গল্পের শুরুতেই কিশোর-মনকে আকর্ষণ করেন বিমল কর। বৈঠকিচালে, খানিকটা মন্থরভঙ্গিতে যে-গল্প শুরু হয়, তার মধ্যে ছোটরা ঢুকে পড়ে অনায়াসে, অবলীলায়।
কাহিনীবিন্যাসের চমকে, অনাবিল হাস্যরসের ধারায়, নিখুঁত চরিত্রচিত্রণে লেখকের কিশোর-কাহিনীগুলি ছোটদের হৃদয় জয় করেছে। অথচ বিমল কর ছোটদের জন্য লেখা আখ্যানে কখনও অকারণ রোমাঞ্চের অবতারণা করেন না। শিশুমনে কুপ্রভাব ফেলতে পারে এমন ঘটনা বর্জন করেন। একই সঙ্গে অবাস্তব বিষয়কেও আনেন না গল্পের ত্রিসীমানায়।
তাঁর গল্পগুলি ভরপুর বিষয়বৈচিত্র্যে। হাসির ঘটনা কিংবা অলৌকিক কাহিনী যেমন আছে, তেমনই কল্পবিজ্ঞান বা গোয়েন্দারহস্য। এর পাশাপাশি কিশোর-পাঠকদের প্রিয় ডাকাতদের গল্প। সব ধরনের গল্পেই তিনি সার্থক।
কিশোরদের জন্য লেখা তাঁর নানা স্বাদের উপন্যাসগুলি এবার এক মলাটে এনে প্রকাশিত হল দশটি কিশোর উপন্যাস। এখানে আছে, ওয়ান্ডার মামা, গজপতি ভেজিটেবল শু কোম্পানি, অলৌকিক, সিসের আংটি, হারানো জীপের রহস্য, কিশোর ফিরে এসেছিল, মন্দারগড়ের রহস্যময় জ্যোৎস্না, কালবৈশাখীর রাত্রে, হারানো ডায়েরির খোঁজে ও রাবণের মুখোশ।

ISBN 81-7756-117-0
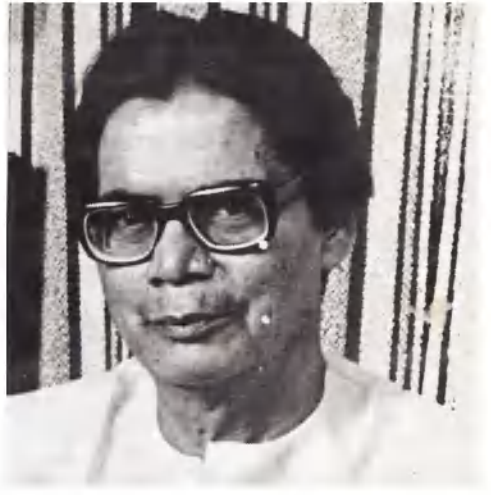
বিমল করের জন্ম ৩ আশ্বিন ১৩২৮। ইংরেজি ১৯২১।
শৈশব কেটেছে নানা জায়গায়। জব্বলপুর, হাজারিবাগ, গোমো, ধানবাদ, আসানসোল।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক।
কর্মজীবন : ১৯৪২ সালে এ.আর.পি.-তে ও ১৯৪৩ সালে আসানসোলে মিউনিশান প্রোডাকশন ডিপোয়। ১৯৪৪-এ রেলওয়ের চাকরি নিয়ে কাশী। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পরাগ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক, পরে 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা ও 'সত্যযুগ'-এর সাব-এডিটর। এ-সবই ১৯৪৬ থেকে '৫২ সালের মধ্যে।
১৯৫৪-১৯৮২ সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
১৯৮২-১৯৮৪ 'শিলাদিত্য' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক।
বহু পুরস্কার। আনন্দ পুরস্কার ১৯৬৭ এবং ১৯৯২। আকাদেমি পুরস্কার ১৯৭৫।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরস্কার ১৯৮১।
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহদাস পুরস্কার ১৯৮২।
'ছোটগল্প—নতুন রীতি' আন্দোলনের প্রবক্তা।

প্রচ্ছদ সমীর সরকার

লেখকের নিবেদন

ছোটদের জন্যে আমার প্রথম লেখা ওয়ান্ডারমামা। অবশ্য ছোট বলতে কিশোর বয়স্ক পাঠকদের কথা বলছি। বছর পঁচিশ আগে এই হালকা এবং হাসির লেখাটি ছাপা হয়। তার পর থেকে অনেক লেখাই লিখেছি। হাসির লেখা, অলৌকিক কাহিনী, কল্পবিজ্ঞান কাহিনী, গোয়েন্দা বা রহস্য কাহিনী, ডাকাতের গল্প—এই রকম আরও কিছু। 'কিকিরা'কে নিয়ে লেখা কাহিনীর সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই। এই বইয়ের দশটি লেখা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কোনওটা হাসির, কোনওটা অলৌকিক, কোনওটা বা রহস্য কাহিনী। কল্পবিজ্ঞানও আছে। পড়ার সুবিধের জন্যে এক এক ধরনের কাহিনী একসঙ্গে পরপর দেওয়া হল। কখন কোনটা লেখা হয়েছে—কালানুক্রমিক ভাবে তা সাজানো হয়নি; আমার কাছে তা জরুরিও মনে হয় না। যাদের জন্যে লেখা তারা যদি এই দশটি লেখা পড়ে আনন্দ পায় লেখক হিসেবে আমি খুশি হব।

২৭ ডিসেম্বর, ২০০০ **বিমল কর**

সূচি

হাসির উপন্যাস

ওআন্ডারমামা
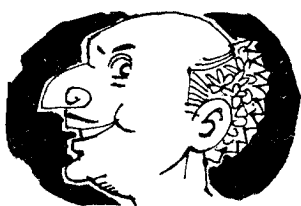
আমাদের মফস্বল শহরে বরাবরই খুব শীত পড়ত। একেই তো জায়গাটা ছিল বিহারের পাহাড়ী এলাকা, তার ওপর আমাদের শহরের আশেপাশে ছিল যত রকম বন-জঙ্গল। ছোটনাগপুর পার্বত্য এলাকা বলতে ভূগোল বইয়ে যা বোঝাত আমরা তার চেয়েও বেশি বুঝতাম, অন্তত শীতকালে ; পার্বত্য এলাকার দৌরাত্ম্যটা বেশ হাড়ে-হাড়ে অনুভব করতাম। তবু একথা ঠিক, আমাদের মফস্বল শহরটি ছিল খুব সুন্দর। মোটামুটি সবই ছিল সে-শহরে : দোকান, বাজার, স্কুল, ছোট হাসপাতাল, সাহেবসুবোদের পাথরঅলা একটা পুরানো গির্জা, আমাদের শিবমন্দির আর বারোয়ারী দুর্গাপুজোর মণ্ডপ, ছোট লাইনের রেল স্টেশন, বাস অফিস, এমন কি বায়োস্কোপ দেখার একটা ঘরও। সপ্তাহে দু'দিন বায়োস্কোপ হত—শনি আর রবি। তখনকার দিনে সিনেমাকে আমাদের মফস্বল শহরে সবাই বায়োস্কোপ বলত। আমরা কোনো নদী-টদী দেখিনি, ঝরনা দেখেছি ছোটখাট, পাহাড়ী নালা দেখেছি, কিন্তু নদী নয়। নদীর জন্যে আমাদের তেমন দুঃখও ছিল না। জল দেখতে হলে চলে যেতাম গির্জার দিকে—সেখানে মস্ত একটা ঝিল ছিল। পাহাড়ের পাথর দিয়ে যেন বাঁধানো ছিল ঝিলটা, কাচের মতন তার ঝকঝকে জল। বর্ষায় ঝিলটা কানায় কানায় ভরে উঠত, আর সারা বছরই সেই জল থাকত ; গরমের সময় অনেকটা শুকিয়েও তা যেন শেষ পর্যন্ত আর শুকোত না ; আমরা ভাবতাম, মাটির তলা থেকে জল ওঠে। ওই ঝিলের জলই ছিল আমাদের খাবার জল। ঝিলের একটু দূরেই একটা জলটাকি ছিল, আর পাশেই ছিল পাম্প হাউস। সকাল বিকেল পাম্প হাউসের ফট্‌ফট্

ফট্‌ফট্‌ শব্দ শোনা যেত।

আমাদের শহরে টিলা আর চাঁদমারি ছিল, সাহেবদের কবরখানা ছিল, ফুটবল ম্যাচ খেলার মাঠ ছিল, কিন্তু ইলেকট্রিক আলো এক রকম ছিলই না। বাঙালী ও বেহারী পাড়াতে তো কারোর বাড়িতেই নয়, সাহেব পাড়াতেও দুটো বাড়ি ছাড়া ইলেকট্রিক আলো ছিল না। সে বাড়ি দুটোর একটা ছিল সাহেবদের ক্লাব, অন্যটা ছিল হাণ্টারসাহেবের বাড়ি। ডায়নামো দিয়ে নাকি তার আলো জ্বালানো হত। যেমন জ্বলত বায়োস্কোপ হলে।

আমাদের পাড়ায় কেরাসিনের আলো জ্বলত, কখনো-সখনো পেট্রম্যাক্স বাতি। রাস্তায় টিমটিমে কতকগুলো কেরাসিন বাতি ছিল। কখনও জ্বলত কখনও বা জ্বলত না। বাজারে পেট্রম্যাক্স, কার্বাইডের আলো, দেওয়াল লণ্ঠন-টণ্ঠন জ্বালানো হত। তা হোক, আমরা কেউই আলো নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাইনি। তখনকার দিনে কেই বা ইলেকট্রিকের আলো নিয়ে মাথা ঘামাবে। আমাদের ছোট্ট সুন্দর শহর, অজস্র গাছপালা, আশপাশের টিলা আর পাহাড়, আমাদের স্কুল, খেলাধুলো এসব নিয়ে আমরা বেশ সুখেই ছিলাম।

সেবারে অ্যান্নুয়েল পরীক্ষার পর সবাই যখন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি আর সাত-সকালে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে লেপের তলায় ঠকঠকিয়ে কাঁপছি তখনই এ-গল্পের শুরু। পরীক্ষার সময় দেখেছি সকালে ঘুম ভাঙত না; বাবা ডাকছেন, মা ডাকছে, কাকিমা এসে ডাকছে তবু ঘুম আর ভাঙে না। যেই না পরীক্ষা ফুরিয়ে গেল, ওরে বাব্বা, ফরসা হবার আগেই কখন ঘুম পালিয়েছে। ঘুম ভেঙে গেলে লেপের তলায় শীতটা আরও যেন বেশী করে গায়ে লাগত; অথচ কার সাধ্য বিছানা ছেড়ে ওঠে। এদিকে মন তখন লেপের তলায় থাকতে চায় না, বন্ধুদের কাছে যাবার জন্যে ছটফট করছে।

সেদিন সকালের হিম-কুয়াশা কেটে রোদ উঠতে উঠতে একটু দেরী হলো। ততক্ষণে হাত মুখ ধুয়ে গরম হালুয়া আর ধোঁয়া-ওঠা

চা খেয়ে আমি তৈরী। ফার্স্ট ক্লাসে উঠতে যাচ্ছি বলে বাড়িতে চায়ের বরাদ্দ বাঁধা হয়েছে।

রোদ উঠতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা অন্তুর কাছে। অন্তু আমার বন্ধু, প্রাণের বন্ধু। অন্তু, কানু, বিজন, টুলু, মানস—সবাই আমরা বন্ধু।

আমরা সকলেই প্রায় একই পাড়ায় থাকি, একই স্কুলে পড়ি, হয় একই ক্লাসে না-হয় এক-দু' ক্লাস উঁচু-নিচুতে। সকলেরই পরীক্ষা শেষ, সবাই আজ সাত-সকালে উঠে জেগে বসে আছে কতক্ষণে দল বেঁধে পলাশতলার মাঠে গিয়ে বসতে পারবে। পলাশতলার মাঠটা আমাদের পাড়ার শেষ দিকটায়, মাঠের তিন পাশে শুধু পলাশ ঝোপ, অন্য পাশ দিয়ে ছোট লাইনের গাড়ি যায় বাঁশি বাজিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে। ওই মাঠে আমরা বরাবর খেলাধুলো করেছি, গুলতানি করেছি।

আমাদের বড়রাও মাঠটার ভাগীদার ছিল। তা থাক, তাতে কিছু যেত আসত না।

কথা ছিল, পলাশতলার মাঠে গিয়ে আমাদের ক্রিকেট খেলার পিচ্ তৈরি হবে সারা সকাল। তারপর বাড়ি গিয়ে নাওয়া-খাওয়া সেরে মাঠে এসে 'লম্বা' ভার্সেস 'বেঁটে' দুটো দল করে প্র্যাক্‌টিস ম্যাচ খেলা হবে, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। এই ম্যাচটা ছিল আমাদের জীবন-মরণ সমস্যার মতন। কেননা পরের দিন, রবিবার, আমাদের চেয়ে যারা বড়—সেই মণ্টুদাদের দলের সঙ্গে আমাদের ম্যাচ। গতবার আমরা জিতেছি, এবারে জিততে না পারলে টুলু, ব্রজ আমাকেই দুয়ো দেবে। আমি এবার ক্যাপ্টেন, গতবার ছিল ব্রজ।

অন্তুদের বাড়ি যাবার সময় শীতের চোটে আমার বেশ কাঁপুনি ধরছিল। হবেই তো; সময়টা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। এখন তো বাঘের শীত শুরু। যেতে যেতে মনে মনে আমাদের 'লম্বা'র দল ঠিক করে ফেলেছিলাম: আমি, অন্তু, হারু, বাসু, এইসব লম্বার দলে আর 'বেঁটে'দের দলে ব্রজ, টুলু বিজনরা থাকবে—ওরা

আমাদের চেয়ে বেঁটে।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হিহি করতে করতে অন্তুদের বাড়ি আসতেই লিলির সঙ্গে দেখা। লিলি অন্তুর বোন। গায়ে পেল্লায় একটা সোয়েটারের ওপর ডলিদির উলের স্কার্ফ চাপিয়ে বাগানের রোদে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। তার হাতে দুধের গ্লাস ; দুধ খাচ্ছে আর নাক সিঁটকোচ্ছে।

"এই, অন্তু কি করছে রে? উঠেছে না ঘুমোচ্ছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কি জানি, দেখিনি," লিলি বলল।

"দেখিসনি ?"

"উঠেছে হয়ত।" লিলি দুধের ঢোঁক গিলল।

"তুই কোন্ বাড়িতে ছিলি রে যে কিছুই দেখিসনি ?"

"মামার বাড়িতে ছিলাম রে......" লিলি ভেঙচি কেটে বলল। লিলিটা বরাবর এই রকম। কারও তোয়াক্কা করে না। আমাদের তো নয়ই।

ওর পাশ কাটিয়ে এগুতে যাচ্ছি, লিলি বলল, "দাদা বেরিয়ে গেছে।"

"বেরিয়ে গেছে !" আমি অবাক, এত সকালে অন্তু কোথায় বেরুবে! বেরুলে সে আমার বাড়িতেই যেত। লিলিটা কোনো খোঁজখবর রাখে না, যা মুখে আসে বলে দেয়।

লিলির কথায় কান না দিয়ে পা বাড়াচ্ছি, আবার সে বলল, "বাড়িতে পাবে না। অন্তুদা স্টেশনে গেছে।"

"স্টেশন !......তবে তুই না বললি দেখিসনি ?"

"দেখিনি তো ! স্টেশনে গেলে কাউকে দেখা যায় !"

"তুই তো পরে বললি ঘুম থেকে উঠেছে হয়ত......"

"আহা, না উঠলে কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্টেশন যাবে।"

"হ্যাত......ইয়ারকি যত...! তুই বড় ইয়ারবাজ হয়ে গেছিস, লিলি।"

লিলি এবার মাথা দুলিয়ে হাসল। বলল, "যাও না, বাড়ির মধ্যে খুঁজে দেখগে যাও।"

"নেই?"

"না।"

"স্টেশনে গেল কেন?"

"মামাকে আনতে।"

"মামা! কার মামা রে?"

"কার মামা আবার, আমাদের মামা। ন্যাকামি করো না রাজুদা, আমাদের মামা আসছে তুমি জানো না?"

অন্তুর এক মামা আছে এ-খবর আমার জানা ছিল; কিন্তু তার মামা আসছে জানতাম না। মাথা নেড়ে বললাম, "বাঃ, আমি কি করে জানব। অন্তু আমায় কিছু বলেনি।"

লিলি হঠাৎ খুব হাসতে লাগল। তার হাসি ফুরোবার আগেই দেখি, অন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি টপকে চলে আসছে।

অন্তু আসতেই আমি লিলির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, "লিলিটা পয়লা নম্বরের মিথ্যুক আর ইয়ারবাজ হয়ে গেছে। আমায় বলছিল তুই স্টেশন গিয়েছিস তোর মামাকে আনতে।"

অন্তু একবার লিলির দিকে তাকিয়ে যেন মজাটা বুঝে নিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "যাবার কথা ছিল। বিকেলে যাব।"

যে মামা সকালে আসবে তাকে বিকেলে আনতে যাওয়ার মানেটা কি আমি বুঝলাম না। মামাকে কি ওরা স্টেশনে বসিয়ে রাখবে নাকি?

অন্তু বলল, "আমার বড়মামা আসছে। ছোটমামাকে তুই তো দেখেছিস। এরোপ্লেন চালায়। পাইলট।"

অন্তুর ছোটমামাকে আমি কস্মিনকালেও দেখিনি, তবে অন্তু আমাকে একটা ফটো দেখিয়েছিল একবার, বলেছিল তার

মামার ছবি। মামা এরোপ্লেন চালায়, বিলেতে থাকে, এদেশে বড় আসে না। তা চেহারাটা দেখে সাহেব-সাহেবই মনে হয়েছিল। বিলেতে থাকলেও থাকতে পারে মামা। তখন এরোপ্লেনই বেশি দেখা যেত না, তার ওপর যদি শুনি কেউ এরোপ্লেন চালায় তবে তো মানুষটিকে অবাক হয়ে সসম্ভ্রমে দেখারই কথা। আমি সেই থেকে অন্তুর ছোটমামাকে খুব সম্ভ্রম করতাম; ভাবতাম, ছোটমামার চোখ, বুক, হাত, সাহস, বুদ্ধি নিশ্চয় আমাদের মতন নয়, অন্য রকম মানুষ নিশ্চয় ছোটমামা। হয়ত সে রকম আর এখানে কেউ নেই, সাহেবদের মধ্যেও নয়। অন্তুর ছোট মামাকে দেখার একটা সাধ আমার ছিল। সেই ছোটমামা না এসে বড়মামা আসছে শুনে আমার আর কোনো আগ্রহ হল না।

অন্তু বলল, "বড়মামা কোত্থেকে আসছে জানিস?"

আমি কিছু প্রশ্ন করার আগেই লিলি বলল, "হো—হোকাইডো ইয়া-ইয়া" বলতে বলতে তার বিষম লেগে গেল।

অন্তু লিলির মাথায় বার কয়েক চাটি মেরে বিষম কাটিয়ে দিয়ে বলল, "বলতে পারিস না—বলতে যাস কেন? বুঝলি রাজু, নামটা বেশ খটমটে, হোক্কাইডো ইয়ামাশিকু..."

নাম শুনে মনে হল আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য কোনো জায়গা সেটা।

অন্তু বলল, "নে চল...বলছি তোকে সব।"

আমরা চললাম মানিকের বাড়ি, সেখান থেকে পলাশতলার মাঠে যাব। যেতে যেতে অন্তু বলল, "বড়মামা এখন আসছে জাপান থেকে। ওই যে হোক্কাইডো ইয়ামাশিকু বললাম—ওটা জাপানে। বড়মামা জাপানে আছে লাস্ট পাঁচ বছর। তার আগে ভাই, জার্মানীতে ছিল, সেখান থেকে রাশিয়া, রাশিয়া থেকে চীন ঘুরে জাপান। বড়মামা একজন সাইনটিস্ট। খুব বড় সাইনটিস্ট। ওসব দেশে বড়মামার নামে সবাই চিনতে পারে।"

"কি নাম রে?" আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

"ছোট করে লোকে বলে ওআণ্ডার মুখার্জী, আসল নাম মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়।"

মথুরানাথ নামটা আমার তেমন পছন্দ না হলেও ওআণ্ডার মুখার্জী নামটায় বেশ মজা পেলাম, অবাকও হলাম। বললাম, "ওআণ্ডার মুখার্জী কেন রে?"

অন্তু হাঁটতে হাঁটতে রাস্তা থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে দু'পা ছুটে গিয়ে ওভার পিচ্ বল করল, করে হাতটা একটু ঝাঁকিয়ে নিল। অন্তু আমাদের বোলার।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অন্তু এবার বলল, "বড়মামা আশ্চর্য আশ্চর্য সব জিনিস আবিষ্কার করেছে, বোধ হয় তাই।"

"কি কি আশ্চর্য জিনিস রে?"

মাথা নাড়ল অন্তু, "তা জানি না। হবে অনেক কিছু। একটা জিনিস তো নয় রে, অনেক কিছু, অত কে মনে রাখে। আমরা কিছু বুঝব না!"

কথাটা অবশ্য ঠিক। তবু দু' একটা আশ্চর্য কিছু আবিষ্কারের কথা শুনতে ইচ্ছে করছিল। আমাদের শহরটা সুন্দর, ছিমছাম। হই-হট্টগোলের জায়গা মোটেও নয়। কিন্তু একটা অভাব আমাদের ছিল। এখানে নামকরা লোকজন কেউ আসত না। মহাত্মা গান্ধীর একবার আসার কথা হয়েছিল, আসেননি; স্যার জগদীশচন্দ্র বসু নাকি একবার—আমরা তখন জন্মেছি কিনা সন্দেহ—এদিক দিয়ে কোথায় যেন গিয়েছিলেন বলে গল্প শুনেছি।

অন্তু বলল, "কাল অনেক রাত পর্যন্ত বাড়িতে বড়মামার গল্প হয়েছে, বুঝলি রাজু। মা ছাড়া বড়মামাকে আর কেউ চেনেই না, বাবাও নয়। বাবা বড়মামাকে দেখেইনি। ফটো দেখেছে। তবে বাবা অনেক গল্পটল্প শুনেছে তো বড়মামার, তাই গল্প বলছিল। চিঠিফিটি আসে মাঝে মাঝে। কুড়ি-বাইশ বছর জার্মান, লণ্ডন,

রাশিয়া, জাপান-টাপান করে এইতো সবে দেশে ফিরেছে মামা। মাসখানেক আগে ফিরেছে বুঝলি, কিন্তু আসতে না আসতেই কলকাতা, দিল্লি, বম্বে···। লোকে খালি টানাটানি করে। এবার আর বড়মামা কোথাও যাবে না, সেরেফ আমাদের কাছে এসে থাকবে। আমাদের দেখতে ইচ্ছে করছে বুড়োর।" অন্তু হাসল।

ততক্ষণে আমরা বিজনদের বাড়ির কাছে পৌছে গেছি।

বিজনদের ওখানে কানু, টুলু, ব্রজ-ট্রজ এসে গেছে; চুনের পুঁটলি, কোদাল, মাপ-ফিতে, ঝুড়ি নিয়ে ওরা সবাই তৈরী। আমাদের দেখে ওরা চটেমটে বলল, "কি রে মুরশিদকুলি খাঁর দল, এত লেট্······।"

অন্তু হেসে বলল, "ইচ্ছে করে দেরী করলাম নাকি! হয়ে গেল!······নে, চল্······।"

ব্রজ বেহারী ছেলে, তার পুরো নাম বা আসল নাম বিরিজ মোহন, আমরা বলি ব্রজ, স্কুলেও মাস্টারমশাইরা তাকে ব্রজ বলে ডাকেন। ব্রজ একটু তেরিয়া মেজাজের ছেলে, হরিণের মতন ছুটতে পারে, কথা বলার সময় সামান্য তোতলামি করে। বাঙলা সে আমাদের মতনই বলে।

যেতে যেতে ব্রজ বলল, "কি করছিলি তোরা? ঘু-ঘুম মারছিলি?"

অন্তু বলল, "না রে, ভোর পাঁচটায় উঠেছি।"

"ত—তবে!"

"ঘরটর গোছানো হচ্ছিল······"

"হঠাৎ? তোরা কি বড়দিনের ঘর সাফ করছিস?"

"না। আমার বড়মামা আসছে হোক্কাইডো ইয়ামাশিকু থেকে।"

পুরো দলটাই থেমে গেল, গিয়ে হাঁ করে অন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অন্তু সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে গর্বভরে ভারিক্কি একটু হাসি হেসে বলল, "জায়গাটা জাপানে। জাপান থেকে আসছে বড়মামা। কথা ছিল সকালে আসবে, তারপরে টেলিগ্রাম এসেছে বিকেলে আসবে।"

"জাপান থেকে টেলিগ্রাম?" কানু চোখ গোল্‌লা করে বলল।

"জাপান থেকে কেন! ক্যালকাটা থেকে। তুই একেবারে মুখ্যু, কানু—" অন্তু বলল, "জাপান থেকে সরাসরি এখানে আসা যায়? জাপানটা কোথায় জানিস তো? না, তাও জানিস না?"

ব্রজ তার মাথার ছোট্ট, নেংটি ইঁদুরের মতন টিকিতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, "বাস্ রে বাস্, তোর জা-জাপানী মামা আসছে!..."

"জাপানী মামা নয়, ওআণ্ডার মামা—!" আমি বললাম।

ওআণ্ডার মামা শুনে ওরা প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল, পরে অন্তু তার ওআণ্ডার মামার বৃত্তান্ত বুঝিয়ে বললে সবাই মিলে হই হই করে উঠল।

আমরা তারপর পলাশতলার মাঠে এসে খেলার জায়গা পরিষ্কার করে কোদাল চালিয়ে পিচ্ করতে লাগলাম, চুনের দাগটাগ পড়তে লাগল। শীতের রোদে সকলের গা-হাত-পা বেশ গরম হয়ে উঠল, আস্তে আস্তে ঠাণ্ডার দাপটটা যেন পালিয়ে গেল।

ব্রজ বলল, "অন্তু, তোর ও-ও-ওআণ্ডার মামাকে কাল আমাদের ম্যাচের আম্পায়ার করবি? বিশুদা ভীষণ চোট্টা, বড়দের জিতিয়ে দেবে।"

কানু বলল, "তার আগে কানে একটা ফুসমন্তর দিয়ে দিতে হবে মামাকে, ওদের বেলায় টপাটপ এল বি ডবলু।"

অন্তু বলল, "ধ্যুত...জাপানীরা ক্রিকেট খেলে না। মামাকে আমরা ম্যাচ দেখতে আনতে পারি।"

মাঠ তৈরী হয়ে গেলে আমরা পলাশ ঝোপে বসে একটু

জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে আবার খেলতে আসতে হবে 'লম্বা' ভার্সেস 'বেঁটে'।

অন্তু বলল, "আমি ভাই চারটে নাগাদ চলে যাব। বাড়ি গিয়ে তৈরী হয়ে সকলের সঙ্গে স্টেশন যেতে হবে।"

মানস বলল, "সাড়ে পাঁচটায় ট্রেন, অত তাড়াতাড়ি যাবি কেন?"

"কাজ আছে।"

"কি কাজ?"

"বাড়িটা একটু সাজাতে হবে, ডেকরেসান—। দেবদারু পাতা, লাল নীল কাগজের ফ্ল্যাগ ঝোলাতে হবে। ফুলের টবগুলো বারান্দায় সাজাবো। অনেক কাজ। বুঝছিস তো, বিশ-বাইশ বছর পরে বড়মামা আসছে। অত নামী লোক। একেবারে কিছু না করলে মামার প্রেস্টিজ থাকে না।"

টুলু হঠাৎ বলল, "হ্যাঁরে, একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে। শুনবি?" প্ল্যানের ব্যাপারে টুলু আমাদের মাস্টার।

"কি প্ল্যান?" কানু বলল।

"সাড়ে পাঁচটায় ট্রেন। আমরা সাড়ে চারটের মধ্যে খেলা শেষ করে চল্ না সবাই স্টেশনে যাই। আমাদের স্কাউট ড্রেস আছে, ড্রাম বিউগল আছে, ফ্ল্যাগ আছে—ওআণ্ডার মামাকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসি।"

ব্রজ হঠাৎ মাঠের ওপর চার-পাঁচটা ডিগবাজি খেয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "ওআণ্ডারফুল—ওয়াণ্ডার মামাকে কি বলে রে—কি বলে সেই যে—আমরা তাই করব।"

"রিসিভ—" মানস বলল, "রিসিভ করব।"

টুলুর প্ল্যান আমাদের পছন্দ হয়ে গেল। অন্তু তো খুবই খুশী। কিন্তু কথা হল, তার বাড়ির লোক এটা পছন্দ করবে কি না।

ব্রজ বলল, "আরে, কেউ কিছু বলবে না। নে চল্, ওঠ।"

বিকেলে একটু তাড়াতাড়ি খেলা ভেঙ্গে দিয়ে আমরা সকলে ছুটতে ছুটতে টুলুর বাড়িতে গিয়ে হাজির। কুয়াতলায় হাতমুখ ধুয়ে টুলুর ঘরে বসে দেদার মুড়ি কড়াইশুঁটি আর মাসিমার দেওয়া চা খেয়ে স্কাউট ড্রেস পরে নিলাম। টুলু আমাদের ক্লাব ম্যানেজার, তার কাছে আমাদের যাবতীয় খেলাধুলোর জিনিস, জার্সিটার্সি থাকে। স্কাউট ইউনিফর্ম অবশ্য আমাদের বাড়িতে ছিল। যার ছিল না, সে অন্যেরটা পরল।

তারপর বারো চোদ্দ জনের দল স্কাউট ড্রেস পরে ড্রাম বিউগল বাজাতে বাজাতে স্টেশনের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সামনে থাকল হারু আর বাসু, তাদের হাতে আমাদের সরস্বতী পুজোর সময়কার লেখা সেই "স্বাগতম" কাপড়টা। তখন বিকেল মরে ছায়া জমে কালো হতে শুরু হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের বিকেল পাঁচটা প্রায়, এখুনি অন্ধকার হয়ে যাবে সব। আমাদের স্কাউট ড্রেস এবং ড্রাম বিউগল দেখে পাড়ার লোক তেমন অবাক হল না। পরীক্ষা শেষ হয়েছে, হয়ত আমরা 'মার্চ' প্র্যাকটিস করছি, বা স্কুলের কোনো ব্যাপারে যাচ্ছি—এরকম কিছু ভাবল। দু' একজন জিজ্ঞেস করল, "কি রে, বাজনা বাজাতে বাজাতে কোথায় চললি?" জবাবে আমরা বলেছি, "স্টেশনে।"

অন্তু আমাদের সঙ্গে ছিল না। সে বাড়ি চলে গেছে, সেখান থেকে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে স্টেশনে যাবে। কথা ছিল, অন্তু স্টেশনে তার ওআণ্ডার মামার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবে, তারপর ফেরার পথে আমরা ওআণ্ডার মামাকে প্রসেসান করে নিয়ে আসব বাজনা বাজাতে বাজাতে।

স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছে দেখি গাড়ি আসছে। আমরা পোঁ পোঁ ছুটতে লাগলুম, গাড়ি স্টেশনে এসে থামার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাদ্য শুরু হওয়া চাই—টুলুর সেইরকম নির্দেশ।

ততক্ষণে চারপাশ বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। স্টেশনের

ডে-লাইটগুলো সব জ্বালানো হয়নি, দু' তিনটে মাত্র জ্বলেছে; আর একটা সবে জ্বালিয়ে লাইট পোস্টের গায়ে-আঁটা হাতল ঘুরিয়ে আলোটাকে তারের টান দিয়ে ওপরের দিকে টেনে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। গাড়ি এসে থেমে গেল।

আমরা ছোট মতন ওভারব্রিজটার ঠিক তলায় তখন। কানু সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা হড়কে পড়ল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না। ল্যাঙচাতে ল্যাঙচাতে পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার লম্বা বাঁশিটা মুখে ঠেকিয়ে রাখল।

ওই তো অন্তুরা : অন্তু, লিলি, ডলিদি, সন্তু, কাকাবাবু, কাকিমা, পিসিমা। ডলিদির হাতে একটা মালা। সন্তুটা তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে। অন্তু গাড়ির কামরার দিকে এগিয়ে কাকে যেন খুঁজছে। এমন সময়ে একেবারে শেষের দিকের কামরায় একটা হইহই শুরু হল, কুলিটুলিগুলো হুড়মুড় করে সেদিকে ছুটছে। আমরাও পজিসন ভুলে ছুটতে লাগলুম। স্কাউট আমরা, আপদ-বিপদ হলে দেখতে হবে তো।

ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখি কাকাবাবু কাকিমা—অন্তুর বাবা ও মা—সেখানে পৌঁছে গেছেন।

প্লাটফর্মের ওপর অদ্ভুত ধরনের একটি মানুষ দাঁড়িয়ে, তাঁর চারপাশে কুলিদের ভিড়, একদল উঠেছে কামরার ভেতর, আর একদল পাশের ব্রেকভ্যানে ঢুকেছে, গার্ডসাহেব ব্যস্ত হয়ে মাল-পত্র নামানোর তদারকি করছেন।

কাকিমা এগিয়ে গিয়ে সেই মানুষটির সামনে দাঁড়ালেন, একটু যেন ভয়ে ভয়ে। কাকাবাবুও এগিয়ে গেলেন।

তারপর যে কি হল ভাল বুঝলাম না, কাকিমা প্রণাম করলেন লোকটিকে, ডলিদি এসে মালা পরিয়ে দিল, সন্তু ফটাস্ ফটাস্ করে দু'তিনটে বেলুন ফাটিয়ে দিল, সেই অদ্ভুত চেহারার মানুষটি স্টেশনে দাঁড়িয়ে কাকিমার মাথায় হাত রেখে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন।
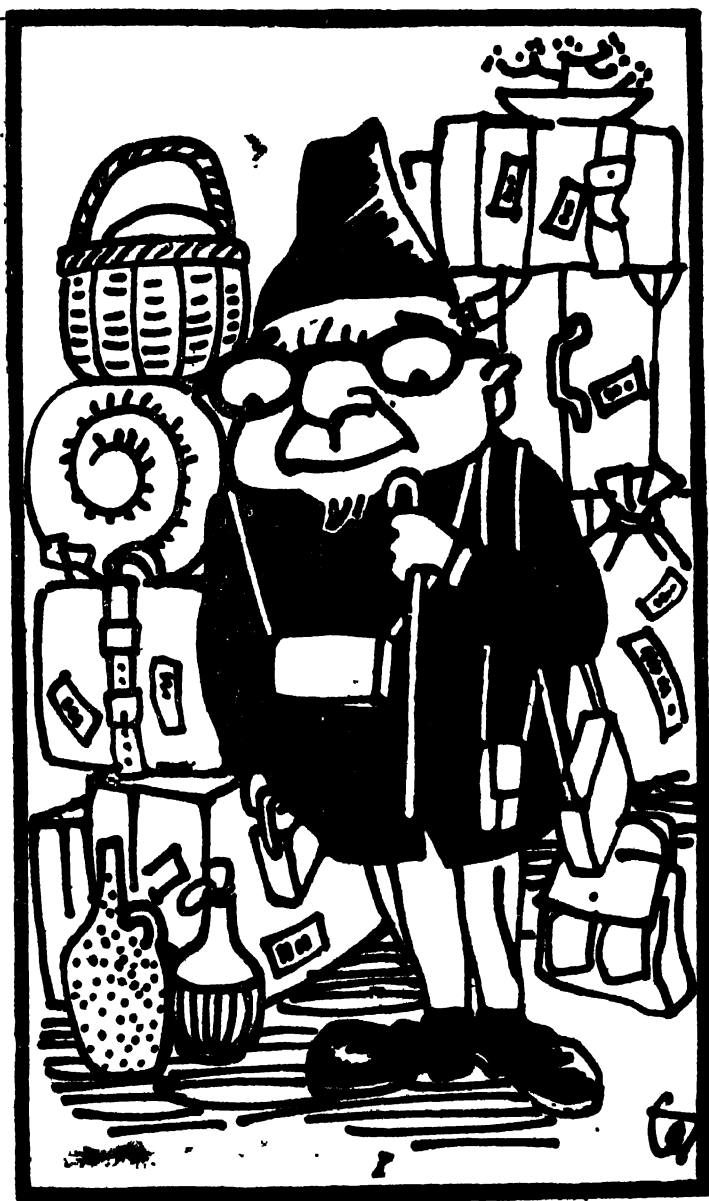
বাক্সর পর বাক্স, বড় বাক্স, ছোট বাক্স, চ্যাপ্টা বাক্স

বিশ-বাইশ বছর পরে দেখা হল বলে এই ধরনের কান্নাকাটি চলল একটু, কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম, উনিই অন্তুর বড়মামা —ওআঙার মামা।

অন্তু মালপত্র নামানোর তদারকি করতে লাগল। ওরে সাবাস, মাল নামছে তো নামছেই, কামরা থেকে নামছে, ব্রেকভ্যান থেকে নামছে—নেমেই যাচ্ছে। বাক্সের পর বাক্স, বড় বাক্স, ছোট বাক্স, চ্যাপ্টা বাক্স, গোল বাক্স, কাঠের বাক্স, বেতের বাক্স। ক্যাম্বিস জড়ানো নানা ধরনের মালপত্রও নামতে লাগল, বিছানা নামল, বস্তা নামল, মস্ত একটা ছাতার মতন কি নামল, তারপর নামল এক সিন্দুক।

গাড়ি লেট্ হয়ে যাচ্ছিল। অন্যরা হাঁ করে এই মালপত্র নামানো দেখছে।

শেষে গাড়ি ছাড়ল, প্লাটফর্মের ভিড় কমল।

এবার আমরা ওআঙার মামাকে ভাল করে দেখতে পেলাম। বেঁটে মতন চেহারা, মুখ একেবারে গোল, থুতনির কাছে একটু দাড়ি, মাথায় ফিনফিনে সাদা ধবধবে চুল, হাতে গম্বুজ ধরনের অদ্ভুত টুপি, চোখে দো-তলা চশমা, প্যাণ্টের পা বেশ সরু, পেটের কাছটা ভীষণ মোটা, গায়ে একটা গলাবন্ধ কোট, জাপানী মার্কা হবে হয়ত, বাঁ হাতে ছড়ি, মুখে চুরুট। পায়ের জুতো জোড়াও যেন চকচক করছিল।

কাকাবাবু কুলিদের দিয়ে মালপত্র ওঠাতে লাগলেন।

আমরা একপাশে সরে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে টুলুর কথা মতন ব্যাণ্ড বাজাতে লাগলাম।

ডলিদি, লিলি যেন এতক্ষণে আমাদের দেখতে পেল। লিলি হাসতে লাগল।

অন্তু ইশারা করে বলল, বাজিয়ে যা।

আমরা আমাদের সবচেয়ে গ্রড়গড় গতটা বাজাতে লাগলাম।

ওআঙার মামা একেবারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের ব্যাণ্ড

শুনতে লাগলেন। যেন অ্যাটেনসান্ হয়ে দাঁড়িয়ে।

বাজনা শেষ হলে ওআণ্ডার মামা স্ট্যাণ্ড এট ইজ হলেন।

অন্তু যেন কি বলল তার বড়মামাকে। শুনে তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

অন্তু আমাদের নাম বলে গেল একে একে, ওআণ্ডার মামা কারও সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন, কারও মাথায় ছড়ির টোকা মারলেন, কারও কান টেনে দিলেন, কাউকে আবার আদর করে আঙুলের খোঁচা মারলেন। আর বার বার বলতে লাগলেন, "বাঃ! বাঃ! ভেরী গ্ল্যাড, ভেরী গ্ল্যাড। তোর বন্ধু সব, বাঃ বাঃ, গুড বয়েজ! কি রে বেটা, তোর মাথায় টিকি কেন? বাঃ বাঃ, টিকি রাখা ভাল।"

শেষপর্যন্ত আমরা ওআণ্ডার মামাকে সামনে নিয়ে প্রসেসান করে এগুতে থাকলাম।

ওভারব্রিজের কাছে এসে মামা বললেন, "তোদের স্টেশনে আলো এ রকম কেন রে?"

অন্তু বলল, "এই রকমই তো বরাবর।"

"বলিস কি! শহরে আলো নেই?"

"কেরাসিনের আলো আছে, পেট্রম্যাক্স আছে।"

"ও-সব কি আর আলো নাকি? আজকাল সভ্য লোকে এসব জ্বালায়! আচ্ছা, আমি তোদের আলো করে দেব।"

"আলো করে দেবেন?"

"ও, ইয়েস। সব আলো করে দেব।...ওআর্লডের আঠাশটা শহর আমার হাতের আলোয় দিন হয়ে আছে, তোদের এই পুচকে শহরটা আলো করতে পারবো না! বলিস কিরে?"

আমরা সবাই মিলে চিৎকার করে উঠলাম আনন্দে। আলো হবে—আলো হবে—, ওআণ্ডার মামা আমাদের শহর আলো করে দেবেন।

ওআণ্ডার মামাকে সাক্ষাৎ দেবদূতের মতন মনে হল তখন।

মামা বললেন, "তোদের এখানে গ্যাস-আলো করব। গ্যাসে আমার সুখ্যাতিটাই একটু বেশি।"

আমরা এবার থ্রি চিয়ার্স করে হাঁক ছাড়লাম। তারপর ওআণ্ডার মামাকে নিয়ে ওভারব্রিজের সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে লাগলাম।

২

পরের দিন পলাশতলার মাঠে ওআণ্ডার মামা আমাদের ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে এলেন। খেয়েদেয়ে জিরিয়ে চুরুট টানতে টানতে তিনি যখন এলেন তখন দুপুর, আমাদের লাঞ্চ খাওয়া হয়ে গিয়েছে, মটরশুঁটির ঘুগনি, পাউরুটি আর আলু-সেদ্ধ খেয়ে আমরা তখন ব্যাট করতে নেমেছি। মন্টুদার দল আমাদের বল যত পিটিয়েছে তত ছুটিয়েছে। ছুটতে ছুটতে কাহিল হয়ে গিয়েছিলাম সব, পা আর নড়ছিল না, খিদেয় মরে যাচ্ছিলাম। একটু আগে-ভাগে লাঞ্চ হল, মন্টুদারা আমাদের পেট ভরে আদর করে খাওয়াল, ব্রজ একাই তিন খুরি ঘুগনি সাবড়ে দিল। খুব করে খাইয়ে-টাইয়ে মন্টুদারা ডিক্লেয়ার করে দিল। আমাদের দু' দলের ম্যাচের নিয়ম ছিল আড়াই ঘণ্টা করে এক এক দল খেলবে। সময়ের হিসেবে আরও আধঘণ্টা ওরা খেলতে পারত, খেলল না। আমরা তখন বড় বড় ঢেঁকুর তুলছি। প্রথমে ব্যাট করতে নামল বিজন আর হারু। বিজন দু'চারটে বল ঠেকা দিয়েই আউট, রান বলতে তখন আমাদের মস্ত এক শূন্য। হারু লাঠি খেলার মতন করে কয়েকবার ব্যাট চালাল, তারপর বল মারতে গিয়ে কাটা সৈনিকের মতন উইকেটের ওপর ধপাস করে পড়ল। আমাদের রান তখনও শূন্য। এমন সময় ওআণ্ডার মামা এলেন।

আমরা ব্যাট করতে নামার আগেই মানস ওআণ্ডার মামাকে আনতে গিয়েছিল। উনি সেই রকমই বলে দিয়েছিলেন, দুপুরে আসবেন। মামা এসে বসতে না বসতে আমাদের টুনুও আউট,

রান হয়েছে চার। মামার জন্যে আমরা একটা ক্যাম্বিসের চেয়ার বয়ে এনে ছায়ায় রেখে দিয়েছিলাম। মামা এসে বসলেন।

মন্টুদারা তখন সবাই মাঠের মধ্যে হাসছে আর মজা করছে। করবেই তো, চার রানে তিন তিনটে উইকেট চলে গেছে আমাদের, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার মতনই অবস্থা। কানুকে আমরা এবার ঠেলেঠুলে পাঠিয়ে দিলাম। সে আমাদের 'তাড়ু দি গ্রেট', আসলে ও বোলার। কানু এমনিতে একেবারে শেষের দিকে যায়। কানুকে মাঠে ঠেলে দিয়ে আমরা একটু জল্পনা কল্পনা করতে বসলাম। মাঠে মন্টুদারা তালি বাজিয়ে ঠাট্টাচ্ছলে কানুকে আদর করে ডেকে নিল।

আমরা যে গো-হারান হারব তাতে সন্দেহ ছিল না। ছি ছি, এই খেলাই আবার ওআন্ডার মামাকে দেখাতে এনেছি!

মামা আগেই বলেছিলেন তিনি ক্রিকেট খেলাটেলা বোঝেন না; জার্মানিতে, রাশিয়ায়, চিনে, জাপানে কোথাও এ-সব খেলা হয় না। তবু আমাদের জন্যে তিনি মাঠে আসবেন।

ক্যাম্বিসের চেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে শীতের রোদে পা ডুবিয়ে বসে মামা খেলা দেখছিলেন, মুখে চুরুট। আমরা তখন জল্পনা কল্পনা করছি। একটা বুদ্ধিটুদ্ধি ধার পাওয়া গেলে বাঁচি। অন্তু বলল, "মামাকে জিজ্ঞেস করি, কী বল?"

যিনি ক্রিকেট খেলাই বোঝেন না তাঁকে জিজ্ঞেস করে কী যে লাভ হবে বুঝলাম না। তার চেয়ে মরিয়া হয়ে একে একে মাঠে নেমে পড়া ভাল। কপালে নির্ঘাত হার, কে আর বাঁচাবে!

ব্রজ বলল, "ঠি-ঠিক কথা, মামাকে বল।"

"মামা কী করবেন, মামা তো আমাদের হয়ে রান করে দেবেন না", আমি বললাম। আমার আবার ক্যাপ্টেন হবার জ্বালা, সেই সঙ্গে গো-হারান হারার অপমান।

ব্রজ বলল, "আরে মামা সাইন্স বলে দেবে...। সাইন্সে সব হয়।"

ব্রজটা একেবারে মুখ্যুর রাজা। সাইন্স দিয়ে কি রান তোলা যায়! অন্তু আমার কথায় কান করল না, মাঠের দিকে এগোল। অগত্যা আমিও এগোলাম। ব্রজব্রজও সঙ্গে চলল।

ততক্ষণে মাঠের চারপাশে, মানে ছায়ায় বসে যারা আমাদের খেলা দেখছে, আমাদের বন্ধু আর বাচ্চাটাচ্চা, তারা হাততালি দিতে লাগল। 'তাড়ু' কানু কি আউট হল? বুকের মধ্যে ছ্যাঁক করে উঠেছিল। তাকিয়ে দেখি, কানু দু-দুটো বাউন্ডারি হাঁকাল, পর পর।

ওআন্ডার মামার কাছে এসে অন্তু বলল, "বড়মামা, আমরা হেরে যাব।"

মামা উঁচু করে মুখ তুলে আমাদের দেখলেন। তারপর বললেন, "হেরে যাবি?"

করুণ মুখ করে আমরা মাথা নাড়লাম।

ব্রজ বলল, "ওরা চোট্টা—মণ্টুদারা, পাঁচ-পাঁচটা ক্লিয়ার আউট দেয়নি। তারপর লাঞ্চে ঘুগনির সঙ্গে নিশ্চয় সিদ্ধি মিশিয়ে দিয়েছে। আমরা খুব খেয়েছি। এখন ঘুম পাচ্ছে, চোখে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।"

মামা ফুস ফুস করে বার কয়েক চুরুট টানলেন। ভাবছিলেন যেন। পরে বললেন, "এই খেলাটা তো দেখছি 'টোনকা' খেলার মতন অনেকটা।"

'টোনকা' যে কী আমরা জানি না। হাঁ করে মামার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

মামা বললেন, "নর্থ জাপানে এই ধরনের একটা খেলা হয়। তা তাদের খেলা তো বল মারা আর ছোটা। টোনকা খেলায় তোদের ওই কাঠিফাঠি পোঁতা থাকে না, চারদিকে গোল হয়ে একজনকে ঘিরে রাখে। ওদের বল আরও ছোট—ডিমের সাইজ..."

অন্তু চট করে বলল, "পিংপং বলের মতন?"

"অনেকটা, তবে বলগুলোর নানা রং, কোনওটা টুকটুকে লাল, কোনওটা সবুজ, নীল, হলুদ। তোদের হাতে যেমন—কী বলে ব্যাট, ওদের হাতে থাকে ছোট্ট ছিপের মতন একটা কঞ্চি, কঞ্চিটার মাথায় একটা জাল, প্রজাপতি ধরার ছোট ছোট জাল দেখেছিস, বাচ্চারা খেলা করে? দেখিসনি? আরে ধর না—লিলিটিলি যেমন খোঁপায় জাল জড়ায় সেই রকম। ওই জালের মধ্যে বল গলিয়ে নিতে হয়। লাল বলে সবচেয়ে কম পয়েন্ট, সাদা বলে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট। প্রতিবারে ছ'টা করে বল দেবার নিয়ম।"

ব্রজ হুট করে জিজ্ঞেস করল, "আউট হয় কী করে?"

মামা বললেন, "একটাও বল যেবার জালে জড়াতে পারবে না সেবারেই তুই বেটা আউট।...আর না হলে যদি তোর ছিপ বা জালে লেগে বল ক্যাচ উঠে অন্যের হাতে চলে যায় তবে আউট।...আরও সব ছোটখাটো নিয়ম আছে, আমি জানি না।"

মাঠের মধ্যে কানু ততক্ষণে আরও দশ-বারোটা রান করে ফেলেছে। আমাদের ছোটর দল চটাচ্চট হাততালি মারছিল।

ওআন্ডার মামা বললেন, "টোনকা খেলা হল চোখের দৃষ্টিশক্তির খেলা।
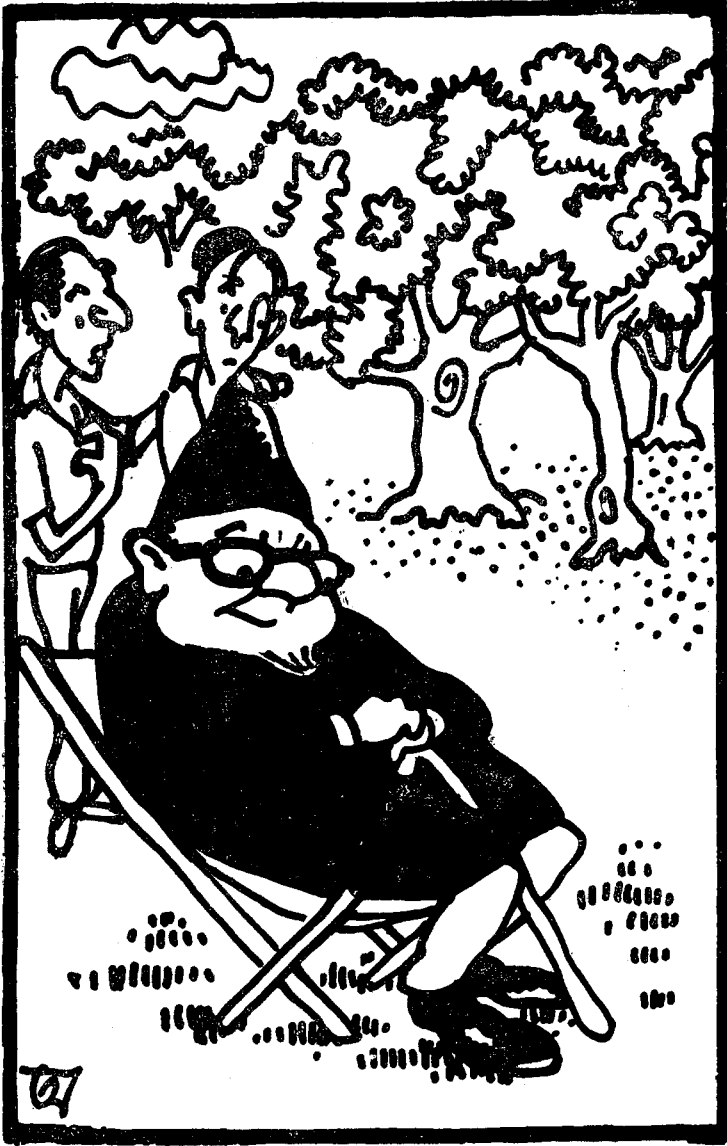
ক্যাম্বিসের চেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে মামা খেলা দেখছিলেন

আই-সাইট ভাল হবে, রঙের চোখ থাকবে পাকা, তবেই তুই খেলতে পারবি। ওই জন্যে ব্রাইট কালার, মানে জ্বলজ্বলে রঙের বলে পয়েন্ট কম, হালকা রঙে পয়েন্ট বেশি। সাদা রঙে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট।"

মামা তাঁর নিবে-যাওয়া চুরুট আবার জুত করে ধরিয়ে নিলেন। বললেন, "তা বুঝলি, একবার আমাদের ওখানে খুব বড় একটা খেলা হবে, ফাইন্যাল ম্যাচ, বাইরে থেকে মস্ত নামকরা একটা দল দেখতে এসেছে। আমাদের দলটার জেতার কোনও চান্স নেই; গো-হারান হারবে। তা ওরা এসে আমায় ধরল। বলল, একটা উপায় করে দাও। এমন করে ধরল যে, না বলতে পারলাম না। তারপর সারারাত ধরে ভেবেচিন্তে একটা টেলিও ম্যাগনিফাইয়িং কালারস্কোপ তৈরি করলাম। তৈরি করলেই তো হবে না, কাজে লাগাতে হবে। ভেবে দেখলাম, চোখে সেঁটে থাকার একমাত্র উপায় হয় গগ্‌লস্। তোরা গগ্‌লস্ চোখে এঁটে মোটরসাইকেল চালাতে দেখেছিস তো, সেইরকম ডিজাইনের হবে। ওটা গগ্‌লস্-এর মতন চোখে এঁটে খেলতে নামো—আর কোনও ভাবনা নেই; টেলিও ম্যাগনিফাইয়িং লেন্স থাকায় ডিমের সাইজের—কী বললি তোরা—পিংপং—তা সেই পিংপং বলগুলো ইয়া বড় বড় ফুটবলের মতন দেখাবে, তার ওপর রয়েছে কালার—মানে রং ধরার কায়দা, কালার ডিটেক্টার...। বল জালে না জড়িয়ে যাবে কোথায়! খেলার আইন-কানুনে চশমা পরা চলবে না—এমন লেখা নেই।...কাজেই বাইরের বাছাধনরা একেবারে উজবুক হয়ে গেল। আমাদের দলটা ওদের গো-হারান হারাল । পরের বছর থেকে আমাদের ওখানে আর কেউ খেলতেই আসত না।" মামা গলা ছেড়ে হাসতে লাগলেন।

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। কী বোকা আমরা, কত বুদ্ধু। এমন ওআন্ডার মামা যাদের সহায় তারা নিজেদের বোকামির জন্যে মণ্টুদাদের দলের কাছে গো-হারান হারবে! ছি ছি! হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল। কাল মামাকে ব্যাপারটা বললেই হত, মামা আমাদের এমন এক জোড়া গগ্‌লস্ করে দিতেন যা পরে মাঠে নেমে আমরা মণ্টুদাদের বল হাঁকড়ে হাঁকড়ে ছত্রখান করে দিতাম। প্রত্যেকেই এক একটা সেঞ্চুরি। প্রত্যেক বলেই হয় ছক্কা, না হয় চার।

নিজেদের বোকামির জন্যে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল।

মামা শেষে বললেন, "যাক গে, খেলা খেলা। জেতাও যা হারাও তাই। বড়দের কাছে হারবি তাতে লজ্জা কী!" বলে একটু থেমে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়লেন। "আমি থিয়োরি অফ ফ্রিকসান নিয়ে প্রফেসার কাদাখোঁচার কাছে হেরে গিয়েছিলুম। প্রফেসার কাদাখোঁচা হল টোকিও ইউনিভার্সিটির বিরাট লোক। মহাপণ্ডিত সারা জগৎ তাঁর নাম জানে, ফিজিস্ট—মানে ফিজিক্সের লোক। দেবতার মতন মানুষ। আমি হেরে যাবার পর যখন দেখা করতে গেলুম, আমায় জড়িয়ে ধরে কী কান্না! বললেন, তোমার সঙ্গে লড়ে আমার বড় আনন্দ হয়েছে।"

হারু বলল, "নামটা কী বিচ্ছিরি, কাদাখোঁচা!"

মামা বললেন, "না রে হাঁদা, নাম কাদাখোঁচা নয়; পুরো নাম হল কোয়াদাতসু খোচাদাই, ও আর জিবে উচ্চারণ হয় না, তাই ছোট করে আমি বলতুম কাদাখোঁচা।"

মাঠে তখন হইহই। কানু একটা ছক্কা মেরেছে।

ভেবে দেখলাম, আমরা হারব ঠিকই; কিন্তু এই হারায় লজ্জা পাবার মতন কিছু নেই। মণ্টুদারা শুধু আমাদের চেয়ে বড় নয়, তারা চোট্টা, তারা পাঁচ-পাঁচটা আউট দেয়নি, ঘুগনির সঙ্গে সিদ্ধি টিদ্ধি কিছু একটা মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছে পেট পুরে, এরপর যদি তারা জেতে তবে সেটা চোট্টার জেতা, চুরির জেতা, আমরা যাকে বলতাম, 'জ্যাক্লস্ উইন'। এই অদ্ভুত শব্দটা আমাদের ব্রজর তৈরি। ব্রজ একবার ক্লাসে 'ধূর্তের জয়'-এর ইংরেজি বলেছিল 'জ্যাক্লস্ উইন'। সেই থেকে আমাদের মুখে মুখে কথাটা চলে গিয়েছিল। অবশ্য ব্রজ ক্লাসে মাস্টারমশাইয়ের কাছে তার ইংরেজির জন্যে চার আনার চানাচুর উপহার পেয়েছিল। ইংরেজির স্যার সদাশয়বাবু এত হেসেছিলেন যে, অতটা হাসির জন্যে ব্রজকে চার আনার চানাচুর আনিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ব্রজ, তুই বিলেত যা, সাহেবদের ইংরিজি শিখিয়ে আয়।

এবার কানু আউট হল। আমার যাবার পালা।

মামা বললেন, "কিচ্ছু পরোয়া করবি না, বেড়াল পেটার মতন করে পিটবি। জেতাও যা, হারাও তাই।"

আমরা বেপরোয়া হয়ে মাঠে নামলাম। কানু আমাদের রান পঞ্চাশের ওপর তুলে দিয়েছে! আমরা আরও পঞ্চাশ তুলব। তারপর আছে অন্তু টন্তু।

খেলাটা দেখতে দেখতে জমে গেল। একবার ব্যাট চালাতে গিয়ে এত জোরে ব্যাট হাঁকড়ালাম যে, ব্যাটটা হাত থেকে ছিটকে গিয়ে পটলদার পায়ের গোড়ালিতে লাগল। পটলদা বসে পড়ল পায়ে হাত দিয়ে, তারপর কাতরাতে কাতরাতে মাঠ ছেড়ে চলে গেল।

আমি চল্লিশ পর্যন্ত গিয়েই ফক্কা। অন্তু পঞ্চাশের ওপরে চলে গেল।

খেলা যখন শেষ, তখন আমরা মাত্র সাত রানে পিছিয়ে। শেষ জুটি খেলছিল। সময় শেষ হয়ে গেছে। কাজে কাজেই ড্র। মণ্টুদারা আর কথা বলতে পারল না।

মামা আমাদের পিঠ চাপড়ে দিলেন, বললেন, "বা, বেশ হয়েছে। সাহসে সব হয়। ভেরি গ্ল্যাড..., ব্রজ বেটা একেবারে হনুমানের মতো লাফ মেরে মেরে খেলছিল।"

ওআন্ডার মামা না থাকলে সেদিন আমরা নির্ঘাত হারতাম। মামা আমাদের চশমা করে দেননি বটে, তবে খেলার মাঠে এসে সাহস জুগিয়ে খুব রক্ষে করেছিলেন। মামা আমাদের 'গুড লাক'।

মাঠ থেকে ফেরার সময় আমরা মামাকে সামনে নিয়ে ফিরলাম, যেন মামা আমাদের সত্যিকারের ক্যাপ্টেন।

দেখতে দেখতে মামার সঙ্গে আমাদের ভাবসাব হয়ে গেল। আমরা সবাই মামার ন্যাওটা হয়ে উঠলাম। আমাদের বেশির ভাগ সময় মামার কাছে, মামার সঙ্গেই কাটতে লাগল। সকালে একদফা মামার কাছে যাওয়া চাই-ই; বিকেলেও মামাকে সঙ্গে নিয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়াতাম। গুরুজন হয়েও মামা আমাদের বন্ধু হয়ে উঠলেন। জ্যাঠাইমা—অন্তুর মা—আমাদের বলতেন, 'চেলার দল', জ্যাঠামশাই

বলতেন, 'ক্ষুদে চেলা'। তা কথাটা ঠিকই; আমরা মামার চেলা হয়ে গিয়েছিলাম। মামার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে আমরা এটা-ওটা সব সময়েই খাচ্ছি; তিলকুট, রেউড়ি, সেউভাজা, টফি, মাখন-বিস্কুট। মামা আমাদের খাওয়াতেন। ঠিক এই লোভেই যে আমরা মামার চেলা হয়ে গিয়েছিলাম তা নয়, মামার ওপর আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়ছিল। অতবড় একজন মানুষকে আমরা দলে পেয়েছি, নিজেদের মধ্যে, এটা কি কম গর্বের! জার্মানিতে যাঁকে ঘরবাড়ি দিয়ে বরাবরের জন্যে রাখতে চেয়েছিল, রাশিয়ায় যাঁর জন্যে আট-আটটা ঘোড়া-টানা-গাড়ি বরাদ্দ ছিল, চিনে যাঁকে সম্মান জানানোর জন্যে তোপ দাগা হত, আর জাপান যাঁকে নিজের দেশের লোক বলেই মনে করত—সেই ওআন্ডার মামা কি আমাদের গর্বের জিনিস নয়! মামার কাছে আমরা বিদেশের অজস্র গল্প শুনতাম, নানা ধরনের গল্প। মামার কৃতিত্বের গল্পও শুনতাম—শুনে বুকটা ফুলে উঠত। আবার মামা মজার মজার গল্পও বলতেন, হেসে আমরা কুটোকুটি হতাম। মামার আবার অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন ছিল! যেমন, আমায় হয়তো জিজ্ঞেস করলেন, "নখ কাটলে আবার বাড়ে, নাক কাটলে বাড়ে না কেন?" আমি বোকা হয়ে কী বলব কী বলব ভাবছি, মামা দুম করে টুলুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা ধর, চাঁদের সেন্টার থেকে একটা কাল্পনিক সুতোর মুখে টেনিস বল বেঁধে ঝুলিয়ে দিলি, বলটা পৃথিবীর কোন জায়গায় থাকতে পারে?" এ-রকম অদ্ভুত প্রশ্নে যখন ভ্যাবাচাকা খেয়ে টুলু চাঁদের সেন্টার খুঁজছে মনে মনে, তখন মামা হয়তো অন্তুকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, "পৃথিবীতে তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল, এই হিসেবে মানুষের মাথায় কত ভাগ গোবর আর কত ভাগ পদার্থ?" এসব প্রশ্নের আমরা কোনও জবাব দিতে পারতাম না।

মামা হাসতেন। কখনও সখনও এক-আধটার জবাব বুঝিয়ে দিতেন।

মামার বয়েস হয়েছিল, প্রায় পঞ্চাশ টপ্পাশের ওপর। কিন্তু মামা একরত্তিও সময় নষ্ট করতেন না, কাজের মানুষ, সময়ের দাম বুঝতেন, কাজও বুঝতেন। অন্তুদের বাড়িতে—মানে নিজের বোনের বাড়িতে এসে ওঠার পর, একটা কি দুটো দিন মামা একটু জিরিয়ে নিয়েছিলেন। ওই সময়ের মধ্যেই তিনি কাগজ পেনসিল দিয়ে অন্তুদের বাড়ির গোটা ছক এবং বাগানের খোলা জায়গা-জমির নকশা করে ফেলেছিলেন। অন্তুর বাবা—আমাদের নৃপেন জ্যাঠামশাই রেলের বড় চাকরি করতেন। তাঁর বাড়িটা বেশ বড়ই ছিল, বাড়ির বাইরে অনেকটা খোলামেলা জায়গা ছিল, বাগান ছিল। মামা সেই ফাঁকা—মাঠ মতন জায়গায় তাঁর নকশা মতন এক তাঁবু বসালেন। পুঁচকে তাঁবু নয়, বেশ বড় তাঁবু। কুলি-মজুর তেমন একটা লাগল না, বাড়ির চাকর বাকর ছিল, আমরা সব ছিলাম। তাঁবুর মধ্যে কেমন সুন্দর গোটা তিনেক ঘর হয়ে গেল, জানলা হয়ে ঘেল। এসব কি আর আমাদের এখানে পাওয়া যায়, মামাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। জাপানি জিনিস। তাঁর সঙ্গে কেন যে অত বিচিত্র মালপত্র ছিল আমরা তা এখন বুঝতে পারলাম। তাঁবু খাটানো হয়ে যাবার পর সবচেয়ে বড় তাঁবু-ঘরে মামা হরেক রকমের জিনিসপত্র সাজাতে লাগলেন, কাঠের টেবিল, কেরাসিন কাঠের বাক্স, টুল—এই সবের ওপর মামা তাঁর অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রপাতি গুছিয়ে ফেলতে লাগলেন।

কোথাও একটা তালপাতার বাঁশির মতন সরু লম্বা ছোট দূরবীন, কোথাও কাচের ঘেরাটোপ বাক্সে পেনসিলের সিসের মতন দুটো কাঠি দুদিকে ঝোলানো, কোথাও পেট মোটা গলা-সরু বোতল, বোতলের মধ্যে নানান রঙের জল, একদিকে সাইকেলের প্যাডেলের মতন একটা দাঁত-বের করা যন্ত্র, তার সঙ্গে চেন, চেনের সঙ্গে আর একটা যন্ত্র বাঁধা, যন্ত্রের তলায় ছোট বড় চুম্বক। চিনেমাটির গোল গোল পাত্রে দস্তার পাত, তার মধ্যে অ্যাসিড। সারাটা ঘর মামা এই ভাবে তাঁর যন্ত্রপাতি সাজাতে লাগলেন। পরের ঘরটায় ওষুধপত্রের শিশি বোতল, রবারের পাইপ, স্টোভ, জলের কল—এইসব থাকল। তার পাশের ঘরটায় মামার বসবার ইজিচেয়ার, কাগজপত্র, বই, খাতা পেনসিল, চুরুটের বাক্স।

এদিকে এইসব সাজানো গোছানো হচ্ছে; অন্যদিকে মামা আমাদের সঙ্গে নিয়ে বিকেলে সারা শহর ঘুরে বেড়িয়ে সব দেখেশুনে নিচ্ছেন। মামা বলতেন, "দাঁড়া, আগে সব সার্ভে করে নিই।"

সার্ভে করা প্রায় শেষ হয়ে এলে মামা বললেন, "সাহেব পাড়াটা ওরা বেশ ফিটফাট করে রেখেছে, বুঝলি; ভেরি সেলফিস জাত ওরা। ইংরেজদের আমি এইজন্য দু-চোখে দেখতে পারি না। ইংল্যান্ডে আমি কখনও রাত কাটাইনি।"

ইংরেজদের ওপর আমাদেরও তেমন একটা ভক্তি ছিল না।

মামা বললেন, "আমি শুধু তোদের পাড়াটাতে—মানে এই এরিয়াটাতে আলো করব, আপ-টু বাজার। সাহেব পাড়াতে করব না। আমি স্বদেশি—" বলে মামা একটু থামলেন, কী ভেবে বললেন, "অবশ্য ওই ইংরেজদের একজন—ডবলু মারডক ১৮০২ সালে কয়লার গ্যাস দিয়ে বার্মিংহামের কাছে আলো জ্বালিয়েছিল। কিন্তু বুঝলি, ১৮০৭ সালে এক জার্মান, নাম উইন্সর—বিলেতেই প্রথম গ্যাসের আলো জ্বালায়।...তা যাকগে..."

আমরা খুব খুশি। এই শহরের এ দিকটাতে আলো হয়ে যাবে। সাহেবরা অবাক হয়ে ভাববে, কী ব্যাপার—ইন্ডিয়ানদের মহল্লায় আলো! আরে সাবাস, লালমুখোদের মুখের মতন জবাব হবে।

টুলু বলল, "মামা, আমাদের এই দিকটায় পুরো গ্যাস হতে ক'দিন লাগবে?"

মামা হাসলেন। "ক'দিন রে বেটা, ক'মাস লাগবে বল! লন্ডনের রাস্তায় আলো জ্বলতেই পাক্কা দশটি বচ্ছর লেগে গিয়েছিল। আর তোদের এখানে এখনও তো কাজই শুরু করলাম না। শুধু দেখলাম। যেখানে যা মানায় তাই করতে হবে তো, দেখতে হবে, যেখানে করছি সেখানে কী কী জিনিস সহজে পাওয়া যায়। তা তোদের এখানে দেদার জঙ্গল। গাছ, লতাপাতা, কাঠ এন্তার পাওয়া যাবে। কাজেই আমার প্রথম নজর থাকবে ওই দিকে। তারপর নজর দেব গোরুর ওপর, গোরু মোষ ছাগল...?"

আমরা হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। গোরু ছাগল? গোরু ছাগল কী হবে?

ব্রজ ফট করে বলে বসল, "গো-মাতা! গাই-ছাগল গ্যাস হবে?" গোরুর গ্যাস হবে শুনে ভীষণ ভড়কে গেছে ব্রজ।

মামা আদর করে ব্রজর টিকি ধরে টান মেরে দিলেন। বললেন, "তুই বেটা ছাগল।...না রে, গোরুর গ্যাস হবে না। আমাদের দরকার গোবর। গোরু মোষ ছাগলে কতটা গোবর টোবর দেয় এখানে রোজ, তার একটা হিসেব করতে হবে। স্বদেশি গ্যাস, চিপ গ্যাস গোবর থেকে নিতে হবে বইকী!"

৩

বড়দিনের ছুটি ফুরিয়ে নতুন বছর পড়ে গিয়েছিল। আমাদের স্কুলও খুলে গেছে। ক্লাসে ওঠা-উঠির পালা আগেই চুকেছিল, স্কুল খুললে নতুন ক্লাস, নতুন বই, খাতাপত্র তৈরি—এসব নিয়ে আমরা মত্ত হয়ে উঠলাম। লেখাপড়া তখন শুরু হয়নি; সরস্বতী পুজোর আগে কারই বা বইপত্র ছুঁতে ইচ্ছে করে। স্কুলটাও ঠিক বসত না, বসার নাম করে শুধু ঘণ্টাটা বেজে যেত। এই সময়টায়, শীতের ওই মরসুমে নানান অনুষ্ঠান ছিল স্কুলের: স্পোর্টস, প্রাইজ, স্কাউটদের ক্যাম্প, সরস্বতী পুজোর তোড়জোড়—কত কী! আমরা এইসব নিয়েই মেতে ছিলাম।

স্কুল নিয়ে যতই কেন না মেতে থাকি, বাড়ি ফিরে সবাই ওআন্ডার মামার কাছে ছুটতাম। মামা ছাড়া আমাদের দিন কাটত না।

মামার কথা স্কুলে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। আমরাই করেছিলাম। পাঁচ মুখে কথা ছড়ালে যা হয়, সবাই নিজের মতন করে একটু একটু বানিয়ে নেয়, আমাদের পাঁচ মুখের বানানো কথায় ওআন্ডার মামা আরও ওআন্ডারফুল হয়ে গিয়েছিলেন।

অন্তুর নিজের মামা, কাজেই অন্তু সবার চেয়ে বেশি বেশি বলত; আর বলত, ব্রজ। ব্রজটা বরাবরের হাঁদা, দুমদাম কথা বলতে তার জুড়ি ছিল না। ব্রজই বলেছিল, মামা আর নিউটন একই, গত জন্মে মামা নিউটন হয়ে বিলেতে জন্মেছিলেন। এ জন্মে ইন্ডিয়ায়।

মামার গল্প শুনে আমাদের অন্য বন্ধুরা বড় বড় চোখ করে চেয়ে থাকত, মুখ থেকে কথা সরত না। ওরা বেপাড়ার ছেলে, কেউ কেউ 'মুনলাইট' বাসে চেপে স্কুলে আসত। তারা মামাকে দেখেনি। এক একদিন দল বেঁধে তারা মামাকে দেখতে আসত। মামার কাছে সকলেরই আদর, আমাদের বন্ধুরা এলে মামা তাদের মাথার চেহারা দেখতেন, কাউকে বলতেন, 'জিব বের কর'; কাউকে হামাগুড়ি দিতে বলতেন, কারও নাক টিপে দিতেন, তারপর প্রত্যেকের এক একটা আজব নাম দিতেন। সে নামের ঠিক-ঠিকানা ছিল না, কারও কোনও জন্তুর নামে নাম হত, কারও বা নাম হত গ্রহ-উপগ্রহের নামে, কারও বা অন্য কিছু। যারা আসত, মামা তাদের হাতে কানা সাহেবের দোকানের নোনতা বিস্কুট চকোলেট টকোলেট তুলে দিতেন। হাতে হাতে নগদ পেলে কারই বা একটা শখের নামে আপত্তি থাকে। মামা যে নাম দিন সবাই বেশ খুশি হত।

দু-চারজন অবশ্য ছিল যারা আমাদের বন্ধু নয়; শত্রু; তারা স্কুলে আমাদের নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করত আড়ালে, টিপ্পনী কাটত। আমরা কিছু বলতাম না, বাড়াবাড়ি

করলে দেখে নেব—এই রকম ভেবে রেখেছিলাম।

পৌষ মাস যাই যাই করছে, মাঘ মাস সামনে, বাঘের শীত পড়ল আমাদের শহরে। কী যে ঠাণ্ডা! যেন শীতের ছুঁচ একেবারে হাড়ে ফুটছে সর্বক্ষণ। সবাই বলছিল, বছর কয়েকের মধ্যে এমন শীত আর পড়েনি।

ওই শীতের মধ্যে মামা একদিন বললেন, "আজ সন্ধেবেলায় সবাই আসবি; আমার নকশাটা মোটামুটি হয়ে গেছে।"

নকশাটা যে গ্যাসের ব্যাপার নিয়ে তা আমরা জানতাম। মামার অনেক কাজ—, দিনের মধ্যে বারো-চোদ্দো ঘণ্টা তিনি তাঁর তাঁবুতেই কাটান। বিচিত্র বেঢপ কত কী নতুন যন্ত্রটন্ত্রও তিনি বসিয়ে ফেলেছেন আরও। তাঁর গবেষণা আমরা বুঝতাম না; কিন্তু চোখের সামনে দেখতাম, কোথাও স্পিরিট ল্যাম্পের ওপর একটা কাচের পাত্রে নীল জল ফুটছে, আঁকানো-বাঁকানো নল দিয়ে কী একটা খয়েরি রঙের জিনিস টুপ টুপ করে নীল জলে এসে পড়ছে; কোথাও দেখতাম একটা দেয়াল ঘড়ির মতন যন্ত্র চিত হয়ে পড়ে আছে, তার কাঁটা নড়ছে না; কোথাও একটা দূরবীন তাঁবুর ছেঁদা দিয়ে আকাশমুখো হয়ে রয়েছে। ওরই মধ্যে মামা হাঁটছেন ফিরছেন, এক একবার এটা ওটা নেড়ে দেখছেন, তারপর নিজের জায়গায় এসে ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে বসে কাগজ পেনসিল নিয়ে আঁকজোক, লেখালেখি করছেন। দিস্তে দিস্তে সাদা কাগজ শুধু মামার অঙ্ক আর আঁকজোকে চিত্র-বিচিত্র হয়ে থাকত। তাঁর চোখের চশমাটা নাকে ঝুলে পড়ছে, মুখে চুরুট, মামা একমনে কাগজ পেনসিল নিয়ে লিখছেন আর লিখছেন—এ দৃশ্য আমরা প্রায়ই দেখতাম। দেখে কত ভক্তি হত, কত ভাল লাগত।

অত কাজের মধ্যেও যে মামার মাথায় গ্যাসের চিন্তাটা রয়েছে এ আমরা জানতাম। মামাও বলতেন।

নকশার কথা শুনে আমরা মহানন্দে নেচে উঠলাম।

কানু বলল, "কিন্তু সন্ধেবেলা যা ঠাণ্ডা পড়বে, হাত-পা বরফ হয়ে যাবে!"

মামা বললেন, "কিছুই হবে না। তোদের গরম করে দেব।...মাফলার টাফলার, বাঁদুরে টুপি যার যা আছে নিয়ে আসিস সব। আর পায়ে মোজা পরে আসবি।"

উরে ব্বাস—সেদিন বিকেল থেকেই কী ঠাণ্ডাটাই পড়ল। আর দেখতে না দেখতে শীতের অন্ধকার এসে একেবারে সন্ধে করে ছাড়ল। কনকনে বাতাস। গরম জামার মধ্যে আমরা কেঁপে উঠছি। তবু একে একে সবাই মামার তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলাম বিকেলের পর, সন্ধের আগেভাগেই। মামা মস্ত একটা অলেস্টার গায়ে চাপিয়েছেন, পায়ে গরম মোজা, মাথায় একটা গরম টুপি। আমরা যেতেই মামা বললেন, "বসে পড় সব।"

বাড়ির ভেতর থেকে হোক কিংবা চাকর বাকরদের ঘর থেকে হোক, একটা ছোট মতন তক্তপোশ আনিয়ে রেখেছিলেন মামা। তক্তপোশের ওপরে মোটা গদি করে কার্পেট পাতা, তার ওপর মস্ত সুজনি। একপাশে একটা মোটা কম্বল পড়ে ছিল। আলো জ্বলছে। আমরা হাত-পা গুটিয়ে তক্তপোশের ওপর বসলাম। মামা বললেন, "শীত করলে পায়ের ওপর র‍্যাগ টেনে নিবি।"

আমরা জড়সড় হয়ে গোল চক্কর করে বসলাম সবাই। বসার পরে মনে হল, তাঁবুর মধ্যে বসে আছি, সন্ধে হয়ে গেল তবু এখানে সেরকম একটা ঠাণ্ডা তো লাগছে না। কী জানি কেন, হয়তো গায়ে গায়ে হয়ে সবাই বসে আছি বলেই। মামা বললেন, "বোস তোরা, কাজের কথা পরে হবে, আগে একটু করে চিচিকারি খেয়ে নে।"

চিচিকারি কী আমরা বুঝলাম না; হাঁ করে মামার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

মামা একটু অন্যমনস্ক, বার বার তাঁবুর দরজার দিকে তাকাচ্ছেন। তারপর অন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কই রে, ডলিটা করছে কী?"

অন্তু বলল, "বলল তো নিয়ে আসছে।"

আমরা ভাবলাম চিচিকারিটা বাড়িতে তৈরি হচ্ছে, ডলি নিয়ে আসবে।

কানু বলল, "মামা, চিচিকারি কী?"

মামা তাঁবুর দরজার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললেন, "জানিস না?"

"কারি জানি", কানু বলল, "ঝোলের নাম কারি। মটন কারি।"

জবাবে মামা বললেন, "এ ঝোল ঝাল বা অম্বল নয়, মোহন হালুয়া টালুয়া নয়, খেয়ে দেখ আগে তবে বুঝবি।"

ডলি আসছে না দেখে মামা ব্যস্ত হয়ে উঠে তাঁর ডাক-ঘন্টিটা বাজাতে লাগলেন। একেবারে হালফিল মামা এই ঘন্টিটা তাঁবুর বাইরে লাগিয়েছেন। মন্দিরে টন্দিরে কিংবা বারোয়ারি পুজোয় যে-রকম ঘন্টা বাজানো হয় আরতির সময়—সেই রকম এক ঘন্টি মোটামুটি—বেশ বড় সাইজের—ঘন্টিটা বাইরে একটা খুঁটির গায়ে ঝুলোনো, একটা সরু দড়ি দিয়ে ঘন্টির ভেতরের দোলকটা বাঁধা। আর সেই দড়িটা তাঁবুর মধ্যে মামার চেয়ারের হাতলের কাছ পর্যন্ত এসেছে। মামা সেই দড়ি ধরে টানলে ঘন্টিটা বাজে। অবশ্য খুব জোরে নয়।

মামার ঘন্টিতে কাজ হল। একটু পরেই ডলিদি এসে হাজির, হাতে কাঠের একটা বড় ট্রে। ট্রের ওপর একপাশে কাচের বড় বড় দুটো ডিশে শিঙাড়া; অন্যপাশে সাত-আটটা খালি কাপ। শিঙাড়া তো চোখে দেখেই চেনা যায়, তবে মামার চিচিকারি কোনটা?

মামা ডলিদিকে ট্রে-টা নামিয়ে রাখতে বলে শিঙাড়ার দিকে তাকালেন, "ভেজে আনলি?"

ডলিদি বলল, "মা ভেজে দিল।...তোমায় আলাদা করে দিই।"

"না না, ওখানেই থাক, আমি একটা নেবখন।" বলে মামা আমাদের দিকে তাকালেন, "নে নে, তোরা জগন্নাথ হয়ে বসে আছিস কেন? হাত মুখ চালা।"

আমরা হাত মুখ চালাবার জন্যে তৈরি হয়ে বসেছিলাম। শিঙাড়ার ডিশগুলো ব্রজ আর হারু টেনে নিল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আট-দশখানা হাত ঝাঁপিয়ে পড়ল। উস, কী গরম! আঙুলে ধরতে পারি না, জিব ঠোঁট পুড়ে গেল। তা যাক পুড়ে, ফুলকপির অমন শিঙাড়া কে ছাড়ে!

মামা দেখি ফাঁকা কাপগুলো নিয়ে পাশের তাঁবু-ঘরে চলে গেলেন।

ডলিদি হেসে বলল, "তোদের কোন পরব হচ্ছে রে?"

একটা দেওয়াল ঘড়ির মতন যন্ত্র চিত হয়ে প'ড়ে আছে

"কেন, কেন?" শিঙাড়ায় ফুঁ দিতে দিতে আমি বললাম।

"মামার মাথাটা আরও খারাপ করে ছাড়বি।"

"কী যে বলে ডলিদি", কানু বলল, "মামার মাথা অত সস্তা কিনা!"

ডলিদি হাসল, কিছু বলল না।

"ডলিদি, চিচিকারি কী খাবার?"

"চিচিকারি—!" ডলিদি জীবনে এমন নাম শোনেনি খাবারের, বোকার মতন তাকিয়ে বলল, " চিচিকারি! সেটা আবার কী? কোথায় খেলি?"

"খাইনি; খাব। মামা খাওয়াবেন।" টুলু বলল।

ব্যাপারটা এতক্ষণে যেন জলের মতন বুঝে ফেলল ডলিদি; মুখ দেখে তাই মনে হল। বুঝে ফেলেও কেন যেন মুখে একটা চাপা হাসি লেগে থাকল ডলিদির। বলল, "ও, তাই বুঝি কাপের তাগাদা।...তা বসে বসে তোরা চিচিকারি খা, আমি যাই। যা শীত!"

মামা আসার আগেই ডলিদি চলে গেল। ওপাশের তাঁবু-ঘরে মামা যে আমাদের জন্যে চিচিকারি তৈরি করছেন আমরা তা বুঝতে পেরেছিলাম। খাদ্যটা কী রকম হবে, চা কোকো না পায়েসের মতন, তা অবশ্য বুঝতে পারলাম না।

একটু পরেই মামা এলেন। মামার হাতে চিচিকারির কাপ।

একে একে মামা মাথা গুনে প্রত্যেকের জন্যে প্রায় পুরো কাপ চিচিকারি এনে নিজের জায়গায় বসলেন।

"নে—গরম গরম খেয়ে নে, জুড়িয়ে গেলে টেস্ট নষ্ট হয়ে যাবে।" মামা হাত বাড়িয়ে পাশের একটা টুলের ওপর থেকে এক দিস্তে কাগজ উঠিয়ে নিলেন।

চিচিকারি জিনিসটা দেখতে অনেকটা তেঁতুল গোলা গুপচুপ (ফুচকা)-এর জলের মতন দেখাচ্ছিল। বেশ গরম, যেন ধোঁয়া উঠছে এখনও।

কোলের ওপর দিস্তে খানেক কাগজ রেখে, পাশের ছোট বেতের টেবিল থেকে মামা একটা গোল মতন পাকানো হাত খানেক লম্বা কাগজ তুলে নিলেন। বললেন, "আমার গ্যাস তৈরির পুরো ছক এর মধ্যে আছে, বুঝলি। এই স্কিমের তিনটে পার্ট। একেবারে ডাল-ভাতের মতন সহজ করে করেছি, জটিল করলে সব গোলমাল হয়ে যাবে, তোদের এখানে জটিল জিনিস কেউ বুঝবে না।...কই, খা খেয়ে নে; শরীর গরম হয়ে যাবে।"

চিচিকারির রং দেখে আমাদের একটু কিন্তু কিন্তু হচ্ছিল বোধ হয়, কেউ আগ বাড়িয়ে কাপটা মুখে তুলছিলাম না; অপেক্ষা করছিলাম, কেউ একজন মুখে তুলুক আগে, তারপর তার মুখের চেহারা দেখে আমরাও মুখে তুলব।

ব্রজই আগে কাপ মুখে তুলে লম্বা চুমুক।

তার মুখের চেহারাটা আমরা লক্ষ করলাম। গরমের জন্যে জিবটা বোধ হয় একটু পুড়েছিল। নাক মুখ কুঁচকে তুললেও বমির কোনও ভাব করল না ব্রজ। তারপর আমাদের দিকে তাকাল, গলা পরিষ্কার করার জন্যে কাশল বার দুই। বলল, "ঝাঁঝ!"

আমরাও একে একে কাপ মুখে তুললাম।

চিচিকারির রং দেখে আমাদের একটু কিন্তু-কিন্তু হচ্ছিল...

জিনিসটা সুস্বাদু নয়, আবার একেবারে বিস্বাদও নয়। আমার কেমন গলার কাছটা জ্বালা জ্বালা করতে লাগল।

মামা ততক্ষণে গোল মতন কাগজটা খুলে আমাদের দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। মস্ত একটা সাদা কাগজ, গোটা দুয়েক কাগজ জুড়ে নকশাটা হয়েছে। নকশার মধ্যে লাল নীল পেনসিলের অজস্র দাগ আর ফুটকি। মামা বললেন, "এই নকশা বোঝার আগে তোদের কতকগুলো গোড়ার জিনিস বুঝতে হবে। যেমন আমি আগেই বলেছি, আমার গ্যাস স্কিমের তিনটে পার্ট—এ বি সি। 'এ' পার্টটায় রয়েছে গ্যাস-মেটিরিয়াল, মানে কী কী জিনিস দিয়ে গ্যাস তৈরি করা হবে তার কথা। ও ব্যাপারে আমার যা বক্তব্য তা আমি এই কাগজে লিখেছি—" বলে মামা কোলের ওপর রাখা কাগজ দেখালেন।

কানু বলল, "মামা, চিচিকারিতে আদার রস আছে, না?"

মামা কথাটা কানে তুললেন না, গ্যাস-পরিকল্পনা বোঝাতে লাগলেন। "আমি আগেই বলেছি, লোক্যাল আর চিপ মেটিরিয়াল দিয়ে এখানে গ্যাস প্রোডাকশন করতে হবে। তার মানে হল, এখানে খুব সহজে যা পাওয়া যাচ্ছে তাই দিয়ে গ্যাস করতে হবে। এখানে আমরা পাচ্ছি গাছপালা আর গোবর। এই দুটো জিনিস হবে আমাদের গ্যাস প্রোডাকশনের মেটিরিয়াল।"

হারু বলল, "মামা, চিচিকারিতে পেঁয়াজ আছে?"

চোখ তুলে তাকালেন মামা। "কেন?"

"পেঁয়াজ পেঁয়াজ গন্ধ ছাড়ছে।"

"ছাড়ুক। খেয়ে নে।" মামা সোজা জবাব দিলেন। তারপর বললেন, "আমি একটা হিসেব করেছি মোটামুটি। তাতে দেখছি, গ্যাসের জন্যে রোজ মণ পঞ্চাশেক মেটিরিয়াল দরকার।"

"পঞ্চাশ মণ?"

"পঞ্চাশ মণ কিছু না। পঞ্চাশ মণে শুধু রাস্তার বাতি হবে, সন্ধে ছ'টা থেকে দশটা পর্যন্ত জ্বলবে। শুক্লপক্ষে জ্যোৎস্নার সময় বাতি জ্বালাবার দরকার তেমন নেই।

"পঞ্চাশ মণে ক'টা বাতি জ্বলবে, মামা?" ব্রজ জিজ্ঞেস করল।

"তিরিশ-চল্লিশটা," মামা বললেন, "দু'-পাঁচটা কম বেশি হতে পারে।...যাক, এ-সব পরের কথা! পঞ্চাশ মণ মেটিরিয়ালের মধ্যে কাঠকুটো গাছপাতা দিয়ে মণ পঁয়ত্রিশ করতে হবে, বাকি পঁচিশ মণ গোরু মোষের গোবর দরকার। তোদের এখানে গোরু মোষ কত?"

প্রশ্নটা বড় বেয়াড়া। এই শহরের অনেক কিছুর খোঁজ-খবর আমরা রাখি, কিন্তু কে আর গোরু মোষের খবর রাখতে গেছে! আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

মামা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, "কাল থেকে গোরু মোষ গুনতে লেগে যা সব। একটা হিসেব দরকার।"

ব্রজ বলল, "শ-দেড়শো গোমাতা আছে।"

মামা হেসে বললেন, "তুই বেটাও আছিস, ছাগল। আচ্ছা তা হলে, স্কিমের যেটা

পার্ট 'এ'—সেটার তোরা আইডিয়া পেলি। পার্ট 'বি' হল—গ্যাস তৈরির প্রসেস, মানে কী ভাবে জিনিসটা তৈরি করা হবে। সেটার নকশা আমি করে রেখেছি। ওটা যন্ত্র টন্তর ব্যাপার, নানা রকম খুঁটিনাটি আছে—পরে তোদের বোঝাতে হবে। স্কিমের পার্ট 'সি' হল—এই নকশা—যা তোরা দেখছিস, এটা হল গিয়ে, গ্যাসটা কী ভাবে কোথা দিয়ে আসবে, কোথায় কোথায় আমাদের লাইটপোস্ট হবে তারই একটা নকশা।" বলে মামা নকশাটা আরও ছড়িয়ে দিলেন, চার কোণ থেকে আমরা চারজন চেপে ধরলাম কাগজটা, মামা আরও ঝুঁকে পড়লেন। বাতিটাও এগিয়ে দেওয়া হল।

মামা বললেন, "দেখতে [illegible]চ্ছিস সকলে?"

সমস্বরে 'হ্যাঁ' বললাম। দেখলাম, কিন্তু কিছু বুঝতে পারছিলাম না। ম্যাপে যেমন রেলপথ জলপথ দেখানো দাগ থাকে অনেকটা সেই রকম দাগ। কিন্তু অজস্র আঁকবাঁক, অগুনতি ফুটকি—লাল নীল, কোথাও কোথাও তারকা চিহ্ন। এ একটা ধাঁধা; মাকড়সার জাল নয় যদিও, তবু সেইরকম জটিল।

মামা একটা লম্বা মতন কাঠি নিয়ে আমাদের নকশা বোঝাতে লাগলেন। বললেন, "ব্যাপারটা কিছু নয়, খুবই ইজি। তোদের সেই অত দূরের জলটাঁকি থেকে যেমন [illegible]আসে পাইপ দিয়ে, সেই রকম মাটির তলা দিয়ে আসবে আমাদের গ্যাস পাইপ। এই [illegible]নায় দ্যাখ—কী দেখছিস?"

"জলের ড্রাম," ক[illegible]ল।

"ড্রাম নয়, ওটা আমি [illegible] ভাবেই এঁকে রেখেছি, ওটা হল গ্যাস রিজার্ভার, ওখান থেকে আমাদের গ্যাস আসবে।"

"ওটা কোথায় হবে মামা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তোদের পলাশতলার মাঠে। ওটাই কাছাকাছি ফাঁকা জায়গা।"

"গ্যাসটাঁকি হবে?" ব্রজ বলল।

মামা মাথা নাড়লেন; তারপর ম্যাপ দেখাবার মতন করে লম্বা কাঠিটা নীল দাগের ওপর বুলোতে বুলোতে এগিয়ে চললেন।

"গ্যাস পাইপ আসবে এইসব জায়গা দিয়ে। রুটটা দেখে রাখ, সোজাসুজি আনিনি, আনলে সুবিধে না হয়ে অসুবিধে হত।"

"কেন?"

"সোজা পথে মানুষজন হাঁটে, গোরু মোষের গাড়ি যায়, টমটম ছোটে। একটু ঘুরিয়ে এনেছি, মাটি সেখানে শক্ত। তা ছাড়া তোরা তো আর লোহা টোহার পাইপ দিচ্ছিস না, দিচ্ছিস মাটির পাইপ। ওপরের চাপে পাইপ ফেটে যেতে পারে।"

মাটির পাইপ আমরা কস্মিনকালেও দেখিনি, বললাম, "মামা, মাটির পাইপ কী করে হবে?"

"কেন?"

"কে করবে?"

"কুমোর, মাটির চওড়া চওড়া চাকা দিয়ে কুয়ো বাঁধায় দেখিসনি? এখানে ওসব অবশ্য দেখতে পাবি না। আমাদের বেঙ্গলে পাবি। সেই রকম গোল গোল চাকা জুড়ে

পাইপ লাইন তৈরি হবে।”

জিনিসটা যেন না বুঝেও আমরা বুঝে ফেললাম। বিজন বলল, “দি গ্র্যান্ড।”

মামা কাঠি চালাতে চালাতে বললেন, “এই যে সব স্টার চিহ্ন দেখছিস—এইখানে লাইট পোস্ট বসানো হবে শাল কাঠের। পাইপ লাইন থেকে রবারের নল দিয়ে আমরা পোস্টে কানেকশন নিতে পারি। রবারের নলের খরচ কম।”

ব্রজ বলল, “মামা, রবারের নল গোরু ছাগলে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে!”

মামা বললেন, “সে-সব আমি ভেবেছি। গোরু ছাগলকে বিশ্বাস নেই। আমি ঠিক করেছি, ফুট পাঁচেক পাইপ কাঠের ভেতর দিয়ে আনব, কাঠের মধ্যে গর্ত করে। বাকিটা গায়ে জড়িয়ে দেব। দেখতে বেশ লাগবে।”

“লতার মতন, না?” অন্তু বলল, “ডিসেন্ট হবে।”

ব্রজ বলল, “মামা, রেল স্টেশনের লোকো ঘরের দিকে গাড়ির সেই পাইপ পড়ে থাকে।”

“কোন পাইপ?”

“ওই যে কামরার পিছুতে থাকে, আগেও থাকে। মোটা মোটা, কালো মতন। কামরার পাইপে পাইপে জুড়ে দেয়। ভ্যাকম পাইপ। ওটা খুব শক্ত।” ব্রজ হাত নেড়ে নেড়ে বোঝাল।

মামা বললেন, “রেলের জিনিস তোদের দেবে কেন!...যাকগে, সে পরে দেখা যাবে। এখন এই হল অবস্থা। আমি আরও ভেবেচিন্তে সব ফাইন্যাল করি। তোরা আমায় গোরু ছাগলের হিসেবটা এনে দে।”

বিজন খুব বিজ্ঞের মতন বলল, “মামা, গড়গড়ার নল দিয়ে পাইপ হবে না! দেখতে খুব বিউটিফুল।”

মামা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন, “না, গড়গড়ার নল বাবুগিরির জন্যে —ওতে কোনও কাজ হয় না।...তোরা আমায় গোরু মোষের হিসেব এনে দে—ওটা জরুরি।”

হিসেবটা আনা কষ্টকর, তবু মামা যখন বলছেন, তখন আনতেই হবে। আমরা মাথা নাড়লাম। সভা ভাঙার সময় হল, রাতও হয়ে আসছে।

চিচিকারির কথাটা এবার আমিই জিজ্ঞেস করলাম, “মামা, চিচিকারি কী?”

“কেমন খেলি আগে তাই বল।”

“মিষ্টি আছে, তবে খুব ঝাঁঝ—গলা জ্বালা করছে।”

মামা হেসে হেসে বললেন, “জিনিসটা খুব হাইজিনিক। জাপানে থাকতে সারারাত বরফ চাপা পড়া এক ঘোড়াকে এই খাইয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম। অবশ্য ঘোড়ার ডোজ খাইয়ে। আমার এক জাপানি বন্ধুর কাছে প্রথমে জিনিসটার নাম শুনি, তারপর এক্সপেরিমেন্ট করে তৈরি করি।...জাপানি এক রকম মুলো আর জাপানি মরিচ—এই হল তোর আসল জিনিস, তার সঙ্গে আছে আমাদের শুকনো তুলসীপাতা, আদা পেঁয়াজের রস, মিছরি।...খুব ভাল জিনিস। টনিকের মতন কাজ করে।”

এবার আমরা উঠে পড়লাম। এই ঠাণ্ডায় বাড়ি ফিরতে হবে ভেবে দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল। চিচিকারিটা ভালভাবে খাইনি, খেলে এমনটা হত না।

বিজন বলল, "মামা, এখানে বেশ গরম ছিল।"

মামা হাত দিয়ে তক্তপোশের তলা দেখালেন। কানু তক্তপোশে ঝুলে পড়া সুজনি ওঠাল। দেখলাম, তক্তপোশের তলায় কাঠকয়লার বড় বড় তিনটে কড়ার আগুন প্রায় নিবে এসেছে।

৪

দেখতে দেখতে মাঘের মাঝামাঝি হয়ে গেল। গোড়ায় গোড়ায় শীতটা যে ভাবে চেপে ধরেছিল, তাতে মনে হত আমাদের শহরটা না ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যায়। শহরটায় যে বরফ পড়ে তা নয়, তবে তেমন ঠাণ্ডা পড়লে বরফ পড়তেও তো পারে। ওআস্তার মামার কাছে আমরা বরফঢাকা শহরের গল্প শুনে, ছবি দেখে প্রায়ই এই মজার কথাটা ভাবতাম। মামা আমাদের রাশিয়ায় বরফ পড়ার গল্প শুনিয়েছিলেন অনেক, তার মধ্যে একটা মজার গল্প কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। মামা যখন রাশিয়ায় ছিলেন, সে প্রায় অনেক দিনের কথা, একবার শীতের গোড়াতেই হুট করে একদিন সকাল থেকে বরফ পড়তে শুরু করল। রাশিয়ার লোকে বরফে ভয় পায় না, গ্রাহ্যও করে না, বিলেতে যেমন বৃষ্টি, রাশিয়াতে তেমনি বরফ টরফ গা-সওয়া। পড়ছে বরফ পড়ুক; শীতে তো বরফ পড়বেই। কেউ আর গা করল না। তা, সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মতন সেই যে বরফ পড়া শুরু হল মামাদের শহরে, তা আর থামল না। দুপুর গেল, বিকেল হল—তখনও বরফ পড়ছে।

পড়ুক। সন্ধে থেকে বরফ পড়া বাড়ল; সারা রাত ধরে পড়েই চলল। পরের দিনও বিরাম নেই, রাস্তাঘাট সাদা হয়ে এসেছে, গাছপাতার অর্ধেকটাই সাদা, ঘরবাড়ির মাথায় সাদা তুলোর মতন বরফের রাশি। পড়ছে তো পড়ছেই, বরফ পড়ার আর শেষ নেই। দ্বিতীয় দিনেও একটানা বরফ পড়ে গেল । কী শীত আর ঠাণ্ডা তখন! পরের দিনও বরফ পড়ছে, আরও যেন জোর হয়েছে। এইভাবে তিন চার পাঁচ দিন কেটে গেল। মামাদের শহরে বরফ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, সাদায় সাদা সব, রাস্তা মাঠঘাট গাছপালা বাড়ি সব বরফে ঢেকে গেছে, মানুষজন পথে বেরোয় না, পশুপাখি সব পালিয়েছে, না হয় মরে গেছে। শেষপর্যন্ত এমন অবস্থা, ঠাণ্ডায় বাড়ি ফাটছে, জলের পাইপ ফাটছে, কারখানার চোঙা ফাটছে, বয়লারও ফাটছে, সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা, কোথাও কিছু না, তবু সর্বক্ষণ সমস্ত শহর জুড়ে কী এক তছনছ কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে। খালি ফাটছে, আর ফাটছে। মানুষজন ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে যত রাজ্যের গরম জিনিস গায়ে চাপিয়েও ঠকঠকিয়ে কাঁপছে ঠাণ্ডায় আর ভয়ে।

খাবার দাবার জমে গেছে, একটু জল মুখে দিতে হলে আগুন জ্বালিয়ে বরফ গলিয়ে নিতে হয়।...ছয় দিনের দিন একেবারে মর মর অবস্থা; কেউ আর স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস নিতে পারছে না, বাতাসটাই যেন বরফ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। ওদিকে আবার আবহাওয়া অফিস থেকে খবর ছড়িয়ে পড়ল, আজ রাত থেকে বাতাস জমে বরফ হয়ে যেতে পারে।...খবরটা কেমন করে ছড়াল সেটাই আশ্চর্য। টেলিফোন

অচল, মানুষজন পথে বেরোচ্ছে না, একা যা ভরসা রেডিয়ো তাই বা ক'টা আস্ত আছে শহরে, বড় জোর পনেরো বিশটা।...যাই হোক, খবরটা মামাদের কানে পৌঁছতেই সবাই পাগলের মতন কাণ্ড করতে লাগল; কী-হবে? কেমন করে নিশ্বাস নেব? হায় ভগবান, শেষ পর্যন্ত বাতাসের অভাবে মরব? ইঁদুর বেড়ালের মতন মরতে হবে? মামাকে কনফারেন্সে ডাকা হল, বাড়ির মধ্যে কনফারেন্স। অক্সিজেন অক্সিজেন রব উঠেছে চারপাশে। কোথায় অক্সিজেন, কে দেবে? কোথায় পাওয়া যাবে অত অক্সিজেন?...মামা ভেবেচিন্তে একটা বুদ্ধি বের করলেন, বললেন—আমাদের ইন্ডিয়ান স্টাইলে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। গোরুগোয়াশোভ নামে এক ডাক্তার বলল, সেটা কী? তোমাদের ইন্ডিয়া তো গরমের জায়গা, তার আবার ঠাণ্ডাদেশ সম্পর্কে ধারণা কী?...মামা বললেন, আমরা গরম দেশের লোক বলেই গরমের ব্যাপারটা ভাল বুঝি। আমার মত হল, বাড়ির মধ্যে মস্ত এক ধুনি জ্বালো—ধুনি নিভলে চলবে না। ধুনির চারপাশে আমরা বসব আর বসে অনবরত নাকে সরষের তেল টানব।...গুরুগোয়াশোভ বলল, সরষের তেল? সেটা কী জিনিস? মামাও অবশ্য বুঝলেন যে, সরষে জিনিসটা ওরা বুঝবে না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল অলিভ অয়েলের সঙ্গে স্মেলিং সল্টের গুঁড়ো মিশিয়ে নাকে টানতে হবে।...হলও তাই। খবরটা যথাসাধ্য ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হল। খুব রক্ষে, পরের দিন বরফ পড়া বন্ধ হল, রোদ উঠল আর দুপুর থেকে বরফ গলতে শুরু হল। ওই অত বরফ যখন গলতে লাগল—তখন আবার বন্যার অবস্থা। সারা শহরটা যেন গলা ডুবিয়ে জলে ভাসছে। তিন দিনের দিন সেই জল নামল শহর থেকে। জল সরে গেলে মনে হল, গোটা শহরটাই যেন আর একবার নতুন করে জন্মাল।

এই গল্পটা মামার মুখে সবিস্তারে শুনতে শুনতে আমরা যত অবাক হয়েছি তত হেসেছি। কিন্তু সেই থেকে মাথায় ওই এক অদ্ভুত চিন্তা ঢুকে গিয়েছিল। যদি সত্যিই এরকম হয়—হঠাৎ এই শহরে বরফ পড়তে শুরু করে, দিনের পর দিন, তবে? কী হবে তবে? কেমন হবে?

মামার মাথায় এইসব বিচিত্র ভাবনা আসত বোধ হয়। আমাদের আচমকা ওই রকম কিছু একটা বলতেন, তারপর আমাদের ঘুমটুম যেত, আমরা অসম্ভব সব কথা ভাবতাম।

এসব কি হয় নাকি? মাথার ওপরকার চাঁদটা একদিন ভেঙে পাঁচ কি সাতখানা হয়ে গেল, হয়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল, এ কি ভাবা যায়? তবু মামা ওই ভাবনাটা ধরিয়ে দিলেন হয়তো। হয়তো হুট করে একদিন বললেন, আচ্ছা ধর, হাজার তিনেক বছর ধরে ছুটতে ছুটতে একটা তারার আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছল, সেই তারাটা কত দূরে আছে? অঙ্ক করে হিসেব কর—।...এসব হিসেব করতে বসলেই আমাদের মাথায় তারা টারা একাকার হয়ে যেত। সন্ধেবেলায় আকাশে তারা ফুটলে দেখতাম আর ভাবতাম। শেষে অত তারা, অত বড় আকাশ দেখতে দেখতে ভয় ধরে যেত। মামা বলতেন, দেখ রে নেফুর দল, (ভাগ্নের দলকে মামা রগড় করে নেফুর দল বলতেন) এই জগৎটা এমনিতে সাদামাটা, একবার যদি ভাবতে বসিস আর কোনও

কূল-কিনারা পাবি না। তা বলে কি ভাববি না? ভাববি। যত ভাববি, তত হাবুডুবু খাবি ততই ইমাজিনেশান খুলবে। হোক না আজগুবি ভাবনা, আজগুবিরও দাম আছে। ক'টা লোক ভাবতে পারে রে! দু'দশটা লোকই পারে। লিলিপুটের গল্প পড়িসনি? আহা, খাসা গল্প। ওটাও তো আজগুবি! জুলে ভার্নের লেখা পড়েছিস? সেও কি কম আজগুবি নাকি? রামায়ণ মহাভারতে কী পড়েছিস? হনুমান লাফ মেরে সাগর পেরোচ্ছে, ভগীরথ গঙ্গা আনছে—এও তো আজগুবি। কিন্তু তাতে কী! আজগুবিও সুন্দর। মামার এইসব কথাবার্তা আমাদের বড় ভাল লাগত। কী বুঝতাম, কতটা বুঝতাম জানি না, কিন্তু মনে হত মামা যা বলছেন তা সত্যি।

মাঘের মাঝামাঝি থেকে শীতটা বেশ পড়ে আসতে লাগল। আর ক'টা দিন পরেই সরস্বতী পুজো। স্কুলের পুজোয় আমরা ছিলাম সবাই কিন্তু দেখাশুনা করত মোহিনীবাবু আর পণ্ডিতমশাই, আমাদের কোনও কর্তৃত্ব ছিল না।

পাড়ায় আমাদের নিজেদের ক্লাব, কানু যার সেক্রেটারি, ম্যানেজার থেকে আরম্ভ করে হেড পিয়ন একাই সব ছিল—সেই ক্লাবের সরস্বতী পুজোই ছিল আমাদের নিজেদের। আমরা সেখানে সবাই যেন কর্তা। তা ছাড়া পুজোটা বরাবরই করছি, না করলে 'ফেল' হব এরকম একটা ভয়-ভাবনা তো থাকবেই। আমরা তাই নিজেদের ক্লাবের পুজো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। চাঁদার খাতা হাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরছি; বাজারে মুদির দোকান থেকে মটর-কড়াইয়ের দোকান কোথাও আর চাঁদা চাইতে বাকি রাখছি না। মামাকে আমরা আমাদের প্রেসিডেন্ট করেছিলাম। এবারে মামা যখন আছেন তখন চাঁদা যাই জুটুক, পুজোটা যে জমকালো করে হবে তাতে আমাদের সন্দেহ ছিল না।

সেদিন বিকেল বিকেল বেরোব ঠাকুর পছন্দ করে আসতে। প্রসাদজির বাড়িতে যেতে হবে। এ-তল্লাটে এক প্রসাদজির বাড়িতেই পাঁচ-সাতটা ঠাকুর তৈরি হয়, প্রসাদজি থাকেন ধোবিতলাও-এর কাছে। দলবল মিলে অন্তুকে ডাকতে গিয়েছি, মামা এসে বললেন—চল আমিও যাব।

ধোবিতলাও খানিকটা দূর। শর্টকাটে যাবার রাস্তাটাও বড় নোংরা। মামার একটু বাতের ধাত। ক'দিন বাতের ব্যথায় মামা খানিকটা ভুগছিলেন। মামাকে কি অতটা নিয়ে যাওয়া উচিত হবে?

বিজন বলল, "মামা, ধোবিতলাও অনেকটা দূর।"

"উসমে কিয়া?" বলে, মামা একটা হিন্দি হুঙ্কার দিলেন।

আমরা হেসে ফেললাম। কানু বলল, "মামা, অত হাঁটলে আপনার বাত বাড়বে।"

মামা কথাটা গা করলেন না, হাতের ছড়িটা দিয়ে কানুর পেটে আলগা খোঁচা মেরে বললেন, "কত্তামি করিস না, চল।"

আমাদের কিন্তু তেমন একটা ইচ্ছে করছিল না। মামার কষ্ট হবে। মামাকে আমরা কষ্ট দিতে চাই না।

আমি কাঁইকুঁই করে বললাম, "রাস্তাটা যাচ্ছেতাই। শর্টকাটে আপনি যেতে পারবেন না।"

"লং কাটে যাব", মামা বললেন।

অগত্যা আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে পা বাড়ালাম। আমাদের খুঁতখুঁতোনি দেখে মামা বললেন, "কিচ্ছু ভাবিস না তোরা; আমি এখনও তিন চার মাইল রাস্তা হাঁটতে পারি। তবে হ্যাঁ, বুড়ো হয়ে গিয়েছি—বাতটাত একটু-আধটু ধরবেই। তা ধরতে দে, সারা জীবন কত লোক হাত ধরল, পা ধরল, কাউকে ফেরালাম না, আর এই বয়েসে বাত বেচারি একটু পা ধরবে তাকে তাড়াই কী করে! ও আমি পারি না! কাউকে বিমুখ করতে আমার বড্ড কষ্ট হয়।"

মামার কথায় আমরা হেসে উঠলাম একসঙ্গে। মনের খুঁতখুঁতুনি কোথায় যেন ধুয়ে গেল।

মামা যে এখনও বেশ হাঁটতে পারেন তা আমরা জানতাম। আমাদের সঙ্গে তিনি এই শহরের চারদিক ঘুরে বেড়িয়েছেন; ঘুরে ঘুরে সব দেখেছেন: কোথায় জঙ্গল, কোথায় গাছপালা, ঝোপঝাড়, রাস্তাঘাট কী রকম, শহরের কোন দিকটা উঁচু, কোন দিক নিচু। এইসব না দেখলে তিনি তাঁর গ্যাস পরিকল্পনাটা করতে পারতেন না। মামা সব দেখেছেন, মনে মনে জরিপ করে ফেলেছেন। আসলে অন্য সময় হলে মামাকে নিয়ে বেড়াতে আমাদের একটুও মন কেমন করত না; নেহাত ক'দিন ধরে মামা একটু বাতে ভুগছিলেন তাই যা আপত্তি। তা ছাড়া আমাদের সরস্বতী পুজোর দিন মামাকে আমরা সুস্থ শরীরে পেতে চাই, নয়তো সব আনন্দই মাটি হয়ে যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে মামা বললেন, "চল না, বাজারে গিয়ে টমটম ভাড়া করব।"

ব্যস, আমাদের সব দুশ্চিন্তা দূর হল। আর কিছুর ভাবনা নেই। বরং সবাই খুব খুশি। আমাদের শহরে টাঙার খুব একটা চল ছিল না, বিশখানা মাত্র টাঙা, ভাড়াও যাচ্ছেতাই। সাইকেলের চলটাই আমাদের এখানে বেশি। সব বাড়িতেই সাইকেল। হয় সাইকেল না হয় পায়ে হাঁটা। দায়ে-অদায়ে টাঙা। টাঙা চড়ার কপাল আমাদের বড় একটা হত না। মামার সঙ্গে টাঙা চড়ে সরস্বতী ঠাকুর পছন্দ করতে যাব ভেবে আহ্লাদে আটখানা হবার জোগাড় আর কী!

মামা টাঙাকে টম্‌টম্ বলতেন। কেন বলতেন জানি না। জিজ্ঞেসও করিনি। বরং টাঙা বা টোঙার চেয়ে টম্‌টম্ শুনতে ভালই লাগত।

বাজারে এসে মামা বেছে বেছে দুটো টম্‌টম্ ভাড়া করলেন। একটাতে মামা, ব্রজ, কানু আর আমি; অন্যটাতে অন্তু, বিজন, হারু, টুনু, মানস টানস।

টম্‌টমে মামাকে আমরা বেশিটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে একপাশে বসিয়ে রাখলাম; ব্রজ একেবারে টাঙাঅলার পাশে গিয়ে বসল।

গাড়ি চলতে শুরু করল। মামা তাঁর চুরুটটা ধরিয়ে নিয়েছেন আগেই। গাড়ির দোলায় আমরা দুলছি; মামাও হেলছেন, দুলছেন, আর থেকে থেকে হেসে ফেলছেন। আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

বার কয়েক আমরা বোকার মতন বসে বসে মামার হাসি দেখলাম। তারপর কানু বলল, "মামা, আপনি হাসছেন কেন?"

গাড়ির দোলায় মামা একটু হেলেদুলে হেসে তারপর ঠিকঠাক হয়ে বসলেন।

বললেন, "কাতুকুতু লাগছে রে!"

"কাতুকুতু!" আমি অবাক।

মামা ঘাড় দুলিয়ে বললেন, "হ্যাঁরে, আমার এই এক বিদঘুটে রোগ। ঘোড়ার লেজ দেখলেই আমার কাতুকুতু লাগে, মনে হয় ভুঁড়িতে লেজের সুড়সুড়ি লাগছে।"

মামার কথা শুনে আমরা যতটা অবাক ততটাই যেন মজা পাই। ঘোড়ার লেজটা দেখে নিই একবার, দেখে হেসে ফেলি। ব্রজ ওপাশ থেকে মুখ ঘুরিয়ে আমাদের প্রায় মুখোমুখি হয়ে বসল।

মামা বললেন, "এই রোগের জন্যে আমার আর ঘোড়ায় চড়া হল না। ও-সব দেশে থাকতে, বিশেষ করে তোর রাশিয়ায়, ঘোড়ায় চড়াটা ডাল-ভাত, তোদের সাইকেল চড়ার মতন। আমায় ওরা কতবার ঘোড়ায় চড়া শেখাতে গেছে, জোর করে ঘোড়ার ওপর বসিয়ে দিয়েছে, কিন্তু বসার সঙ্গে সঙ্গে যেই ঘোড়াটা পা তোলে অমনি আমি হেসে মরি। মনে হয়, কোমরে আর ভুঁড়িতে লেজের সুড়সুড়ি লাগছে। হাসতে হাসতে লাগাম ছেড়ে দিয়ে ডিগবাজি খেয়েছি কতবার যে।...একবার তো উলটে পড়ে নাকটাই গেল।"

আমরা হাসতে লাগলাম। ব্রজ বলল, "হাসির কোনও পাত্তা নেই।...মামা, আমি একটা লোককে মিরচা খেয়ে খুব হাসতে দেখেছি।"

"মিরচা কী রে? লঙ্কা না মরিচ?"

"লঙ্কা।"

"লঙ্কা খেয়ে হাসে—সে আবার কেমন মানুষ রে। অ্যাঁ?" মামা মজার গলায় বললেন।

ব্রজ জবাব দিল, "কী জানি। তাজ্জব।"

চুরুটে ছোট ছোট দুটো টান মেরে মামা বললেন, "কার একটা গল্প পড়েছিলাম বিদেশে থাকতে, খাসা গল্প। তা বুঝলি রে ব্রজ, সেই গল্পে একটা জায়গার নাম ছিল আটাশটা অক্ষরে, উচ্চারণই হয় না, ভাওএলগুলো বেমালুম সব বাদ। ছোট করে লোকে বলত, 'ফানি টাউন'। সে শহরে কুকুরেরা একশো বছরেও একটা মানুষকে কামড়ায়নি, নিজেরাও কামড়াকামড়ি করেনি, বেড়ালরা ইঁদুর ধরেনি, মাছ দুধ ছোঁয়নি, ঘোড়ারা রুটি মাখন ছাড়া ঘাসটাস খেত না; আর একশো বছরেও কোনও মানুষের মুখ ভার, চোখে জল দেখা যায়নি।..."

"আরে সাবাস..." ব্রজ সহর্ষে চেঁচিয়ে উঠল, "কিয়া মজাদার শহর মামা! কী যেন নামটা?"

"ফানি-টাউন, মজার শহর।"

"আজব দেশ," আমি লাগসই করে বললাম।

কানু বলল, "তারপর মামা?"

"তারপর সে বিস্তর কাহিনী। অত এখন বলতে পারব না। দেখছিস না, খালি সুড়সুড়ি খেয়ে হাসছি!" বলে মামা একটু হেসে নিয়ে এমন ভাবে বসলেন যেন ঘোড়াটার লেজটাই না চোখে পড়ে। বললেন, "ছোট্ট করে গল্পটা বলি শোন।...তা

সেই শহরে এক মেয়র ছিল। মেয়র জানিস? কলকাতা শহরে আছে, কর্পোরেশনের মেয়র। তোদের এখানে যেমন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, সেই রকম। ওদেশে পুঁচকে শহরেও মেয়র থাকে। গালভরা নাম, গদিঅলা চেয়ার, ছিমছাম ফিটফাট অফিস, মেয়রসাহেব আসেন বসেন, সেলাম খান। মজার শহরে যিনি মেয়র তাঁরা চার পুরুষ ধরে মেয়রই হয়ে আসছেন। শেষের দু-পুরুষের কোনও কাজকর্মই ছিল না। থাকবে কী করে? শহরে কিছুই যে হয় না, ভুল করে একটা ইঁদুরও রাস্তায় মরে না। একটা কিছু না হলে মেয়রই বা করবেন কী! তাই মেয়রসাহেব অফিসে বসে শুধু আইসক্রিম খান আর নাক ডাকিয়ে ঘুমোন।...একদিন সেই শহরে এক ভদ্রলোক এল, বলল সে মেয়রসাহেবের শালা!...মেয়রসাহেব বললেন, বেশ বেশ, তা শালাবাবুর উদ্দেশ্যটা কী? শালাবাবু বললেন, তিনি ডাক্তার, এই শহরে ডাক্তারি করতে এসেছেন। কথা শুনে মেয়রসাহেব হেসে গড়াগড়ি। শালাবাবু বলেন কী? এই শহরে ডাক্তারি! আরে, এখানে মানুষ গোরু ভেড়া ঘোড়া কুকুর কারও যে কোনও অসুখই করে না। দু-পাঁচটা ডাক্তার যারা ছিল, তারা সব পাততাড়ি গুটিয়েছে।...শালাবাবু তবু বিদেয় হলেন না, বললেন—বেশ তো, পাঁচ-সাতদিন থাকি, তারপর যাব।"

কানু বলল, "মামা, শহরটায় মাথাধরা, পেটের অসুখ থাকা দরকার ছিল।"

"কেন রে?" মামা বললেন, "ও দুটো রোগই বা থাকবে কেন?"

কানু হেসে বলল, "তা না হলে স্কুল কামাই করা যাবে না।"

মামা হো হো করে হেসে একেবারে টম্‌টম্ থেকে গড়িয়ে পড়েন আরকী। আমরাও হেসে উঠেছিলাম। দিব্যি ব্রেন খাটিয়ে বলেছে কানু।

মামার অট্টহাসি দেখে ব্রজ ঘোড়ার লেজ আরও আড়াল করে বসল।

হাসি থামলে মামা বললেন,"তারপর শোন। যা বলছিলাম। তা ডাক্তার শালাবাবু শহরে থাকতে থাকতেই একদিন মেয়রসাহেব তাঁর সভাসদ—মানে কাউন্সিলারদের এক ভোজ দিলেন। সেই ভোজে শালাবাবুও অতিথি।...খুব খাওয়া দাওয়া হই হল্লা হচ্ছে, হঠাৎ শালাবাবু মোটাসোটা নধর গোছের বুড়ো এক কাউন্সিলারকে বললেন—আপনি মশাই অত জোরে জোরে হাসবেন না, দাঁতে ব্যথা হবে। দাঁত ব্যথা? সেটা আবার কী? দাঁতে আবার ব্যথা হয় নাকি? শালাবাবু বললেন—আজ্ঞে হয়; দাঁত বড় প্রয়োজনীয় জিনিস; ভগবানের রাজ্যে এর চেয়ে চমৎকার ও সূক্ষ্ম সৃষ্টি নেই। আপনার দাঁত আমাকে দেখতে দিন। এই বলে শালাবাবু দাঁত দেখার নাম করে খাবার কাঁটা দিয়ে কী একটা যেন করে দিল। পরের দিন ভদ্রলোকের দাঁতে ব্যথা। তার পরের দিন মাড়ি ব্যথা; শেষে গাল ফুলল। যন্ত্রণায় ভদ্রলোকের মুখটি ভার হল। সেই প্রথম 'ফানি টাউনে' গালফোলা আর মুখভার একটা মানুষ দেখা গেল।

তারপর শালাবাবু ভদ্রলোকের দাঁত তুললেন। দাঁত তোলার আগে শালাবাবু একটা গ্যাস দিতেন, লাফিং গ্যাসের মতন, তবে ঠিক লাফিং গ্যাস নয়, ফলে রুগি অজ্ঞান হত না ঠিক, হাসতে হাসতে ঝিমিয়ে পড়ত। আর শালাবাবু টক করে দাঁতটি তুলে নিতেন।"

"শালাবাবু দাঁতের ডাক্তার?" কানু শুধলো।

"তা ঠিক জানি না রে। তা সেই 'ফানি টাউনের' লোক যেই শুনল যে, শালাবাবুর কাছে গেলে চেয়ারে বসে ভীষণ হাসা যায়, অমনি সবাই ছুটতে লাগল। আর শালাবাবু হাসাবার নাম করে দাঁত তোলেন। দাঁত তোলেন আর পাশের দাঁতটা নড়িয়ে দেন; আবার তোলেন। দাঁত প্রতি দশ টাকা মতন। দেখতে দেখতে শহরে খালি গালফোলা লোকের ভিড়, খালি আঃ আর উঃ! এমন অবস্থা হল যে, ওই শহরে মানুষের আর দাঁত থাকল না। সবাই নির্দন্ত। মেয়রসাহেব তখন শালাবাবুকে ঘাড় ধরে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গেলেন। নিয়ে গিয়ে বেশ করে জলে চুবিয়ে তিরিশ কুকুরে টানা গাড়ি করে শহর থেকে বিদায় করে দিলেন।"

গল্পটা শেষ হতে হতে আমরা ধোবিতলায় পৌঁছে গেলাম। অন্তু টন্তুরা অন্য গাড়িতে বসে আমাদের হাসাহাসি দেখে বেজায় চটছিল, যেন আমরা ওদের ভাগ না দিয়ে টাটকা টাটকা কিছু খেয়ে নিলাম।

টম্‌টম্ থেকে নামতে নামতে মামা বললেন, "বুঝলি ব্রজ, লঙ্কা খেয়ে হাসা আর শক্ত কী? কিন্তু নামে লাফিং গ্যাস হলেও লাফিং গ্যাস খেয়ে হাসতে যাওয়া খুবই সাংঘাতিক।"

সরস্বতী ঠাকুর পছন্দ করে আমরা ফিরলাম। সেই টম্‌টম্। অনেকটা পথ আসার পর মামা বললেন, "এবার গাড়ি দুটোকে বিদায় করে দে। চমৎকার লাগছে। চল হেঁটে হেঁটে ফিরি।"

টম্‌টম্ বিদায় করে দিয়ে আমরা সবাই একসঙ্গে ফিরতে লাগলাম। সন্ধে হয়ে এসেছে প্রায়। বাতাসে শীত আছে, তবু আর কাঁপুনি লাগছে না। দেবদারু গাছের মাথায় অন্ধকার এসে বসছে, পাখির দল ঝাঁক বেঁধে ফিরছে, গাছে গাছে এসে বসছে, মধুবাবুর ফুলবাগানে গাঁদাফুলের ওপর ছায়া নেমে গাঢ় হয়ে গেছে, আকাশে তারা ফুটল দু'-একটা, কেমন যেন বুনো ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে।

হাঁটতে হাঁটতে মামা এক সময়ে বললেন, "আচ্ছা, আমি এবার কাজের কথা বলি, শোন। সরস্বতী পুজোর দিন আমি আমার তাঁবুর কাছে—বাগানে একটা মডেল গ্যাস প্ল্যান্ট বসাব। বড় সড় করে যেটা বসাতে হবে, তার একটা ছোটখাটো চেহারা আগে তোদের দেখা দরকার। আমার অ্যারেঞ্জমেন্ট কমপ্লিট—মানে, কী কী চাই তা ঠিক করে ফেলেছি। একটা বড় ড্রাম দরকার, গোটা কয়েক টিন, দু-তিনটে মাটির জালাও দরকার হতে পারে। নল টল আমার কাছে আছে। এখন তোমরা বয়েজ, আমায় কিছু পচা গাছপাতা কাঠকুটো এনে দেবে, আর গোবর।"

"গোবর!" বিজন হুট করে বলে ফেলল।

মামা বিজনের দিকে তাকালেন, "তোকে দিয়েও অবশ্য কাজটা চলতে পারে—কিন্তু পুজোর দিন আর তোর মাথার গোবর নিতে চাই না।"

ব্রজ বলল, "মামা, আমাদের গোমাতার হিসেবটা হয়নি।"

"এখনও হয়নি! কী করছিলি তবে?"

"সরস্বতী পুজোর চাঁদা টাঁদা তুলছিলাম," আমি বললাম।

মামা এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, "তবে তো ওরই সঙ্গে সঙ্গে এটাও করতে

পারতিস। বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলিসনি?”

“হ্যাঁ—বাড়ি বাড়ি গিয়ে তুলেছি—” কানু বলল।

“তবে—!” মামা বললেন, “তবে তো ওই সঙ্গে এটাও হয়ে যেত। যে বাড়িতে চাঁদা চাইতে যাস সে বাড়িতে গোরু আছে কি না, থাকলে ক'টা গোরু জেনে নিতে পারিস না? ওটা জানলেই তো মোটামুটি একটা হিসেব বেরিয়ে গেল! তারপর যাবি গোয়ালাদের কাছে, শেষে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়বি। না, তোদের দ্বারা এ-সব হবে না। একেবারে ছাগল তোরা—!”

আমরা সবাই কেমন লজ্জায় চুপ করে থাকলাম। হঠাৎ ব্রজ বলল, “মামা, এখনও চাঁদা আদায় বাকি আছে। সব লোক চাঁদা দেয়নি, রসিদ কেটে দিয়েছি। কাল থেকে গোমাতার হিসেব নেব।”

মামা দু' মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, “গুড, ভেরি গুড।”

কানু আমতা আমতা করে বলল, “আমরা কি বাড়ি বাড়ি গিয়ে গোবরের কথা বলে আসব, মামা?”

“বাঃ, গুড আইডিয়া! ভেরি গুড!”

৫

অন্তুদের বাড়ির বাগানে মামার তাঁবুর পাশে সরস্বতী পুজোর দিন গ্যাসের মডেল যন্ত্রটা বসানো হল। মামাই বসালেন। আগের দিন থেকেই হাঁকডাক করে বাড়ির চাকরবাকরদের ডেকে মামা কাজ করাচ্ছিলেন, আমরাও পুজোর তোড়জোড়ের ফাঁকে ফাঁকে মামার ফরমাশ খাটছিলাম। একটা ড্রাম এল তেলের, বড় ড্রাম; মাঝারি আরও একটা জোটানো হল, টিন এল কেরাসিন তেলের—খালি টিন, মাটির কলসি, কিছু কাঠকুটো, পচা জঞ্জাল এবং গোবরও।

সন্ধেবেলায় আমরা কিছু গোবর কুড়িয়ে এনে রেখে দিয়েছিলাম।

সরস্বতী ঠাকুরের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে আমরা ছুটতে ছুটতে মামার কাছে এসে হাজির। এসে দেখি, জোগাড়যন্ত্র শেষ করে মামা তাঁর মডেল-যন্ত্রের সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমরা আসতেই মামা বললেন, “এই যে, তোদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। অঞ্জলি দেওয়া শেষ হয়েছে?”

“হ্যাঁ,” সমস্বরে আমরা জবাব দিলাম।

যন্ত্রটার দিকে আঙুল দেখিয়ে মামা বললেন, “কী রকম দেখাচ্ছে বল তো?”

কী রকম যে দেখাচ্ছিল বলা মুশকিল। বাস্তবিক ওর কোনও চেহারা আমরা ঠাওর করতে পারছিলাম না। বাড়ি, গাড়ি, গোরু মোষ, পাখি, গাছ—এসব যা আমরা নিত্য দেখি, তার সঙ্গে যন্ত্রটার কোনও সম্পর্ক ছিল না। চেহারাটা কেমন, কী করে বলব? অবশ্য যন্ত্রের কি কোনও চেহারা থাকে? যন্ত্র তো মানুষ বা পশুপাখি নয় যে, তার একটা চেহারা ভগবান চুপি চুপি ঠিক করে দেবেন। আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি
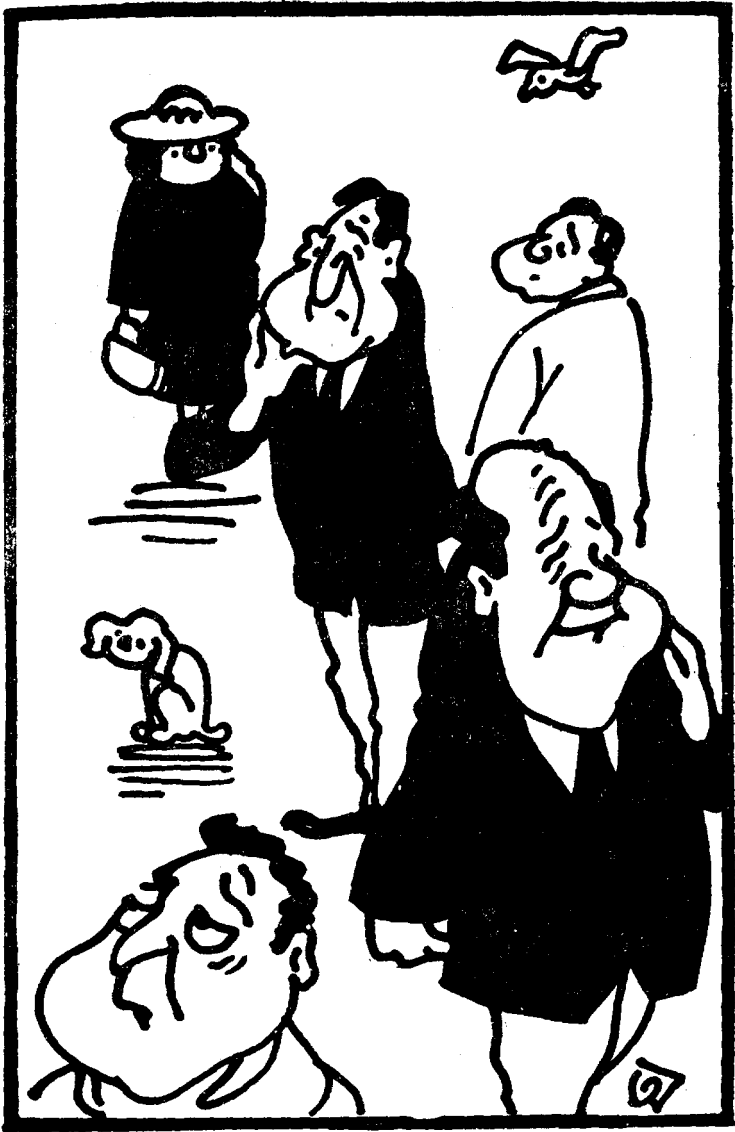
দেখতে দেখতে শহরে খালি গালফোলা লোকের ভিড়...

যখন, তখন ব্রজ ফট করে বলল, "দেখতে একেবারে বগলার মতন লাগছে।"

ব্রজর কথা শুনে আমরা অবাক।

বগলা আমাদের স্কুলের জল-পাঁড়ে। মামা ব্রজর দিকে ফিরে তাকালেন, "বগলা? বগলা কী? তুই কী-সব ভাষা যে বলিস বেটা?"

আমাদের স্কুলের জল-পাঁড়ে বগলা মাথায় এত বেঁটে যে, সে জলের মস্ত মস্ত ড্রামের পাশে দাঁড়ালে তাকে ড্রামের বাচ্চা মনে হয়! একেবারে গোল তার চেহারা, ভীষণ মোটা, পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত সরলরেখা টানলে কোথাও বেঁকবে না। বগলা হাঁটলে মনে হয় ড্রাম গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। মাথায় চুল নেই বলে বগলা রোদের সময় সোলার হ্যাট পরে। এই হ্যাট সে একবার গুণেন স্যারের কাছ থেকে পেয়েছিল। কেন পেয়েছিল জানি না।

ব্রজ বলল, "মামা, বগলা আমাদের জল-পাঁড়ে।"

ভেবেছিলাম মামা বোধ হয় রাগ করবেন; কিন্তু তিনি রাগ করলেন না। বললেন, "নিয়ে আসিস তাকে একদিন, দেখব।"

আমরা একটু হাসলাম। বগলাকে দেখলে মামা হেসে মাটিতে গড়াগড়ি যাবেন। তা ছাড়া বগলার কথা? সে কথা যে না শুনেছে সে বুঝবে না। বগলা হাই স্কুলের জল-পাঁড়ে, মাথায় হ্যাট পরে বলে দেশে তার খুবই খাতির। বগলাকে সেখানে কথায় কথায় ইংরেজি বলতে হয়।

ইংরেজিগুলো সে আজ বারো বছর ধরে স্কুলের ছেলেদের কাছে শিখছে। শিখে শিখে এমন রপ্ত করেছে যে আজকাল আমাদের কাছেই সেই সব ইংরেজি বলে। শুনে আমরা খুব হাসি। হাসার মতনই ইংরেজি; মরা মানুষও সেই ইংরেজি শুনলে হাসতে হাসতে জ্যান্ত হয়ে উঠবে, কিংবা কে জানে, তেমন জ্যান্ত মানুষ হলে হয়তো হাসতে হাসতে মরেও যেতে পারে।

যাই হোক, যন্ত্র বলতে আমরা চোখের সামনে যা দেখছি তা হল একটা বড় ড্রাম একটা বাচ্চা ড্রামকে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে বসে আছে, তার মাথায় একটা ফুটো, ফুটোয় রবারের নল, সেই নল এসে পাশে একটা মুখ আঁটা কলসির মধ্যে ঢোকানো, সেখান থেকে একটা নল বেরিয়ে পাশে কেরোসিনের মুখঢাকা টিনের মধ্যে, আবার সেখান থেকে নল, আবার কলসি...। আমাদের গ্যাস দেখতেই বেশি আগ্রহ। কই, গ্যাস কই?

বিজন বলল, "মামা, গ্যাস কখন বেরোবে?"

মামা একটু বিরক্ত চোখে বিজনের দিকে তাকালেন। বললেন, "এখনি গ্যাস বেরোবে কী? যন্ত্রটা কি চালু হয়েছে?"

যন্ত্রই চালু হয়নি। আমরা অবাক! আমাদের দোষ নেই, দেখে শুনে আমরা কী করে বুঝব যে যন্ত্রটা হাত-পা গুটিয়ে ঠুঁটো হয়ে বসে আছে। মামার দোষ নেই। মামা হয়তো আগে আমাদের সে কথাটা বলেছেন, আমরা খেয়াল করে শুনিনি।

একটু তফাতে একটা চুল্লিও করা হয়েছিল। ইট আর কাদা দিয়ে। সেই চুল্লির মধ্যে গুচ্ছের কাঠ। চুল্লিটার ওপর কেরাসিনের টিন, কাদা দিয়ে ফাঁকটাক ঢাকা, টিনের

মাথায় আর একটা টিন, তার মাথার ফুটো করে রবারের নল বসানো। সেই নলটা আবার এপাশে হেলিয়ে কলসির মধ্যে ঢোকানো রয়েছে। বড়ই জটিল ব্যাপার।

ব্রজ বলল, "মামা, যন্তরটা চালু হবে কখন?"

"হবে", মামা জবাব দিলেন।

মামা তারপর তাঁর বিচিত্র পরীক্ষা-যন্ত্রটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ওই যে জিনিসগুলো—তেলের ড্রাম, জলের ড্রাম, কেরোসিনের টিন, মাটির বড় বড় কলসি, রবারের পাইপ, পাইপের মুখে ছোট ছোট কাঠের কল ইত্যাদি—এসব মিলিয়ে মিশিয়ে যা দাঁড়িয়েছিল তাকে যন্ত্র বলা যাবে কি না তা জানি না। তবে, গ্যাসের পরীক্ষা এ-সবের মধ্যেই হচ্ছে বলে আমরা তাকে পরীক্ষা-যন্ত্র নাম দিলাম।

আমরা পাশাপাশি ড্রিল ক্লাসের সময় যেমন অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াই সেই ভাবে দাঁড়ালাম।

মামা আঙুল বাড়িয়ে যন্ত্রটার একেবারে গোড়ার দিক দেখালেন। মস্ত ড্রামটা দেখিয়ে বললেন, "ওই ড্রাম, ওর মধ্যে কী হচ্ছে?"

আমরা চুপচাপ।

মামা বললেন, "ওর মধ্যে জঞ্জাল আর গোবর পচানো হচ্ছে। জঞ্জাল পচে যে গ্যাস হবে সেই গ্যাসই আমাদের দরকার।"

কানু বলল, "পচাই গ্যাস!"

মামা বললেন, "একে বলে ডিকম্‌পোজিসান। পচতে শুরু হলে যে গ্যাস ওর মধ্যে জন্মাবে সেটা ওপরের নল দিয়ে এসে ওই কলসিটার মুখে ঢুকবে, কলসি থেকে যাবে অন্য কলসিটায়, তারপর টিনের মধ্যে। আর ওই যে দেখছিস চুল্লি, এটা থেকে আমরা কাঠকুটো জ্বালিয়ে একটা আলাদা প্রসেসে গ্যাস বের করে নিচ্ছি। ওই গ্যাস এসে এই গ্যাসটার সঙ্গে মিশছে, মিশে একসঙ্গে টিনগুলোর মধ্যে দিয়ে যাবার সময় পিউরিফাই হচ্ছে, হয়ে শেষ পর্যন্ত ওই জালাটায় গিয়ে জমছে। জালাটা হচ্ছে আমাদের গ্যাস চেম্বার।"

আমরা যেন কতই বুঝলাম, কলকল করে বললাম, "বুঝেছি। একেবারে পরিষ্কার। ওই গ্যাস থেকে বাতি জ্বলবে।"

মামা হেসে বললেন, "জিনিসটা অত সোজা নয় নেফুর দল। এটা হল এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজ। আসল যেটা করব সেটা করতে মিস্ত্রি-মজুর, ইট, লোহা, পাইপ, ফার্নেস কত কী দরকার হবে। অনেক টাকার ব্যাপার।...তা আর দেরি করে লাভ নেই। আমি কাজ শুরু করে দিই।"

মামা কাজ শুরু করতে যাবেন, এমন সময় ব্রজ বলল, "মামা, এই গ্যাসটার নাম কী?"

মামা দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "ডবলু-আর!"

আমরা কিছু বুঝলাম না। মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। মামা বুঝিয়ে দিলেন। বললেন যে, এই গ্যাসের মেটিরিআল হল কাঠ আর জঞ্জাল, মানে উড এন্ড রাবিশ।

উড়ের...

কানু কথাটা লুফে নিয়ে বলল, " উড়ের ডব্লু আর রাবিশের আর।"

মামা মাথা নাড়লেন। "রাইট।"

মামা চুল্লিটা জ্বালিয়ে দিলেন। তলার ফাঁক দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে লাগল। আমাদের আর দাঁড়িয়ে থাকার সময় ছিল না। কানুদের বাড়িতেই আমাদের সরস্বতী পুজো হয় বরাবর। সেখানে আমাদের দুপুরে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, মাসিমা আর কল্যাণীদি-ই সব ব্যবস্থা করছেন, পুঁচকে ক'টা ছেলেমেয়ে আছে, লিলিও আছে। তবু সেখানে আমাদের যাওয়া দরকার। তারপর স্কুলেও যেতে হবে একবার। বিকেল থেকে ঠাকুর সাজানো হবে রাত্রের জন্যে। পাড়ার সবাই আসবে। পশুপতিদা ম্যাজিক দেখাবে আজ আমাদের ওখানে।

মামাকে বললুম, "মামা, আমরা যাই?"

মামা বললেন, "হ্যাঁ, তোরা যা। গ্যাস হোক, তারপর জ্বালাব। সে কালকের ব্যাপার।"

সন্ধেবেলায় মণ্টুদারা আমাদের ঠাকুর দেখতে এল।

ঠাকুর দেখে বলল, "বাঃ, বেশ সাজিয়েছিস। তা কই, আমাদের কিছু খাওয়াটাওয়া!"

প্রসাদ ফুরিয়ে গেছে কখন, খাওয়াবার কিছু নেই। আমরা অপ্রস্তুত।

কানু বলল, "চা খাবে! চা-বিস্কুট?"

গেনুদা বলল, "ফার্স্ট ক্লাস! নিয়ে আয়। মাসিমাকে জ্বালাবি না তো?"

কানু বলল, "আমি নিজে করে আনছি! কিন্তু গেনুদা, তোমায় একটা গান গাইতে হবে।"

গেনুদা বলল, "ভাগ্।"

আমরা গেনুদাকে ধরে বসলাম। গেনুদা বেশ গায়। হাসির গান।

কানু বলল, "পশুপতি আসুক, তখন গান—এখন কী!"

গেনুদা যে গান গাইবে তা বেশ বোঝা গেল।

গল্প করতে করতে গেনুদা বলল, "হ্যাঁরে, তোদের সেই জাপানি মামার খবর কী? আসবেন না?"

বিজন বলল, "আসবেন। আর খানিক পরে আসবেন।"

"বাড়ির মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে করেন কী ভদ্রলোক? পাগল নাকি?"

ব্রজ চটে গেল। বলল, "পাগল টাগল বোলো না।"

মণ্টুদা হাসল। "আজ দেখলাম হাঁড়ি কলসি টিন সাজিয়ে বসে আছেন। ব্যাপার কী?"

"গ্যাস হচ্ছে—" ব্রজ বলল। এমন ভাবে বলল যেন সে খুব গোপনে একটা চমকপ্রদ সংবাদ দিচ্ছে।

"গ্যাস!" মণ্টুদার চোখ কপালে উঠল।

গেনুদা বলল, "গ্যাস কীসের রে? কী গ্যাস? তোদের জাপানি মামা কি সোডা-লেমোনেড তৈরি করবেন?"

ভ্যাগ্যিস অন্তু সেখানে ছিল না, নয়তো কী যে ভাবত!

আমরা বললাম, "না, রাস্তার বাতি জ্বালাবার গ্যাস হবে।"

শুনে মণ্টুদা আর গেনুদা পরস্পরের মুখের দিকে খানিকটা বোকার মতন তাকিয়ে থেকে শেষে হোহো করে হেসে উঠল। সে হাসি আর থামতে চায় না।

আমাদের খারাপ লাগল। বিজন আর ব্রজ ভয়ঙ্কর চটল, আমার তো মনে হচ্ছিল চিৎকার করে মামার বিশ্বজোড়া খ্যাতির কথাটা ওদের বলি।

ব্রজ বলল, "হাসছ কেন? বিশওয়াস (বিশ্বাস) হচ্ছে না?"

মণ্টুদা মুখ চাপা দিয়ে বলল, "এটা কোন গ্যাস রে?"

বিজন মুখ চোখ লাল করে বলল, "ডবলু-আর।"

"ডবলু-আর? সেটা কী?"

আমরা কিছু বললাম না। বরং খানিকটা অবহেলার সঙ্গে মণ্টুদাদের দিকে তাকালাম।

গেনুদা বলল, "তোদের গ্যাস-মামা নির্ঘাত পাগল।"

"পাগল কখনও ফেমাস ম্যান হয় না," আমি বললাম। "মামা বিখ্যাত লোক। পৃথিবীসুদ্ধ তাঁর নাম জানে।"

"আরে ব্বাস্! তাই নাকি? কেন জানে রে?"

"সাইনটিস্ট বলে।"

"যাচ্চলে, আমরাই জানি না। কী নাম?"

"ওআন্ডার মুখার্জি বলেই লোকে জানে।"

গেনুদা নস্যির ডিবে খুলে নস্যি নিল আঙুলে। বলল, "ভাল কথা। আগে বলিসনি কেন? এমন লোক এ-শহরে এসেছেন। আমরা ভাবতাম ছিট টিট আছে মাথায়। তা ও-রকম সাইনটিস্ট যখন, তখন আমরা ওঁকে দিয়ে কত কী করিয়ে নিতে পারি। কী বলিস, মণ্টু?"

মণ্টুদা হাসল। "তা তো পারিই।"

গেনুদা বলল, "কী দিয়ে গ্যাস হচ্ছে রে?"

"গোবর টোবর জঞ্জাল দিয়ে, কাঠ পুড়িয়ে।"

"গোবর গ্যাস!" গেনুদা নাকের নস্যি ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "এ যে দেখছি অরিজিন্যাল ব্যাপার! তা হলে ক'টা খাটাল বসা। গোরু মোষ রাখ। দুধটা আমাদের দিস, গোবর তোদের!"

আমরা রীতিমতো অপমানিত বোধ করলাম। বললাম, "ঠাট্টা করছ?"

গেনুদা বলল, "দূর, ঠাট্টা করব কী? শুনে পর্যন্ত মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে।"

এমন সময় অন্তু ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "এই শীগগির চল। একটা ষাঁড় ঢুকে পড়েছিল বাগানে—তাড়া খেয়ে গ্যাসের সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছে।"

৬

শুভকাজে বাধা পড়লে সকলেরই মন খারাপ হয়। মামার বেলায় যেটা হয়েছিল সেটা শুধু বাধা নয়, একেবারে লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। গ্যাস যন্তরের কিছু আর ছিল না। হাঁড়ি জালা ভেঙেচুরে ছত্রাকার, কেরোসিনের টিনগুলো চ্যাপটা হয়ে তুবড়ে চারপাশে পড়ে আছে, মস্ত ড্রামটা একপাশে গড়াগড়ি খাচ্ছিল, চুল্লি ভেঙে গেছে, রবারের টিউবগুলো টুকরো টুকরো। দেখেশুনে মনে হবে যেন একটা কামানের গোলাটোলা কোথাও থেকে ছিটকে এসে পড়ে সব তছনছ করে দিয়েছে। অবস্থা দেখে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছিল। মামা একেবারে চুপ, গম্ভীর। বুঝতেই পারছিলাম মামার এত কষ্টের ও পরিশ্রমের জিনিস নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কী রকম দুঃখ পেয়েছেন। মামা আর বাগানে ছিলেন না, একেবারে তাঁর তাঁবুতে ক্যাম্বিসের চেয়ারে এসে বসে পড়েছিলেন, হাতে চুরুট।

আমরা অনেকক্ষণ ভয়ে ভয়ে মামার সঙ্গে কথা বলতেও পারিনি। কী বলব, মামা যেন একেবারে অন্য জগতে চলে গেছেন, কিছু দেখছেন না, সাড়াশব্দ দিচ্ছেন না, মাঝে মাঝে শুধু হাতের চুরুটটা মুখে উঠছিল।

গেনুদা আমাদের সঙ্গেই চলে এসেছিল। যেন মজা দেখার জন্যেই। দেখেশুনে বলল, "এটা বোধ হয় সেই মহাদেবের ষাঁড় রে, নয়তো এ-রকম দক্ষযজ্ঞ করত না।"

কথাটা তাঁবুর বাইরে মামার কানের আড়ালেই বলেছিল গেনুদা। আমাদেরও মনে হল, গেনুদার কথাটা হয়তো ঠিক। আমাদের শহরে দশ-পনেরোটা ষাঁড় নিশ্চয় আছে। কিন্তু মহাদেবের ষাঁড় বলতে একটাই। বিখ্যাত ষাঁড়। নামটাও মুখে মুখে রটেছে। দেখতে এমনিতে নিরীহ, গায়ে গতরে মণ আট-দশ, শরীরের অর্ধেকটা কালো, বাকিটা বাদামি। এমন বদমাশ ষাঁড় ভূ-ভারতে আর জন্মেছে কি না সন্দেহ। মহাদেব বাজারে ঢুকে পড়লে ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে, বিশ-পঞ্চাশটা লাঠি তৈরি হয়ে যায়। তবু মহাদেবের যদি মর্জি হয়, আলুর বাজার কি তরকারির বাজার তছনছ করে দিতে পারে, রাস্তার ধারের মিষ্টির দোকানের কাচ যে কতবার সে ভেঙেছে তার ইয়ত্তা নেই। তা হলেও মহাদেব শান্ত শিষ্ট, বেশ নিরীহ তার চলন টলন। ওরই মধ্যে হঠাৎ সে খেপে যায়। খেপে গেলে সে সত্যিই দক্ষযজ্ঞ করে।

মহাদেবের খ্যাপার কোনও ঠিকঠিকানা নেই; তবে আমরা জানি, বেয়াড়া কিছু দেখলেই তার মেজাজ গরম হয়ে চোখ লাল হয়ে ওঠে। কে জানে, মহাদেব হয়তো এই পাড়ায় আজ এসেছিল, তারপর শেষ বিকেলের দিকে টহল মারার সময় কোনও রকমে তার চোখ পড়ে যায় অন্তুদের বাগানে। মামার তাঁবু দেখেই হোক বা কোনও ফাঁক-ফোকর দিয়ে গ্যাস যন্তর দেখেই হোক, তার তেমন পছন্দ হয়নি, এক ফাঁকে গেট খোলা পেয়ে ঢুকে পড়ে এই কাণ্ড করেছে। যা করেছে সেটা গোরু ষাঁড়টাড়রাই করতে পারে—মানুষের মগজ তো তাদের নেই, মামার এই গ্যাস-যন্তরের মূল্য সে কী বুঝবে!

আমরা যখন বিদায় নিলাম তখন মর্মাহত মামা শুধু বললেন, "কাল আসিস

গ্যাস যন্তরের কিছু আর ছিল না। হাঁড়ি জালা ভেঙেচুরে ছত্রাকার...

তোরা।"

আমরা চলে এলাম।...

পরের দিন অন্তুদের বাড়ি গিয়ে দেখলাম মামা খুব ব্যস্ত। সকাল থেকেই অন্তু আর বাড়ির চাকর দয়ারামকে নিয়ে মামা মস্ত গজ-ফিতে ধরে নানারকম মাপজোপ করাচ্ছেন। মাপজোপটা কীসের আমরা বুঝলাম না, ভাবলাম—আবার নতুন করে যে যন্তর বসানো হবে তারই মাপটাপ কিছু হবে। কিন্তু মামার মাপজোপের কেমন একটা অদ্ভুত ধরন ছিল, গেট থেকে আগের গ্যাস-যন্তরের কতটা দূরত্ব ছিল তার অন্তত পাঁচ রকম মাপ হল, কম্পাউন্ডের উচ্চতা মাপা হল, ছড়ানো-ছিটানো যন্তরের টুকরোগুলোরও নানা রকম মাপ হল। তারপর মামা তাঁবু থেকে একটা দূরবীনের মতো যন্ত্র এনে অনেক কিছু দেখলেন, শেষে ওই টুকরো-টাকরা মাটি, রবারের টিউবের কয়েকটা অংশ নিয়ে তাঁবুতে ঢুকলেন। এত যে মাপামাপি—সবই কিন্তু মামা একটা লম্বা কাগজে টুকে নিয়েছিলেন।

আমরা কিছুই বুঝলাম না। অন্তুও তেমন কিছু বোঝেনি। তবে আমরা যখন তাঁবুর বাইরে তখন অন্তু বলল, 'ব্যাপারটা মিস্টিরিয়াস...।' মিস্টিরিয়াস' কথাটা আমাদের মধ্যে খুব চল ছিল। কিছু না বুঝলেই বলতাম মিস্টিরিয়াস। কথাটার মধ্যে বিস্ময় থাকত, রোমাঞ্চও থাকত, অন্তত কথাটায় আমাদের বিস্ময় বাড়ত।

সকালের দিকে মামা আমাদের সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বললেন না। দেখলাম, তাঁবুর মধ্যে ঢুকে মস্ত এক আতস কাচ বের করে তিনি কাজ করতে বসলেন। কুড়োনো টুকরোগুলো নানা ভাবে দেখছিলেন তিনি। বললেন, "সন্ধেবেলায় আসিস, এখন কাজ করব।"

সন্ধেবেলায় ঠাকুর বিসর্জনের পালা। অবশ্য তাতে আমাদের খুব আটকায় না, সাড়ে সাতটা নাগাদ অনায়াসেই আসতে পারব।

রাত্রে মামার কাছে আসতেই মামা বললেন, "বোস।"

আমরা বসলাম।

মামা চুরুট টানছিলেন। খানিকটা সময় চুপচাপ চুরুট টানার পর চোখ চেয়ে বললেন, "বিসর্জন হল?"

আমরা মাথা নাড়লাম। ব্রজ কী বলতে যাচ্ছিল, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তার গলা ভেঙে গেছে, ভাঙা গলায় খানিকটা বিচিত্র শব্দ হল মাত্র।

মামা আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন, "অন্তু, ওই যে ওখান থেকে টর্চটা নিয়ে বাইরেটা একবার দেখে আয়, লোকজন কেউ আছে কি না।"

মামার কথায় আমরা অবাক। মামার মুখও বেশ গম্ভীর। অন্তু টর্চ নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমরা চুপচাপ বসে, পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি।

খানিকটা পরে অন্তু ফিরে এল। মামা চোখ তুলে তার দিকে তাকালেন।

অন্তু বলল, "কেউ নেই।"

মামা বললেন, "ভাল করে দেখেছিস?"

"হ্যাঁ।"

"গুড...।" মনে হল মামা সন্তুষ্ট হয়েছেন। তারপর সামান্য চুপচাপ থাকার পর বললেন, "এবার থেকে আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। কথাবার্তায় কাজে আমরা যদি কেয়ারফুল না হই, আবার এ রকম কাণ্ড ঘটবে।"

মামার মুখ দেখে এবং কথার ধরন থেকে আমরা কেমন রহস্যের ছোঁয়া পেলাম। অথচ ব্যাপারটা বুঝলাম না।

মামা হঠাৎ শুধোলেন, "কাল তোদের সঙ্গে যে ছেলেটা এসেছিল ওই ছেলেটা কে? ওকে তো আমি দেখিনি আগে? তোদের চেয়ে বয়সে ঢের বড়।"

কাল আমাদের সঙ্গে গেনুদা এসেছিল। কানু বলল, "আমাদের সঙ্গে গেনুদা ছিল!"

"গেনুদা! গেনুদাটা কে?"

জবাবটা আমরা ঠিক মতন দিতে যেন ভুলে গেলাম। আমি বললাম, "গেনুদা আমাদের পাড়ায় থাকে। পাড়ার ছেলে, দাদা।"

"কী করে?"

"কিছু করে না, মামা। গেনুদা হাসির গান গাইতে পারে ভাল।"

"লেখাপড়া কতদূর করেছে?"

"কলেজ পর্যন্ত, বি-এ পরীক্ষা দেয়নি।"

"কলেজ? কোন কলেজ?"

"পাটনায় পড়েছিল।"

"ও? তা কিছু করে না কেন?"

"কী জানি!"

"বাড়িতে কে কে আছে?"

"সবাই আছে। বাবা মা দাদা। গেনুদার বাবা সাহেবদের ক্লাবের ম্যানেজার।"

মামা যেন তাঁর চোখ দুটোকে টপ করে তুলে আমার চোখের ওপর আটকে ফেললেন। খানিকটা সময় আর কথা নেই। তারপর বললেন, "ব্যস, আর বলতে হবে না। একটা আঁচ পাওয়া যাচ্ছে।"

মামা যে কী ভাবছিলেন আমরা জানি না, বোকার মতন তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

মামা তাঁর নিবন্ত চুরুট ধরিয়ে বেশ গুছিয়ে বসে নিচু গলায় বললেন, "বয়েজ, ব্যাপারটা খুবই দুঃখের, কিন্তু এটা প্রায় ঠিকই যে আমাদের পেছনে শত্রু লেগেছে।"

শত্রু! আমাদের পেছনে শত্রু লেগেছে? কথাটা শোনামাত্র ভাল কিছু বুঝলাম না, তারপর যেন মানেটা আস্তে আস্তে বুঝতে পেরে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। অজ্ঞাত শত্রুর কল্পনায় সামান্য রোমাঞ্চ হল।

ব্রজ বলল, "মামা শতরু লেগেছে? কোন শতরু?"

কানু বলল, "শত্রু লাগবে কেন?"

মামা হাতের চুরুটটা কানুর দিকে বাড়িয়ে বার কয়েক বাতাসে প্রশ্নচিহ্নের মতন নাড়লেন, অর্থাৎ কেন, কেন, কেন—এই কথাটাই যেন জোরে জোরে শুধোলেন নিজেকেই। তারপর বললেন, "এ-ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটে, বিদেশে তো হামেশাই।

তোরা বলবি, কেন ঘটে? জবাবে আমি বলব, কিছু মানুষের এই রকমই মনোবৃত্তি। তারা কেউ স্বার্থের জন্যে, কেউ পয়সার লোভে, কেউ কীর্তির আশায় অন্যের পরিশ্রম, সাধনা চুরি করে। জার্মানিতে জু-দের অনেক সাধারণ বিজ্ঞানীর কীর্তি জার্মানরা চুরি করেছে, তা জানিস!...ব্যাপারটা খুব এলাহিভাবে বিদেশে চলে, বিস্তর পয়সা খরচ করে অন্যের গবেষণা চুরি করাও হয়, তবে এ-সব বেশি চলে যেখানে পয়সা সে-সব জায়গায়। নতুন ওষুধবিষুধ আর এঞ্জিনিয়ারিংয়ের বেলায়। ফরমুলা চুরি, প্ল্যান চুরি এসব ওখানে ডাল ভাত। যুদ্ধের সময় কে কী নতুন জিনিস বের করছে মানুষ মারার জন্যে, তা নিয়ে চুরির হিড়িক পড়ে যায়। সে-সব গল্প শুনলে তোদের গায়ে কাঁটা দেবে। যাকগে, তবু এ-কথা ঠিক, বিদেশে আমরা কাজ করেছি ল্যাবরেটরিতে, ইউনিভার্সিটিতে কিংবা ধর গভর্নমেন্টের ব্যবস্থার মধ্যে। সব সময় একটা প্রটেকশান থাকত, চাকরবাকর, দারোয়ান-পাহারাদারের অভাব ছিল না। পেনসিলে লেখা একটা চিরকুটও খোয়া যাবার ভয় ছিল না। ওরই মধ্যে অবশ্য বড় বড় চুরিও হয়েছে। আমার বেলাতেই হয়েছিল একবার, তবে চোর ধরা পড়ে গিয়েছিল। সেটা হল তোর ম্যাগ্‌নেটিক রিঅ্যাকশান্ নিয়ে। চোর ঘরে পা দিতেই চারপাশে ঘণ্টি বেজে উঠল অটোমেটিক। চোর ধরা পড়ে গেল।”

মামা থামলেন একটু। আমরা রীতিমতো রোমাঞ্চ বোধ করতে লাগলাম।

বিজন বলল, “মামা, আমাদের শত্রু কে?”

মামা চশমাটা খুলে ফেললেন। বললেন, “তার আগে প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের যে শত্রু আছে তার প্রমাণ কী?”

ঠিক। মনগড়া শত্রুর কোনও মানেই হয় না। আমাদের যে শত্রু আছে তার প্রমাণ কী? আমাদের চোখের প্রশ্ন যেন মামা বুঝে নিয়ে আবার বললেন, “আমি অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দিতে পারি, গতকাল এখানে যা হয়েছে তার মধ্যে একটা প্ল্যান ছিল!”

বিজন আর কানু আমার দিকে তাকাল। আমি অন্তুর দিকে।

“অকারণে একটা সন্দেহ করা ঠিক নয়—” মামা বললেন। “প্রথমটায় আমিও ভেবেছিলাম এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট, ষাঁড় ঢুকে পড়ে এ-রকমটা করেছে। পরে আমার মনে হল, না—দৈবাৎ এটা হয়নি। একটা ষাঁড় বাইচান্স বাগানে ঢুকে পড়লেই চারপাশে ভূমিকম্প হতে পারে না।”

“ভূমিকম্প?” আমি চমকে উঠে বললাম।

“ওটা কথার কথা, ভূমিকম্প হয়নি, তবে অবস্থাটা ভূমিকম্পের মতন। আমি প্রত্যেকটা খুঁটিনাটির কথা ভেবেছি, কোনটা কোথায় ঠিকরে পড়েছে, কী অবস্থায় পড়েছে, তার মাপজোক করছি, টুকরোর চেহারাগুলো পরীক্ষা করছি। সব দেখেশুনে আমার মনে হচ্ছে এটা ষাঁড়ের কীর্তি নয়, একটা ব্লাস্টিং ঘটানো হয়েছে, মানে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।”

ব্রজ বলল, “মামা, মহাদেওকা ষাঁড় ভীষণ শয়তান।”

“নো নো—” মামা, মাথা নাড়লেন, “ষাঁড় শয়তান হলেও তার পক্ষে আগাগোড়া সব নষ্ট করা সম্ভব নয়। ষাঁড় গবাদি প্রাণী, তার সেন্স আছে। তাছাড়া ষাঁড়ের মাথায়

এত জোর থাকে না—যাতে প্রত্যেকটা জিনিস এ-ভাবে ছিটকে পড়বে। ষাঁড়টা ঢুকিয়ে দিয়ে একটা লোকঠকানো ব্যাপার করা হয়েছে।"

বিজন যেন সবই বুঝল, বুঝেও বলল, "মহাদেবের ষাঁড় ভীষণ পাজি, তার গোঁ ভীষণ মামা, ওর অসাধ্য কিছু নেই।"

মামা বললেন, "ষাঁড়টার মেজাজ খারাপ হবার কোনও কারণ নেই। সন্ধেবেলা তার চোখে এত জ্যোতিই বা ঠিকরোবে কোথা থেকে যে, ওই জন্তুটা বাগানে ঢুকে সব দেখে শুনে এভরিথিং তছনছ করবে?"

যুক্তিটা অকাট্য যেন। আমার অবশ্য মনে হচ্ছিল, মহাদেব হয়তো মামার ওই বিচিত্র গ্যাস-যন্তর দেখেই খেপে গিয়েছিল। এমন বিদঘুটে জিনিস ওর জন্মেও দেখেনি। দেখবেই বা কোথা থেকে! আমরা মানুষ হয়ে যা দেখলাম না, ও জন্তু হয়ে সেটা দেখবে!

মামা হঠাৎ বললেন, "ওই গেনু ছোঁড়া কেন এসেছিল সেদিন? হোয়াই?"

আমরা যেমন চমকে উঠলাম, তেমনি অবাক হয়ে গেলাম। গেনুদা আমাদের সরস্বতী ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল, সেখানে মামার কথাও উঠেছিল। অবশ্য গেনুদা সেদিন মামাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশাই করেছে, আমাদের তা ভাল লাগেনি। মণ্টুদাও ওখানে ছিল গেনুদার সঙ্গে, আমাদের খুব ঠোক্কর মেরেছে, কিন্তু মণ্টুদা আমাদের সঙ্গে ছুটে মামার কাছে আসেনি।

ব্রজ বিস্তারিত করে সব কথা বলল।—মণ্টুদা আর গেনুদা আমাদের ওখানে কখন গিয়েছিল, কী কী কথা বলেছে, কত রকম তামাশা করেছে, গ্যাস-যন্তরটাও তারা দেখে গিয়েছিল।

মামা গভীর মনোযোগে সব শুনলেন। তারপর বললেন, "গেনু ছোঁড়া দেখতে এসেছিল অবস্থাটা কী রকম দাঁড়িয়েছে।"

আমি বললাম, "কিন্তু মামা, যে সময় ষাঁড় ঢোকে তখন তো গেনুদারা আমাদের ওখানে—সরস্বতী ঠাকুরের কাছে।"

"ওটাই তো চালাকি! একে বলে অ্যালিবি—বুঝলি। সোজা কথায়—চোখে ধুলো। মানে চুরি যখন এ বাড়িতে হচ্ছে, চোর তখন বাজারে রসগোল্লা খাচ্ছে—এ-রকম একটা প্রমাণ রাখতে পারলে কে ধরে! যাক গে, গেনু হয়তো দোষী নয়—কিন্তু সে শত্রুপক্ষের লোক, খোঁজখবর রাখে, ইন্‌ফরমেশান দিচ্ছে।"

"শত্রু কে?" কানু জিজ্ঞাসা করল।

"ঠিক জানি না। গেনুটেনুর মাথায় অত বুদ্ধি নেই যে শত্রুতা করবে। ওদের বিদ্যে ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত। আমার মনে হচ্ছে, এই শত্রুতা করছে সাহেবরা। তাদের পাড়ায় পাড়ায় গ্যাস জ্বলবে না—জ্বলবে ইন্ডিয়ানদের পাড়ায়, এটাতেই তাদের মানে লাগছে। সাহেবগুলোকে এই জন্যই আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। হতচ্ছাড়া পাজির দল।"

মামার কথায় আমাদের হঠাৎ যেন বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল, তবে গেনুদাকে আমরা তখনও তেমন দোষী ভাবতে পারছিলাম না। আবার যখন মণ্টুদা আর গেনুদার

কথাবার্তা, তাদের রসিকতা, তামাশা মনে পড়ছিল তখন কেমন সন্দেহ হচ্ছিল।

ব্রজ বলল, "আমাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলায় জেতার জন্যে যারা ঘুগনির সঙ্গে সিদ্ধি মিশিয়ে দেয়, সেই মণ্টুদারা সব পারে। এটাও গেনুদারা পারে, কেননা—মামা আমাদের, তাদের নয়।"

মামা বললেন, "ষাঁড় নিমিত্ত মাত্র, ওটা একটা লোকঠকানো ব্যাপার। আসলে আমার সন্দেহ হচ্ছে, খুব হালকা শব্দের একটা বোমা ওই জায়গায় রাখা হয়েছিল। শব্দটা আমরা ঠিক শুনতে পাইনি, তবে ওরা ওদের উদ্দেশ্য সফল করেছে। বোমাটা কায়দার বটে।"

আমরা নীরব। এত বড় একটা বোমার ষড়যন্ত্র ঘটে গেছে জেনে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

শেষে মামা বললেন, "যাই হোক বয়েজ, আমি ওআন্ডার মুখার্জি, এসব ছোটখাটো ব্যাপারে আমার ভয় হয় না, আমি হতাশ হই না। গ্যাস আমি করবই। আমি যে গ্যাসবাতি জ্বালাতে পারি তার একটা প্রমাণ তোদের এবারে দেখাই।"

মামা এবার উঠে তাঁবুর মধ্যে অন্য ঘরে ঢুকে গেলেন। তারপর তিন-চারটে বিচিত্র কায়দার যন্ত্র আনলেন, পাইপ আনলেন, সেগুলো সাজালেন। যন্ত্রগুলো নানা ধাঁচের—কোনওটা ফোটো তোলার যন্ত্রের মতন দেখতে, কোনওটা রাস্তায় যে বায়োস্কোপ দেখি ফোকরে চোখ দিয়ে—সেই রকম। একটা কার্বাইডের বাতির চোঙের মতন লম্বা চোঙ আনলেন, ভাঙা পেট্রম্যাক্স বাতির একটা অংশ এল, মামা নানা রকম টুকটাক কাজ সারলেন, তারপর পাইপের নল খুলে দেশলাই জ্বালতেই পেট্রম্যাক্সের ম্যান্টেলে ধব্ করে আলো জ্বলে উঠল। আলোটা লালচে।

আমরা সবাই একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠলাম। মামা বললেন, "না না, হাততালির কিছু নয়, এটা হল অন্য প্রসেস, কেরোসিন প্রসেস। আমার গ্যাস তো জ্বালানি গ্যাস। তবে ব্যাপারটা এই রকমই। ওই যে ম্যান্টেল, ওটাই হল আসল, শুধু বার্নার জ্বালিয়ে লাভ নেই, তাতে তেমন আলো হয় না, ইন্‌ক্যানডেসেন্ট ম্যান্টেল, থোরিয়াম দিয়ে এই সুতির ম্যান্টেল তৈরি করতে হয়। এখানে আমরা ম্যান্টেল পাব কোথায়?"

সমস্যাটা আমরা বুঝলাম না, কিন্তু রীতিমতো ভাবনায় পড়লাম।

মামা বললেন, "পরের ব্যাপার পরে—আপাতত আমার হাতে ক'টা কাজ রয়েছে। প্রথম হল, আমি একটা বাড়ি ভাড়া করতে চাই ফাঁকায়, মোটামুটি মাথার ওপর চাল থাকলেই হল, সেখানে আমার যন্ত্র বসাব। দু'-নম্বর হল, একটা নেপালি দরোয়ান চাই, গার্ড। তিন নম্বর হল, তোদের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলতে হবে, আইনের ব্যাপার আছে। নাম্বার ফোর হল, তোমরা কারও কাছে কোনও কথা কোনও দিন বলবে না। আর পাঁচ নম্বর হল, গেনুটেনুর সঙ্গে মিশবে না।"

দেশলাই জ্বালাতেই...ধব্ করে আলো জ্বলে উঠল।

৭

কয়েকটা দিন বাড়ির খোঁজে কাটল। আমাদের পাড়ার বেশির ভাগটাই ছিল রেলের কোয়ার্টার, অল্প কিছু এমনি বাড়ি। ভাড়া বাড়ি প্রায় ছিলই না। বাজার পাড়ায় দু-একটা গুদোম গোছের বাড়ি পড়ে ছিল, আর ছিল জোড়া-ফটকের দিকে তিন-চারটে বড় বড় বাড়ি। কোনওটাই মামার পছন্দ নয়, আমাদেরও ভাল লাগল না। কাছাকাছি একটা বাড়ি না হলে কি হয়? মামার অসুবিধে, আমাদেরও ভীষণ অসুবিধে।

শেষ পর্যন্ত ব্রজর মাথা থেকে একটা বুদ্ধি বেরোল। ব্রজ বলল, "মামা, আমরা রুটিসাহেবের পুরনো কারখানাটা নিতে পারি।"

রুটিসাহেব মানে আমাদের পেশরান্‌জিসাহেব। পেশরান্‌জিসাহেব তার পাউরুটি বিস্কুটের প্রথম কারখানা খুলেছিল আমাদের পাড়ার দিকেই খোলার চালের একটা ছোটখাটো বাড়িতে। তার একদিকে ঢালু মাঠ, অন্যদিকে মল্লিকডাক্তারদের বাগান। কারখানার অবস্থা খানিকটা ভাল হয়ে যাবার পর রুটিসাহেব সে-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে। বাড়িটা তারপর থেকে বরাবর খালিই পড়ে ছিল, ও-বাড়ির যা চেহারা কেউ আর ওদিকে মাড়াত না।

ব্রজর কথাটায় আমরা তেমন পাত্তা দিইনি প্রথমে, কিন্তু মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "চল, আজ বিকেলে বাড়িটা দেখে আসি।"

বিকেলে মামাকে নিয়ে আমরা বাড়ি দেখতে গেলাম। আমাদের পাড়ার গায়ে গায়ে বাড়ি, অন্তুদের বাড়ির বেশ কাছাকাছি। বটতলার পর একটা সরু রাস্তা, নুড়ি পাথরের, তার ওপাশে রুটির কারখানা। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে সোজা মাঠে নেমে গেছে, মাঠের একদিকে ছোট রেলের লাইন, অন্যপাশে ময়লা পোড়াবার চুল্লি। দু-চারটে গাছ বাড়ি ঘেঁষে। বাড়িটা ছোট, মাথার ওপরকার খোলার চালে ঢেউ খেলে গেছে, পাঁচিলের গায়ে মস্ত কাঠচাঁপা গাছ। বাইরে থেকে বাড়িটা দেখে মামা অনেকক্ষণ কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, "কার বাড়ি?"

কানু বললেন, "হাকিমবাবুর।"

মামা বললেন, "ঠিক আছে; কথা বলতে হয়।"

ওই বাড়িটাই মামা ভাড়া করে ফেললেন। নগদ দশ টাকা ভাড়া।

বাড়িটা ভাড়া করার পর মামা বাড়ি সারাই নিয়ে পড়লেন। প্রথমে রুটি কারখানার যত জঞ্জাল সাফসুফ করা হল, মাথার ওপরের চাল নুয়ে এসেছে অনেক জায়গায়, তার মেরামতি হতে লাগল, দেয়ালগুলোয় উই ধরেছিল, উই পরিষ্কার করে দেয়ালের আধখানা আলকাতরা লাগানো হল। যেমন গন্ধ তেমনি ঝাঁঝ। বাড়িটায় দুটো মাত্র ঘর, ঘরের গা ঘেঁষে ঢাকা বারান্দা। বারান্দার ডান পাশে একটা ছোট্ট চালা। চালাটা ভেঙে পড়েছিল। মামা সেটাও দাঁড় করিয়ে নিলেন। জানলার ওপর জাল আটকানো হল, আর বাইরের বারান্দার আগাগোড়া ঢেকে দেওয়া হল তারের পাতলা জাল দিয়ে। কানু বলল যে, তার খরগোশের বাক্সে এইরকম জাল ছিল।

কথাটা মামার কানে গিয়েছিল, বললেন, "এটা তোর খরগোশের বাক্স নয়, এ হল গ্যাস রিসার্চ সেন্টার।"

কানু বেচারা মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, "হ্যাঁ মামা, গ্যাস গবেষণা..." কথাটা আর শেষ করতে পারল না। মনে হল, গবেষণার পাশাপাশি একটা বসাবার মতন কথা সে খুঁজে পেল না।

বাড়িটাকে যে এত জালটাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হল, তার কারণ সাবধানতা; আমরা সেটা জানতাম। মামাও আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, শত্রুকে কখনও অবহেলা করতে নেই, ছোট করে দেখতে নেই। আমাদের শত্রু যে কে বা কারা তা জানা না থাকলেও এবার সকলেই বেশ সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম। যেখানে সেখানে দুমদাম কথা বলতাম না, গেনুদাদের সঙ্গে চোখাচোখি হলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতাম। বিজন রবার্ট ব্লেক সিরিজের অনেকগুলো গোয়েন্দা বই পড়েছিল বলে সে আমাদের রবার্ট ব্লেক হয়ে গেল, আর ব্রজ হল ব্লেকসাহেবের অ্যাসিস্টেন্ট স্মিথ। অবশ্য ব্রজ স্মিথটিথ বুঝত না। না বোঝার দরুন সে আমাদের গ্যাস গবেষণা বাড়ির, বা বলা যায়—গ্যাস গবেষণা ভবনের কাছাকাছি যাকেই হাঁটাচলা করতে দেখত, তার ওপরই সন্দেহ করত। একদিন তো রেলের লোয়ার প্রাইমারি স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই গোবিন্দবাবুকে বিকট শব্দ করে ভয় দেখিয়ে প্রায় অজ্ঞান করে ফেলেছিল। দোষ অবশ্য ব্রজর ততটা নয়, সন্ধেবেলায় অন্ধকারে গোবিন্দবাবু মাথায় বাঁদরটুপি পরে ওই রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, ব্রজ ভাল মতন ঠাওর করতে পারেনি। সামান্য ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ব্রজ কাউকেই বাদ দিত না, মোমফালিঅলা, ঘুগনিঅলা, কেদার ধোপা, মদন মালী—সকলকেই রীতিমতো নজরে রাখত।

মামা বাড়িটার মেরামতি শেষ করে চারদিকে জাল দিয়ে ঘিরে ফেলার পর অন্য আর পাঁচটা কাজে হাত দিলেন। তাঁর তাঁবু থেকে সেই সব বিচিত্র যন্ত্রপাতি আসতে লাগল, ইট আর মাটি দিয়ে দুটো বড় বড় যজ্ঞের উনুন তৈরি হল বারান্দার কোণ ঘেঁষে টিনের শেডের তলায়, ড্রাম এল বড় বড়, মাটির জালা এল, কেরোসিনের টিন, আরও কত কী। দুটো ঘরের একটার দরজার ওপর মামা লাল রং দিয়ে লিখে দিলেন—'প্রোটেকটেড্ প্লেস: নো অ্যাডমিশান', আর অন্য ঘরটার মাথায় লেখা থাকল: 'ল্যাবরেটরি'। প্রথম ঘরটায় মামা তাঁর গ্যাস তৈরির যন্ত্রপাতি সাজাতে লাগলেন, আর দ্বিতীয় ঘরটায় থাকল আর পাঁচ রকমের সরঞ্জাম, কাগজপত্র, টেবিল চেয়ার।

বীর বাহাদুর নামে একটা নেপালি পাওয়া গিয়েছিল, বুড়ো গোছের। অন্তুর বাবা—নৃপেন জ্যাঠামশাইয়ের অফিসে কাজ করত সে একসময়ে। তাকে মামা চৌকিদার করে রেখে দিলেন। ব্রজ কোথা থেকে একটা শেয়াল টাইপের খেঁকি কুকুর জুটিয়ে আনল; বলল, "মামা, এই কুত্তা দিনরাত ওয়াচ্ দেবে; খুব চেল্লায়।"

নতুন করে গ্যাস গবেষণার সব রকম ব্যবস্থা করতে করতে শীত প্রায় যাই যাই করছিল। আমাদের ওদিকে শীতটা সহজে যেত না, পাকা কাবাডি খেলুড়ের মতন দম টেনে একবার এদিক একবার ওদিক দৌড়োদৌড়ি করত।

কাঁচা কাজে আর হাত দেবেন না বলেই মামা এবার একটু সময় নিয়েছিলেন,

চারদিক বেঁধেবুধে পাকা কাজে হাত দিলেন এবার। গ্যাস যন্তর চালু করার আগের দিন আমাদের একটা সিক্রেট মিটিং হল, মামাই মিটিং ডেকেছিলেন সন্ধেবেলায়।

আমরা সবাই ঠিক সময়ে যথাস্থানে হাজির হলাম। মামার অফিসঘরে মিটিং। মিটিংয়ের আগে বাড়িটার চারদিকে একবার টহল মেরে এল বিজন আর ব্রজ। নেপালি চৌকিদার বীর বাহাদুর থাকল সদরে দাঁড়িয়ে। আর ব্রজর সেই খেঁকি কুকুর—যার নাম দিয়েছিল ব্রজ 'টাইগার'—সেই টাইগার থাকল বারান্দার নীচে দড়ি-বাঁধা। অনবরত সে চেঁচাতে লাগল।

পেট্রম্যাক্স নয়, ডিজ্ ল্যাম্প নয়—একেবারে মিটমিটে লণ্ঠন জ্বালিয়ে আমাদের মিটিং বসল, কেননা ওটা সিক্রেট মিটিং।

মামা বললেন, "বয়েজ, আজকের মিটিংয়ে তোমাদের কাছে আমি খোলাখুলি ক'টা কথা বলতে চাই।"

আমরা হাত-পা টান করে বসলাম; কান খাড়া থাকল। ব্যাপারটা যে বেশ গুরুগম্ভীর হতে চলেছে এটা বোঝাই যাচ্ছিল।

মামা তাঁর হাতের চুরুট দাঁতে চেপে ধরে সেটা ধরিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, "কোনও বড় কাজ সহজে হয় না, বাধা আসে। আমার অনেক বয়েস হয়েছে, নানা দেশে নানা রকম কাজ আমি করেছি; আমি জানি বাধা-বিপত্তি আসবেই। কাজেই যা হয়েছে তা মনে করে বসে থাকলে চলবে না। আমরা তা থেকে শিক্ষা নিয়েছি আর সেই শিক্ষা মতন কাজ করেছি। শিক্ষাটা কী?"

হুট করে নন্তু বলল, "সাবধান হওয়া।"

মাথা হেলিয়ে মামা বললেন, "ইয়েস। এসব কাজে কেয়ারফুল হওয়া উচিত; যা করার গোপনে করা দরকার। তা আমরা এবার সেটা যথাসাধ্য করেছি। ঠিক কি না?"

আমরা সকলে মাথা নেড়ে বললাম, "ঠিক ঠিক।"

মামা আচমকা বললেন, "সেই গেনুর খবর কী?"

ব্রজ কিছু বলতে যাচ্ছিল, বিজন ব্রজকে থামিয়ে দিল, যেন রবার্ট ব্লেক সামনে থাকতে স্মিথের কিছু বলা মানায় না। বিজন বলল, "গেনুদার চিকেন হয়েছে।"

"কী?"

"চিকেন-পক্স।"

"ক-দিন হল ভুগছে?"

"চার-পাঁচ দিন।"

"তার আগে ওই গেনু কোনও খোঁজখবর করেছে?"

"করেছিল।"

মামা সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকলেন। "কী খোঁজখবর?"

"এই বাড়িটা ভাড়া নেবার কথা জিজ্ঞেস করছিল। আমি বলেছি, বাড়িটা মামা ভাড়া নিয়েছেন কেক বিস্কুট তৈরি করাবেন বলে...।"

মামা ব্রজর দিকে তাকালেন। যেন আরও বিস্তারিত খবর চান।

ব্রজ প্রথমটায় একটু তোতলা হয়ে গেল, তারপর বলল, "গেনুদাকে ডর করবেন

না মামা, টাইগারকে রেডি করে রেখেছি। গেনুদা ঘেঁষতে পারবে না। চেচাক বেমারি হয়েছে।”

মামা যেন তেমন কিছু ভরসা পাচ্ছিলেন না। বললেন, “গেনুর ব্যাপারটা বড় নয়—তার পেছনে কেউ থাকতে পারে। সেদিন আমি একটা লোককে দেখলাম, এই বাড়িটার আশেপাশে ঘুরঘুর করছে।”

বিজন চমকে উঠে বলল, “কে লোক? কেমন দেখতে মামা?”

মামা লোকটার যা বর্ণনা দিলেন তাতে মনে হল, জগা পাগলা। জগা পাগলা মাঝে মাঝে খাকি হাফ প্যান্ট, গলাবন্ধ রেলের কোট, জুতোমোজা পরে এক জোড়া লাল-সবুজ ফ্ল্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সিগন্যাল দেয়, হুইসল বাজায়। জগা পাগলা লাল ফ্ল্যাগ তুলে রাখলে তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া বড় ঝঞ্ঝাটের। ছেলেবেলায় আমরা তো তাকে ভয়ই পেতাম। লোকে বলে, গাঁজা খেয়ে খেয়ে জগা পাগলার মাথার ওই অবস্থা। এখনও জগা পাগলা গাঁজা খায়।

কানু বলল, “মামা, ও-হল জগা পাগলা।”

মামা বললেন, “পাগলা হতে পারে। কিন্তু পাগলাদেরও চোখ কান আছে।”

বিজন বলল, “জগা পাগলার জন্যে আপনি ভাববেন না মামা; আমরা ওকে দেখব।”

মামা এবার অন্য কথা পাড়লেন। বললেন, “আমি একদিন তোমাদের মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে যাব ভেবেছিলাম। শেষে দেখলাম, এখন গিয়ে লাভ নেই। আগে থেকে জানাজানি হয়ে গেলে আমাদের এনিমি ক্যাম্পের সুবিধে হবে। তার চেয়ে গ্যাস এক্সপেরিমেন্টটা আগে সাকসেসফুল হোক, তখন যাব। কী বলো?”

আমরা মাথা নাড়লাম—সেটাই ঠিক।

এবার মামা সরাসরি গ্যাসের কথায় এলেন। বললেন, “কাল সকালে আমার গ্যাস প্ল্যান্ট চালু করব। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় হাফ পাস্ট সেভেনে। পাঁজি দেখে সময়টা ঠিক করে নিয়েছি। অবশ্য পাঁজিটাজি আমি মানি না। ডলি বেটি জোর করে আমায় পাঁজি ধরিয়ে দিল।”

আমাদের মনে হল, ডলিদি কাজটা ভালই করেছে। এমনিতে তো ডলিদি, জ্যাঠাইমা—এরা মামার এই বাড়ি ভাড়া নেওয়া, যন্ত্রপাতি বসানো এ-সব নিয়ে মুখ টিপে হাসে, আমাদের খ্যাপায়, একটু-আধটু রাগটাগও করে মামার ওপর। এখন অন্তত ডলিদি কাজটা ভালই করেছে।

মামা হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা ফাইল তুলে নিলেন, পাতা ওলটালেন পরপর, শেষে বললেন, “আমার হিসেব মতন এবার গ্যাস হতে লাগবে ছত্রিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা, মানে মেরে কেটে দেড় থেকে দু'দিন। আগের বার খুব ছোট করে করেছিলাম বলে কম টাইম নিয়েছিলাম, এবার খানিকটা বড় করে করছি, প্রসেস সামান্য পালটে দিয়েছি।...যাই হোক, এই আটচল্লিশ ঘণ্টা খুব সাবধানে থাকতে হবে। কোনও রকম অবস্ট্রাকশান চলবে না, বাইরের কেউ ভেতরে ঢুকতে পারবে না, বুঝলে?”

বাইরের কেউ বলতে মামা কাকে বোঝাচ্ছেন বুঝতে পারলাম না। বাইরের কেউ এ-বাড়িতে তো ঢোকে না। মিস্ত্রি-মজুররা এক সময়ে ঢুকত, তাদের কাজ শেষ হবার পর আসে না। আসার মধ্যে কিষণ বলে একটা বুড়ো আসে রোজ গোবরের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে, তার কাজ হল যেখানে যত গোবর পাবে নিয়ে এসে গ্যাস গবেষণার বাড়িতে জমা করবে। তা হলে?

টুলু বলল, "মামা, আমরা আসব না?"

মামা বললেন, "তোমরা? হ্যাঁ, তোমরা আসবে। তোমাদের আসতে হবে বলে আমি ডিউটি চার্ট করেছি।" বলে মামা ফাইল হাতড়ে একটা আলগা কাগজ বের করলেন।

ডিউটি চার্ট আমরা বুঝতাম। স্কাউট হবার দরুন নানা ধরনের ছোট বড় ডিউটি আমরা এ-শহরে দিয়েছি।

কাগজটা দেখে দেখে মামা বললেন, "কাল সকাল থেকে তোমাদের ডিউটি পড়ছে। কাল রবিবার। তাই না?"

আমরা মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"রবিবার দেখেই আমি দিন ঠিক করেছি," মামা বললেন, "কাল সকাল সাতটায় কানু আর টুলু চলে আসবে। বারোটায় তোমরা খেতে যাবে, তার আগে আসবে অন্তু আর ব্রজ। অন্তু আর ব্রজ থাকবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। নেক্সট ডিউটি বিজন আর মানস...।" মামা চার-পাঁচ ঘণ্টা করে আমাদের সকলের ডিউটি ভাগ করে দিলেন। রাত ন'টার পর কাগজে-কলমে আমাদের কারও ডিউটি নেই। রাত্রিতে মামা নিজে থাকবেন, আর থাকবে বীর বাহাদুর, টাইগার তো আছেই। আমার, বাসুর আর হারুর ডিউটিটা হল বেখাপ্পা রকমের। হারুর ডিউটি পড়ল সাইকেলে করে বাড়ির চারপাশে ওয়াচ রাখার, বাসুকে মামা গোবরের সাপ্লাই ও স্টক দেখার চার্জ দিলেন, আর আমায় দিলেন গ্যাস প্রেসার দেখার কাজ। সেটা কী বস্তু বুঝলাম না। মামা বললেন, বুঝিয়ে দেবেন।

বিজন বলল, "মামা, কাল আমাদের সকলের ছুটি—আমরা সারা দিনরাতই থাকতে পারি।"

পরের দিন সাত-সকালে আমরা গ্যাস গবেষণা ভবনে গিয়ে হাজির। সকালের ডিউটি যারই হোক, আমাদের যেতে কোনও বাধা ছিল না; যার যার নিজের ডিউটিতে কামাই না করলেই হল। মামা সে ব্যাপারে কড়া হুকুম দিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য হুকুমের কথাই ওঠে না, আমরা তো নিজের গরজেই চব্বিশ ঘণ্টা হাজির থাকতে রাজি।

আমার পৌঁছতে দু-পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছিল। গিয়ে দেখি, অন্তু-হারু-কানু-নন্তু-বিজন সব হাজির। ব্রজ কাঠচাঁপা গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে, বাইরেটাও নজর রাখছে। ব্রজর টাইগার গাছতলায়, বীর বাহাদুর সদর আগলে দাঁড়িয়ে। টিনের চালার তলায় সেই যে পাশাপাশি দুটো যজ্ঞের চৌকোনা উনুন পাতা

জগা পাগলা মাঝে মাঝে খাকি হাফ প্যান্ট, গলাবন্ধ রেলের কোট, জুতো-মোজা পরে এক জোড়া লাল-সবুজ ফ্ল্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

হয়েছিল—জোড়া উনুন—তার পেছনের দিকে একটা বাঁকা চোঙা। সেখান থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, কালো ধোঁয়া। উনুন ধরানো হয়ে গিয়েছিল। উনুনের আর-এক পাশ থেকে একটা মোটা নল এসেছে বারান্দায়, বারান্দার একপাশে একটা বড় ড্রাম, ড্রামের মাথাটা ঢাকা, গায়ের পাশ দিয়ে একটা নল বেরিয়ে এসেছে। উনুন আর ড্রাম দু'দিকের দুটো নল পাশাপাশি মামার যন্ত্রঘরে চলে গেছে। বারান্দার ড্রামটায় যে গোবর পচানো হয়েছে বোঝাই যাচ্ছিল—গন্ধ উঠছিল খুব, মাছি জুটে গিয়েছে।

যন্ত্রঘরে মামা কাজকর্ম তদারকি করছিলেন। আমরা সকলেই প্রায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। ঘরের ভেতরে পা দেবার মতন জায়গা ছিল না। বাস রে বাস—কত রকম জিনিসই জোগাড় করেছেন মামা! একটা ঘরে এত জিনিস জমা করা যায় আমরা জানতাম না। মেঝে থেকে মাথা পর্যন্ত নানা ছাঁদের যন্ত্র। কেরোসিনের টিন, মাটির জালা, রবারের নলটল তো আছেই—তা বাদেও কত কী আছে: বিরাট কচ্ছপের মতন একটা পা-অলা মুখবন্ধ ড্রাম, হাপরের মতন যন্ত্র, কুমিরের বাচ্চার মতন রবারের একটা মস্ত ব্লাডার, সাইকেলের প্যাডেল আর চেন, তারের জালির মধ্যে ইংরেজি 'জেড' অক্ষরের মতন অজস্র নল, ওজন যন্ত্রের মতন দেখতে কাঁটাওলা যন্ত্র, এলার্ম ঘড়ির মতন ঘড়ি এক জোড়া, আরও কত কী। মামা একটা সিঁড়িওলা টুলের ওপরে বসে কাজ করছিলেন, গায়ে আলখাল্লা, পকেটে প্লাস, রেঞ্জ, হাতে রবারের দস্তানা, পায়ে মোটা মোটা কেডস জুতো। মামার চোখের চশমা ঝুলে পড়েছে।

টুলের ওপর থেকে নেমে এলেন মামা। মুখ বেশ হাসিখুশি।

"কী রে, কেমন দেখছিস?" মামা জিজ্ঞেস করলেন।

আমরা আর কী দেখব! চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে এই আশ্চর্য কলকব্জা দেখছিলাম। মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। সহজ একটা জ্যামিতি মাথায় ঢুকোতে যাদের ঘিলু শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়—তারা এসব কী বুঝবে!

মামা আমাকে ইশারায় ডাকলেন। ডেকে সেই ওজন যন্ত্র আর ঘড়ির মতন জিনিসটা দেখিয়ে দিলেন। বললেন, "দেখে রাখ, ও দুটো গ্যাস প্রেসার মাপার যন্ত্র। গ্যাস কতটা জমছে বুঝতে পারবি।"

মামা ঘরের বাইরে এলেন।

কানু ফিসফিস করে বলল, "ঘরে একটা চৌবাচ্চা থাকলে ভাল হত।"

"কেন?" বিজন জিজ্ঞেস করল।

"গ্যাস বেশি হয়ে গেলে আগুন লেগে যেতে পারে।"

কথাটা অন্তু শুনতে পেয়েছিল। ধমক দিয়ে বলল, "বাজে বকিস না, যত অলুক্ষণে কথা।"

বারান্দার চারদিকে তাকিয়ে মামা এবার তাঁর অফিসঘরে ঢুকলেন। উঠোনে টাইগারটা ভয়ংকর চেঁচাচ্ছিল, ছোটাছুটি করছিল। ব্রজ কাঠচাঁপা গাছ থেকে নেমে এসেছে। জ্বলজ্বলে রোদ বাইরের উঠোনে।

মামা অফিসঘরে ঢুকলেন। আমরাও তাঁর পিছু পিছু ঢুকে পড়লাম। ছোট টেবিলের ওপর চার্ট কাগজ, বাঁধানো খাতা পড়ে ছিল। মামা লাল-নীল পেনসিল তুলে নিয়ে চার্ট

কাগজে বড় বড় ফোঁটা দিলেন কয়েকটা, খাতায় কী লিখলেন, তারপর নিজের ইজিচেয়ারে আরাম করে বসলেন। মামার যে খুবই খাটুনি যাচ্ছে আমরা বুঝতে পারছিলাম। মাথার খাটুনি তো আছেই, তার ওপর এইসব যন্ত্রপাতি তৈরির খাটুনি। কামারশালার হরিমিস্ত্রিকে আনিয়ে মামা কম কাজ করিয়েছেন! এই বয়েসে এত পরিশ্রম করা সহজ নয়।

ঘরে বসবার জায়গা কম বলে আমরা গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। একটু গরম গরম লাগছিল। লাগারই কথা। ঘরে এত জিনিসপত্র, পাশের ঘরে গ্যাস হচ্ছে, বাইরে জোড়া উনুন জ্বলছে দাউ দাউ করে, শীতও আর সকালের দিকে অতটা নেই, খানিকটা গরম তো লাগবেই।

চেয়ারে বসে মামা এবার আরাম করে একটা নতুন চুরুট ধরিয়ে চোখ বুজে বসে থাকলেন।

অন্তু আমার কানে কানে বলল, "মামা রাত্তিরে এক ঘণ্টা ঘুমোন।"

আমি কিছু বলার আগেই চোখ খুলে মামা বললেন, "কাল সন্ধে নাগাদ বোধ হয় বাতি জ্বালাতে পারব।"

কাল সন্ধে পর্যন্ত আমাদের ধৈর্য ধারণ সোজা কথা নয়, কিন্তু উপায় তো নেই।

বাইরে অনেকগুলো কাক ডাকতে শুরু করেছিল। দিনের বেলায় কাক ডাকবে এ আর নতুন কথা কী, কিন্তু একগাদা কাক একসঙ্গে কা কা করলে বড় কানে লাগে। কে জানে কাকগুলোও আমাদের গ্যাস তৈরির খবর পেয়ে গেল কি না! টাইগারটাও বেজায় চেঁচাচ্ছিল।

হঠাৎ মামা বললেন, "কাল যে বাতিটা প্রথমে জ্বালাব, তোদের এখন সেটা দেখাই।" বলে মামা অন্তুকে ডাকলেন।

অন্তু কাছে যাবার আগেই বললেন, "ওই যে ওটা—নিয়ে আয়।"

ঘরের কোণ থেকে অন্তু একটা কাপড়ে ঢাকা জিনিস নিয়ে এসে মামার পাশে রাখল। অন্তু যেটা আনল সেটা আমরা আগে দেখিনি, মামা দেখাননি। দেখে মনে হল, এ যেন কোনও ম্যাজিকের জিনিস। কালচে কাপড় দিয়ে ঢাকা। মামা কাপড়টা সরিয়ে নিলেন। আমাদের চোখের পাতা আর পড়ে না।

লণ্ঠন, টেবিল-বাতি, ডিজল্যাম্প, মোমদান, পেট্রম্যাক্স, ডে-লাইট, কার্বাইডের বাতি আমরা দেখেছি, কিন্তু এমন বাতি আর দেখিনি। এ এক অদ্ভুত বাতি। কার্বাইডের বাতির মতন নীচের দিকে একটা খোল; বেশ পেটমোটা খোল, তার মাঝখান দিয়ে সরু নল উঠে গেছে, হাত তিনেক লম্বা, নলের মুখের ওপর গোল করে তারের জালতি, খাঁচার মতন দেখাচ্ছিল, জালের গায়ে অভ্রের পাত, পেট্রম্যাক্স বাতির ম্যান্টেলের মতন একটা ম্যান্টেল ঝুলছিল ওপর থেকে। বাতির ওপরের দিকটা তেমন কিছু জটিল নয়, কিন্তু নীচের খোলের দিকটায় বেশ কয়েকটা টুকিটাকি রয়েছে। পেট্রম্যাক্স বাতির গায়ে যেমন থাকে সেই রকম, তার চেয়েও বাড়তি কিছু।

মামা বললেন, "এই বাতিটা একটু আলাদাভাবে তৈরি। তোদের রাস্তায় বাতি এরকম হবে না। সেটা হবে সিম্পল্। এটা আমায় অন্যভাবে করতে হয়েছে। গ্যাসটা

নীচে এসে জমবে, ওই নল দিয়ে। যদি গ্যাসটা ভারী হয়ে যায়, ওপরে উঠতে চাইবে না, তখন একটু পাম্প করে দিতে হবে। সমানভাবে গ্যাস না গেলে বাতি কখনও নিবে আসবে, কখনও জোরে জ্বলবে। সেটা কনট্রোল করার জন্যে ওই চাবিটা, ওটা বাঁয়ে ডানে ঘুরিয়ে গ্যাস কনট্রোল করা যাবে। আর ওই যে কাঁটা দেখছিস—ওটা গ্যাসের প্রেসার মাপার।"

মামা আরও যেন কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় বাইরে বীর বাহাদুরের চেঁচামেচি আর টাইগারের বিকট চিৎকার শুনে আমরা কেমন থতমত খেয়ে গেলাম। বিজন আর ব্রজ—আমাদের রবার্ট ব্লেক আর স্মিথ লাফ মেরে বারান্দা দিয়ে ছুটল। আমরাও পেছন পেছন ছুটলাম।

বাইরে এসে দেখি, বিচ্ছিরি এক কাণ্ড হয়েছে। পাড়ার যত কাক আমাদের গ্যাস ভবনে এসে জুটেছে। টিনের চালার ওপর কাক, কাঠচাঁপা গাছের ডালে ডালে কাক, উঠোনে কাক। কাকে কাকে ভরে গেছে, আর অত কাক একসঙ্গে কা কা করে সমানে চেঁচাচ্ছে। সেই ডাক শুনে শহরের যত কাক সব যেন ছুটে আসছে।

ব্যাপারটা বোঝবার আগেই বীর বাহাদুর একটা মরা কাক দেখাল। টিনের চালার তলায় উনুনের কাছাকাছি পড়ে আছে। কাকটা কেউ ফেলে গেছে, না কি টাইগার তাকে মেরেছে, কিছুই বোঝা গেল না। দেখতে দেখতে সব কালো হয়ে যাচ্ছিল। টিনের চালা কালো, পাঁচিল কালো, কাঠচাঁপা গাছও কালো। উঠোনেও অজস্র কাক লাফাচ্ছে।

ব্রজ আর বিজন লাঠি নিয়ে কাক তাড়া করতে উঠোনে নেমেছিল। পালিয়ে এল। আমরাও আর উঠোনে নামলুম না। কাকের ঠোক্কর বড় সাংঘাতিক। বীর বাহাদুরও পালিয়ে এসেছে। শুধু টাইগার একলা আরও কিছুক্ষণ লড়ে খোলা সদর দিয়ে পালাল।

মামা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, "বুঝতে পেরেছি। এটাও আমাদের শত্রুর কাজ।"

৮

কথায় বলে, একটা কাক মরলে কাকের সভা বসে যায়। কিন্তু সেটা যে কী জিনিস, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের বেলায় যা হয়েছিল তা যেন আরও বেশি। বোধ হয় গোটা শহরের কাক এসে জড়ো হয়েছিল গ্যাস গবেষণা ভবনে। আর কী তাদের কা কা চেঁচানি! সারা উঠোনময় কাক; গাছে, পাঁচিলে, বাড়ির মাথায়। কাকে কাকে কালো হয়ে গিয়েছিল বাড়িটা। আমরা বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, অত কাক দেখে দেখে ঘেন্নায় গা গুলিয়ে উঠছিল। দুপুর পর্যন্ত কেউ আর উঠোনে নামতে পারলাম না। মল্লিকদের বাগান থেকে মালী এসেছিল ছুটে, আরও পাঁচ-সাতজন পাড়ার লোক ব্যাপারটা দেখতে এসে সদর থেকেই পালিয়ে গেল। শেষে নাথু জমাদার তার ছোট ভাইকে সঙ্গে করে এনে মরা কাক সরিয়ে আমাদের বাঁচাল।

বিকেলের দিকে আর একটাও কাক থাকল না।

সারা দিনের এই ধকল আমাদের বেশ কাবু করে ফেলেছিল। বাড়ি ফিরে অবেলায় স্নান-খাওয়া সেরে হাই তুলতে তুলতে আবার আমরা গ্যাস গবেষণা ভবনে এলাম। মামা আর বাড়ি যাননি; তাঁর জন্যে বাড়ি থেকে খাবার এসেছিল—খাননি, শুধু দু-পেয়ালা চা খেয়েছেন। মামাকে এত মনমরা, ক্লান্ত, গম্ভীর দেখাচ্ছিল যে আমাদের খুব দুঃখ হচ্ছিল। ঘটনাটা কেমন করে ঘটেছে আমরা জানি না। কেউ বলল, জগা পাগলা রাস্তার মরা কাক পাঁচিল টপকে ছুড়ে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে; এটা নাকি তার প্রতিশোধ। মামা একদিন জগা পাগলাকে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধমক ধামক দিয়েছিলেন; জগা তার শোধ নিয়েছে। কেউ বলল, অত বড় বড় উনুন জ্বলছে, মস্ত মস্ত ড্রাম রয়েছে এদিকে সেদিকে, দু-চারটে কাক বোধ হয় ভেবেছিল, জোর কোনও ভোজ হচ্ছে, সেই লোভে তারা ব্যাপারটা দেখতে এসেছিল, উঠোনে বসেছিল। আমাদের টাইগার তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটাকে মেরে ফেলে। কাক মারা সোজা কথা নয়, সহজও নয়, তবু আমাদের কপাল মন্দ, টাইগার শক্ত কাজটাই ঘটনাচক্রে করে ফেলেছিল। অবশ্য টাইগার যে কাক মেরেছে এটা কেউ দেখেনি—বীর বাহাদুরও চোখে দেখেনি। তবে সে টাইগারের ঘাড়েই দোষটা চাপিয়ে দিল। মামা অবশ্য বার বার বলতে লাগলেন যে, এটা এনিমি ক্যাম্পের কাজ, শত্রুতা করা হয়েছে।

শত্রুতার গন্ধ আছে বলেই হোক, কিংবা এতদূর এসে হটে যাওয়া কাপুরুষতা বলেই হোক—আমরা ঠিক করলাম, গ্যাস গবেষণা ভবনের চারপাশে আমরা দুর্গের মতন পাহারা দেব। একটা সন্ধে আর রাত পাহারা দেওয়া এমন কী কঠিন কাজ?

বিজন স্পষ্টই বলে দিল, সে আর বাড়িই যাবে না আজ।

কানু বলল, সে সন্ধের মধ্যে বাড়ি গিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে চলে আসবে।

ব্রজ কয়েকটা লাঠি, লণ্ঠন আর টর্চের জোগাড় করতে বেরিয়ে গেল।

মামা তাঁর চেয়ারে বসেই থাকলেন বেশির ভাগ সময়। মাঝে মাঝে যন্ত্রঘরে আসছিলেন। ফিরে গিয়ে চার্ট পেপারে নীল পেনসিলের দাগ মারছিলেন।

দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে গেল। যে যার বাড়িতে গিয়ে জানিয়ে এল, আজ আর রাত্রে বাড়ি ফিরবে না। বাড়ির লোক কি সহজে ছাড়ে! অন্তু আর ওআন্ডার মামার কথা বলে তবে ছাড়ান।

শীত কমে গিয়েছিল, তবু একেবারে চলে যায়নি। সন্ধের দিকে তেমন কিছু না করলেও সামান্য রাত থেকে শীত শীত করত। মাঝ রাতে তো শীত পড়বেই। আমরা গরম জামা টামা, জুতোমোজা পরে, মাফলার টাফলার নিয়ে তৈরি হয়েই এসেছিলাম। ব্রজ এনেছিল কম্বল—এক জোড়া ভুট কম্বল, আর হনুমান টুপি। কানু একটা করকরে রেলের ওভারকোট জোগাড় করে এনেছিল। বিজন রাত জাগার জন্যে চা, চিনি, দুধটুধ নিয়ে এসেছিল। সেই সঙ্গে স্পিরিটের শিশি, স্টোভ। গত বছরে আমরা স্কাউট হয়ে রাঁচির কাছে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম, মিশনারি একটা স্কুলে ছিলাম, তখন ভয়ংকর শীত, সেখানে আমাদের ক্যাম্প ফায়ার হয়েছিল। গ্যাস

গবেষণা ভবনে আমরা যেভাবে জাঁকিয়ে বসলাম—তাতে আর একবার ক্যাম্প ফায়ার হচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল।

মামা রাত্রে খানিকটা দুধ খেলেন, আর এক প্লেট হালুয়া। তারপর তাঁর ইজিচেয়ারে শুয়ে চোখ বুজে চুরুট খেতে লাগলেন।

আমরা বারান্দায় বসলাম। লণ্ঠন জ্বালিয়ে। ব্রজ লাঠিটাঠি একপাশে জড়ো করে রাখল। আস্তে আস্তে রাত হতে লাগল। নটার সময় কোতয়ালিতে ঘণ্টা পড়ে। সেই ঘণ্টাও পড়ে গেল। চারদিক খুব অন্ধকার। অমাবস্যা টমাবস্যা হতে পারে আজ। টাইগার সেই যে পালিয়েছে আর আসেনি। বীর বাহাদুরকে রাত্রের মতন ছুটি দিয়ে দিয়েছি আমরা, অন্যদিন সে এই বাড়িতে থাকে, আজ তার থাকার জায়গা নেই, দরকারও নেই।

নন্তু বলেছিল ক্যারাম বোর্ডটা আনতে, আমরা আনিনি। ক্যারাম খেলার মতন মনের অবস্থা তখন নয়। মামাই বা কী ভাববেন!

গোল হয়ে বসে আমরা গল্প করছিলাম। সকালের ব্যাপারটা তখনও কারও মাথায় আসছিল না। সত্যি কি কেউ শত্রুতা করছে আমাদের সঙ্গে? গেনুদা তো বিছানায়। মন্টুদা গিয়েছে কোন বিয়েতে। কে করবে শত্রুতা?

নন্তু বলল, "শত্রুতা করে লাভটাই বা কী হল? আমাদের গ্যাস তৈরি বন্ধ হল?"

কানু বলল, "রাতটা আগে কাটুক! দিনের বেলায় যদি মরা কাক ছুড়ে ফেলতে পেরে থাকে তো রাত্তিরে কী করবে কে জানে!"

বিজন বলল, "কচু করবে। দশটার পর থেকে আমরা থানা চৌকির মতন পাহারা দেব।"

ব্রজ তার কোলে টর্চ নিয়ে বসেছিল। মাঝে মাঝেই টর্চ জ্বেলে চারপাশ ভাল করে দেখে নিচ্ছিল।

শীত বাড়তে লাগল। সেই সঙ্গে মশা। মশা আমাদের ছেঁকে ফেলছিল। আর পচা গোবরের গন্ধ এমন ভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছিল যে, আমরা নাক মুখ কুঁচকে মাঝে মাঝে ওয়াক তুলছিলাম। মাথাও বেশ ধরে গিয়েছিল। কানু আমাদের চাঙ্গা করবার জন্যে রগড় করে বলছিল, 'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে।'

দশটাও বেজে গেল। দশটার পর থানা চৌকির মতন পাহারা। নন্তু আর হারুকে লাঠি আর টর্চ দিয়ে বিজন গ্যাস ভবনের চারপাশে ঘুরে আসতে বলল। প্রথমে কথা হয়েছিল—সদরের দু-দিকে দু-জনে দাঁড়িয়ে থাকবে দু-ঘণ্টা। কিন্তু তাতে কেউ রাজি হল না। ঠাণ্ডার মধ্যে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকলে নির্ঘাত নিউমোনিয়া। তখন ঠিক হল, আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর একবার করে বাইরেটা ঘুরে এলেই চলবে। সেই হিসেবে নন্তু আর হারু বাইরে চক্কর মারতে গেল।

অন্তু মামাকে একবার গলা বাড়িয়ে দেখে নিল। ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে মামা শুয়ে আছেন, হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। এত পরিশ্রম আর চিন্তা কি তাঁর বয়সে সহ্য হয়!

আমরা গোল হয়ে বসে গল্প করতে করতে হাই তুলতে লাগলাম। গোবরের গন্ধ

যেন আরও বিচ্ছিরি হয়ে নাকে লাগছিল। কেন লাগছিল জানি না, সারা দিন ধরে পচা গোবর আরও পচছে বলেই, না কি পচা গোবরের মধ্যে মামা কোনও ওষুধবিষুধ ঢেলে দিয়েছেন বলেই, বোঝা গেল না। এমনও হতে পারে—রাত্রের দিকে বাতাস দিচ্ছিল বলেই আরও গন্ধ উঠছিল। নাক খুলে রাখাই মুশকিল বলে আমরা নাক চাপা দিচ্ছিলাম। যন্ত্রঘরের একদিকে কার্বাইডের একটা বাতি জ্বলছে, তার গন্ধও আসছিল। তা ছাড়া আমাদের মনে হল, কার্বাইড কোনও কাজে লাগবে বলে মামা যেন কোথাও কিছু কার্বাইড ভিজিয়েছেন। তারও গন্ধ আছে।

বিজন এবার চা করতে বসল। এত ঘুম পাচ্ছিল যে, চা না হলে বসে থাকাই দায়। বারান্দার এক কোণে স্টোভ জ্বালিয়ে অনেক কষ্টে চা হল। বাতাসে স্টোভ নিবে যাচ্ছিল।

বারোটাও বেজে গেল। একেবারে চুপচাপ সব। ভীষণ অন্ধকার বাইরে। শীত বেড়ে উঠে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল আমাদের। অন্তু আর কানু চা খেয়ে ভুট কম্বল মুড়ি দিয়ে টর্চ হাতে চক্কর মেরে এল বাইরে থেকে।

আমরা আরও কুঁকড়ে জড়সড় হয়ে বসে। মশা কামড়াচ্ছে অনবরত। এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছিলাম ঘুমে। ব্রজ তখনও পিঠ টান করে বসে। বিজন লম্বা লম্বা হাই তুলছিল। কানু ঘুম তাড়াবার জন্যে একটা গল্প শুরু করল। খানিকটা বলে আর তার গলার স্বর উঠল না। হারু একপাশে হেলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অন্তুরও সেই অবস্থা। নন্তু বমি তোলার মতন করল একবার, তারপর বলল, "গন্ধর জন্যে মরে যাব।"

একটা কি দুটো বেজে গেল। শীত একেবারে হাড়ে গিয়ে লাগছিল। বিজন আমাকে চক্কর মারতে পাঠাল, সঙ্গে ব্রজ। কম্বল মুড়ি দিয়ে টর্চ আর লাঠি হাতে আমরা বাড়ির চারপাশে চক্কর মারতে বেরোলাম। শীতে হাত পা কনকন করছিল। ঘুটঘুটে অন্ধকার, রাস্তার পাশে জামগাছটা যেন একটা বিরাট দৈত্যের মতন দাঁড়িয়ে।

ব্রজ হঠাৎ বলল, "এই গাছটায় গণেশজি থাকে।"

গণেশজির নামটা ব্রজ এমন সময় মনে করিয়ে দিল যে বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। আমাদের বয়স তখন অনেক কম, গণেশ মিশির বলে এক রেলের গার্ড থাকতেন। পায়ের দোষ ছিল। লোকে বলত, ল্যাংড়া গণেশ। একবার গণেশজি রাত্রে মালগাড়ি নিয়ে ফেরার সময় কেমন যেন ভুল করে চলতি মালগাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েন। ভেবেছিলেন, স্টেশন এসে গেছে। কাটা না পড়লেও হাত পা ভেঙে, মাথা ফেটে গণেশজি রেল লাইনের পাশে সারা রাত পড়েছিলেন। সকালে তাঁকে খুঁজে পেয়ে এই রাস্তা দিয়ে যখন খাটিয়া করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন গণেশজি মারা যান। রেলের ছোট হাসপাতালে পৌঁছবার আগেই মারা গিয়েছিলেন গণেশজি। লোকে বলে, গণেশজির অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল, এই জামগাছ তলাতেই তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে যায়। সেই থেকে গণেশজি জামগাছটার ডালপালার মধ্যে কোথাও সূক্ষ্ম আত্মা নিয়ে থেকে গেছেন। জামগাছ তলায় গণেশজিকে রাতে-বিরেতে নাকি দেখাও যেত ছায়ার মতন। এসব আমরা শুনেছি আগে, বিশ্বাসও করতাম। আজকাল আর গণেশজির কথা শোনা যায় না!

ব্রজ গণেশজির কথাটা তুলে আমায় ভয় পাইয়ে দিল। গা ছমছম করতে লাগল। একেবারে থমথমে রাত, চারদিক নিঃসাড়, কোথাও এক ফোঁটা আলো জ্বলছে না—জামগাছটা দৈত্যের মতন দাঁড়িয়ে; মনে হল, গণেশজি যেন আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের দেখছেন।

মল্লিকদের বাগানের দিক থেকে কনকনে বাতাসও ভেসে এল। গাছপাতার শব্দ হল সড়সড় করে।

ব্রজ আর আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম।

বিজন লণ্ঠন সামনে নিয়ে দুলছিল।

ব্রজ বলল, "বাইরে যাবার দরকার নেই, বারান্দায় বসে নজর রাখলেই চলবে।"

নন্তু টন্তু কোল বালিশের মতন এ-ওর গায়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল। বিজনও ঘুমে টলে পড়ছিল। আমরাও আর পারছিলাম না।

কখন যে সবাই মিলে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, হঠাৎ চেঁচামিচি শুনে ঘুম ভাঙতেই দেখি ফরসা হয়ে গেছে। কিন্তু ফরসা হয়ে গেলে কী হবে, মামার যন্ত্রঘরে কী যেন একটা হয়েছে, ধোঁয়া বেরোচ্ছে, গন্ধ আসছে বিচ্ছিরি। আর মামা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছেন। আমরা সকলেই হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। কিছু বোঝার আগে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে কে কার ঘাড়ে পড়লাম, কার গলা টিপে দিলাম, কার পেটে লাথি মারলাম, কিছুই জানি না। একবার মনে হল, মামার গ্যাস হয়ে গিয়েছে, হয়তো তাই অত ধোঁয়া আর গন্ধ, কিন্তু মামা ওভাবে চেঁচাচ্ছেন কেন? আনন্দে নাকি?

যন্ত্রঘরের মধ্যে তাকানো যাচ্ছিল না; ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালো হয়ে আছে। উনুনে কাঁচা কয়লা ঢাললে যেমন চাপ চাপ ধোঁয়া উঠতে থাকে—দরজার মধ্যে দিয়ে সেই রকম ধোঁয়া আসছিল দমকে দমকে। আমাদের সাধ্য কী ঘরের মধ্যে ঢুকি। ধোঁয়ার চোটে চোখে জল আসছিল, কাশতে শুরু করলাম সবাই। মামা ঘরের মধ্যে কী করছেন দেখতেই পাচ্ছিলাম না, ধোঁয়ার সঙ্গে রবার পোড়ার বিকট গন্ধ, চামড়া পোড়ার গন্ধ ভেসে আসছিল। ওই অবস্থায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। হারু না নন্তু কে যেন লাফ মেরে উঠোনে পড়ল। কানু চেঁচিয়ে বলল, "আগুন ধরে গেছে পালা।"

আমরা একবার শুধু ঝাপসা ভাবে দেখতে পেলাম, মামা ঘরের মধ্যে অন্ধের মতন শুধু হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, টলছেন। কেশে কেশে মরে যাচ্ছিলেন।

মামাকে আমরা বাইরে বেরিয়ে আসার জন্যে প্রাণপণে ডাকছিলাম।

এমন সময় ঘরের মধ্যে কী যেন ফাটতে শুরু করল। হুড়মুড় করে উঠোনে নেমে পড়লাম সবাই। মামা তখনও ঘরে।

কানু জল জল বলে চেঁচাতে লাগল। বিজন চেঁচাতে লাগল, আগুন আগুন বলে। আমরা মামাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলাম।

শেষ পর্যন্ত মামা টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। দম টানছেন হাপরের মতন। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। চশমাটা চোখে নেই, চোখের পাতাও খুলতে

পারছেন না।

আমরা ছুটে গিয়ে মামাকে উঠোনে নামিয়ে আনলাম। মামা দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না, উঠোনে শুয়ে পড়লেন আকাশমুখো হয়ে।

ততক্ষণে যন্ত্রঘরে আগুন লেগে গেছে। খোলার চালের ঘর, মাথায় কাঠের কাঠামো, দেয়ালে আলকাতরা।

খবরটা কেমন করে ছড়িয়ে পড়েছিল জানি না। ওই সকালে দেখতে দেখতে পাড়ার লোকজন ছুটে এল আগুন নেভাতে।

আগুন যখন নিবল, তখন যন্ত্রঘরের অবস্থাটা দেখে কানু বলল, "একেবারে নিকুম্ভিলা হয়ে গেছে।"

সারাটা দিন কেমন করে যে কাটল বলা যায় না। পরীক্ষায় ফেল করা ছেলেদেরও এত মন খারাপ হয় না। কী করে যে আগুন ধরল তাও বোঝা গেল না। কানু বলল, গ্যাস বেশি হয়ে গিয়েছিল। বিজন বলল, কোলিয়ারিতে যে-ভাবে আগুন লেগে যায় সেই রকম কিছু হয়েছিল। হারু বলল, কেউ আগুন দিয়ে পালিয়ে যেতেও পারে। আমরা অনেক রকম ভাবলাম, নানা সন্দেহ করলাম, কিন্তু কেমন করে যে আগুন লেগেছিল তা বুঝতে পারলাম না। মামার কাছে যাবার মুখও আর আমাদের নেই। তা ছাড়া, সেই যে মামা উঠোনে এসে চোখ বুজে শুয়ে পড়েছিলেন তারপর আর একটাও কথা বলেননি। অন্তুর বাবা—নৃপেন জ্যাঠামশাই—খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে মামাকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। বাড়ি গিয়ে মামা বিছানা নিয়েছেন শুনেছি।

দুপুর গেল, বিকেল গেল—আমরা আবার প্রায় সবাই কানুদের বাড়িতে জমা হলুম। ব্রজ ছিল না। চোখ মুখের যা চেহারা হয়েছে আমাদের তা বলার নয়। চুপসানো মুখে সবাই বসে আছি আর হায় হায় করছি।

এমন সময় অন্তু এল। গম্ভীর মুখ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মামা কেমন আছেন?"

"ব্রেনে ধোঁয়া ঢুকে গেছে।"

ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। নাকে মুখে ধোঁয়া ঢুকে যায় জানি, বেরিয়েও যায়, ব্রেনে কী করে ঢোকে, আর ঢুকলেও সেটা কী ক্ষতি করে জানি না। অন্তুর মুখ দেখে মনে হল, ব্রেনে ধোঁয়া ঢোকা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার।

কানু বলল, "মামা কথা বলছেন না?"

"না। পারছেন না।"

আমরা চমকে উঠলাম। মামা কথা বলতে পারছেন না! সর্বনাশ!

"সে কী রে? তবে? একবারে চুপচাপ শুয়ে আছেন?" বিজন জিজ্ঞেস করল।

অন্তু আস্তে করে ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, "এখানকার ঘোষ ডাক্তারকে বাবা ডেকে পাঠিয়েছিল। মামা ডাক্তারকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি।"

"কেন?"

"মামা একটা কাগজে লিখে দিয়েছে, ব্রেনে ধোঁয়া ঢোকার ব্যাপার এখানকার ডাক্তাররা কিচ্ছু বুঝবে না। মামা নিজে বুঝতে পারছে—কম করেও এক শিশি ধোঁয়া ব্রেনের মধ্যে চলে গেছে। রোগটা খুব খারাপ। তাড়াতাড়ি বের করতে না পারলে সমস্ত ব্রেন নষ্ট হয়ে যাবে।"

আমরা প্রায় আঁতকে উঠলাম। হায় হায়, এ কী হল? কোথাকার একটা পুঁচকে শহরে গ্যাসের আলো জ্বালাতে গিয়ে মামার এই অবস্থা হল? তাও আমাদের মতন কটা 'নেফুর' জন্যে। মামার ব্রেন নষ্ট হয়ে যাওয়ার মানে বিরাট ক্ষতি। কত ক্ষতি যে সারা জগতের আমরা করলাম। আমাদের চোখ ছলছল করতে লাগল।

আমি কান্না কান্না গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "তা হলে কী হবে?"

অন্তু বলল, "মামা কালই কলকাতায় চলে যাবে। সেখানে মামার কোনও চেনা-জানা ডাক্তার আছে, বড় ডাক্তার। তাকে দিয়ে একবার দেখিয়ে সোজা জাপানে যাবে।"

"জাপানে?"

"জাপানে এর চিকিৎসা আছে। ওরা পারে। মুশকিল হল, রোগটা এমন ডেঞ্জারাস যে দেরি করাও যাবে না, দেরি করলেই গণ্ডগোল। সমস্ত ব্রেন নষ্ট হয়ে যাবে।"

আমরা কেউই চাই না মামার ব্রেন নষ্ট হোক। খুব তাড়াতাড়িই মামার জাপান যাবার দরকার। নন্তু বলল, "যাবেন কী করে?"

"ছোট মামাকে কলকাতা থেকে বিলেতে খবর পাঠাতে হবে। ছোট মামা যদি আসতে পারে, এরোপ্লেনে করে বড় মামাকে জাপানে নিয়ে যাবে। না হলে জাহাজে যেতে হবে। জাহাজ বড় দেরি করে। আমাদের সেইটেই ভয়। মা যা কাঁদছে সারাদিন!"

মামার জন্যে আমাদেরও বুক টনটন করছিল। কেন মামা গ্যাসের বাতি জ্বালাবার জেদ ধরলেন! না হয় না জ্বলত বাতি। আমরা তো মরে যাচ্ছিলুম না। এই শহরের লণ্ঠন, কুপি, কার্বাইড, পেট্রম্যাক্স নিয়ে বেশ তো ছিলাম আমরা। কোনও দুঃখ, কোনও রকম অভাব তো আমাদের ছিল না। কোথাকার গ্যাস বাতি জ্বালাতে গিয়ে এতবড় অঘটন ঘটে গেল।

মুখ নিচু করে অপরাধীর মতন বসে থাকলাম আমরা। বড় বড় নিশ্বাস ফেললাম।

শেষে বিজন বলল, "হ্যাঁ রে, একবার মামাকে দেখতে যাওয়া যাবে না?"

অন্তু বলল, "যাবে, কথাবার্তা বলা যাবে না। মামা আমায় ইশারা করে তোদের নিয়ে যেতে বলেছে। চল। কাল সকালের দিকেই মামা কলকাতা চলে যাবে।"

আমরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

অন্তুদের বাড়ি এসে চোরের মতন পা টিপে টিপে মামার ঘরে গেলাম।

জ্যাঠাইমা, ডলিদি, লিলি কেউ আমাদের দেখে ফেলুক আমরা একেবারেই চাইছিলাম না।

একেবারে পাশের ঘরে বিছানায় মামা শুয়ে ছিলেন। ঘরে ছোট একটা বাতি

জ্বলছিল। আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি। মামা টান হয়ে শুয়ে। পায়ের ওপর কম্বল চাপানো, কোমর পর্যন্ত। উঁচু বালিশে মাথা। মাথার দিকে একটা সাদা তোয়ালে পাট করে ব্রহ্মতালুর ওপর ঢাকা। চোখ বুজে মামা শুয়েছিলেন। ঘরের জানলা বন্ধ। কর্পূর পোড়ার গন্ধ বাতাসে।

আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলাম। কোনও কথা নয়, শব্দ নয়। একদৃষ্টে মামাকে দেখছিলাম। কী রকম যেন দেখাচ্ছিল মামাকে। অত বড় অসুখ হলে হয়তো এই রকমই দেখায়।

অনেকক্ষণ পরে মামা চোখের পাতা খুললেন। আমাদের যেন দেখতেই পেলেন না। আবার চোখ বুজলেন। খানিক পরে তাকালেন, আমাদের মুখ দেখলেন। চিনতে পারছেন কি না বোঝা গেল না।

শেষে চিনতে পারলেন। ঠোঁটে মুখে পাতলা একটু হাসি এল। দুঃখের হাসি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ইশারায় যেন অন্তুকে কী বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

প্রথমটায় না হলেও অন্তু ইশারা বুঝতে পারল। ঘর থেকে চলে গেল।

মামা আস্তে আস্তে হাত নেড়ে যেন আমাদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। আমরা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিলাম।

অন্তু আবার ঘরে এল। হাতে কাগজ-পেনসিল। মামাকে দিল।

মামা উঠতে পারলেন না। সোজা হয়ে শুয়ে বুকের তলায় কাগজ রেখে আন্দাজে কী যেন লিখলেন বড় বড় করে, লিখে কাগজটা অন্তুর হাতে দিলেন।

অন্তু পড়ল। তারপর আমাদের হাতে দিল।

মামা তো ঠিক মতন লিখতে পারেননি, কষ্ট হয়েছে, লেখা জড়িয়ে গেছে, তবু আমরা লেখাটা পড়তে পারলাম।

মামা লিখেছেন: ব্রজ কোথায়? তাকে খোঁজ। দুঃখ করিস না।

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। মামা আবার চোখ বুজলেন।

বাইরে এসে অন্তু বলল, "ব্রজ কোথায়?"

সেই সকালে যখন অত কাণ্ড ঘটছে তখন থেকেই ব্রজ বেপাত্তা। প্রথমে নজর পড়েনি; পরে পড়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম—ব্রজ আগুন নেভাবার জন্যে লোক ডাকতে ছুটেছে। তারপরও ব্রজ এল না। বিপদের সময় ছাই কি সব জিনিস মনে থাকে। আমাদেরও যা হাল হয়েছিল তাতে যে যার বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। ব্রজকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাইনি।

কানুদের বাড়িতে বিকেলে আমরা সকলেই এলাম, ব্রজ এল না। তখন ব্রজর কথা উঠেছিল। কে যেন বলল, ব্রজ সারা রাত ঠায় বসেছিল বলে শরীর খারাপ হয়েছে বোধ হয়, বাড়িতে ঘুমোচ্ছে। হতে পারে। আমরা আর ও নিয়ে ভাবিনি।

মামার চিরকুট দেখে এবার সকলেই বেশ অবাক হয়ে গেলাম। সত্যি, ব্রজ কোথায়? সকাল থেকে সে বেপাত্তা কেন? ব্যাপারটা কী? একবারও সে এল না

কেন?

বিজন বলল, "রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে।"

ঠাট্টা করে কানু বলল, "তোর স্মিথ তো!"

অন্তু বলল, "ব্রজর বাড়ি চল।"

ব্রজর বাড়ির দিকে আমরা পা চালালাম।

ব্রজর বাড়ি গিয়ে দেখি, সে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। তার চোখমুখ একেবারে কালির মতন কালো। গালে দাগ, কালশিরে পড়েছে।

আমাদের দেখে ব্রজ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

সেই কান্না আর থামে না। শেষে ব্রজ খাটিয়ার ওপর উঠে বসল। তার হাত, পিঠ, বুক এমন কী গলাতেও দাগ। ফুলে গেছে অনেক জায়গা। ছেঁকাও খেয়েছে। একটা মলম লাগানো রয়েছে পোড়া জায়গায়। বিজন বলল, "হয়েছেটা কী তা তো বলবি?"

ব্রজ যা বলল আমরা তা স্বপ্নেও ভাবিনি। ব্রজ বলল, শেষ রাতে সে একবার একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙতেই তার মনে হল, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। সবাই ঘুমিয়ে আছে, এ-সময় খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারে। সে জেগে থাকার জন্যে চা তৈরি করবে ভেবে স্টোভ নিয়ে যন্ত্রঘরে ঢুকেছিল। শেষ রাতের শীত, একেবারে বরফের মতন ঠাণ্ডা সব। ভুট কম্বলে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে, হনুমান টুপি চাপিয়ে ব্রজ যন্ত্রঘরে ঢুকে স্টোভ জ্বালাচ্ছিল। বাইরে বাতাসে স্টোভ ধরানোও যেত না। ভেবেছিল, চা করে সবাইকে ডাকবে। ব্রজ যখন কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে স্টোভ জ্বালাচ্ছে, স্পিরিটের শিশিটা খোলাই ছিল, সবে দেশলাই জ্বালিয়েছে—এমন সময় কে যেন বাইরে থেকে তার ওপর লাফিয়ে পড়ল। ব্রজকে চেপে ধরল। ব্রজ ভেবেছিল গণেশজি। পালাবার চেষ্টা করতেই কম্বল খুলে গেল, স্পিরিটের শিশি উলটে গেল, আর আগুন জ্বলে গেল। জ্বলন্ত কম্বলটা পায়ে করে ব্রজ দূরে ছুড়ে দিতে পেরেছিল এইমাত্র। তারপর সেই ঘরের মধ্যে দক্ষযজ্ঞ। ব্রজ পালাবার চেষ্টা করছে, আর গণেশজি তাকে দম বন্ধ করে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। শেষে ব্রজ বুঝতে পারল গণেশজি নয়, মামা। কিন্তু মামাও ব্রজকে ছাড়বে না, ব্রজও পালাবে। ধস্তাধস্তির মধ্যে ব্রজ কোনও রকমে মামার হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছে। আর ও-মুখো হয়নি।

আগুন লাগার ব্যাপারটা এতক্ষণে বোঝা গেল।

কানু কপাল চাপড়ে বলল, "তোর জন্যেই মামার ব্রেনে ধোঁয়া ঢুকে গেছে জানিস? মামার খুবই অসুখ, জাপানে চলে যাচ্ছেন তিনি!"

"কিতনা ধোঁয়া?" ব্রজ জিজ্ঞেস করল।

"এক শিশি", অন্তু বেশ রাগের সঙ্গে বলল, "জবাকুসুমের শিশির এক শিশি তো হবেই।"

ব্রজ হাত জোড় করে বলল, "আমার ঘিলুতে কার্বাইড আর গোবর ঢুকে গেছে ভাই। মাথায় চরকি মারছে। সারা শরীরে দরদ। জ্বালা করছে।"

অন্তু ধমক দিয়ে বলল, "চুপ কর। তোর মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু ছিল কি!

এভরিথিং নষ্ট করে দিলি।”

ব্রজ অনুতাপের গলায় বলল, “আমার আফসোস হচ্ছে ভাই। মামার কাছে মাফ চাইব।”

ব্রজর মাপ চাওয়ার জন্যে মামা কি বসে থাকবেন! পরের দিন তাঁর কলকাতা হয়ে জাপান যাবার কথা। আমরা মামার আরোগ্য কামনা করে যে যার বাড়ি ফিরে গেলাম।

পরের দিন মামা চলে গেলেন। আর আমাদের শহরে এলেন না কোনওদিন।

হা সি র উ প ন্যা স

গজপতি ভেজিটেব্‌ল শু কোম্পানি

রবিবার সকালে দোতলার গোলঘরে চা-পানির আসর বসেছিল পতি-পরিবারের। পারিবারিক চায়ের আসরকে এঁরা বলেন ‘চা-পানির আসর’।

দোতলার এই গোলঘরটি আড্ডা মজলিস আসর হুল্লোড়ের পক্ষে চমৎকার। ঘরটি প্রায় গোল। পুব-পশ্চিম-দক্ষিণ খোলা। বড়-বড় কাচের জানলা। বাইরে তাকালে মাঠের ঢেউ, দূরে রেললাইনের গায়ে বালিয়াড়ি, সাঁকো, পলাশবন, সবই চোখে পড়ে।

পতি-পরিবারের বাড়ির কর্তা ধনপতি। বুড়ো মানুষ। আশির কাছাকাছি বয়েস। হাতে-পায়ে জোর কমেছে, কানে কম শোনেন, ছানি-কাটানো চোখে মোটা-মোটা কাচের চশমা। তিনি তেতলাতেই থাকেন, দোতলায় বড় নামেন না। তবে আজ সকালে তাঁকে নামিয়ে আনা হয়েছে চা-পানির আসরে। কারণ গজপতি। পাঁচ বছর পরে গজপতি বাড়ি ফিরেছে—এটা কি কম কথা হল!

পৌষ মাস। শীত যতই হোক, গোলঘরের বড়-বড় জানলা দিয়ে রোদ এসে ঘর ভাসিয়ে দিচ্ছিল। রোদে বসেই চা খাওয়া হচ্ছিল ধনপতিদের।

ধনপতির তিন ছেলে। মহীপতি, সীতাপতি, উমাপতি। তিন ভাইয়ের মধ্যে মধ্যজন বেঁচে নেই। গজপতি হল এই মধ্যজন সীতাপতির ছেলে। ফলে ঠাকুরদার তো বটেই, জেঠা-কাকারও নয়নের মণি গজপতি।

চা খেতে-খেতে মহীপতি বাবাকে বললেন, “বাবা, গজু ফিরে এসে আমাদের বুকের বল বাড়িয়ে দিল। এবার ওকে একটা কিছু করতে হয়। অত লেখাপড়া শিখে পাঁচ দেশ ঘুরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরল, এতে কি আমাদের কম গৌরব না আনন্দ!”

পতি-পরিবার ময়ূরগঞ্জের নামকরা ধনী পরিবার। ব্যবসাপত্র, জমি-জায়গা, হাট-বাজার, বাস কোম্পানি অনেক কিছুই আছে তাঁদের। তবে পয়সার তেজ এঁদের নেই, চাল চালিয়াতি অহঙ্কারও না থাকার মতন। মানুষগুলি ভাল কিন্তু বংশগতভাবে একটু খ্যাপাটে। লোকে ঠাট্টা করে আড়ালে বলে, পতি পাগলের বংশ।

বড় ছেলের কথা শুনে ধনপতি আদরের গলায় গজপতিকে বললেন, “কী গো নাতিদাদু, তোমার মতলবটা কী?”

গজপতির চেহারাটি ঠিক ছিপছিপে নয়, গোলগাল। গায়ের রং ফরসা। মুখের আদল চাঁদের মতন গোল। মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। কান দুটো একটু বেশি বড়।

গজপতির সাজপোশাক এখন একেবারে সাধারণ। পাজামা, পাঞ্জাবি, গায়ে তুষের চাদর।

গজপতি ঠাকুরদাকে বলল, "দাদা, আমি একটা প্ল্যান ঠিক করে রেখেছি।"
ধনপতি খুশি হয়ে বললেন, "কী প্ল্যান?"
গজপতি বলল, "আমি এখানে একটা জুতো কোম্পানি খুলব!"
কথাটা শোনামাত্র কেমন যেন থমক-মারা ভাব হল! সবাই চুপ। শেষপর্যন্ত কথা বললেন, মহীপতি, "জুতো কোম্পানি!" মহীপতি অবাক। উমাপতিও হাঁ করে ভাইপোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। গজপতির খুড়তুতো ভাই বৃহস্পতি ফিক করে হেসে ফেলল।

ধনপতি বললেন, "জুতো কোম্পানি! সেটা কী? জুতোর দোকান! আরে রাম রাম, তুমি পাঁচ বছর বাইরে-বাইরে কাটিয়ে এসে শেষে এখানে জুতোর দোকান খুলবে! লোকে বলবে কী!"

গজপতি বলল, "দাদা, জুতোর এখন সেদিন নেই; ভ্যালু বেড়ে গেছে। আমি যখন জাপানে ছিলাম তখন মিসিকাটায় একটা কনফারেন্স হয়েছিল। বড়-বড় সব পণ্ডিত জুটেছিল সেই কনফারেন্সে। সেখানে শুনলাম, আগামী দশ বছরে জুতোর ডিমাণ্ড পাঁচ থেকে পঁচিশ গুণ বাড়বে। সারা পৃথিবীতে।"

"কেন?"

"খালি পায়ে লোকে একেবারেই হাঁটবে না। এই যে পলিউশন হচ্ছে, এতে এক ধরনের রোগ হবে; মাটি থেকে পা বেয়ে রোগটা মাথায় উঠবে। রোগটার নাম 'পুগান'। একবার হলে আর রক্ষে নেই।"

উমাপতি বললেন, "জাপানি কথা বাদ দাও। আমাদের দেশ কি সাহেবদের দেশ। আমাদের বাপ চৌদ্দ পুরুষ খালি পায়ে হেঁটে-হেঁটে মানুষ হল। কই, তাদের তো তোমার ওই পুঁই রোগ হতে দেখলাম না।"

গজপতি মাথা নাড়ল। "কাকা, পুঁই নয় পুগান। খুব খারাপ রোগ!"
মহীপতি বললেন, "তুই না শিখতে গিয়েছিল সিরামিক্স। শিখে এলি জুতো!"
গজপতি বলল, "জেঠু, আমি একটা নয়, পাঁচটা জিনিস শিখেছি। সিরামিক্স শিখতে আমি যাইনি, গিয়েছিলাম সিরো টেরাটোলজিম্ শিখতে। ও তুমি বুঝবে না জেঠু। টেরাটোলজিম্ বড় কঠিন জিনিস। তার সঙ্গে সিরো হল আরও কঠিন। জাপানের নাকিথাদায় একটা মাত্র সেন্টার ওটা শেখায়।"

ধনপতি নাতিকে বাধা দিয়ে বললেন, "গজু, আমি মিসিকাটা নাকিখাঁদা বুঝি না। তা বলে তুই জুতোর দোকান দিবি দাদা! আমাদের মান-সম্মান!"

"এই তো দাদা, না শুনেই মান-সম্মানের কথা তুলছ! অথচ জানো না জুতোতেই মান-সম্মান থাকে। তুমি খড়ম পায়ে ঘোরো, লোকে বলবে পেঁচো ঠাকুর, ছেঁড়া চটি পায়ে ঘোরো, লোকে বলবে ফেরিঅলা। বেশ ভাল একটা জুতো পায়ে মচমচিয়ে ঘোরো, লোকে তোমায় জেন্টলম্যান ভাববে।... তা আমি তো জুতোর দোকান খুলব না, কারখানা খুলব, শু-ফ্যাক্টরি।"

ধনপতির পাশে বসে ঝিললি। ধনপতির আদরের নাতনি। গজপতির ছোট বোন। বসে-বসে জেলি চাটছিল। ঝিললি মুচকি হেসে বলল, "ভালই হল। বাটার জুতো

বাটার জুতো শুনতে-শুনতে কান পচে গেছে, এবার থেকে 'গজুর জুতো' শুনব।"

বৃহস্পতি আবার হেসে উঠল।

গজপতি বলল, "ননসেন্স। এরা ফাজলামি ছাড়া আর কিছু শেখেনি। মাথা আছে মগজ নেই।"

উমাপতি বললেন, "জুতোর কারখানা খোলার হ্যাপা অনেক তা জানিস। বড়সড় জায়গা চাই, মস্ত-মস্ত শেড করতে হবে। জন্তু জানোয়ারের চামড়া চাই। গোরু, মোষ, ছাগল. ভেড়া—আরে ছোঃ! তারপর কাঁচা চামড়া হলে ট্যান করতে হবে, সে কী দুর্গন্ধ! জুতো সেলাই মেশিন, কাঠের ফরমা, মুচি, ...হাজারো ফ্যাকড়া। এসব তুই কেমন করে করবি গজু! তোর মাথা খারাপ হয়েছে।"

গজপতি হেসে বলল, "কাকা, চামড়া আমার লাগবে না। তুমি জানো, গান্ধীজি বলেছিলেন, প্রাণী হত্যা করে তার চামড়ায় জুতো পরা উচিত নয়। মৃত জন্তুর চামড়ায় তৈরি জুতো পরা যেতে পারে । আমি তার চেয়েও বেশি বলি, মৃত জন্তুকা চামড়া সে বানায়া জুতোর কোনও মানে নেই, সেটাও চামড়া। আমি বলি, নো চামড়া, বাট ভেজিটেব্‌ল। ভেজিটেব্‌ল শু! নিরামিষ জুতো।"

ভেজিটেব্‌ল কথাটায় কী ছিল কে জানে, পতি-পরিবারের চায়ের আসরে যুগপৎ হাস্য ও হট্টগোল উঠল।

গণপতি হল গজপতির দাদা; জেঠতুতো বড় ভাই। দেখতে সুপুরুষ। অত্যন্ত স্মার্ট ধরনের ছোকরা। সে এতক্ষণ চুপচাপ ছিল—কোনও কথা বলছিল না। নিজের মনে হালুয়া, লুচি, মিষ্টি, চা খেয়ে যাচ্ছিল। এ-বাড়ির অন্দরমহল হল নিরামিষাশী। বাইরে কে কোথায় আমিষ খাচ্ছে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

হাসি হট্টগোলের মধ্যে গণপতি বলল, "গজা, তুই বলিস কীরে? ভেজিটেব্‌ল শু! এ তো জন্মেও শুনিনি।"

ঝিললি বলল, "ভেজিটেব্‌ল স্টু আমি অনেক খেয়েছি, লিভার খারাপ হয়েছিল বলে। জেঠিমা খাওয়াত। ভেজিটেব্‌ল শু! মাগো!"

ধনপতি কিন্তু কী কারণে যেন খুশি হলেন। বললেন, "এমন তো আমিও শুনিনি আগে। তবে অনেককাল আগে কলকাতা শহরে নাকি এক ধরনের পিসবোর্ডের জুতো চালু হয়েছিল। একটু-আধটু রবার থাকত। সেই জুতো না কি!"

গজপতি বলল, " না। ফাঁকির কারবার আমার নয়। ভেজিটেব্‌ল ইজ ভেজিটেব্‌ল!"

ধনপতি বললেন, "শুনে তো জিনিসটা মন্দ মনে হচ্ছে না। আমরা আমিষ-ভক্ত নই; আমাদের কুলাচার বলেছে অহিংস হতে, ঢোলপুরের পরমানন্দজি আমাদের কুলগুরু।... তা গজুদাদা, তুই যা বলছিস সব সত্যি?"

"হাঁ দাদা। টোয়োহাসিতে আমি হাতে-কলমে কাজ শিখেছি।"

ধনপতি হাত তুলে বললেন, "বেশ। তুই তবে তোর মতন কাজ শুরু করে দে।" বলে বড় ছেলে আর ছোট ছেলের দিকে তাকালেন। "যা লাগে ওর ব্যবস্থা করে দিও।"

জ্যাঠা, কাকা মাথা হেলালেন। কর্তার হুকুম যা, তাই হবে।

ঝিললি ফোড়ন কেটে বলল, "মেজদার জুতো কোম্পানির নাম কী হবে?"

গজপতি বলল, "নাম একটা হবে।"

"ময়ূর শু, কেমন?" বৃহস্পতি বলল ঠাট্টার গলায়।

"ময়ূর একটা জীব। জীবের নামে নিরামিষ জুতোর নাম হতে পারে না," উমাপতি বললেন।

গণপতি ঠাকুরদাকে বলল, "দাদা, আমি বলি নামটা হোক 'গজপতি ভেজিটেব্‌ল শু কোম্পানি'। ভাল নাম। কানে ভাল শোনাবে।"

ধনপতি বললেন, "ভাল বলেছিস। ওটাই থাক।"

আরও খানিকটা বেলায় গণপতি বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে তার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে, গজপতিকে দেখতে পেল।

গণপতি ডাকল, "গজা, আয়!"

গজপতি এবার একটু অন্যরকম সাজ করেছে। পরনে ঢোলা পায়ের ফুল প্যান্ট, গায়ে জামা, জামার ওপর লাল রঙের পুলওভার, মাথায় গল্‌ফ হ্যাট, হাতে ছড়ি, পায়ে জুতো-মোজা।

গজপতি বলল, "তুই কোন দিকে যাবি? আমি একবার গোশালার মাঠের দিকে যাব।"

"যাবি তো যাবি। তোকে পৌঁছে দেব।"

দাদা গণপতির সঙ্গে গাড়িতে যেতে গজপতি ভরসা পায় না। গণপতির গাড়ির কোনও বংশ-পরিচয় নেই। না বিদেশি না এদেশি। টু সিটার গাড়ি। দেখতে সরু, ছুঁচলো মুখ। গাড়ির গায়ে নানা রঙের পোঁচ। জেব্রার নকশা যেন। মাথায় ক্যাম্বিশের চাল। সামনে দু' পাল্লার কাচ। হেড লাইট দুটো সামনের চাকার মাড গার্ডের ওপর সাপের ফণা তোলার মতন ফণা তুলে বসে আছে।

গজপতি গাড়িতে উঠে বলল, "তোর এই গাড়ির চালটা ভাল নয়। কাল তো দেখলুম।"

গণপতি বলল, "তুইও মুখ্যুদের মতন কথা বলছিস, গজা! শুনে বড় দুঃখু হচ্ছে। ভাল গাড়ি কাকে বলে? যার অ্যারিসটোক্রেসি আছে। গাড়ি গাধাও নয়, ঘোড়াও নয় যে, চাবুক মারলেই চলবে। ভাল গাড়ি নিজের মরজিতে চলে। মানুষের যেমন ব্যক্তিত্ব, গাড়ির তেমনই গাড়িত্ব। নিজের মরজিতে যাবে, থামবে, গোঁ করবে, খানায় পড়বে, রয়েসয়ে আলসেমি ভেঙে চলবে, তবেই না রিয়েল বনেদি গাড়ি। আমি নিজের হাতে এটা তৈরি করিয়েছি গদাই মিস্ত্রিকে দিয়ে।... নে, ঘাবড়াস না, গ্যাঁট হয়ে বোস।"

গণপতি গাড়ি ছাড়ল।

বাড়ির ফটক পেরিয়ে রাস্তা।

গণপতি বার দুই-তিন শিস দিয়ে ইংরিজি একটা সুর বাজাল, তারপর বলল,

"গোশালার দিকে কোথায় যাবি?"

"কারখানার সাইট দেখতে।"

"সাইট দেখতে! তা গোশালা কেন রে গজা। আরও ভাল জায়গা আছে। রেল-ফটক, যেখানে তোর ডিসট্যান্ট সিগন্যাল—তার বাঁ পাশে কত জমি। ওখানে জায়গা নিই। পুরো জায়গায় বিশাল করে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেব: 'গজপতি ভেজিটেব্‌ল শু কোম্পানি। ময়ূরগঞ্জ।' ট্রেনের হাজার-হাজার প্যাসেঞ্জার আসতে-যেতে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখবে রোজ। কী রকম পাবলিসিটি হবে তোর জুতো কোম্পানির।"

গজপতি মন দিয়ে দাদার কথা শুনল; তারপর বলল, "বলেছিস ভাল। কিন্তু গণাদা, আমার যে র' মেটিরিয়াল সাপ্লাইটা আগে দেখতে হবে।"

"র' মেটিরিয়াল! গোশালার কাছে র' মেটিরিয়াল! আরে রাম রাম। ছো ছো।"

গজপতি বলল, "তুই কিচ্ছুটি বুঝলি না। আমার র' মেটিরিয়াল বলতে—ঘাস, খড়, কলাগাছের থোড়, পাতা, কুমড়োর খোসা, বাঁশপাতা, কাঁঠালের খোসা, মানে তোর সবরকম ভেজিটেব্‌লের ওয়েস্টেজ আর লতাপাতা। গোশালার মাঠের কাছে বাগান আছে হরিরামবাবুর। আমিও বাগান করব, দু-চার একর জমি কিনে। তার পাশেই থাকবে আমার কারখানা।"

গণপতি বলল, "বলিস কী! আগে তোর বাগান হবে; তারপর কারখানা চালু হবে। এ তো সেই রামের বনবাসের বারো বচ্ছর।"

গজপতি বলল, "না, না এখন কাজ শুরুর মুখে আমাকে মেটিরিয়াল বাইরে থেকে জোগাড় করতে হবে, সে হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, সবার আগে সাইট সিলেকশান।"

গণপতির গাড়ি হঠাৎ ঘাড় বেঁকিয়ে মাঠের পাশে নেমে গেল।

দুই

নিজের চালে চলতে-চলতে গড়াতে-গড়াতে গণপতির 'অ্যাজ ইউ লাইক' গাড়ি শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে থামল তার পাশেই বড়সড় ডোবা। জল না থাক পাঁক আর কাদা রয়েছে। পাঁকের ওপর শ্যাওলা-জাতের এক ধরনের ঘাস-লতা। মানে, ঘাসও নয়; আবার লতাও নয়। ওদিককার ভাষায় 'ঝিজিয়া'। রং সবুজ। এখন অবশ্য পাঁকের কল্যাণে কালচে দেখাচ্ছে।

গাড়িটা ডান দিকে টাল খেয়ে টলে পড়েছিল।

গণপতি গাড়ি থেকে নেমে একবার দেখল। বলল, "গজা, সামনের ডান দিকের চাকা খুলে বেরিয়ে গেছে। সাবধানে নেমে পড়।"

গজপতি নেমে পড়ল।

রাস্তা থেকে মাঠ গড়িয়ে নামতে-নামতে গাড়ির চাকা খুলে বেরিয়ে যাবে এ আর এমন কী বিচিত্র! মাঠ তো আর সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো থাকে না।

চাকাটা গজ বিশ-পঁচিশ দূরে পড়ে ছিল।

গণপতি একবার ঝুঁকে পড়ে গাড়ির সামনের দিকটা দেখে নিল। তারপর বলল, "ভাবিস না, রেডি করে ফেলছি; দশ মিনিট। তুই ততক্ষণ একটু পায়চারি করে নে।" বলে শিস দিতে-দিতে গণপতি খুলে যাওয়া চাকাটা উঠিয়ে আনতে গেল।

গজপতি দাদাকে দেখল কয়েক পলক। গণাদা হল রিয়েল মাদ্রিদ। না-না, পৃথিবী বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব 'রিয়েল মাদ্রিদ' নয়; খাঁটি পাগল—মানে রিয়েল ম্যাড রিড। ফুকুকানোতে এক জাতের বাজনা দেখেছে গজপতি, আমাদের দেশের হারমোনিয়াম যন্ত্রের মতন, তবে দেখতে ছোট, সরু ধরনের; তার এক-একটা রিড চেপে ধরে বেলো টিপলে যা ভয়ংকর শব্দ হয়। পাগল করে দেয় মানুষকে। গণাদারও সেই অবস্থা। কোন রিড কখন বেজে উঠে মাথা খারাপ করে দেবে কে জানে!

গণাদার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। চাকা আনল কুড়িয়ে, মানে গড়িয়ে-গড়িয়ে, শিস দিতে-দিতে। তারপর গাড়ির পেছনে টুল-বক্স থেকে যন্ত্রপাতি নামাতে লাগল। চাকা লাগাবে।

খানিকটা বেলা হওয়ায় রোদ এখন বাহারি আর গরম হয়ে উঠেছে। শীতের এই রোদ যেমন দেখতে, তেমনই আরামের। সকালের দিকটায় হাওয়ার খ্যাপামি থাকে না, তেমন করে গা-কাঁপিয়ে দিচ্ছিল না এখন। আকাশ তকতকে, নীলের রং মাখানো, রোদ গড়িয়ে পড়েছে গাছপালার মাথায়, মাঠে, ছোট রেল লাইনের পাথরনুড়ির ওপর। দূরে চাঁদমারির রুক্ষ গা ঝকঝক করছিল। বোধ হয় পাথরকুচির জন্যে।

গজপতি বলল, "লাগব নাকি?"

"না, না, তুই ঘুরে বেড়া। বিউটি দ্যাখ। এ তো সামান্য! গাড়ির চাকা খুলে যাওয়া একেবারে কমন ব্যাপার। বনেদি ভদ্রলোকের কাছা আর বনেদি গাড়ির চাকা, এ যদি না খোলে তো বনেদিআনা হয় না। বুঝলি?"

গজপতি ঘুরতে লাগল। পাখি ডাকছে কোথায় যেন! টি—টি—টি; চিকির-চিক...। আকাশ-তলায় ক'টা চিল উড়ছে।

ঘুরতে-ঘুরতে গজপতি একেবারে সেই ডোবার কাছে।

ডোবার কাছে দাঁড়াতেই কেমন একটা গন্ধ নাকে এল। ঠিক পচা গন্ধ নয়, দুর্গন্ধও নয়, খানিকটা পাঁক, খানিকটা বুনো গন্ধ মেশানো কেমন এক ঘ্রাণ।

গজপতি তাকিয়ে-তাকিয়ে ডোবাটা দেখতে লাগল। ডোবার বারো আনা ঝিঝিয়া-শেওলায় ভরা, বাকিটাতে কাদাটে জল আর শালুকপাতার মতন কিছু পাতা।

ঝিঝিয়া দেখতে-দেখতে গজপতি হঠাৎ বসে পড়ল। একেবারে ডোবার পাশে। খুব গভীরভাবে নজর করে-করে সেই শ্যাওলা দেখতে লাগল।

গণপতি ততক্ষণে চাকা লাগাতে-লাগাতে শিস থামিয়ে গান ধরেছে।

গজপতি একটা কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে শ্যাওলা ঘাঁটল বার কয়েক। কাঠিটা তুলে

নিল। দেখল। তারপর বলল, "গণাদা! একবার আসবি?"

"কামিং।"

"হয়নি এখনও?"

"দু' মিনিট। নাট টাইট মারছি।"

গজপতি আবার কাঠিটা নামিয়ে ডোবার ঝিঝিয়া পাঁক ঘাঁটকে লাগল নিজের মনে। কী যেন ভাবছিল।

মাঠের ওপ্রান্ত দিয়ে ছোট লাইনের ছোট গাড়ি কু-কু সিটি দিতে-দিতে চলে গেল। কয়লা-ইঞ্জিন। ধোঁয়া উঠে বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল পলাশবনের গা ছুঁয়ে।

গণপতি তার গাড়িতে বার দুই হর্ন বাজিয়ে বুঝিয়ে দিল কাজ শেষ।

যন্ত্রপাতি তুলে রেখে কালিঝুলি মাখা কাপড়ে হাত মুছতে-মুছতে গণপতি ভাইয়ের কাছে এসে বলল, "বল?"

গজপতি ততক্ষণে কাঠিটা তুলে নিয়েছে ডোবা থেকে। বলল, "গণাদা, এটা দ্যাখ।" বলে কাঠিটা দেখাল।

গণপতি কাঠি দেখল। বুঝল না কিছুই। অবাক হয়ে বলল, "কী দেখব? কাঠি?"

"কাঠির গায়ে কী লেগে আছে দেখ।"

"দেখছি। নোংরা পাঁক আর শ্যাওলা।"

"তুই বুঝতে পারলি না। পারবিই বা কোত্থেকে? আমি দেখতে পাচ্ছি। ভাগ্যিস তোর গাড়ির চাকা খুলে গিয়েছিল। একেই লাক বলে গণাদা। আমাকে একেবারে ঠিক জায়গায় টেনে এনেছে। দিস ইজ ক্যারাক্যারাম্বুলা টাইপ। ভগবানের কী দয়া...!"

"কী? কী বললি? ক্যারা...?"

"ক্যারাক্যারাম্বুলা! টাইপটা সেইরকম। এক জাতের ওয়াটার উইড। মানে জলে-কাদায় জন্মায়।"

"তা জন্মাক। আমরা তো ঝিঝিয়া বলি। ইয়ে, মানে এর মধ্যে ভগবানের লীলাটা কোথায়, গজা!"

"আছে, ভাগ্যের ইঙ্গিত! এই জিনিসটা আমার ভেজিটেব্‌ল জুতো তৈরিতে ভীষণ কাজে দেবে। বলতে পারিস—এই ক্যারাক্যারাম্বুলা হবে বেস মেটিরিয়াল। মানে এর সঙ্গে আরও পাঁচটা জিনিস মিশিয়ে যে পেস্ট হবে—কাদাটে জিনিস—সেই পেস্টকে জমিয়ে আমি চামড়ার মতন করব।"

গণপতি তার ছোট ভাইয়ের মগজটা দেখবার জন্যেই যেন খুব তীক্ষ্ণভাবে গজপতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। মানুষের মগজ তো দেখা যায় না, কাজেই গণপতি কিছুই দেখতে পেল না। তবে ভাইয়ের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে বলল, "সত্যি গজা, তুই দারুণ। ব্রিলিয়ান্ট। ছেলেবেলায় তুই ফটাফট অঙ্ক কষতে পারতিস। তখনই তোকে যা লাগত! আর এখন তুই কত বড়! লাপাজু!"

গজপতি বলল, "লাপাজু? কী সেটা?"

"হাতির শুঁড়। হাতির শুঁড়ই তার আসল, জানিস তো! মানুষের হল বুদ্ধি। বুদ্ধি থাকলেই সব টেনে আনা যায়।"

গজপতি খুশি হল।

"তা হলে এবার?" গণপতি বলল, "কোথায় যাবি? গোশালার মাঠে?"

"হ্যাঁ, যাব।"

"চল তবে।"

গণপতির গাড়ির বাহাদুরি কম নয়। গড়গড়িয়ে যেমন মাঠে নেমে গিয়েছিল, সেইরকম চড়চড়িয়ে আবার রাস্তায় উঠল। অবশ্য গর্জন করল ভীষণ, লাফাল, ঝাঁকি খেল, শেষ পর্যন্ত উঠে গেল।

গাড়ি চলতে শুরু করলে গজপতি বলল, "গণাদা, ওই ডোবা আমার চাই।"

গণপতি অবাক হয়ে বলল, "ডোবা চাই! বলিস কী? ডোবা কি আমফল না জামফল, গাছ না পাথর যে, তুলে নিয়ে যাব?"

"না না, ডোবা কেন তুলব? ডোবা কি তোলা যায়? আমি বলছি—ওইরকম ডোবা আমায় বানাতে হবে।"

"গজা, ডোবায় ডোবার চেয়ে পুকুরে ডোবায় ইজ্জত আছে।"

"পুকুর! মন্দ নয়। তবে পুকুর কাটলে কি কাজ হবে! ছোট জায়গায় জল পচে ভাল। পুকুর বড় হয়ে যাবে। ...ধর, আমার কারখানার পাশে পাঁচ-সাতটা ডোবা করিয়ে নিলাম। সেখানে ক্যারাক্যারাম্বুলার চাষ হল।"

"চাষ?"

"বা রে! চাষ ছাড়া আবার কী!"

"গজা, এ কি তোর ধান! যব, জোয়ার...?"

"গণাদা, তুই গাড়ি ছাড়া কিচ্ছু বুঝিস না! আজকাল সব জিনিসের চাষ হয়। মাছ থেকে হাঁস-মুরগি পর্যন্ত।"

গণপতি গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগল। হাসতে-হাসতে বলল, "তা বলে ডোবার চাষ?"

"কথাটা না শুনেই তুবড়ি ছুটিয়ে দিলি হাসির! আগে শোন, তারপর হাসিস।"

"বল তবে?"

"কচুরিপানা দেখিসনি? জলা জায়গায়, পুকুরে—তুই দুটো কচুরিপানা ছেড়ে দে—দেখতে-দেখতে পুকুর ভরে যাবে। জলাডোবায় জলকচুর চাষ কর—কচুপাতায় ভরে যাবে ডোবা। সেইরকম এই ক্যারাক্যারাম্বুলা আমি ছেড়ে দেব ডোবায়, দেখতে-দেখতে ডোবা ভরে যাবে।"

গণপতি আবার তারিফ করল ভাইকে। "লাপাজু! দারুণ বলেছিস! তা তোকে তা হলে ডোবা খুঁজতে হবে।"

"খুঁজব কেন! খুঁড়ব। আমার কারখানার পাশে গোটা পাঁচ-সাত ডোবা খুঁড়িয়ে নেব। জল পচবে। ক্যারা লাগিয়ে দেব। ব্যস!"

গণপতি গাড়িতে হর্ন বাজাতে-বাজাতে খুশির গলায় বলল, "ইজি ব্যাপার গজু! ভেরি ইজি! ডোবা খুঁড়তে আর কী কষ্ট! মাটিকাটা লোক লাগিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। তবে এখন শীতকাল, জল পাবি কোথায়? মাটি খুঁড়েও চান্স নেই। অনেক ডিপে

যেতে হবে। এখানের জল তো ভাল। হাত তিরিশ মাটি না খুঁড়লে জল পাওয়া যায় না। তোকে কুয়াও খুঁড়তে হবে।"

গজপতি পকেট থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বের করল। তার মধ্যে গোল-গোল লজেন্স। গণপতিকে দিল একটা, নিজেও মুখে পুরল।

গণপতি লজেন্স মুখে দিয়েই কেমন বিশ্রী শব্দ করল। যেন গলায় ফাঁস লেগে গেছে। নাক-মুখ কুঁচকে ওয়াক তুলে ফেলে দিল লজেন্স। "ছ্যা-ছ্যা! এটা কী রে! গা গুলিয়ে মরে যাচ্ছি।"

গজপতি বলল, "ভাল জিনিসটা মুখে রুচল না তোর! এ হল থ্রোট লজেন্স। গলাটা খুসখুস করছে আমার। ঠাণ্ডায় হয়তো। তুইও মুখে রাখলে আরাম পেতিস।"

"কী আছে ওতে?"

"জিন্‌জার, মেনথল, পুদিনা, হিং..."

"হিং আর পুদিনা!... ছ্যা-ছ্যা! এটা কি তোর হিংপু ফরমুলায় তৈরি?"

"হ্যাঁ।...তা কাজের কথা শোন। আমি বলছি, ডোবা লাগবে পাঁচ-সাতটা। সেগুলো আমরা খুঁড়িয়ে নেব। জল কোনও সমস্যা নয়। কুয়া খুঁড়ে জল নিতে পারি, কিংবা ধর—রেলের লোকো ট্যাঙ্কের জল আনতে পারি নালা খুঁড়ে।"

গণপতি বলল, "গোশালার মাঠের কাছে লোকো ট্যাঙ্ক, আতা ঝোপে আকন্দ ফুল! গজা, তুই দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়েছিস। লোকো ট্যাঙ্ক পশ্চিমে, রেলের ডিসট্যান্ট সিগন্যালের দিকে; আর তোর গোশালার মাঠ পুব দিকে। গজা, তুই কি ভগীরথ হবি?"

কথা বলতে-বলতে গাড়ি গোশালার মাঠের দিকে চলে এল।

জায়গাটা ফাঁকা। গোটা দুই বড়-বড় বাগান। বাবুদের। আম, জাম, কলা, লিচু গাছও রয়েছে বাগানে। কাঁঠাল গাছও।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল দুই ভাই।

গণপতি বার কয়েক থুথু ফেলল। হিং জিনিসটা সে সহ্য করতে পারে না। কোনও খাবারের মধ্যে একটু-আধটু থাকলেও সে নাক সিঁটকোয়।

গজপতি বাগানের দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিচ্ছিল।

গণপতি বলল, "ধুত, এটা কি তোর কারখানার সাইট হল। একেবারে একপাশে। কারুর চোখে পড়বে না। তারপর তুই আর একটা জিনিস দ্যাখ। মাঠে একেবারে ঘাস নেই। গোশালার গোরুগুলো চরে-চরে মাঠ ফাঁকা করে দিয়েছে। ঘাস তো তোর চাই—তুই বলছিলি না?"

গজপতি মাথা নাড়ল। বলল, "না, আমারও পছন্দ হচ্ছে না। যে-ঘাসগুলো আছে একটু-আধটু—তার কোয়ালিটি ভাল নয়। কলাগাছগুলোরও কোনও লাইফ নেই। কলাপাতা না হলে তো আমার হবে না। কত কী চাই গণাদা! ঘাস, কলাপাতা, কুমড়োর খোসা, কাঁঠালের খোসা, পাতা, আরও সাত-সতেরো জিনিস।"

গণপতি বলল, "তোকে যা বলছি শোন। রেলের স্টেশন কাছে হবে, তুই ওই ডিসট্যান্ট সিগন্যালের দিকটাতে কারখানা লাগা। যা চাইবি সব হয়ে যাবে।...চল, ফরনাথিং এখানে দাঁড়িয়ে লাভ নেই।

তিন

ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছেই রেল-ফটক। তার একপাশে রেললাইন বরাবর ফাঁকা রুক্ষসুক্ষ মাঠ। এবড়োখেবড়ো, ছোটখাটো ঝোপঝাড়ে ভরতি। পলাশ ঝোপ, কুল ঝোপ। লাইনের অন্য পাশে টুকরোটাকরা খেতি, গেঁয়ো মানুষ সবজি ফলায় সামান্য। খাপরার চাল দেওয়া কুঁড়ে; দু-চার ঘর মানুষও থাকে ওখানে।

রুক্ষ মাঠের গজ পঞ্চাশের মধ্যেই এক পুকুর। পুকুর না বলে জলা বললেও বলা যায়। একসময় ছোট লাইনের ছোট ইঞ্জিনের জন্য এক লোকো শেড ছিল কাছেই, এখন শেডটা নেই। স্টেশনের অন্য দিকে ব্যবস্থা হয়েছে ছোট গাড়ি রাখার। কিন্তু এই জলা জায়গাটার নাম লোকো ট্যাঙ্কই থেকে গিয়েছে। বর্ষায় খুব মাছ ধরার ধুম জাগে ট্যাঙ্কে।

জায়গাটা পছন্দ করে গজপতি বলল, "গণাদা, তুই ঠিক বলেছিলি, এটাই বেস্ট, এর চেয়ে ভাল জায়গা হত না।"

গণপতি বলল, "তা হলে আমার চয়েসটা দ্যাখ। তোকে একেবারে হেভেন দিয়ে দিলুম।"

গজপতি হেভেন পেল কি পেল-না কে জানে, বলল, "জায়গাটা কার? রেলের?"

"রেল! রেল এত জায়গা নিয়ে কী করবে? খাবে? লাইনের পাশে দু-দশ হাত জায়গা ওদের হতে পারে। তুই ঘাবড়াস না, আমি পাত্তা লাগাচ্ছি।"

"তো ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি লাগা।"

"ওয়ান উইক! নে। চল...!"

ওরা ফিরতে যাবে এমন সময় বড় লাইনের গাড়ি আসার শব্দ পেল। হুইস্‌ল। দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জনেই।

দেখতে-দেখতে গাড়ি চলে এলে। সকালবেলার প্যাসেঞ্জার-গাড়ি। নয়-নয় করেও খানিকটা লম্বা বইকী! কম্পার্টমেন্টের খোলা জানলা দিয়ে প্যাসেঞ্জাররা মুখ বাড়িয়ে রয়েছে। কোনও-কোনও কামরায় আধ খোলা দরজার কাছে মোটঘাট ডাঁই করা। আগে-আগে নেমে পড়ার তাড়ায় মালপত্র টেনে এনেছে দরজার কাছে।

গাড়ি চলে যাওয়ার পর গণপতি বলল, "এখন থেকেই সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিতে হবে, 'সাইট ফর গজপতি ভেজিটেব্‌ল শু কোম্পানি।'

গজপতি বলল, "আগে জায়গাটা..."

"হয়ে যাবে। তুই ভাবিস না।"

ফেরার সময় গজপতি বলল, "গণাদা, তুই এখন কোথায় যাবি?"

"আমার দোকানে।"

গণপতি শৌখিন ছেলে। সে বাপ-কাকার মতন গুচ্ছের জবরজং ব্যবসা নিয়ে বসে থাকে না। তার হল জোড়া-দোকান। মানে একদিকে গান-বাজনার যন্ত্রপাতি, রেডিও, গ্রামোফোন, টেপরেকর্ডার, ক্যাসেট—এইসব বিক্রি হয়; পাশের দোকানে স্পোর্টস বা

খেলার জিনিসপত্র, ফুটবল, ক্রিকেট ব্যাট থেকে হকির স্টিক, আবার শাট্‌ল কক থেকে ক্যারাম বোর্ড পর্যন্ত।

গণপতি যে কতটা দোকান দেখে কে জানে, তবে তার দোকানে বন্ধুবান্ধবের জমজমাট আড্ডা জমে দু' বেলাই। সন্ধেবেলাতেই বেশি।

গজপতি বলল, "আমায় তা হলে দোকানেই নামিয়ে দিস। আমি একবার বাজার ঘুরে যাব।"

"বাজারে তোর কী কাজ?"

"ঘুরে যাব। একটা সার্ভে। ভেজিটেব্‌ল বাজারটা সার্ভে করে যাব।"

গণপতি ঘাড় হেলিয়ে জানিয়ে দিল, ঠিক আছে—তাই হবে।

আরও খানিকটা এগিয়ে এসে গণপতি বলল, "গজা, তুই আজ থেকেই প্ল্যানিং করতে বসে পড়। আগে কারখানার নকশা আঁক।"

গজপতি বলল, "বসব। তোর হাতে লোক আছে? যেমনটি বলব, তেমনটি করতে পারবে!"

"ভাল লোক আছে, নিউটন।"

"নিউটন?"

"আরে সে-নিউটন নয়, এ হল নয়াবাজারের লালটন। লালটু। লালু। লালুকে তুই চিনিস। তোতলা ছিল। মনে নেই?...লালুটার গলায় হরদম কাশি হত, ব্যথা হত, জ্বরজ্বালায় পড়ত। তা ও একেবারে আহাম্মকের মতন কাজ করল। টনসিল অপারেশান করাতে কলকাতায় গেল। ফিরে এল চিনে পটকার মতন গলার আওয়াজ নিয়ে। আরও তোতলাতে লাগল। অর্ধেক শব্দ ভাল করে উচ্চারণ করতে পারে না। নিউ টাউন-কে বলে নিউটন—মানে ওইরকম। আমরা তার নাম দিয়েছি নিউটন লালটন।" বলে গণপতি হেসে ফেলল। তারপরই বলল, "লালু কিন্তু এসব ভাল বোঝে। সিভিলের হাফ ডিপ্লোমা রয়েছে। ভাল ছেলে। গলাই ওকে মেরে দিল। বেচারি!"

গজপতি চিনতে পারল। লালুদা। আরে সর্বনাশ, লালুদা তো একবার সার্কাস পার্টিতে সাইকেলের খেলা দেখাবে বলে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আর একবার স্কুলের ফুটবল খেলায় গোলকিপার হয়ে খেলে সাত বোতল লেমনেড আর সাতটা গোল খেয়েছিল জেলা-স্কুলের সঙ্গে খেলায়। তবে হ্যাঁ, সাইকেলটা দারুণ চালাত। কায়দা দেখাত অনেক।

গজপতি বলল, "লালুদার গলা কোনও প্রবলেম নয়, মাথাটা ঠিক আছে তো?"

"পারফেক্ট। মাঝে-মাঝে কানেকশান লুজ হয়ে যায়, তা তেমন কিছু নয়। নো প্রবলেম।"

"পাব কোথায়?"

"দোকানে পাবি। আমার দোকানে আড্ডা মারতে আসে সন্ধেবেলায়।"

কথা বলতে-বলতে গাড়ি এসে গণপতির দোকানে সামনের থামল।

গজপতি বাড়ি ফিরল বেলা করে। সাদা কাগজ কিনেছে দিস্তে পাঁচেক, ড্রয়িং

পেপার দশ শিট, খাতা গোটা পাঁচেক, সিস পেনসিল, লাল-নীল পেনসিল ডজন খানেক। ইরেজার, রুল, কম্পাস, ক্লিপ, আরও কত কী! একটা ছোকরাকে দিয়ে বইয়ে এনেছে।

দুপুরবেলা থেকেই সে কাজে বসবে।

ঝিললির সঙ্গে দেখা সিঁড়িতে। অবাক হয়ে বলল, "মেজদা, এত কাগজ কী হবে?"

"কাজ আছে।" গজপতি গম্ভীর হয়ে বলল। ছোট বোনকে সে খুবই ভালবাসে। কিন্তু সকালবেলায় ওইটুকু মেয়ে পাকামি করে তাকে ঠাট্টা করেছে বলে একটু গম্ভীর হয়ে থাকল।

ঝিললি ঠোঁট টিপে হাসল, "ডিজাইন হবে? জুতোর?"

"না।"

"ডিজাইন করার সময় আমায় বোলো। আমি নয়া-নয়া ডিজাইন এঁকে দেব।"

"নিজের চরকায় তেল দে।"

ঝিললি সরে গেল। আর বেশি হাসতে সাহস পেল না।

গজপতির ঘর দোতলায়। নিজের ঘরে এসে কাগজপত্র সব নামিয়ে রাখল। ছেলেটাকে ছেড়ে দিল টাকা দিয়ে। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ে জিরোতে লাগল। ঘোরাঘুরি হয়ে গেছে অনেকটা।

ঘুম নয়, তন্দ্রাও নয়, চোখ সামান্য বোজা-বোজা হয়ে শুয়েছিল গজপতি। এমন সময় জ্যাঠাইমার গলা পেল। "বাবা গজানন—!"

জ্যাঠাইমা গজপতিকে বরাবর 'গজানন' বলেন। মা- কাকিমা বলেন, 'গজু'।

গজপতি উঠে বসল বিছানায়।

জ্যাঠাইমার সকালটা পুজোয়-পুজোয় ঠাসা। এখন শীতের দিন, ভোর-ভোর উঠে স্নান সেরে পুজো নিয়ে বসতে পারেন না। বয়েস হয়ে গিয়েছে, মাথার চুল পেকে সাদা হতে চলল, এ-সময় একটু বেলা হয় উঠতে, তারপর গরম জলে স্নান সেরে ঠাকুরঘরে গিয়ে বসেন। সাত ঠাকুর, সাতাশ রকম আচার। সেসব সেরে উঠতে-উঠতে পাক্কা আড়াই-তিন ঘণ্টা। এর পর তিনি সংসারের খবরাখবর নিতে শুরু করেন। নিজের হাতে কিছুই করতে হয় না, তবু তিনি বড়—পতি-পরিবারের অন্দরমহলের মাথা, তাঁকে তো সব খবরই রাখতে হয়।

পুজো সেরে কাপড়চোপড় বদলেই এসেছেন জ্যাঠাইমা। হাতে কিন্তু রুপোর ছোট রেকাবিতে প্রসাদী ফুলপাতা, দু-চার টুকরো মিষ্টি।

গজপতির মাথায়, বুকে ফুলপাতা ছুঁইয়ে মুখে এক টুকরো পেঁড়া ফেলে দিলেন আলগোছে। "কোথায় গিয়েছিলি?"

গজপতি বলল, "গণাদার সঙ্গে জমি খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।"

"শুনলাম, তুই নাকি জুতো তৈরি করবি?"

"আমি কেন তৈরি করব? কারখানা খুলে জুতো তৈরি করাব।"

"কে যেন বলল, ঘ্যাঁটের জুতো!"

"ঘ্যাঁটের জুতো?"

"হ্যাঁ রে, তাই তো বলল, শাকপাতা, আলু-কুমড়োর ঘ্যাঁট যেমন হয়!"

"বাজে কথা বলেছে তোমাকে। আমি যে-জুতো করাব, তাতে চামড়া থাকবে না। ভেজিটেব্‌ল শু। নিরামিষ জুতো!"

জ্যাঠাইমা বললেন, "খু-ব ভাল, খু-ব ভাল। নিরামিষ কত উপকারী জানিস? যে খায় নিরামিষ তার শরীরে যায় না বিষ। নিরামিষ খেয়ে আমার ঠাকুরদা একশো আট বছর বেঁচে ছিল। বাবা একশো এক। মুঙ্গেরে একবার এক সাহেব-ডাক্তার ঠাকুরদাকে নিয়ে মজা করছিল। ঠাকুরদার তখন একশো পেরিয়েছে। তোকে বাবা বলব কী গজানন, ঠাকুরদা সাহেবকে বসিয়ে বাজার থেকে বালুসাই আনাল এক সের করে। সাহেবকে বলল, 'সাহেব, আমি এই এক সের খাচ্ছি, ইউ ইট এক সের। কালকে এসো, দেখে যেয়ো।' ...তা পরের দিন সাহেব আর এল না, আসার অবস্থা ছিল না তার। ঠাকুরদা দিব্যি বাইরে বসে থাকল কুরসিতে। ...ভেবে দ্যাখ একবার, নিরামিষ কত উপকারী।"

গজপতি বলল, "আমার তো খাওয়া নয়, জুতো।"

"বুঝেছি। জুতো বলে কি ফেলনা।... দ্যাখ গজানন, মেজো বউ ছোট বউকে আমি বললাম, তোমাদের হাঁ হওয়ার কী আছে! আমরা যেমন ডাল ভিজিয়ে বেটে ধোঁকা করি, চাপ-চাপ, সেইরকম গজানন আমার নিরামিষ দিয়ে জুতো তৈরির ধোঁকা করবে? ঠিক কি না বল?"

গজপতি বলল, "ঠিক। জেঠিমণি, তুমি ঠিক বুঝেছ! ধোঁকা আমি করব না, কিন্তু ওইরকম একটা জিনিস তৈরি করব। মোটা, মাঝারি, পাতলা—নানারকমের। তাই দিয়েই জুতো হবে।"

"তাই কর বাবা! তুই ছাড়া কে আর পারবে! কত লেখাপড়া শিখেছিস, ঘুরে বেড়িয়েছিস, দেখেছিস...তুই-ই পারবি!"

জ্যাঠাইমা চলে গেলেন।

গজপতি ঘরের মধ্যে খানিকটা পায়চারি করে নিল। কী যেন ভাবছিল নিজের মনে। ঘরটা বারবার দেখল। মাঝারি ঘর। জানলা গোটা তিনেক। খাট, আলমারি সবই আছে, টেবিলও রয়েছে। তবে টেবিলটা বড় নয়। বড়সড়, হাত দশেক একটা টেবিল দরকার। এই ঘরে অবশ্য সেটা রাখা যাবে না। জায়গা নেই।

বাইরে পায়ের শব্দ পেয়ে গজপতি ডাকল, "কে রে?"

"আমি! রতন!" মুখ বাড়াল রতন। এ-বাড়িতে কাজ করে। আধ-বুড়ো।

গজপতি বলল, "রতনদা, নীচে একটা বড় ঘর ছিল; হলঘরের পাশে, সেখানে এখন কী হয়?"

"বেম্পতিদাদারা বেঁটে-বেঁটে ব্যাট আর ছোট-ছোট বল নিয়ে খেলে।"

"কোথায় বেম্পতি?"

'ডেকে দেব?"

"দাও।"

রতন চলে গেল।

সামান্য পরেই বৃহস্পতি এল। কাকার ছেলে। ছিমছাম দেখতে, উজ্জ্বল চোখ, মুখভরা হাসি, মাথায় বড়-বড় চুল, মেয়েদের মতন, গলায় সোনার চেন।

"মেজদা, ডেকেছ?"

"নীচের বড় ঘরটায় তোরা খেলিস?"

"টেব্‌ল-টেনিস।"

"ঘরটা আমায় ছেড়ে দিবি?"

"কেন, এ-ঘরে তুমি থাকবে না? তোমার ঘর।"

"এখানেই থাকব। নীচের ওই ঘরটা আমার দরকার। ওখানে আমি অফিস করব এখন। কাজকর্ম হবে। কাগজপত্র, আঁকিজুকি, স্ট্রাকচারের প্ল্যানিং। তা ছাড়া, একটা টেবিল পাতব—মস্ত টেবিল—লম্বাতেই দশ ফুট অন্তত। চওড়া তিন ফুট। ওই টেবিলের ওপর মডেল খাড়া করব। ফ্যাক্টরির মডেল।"

বৃহস্পতি তার মেজদাকে দেখল ভাল করে, তারপর বলল, "বেশ তো, ঘরটা তুমি নিয়ে নাও; কিন্তু ওই ঘরে গোটা দশ-বারো ধেড়ে ইঁদুর আছে। বাগান থেকে আসে। তোমার কাগজপত্র, মডেল তো নষ্ট করে দেবে!"

গজপতি ভাইয়ের মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল। তারপর মিটমিট করে হাসল। বলল, "ইঁদুর আমার কী করবে! ইঁদুরদের আমি ঘুম পাড়িয়ে দেব। র‍্যাট-ট্র্যাংকুলাইজার জানিস? এক মিলি আর-টি খেলে পাকা তিনদিন ঘুমোতে হবে।'

বৃহস্পতি বড়-বড় চোখ করে বলল, "র‍্যাট-ট্র্যাংকুলাইজার! লাইফে শুনিনি, মেজদা। র‍্যাট-কিলার জানি। ইঁদুর মারার বিষ!"

গজপতি বলল, "অহিংসা পরম ধর্ম। ইঁদুর হলেও মারতে নেই। ধরতে চাও, ধরো, ধরে বাইরে বনবাদাড়ে ফেলে দিয়ে এসো। নো কিলিং!"

বৃহস্পতি মাথা নাড়তে-নাড়তে বলল, "বাঃ, দারুণ! মেজদা, একেই বলে ব্রেন-ক্র্যাকিং; মার্ভেলাস!"

চার

রেল-ফটকের কাছে জমির খোঁজ চলতে লাগল। এসব ব্যাপার দেখাশোনা করার দায়িত্ব মহীপতির। তিনি বড়। পতি-পরিবারের ঘরবাড়ি, জমি-জায়গা, বাজারের শেড, দোকানঘর—এ-সবই তাঁর তদারকিতে চলে। উমাপতি দেখেন বাস কোম্পানি ও অন্যান্য ব্যবসা।

জমির যারা খোঁজখবর রাখে তারা হন্যে হয়ে রেল-ফটকের কাছাকাছি জমির মালিকদের খুঁজে বার করতে লাগল। ওসব পড়তি, রুক্ষ, নেড়া জমির মালিকই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল বানোয়ারিজিকে। বানোয়ারিলালদের আগে ছিল মাইকার ব্যবসা। ভদ্রলোকের বাবা মারা যান বছর বারো চৌদ্দ আগে। ব্যবসা তার আগেই উঠে গিয়েছিল। বানোয়ারিলাল এখন গিরিডির বাড়িতে থাকেন। তাঁর পোষ্য বলতে, একজোড়া পালোয়ান, চারটে বিরাট সাইজের ভেড়া, পাকানো শিং; দুটো ভাগলপুরি গাই। বানোয়ারিজির নেশা হল বা শখও বলা যায়—নিজের দুই পালোয়ান নিয়ে কুস্তি কম্পিটিশানে যাওয়া। তাঁর পালোয়ান জিতলে সঙ্গে-সঙ্গে হাজার টাকা বকসিস। হারলে আর রক্ষে নেই। চার-চারটে শিংওয়ালা বিরাট ভেড়া নিয়ে বানোয়ারিজি সারা শীত ভেড়িয়া কি লড়াই লাগিয়ে বেড়ান। গোরুগুলো অবশ্য বাড়ির জন্যে। পালোয়ানদের জন্যে আছে ভইসা—মানে মোষ। ভদ্রলোকের অন্য কোনও বাজে নেশা নেই। তবে দিনে পঞ্চাশ-ষাটটা পান খান।

কাছাকাছি কোথায় এসেছিলেন বানোয়ারিজি। জমির দালালের কাছে খবর পেয়ে মহীপতি গণপতিকে বললেন, "গণা, তুই গজুকে নিয়ে যা। কথা বলে আয় বানোয়ারিলালের সঙ্গে । বলবি, পাঁচ-সাত বিঘে জমি চাই। দেরি করলে চলবে না।"

গণপতি বলল, "দাম-দর কী বলব?"

"তুই আগে দর বলবি না। জমি তার, দর সে বলবে।"

"তবু...?"

"ওসব জমির দাম নেই। জলের দর । বেশি হাঁকবে না। কথা বলে দ্যাখ। বাবার কথা বলবি। বাবাকে বোধহয় চেনে। আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল একবার। মনে আছে কি না জানি না।"

গণপতি বলল, "ভাবতে হবে না। আমি ব্যবস্থা ফাইনাল করে ফিরব।"

ময়ূরগঞ্জে নয়, মাইল দশ-পনেরো দূরে তিলাইগাঁও বলে একটা বড় জায়গায় শীতের মেলা বসেছে। বিরাট মেলা। এ-মেলার খুব নামডাক। এখানে বিক্রি-বাটা হয় নানান জিনিস, হই-হুল্লোড়ও হয় হরেক রকমের । রামলীলা থেকে ছোটখাটো সার্কাস, সবই হয়। বানোয়ারিজি মেলায় এসেছেন তাঁর চারটে ভেড়িয়া নিয়ে। লড়াই লাগাবেন। প্রতি বছর না আসলেও মাঝে-মাঝে মেলায় আসেন তিনি। ভেড়ার লড়াইয়ে নিজের ভেড়াদের জিতিয়ে গলায় গাঁদাফুলের মালা পরিয়ে ফিরে যান। লরি করেই আসা-যাওয়া।

গণপতি, গজপতি দুই ভাই পতিবাবুদের জিপে করে মেলায় এল সকালের দিকে। খানিকটা বেলায়।

এসে দেখল, মেলা থেকে সিকি মাইলটাক দূরে বানোয়ারিজির ক্যাম্প পড়েছে। মামুলি এক খোলার চালওলা কুঁড়ের কাছে তেরপল দিয়ে অনেকটা জায়গা ঘেরা। সেখানে তাঁবু পড়েছে। বানোয়ারিজির লোকজন খাটাখাটি করছে। হাঁড়ি, ডেকচি, কড়াই, আলু, কপি, টমাটো, কড়াইশুঁটি, বড়-বড় উনুন, ডে-লাইট বাতি—আরও কত কী! সে এক এলাহি কাণ্ড।

বানোয়ারিজি নিজে ভেড়াদের প্র্যাকটিস তদারক করাচ্ছিলেন। দুটো লোক

ভেড়াদের ধরে রেখেছে।

প্র্যাকটিস ব্যাপারটা দেখার মতন। বালির বস্তা, কাঠের গুঁড়োর বস্তা থেকে শুরু করে ইটের বস্তা, কাঠের তক্তা, মায় শালের ছোট-ছোট খুঁটি। ভেড়াগুলো হাত কয়েক দূর থেকে শিং বাগিয়ে এসে ঢুঁ মেরে-মেরে প্র্যাকটিস সেরে নিচ্ছে।

কাছেই একটা কাঠের চেয়ারে বানোয়ারিজি বসে। পরনে পাজামা, গায়ে ফতুয়ার ওপর গরম চাদর। চেহারাটি এমন কিছু বিশাল নয়—কিন্তু গোঁফটি দেখার মতন, দু' পাশে কান-ছোঁয়া। মাথায় চুল প্রায় নেই।

গণপতি আর গজপতি গিয়ে সামনে দাঁড়াল।

বানোয়ারিজি খেয়াল করলেন না। তিনি তাঁর ভেড়াদের তেড়ে যাওয়া, ঢুঁ-মারা, পিছিয়ে এসে আবার ছুটে যাওয়া নজর করছিলেন।

গণপতি বাহবা দিতে লাগল।

বানোয়ারিজির খেয়াল হল। দেখলেন গণপতিদের। একটু যেন হাসলেন।

"কী হে ছোকরা! কেমন দেখছ?"

"জি। ফ্যান্টাসটিক। ...লাপাজু।"

"আরে, লাপা-উপা রাখো। লালাপ্রসাদজি কী করবে! ও তো বাচ্চা! আমার ভেঁড়িয়ারা পাটনা-চ্যাম্পিয়ান। এ তো থোড়া কুছ দেখছ! লড়াইয়ের টাইমে দেখবে! তোমরা কাঁহাকার ভেঁড়িয়া?"

গণপতি গজপতিকে দেখল। তারপর বানোয়ারিজিকে বলল, "আমরা ভেঁড়িয়া নই চাচাজি। ভেড়া-পার্টিরও কেউ নয়।"

"তো তোমরা কে?"

গণপতি তার ঠাকুরদার, বাবা, কাকার পরিচয় দিল।

বানোয়ারিজি খুবই খুশি হয়ে বললে, "ধনপতিবাবুজির নাতি তোমরা। বা, বা! বহুত খুশ হলাম। চলো, তাঁবুতে চলো। চা, জিলাবি, হালুয়া খাবে।"

তাঁবুতে এসে কথা হল।

বানোয়ারিজি হেসেই মরেন। "আরে, এই জমি যে আমার—আমি নিজেই জানি না। গিরিডিতে গিয়ে খোঁজ করব। যদি আমার হয়—পাঁচ কেন, দশ বিঘে জমি তোমরা নিয়ে নাও। দাম যা হয় দেবে। কুছ পরোয়া নেই। ধনপতিবাবুজির নাতি তোমরা! আরে-ব্বাস তোমাদের কত ইজ্জত! কিন্তু, তোমাদের জুতো কোম্পানির এজেন্সি আমাকে দিতে হবে। পাক্কা কথা দাও।"

গণপতি আর গজপতি কথা দিয়ে উঠে আসবে—হঠাৎ বানোয়ারিজি বললে, "এখন কোথায় যাবে তোমরা! দুপুরে আমার ভেঁড়িয়ারা লড়বে। লড়াই দেখে তারপর যেও। লড়াইয়ের সময় চিল্লাতে হবে। বুঝলে। আমার চিল্লাবার লোক কমতি পড়ে গেছে হে গন্‌পত গজ্‌পত।"

গণপতি বলল, "ঠিক হ্যায়, চেল্লাব।"

ফিরতে-ফিরতে বিকেল।

গণপতির গলা ভেঙে গিয়েছিল চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে। বানোয়ারিজির ভেড়াগুলো গায়ে আছে; বুদ্ধিতে একেবারে গাধা। বোধ হয় চোখে টেরা। কোনাকুনি ছোটে। বড় ভেড়াটা প্রথম রাউন্ডেই রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাচ্ছিল আর কী! তাকে আবার লড়িয়ে দিতে হিমসিম খেয়ে যেতে হল। চার রাউন্ড লড়ে সে-গাধা জিতে গেল। মেজো ভেড়াটা একেবারে ফেরোসাস। দু'-রাউন্ডেই তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করে দিল। তা শেষ পর্যন্ত বানোয়ারিজিরই জয় হল। অন্তত আজ। কাল অন্য দুটো ভেড়া লড়বে। আজ হল কোয়ার্টার ফাইনাল। কাল সেমিফাইনাল। ফাইনাল পরশু।

গজপতি বেশি চেঁচায়নি। তার তেমন অভ্যাস নেই চেঁচানোর। তবু তারও গলা বসে গেছে।

ফেরার পথে গণপতি বলল, "গজা, বানোয়ারিজির ভেড়া না জিতলে কেস খারাপ হত। জিতে গিয়েছে। কাজ তা হলে মিটল?"

গজপতি বলল, "মোটামুটি।"

"ও হয়ে যাবে। ভাবিস না। মাসখানেক বড়জোর।"

গজপতি কিছু বলল না।

আরও খানিকটা আসার পর গজপতি বলল, "গণাদা, আমার একটা ছাপ্পা দরকার।"

"ছাপ্পা?"

"আরে ওই যে কোম্পানির মার্কা।"

"ও, সিম্বল!"

"এম্‌ব্লেম।"

"দিয়ে দে। ক-ত্ত আছে। ভেড়াও দিতে পারিস।"

"ভেড়া। ভেজিটেব্‌ল শু-এর মধ্যে ভেড়া?"

"না, গজা—আমি বলছিলাম ভেড়া খারাপ কীসের। এই তো তোর উলের কোম্পানিরা ভেড়ার ছাপ মারে। ভেড়া খারাপ জন্তু নয়।"

গজপতি মাথা নেড়ে বলল, "ভেড়া পশু। আমার কোম্পানির ছাপ্পায় পশু কেমন করে আসবে! তোর একথা মনে হল কেন?"

গণপতির গলার এমনই অবস্থা যে শব্দ বেরোচ্ছে না, বাসন-মাজার শব্দের মতন কর্কশ এক আওয়াজ বেরোচ্ছিল। গণপতি বলল, "ভেড়ার লড়াই দেখে সদ্য ফিরছি কিনা, তাই মনে পড়ল। ধর, সিম্বলটা এমন হল—একটা ভেড়া শিং বাগিয়ে গাছের গুঁড়িতে ঢুঁ মারছে।"

"ঢুঁ মারছে? জুতোর কি শিং থাকে?"

"আরে না, না। তুই বুঝবি না। ওটা হল সিম্বল। মানে দেখানো হচ্ছে, গজপতির জুতো কেমন শক্ত। ভেড়ার শিংয়ের মতন। এই জুতো পায়ে যেখানে খুশি যাওয়া যায়। ভেরি হার্ড, পাওয়ারফুল...। টেকসই।"

গজপতির ঠিক পছন্দ হল না। বলল, "না, গণাদা, জন্তু-জানোয়ার টানিস না। তা হলে তো গণ্ডারও সিম্বল করা যেতে পারে, হোয়াই ভেড়া! না না, সেটা উচিত হবে

না। তুই অন্য কিছু ভাব।"

ভাবতে-ভাবতে দুই ভাই প্রায় ময়ূরগঞ্জে পৌঁছে গেল। তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। শীতের কনকনে বাতাস ছুটছে।

গণপতি বলল, "গজা, আমি ফেড-আপ হয়ে গেলাম। ভেজিটেব্‌ল-এর মধ্যে শক্ত কিছু পাচ্ছি না। যা ভাবছি সবই নরম। আলু, পটল, কুমড়ো, কপি, কচু-ঘেঁচু—সবই নরম, সেদ্ধ করলেই গলে যায়। তুই অন্য কিছু ভাব।"

গজপতিরও মাথায় কিছু আসছিল না।

বাড়ি এসে দুই ভাই গাড়ি থেকে নামতেই নয়াবাজারের নিউটন লালটন—মানে লালটু বা লালুর সঙ্গে দেখা।

লালুর চেহারা দেখলে মনে হবে সে মাথায় যতটা লম্বা, চওড়ায় তার সিকিভাগ। তাকে লম্বুবান বলা যায়। সার্কাসে এক চাকার লম্বা খেলা-দেখানো সাইকেল যেমন অদ্ভুত দেখতে হয়—লালুর চেহারাটা সেইরকম। মাথায় তালগাছ, গায়ে কাঠি। তবে হ্যাঁ, তার পা দুটো বেশ লম্বা। লালু দারুণ সাইকেল চালাতে পারত বলেই বোধহয় ওইরকম লম্বাটে পা হয়েছে। কিংবা লম্বা পায়ের জন্যেই সে পয়লা নম্বর সাইকেলিস্ট হয়েছিল। সার্কাস পার্টিতে গিয়েছিল সাইকেলের খেলা দ্যাখাতে। ভাল লাগেনি সার্কাস পার্টি। ফিরে এসেছিল যথারীতি।

লালুর গায়ের রং ধবধবে। নাক, চোখ, মুখ বেশ দেখতে। মাথায় একরাশ চুল। সবই ভাল, শুধু মাত্রাছাড়া লম্বা, আর রোগা। সে বলে, তার টনসিলের রোগের জন্যেই সে অমন ঢেঙা হয়ে গেছে। টনসিল না কাটালে অমনটা হত না।

লালু বলল, 'গি-গিয়েছিলে কোথায়?"

গণপতি বলল, "ভেড়ার লড়াই দেখতে।"

"ভে-ভে-ভেড়ার লড়াই। কে লড়ছিল?"

"ভেড়া লড়ছিল। ...তুই কতক্ষণ!"

"এই এলাম।"

গজপতি বলল, "লালুদা, আজ বসতে হবে।"

লালু বলল, "আমি রে-রেডি। এ-কটা ড-ড্রয়িং করে এনেছি। পকেটে আছে।"

"চলো, তবে বসি। ...তুমি আমায় আধ ঘণ্টা সময় দাও। সারাদিন বাইরে ছিলাম—একটু ফ্রেশ হয়ে আসি।"

লালু বলল, "যা—যা; সাফাই সে-সেরে আয়। ভে-ভেড়া বড় ব্যাড স্মেলিং। নেপথলিন বাথ নিতে পারলে ভাল হত। এই শীতে, তু-তুই কত জল ঘাঁটবি! ঠাণ্ডা লেগে যাবে।" বলতে-বলতে লালু নিজের পুরোহাতা সোয়েটারটা পরে নিল। গায়ে যেটা ছিল সেটা হাফহাতা সোয়েটার। টনসিলের রোগী বলে মাফলারও সঙ্গে আছে।

গজপতি চলে যাচ্ছিল, লালু হাঁক মেরে বলল, "অফিসঘরে আলো দিতে বলে দে। বেশি-বেশি চা পা-পাঠাতে বলবি। আর ইয়ে—গজুভাই—দু' প্যা-প্যাকেট প-প-পটেটো চিপস...।"

গণপতি বলল, "পটেটো চিপস খাবি তো ড্রয়িং করবি কখন?"

"ড্রয়িং ফিনিশ।" বলে লালু সাইকেলের হ্যান্ডেলের সঙ্গে ঝোলানো ব্যাগটা দেখাল। "ওর মধ্যে আছে। দেখবি?"

"পরে দেখব। তুই ঘরে যা। আমিও ওয়াশ করে আসি। ভেড়ার গন্ধ ভ-ভ করছে।"

লালু বলল, "যা, ধোলাই সেরে আয়।"

পাঁচ

গজপতি অনেকক্ষণ ধরে লালুর আঁকা ড্রয়িং দেখতে-দেখতে শেষে বলল, "লালুদা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

লালু একটু হেসে বলল, "পারছিস না? পারবি! ভাল করে লুক কর। পে-পেরে যাবি। তোর কী মনে হচ্ছে?"

গজপতি কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, "পিকচার পাজল!" বলে মাথা চুলকোতে লাগল।

"দূ-র! পা-জ-ল কী রে! এ হল মডার্ন স্টাইল!"

"তবে কি সার্কাসের তাঁবু?"

লালু এবার এগিয়ে এল।

ঘরে দুটো বাতি জ্বলছিল। তিন নম্বরটাও জ্বালিয়ে দিল লালু। জোরালো আলো।

বড়-বড় জানলা ঘেঁষে পুব-দেয়ালের মাঝামাঝি এক বোর্ড ঝোলানো হয়েছে। কাঠের বোর্ড। বোর্ডের গায়ে ভেলভেটের মতন এক কাপড় লাগানো। নীলচে রং কাপড়টার। তার ওপর লালুর ড্রয়িংয়ের মস্ত কাগজ। পিন দিয়ে আটকানো।

সামান্য তফাতে গজপতির সেই লম্বা টেবিল। যার ওপর সে তার কারখানার মডেল তৈরি করে সাজাচ্ছে। রাশিকৃত কাগজ—রঙিন, সাদা; গোটা দুয়েক কাঁচি; মুঠো-মুঠো রঙিন পেনসিল, রং, আঠা, আরও অজস্র জিনিস ছড়ানো।

লালু বোর্ডের কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হাত বাড়িয়ে ভূগোল মাস্টারের মতন তার আঁকা ড্রয়িং দেখাতে-দেখাতে বলল, "সার্কাসের টেন্ট নয়, ভা-ল করে দ্যাখ।... ওই যে দাগ দেখছিস—চারপাশে, বু-বু-ব্লু দিয়ে মার্ক করা, ওটা হল গিয়ে তোর কারখানার কম-কম্পাউন্ড ওয়াল।"

"কম্পাউন্ড ওয়াল গোল কেন? কারখানা কি শিব মন্দির?"

"না, না, বাইরের দিকটা গোল করে সাজালে দেখতে ভাল লাগবে। সার্কুলার ডিজাইন এখন খুব চলছে।"

"ও!"

"বাইরের কম্পাউন্ড ওয়ালের পর—তোর দু' নম্বর ওয়াল। দ্যাখ, ভাল করে দ্যাখ। দু নম্বর ওয়ালের হাইট কম। চার ফুট। ওটা তোর জুতোর স্টাইলে তৈরি হবে, উঁচু-নিচু উঁচু-নিচু; মা-মানে—উঁচুর দিকটা হল গোড়ালি, নিচুর দিকটা আঙুল। বুট

জুতোর ধরন আর কী! এটা তোর সেকেন্ড ফ্রন্ট। দুটো দেয়ালের মধ্যে পনেরো-বিশ ফুট জায়গা ছাড়। সেখানে সামনের দিকে ঘাসের লন আর ফু-ফুল গাছ। পেছনের দিকে অনলি গা-গা-গ্রাস,ইয়ে ঘাস—বড়-বড় ঘাস। ঘাস তোর কাজে লাগবে।...মানে তোর মেটিরিয়াল হিসাবে কাজে লাগবে।”

গজপতি বলল, “দুটো ওয়ালের কী দরকার! একটা থাকলেই তো হত। আর ঘাসের জন্যে মাঠ পড়ে আছে।”

“দূ-র! ও মাঠে কো-কোয়ালিটি ঘাস হবে না। গোরু-খাওয়া ঘাসে কী হবে রে! তোর ভাল ঘাস চাই। বড়-বড়, গ্রিন। তুই বলছিলি জাপানে কোথায় যেন...”

“ওকাইয়ামা। সমুদ্রের ধারে...”

“সেই কোয়ালিটি এখানে পাবি না। আমি তোকে অন্য ঘাসের ব্যবস্থা করে দেব। হাতখানেক বড় হবে। আর কী তাড়াতাড়ি বাড়ে রে! সকালে কাটলি—সন্ধেতেই সিকি হাত। পরের দিন সকালে আধ হাত।...তা এর পর—ওই দ্যাখ, ওই যে স্কোয়ার জায়গাটা—ওখানে হবে তোর অফিস। আর ওই লাইনে যে লম্বা-লম্বা দাগটানা জায়গা দেখছিস, ওটা তোর ফ্যা-ফ্যা-ফ্যাক্টরির জায়গা। ও-পাশে শেড। তারপর রয়েছে ফাঁকা জায়গা। একেবারে শেষের দিকে কুয়া। বড়-বড় দুটো কুয়া, ভাল জলের জন্যে।”

গজপতি বলল, “আমার ডোবা কই! ডোবা না থাকলে ক্যারাক্যারাম্বুলার চাষ করব কোথায়?”

লালু হাসতে-হাসতে অভয় দিয়ে বলল, “গজু, লালু কিছু ভোলে না। তুই যা-যা বলেছিস সব পাবি। ডোবা? ডো-বা!” বলতে-বলতে সে এগিয়ে এল আরও দু' পা, এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে ড্রয়িংটার একটা জায়গা দেখাল। বলল, “লুক হিয়ার! কী দেখছিস? পেছনের দিকের কম্-কম্পাউন্ড ওয়ালের পর কয়েকটি গোল্লা। ছ'টা। গোল্লাগুলোর পাশে ক্রস চিহ্ন। এই গোল্লাগুলো হল ডোবা। আর ক্রস চিহ্নগুলো হল টেরা স্টক করার জায়গা।”

গজপতি বলল, “টেরা নয়, ক্যারা। ক্যারাক্যারাম্বুলা!”

“ওই হল! ক্যা-ক্যারাও যা, টেরাও তাই। তো তুই ভেবে দ্যাখ, ক্যা-ক্যারা তুলে রাখার জন্যে আমি শেড করেছি। শেডের তলায় বিগ-বিগ চৌবাচ্চা থাকবে। সেই চৌবাচ্চায় তুই টেরা জমাবি।”

গজপতি বলল, “তা ওটা তুমি কী করছ? মাথার ওপর একটা পতাকা মতন?”

“প-তা-কা!” লালু অবাক। “পতাকা কোথায়? গজু, তুই সব ভুলে গিয়েছিস। পতাকা কেন হবে! ও হল উইন্ড মিল, বাতাস-কল। ট্যাঙ্ক থেকে জল আনতে হবে না? হার্ড টু ব্রিংগ? উইন্ড মিলের কথা মাথায় এল। লাগিয়ে দিলাম। মাথার ওপর পাখা ঘুরবে বাতাসে—আর তোর লোকো ট্যাঙ্কের জল টেনে আনব পাইপ দিয়ে।...কেমন আইডিয়া, বল?”

গজপতি খুশি হল। নালা কেটে জল আনার চেয়ে এটা বরং ভালই হল।

গজপতি বলল, ‘ঠিক আছে। দু-এক জায়গায় অদলবদল করতে হবে। সে পরে

দেখা যাবে। জমিটা আগে হাতে পাই।”

লালু বলল, “পাবি। জমি যাবে কোথায়!”

গজপতি এবার নিজের মডেল দেখতে-দেখতে বলল, “লালুদা, কারখানার কোথায় কী থাকবে, এই মডেলে সাজিয়ে দিচ্ছি। তোমাকে ঠিক এইভাবে সব করতে হবে।”

“হয়ে যাবে, তুই ভাবিস না!”

“তুমি বাজারে খোঁজ করেছ?”

“করছি। মিস্ত্রি, ইট-সিমেন্ট, সবই পাওয়া যাবে। ক-ক-কন-কনস্ট্রাকশনের কোনও অসুবিধা হবে না। শুরু করলে দন-দনাদ্দন মেরে দেব।”

এমন সময় গণপতি ঘরে এল।

লালু বলল, “গণা, ড্র-ড্রয়িং দেখছিস?” বলে হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে ড্রয়িং দেখাল।

ভাঙা গলায় গণপতি বলল, “দাঁড়া বাবা। কোমরে খিঁচ লেগে গেছে।”

“কেমন করে?”

“ভেড়ার লড়াই লাগাচ্ছিলাম কোমর নিচু করে। গলার অবস্থা দেখেছিস! শব্দ বেরোচ্ছে না।”

গজপতি বলল, “তুই বড় বেশি চেঁচাচ্ছিলি! অত চেঁচাচ্ছিলি কেন গলা ফাটিয়ে। ভেড়া তোর নয়।”

গণপতি বলল, “সাধে চেঁচাচ্ছিলাম! ভেড়া না জিতলে সহজে জমি পেতিস না, গজা! ভেড়া-বাবুজির মেজাজ বিগড়ে যেত।...তা তুই যাই বলিস, দু’ নম্বর ভেড়াটা দারুণ। আফগানি বোধ হয়!”

“আফগানি?”

“ওই মুলুক থেকে ওর বাপ-ঠাকুরদা কি তার ঠাকুরদা এসেছিল নিশ্চয়। কী তেজ রে! ব্রুস লি স্টাইলে লড়ে গেল। দাঁড়াতেই দিল না রাইভ্যালকে!”

লালু বলল, “ড্রয়িংটা একবার দ্যাখ?”

গণপতি এগিয়ে গিয়ে মুখ তুলে ড্রয়িং দেখতে লাগল।

খানিকক্ষণ দেখার পর বলল, “দূ-র! এটা কী হয়েছে? এ তো দেখছি, জিলিপির প্যাঁচ!”

লালু কেমন থমকে গেল। বন্ধুর মুখ দেখতে-দেখতে বলল, “জিলিপির প্যাঁচ? জিলিপি পেলি কোথায়?”

“তুই নিজেই দ্যাখ!”

“গোল ডিজাইন বলে বলছিস? আমি তো ওই স্টাইলটা নিয়েছি। সার্কুলার ডিজাইনের স্টাইল!”

“কেন নিয়েছিস! এটা কারখানা। ফ্যাক্টরি। কারখানা কি তোর ওইরকম জিলিপি-মার্কা হয়? লম্বা হবে। দেখিসনি কারখানা! কারখানার স্টাইল হল দিস এন্ড টু দ্যাট এন্ড। স্ট্রেট। রেল লাইন বরাবর লম্বা চলে যাবে। আমাদের মাধোরাম বলরাম

রামরাম স্টিল কোম্পানির কারখানা দেখিসনি দাগাপুরে? লাইক দ্যাট।”

লালু বলল, “লোহার কারখানা আর জুতোর কারখানা এক হল?”

“কারখানা ইজ কারখানা, সে তোর জুতোর হোক আর লোহার হোক। তুই লম্বা স্টাইলে প্ল্যান কর। দেখবি ভাল হবে। চেহারা খুলে যাবে। একেবারে লাপাজু!”

লালুর মানে লাগল। অভিমান করে বলল, “গণা, আমি খেটেখুটে মাথা খা-খাটিয়ে একটা প্ল্যান করলাম, তুই আমার ড-ড্রয়িং রি-রি-রিজেক্ট করে দিলি!”

গণপতি বলল, “বাজে কথা বলিস না! রিজেক্ট কোথায়! একটু শোধরাতে বলছি। তোর ইচ্ছে না হয়, করিস না! কোম্পানি গজার। গজার যা পছন্দ তাই হবে।”

গজপতি বলল, “লালুদা, তোমার এই ড্রয়িংটা থাক। এটা কাজে লাগবে। আমি বলি কী, তুমি আরও একটা ড্রয়িং করো। ফ্রন্ট পোরশানের। লম্বা স্টাইলে করো। আর দুটো দেয়ালের বদলে একটাই রাখো।”

“একটা? তা হলে ঘাস?”

“পাশের মাঠে হবে।”

“কচু হবে। গোরু-মোষে মুড়িয়ে খেয়ে যাবে।”

গণপতি বলল, “তারকাঁটার ফেন্সিং দিয়ে দিবি।”

লালু আর কিছু বলল না। মুখে কিছু না বললেও মনে-মনে বেশ দুঃখ পেয়েছিল সে। অনেক মাথা খাটিয়ে এমন সুন্দর একটা প্ল্যান করল লালু—, নতুন ধরনের, দেখতে চমৎকার লাগত, অথচ গণপতি আর গজপতি—সেটা বুঝল না। আসলে ওরা পেনসিলের দাগটাই চোখে দেখছে—তার বাইরে মনে-মনে ভাবতে পারছে না। দু'জনেই বোকা।

লালু হঠাৎ বোর্ড থেকে তার আঁকা ড্রয়িংটা খুলে নিতে লাগল।

গজপতি বলল, “ও কী! খুলে নিচ্ছ যে?”

“রেখে কী হবে! আবার একটা করে আনব।”

“আহা, তা বলে খুলে ফেলবে! তোমাব প্ল্যানের কয়েকটি ব্যাপার আমার খুব পছন্দ।”

লালু খুলে নিল ড্রয়িংটা। নিয়ে গোল করে পাকিয়ে নিতে-নিতে বলল, “নতুনটা করে ফেলি। তারপর ফা-ফাইনাল করা যাবে।”

গণপতি তার বন্ধু লালুকে হাড়ে-হাড়ে চেনে। সবই ভাল লালুর—তবে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেলে ঝপ করে ডুব মেরে দেয়। বন্ধুদের কাছে আসে না আড্ডা মারতে, বাড়িতেও থাকে না। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাইরে। যেখানে খুশি চলে যায়, দু-পাঁচদিন যত্রতত্র পড়ে থাকে, তারপর মেজাজ ভাল হলে আবার বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ির লোক সবাই জানে। তবু বাড়ির ছেলে হুট করে বেরিয়ে গেল, আট-দশ দিন আর ফিরল না, কোথায় গেল, কী হল, এসব দুর্ভাবনা ভাবতে-ভাবতে মরে যায় প্রায়।

লালুর মেজাজ শোধরাবার জন্য গণপতি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। লালু বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে গেলে গণপতিরও কি কম হাঙ্গামা সহ্য করতে হয়!

গণপতি খুব আদর করে লালুর গলা জড়িয়ে ধরল। "লালু, লালু—লালটন, লালুভাই, তুই রাগ করলি?"

"না।"

"তুই রাগ করেছিস।...রাগ করলে তোর টনসিল টাটাবে।...শোন, তুই যে-প্ল্যানটা করেছিস—সেটা আমরা অন্য কাজে লাগাব। ধর, কারখানার কাছে একটা ছোট গেস্ট হাউস করা গেল। বাইরে থেকে যারা আমাদের কারখানা দেখতে আসবে—বড়-বড় লোকরা, ভিজিটার্স, তারা থাকবে। আরামসে থাকবে। থেকে বর্তে যাবে। তোর নাম ছড়িয়ে পড়বে।...জুতো কারখানার প্ল্যানটা তুই কারখানা স্টাইলে কর ভাই। চোঙা-টোঙা লাগাবি। কোডের মাথা করবি উঁচু-নিচু ধরনের। করাতের দাঁতের মতন—বুঝলি না!"

লালু বলল, "বুঝেছি। ভেজিটেব্ল শু-এর কারখানার ডিজাইনে এবার দেখো কী করি! ও-ওয়েট অ্যান্ড সি। এখন বলব না।"

"তাড়াতাড়ি করবি তো?"

"দশ-পনেরো দিন। তার আগে হবে না। এখন আমি একটু বিজি। আমার হাতে অনেক কাজ।"

গণপতি হেসে বলল, "তাই করিস। পনেরো দিন পরেই দেখাস তোর ড্রয়িং।"

ছয়

জমি পেতে সামান্য সময় লাগল। এ তো গাছের পাকা ফল নয় যে ডাল বেয়ে উঠলাম আর হাত বাড়িয়ে পেড়ে নিলাম টুক করে। কোর্ট-কাচারির একটা ব্যাপার থাকে, থাকে খতিয়ান-মতিয়ান, লেখাপড়া, দলিল এইসব।

মহীপতি এতকাল ধরে জমি, বাড়ি নিয়ে কাজ করছেন পতি-পরিবারের। তাঁর কাজের জন্যে জানাশোনা লোকজনও পাঁচ-সাতজন আছে। আছে উকিল-মোক্তার! তা গিরিডির বানোয়ারিবাবু হ্যাঁ বলার সঙ্গে-সঙ্গে মহীপতি তাঁর লোকজনকে লাগিয়ে দিলেন।

মাসখানেকের পরেই ফটক-পারের জমি হাতে এসে গেল পতি-পরিবারের।

মহীপতি এসে ভাইপোকে বললেন, "জমির মাপজোক আসছে সোমবারে শেষ হয়ে যাবে। নে, এবার তুই লেগে যা কাজে।"

শীত তখন ফুরিয়ে যায়নি। ফুরোবার আগে শেষ খেলা খেলে নিচ্ছিল। আজ একটু ঠাণ্ডা কমে তো কাল একেবারে হাড় কাঁপিয়ে হাজির হয়। মাঘ শেষ হয়ে গেল সবে। শীতের বাতাসের গায়ে-গায়ে এক-আধবার ফাল্গুনের বাতাসও মাঠঘাটের ধুলো উড়িয়ে চলে যায়।

শুভ কাজ। শুভ দিন ছাড়া হওয়ার উপায় নেই। ধনপতির পরিবার পাঁজিপুঁথি মেনে কাজ করে। তা ছাড়া জেঠিমণি। দিন, ক্ষণ, সময়, বার, ভাল যোগ—এইসব না মেনে কোনও কাজ করতে দেন না তিনি।

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি শুভ দিনে মহেন্দ্র যোগে শুভ কাজটা সারা হয়ে গেল।

সে এক এলাহি কাণ্ড। ফাঁকা মাঠে মস্ত বড় শামিয়ানা পড়ল। নকশাদার মিরজাপুরি শামিয়ানা। শামিয়ানার তলায় তিরিশ-চল্লিশটা টিনের চেয়ার। শামিয়ানার সামনের দিকে গাঁদা ফুলের মালা ঝুলছে। পতি-পরিবারের সবাই হাজির—এক, বৃদ্ধ ধনপতি বাদে। তাঁর পক্ষে আসা বড় ঝঞ্ঝাটের। আজকাল তিনি গাড়িতেও উঠতে চান না, কষ্ট হয়। তার ওপর ঠায় বসে থাকা সম্ভব নয়। ধনপতি বাদে সবাই হাজির। কর্তারা, গিন্নিরা, ছেলেমেয়েরা। দু-চারজন ঘনিষ্ঠরাও এসেছেন।

মাঠের মধ্যে পুজো হল। খোলা আকাশের তলায়। নমো-নমো পুজো নয়, নিয়ম আচার মিলে ঠিকঠাক পুজো। জেঠিমণি নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে পুজো করালেন। গলায় মালা, কপালে সিঁদুরের তেলক, মাথায় ধানদূর্বা নিয়ে গণপতি দাঁড়িয়ে থাকল পুজোর জায়গায়।

পুজো শেষ হওয়ার পর প্রসাদ গ্রহণ। নামেই প্রসাদ, আসলে পেটপুরে খাওয়া। তারপর দু-চারটে পটকা ফাটল। ফাটাল বৃহস্পতি।

দুপুর নাগাদ পতি-পরিবার ফিরে গেল। থাকল গজপতি, গণপতি, লালু আর দু-একজন কাজের লোক।

গণপতি বলল, "বোর্ডটা এবার লাগিয়ে দে, গজা!"

হাত পাঁচ-ছয় লম্বা একটা সাইনবোর্ড একপাশে নামানো ছিল। বোর্ডে লেখা: 'গজপতি ভেজিটেব্‌ল শু কোম্পানি'। তলায় বেঁকা-বেঁকা অক্ষরে ব্র্যাকেটের মধ্যে ছোট হরফে লেখা: দি ওনলি ইন্ডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং এন্টারপ্রাইজ অফ ভেজ-শু। তলায় বড় হরফে ময়ূরগঞ্জ।

লালু চলল কাজের লোকজন নিয়ে সাইনবোর্ড লাগাতে।

বড়সড় দুই লোহার খুঁটি আগেই রেললাইনের দিকে মুখ করে পুঁতে রাখা হয়েছিল সাইনবোর্ড টাঙানোর জন্যে।

লালু যখন সাইনবোর্ড টাঙাচ্ছে, তখন, শেষ দুপুরে একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি চলে যাচ্ছিল লাইন ধরে। জানলার দিকে বসা যাত্রীরা অবাক হয়ে দেখছিল, ফাঁকা মাঠে শামিয়ানা টাঙিয়ে ক'টা লোক দাঁড়িয়ে আছে। কী ভাবছিল কে জানে। বোধ হয় ভাবছিল, চড়ুইভাতির পার্টি এসেছে মাঠে, জোর পিকনিক হচ্ছে।

ওদের মধ্যে দু-একজন হাত নাড়ল মজা করে।

গণপতিও হাত নেড়ে জবাব দিল।

গজপতি বলল, "গণাদা, এবার বাউন্ডারি দিয়ে নিতে হয় জায়গাটায়।"

গণপতি বলল, "দিয়ে নে। কবে থেকে দিবি?"

"যত তাড়াতাড়ি হয়।"

'কাল থেকেই শুরু করে দে।"

"মাটি খোঁড়ার লোক লাগবে।"

"ক-ত লোক চাই তোর! বিশ, পঁচিশ! হয়ে যাবে। কাকাকে বললেই কোদাল,

গাঁইতি, ঝুড়ি নিয়ে লোক চলে আসবে।"

কথাটা ঠিকই। উমাপতিকে বললেই, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এমন সময় লালু হাত নেড়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল।

গজপতিরা এগিয়ে গেল।

লোহার খুঁটির কাছ থেকেই লালু বলল, "গণা, মিস্‌টেক হয়ে গেছে রে, বিরাট মিস্‌টেক।"

গণপতি বলল, "কীসের মিস্‌টেক?"

লালু সাইনবোর্ড দেখাল। বলল, "এই দেখ, ভেজ-শু-এর শু-তে 'ই' নেই দুটো 'ও' হয় গেছে। SHOE-এর বদলে SHOO। 'ই' কোথায় গেল?"

গণপতি দেখল, দেখে নিজের কপালে থাপ্পড় মারল।

গজপতি অবাক হয়ে বলল, "এ কেমন করে হল?"

লালু বলল, "ভুটোর কাজ। ভুটো বেটাকে যা লিখতে দাও—একটা না একটা ভুল করবেই। ইস, ডেলিভারি নেওয়ার সময় একবার দেখে নিলি না? এখন কী হবে?"

গণপতি বলল, "দেখে নেওয়ার সময় হল কই! তিন হপ্তা আগে অর্ডার দিয়েছি, ফেলে রেখেছিল রাস্কেল। কাল সন্ধেবেলায় শেষ করে আজ পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে। আমরা কেউ দেখিনি।"

গজপতি বিমর্ষ মুখ করে বলল, "সকাল থেকে কাজ করতে গিয়ে আসলটাই দেখা হল না! ধুত!"

লালু বলল, "কী করব বল? টাঙাব না?"

গজপতি বলল, "আজ না টাঙাতে পারলে ভাল দিনটাই নষ্ট হয়ে যাবে।"

গণপতি বার-দুই মাথা চুলকে নিল, ঘাড় চুলকোল, তারপর বলল, "গজা, একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে।...আচ্ছা ধর, যেমন আছে তেমনই থাকল।"

"মানে?"

"মানে, এটাও একটা কায়দা। নতুন ব্যাপার ভেজিটেব্‌ল শু যেমন নতুন, শু-এর বানানটাও নতুন হল। এরকম হয়। বানান ইচ্ছে করেই পালটে দেয় চোখে পড়ার জন্যে। লাইট বানান লেখে Lite দিয়ে, ক্লিন বানান লেখে KLIN, কত কী আছে এরকম। দারুণ ক্যাচি হবে। কী বলিস?"

গজপতি দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। অথচ ভাবছিল।

লালু বলল, "লোকে চমক খাবে। শু-কে তো 'স্টু' ভাববে না। লাগিয়ে দিই!"

গজপতি চুপ করে আছে দেখে গণপতি বলল, "আর নয়তো লালু গিয়ে ভুটোকে ধরে আনুক বাজার থেকে। ভুটো তুলি আর রং নিয়ে আসবে। এসে 'ও'-টাকে 'ই' করে দিক।"

বাজার কম দূরে নয়। লালু সাইকেলে করে যাবে, ভুটোকে ধরে নিয়ে আসবে—তাতে সময় যাবে অনেকটা। বিকেল পড়ে যাবে।

লালু বলল, "বহুত সময় যাবে। তার চেয়ে গণা গাড়ি নিয়ে চলে যাক। যাবে আর

আসবে।"

গজপতি তখনও ভাবছিল। গণাদার গাড়ি যাবে হয়তো, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবে কি না বলা যায় না।

গণপতি বলল, "গজা, তাড়াতাড়ি ঠিক কর। দেরি করলে আজ আর হবে না।"

গজপতি বলল, "তুই বল?"

"আমি বলি ছেড়ে দে।...এই দেখ না আমরা বলি এভার রেডি বেটারি। বানান হল EVEREADY—তাই না।...তা তুই যা বল, আমার তো মনে হয় ভেজ-এর সঙ্গে দুটো 'ও'-অলা শু—দারুণ ফিটিং। না কি রে লালু?"

লালু বলল, "অত খুঁতখুঁত করলে চলবে না গজু! এই যে তোর ভেজ লিখেছিস, হোমিওপ্যাথিতেও ভেজ আছে। আমি খেয়েছি। ভেজিটেলিস। তোর জুতোর ভেজ আর হোমিওপ্যাথির ভেজ এক হল! লোকে বুঝে নেবে।"

গজপতি ভেবেচিন্তে বলল, "আচ্ছা, এখন থাক তবে। বোর্ডটা আজ লাগানো দরকার। ভাল কাজে যেমন খুঁত রাখতে নেই, তেমনই পিছিয়ে রাখাও উচিত নয়। এখন যা আছে থাক। পরে বরং ঠিক করে নিলেই হবে।"

লালু মহা উৎসাহের সঙ্গে সাইনবোর্ড টাঙাতে লাগল অন্যদের নিয়ে। গণপতিও থাকল পাশে।

গজপতি একা-একাই মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মনে-মনে হিসেব করছিল, কবে নাগাদ তার জুতো-কারখানার গোড়ার কাজগুলো শেষ হয়ে যেতে পারে। মাস তিনেক লাগবে বোধ হয়। তার মানে—ততদিনে গরমকাল। বা বর্ষার গোড়াও হতে পারে। গজপতির ইচ্ছে, বাইরের কাজকর্ম যতদিন চলবে, ততদিন চুপ করে বসে না থেকে ভেতরের কাজেও হাত দেওয়া। মাস ছয় পরে সে যদি প্রথম দিককার দু-চারটে স্যামপেল্ জুতো বার করতে পারে তবে মন্দ হয় না। দেখা যাক। কাজ তো অনেক।

এমন সময় গজপতির চোখে পড়ল সাইকেল চালিয়ে কে যেন আসছে।

গজপতি তাকিয়ে থাকল।

খানিকটা পরে সাইকেলঅলা কাছে এল।

গজপতি চিনতে পারল না। পুরনো চেনা লোক নয়।

সাইকেল থেকে নামল লোকটা। নেমে বলল, "রাম রাম বাবু।"

গজপতিও রাম রাম বলল।

লোকটা বলল, "আমি মহাদেব। মহাদেব ঠিকাদার। বড়াবাবু, ছোটাবাবু আমার জান-পহছান। বুড়াবাবুকে আমি দেখিনি। গণপতদাদাও আমার নাম জানেন। দেখেছেন। এই শহরে চার সাল আছি বাবু। ঠিকাদারি করি।"

মহাদেবকে দেখছিল গজপতি। তাগড়া চেহারা। গায়ের রং কালো। মাথায় কুচিকুচি চুল। চোখ দুটো বেশ লাল। মহাদেবের পরনে মালকোঁচা-মারা ধুতি। গায়ে এক কম্বল-মার্কা জামা, পাঁচ-ছ'টা পকেট জামাটার। কোমরের কাছে মাফলার বাঁধা। হাতে ঘড়ি। পায়ে কেড্স জুতো।

গজপতি বলল, "ঠিকাদার?"

"জি। আমি ঠিকাদারের কাম করি। ইধার কাম হবে শুনলাম..."

"হবে।" মাথা নাড়ল গজপতি। তারপর হঠাৎ বলল, "ঘর কোথায়?"

"ঘর। দেশ তো গয়া। গয়া জিলা। বচপনসে ইধারমেই আছি। এই শহরমে চার সাল। দুর্গাবাড়ির কালুবাবু হামায় তলব করে এনেছিলেন। বাবু চলে গেলেন। আমি শহরেই থেকে গেলাম।"

গজপতির মন্দ লাগল না মহাদেবকে। ঠিকাদারি করে বলে কথাবার্তা কাঠখোট্টা নয়, বিনীতভাবেই কথা বলে।

গজপতি বলল, "এখানে যে-কাজ হবে..."

"বাবু, আমি বিল্ডিংয়ের কাজ জানি!"

"বিল্ডিং কনট্রাক্টর?"

"হাঁ, হাঁ, বিল্ডিং কন্‌টাকটার।

কন্‌টাকটার! গজপতির হাসি পেল, হাসল না। কাজ নিয়ে কথা, মুখের কথায় গোলমাল হতেই পারে। "বিল্ডিং পরে। আগে অন্য কাজ। মাটি কাটার লোক আছে হাতে?"

"মিট্টি না কাটলে বিল্ডিং হয়, বাবু? হামার বিশ-পঁচিশ আদমি আছে। মজুর, মিস্ত্রি। সব কাম করতে পারে।"

"আগে আমার মাটি কাটার লোক দরকার।"

"কুছ বাত নেহি। কিতনা মিট্টি কাটতে হবে?"

গজপতি ইশারায় গণপতিকে দেখাল। বলল, "ওধারে বাত হবে।" বলে গণপতিদের দিকে পা বাড়াল।

মহাদেবও পাশে-পাশে চলতে লাগল গজপতির। "তো আপনার বিল্ডিং কব্ হবে?"

"কারখানা হবে এখানে।"

"কারখানা! কোন কারখানা, বাবু?"

"জুতোর কারখানা।"

"জুতি! জুতি কারখানা!"

"হ্যাঁ।"

"বাবু, জুতি ঠিক আছে। জুতিমে পারফিট আচ্ছা আছে! মাগর, আপনি এক ধোতি কারখানা ভি বানান। গরিব দেশ বাবু, আগে ধোতি চাই, উসকা বাদ জুতি। ঠিক, না!"

গজপতি মহাদেবের মুখের দিকে তাকাল আবার।

সাত

মাসখানেকের মধ্যেই কাজ খানিকটা এগিয়ে গেল। না এগোবে কেন? পাঁচ হাতে কাজ হচ্ছে। মাটি কাটার আর কম্পাউন্ড ওয়াল গাঁথার কাজ করছে মহাদেব

ঠিকাদার। কারখানার শেড তৈরি করার জন্যে এসেছেন পেস্তাজি। পুরো নাম কেউ জানে না, নামের শেষমেশ লেখা থাকত পেসরানজি; তার থেকে পেস্তাজি। কেউ-কেউ বলে পেস্তা-বাদামজি। পেস্তাজিরা এলেবেলে লোক নয়, গোডাউন শেড তৈরির কাজে সিলভার জুবিলি করে ফেলেছেন। ফ্যাক্টরি শেডও করে কোম্পানি। তাদের কোম্পানির যথেষ্ট নাম। ওদিকে বিল্ডিং—মানে পাকা কারখানা বাড়ির কাজ হাতে নিয়েছেন আড্ডি। পুরো নাম বদ্যিনাথ আঢ্য। শহরের লোক বরাবর তাঁকে বোদে আড্ডি বলে ডাকত। ডাকতে-ডাকতে এখন বোঁদে আড্ডি হয়ে গিয়েছে।

মহীপতি কাজের লোক। তিনি জানেন, যে-কোনও একজনকে দিয়ে কাজ করাতে গেলে বারো মাসেও কারখানার চালাটুকুও উঠবে না। তাই তিনি ভাগ-ভাগ করে কাজ দিয়েছেন। ভাইপোকে বলেছেন, "গজু, যে যা জানে তাকে সেই কাজ করতে দেওয়া উচিত। এক্সপিরিয়েন্স না থাকলে এসব কাজ হয়! এ কি জামার বোতাম সেলাই?"

একেবারে খাঁটি কথা। মহাদেব ঠিকাদার, পেস্তাজির লোকজন আর বোঁদে আড্ডির মিস্ত্রিমজুর কোমর বেঁধে কাজে নেমে পড়েছে। লরি করে আসছে ইট, বালি, সিমেন্ট, লোহার খুঁটি, অ্যাঙ্গেল, রড, নাটবল্টু, ঢেউখেলানো টিনের শিট, আরও কত কী!

ওখানেই হয়েছে মালপত্র রাখার মস্ত চালা। ছোটখাটো এক অফিস ঘর। অফিস অবশ্য গজপতি আর লালুর। কাঠের টেবিল, দু-চারটে চেয়ার রয়েছে অফিসে। একটা ব্ল্যাক বোর্ড রাখা রয়েছে একপাশে—তাতে হরেকরকম রঙিন খড়ি দিয়ে কারখানার একটা কাজ-চালানো গোছের প্ল্যান আঁকা। গোল-গোল করে পাকানো কাগজপত্র রাখা আছে এক ছোটখাটো লোহার আলমারির মাথায়।

অফিসটা যদিও গজপতি আর লালুর, তবু অন্যদের যখন যার দরকার হয়, আসে, বসে, কাগজ-পেনসিল নিয়ে কাজ করে, কথা বলে, উঠে যায়।

গজপতি আর লালু আসে সকালে। ন'টা নাগাদ। গজপতি আসে পুরনো মোটরসাইকেলে চেপে। এটা বাড়ির ভটভটি। একসময় উমাপতি চড়তেন। গণপতিও চড়েছে। জিনিসটা পুরনো হলেও এখনও তার দম আছে। গর্জনও বেশি করে হয়তো, কিন্তু ইঞ্জিন যেন টগবগে ঘোড়া। লালু কোনও-কোনওদিন গজপতির মোটরবাইকের পেছনে বসেই চলে আসে; কোনও-কোনওদিন আসে নিজের সাইকেলে। দু'জনেই আসে একেবারে কাজের পোশাকে, প্যান্ট-শার্ট পরে; একটা করে টুপি পরে মাথায়। কাজের জায়গায় কাজের পোশাকই পরতে হবে।

দুপুর একটা নাগাদ দু'জনেই চলে যায় স্নান, খাওয়াদাওয়া সারতে। তিনটে নাগাদ আবার কর্মস্থলে। পাঁচটার পর বাড়ি ফেরা।

গণপতিও তার গাড়ি চালিয়ে হুটহাট এসে পড়ে।

সেদিন পেস্তাজি নিজেই এসেছিলেন। কাজকর্ম কেমন হচ্ছে দেখতে। ভদ্রলোকের বয়েস পঞ্চাশের ওপর। ছিপছিপে গড়ন, তামাটে গায়ের রং। এককালে

বোধহয় ফর্সাই ছিলেন। রোদে-জলে তামাটে হয়ে গেছেন। মাথার চুল সব সাদা। মস্ত এক গোঁফ। দু'পাশে ঝুলে পড়েছে গোঁফের প্রান্ত।

পেস্তাজিরা কচ্ছি-ঘরানার। এখন ঠিক বোঝা যায় না।

গণপতির গাড়িতেই এসেছিলেন পেস্তাজি।

কারখানার শেড তৈরি তদারকি করলেন খানিকক্ষণ। তাঁর মিস্ত্রিদের বোঝালেন কী সব। গজপতিরা সঙ্গেই ছিল। তারপর মাঠের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে গজপতি ভেজিটেব্‌ল শু কোম্পানির সাইনবোর্ডটা আবার দেখলেন।

'এ গজ্‌পতি, দ্যাট ডে আমি এক দিল্লির পেপার দেখছি।" পেস্তাজি বাংলা মন্দ বলেন না, তবে একটু ছোট করে নেন ক্রিয়াপদগুলো। দেখছিলাম, খাচ্ছিলাম, যাচ্ছিলাম, না বলে বলেন দেখছি, খাচ্ছি যাচ্ছি। অতীতের ব্যাপারটা তেমন বোঝেন না। "মাই বয়, আন্ডার গারমেন্টস-এর এক টপ কোম্পানি উসলোকদের কোম্পানিকা নামমে লিখেছে FIZZI-CALI, তোমার SHOO-কে মনে এল। অল রাইট। ইউ কিপ ইট, বয়।"

পেস্তাজি 'বয়' শব্দটা একটু বেশি ব্যবহার করেন। 'বয়' এবং 'ম্যান'। ছোটদের অবশ্য বয়।

গণপতি গজপতিকে দেখল। হাসল। বলল, "কী রে গজা! ঠিক বলেছিলাম না? তোর শু ক্যাচ করে গেছে। ভেজি জুতোয় 'ও' লাগানোই কারেক্ট।"

পেস্তাজি হাঁটতে লাগলেন। মহীপতি-উমাপতির সঙ্গে তাঁর পুরনো আলাপ। খাতির যথেষ্ট। যদিও পেস্তাজি এখানে থাকেন না। তাঁর আদত অফিস মাইল-পাঁচেক তফাতে—রায়নাগড়ে। তিনি কথা দিয়েছেন, দু' মাসে শেডের বাইরেটা খাড়া করে দেবেন। আগেও দিতে পারেন।

মাঠের মাঝামাঝি জায়গায় বিল্ডিংয়ের কাজ চলছিল। বড়সড় বাড়ি নয়, মাঝারি ধরনের বিল্ডিং। বোঁদে আড্ডির মিস্ত্রিমজুর গাঁথনি তুলছিল ইটের।

পেস্তাজি গাঁথনির কাজ দেখতে-দেখতে বললেন, "ভেরি স্লো।"

লালু বলল, "কাজ থোড়া পা-পাক্‌কাসে বানাতে হচ্ছে পেস্তাজি!"

"পাক্‌কা। হোয়াই পাক্‌কা?"

গজপতি বলল, "বিল্ডিংয়ের নর্থ পার্টটায় মেশিন বসবে। মেশিন চললে ভাইব্রেশান হবে।"

পেস্তাজি মুচকি হেসে বললেন, "থোড়া কুছ হবে। মিনিমাম। বয়, তোমার শু-মেকিং মেশিনে কত ভাইব্রেশান হবে? ভূ-কাঁপ তো হবে না। আর্থকোয়েক। আরে ভাই, আমি বয়লার বসানোর বিল্ডিং করেছি। কাজারি পাওয়ার হাউসের। গো অ্যান্ড সি। বয়, এরা তোমায় চিট করছে।"

পেস্তাজির খেয়াল ছিল না কথাটা তিনি কোথায় বলছেন। গজপতিরাও নজর করেনি। বোঁদে আড্ডি একটা ইটের পাঁজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাঁর মুনশির সঙ্গে কথা বলছিলেন। কথাটা যে তাঁর কানে গিয়েছিল সরাসরি তাও নয়—তবে বোঁদের ভাগ্নে পিনুর কানে গিয়েছিল। পিনু অকর্মার ধাড়ি। মামার বাড়িতে খায়দায়, চরে বেড়ায়। বোঁদেবাবু বারবার চেষ্টা করেও ভাগ্নেকে বাগে আনতে পারেননি। এবার এই

পতিবাবুদের কাজটা হাতে নেওয়ার পর তিনি পিনুকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মুনশির কাছে বাড়ির কাজ দেখা শিখবে।

পিনু যে কখন সরে গিয়ে মামার কানে কথাটা লাগিয়ে দিয়েছে, কেউ বুঝতে পারেনি।

হঠাৎ ইটের পাঁজার আড়াল থেকে বোঁদে আড্ডি তাঁর মুনশি আর ভাগ্নেকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

বোঁদেবাবু অসম্ভব বেঁটে। সাড়ে চার কি পৌনে পাঁচ হবেন হয়তো। একেবারে গোল। লোকে ঠাট্টা করে বলে, 'জলের ড্রাম'। অত বেঁটে এবং মোটা হওয়া সত্ত্বেও বোঁদেবাবুর বডি বারো আনা ফিট। তিনি নিজের কাজের জায়গায় তদারকি করতে যান স্কুটারে চেপে। ধুতি-শার্ট ছাড়া অন্য কিছু পরেন না। অবশ্য একটা টুপি থাকে মাথায়, শোলার হ্যাট। বোঁদেবাবুর গলা একেবারে ভাঙা, খসখসে।

বোঁদেবাবুর দলবলকে দেখে গজপতিরা প্রথমটায় কিছুই বোঝেনি।

বোঁদেবাবু এগিয়ে এসে পেস্তাজির কাছাকাছি দাঁড়ালেন।

পেস্তাজির খেয়াল ছিল না, তিনি একটু আগে কী বলেছেন। বোঁদেবাবুকে দেখে হাত তুলে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন যেন। "হ্যালো, বঁদিয়া! হাউ আর ইউ, ম্যান? তুমি ইধার এসেছ?"

বোঁদেবাবু বললেন, ভাঙা খসখসে গলায়, "ইয়েস, আইছি। তুমি পেস্তা এই ছেলেগুলারে কী কইতেছিলে?"

পেস্তাজি প্রথমটায় কিছুই বুঝলেন না। গজপতিদের দিকে তাকালেন।

গণপতি বুঝতে পেরেছিল। তাড়াতাড়ি বলল, "না, না, ওসব কিছু নয় বদুকাকা। সাহেব তাঁর শেড দেখতে এসেছিলেন। তারপর এই ঘুরছেন-ফিরছেন।"

বোঁদেবাবু বললেন, "ঘুরতাছে না, দালালি করতাছে। আমাকে চিট কইছে।" বলে ভাগ্নের দিকে তাকালেন, "পিনু, ওই পেস্তা আমাকে চিট কইছে না? চিট মানে জোচ্চুর—জোচ্চুর—! আমি ইংরিজি জানি না? ওই পাঁঠায় আমারে শিখাইবে?" বোঁদেবাবু জোচ্চরকে শুধু জোচ্চুরই বললেন না। 'চ্চু' শব্দটা বলার সময় মুখ ছুঁচলো করে অদ্ভুত শব্দ করলেন।

পিনু বলল, "হ্যাঁ, মামা, চিট বলেছে।"

পেস্তাজি রীতিমতো বিব্রত বোধ করলেন। গজপতিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বয়, বঁদিয়াবাবু কী বলছে! আমি বাবুকে চিট বলেছি?"

লালু মাঝখানে এগিয়ে গিয়ে বলল, "বদুকাকা, পি-পিনু শুনতে ভুল করেছে। মি-মিসটেক। পেস্তাজি চিট বলেননি, চিজ—চি-চিজ বলেছেন। বলেছেন, এই মিস্ত্রিমজুরগুলো কী চিজ যে এত ধীরে-ধীরে কাজ করছে।"

পেস্তাজি সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়লেন। "হাঁ হাঁ। চিজ বলেছি।"

বোঁদেবাবু অত সহজে ভোলবার লোক নন। লালুকে বললেন, "ক্যান! তুমি আমারে জগা পাইছ! মিছটেক! এহানে কি মিছটেকের ভিয়ান চাপাইছ! আমার কাজে ও নাক গলায় ক্যান?" বলে পেস্তাজির দিকে তাকালেন। "তুমি আমার মিস্তির

মজুর কামিন নিয়ে কথা বলার কে হে! মাই ওয়ার্ক মাই ওয়ার্ক, ইওর ওয়ার্ক ইওর ওয়ার্ক। তোমার শেডের কাম আমি দেখছি। মালগুদামের শেড। কারখানার শেড যে কয় ওটারে সে গর্দভ? বুঝলা সাহেব?"

পেস্তাজির আঁতে লাগল। বললেন, "অ্যাই ম্যান, ফালতু কথা বলবে না। হোয়াট ইউ নো অফ শেড? আমার কোম্পানির রেপুটেশান জানো?"

"যাও, যাও, আমি সব জানি।"

"তুমি কুছ জানো না। শেড বানানো বিড়ি পাকানো কাম নেহি হ্যায়। ইউ নো দ্যাট। বিল্ডিং—আই নো! ইটা লাগাও সিমেন্ট মারো। বঁদিয়াবাবু, আমার কোম্পানিও পঁচাশ-যাট বিল্ডিং বানাল। তুমি আমায় কাম শিখলাবে।"

বোঁদেবাবু বললেন, "শেখলাব। আলবাত শেখলাব।"

"নো ম্যান।"

"ইয়েস ম্যান।"

গণপতি দেখল, দু'জনে লেগে যায় আর কী! এ তো মহা ফ্যাসাদ। ভাগাভাগি করে কাজ দেওয়ার এই পরিণাম। যে যখন আসে, অন্যের কাজের খুঁত ধরে দু-চার কথা বলে যায়।

গণপতি বলল, "আপনারা সোর মাচাচ্ছেন কেন? ঝগড়া লাগাচ্ছেন। যে যার কাজ করবেন—তাই তো কথা। আমাদের কাজের দেরি হচ্ছে।"

পেস্তাজি রাগে কাঁপছিলেন। বললেন, "আমি বাবুর কাছে যায়গা গণপতি। হোয়াট ইজ দিস? বঁদিয়া মিস্ত্রিমজুর খাটাতে-খাটাতে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব হয়ে গিয়েছে? আমি কাম জানি না।"

বোঁদেবাবু বললেন, "তুমি ইঞ্জিনিয়ার নাকি? ফিতা হাতে ঘুরছ তুমি, আমি দেখি নাই।"

পেস্তাজি বললেন, "শাট আপ।"

বোঁদেবাবু বললেন, "ইউ আপ।"

গণপতি হেসে ফেলল। গজপতি একেবারে বোবা।

লালু বোঁদেবাবুকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যেতে-যেতে বলল, "বদুকাকা, ছেড়ে দিন। ল-লড়াই করে লাভ নেই। আপনি পা-পাকা লোক। আপনার হাতে কত বাড়ি হ-ল? আপনাকে কে শেখাবে। আ-আপনি এক ন-নম্বর। চলুন—ওদিকে চলুন।" লালু বোঁদেবাবুকে ঠেলতে-ঠেলতে ইটের পাঁজার দিকে নিয়ে গেল।

গণপতি পেস্তাজিকে টেনে নিয়ে চলল অফিসে। পেস্তাজি বার বার বলছিলেন, "বঁদিয়া চিট, ফিকিররাজ, চোট্টা। ওই বিল্ডিং ধস জায়গা। সিমেন্ট-চোর হ্যায় বঁদিয়া। বয়, আমি ঠিক বাত বলছি।"

ঝগড়াঝাটি মিটে গেল। পেস্তাজি চলে গেলেন আগে। বোঁদেবাবু পরে।

অফিসে বসে গণপতি বলল, "গজা, এরকম ভেড়ার লড়াই হলে তো খুনোখুনি হয়ে যাবে রে, কাজেরও দেরি হবে।"

লালু বলল, "ভেড়া না, রা-রাম ছাগল?"

গজপতি বলল, "গণাদা, তাড়াতাড়ি কাজ হওয়ার জন্যে জ্যাঠা তিন তিনজনকে লাগিয়ে দিল। এরা তিনজনেই গোড়া থেকে একে অন্যের কাজের খুঁত ধরছে। এতদিন আড়ালে বলত। আজ..."

"তোর মহাদেব কী বলছে?"

"মহাদেব কাজ কম পেয়েছে। বেচারির বড় আফসোস। তো আমি বলেছি, কম্পাউন্ড ওয়াল হয়ে গেলে তুমি অন্য মাটি খোঁড়ার কাজ পাবে। ডোবা বানাতে হবে। তার বাদে ভাটি আছে। ইটার কাজও থাকবে।"

গণপতি বলল, "বাবাকে বলতে হবে। পেস্তা আর বোঁদে যদি লড়াই করে, কাজ হবে কেমন করে! ওরা তাড়াতাড়ি না কাজ করতে পারলে কীসের লাভ!"

লালু বলল, "কাল থেকে গজু শেড দেখবে। আমি বি-বিল্ডিং! সামনে দাঁড়িয়ে থা-থাকলে কাজ হবে।"

গজপতি বলল, "আমার মেশিনের ড্রয়িং শেষ হল না, গণাদা। আমি মেশিনের নকশা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি। নকশা হয়ে গেলে কতরকম মেশিন বানাতে হবে।"

"অর্ডার দিয়ে দে।"

"অর্ডার দিয়ে হবে না। দু-একটা পাওয়া যাবে। বাকি সব বানাতে হবে এখানে।"

লালু বলল, "দাঁ-দাঁড়া। আগে ঘোড়া হোক, তারপর ছপটি।"

আট

শীত গেল, বসন্ত গেল। গরম পড়ার আগে পেস্তাজি টিনের শেড শেষ করে ফেললেন। মাথা শেষ হয়েছে শেডের। পেছনের দিকের কাজও অর্ধেক শেষ; ঘেরার কাজ চলছে পেছনে।

এদিকে বোঁদেবাবুও যেন খেপে গেছেন। পেস্তা তাঁকে শুধু অপমান করেনি, চিট বলেছে। মানে ঠগবাজ, চোর-জোচ্চোর ক্লাসের। বোঁদেবাবু যে একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা, তা নয়। কনট্রাক্টরির কাজে কেই-বা যুধিষ্ঠির হয়! তবে মশলা মাখার সময় আড়ালে সিমেন্ট মারার যে সনাতন অভ্যেস বোঁদেবাবুর ছিল, সেটা এখন শুধরে নিয়েছেন। ফাঁকিবাজির মাত্রাও কমেছে। লোকজনও বাড়িয়ে দিয়েছেন কাজের, যাতে পেস্তার সঙ্গে কম্পিটিশানে তিনি না মার খেয়ে যান।

রেষারেষি ঝগড়ার দরুন সুবিধেই হল গজপতির। গোড়ায়-গোড়ায় ঢিমেতালে যেভাবে কাজ চলছিল তাতে বর্ষার আগে গজপতি কিছুই করতে পারত না। এখন সে নিজের কাজে হাত লাগাতে পারবে।

টিনের শেডের তলায় গোটাচারেক গোল-গোল ভাটি তৈরি হয়ে গেল। গজপতির কথা মতন আরও দুটো পরে হবে। ভাটিগুলো আকারে গোল, ডাস্টবিন যেমন দেখতে হয়। তবে মাথায় উঁচু, গোলের মাপটাও বেশি। ভাটির ভেতরে-বাইরে সিমেন্ট। দেখলে মনে হবে এক-একটা ছোট পাতকুয়া বুঝি। তা অবশ্য নয়। ভাটির

বাইরের দিকে সিঁড়ির ধাপ। মানে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভাটির মুখে যাওয়া যাবে। প্রত্যেকটি ভাটির একপাশে সিঁড়ি, অন্য ধাপে—নীচের দিকে একটা করে গর্ত, গর্তের মুখে লোহার পাইপ বা নল লাগানো। মানে ওই নল দিয়ে ভাটির মালমশলা বেরোবে।

শেড-বরাবর খয়েরি রঙের মাঝারি ধরনের এক পাইপ চলে গিয়েছে। পোড়া মাটির পাইপ। গিয়ে মাঠে নেমেছে। মাঠ থেকে আবার গিয়ে উঠেছে বিল্ডিংয়ে। বিল্ডিংয়ের মধ্যে আপাতত এক বড়সড় চৌবাচ্চাও তৈরি হয়ে পড়ে আছে।

পাইপ বসানোর কাজ চলছিল। মহাদেবকে সঙ্গে নিয়ে গজপতি আর লালু এই কাজটা নিজেরাই দেখাশোনা করছিল।

পাইপ বসানোর কাজ করছিল পাঁচু মিস্ত্রি। তার তিন শাগরেদ। তিনজনেই ছোকরা বয়েসী। পাঁচু হল এই শহরের পাইপ-মিস্ত্রি। নাম আছে তার। 'পাইপ-পাঁচু'। পাঁচুর একমাত্র দোষ, সারাক্ষণই পান খায় আর বিড়ি ফোঁকে। মুখে পান নিয়ে ও যে কী বলে ওর ভাষায়, বোঝা মুশকিল।

সেদিন গজপতি আর লালু গোল-গোল ভাটিগুলো ভাল করে পরখ করে নেওয়ার পর গজপতি বলল, "লালুদা, ভাটিগুলোর নম্বর লিখিয়ে দিতে হবে। এক, দুই, তিন, চার।"

লালু বলল, "ই-ইংলিশে তো? ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর।"

"হ্যাঁ। আরও দুটো ভাটি পরে বসাব।"

"সেই ভাল।"

"প্রথম ভাটিটায় কী হবে বলেছিলাম, মনে আছে?"

"টেরা জমানো হবে।"

"টেরা নয়, ক্যারা, ক্যারাক্যারাম্বুলা। তোমায় যতবার বলি ক্যারা, তুমি টেরা-টেরা করো।"

"মু-মুখে এসে যায়।"

"শোনো। রাতে শুয়ে-শুয়ে ভাবছিলাম। একটু চেঞ্জ করেছি। এক নম্বর ভাটিতে ভেজিটেব্‌ল ওয়েস্ট ঢালা হবে। মানে তোমার যত—যত কিনা—খোসাটোসা। যেমন কুমড়োর খোসা, লাউয়ের খোসা, তরিতরকারির খোসা। তবে আলুর খোসা, পেঁপের খোসা নয়।"

লালু বলল, "ভাবিস না, আমি দু'জন চ্যা-চ্যাম্পিয়ানকে লা-লাগিয়ে দেব। কথা বলে রেখেছি। বকা আর লকা। দু'জনেই পুজোর চাঁদা আদায় করে বেড়ায় বাড়ি-বাড়ি। এক-এক্সপার্ট। ওরাই বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তরিতরকারির—সবজির খোসা কালেক্ট করবে। খোসা কালেকশানের কনট্রাক্টটা ওদের দিয়ে দেওয়াই ভাল।...আমি বলি কী গজু, বকা-লকাকে দু-চারটে করে বস্তা দিলে কেমন হয়?"

"বস্তা! না, না, বস্তা নয়। আমরা পলিথিন-ব্যাগ দেব, বাড়ি-বাড়ি। বাড়িতে বলা থাকবে, সবজির খোসাগুলো ব্যাগে ভরে রেখে দিতে। আমাদের লোক গিয়ে ভরতি

ব্যাগগুলো নেবে, আর নতুন একটা দিয়ে আসবে।"

"বলিস কী! রোজ অত ব্যাগ পাবি কোথায়? ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে।"

"দেখি।...পরে ভাবব।"

লালু বলল, "দু' নম্বর ভাটিতে তা হলে কী পড়বে?"

"পাতা। কলাপাতা, কাঁঠালপাতা, ঘাস, সো অ্যান্ড সো...।"

"তাহলে তোর নাম্বার ওয়ানে পড়ছে খোসা, না-নাম্বার টু-তে পাতা; না-নাম্বার থ্রিতে টেরা-না না, ক্যারা?"

গজপতি মাথা নাড়ল।

লালু বলল, "নাম্বার ফোরে?"

গজপতি বলল, "শ' ডাস্ট, মানে কাঠ চেরাই করাতের গুঁড়ো, আর ছেঁড়াখোড়া পেস্টবোর্ড—যাকে বলে পিচবোর্ড!"

লালু কথাগুলো নতুন শুনছে না। তবে মাঝে-মাঝেই গজপতি তার মত পালটায় বলে আবার একবার ভাল করে জেনে নিল।

গজপতি তখন পাইপ লাইন দেখছিল। পাঁচুমিস্ত্রি তার শাগরেদদের দিয়ে মাঠে পাইপ জোড়া দিচ্ছিল।

গজপতি লালুকে বলল, "লালুদা, এক নম্বর ভাটিতে যে ভেজিটেব্‌ল ওয়েস্ট জমানো হবে সেটা ভাটিতে থাকবে এক মাস বা থারটি টু ফরটি ডেজ। সবজির খোসাগুলোকে গলিয়ে একেবারে কাদা করে ফেলতে হবে।"

"তাই তো বলেছিলি..." লালু বলল। "কাদা করা আর কঠিন কী!"

"হ্যাঁ। আমি একেবারে আমাদের মতন করে সব করতে চাই। খোসাগুলো গলাবার জন্যে শুধু চুন, পাথুরে চুন আর নুন ঢালব।"

"চুন—আর নু-ন।"

"হ্যাঁ।"

"গলবে?"

"দেখতেই পাবে। চুনে মাংস পর্যন্ত গলিয়ে দেওয়া যায়!"

"আমি ভেবেছিলাম, তুই একটা ব-বয়লিংয়ের ব্যাপার করবি। খোসা সেদ্ধ হবে। অথচ দেখলুম—ভাটির তলায় উনুন করলি না।"

গজপতি হাসতে-হাসতে বলল, "লালুদা, উনুনের দরকার এখন নেই। এখন তোমার এক নম্বরে খোসা গলিয়ে কাদা করা হবে। দু' নম্বরে থাকবে ক্যারা—ক্যারাক্যারাম্বুলা।"

লালু চোখ বড়-বড় করে বলল, "তুই তো একটু আগে বললি পাতা পড়বে।"

খেয়াল হল গজপতির। বলল, "ভুল হয়ে গেছে। হ্যাঁ—দু' নম্বরে কলার পাতা, কাঁঠালপাতা, ঘাস—আর তোমার আগার-বাগার। তবে এমন পাতা, যাতে ফাইবার কোয়ালিটি আছে। পাতাগুলোকে ছোট-ছোট করে কেটে ভাটিতে ফেলে দিতে হবে। তবে সেগুলো পুরোপুরি গলানো হবে না। মাঝারিভাবে গলানো হবে।"

"তো এখানেও চু-চুন আর নু-নুন?"

"না, এখানে চুন, নুন নয়। এখানে ভাবছি অ্যাসিড দেব। কড়া অ্যাসিড নয়, নরম অ্যাসিডের সঙ্গে এল্‌টা।"

"এল্‌টা?"

"আছে। এক ধরনের কেমিক্যাল কম্পাউন্ড!...ও আমি তৈরি করে নেব।"

"নি-নিলি; তারপর?"

"তিন নম্বরে ক্যারা। এখন আমাদের নিজেদের ক্যারা-ডোবা হয়নি। বর্ষার পর শুরু করলে তিন-চার মাসে হয়ে যাবে। গোশালার কাছের মাঠ থেকে ক্যারা আনতে হবে। ওখানে আরও ক'টা ডোবায় ক্যারা আছে।"

লালু বলল, "ক্যারা তো কাদা-কাদা দেখতে। ওতে আবার কী দিবি?"

"ক্যারা ডিপোজিট হলে ওর মধ্যে বেশি কিছু দেব না, ধরো শিরীষের আঠা, আর খানিকটা খয়ের গোলা। আঠালো ভাব দরকার, বুঝলে না! জিনিসটাকে আঁট করতে হবে না।"

লালু খানিকটা অবাক হল। তারপর বলল, "কাঠের গুঁড়োতেও আঠা দিবি? খয়েরগোলা!"

"ওটা চার নম্বর ভাটিতে থাকবে। কাঠের গুঁড়ো আর ছেঁড়াখোঁড়া পেস্ট বোর্ড। ওগুলো ভিজিয়ে কাদা-কাদা করে ঘেঁটে রাখলেই চলবে। কিছু দেওয়ার দরকার হবে না বলেই মনে হচ্ছে।"

লালু বলল, "কথাটা তুই বে-বেমালুম ভুলে গেলি।"

গজপতি মাথা নেড়ে বলল, "না-না, ভুলিনি। ওসব পরে হবে।"

কথা বলতে-বলতে দু'জনে মাঠে নামল। পাঁচুমিস্ত্রি কাজ করছে।

গজপতি বলল, "লালুকে, লালুদা, ওই যে দেখছ শেডের মধ্যে চারটে ভাটির মুখে চারটে পাইপ—ওই ছোট পাইপ দিয়ে এক নম্বর ভাটির জিনিসগুলো বেরিয়ে আসবে। এসে ওই বড় পাইপে পড়বে।"

লালু বলল, "গজু, ওটা আমি জানি। তুই বলেছিস। ওকে আমি বলি এল প্রসেস। মানে ইংরিজি 'এল' অক্ষরের মতন দেখতে। আগে এক নম্বরের মাল এসে পড়বে বড় পাইপে, তারপর পড়বে দু' নম্বর ভাটির, শেষে থ্রি অ্যান্ড ফোর। পড়ে হড়হড় করে হড়কে যাবে।"

গজপতি বলল, "হড়কে যাবে মানে! তুমি যে কী বলো। বড় পাইপ দিয়ে জিনিসটা এসে পড়বে ওই বিল্ডিংয়ের ট্যাঙ্কটায়!"

লালু বলল, "হড়কাবে মানে পা হড়কাবে না, গজু। স্মুথলি চলে যাবে। এই ধর, আমার যেমন কড়াইয়ের ডালের সঙ্গে ভাত মেখে খেলে গলা দিয়ে হড়কে পেটে চলে যায়, সেইরকম...।"

"ট্যাঙ্কটা হল লাস্ট ডিপোজিট ট্যাঙ্ক। ওখানে মেশানো জিনিসগুলো ধীরে-ধীরে থিতিয়ে যাবে। শক্ত হবে।"

লালু বলল, "চৌবাচ্চার মধ্যে নিজে-নিজেই থিতিয়ে যাবে।"

"যাবে। দুটো বড়-বড় উনুন থাকবে চৌবাচ্চার পাশে। হিট পেলেই জলের কিছু

থাকবে না। জল উবে যাবে। ময়েশ্চারও চলে যাবে। আস্তে-আস্তে আঁট আর শক্ত হবে...”

লালু বলল, “আরে এ তো ইজি ব্যাপার। আমসত্ত্ব যেভাবে হয়—সেইভাবেই। ওখানে রোদ, এখানে হিট।”

গজপতি বলল, “না লালুদা, অত ইজি নয়। ওইভাবে শক্ত করা যাবে না। সেমি-শক্ত আর আঁট হলে, চৌবাচ্চা থেকে মাল তুলে বড়-বড় চৌকোনো অ্যালুমিনিয়াম ট্রেতে রাখতে হবে।”

“ট্রে? ট্রে-র সাইজ?”

“ধরো, তিন বাই তিন, বা চার বাই চার ফুট।”

“হয়ে যাবে।”

“ট্রেগুলোকে তারপর একবার অল্প আঁচের চুল্লির ওপর রাখতে হবে। দু-তিন দিন বড়জোর। ব্যস, হয়ে গেল।”

“মানে ভেজিটেব্‌ল শু-এর ভে-ভেজি চামড়া হয়ে গেল।”

“হ্যাঁ। ভেজি শিট হয়ে গেল। ওই শিট কেটে তুমি জুতো করো, নো প্রবলেম।”

লালু বলল, “বিউটিফুল। গজু, তুই রং-অলা জুতো করবি না?”

“এখন নয়। রং করা পরে হবে। ওটা কঠিন কাজ নয়। এখন আমরা এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজে এমনি জুতো করব।” বলে, একটু থেমে গজপতি আবার বলল, “লালুদা, এক লাফে গাছে চড়া যায় না। যায়?”

“না, নেভার। হনুমানরাই পারে।”

“এই কাজের ক'টা ফেজ আছে, মানে স্তর। ভাটি পর্যন্ত একটা স্টেজ। দু' নম্বর স্টেজ হল ভেজ-শিট তৈরি করা পর্যন্ত। তিন নম্বর স্টেজ হল জুতোর কাঁটছাট, জোড়, এইসব।”

লালু বলল, “তা হলে তো আরও মাস চারেক।”

গজপতি বলল, “তার আগেই ভাটি চালু করব। কী হচ্ছে দেখতে হবে না!”

হঠাৎ পাঁচুমিস্ত্রির কী হল, বিকট এক চিৎকার করে পাইপের কাজ ফেলে দে দৌড়। দৌড়ে অবশ্য পালাল না, বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে দু' হাত মাথার ওপর তুলে নাচের ভঙ্গিতে লাফাতে লাগল।

গজপতি অবাক। লালুও অবাক।

হল কী পাঁচুমিস্ত্রির?

পাঁচুর শাগরেদরা কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে থাকল।

লালু এক শাগরেদকে জিজ্ঞেস করল, “কীরে? পাঁচুর কী হল? অমন করছে কেন?”

শাগরেদ বলল, “ও কিছু না বাবু! কাকাকে পাইপবাবা ভর করে। আজ কী বার?”

“কী মানে?”

“পুন্যিমে না আমারাত?”

“জানি না। অমাবস্যা হতে পারে।”

"তবে ঠিকই হয়েছে। কাকা এখন ভরে থাকবে। আধা ঘণ্টা। তারপর ঠিক হয়ে যাবে।"

গজপতি বলল, "লালুদা, বড় তাজ্জব ব্যাপার।"

লালু বলল, "দাঁড়া, এ তো সবেই শুরু গজু। আরও কত কী হবে!"

নয়

বর্ষা নামার মুখে-মুখে গজপতি বলল, "গণাদা, আর দেরি নয়; ভাটিতে মাল ফেলতে হবে।"

গণপতি বলল, "শুরু করে দে। কবে থেকে শুরু করবি?"

গজপতির একটা হিসেব ছিল মনে-মনে। লালুর সঙ্গে হিসেবটা সেরে রেখেছে। লালুকে বলল, "লালুদা, সোমবার থেকে শুরু করা যেতে পারে। তাই না?"

লালু আজকাল একটা ডায়েরি-খাতা রাখে নিজের কাছে। তাতে নানা ধরনের আঁকিজুকি, লেখা, হিসেবপত্র।

ডায়েরি-খাতা দেখে লালু বলল, "সোমবার নয়, বুধবার। বুধবার থেকে নো প-প-প্রবলেম।"

গজপতি বলল, "তা হলে বুধবারই এক নম্বর ভাটিতে মাল ফেলার ব্যবস্থা করো।"

লালু মাথা হেলিয়ে সায় দিল। দিয়েই ডায়েরি-খাতায় কী একটা লিখে নিল।

গণপতি আধ হাত সাইজের একটা লিকলিকে কাঁকড়ি খাচ্ছিল নুন দিয়ে। খেতে-খেতে বলল, "লালু, ক' বস্তা মাল পড়বে রে?"

লালু সঙ্গে-সঙ্গে তার ডায়েরি-খাতার পাতায় চোখ বুলিয়ে নিল। বলল, "ব-বস্তা নয়, গাড়ি। দশ বস্তায় এক গাড়ি। প্রথম দিন দু' গাড়ি মাল পড়বে মিনিমাম চার। তা হলে তো চল্লিশ বস্তা হল কম করেও।"

"গাড়ি কেন? তুই যে বললি প্লাস্টিকের বড়-বড় বস্তা করে মাল আসবে।"

লালু বলল, "ব-বলেছিলাম। চে-চেষ্টাও করা গেল, না কী রে গজু। প্লাস্টিকের ব-বস্তা পাওয়া গেল না। দু-চারটে পাওয়া যেতে পারে। তাতে আর কী হবে বল! ইউনিয়ন বোর্ডের ছাতুবাবুকে বললাম। ছাতুবাবু বললে, ঠিক আছে ওই সাফাই গাড়ি নিয়ে নাও।"

গণপতি অবাক হল। সে দিনকয়েক খোঁজখবর রাখতে পারেনি এদিককার। বাড়ির কাজে পাটনা যেতে হয়েছিল। গতকালই ফিরেছে পাটনা থেকে। গণপতি জানত, প্লাস্টিকের বড়-বড় ব্যাগে করে সবজির খোসাটোসা এনে ফেলা হবে এখানে। হঠাৎ শুনছে, ব্যাগ নয়, ইউনিয়ন বোর্ডের ময়লা ফেলা গাড়ি করে মালপত্র আসবে। সেগুলো তো গাড়ি নয়, নরকের আড়ত।

গণপতির ঘেন্না-ঘেন্না লাগল। নাকমুখ কুঁচকে বলল, "বলিস কী! ওই মোষটানা ময়লা-ফেলা গাড়ি?"

লালু বলল, "হ্যাঁ। দুটো গাড়ি পাওয়া যাবে ইউনিয়ন বোর্ড থেকে। ছাতুবাবু ম্যানেজ করে দেবে। বার তিনেক ট্রিপ মারবে গাড়ি দুটো। মানে তো-তোর ছ' গাড়ি মাল পড়বে প্রথম দিন।"

গণপতি বলল, "আরে রাম রাম! লালু, তুই-তুই গাধা না ঘোড়া? ইউনিয়ন বোর্ডের ওই ময়লা-ফেলা গাড়ি করে মাল আনলে—এক-একটা গাড়িতে ক' হাজার মাছি, ক' ডজন মরা ইঁদুর, কটা পচা বেড়াল-কুকুর এসে পড়বে তা জানিস?"

গজপতি লালুর দিকে তাকাল। এ-ব্যাপারে সে লালুর মুখ চেয়ে বসে আছে গোড়া থেকেই।

লালু বলল, "তুই মা-মাছি ইঁদুর কোথায় দেখলি? এ কি তোর শহরের ময়লা এসে জমা হচ্ছে এখানে? সেরেফ ভেজিটেব্‌ল খোসা। বাড়ি-বাড়ি থেকে কালেক্ট করে নিয়ে আসবে।"

"তোর মাথা!" গণপতি বলল, "কিস্যু বুঝিস না তুই! ইউনিয়ন বোর্ডের ছাতু হল ধাড়ি শেয়াল। চার-পাঁচটা তো গাড়ি ময়লা ফেলার। তার মধ্যে দু-তিনটের চাকা আর নড়তে চায় না। ওসব গাড়ি তোর-আমার জন্মের আগে থেকে পড়ে আছে ইউনিয়ন বোর্ডের মাঠে। আমি বলছি, ছাতু ওই ভাঙা গাড়ি খাটিয়ে কিছু ইনকাম করে নেওয়ার তাল করেছে। ছাতুর গাড়িতে মাল এলে আর দেখতে হবে না।"

লালু বলল, "তা হলে আসবে কেমন করে?"

"কেন, তোর বকা-লকা কী করল?"

"ওরা কেটে পড়েছে। বলছে, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে শাকসবজির খোসা কালেক্ট করা তাদের কাজ নয়। ওরা কি ময়লা-তোলা ঝাড়ুদার!"

গণপতি রেগে গেল। বলল, "আমি তোকে বলেছিলাম—ওই তোর বকা-লকার কাজ এসব নয়। আমার কথা শুনলি না। নে, বোঝ এবার।"

গজপতি বলল, "গণাদা, প্রথম-প্রথম একটু গোলমাল, ভুলচুক হবেই। মানে আমরা একটা সিস্টেম তৈরি না করা পর্যন্ত ঝামেলায় পড়ব ঠিকই। তবে এখন আমাদের ট্রায়াল পিরিয়াড। পরে ধীরে-ধীরে সব শুধরে নেওয়া যাবে। আগে দেখি ব্যাপারটা কতটা সাকসেসফুল হয়।"

গণপতি বলল, "অন্য অন্য মালগুলো কীভাবে আসবে?"

লালু বলল, "চলে আসবে। তুই ঘাবড়াস না। মাটির বড়-বড় গামলা করে আসবে টেরা—মানে ক্যারা। ঘাস-কাটা লোকরা ঘাস আর পাতাটাতা দিয়ে যাবে। কাঠের গুঁড়ো আর আদার মেটিরিয়াল আসবে গানি ব্যাগে।"

গণপতি আর কিছু বলল না। কীই-বা বলবে!

বুধবার খানিকটা বেলায় ইউনিয়ন বোর্ডের দুটো ময়লা-ফেলা গাড়ি এসে একরাশ ময়লা ফেলে দিয়ে চলে গেল। এল আর চলে গেল, কিছু বলল না। গ্রাহ্যও করল না।

গজপতি দেখল, সেই ময়লার মধ্যে নানা ধরনের আবর্জনা। তার দরকার তরিতরকারির খোসা। তাও আবার মোটা-মোটা খোসা। যে-ময়লা এসে পড়ল তাতে

যাবতীয় তরিতরকারির খোসা, ডাঁটি, শাকপাতা, মাছের আঁশ, কাঁটা, ডিমের খোসা, নানান আবর্জনা। এমনকী মরা আরশোলা, টিকটিকি পর্যন্ত।

গজপতি থ' হয়ে গেল। বলল, "লালুদা, এ কী?"

লালুও কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। চুপ করে থাকল, মাথা চুলকোতে লাগল। শেষে বলল, "বললাম এক, আনল আর-এক। বেটাদের মাথায় কি কিছু নেই? অল গাধাস্! তুই বিশ্বাস কর গজু, বারবার বুঝিয়ে বলেছি। লোকে কথা না বুঝলে কী করি বল তো? পইপই করে বলে এলাম, বুঝিয়ে এলাম এক। আর নিয়ে এল এক।"

গজপতি হতাশ হয়ে বলল, "এসব চলবে না লালুদা। এগুলো বাইরে পড়ে আছে, পড়ে থাক। চুন আর ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিতে বলো।"

ময়লা ফেলার পরপরই কোথথেকে মাছি জুটে গিয়েছিল। দেখতে-দেখতে মাছি যেন বাড়তে লাগল। কয়েকটা কাকও এসে পড়ল দেখতে-দেখতে।

গজপতি আর লালু সরে গেল সামনে থেকে।

এমন সময় মহাদেবকে দেখা গেল। সবেই এসেছে। তার মজুরদের সঙ্গে কথা বলছিল।

গজপতিরা খানিকটা হেঁটে আসতেই মহাদেবের সঙ্গে দেখা।

মহাদেব যথারীতি 'রাম রাম' বলে নমস্কার জানাল।

গজপতি হঠাৎ বলল, "লালুদা, তুমি মহাদেবের সঙ্গে কথা বলো তো! ওর হাতে লোকজন আছে।"

লালু কিছু বলার আগেই মহাদেব নিজেই বলল, "মাঠে ওভাবে ময়লা ফেলে গেল কে লালুবাবু? পচা গন্ধ উঠছে। কাক এসে বসেছে জঞ্জালের ওপর।"

লালু একটু যেন লজ্জায় পড়ে গেল। তারপর বলল ঘটনাটা।

মহাদেব বলল, "লালুবাবু, আপনারা তো শুরুতেই গোলমাল করে ফেললেন। আগর আমাকে পুছতেন...!"

লালু বলল, "মাথায় আসেনি। এখন বলো, কী করা যায়?"

মহাদেব সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "শহরে ঢিঢিয়া লাগিয়ে দিন।"

"ঢিঢিয়া! মানে ঢেঁড়া পেটানোর কথা বলছ?"

"বিলকুল ওহি কাম করুন।"

গজপতি বলল, "তাতে কী হবে?"

মহাদেব বলল, "ঠিক কাম হবে।"

"কেমন করে?"

মহাদেব বলল, "শহরে ঢেঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হোক—জুতি কারখানা কাজের জন্যে মাল চাইছে। চাইছে, সবজির খোসা। কী-কী সবজি তা বলে দেওয়া হোক সকলকে। এক ঝুড়ি ভাল মালের জন্যে দু' টাকা করে দেওয়া হবে। মাঝারি মালের জন্যে দেড় টাকা। বাজে মাল নেওয়া হবে না। যারা মাল দিতে চায়—সরাসরি জুতি কারখানায় নিজেদের মাল পৌঁছে দিতে হবে। মালের দাম পাওয়া যাবে নগদা।"

গজপতি আর লালু প্রায় একই সঙ্গে বলল, "এতে কাজ হবে?"

মহাদেব বলল, "বাবু, কাম-কাজ এয়সানই হয়। গোয়ালারা ঘর-ঘর দুধ দেয়, ঘুঁটিয়াআলি ঘর-ঘর ঘুঁটিয়া দেয়। কিতনা গরিব আদমি আছে শহরমে। দো-এক ঝোড়ি মাল রেখে গেলে চার-পাঁচ টাকা কামাই।"

গজপতির বেশ পছন্দ হল কথাটা।

লালু বলল, "গজু, আইডিয়াটা মন্দ নয়। কত গরিব মানুষ আছে, বাড়ি-বাড়ি এটা-সেটা চেয়ে বেড়ায়, এরাই তো বাড়ি থেকে সবজির ফেলে দেওয়া খোসা জোগাড় করে আনতে পারে।"

মহাদেব বলল, "জরুর পারে। টিশানে লছমানের দোকান আছে, বাজারে হোটেলআছে—, দো চার ঝোড়ি মাল হরবখত পাওয়া যাবে গজপতবাবু।"

গজপতি বলল, "লালুদা, গুড অ্যাডভাইস। তুমি কালই ঢেঁড়রা পিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করো।"

লালু মাথা নেড়ে বলতে যাচ্ছিল, ঠিক আছে—ব্যবস্থা করবে, হঠাৎ তার গণপতির কথা মনে পড়ে গেল। গণপতিকে একবার জিজ্ঞেস করা দরকার। নয়তো আবার বেইজ্জত হতে হবে। গণপতি ঠিকই বলেছিল, ছাতুবাবু লোকটাকে বিশ্বাস করা উচিত হয়নি। আজ এখন যদি গণপতি এসে হাজির হয়—মাঠের মধ্যে জমানো ময়লা দেখে খেপে যাবে।

লালু বলল, "ঠিক আছে। বিকেলে একবার গণাকে জি-জিজ্ঞেস করে নিলেই হবে।"

বিকেলে গণপতি সব শুনে বলল, "তোদের মাথাখারাপ হয়েছে! ঢেঁড়রা! ঢোল পিটিয়ে বলে বেড়াতে হবে...। না, না, ওসব ফালতু কাজ করিস না। প্রেস্টিজ বলে একটা কথা আছে। গজা কত বড় একটা কাজ করতে যাচ্ছে—একেবারে নতুন, লোকে অলরেডি দেখছে—কীরকম একটা কারখানা তৈরি হয়ে উঠছে এখানে—আর তোরা ঢেঁড়রা পেটাবার কথা বলছিস। নো, নেভার। হতেই পারে না।"

গজপতি অসহায়ভাবে বলল, "তা হলে?"

গণপতি বলল, "হ্যান্ডবিল।"

"হ্যান্ডবিল?"

"হ্যাঁ, হ্যান্ডবিল ছেপে বিলি করে দে শহরে। বড়-বড় করে ছাপা থাকবে জুতো কারখানার জন্যে সবজির খোসা চাই।"

লালু বলল, "গরিব মানুষ, মুটে-মজুর? তারা কি লেখাপড়া জানে যে, হ্যান্ডবিল পড়তে পারবে?"

"তারা না পারুক যারা পারবে তারাই ওদের বলে দেবে। আমি বলছি তোদের কাজের কাজ হয়ে যাবে।"

গজপতি বলল, "গণাদা, এসব করতে-করতে যে দেরি হয়ে যাবে।"

"দু-তিনদিন। তুই অন্য ভাটিগুলো ভরতি কর। এক নম্বরটা একটু পিছিয়ে যাবে।

তাতে কী?”

লালু বলল, “হ্যান্ডবিল লিখবে কে? ছাপানো হবে কোথায়?”

গণপতি বলল, “সে-ব্যবস্থা আমি করছি। তোরা নিজেদের কাজ করে যা।”

গজপতি বলল, “তাই করতে হবে। তবে অন্যগুলোর প্রবলেম কম। এক নম্বরটাই ঝামেলার।”

গণপতি অভয় দিয়ে বলল, “পাঁচ-সাত দিন দেরি হবে হোক—তবে কাজ শুরু হলে আর আটকাবে না।”

গণপতির হ্যান্ডবিল ছাপা হতে-হতে দিনচারেক লেগে গেল। লাল আর সবুজ দু'রকম কাগজে ছোট-ছোট হ্যান্ডবিল ছাপা হল। বাংলা আর হিন্দিতে।

ময়ূরগঞ্জের পুরনো সেপাই মাঠে শীতকালে সার্কাস আসে। মাঝে-মাঝে বাদও পড়ে যায়। এবারে সার্কাস আসেনি, তার বদলে দু-চারদিনের এক মেলা হয়ে গিয়েছিল। ভাল জমেনি।

সার্কাস পার্টির লোকরা শহরে এলে টেম্পো ভাড়া করে মাইক বাজিয়ে হ্যান্ডবিল ছড়ায়। গজপতি টেম্পো ভাড়া করল না। এখনও এখানে টাঙা-পটি আছে, দশ-পনেরোটা টাঙা শহরে ঘোরাফেরা করে। বেচারাদের অবস্থা দিন-দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

গণপতি এক চেনাজানা টাঙাঅলাকে ধরল। নাম তার ভজুয়া। ভজুয়াকে ডেকে গণপতি বলল, “দু'দিন ধরে শহরের সব মহল্লায় এই হ্যান্ডবিল বিলি করে দিতে হবে। দিনে পঁচিশ টাকা টাঙাভাড়া, পাঁচ টাকা খাইখরচা।”

ভজুয়া একসময় হামিদ মিঞার ব্যান্ড-পার্টিতে ড্রাম বাজাত। তার বাঁ হাতের কবজি ভেঙে যাওয়ার পর ড্রাম বাজাতে কষ্ট হত বলে সে ব্যান্ড-পার্টি ছেড়ে দিয়েছে। তবে সে ব্যান্ডের ভক্ত।

একেবারে খালি হাতে হ্যান্ডবিল বিলি করায় যেন মন পাচ্ছিল না ভজুয়া। তার চেয়ে জনা দুই-তিন ব্যান্ড-পার্টির লোক নিয়ে বাজনা বাজাতে-বাজাতে কাগজবিলি করলে ব্যাপারটা মানানসই হবে।

গণপতি ভাইকে বলল, “গজা, ব্যান্ড দিবি? ব্যান্ড না থাকলে নেড়া-নেড়া লাগে, তাই না?

গজপতি কিছু বলার আগেই লালু বলল, “দিয়ে দে। জমবে ভাল।”

গণপতি রাজি হয়ে গেল।

দশ

শহরে ঢেঁড়া পড়ার পর একটা হপ্তাও কাটল না, গজপতির জুতো কারখানার সামনে আনাজের খোসা জমতে-জমতে যেন পাহাড় হয়ে উঠতে লাগল। বেলা একটু বাড়ল কি লোক আসতে শুরু করল। মাথায় ঝুড়ি। ঝুড়ি ভর্তি আনাজের খোসা।

শহরে গরিবগুরবো লোকের অভাব নেই; কেউ রেলের ছাইগাদা থেকে কুড়নো পোড়া-কয়লা বিক্রি করে ঝুড়ি করে, কেউ বিক্রি করে ঘুঁটে, কাঠকুটো—এইরকম কত কী। তারা বোধ হয় সবাই এখন বাড়ি-বাড়ি থেকে তরিতরকারির খোসা এনে জুতো কারখানার মাঠে হাজির করছে। আসছেও নানা বয়েসের লোক, বুড়ো, জোয়ান, ছেলেছোকরা। মেয়েরাও আসছে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে।

লালুর হয়েছে জ্বালা। এখন তাকে আরও সকাল-সকাল আসতে হয়। ঝুড়ি দেখতে হয়, গুনতে হয়, টাকা মেটাতে হয়। আর রোজই চেঁচামেচি করতে হয় লালুকে, লোকগুলোর সঙ্গে। বারবার বলা সত্ত্বেও ওরা যে-যা পারে আনাজের খোসা এনে হাজির করে, ফলে লালুকে অনর্থক চেঁচাতে হয়। অবশ্য লালু বুঝতে পারে, ওদের আর দোষ কী, দু' পয়সা নগদানগদি পাওয়ার লোভেই না এসে জোটে ওরা।

দিন-আষ্টেকের মাথায় লালু গজপতিকে বলল, "গজু, নো মোর। খোসার পাহাড় হয়ে গেছে।"

গজপতিরও মনে হল, পাহাড় না হোক—আপাতত আনাজের খোসা যা জমেছে তাতে তার এক নম্বর ভাটি কেন, চারটে ভাটিই ভরতি হয়ে যেতে পারে। গজপতি বলল, "বারণ করে দাও। বলে দাও এখন আর লাগবে না। পরে যখন লাগবে, জানাব।"

লালু বলল, "আর দেরি করে কী হবে। কাল থেকে এক নম্বরে মালপত্র ফেলা যাক। কী বলিস।"

গজপতি মাথা দোলাল, "কাল থেকেই শুরু করো।"

লালু বলল, "কিন্তু একটা প্র-প্রবলেম হচ্ছে যে রে?"

"কী?"

"মাঠ থেকে মাল এনে ভাটিতে ফেলতে হবে। লোক চাই।"

"দু-তিনটে লোক লাগিয়ে দাও।"

"দু'জনের সঙ্গে কথা বলেছি। বেটারা নবাব। বলে, ময়লা তোলা ধাঙড়ের কাজ।"

"ময়লা!"

লালু বলল, "তা ইয়ে, খানিকটা জঞ্জাল তো হয়েছে। ক'-ক'দিন ধরে পড়ে আছে মাঠে, রোদে পচছে, মাছি ভনভন করছে, কাক উড়ছে, দু-চারটে কুকুরও এসে জুটেছে। বড় দু-দুর্গন্ধও হয়েছে রে!"

গজপতি অস্বীকার করতে পারল না। সত্যিই বেশ মাছি হয়েছে। তবে কাক আর কুকুর কোথায় না থাকে। আগেই এখানে কুকুর জুটেছে। গন্ধটা কোনও সমস্যা নয়। ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিলে গন্ধটা চাপা পড়ে যাবে।

গজপতি বলল, "তবে দু-তিনটে ধাঙড় ধরে আনো। দু-চার টাকা বেশি দাও। ওরাই মাল তুলে দেবে।"

লালু বলল, "ধাঙড় নয়, ওরাই করবে। টাকা বেশি দিতে হবে। আর বলছে—জুতো কারখানায় চাকরি দিতে হবে ওদের।"

গজপতি বলল, "ঠিক আছে। চাকরি পাবে।"

কথা বলতে-বলতে দু'জনে মাঠ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, চোখে পড়ল, বোঁদে আড্ডি তাঁর মুনশিকে নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

বোঁদে আড্ডিও গজপতিদের দেখেছিলেন। হাত তুললেন। ডাকলেন গজপতিদের।

গজপতিরা এগিয়ে গেল।

কাছাকাছি আসতেই বোঁদে আড্ডি বললেন, "তোমাগো এখানে যত্ত চুর-ছ্যাঁচুড়ের আড্ডা হইতাছে। আমাগো মালপত্তর চুরি যায়।"

গজপতি যেন বুঝতে পারল না কথাটা। বোঁদেবাবু যে চোরকে 'চুর' বলেন, আগেই সেটা শুনেছে সে। তা চোর আসছে এখানে। কই, সে তো শোনেনি আগে।

লালু বলল, "চোর! কোথায় চোর?"

বোঁদে আড্ডি বললেন, "কোথায় চুর! চুর কি তোমার কুটুম? খবর দিয়া আইব!"

লালু বলল, "চো-চোরের কথা আমরা জানি না। আপনার কিছু চুরি গিয়েছে?"

বোঁদে আড্ডি তাঁর মুনশির দিকে তাকালেন। মানে, মুনশিকে বলতে বললেন কিছু।

মুনশি বলল, তাদের মালপত্র রাখার ঘর থেকে কালই চার বস্তা সিমেন্ট, দুটো কোদাল, এক জোড়া কড়াই, আরও খুচরো-খাচরা কিছু চুরি গিয়েছে।

গজপতি বোঁদেবাবুকে বলল, "তা কেমন করে হবে? আপনারা আলাদা গুদোমে মাল রাখেন। নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। আমাদের এখানে একজন মাত্র দরোয়ান। বিশ্বাসী লোক। সে তো কিছু বলেনি।"

বোঁদে আড্ডি বললেন, "তুমি আমারে লায়ার কও! আমি ফালতু কথা কই না হে! আগে তো চুরির কথা কই নাই, এখন কইছি।"

লালু বলল, "চোরটা কে? আপনি এখানে কাকে চোর দেখলেন?"

বোঁদে আড্ডি বললেন, "আমি যা দ্যাখবার দ্যাখছি। বস্তা-বস্তা সিমেন্ট, কোদাল, কড়াই, ঝুড়ি—যায় কোথায়?"

গজপতি বিরক্ত হয়ে বলল, "ঠিক আছে, খরচা লিখে নেবেন।"

লালুকে নিয়ে গজপতি চলে যাচ্ছিল, বোঁদে বললেন, "ওই লোকটাকে আমি ছাচপেক্ট করি।" বোঁদেবাবু সাসপেক্টকে 'ছাচপেক্ট' বললেন।

গজপতি বলল, "কোন লোক?"

"পেস্তার ওই টেরা মিস্ত্রিটাকে।"

লালু অবাক হয়ে বলল, "বলেন কী! ও তো রং-মিস্ত্রি। শেডের মাথায় কালো রং লাগাচ্ছে। ওর নাম ভক্ত। ভক্তর সঙ্গে আরও দুটো লোক কাজ করছে বদুকাকা। ভক্ত খুব ভাল লোক। ভজ গৌরাঙ্গ গান গায়। আমাদের চেনা। পেস্তাজির লোক ও নয়, আমাদের লোক।"

বোঁদেবাবু ডান হাতের আঙুল তুলে বললেন, "তুমি আমারে ভক্ত দেখাও লালু? ভক্ত পেহ্লাদ। আমি ওটারে জানি। বেটা পেস্তার লোক। স্পাই।"

"স্পাই!" লালু আর গজপতি আকাশ থেকে পড়ল। "স্পাই কেন হবে?"

বোঁদে বললেন, "পেস্তা যায় ডালে-ডালে, আমি যাই পাতায়-পাতায়। পেস্তা আমারে ডাউন দিতে চায়। বদনাম করাতে চায়।"

গজপতির আর দাঁড়াতে ইচ্ছে করছিল না। লালুকে ঠেলা মেরে এগিয়ে যেতে বলল।

খানিকটা এগিয়ে এসে লালু বলল, "গজু, বোঁদেকে দিয়ে চলবে না।আমার মনে হয়—ও নিজেই সিমেন্টের বস্তা সরাচ্ছে। আজ বলছে চার বস্তা সিমেন্ট চুরি গেছে। কাল বলবে পাঁচ বস্তা। ও পয়লা নম্বর সিমেন্ট-চোর। চুরি করবে নিজে আর দোষ চাপাবে পেস্তাজির লোকের নামে।"

গজপতি বলল, "জেঠুকে বলব, বোঁদেবাবুকে হটিয়ে দিতে।"

আরও খানিকটা এগিয়ে আসার পর গজপতিরা দেখল, গোটা তিনেক গোরুর গাড়ি প্রায় কারখানার কম্পাউন্ড ওয়ালের কাছাকাছি এসে গেছে। কারখানার কম্পাউন্ডওয়াল সবটুকু ঘেরা হয়ে গেলেও একপাশে অনেকটা ফাঁক রাখা হয়েছে। মালপত্র আনা-নেওয়ার সুবিধের জন্যে।

গোরুর গাড়ি দেখে লালু আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল, "গজু, দেখছিস?"

"দেখছি।"

"তোর টেরা—না মা-মানে ক্যারা এসে গেল।"

গজপতি অবাক হল না। ক্যারাক্যারাম্বুলা আসার কথাই ছিল। গতকালই আসতে পারত, আসেনি।

লালু আর গজপতি এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

গোরুর গাড়িগুলো হেলে-দুলে চাকার শব্দ তুলে সামনে এসে দাঁড়াল।

গজপতি আর লালু গাড়ির পাশে এল; দেখল। বড়-বড় মাটির গামলা পরপর সাজানো। এক-একটা গাড়িতে তিনটের বেশি গামলা আঁটেনি। কাদাটে কালচে শ্যাওলায় গামলাগুলো ভরতি। গাড়ির নড়াচড়ায় গামলার গা দিয়ে শ্যাওলা গড়িয়ে পড়েছে। গাড়ির গাড়োয়ানগুলো ছেঁড়া গামছা দিয়ে নাক মুখ ঢেকে রেখেছে।

গজপতি বলল, "লালুদা, গাড়িগুলো একেবারে শেডের কাছে নিয়ে যেতে বলো। লোকজন ডাকো। গামলা নামিয়ে শেডের মধ্যে রাখবে।"

লালু বলল, "গজু, এখানে ন' গামলা আছে। আর কত লাগবে?"

গজপতি বলল, "আরও লাগবে।"

গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানগুলোকে শেডের দিকে এগিয়ে যেতে বলে লালু পকেট থেকে রুমাল বার করল। নাকমুখ কুঁচকে বলল, "গজু, পচা পাঁকের গন্ধ রে! বেড়াল পচলেও এত বাজে গ-গন্ধ হয় না। মরে যাব।"

গজপতির নিজেরও গন্ধ লাগছিল। নাক চাপা দিয়ে বলল, "কাল থেকে আমরা মাস্ক পরব।"

"কী?"

"মাস্ক। আমার কাছে নেই। তৈরি করিয়ে নেব। ব্যান্ডেজের কাপড় আর গজ দিয়ে। গন্ধ লাগবে না। গজের মধ্যে ইউক্যালিপটাস অয়েল দিয়ে নিলে তুমি গন্ধের

'গ' পাবে না।"

লালু যেন বমি চাপতে-চাপতে শেডের দিকে ছুটল।

গণপতি এসেছিল বিকেলে। এসে দেখল, লালু একটা দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে আছে। একেবারে ফাঁকা মাঠে। বিকেল পড়ে আসছে তখন। রোদ সামান্য ঘোলাটে। বাতাস দিচ্ছিল।

গণপতি বলল, "কী রে লালু? তুই শুয়ে আছিস?"

লালু বলল, "গ্যা-গ্যাস লেগে গেছে।"

"গ্যাস?"

"ক্যারা-গ্যাস!" বলে লালু গ্যাস লাগার বিবরণ দিল। শেডের মধ্যে শ্যাওলা আর পাঁকের গামলা নামাবার সময় তার গ্যাস লেগে গিয়েছে।

গণপতি বলল, "গজা কোথায়?"

"আছে। আসছে।"

একটু পরেই গজপতি এল।

গণপতি বলল, "গজা, লালুর গ্যাস লেগে গেছে!"

"সেরে যাবে। লালুদা এখন ফিট।"

"তুই?"

"ঠিক আছি। আমি কাছে ছিলাম না, লালুদা ছিল।...তুমি ভেবো না। কাল থেকে আমরা মাস্ক পরে কাজ করব।"

গণপতি বলল, "কবে থেকে শুরু করছিস?"

"কাল।"

লালু উঠে পড়ল। বলল, "নে, চল। আজ আর ভাল লাগছে না।"

গণপতির গাড়িতেই ফিরছিল ওরা। ফেরার পথে গজপতি বলল, "গণাদা, বোঁদেবাবু বলছেন, তাঁর মালপত্র রাখার গুদোম থেকে চুরিচামারি হচ্ছে।"

"চুরি! কী চুরি হয়েছে?"

"সিমেন্টের বস্তা, কোদাল, ঝুড়ি, আরও কী-কী!"

"বাজে কথা। বোঁদে নিজেই মাল সরিয়েছে।"

"উনি বলছেন, রং-মিস্ত্রি ভক্তকে উনি সন্দেহ করেন।"

লালু বলল, "ভক্ত নাকি পেস্তাজির লোক। বোঁদেকে ডাউন করার জন্যে পেস্তাজির কথায় ভক্ত বোঁদের গোডাউন থেকে মালপত্তর সরাচ্ছে।"

গণপতি বলল, "দাঁড়া। বোঁদেকে দেখছি।"

"কী দেখবে?"

"কাল ওর গোডাউন চেক করব। আমার মনে হয়, চার কেন—ও চল্লিশ বস্তা সিমেন্ট সরিয়ে ফেলেছে এর মধ্যেই। চার দিয়ে শুরু করেছে বোঁদে।...তোদের কাছে হিসেব আছে না সিমেন্টের?"

গজপতি বলল, "আছে।"

কথা বলতে-বলতে আরও খানিকটা আসার পর ল্যালু হঠাৎ কেমন করে উঠল। বলল, "গণা, আমার মাথার মধ্যে কেমন করছে।"

"কেমন করছে! কী করছে?"

লালু দু' হাতে মাথা টিপে ধরে একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "মাথার মধ্যে ভুড়ভুড়ি কাটছে। মনে হচ্ছে, ওই ক্যা-ক্যারা গ্যাস আমার ব্রেনের মধ্যে ঢুকে গেছে। ব্রেন গ্যাস হয়ে যাচ্ছে।"

গণপতি হেসে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই দেখল, লালু চোখ উলটে কেমন অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল। তারপর একেবারে এলিয়ে পড়ল গাড়িতে।

এগারো

বর্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

জুতো কারখানার শেডের তলায় ভাটিগুলোও ততদিনে চালু হয়ে গিয়েছে। এক নম্বর ভাটিতে সবজির খোসার সঙ্গে চুন পড়েছে দেড় বস্তা, নুন এক বস্তা। দু' নম্বর ভাটিতে চুন আর সোডা মিশিয়ে ফেলা হয়েছে অন্তত দেড় বস্তা। কোনওটায় অ্যাসিড পড়েছে, কোনওটায় খড়িমাটির মতন সাদাটে রঙের এক পাউডার। কাঠের গুঁড়ো আর পেস্টবোর্ডের ভাটিতে শিরীষ আঠা পড়েছে দেদার।

গজপতি আর লালু এখন আর আগের মতন মামুলি পোশাকে ঘোরাফেরা করে না শেডের মধ্যে। দু'জনেই এখন আলখাল্লা ধরনের জামা পরে। মুখে কাপড়ের মাস্ক। অনেকটা বাচ্চাদের কান-ঢাকা টুপির মতন দেখতে। নিজেদের হাতে বানানো। মাস্কের নাকের কাছে গজ-কাপড়, তাতে ইউক্যালিপটাস তেল দেওয়া থাকে।

কারখানার শেডের দিকে সহজে কেউ ভিড়তে চায় না। উৎকট এক গন্ধ বেরোয় ভাটিগুলো থেকে। মাছি উড়ছে সারাক্ষণ, শ'য়ে-শ'য়ে মাছি, বড়-বড় ডাঁশ মাছিও হয়েছে কম নয়। সেইসঙ্গে পোকা আর মশা। ক্যারাক্যারাম্বুলার ভাটির মুখে মশা কালো হয়ে থাকে, মনে হয় ভাটির মুখে বুঝি ঘন কালো সর পড়েছে মশার।

বর্ষাও চলছিল। মাছি, মশা, দুর্গন্ধ, ইঁদুর—কোনও কিছুরই অভাব ছিল না শেডের মধ্যে।

দিন-পনেরো পরে গজপতি বলল, "লালুদা, মাছিগুলো তাড়াতে না পারলে তো কাজ করা যাবে না।"

লালুর সেই যে গ্যাস লেগেছিল তারপর থেকে নাক আর গলা বসে গেছে। নাক সব সময় বুজে থাকে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট রয়েছে। আর গলা তো আরও ভেঙে গেছে। মাথা অবশ্য ঠিক আছে। শুধু মাঝে-মাঝে তার একটু বেশি ঘুম পায়। ডাক্তার বলেছেন, লালুর ব্রেন ঠিকই আছে, গ্যাস লেগে কোনও ক্ষতি হয়নি।

মাছি, মশা আর দুর্গন্ধের উৎপাতে লালু বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল এই

ক'দিনেই। একবার তার মনেও হয়েছিল, গজপতিকে ফেলে পালিয়ে যায়। তারপর নিজেকেই ধিক্কার দিয়েছিল। ছিছি, গোড়াতেই এভাবে পালিয়ে যাওয়া যায় না। গজু তার বন্ধুর ছোট ভাই। নিজের ভাইয়ের মতন। কত ভরসা করে সে লালুর ওপর। বলতে গেলে, লালুই তো কোম্পানির ওয়ার্কস ম্যানেজার। না, লালু পালাবে না। সে কি কাওয়ার্ড নাকি? মাছি, মশা, গন্ধের ভয়ে পালাবে! লালু পালায়নি।

গজপতি আবার বলল, "আমরা যাদের কাজে নিয়েছি তারা সবে কাজে আসতে শুরু করেছে। এখনও শেডের মধ্যে ঢোকেনি বড়। ওরাও যদি বিগড়ে যায়।"

লালু বলল, "বি-বিগড়োতে পারে। তবে ওরা কত আজেবাজে জায়গায় কাজ করেছে। গ-গন্ধ কোনও ব্যাপার নয়।"

"কী করা যায় বলো? আমাদেরও তো নিজের হাতে কাজকর্ম করতে হবে। হুকুম মেরে এসব কাজ হয় না। হাত লাগানো চাই।"

লালুর কিছু মাথায় এল না। বলল, "তুই বল।"

"ভাবছি। মাথায় কিছু আসছে না। দেখি, গণাদার সঙ্গে আর-একবার কথা বলে দেখি।"

সন্ধেবেলায় বাড়িতে নীচের ঘরে আড্ডা বসেছিল। জুতো কোম্পানির অফিসঘরই বলা যায় ঘরটাকে। হরেকরকম জিনিস, ছবি, মেশিনের নকশায় ঘরের চারপাশ ভরতি। গোটাকয়েক প্যাকিং-বাক্সও পড়ে আছে।

কথাটা গজপতিই তুলল।

লালুও বলল, "গণা, আসছে হপ্তায় আমাদের এক নম্বর ভাটির মাল রিলিজ করতে হবে। একটা বুদ্ধি বাতলা।"

গণপতি বলল, "মালপত্র তো পাইপ দিয়ে রিলিজ হবে—"

"ঘরে আমাদের থাকতে হবে না? হাত লাগাতে হবে।"

গণপতি একটু ভেবে বলল, "অ্যারেবিয়ান শেখদের মতন বোরখা পরে নে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা। মুখে তোদের নাক-পট্টি তো আছেই।"

গজপতি শুনল মন দিয়ে, কী যেন ভাবল, তারপর বলল, "গণাদা, তোমার আইডিয়াটা ভাল। আমারও একটা আইডিয়া এল তোমার কথা শুনে।"

গণপতি আর লালু একই সঙ্গে বলল, "কী আইডিয়া?"

গজপতি বলল, "চ্যারিয়ট!"

গণপতিরা কিছুই বুঝল না। এ আবার কী জাপানি জিনিস বলছে গজা! গণপতি বলল, "চ্যারিয়ট? মানে?"

"চ্যারিয়ট। চ্যারিয়ট বুঝলে না? রথ।"

"রথ! ও, সেই চ্যারিয়ট! কর্ণ আর অর্জুনের ফাইট। তাই বল! আমি ভাবলাম কী না কী! তা রথ নিয়ে কী করবি?"

গজপতি বলল, "রথ মানে একেবারে ঠিকঠাক দ্যাট টাইপের রথ নয়, রথের মতন। ধরো, চারটে চাকা-লাগানো একটা করে খাঁচা টাইপের গাড়ি। গাড়ির চারপাশে

চার খুঁটি। গাড়িটা জাল দিয়ে ঘেরা। মাছি, মশা ঢুকতে পারবে না। ওই গাড়ি চেপে আমরা শেডের মধ্যে কাজ করে বেড়াব।"

গণপতি অবাক হয়ে ভাইকে দেখতে লাগল। তারপর লালুর দিকে তাকাল। যেন বলল, কী রে লালু কিছু বুঝলি?

লালুও কিছু বুঝল না।

গজপতি বলল, "এরকম গাড়ি আমি দেখেছি নাচিকিচিতে। ওরা বলে 'গ্লাস ট্রলি'। অটোমেটিক ট্রলি। ওখানে সবই যন্ত্রে হয়। বিরাট কারখানার মধ্যে ট্রলিগুলো যেখানে খুশি যাচ্ছে, ট্রলির মধ্যে একটা করে লোক। বেঁটে বলে খুব সুবিধে ওদের। টুলের মধ্যে বসে-বসেই কাজ সেরে নিচ্ছে সামনের দরজা খুলে। আবার চলে যাচ্ছে অন্য জায়গায়। ভেরি বিউটিফুল।"

গণপতি বলল, "বাঃ, খাসা জিনিস তো রে গজা! রথ চড়া কলা বেচা দুই হচ্ছে!"

"হ্যাঁ।"

"লাপাজু!" বলে গণপতি যেন তালি বাজিয়ে নেচে উঠল। তারপর বলল, "তবে গজা! এখানে তোর অটোমেটিক খাঁচা হওয়ার কোনও চান্স নেই। আর তোর কারখানার স্পেসই বা কতটুকু! আমি বলি, রথটথ ছেড়ে দে। বরং একটা করে ডবল নেটের আলখাল্লা বানিয়ে নে শেখদের মতন। মাথায় টুপি লাগা। মুখের সামনে বোরখার মতন জালি রাখ। কাজ করার সময় হাতে দস্তানা পরবি। ব্যস! ওতেই হবে।"

লালু মাথা নাড়ল। গণপতির কথাটাই তার মনে ধরেছে।

গজপতি খানিকটা মুষড়ে পড়ে বলল, "দেখি তবে। ওরকম ড্রেস তো ওদেরও চাই, যারা কাজ করবে শেডে।"

"করিয়ে দে।"

"কাকে দিয়ে করাব?"

লালু বলল, "ও ভাবতে হবে না। আমাদের ভিখু দরজি আছে। ভিখুর হাত ভাল। এ-একবার বুঝিয়ে দিলে ফটাফট করে ফেলবে!"

গজপতি আর আপত্তি করল না।

গণপতি বলল, "তা হলে আর দেরি করিস না গজা, কাল সকালে গিয়েই ভিখুকে সব বুঝিয়ে দে। রামবাবুর দোকানে তুই ভাল নাইলন মশারির নেট পেয়ে যাবি। না কী রে লালু?"

লালু ঘাড় নাড়ল। বলল, "রামবাবু আছে, দু-দু-দুনিবাবুর দোকান আছে।"

মোটামুটি ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাওয়ার পর গজপতি বলল, "গণাদা, আর একমাস কি বড় জোর দেড়মাস। তারপর আমার কারখানায় প্রথম জুতো তৈরি হবে। স্যাম্প্‌ল জুতো গোটা দুই-চার তৈরি করে দেখব। এক্সপেরিমেন্ট!"

গণপতি বলল, "প্রথম জুতোটা কার নামে চড়াবি?"

গজপতি বলল, "কার নামে চড়াব মানে?"

"মানে কাকে দিবি?"

লালু বেশ ভারিক্কি গলায় বলল, "ঠাকুর-দেবতাকেই লোকে প্র-প্রথম জিনিসটা দেয়। ফল, মিষ্টি, ভোগ। জুতো তো ফলফুলুরি নয় যে, গড-এর নামে দেওয়া যাবে।"

গণপতি গম্ভীর হয়ে বলল, "পাঁজিটা একবার দেখতে হবে। ভেজিটেব্‌ল জুতো যখন, তখন কাউকে নিশ্চয় দেওয়া যাবে। গজা, এটা মায়ের হাতে ছেড়ে দে। মা একটা কিছু বার করে দেবে ঠিক।"

ওরা খেয়াল করেনি, ঝিললি কখন ঘরে এসেছে। দাদাকে ডাকতেই এসেছিল। ভেতরে মা-কাকিরা ডাকছে মেজদাকে। ঝিললির কানে কথাটা গিয়েছিল। সে চট করে বলল, "জুতোশ্বর!"

গণপতিরা ঝিললিকে আগে নজর করেনি। বোনের গলা পেয়ে তাকাল তার দিকে।

ঝিললি যেন তেমন কিছু না বুঝেই প্রথমে কথাটা বলে ফেলেছিল। এবার তার খেয়াল হল। নিজেই বেশ মজা পেল।

গণপতি বোনকে বলল, "কী বললি?"

ঝিললি ঠোঁট টিপে হেসে বলল, "জুতোশ্বর।"

"জুতেশ্বর।"

"জুতেশ্বর নয়, জুতোশ্বর!"

গজপতি বলল, "কে জুতোশ্বর?"

ঝিললি মুচকি হেসে বলল, "আছে। মা-কাকিমারা জানে।"

গণপতি বলল, "যা, যা, দুষ্টুমি করিস না।"

লালু বলল, "না, না, গণা—থাকতে পারে। পসিব্‌ল। আমাদের তে-তেত্তিরিশ কোটি দেবদেবী। মহেশ্বর থেকে ব-বটেশ্বর, ঘ-ঘ-ঘণ্টেশ্বরও আছে। ঝিললি ঠিকই বলেছে বোধ হয়।"

গণপতি বলল, "আমি শুনিনি। জুতোশ্বর! সন্ধি, না সমাস? কে জুতোশ্বর?"

ঝিললি ততক্ষণে মাথা ঘামিয়ে একটা জবাব বার করে ফেলেছে। বলল, "কার্তিকঠাকুর। কার্তিকঠাকুর...!"

"সে তো ময়ূর চড়ে ঘুরে বেড়ায়।"

"জুতোও পরে।"

লালু মাথা নেড়ে বলল, "রাইট। এক্কেবারে ঠিক। দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে কা-কার্ত্তিককে দেখিসনি। পামশু জুতো পরে।"

গজপতি কিছুই বলল না।

ঝিললি কোনওরকমে হাসি চেপে গজপতিকে ডাকল। "তোমায় ডাকছে। চলো।"

"কে ডাকছে?"

"মা, কাকি!"

"যা তুই। আসছি।"

ঝিললি চলে গেল।

বোন চলে যাওয়ার পর গজপতি বলল, "গণাদা, তোমরা বোসো, আমি আসছি।"

গণপতিরা বসে রয়েছে, কে একজন বাইরে এসে ডাকাডাকি শুরু করল। লালু বাইরে গেল দেখতে।

একটু পরেই গণপতি একটা লোককে নিয়ে ফিরে এল ঘরে। লোকটাকে দেখতে এত বেঁটে যে, চেয়ারে বসলে তার পা বোধহয় মাটিতে ঠেকবে না। মাথায় অত বেঁটে হলেও গায়ে বেশ তাগড়া। লোকটার মুখ দেখলে তার বয়েস বছর ত্রিশ বলেই মনে হয়। থুতনির চারপাশে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ভোঁতা নাক। চোখগুলো লালচে। মাথার চুল কোঁকড়ানো। গায়ের রং কুচকুচে কালো। লোকটার পরনে প্যান্ট, গায়ে হাফহাতা শার্ট। হাতে একটা কিট ব্যাগ।

গণপতি তাকাল। "কী চাই?"

লোকটা বলল, "চাকরি।"

"চাকরি? কীসের চাকরি?"

"আমি কাটিং মাস্টার। জুতোর কাটিং করি। জুতো সেলাই মেশিনে সেলাইও করি সার।"

"তোমার নাম?"

"পান্নালাল। লোকে সার আমাকে কেলো পানতুয়া—পানু বলে ডাকে।"

গণপতি আর লালু হেসে ফেলল। কেলো পানতুয়া! দারুণ নাম তো, কালোজাম নামটাই বা খারাপ কী! গণপতি বলল, "তোমাকে চাকরির কথা কে বলল?"

"আজ্ঞে, আমি ছাতাপাথরে এয়েছিলাম। সাহেববাবুর সাথে দেখা। তিনি বললেন এখানে জুতো কারখানা খুলেছে।"

গণপতি বুঝতে পারল। পেস্তাজির সঙ্গে দেখা হয়েছিল পানুর। পেস্তাজি ওকে পাঠিয়েছেন।

গণপতি বলল, "তুমি আগে কোথায় কাজ করেছ?"

পানু তিন-চার জায়গার নাম বলল। এমনকী, কলকাতার নামও। কলকাতায় চিনেপাড়াতেও কাজ করেছে পানু। তারপর নিজেই বলল, "সার, আমাকে হাতে-কলমে কাজ শিখিয়েছিলেন শুন-সাহেব, চিনে-সাহেব। তিনি আমায় ডাকতেন, পং বলে।"

গণপতির হাসি পেয়ে গেল। সামলাতে পারল না। হেসে উঠল জোরে। লালুও হাসতে লাগল।

এমন সময় গজপতি ঘরে এল আবার।

কোনওরকমে নিজেকে সামলে গণপতি ভাইকে বলল, "গজা, লাপাজু। এই দেখ, পেস্তাসাহেব একে পাঠিয়েছেন তোর কারখানার জন্যে। এ হল কাটিং মাস্টার, পং, মানে পানু।"

গজপতি পানুকে দেখছিল।

বারো

গজপতি আর লালু তাদের নতুন পোশাক পরে নিচ্ছিল।

পোশাকগুলো দেখার মতনই হয়েছে। মশারির আলখাল্লা। গলা থেকে পায়ের কনুই পর্যন্ত ঝুলে আছে জামাগুলো। মাথায় শেখদের মতন পাগড়ি। মুখে মাস্ক। পোশাক পরার পর ওদের আর মানুষ বলে চেনা যায় না, মনে হয় অদ্ভুত কোনও জীব, ভূতটুতও হতে পারে।

লালু লম্বা রোগা বলে তাকে আরও কিম্ভূত দেখাচ্ছিল।

গণপতি সামনেই ছিল। ভাই আর বন্ধুর সাজসজ্জা দেখার পর আর থাকতে পারল না, হোহো করে হেসে উঠল।

লালু বলল, "হা-হাসছিস!"

হাসতে-হাসতে বেদম হয়ে শেষপর্যন্ত গণপতি বলল, "লাপাজু!...মার্ভেলাস! তোদের দেখে মনে হচ্ছে যেন মঙ্গল গ্রহ ট্রহ থেকে স্ট্রেট নেমে এলি!"

গজপতি দস্তানা পরে নিচ্ছিল হাতে। বলল, "গণাদা, আমি একরকম ডুবুরি দেখেছি সারুফুতসুতে, তারা এক ধরনের ফ্লাস্ক-সুট পরে সমুদ্রে নামে।"

"ফ্লাস্ক-সুট?"

"ওইরকম। মানে, ভেতর আর বাইরের মধ্যে একটা কভার থাকে। ভেতরে থাকে ডুবুরি।"

"জাপানি ব্যাপারই আলাদা রে গজা!...নে, এবার রেডি হয়ে নে। তোদের যাত্রা করিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব। দোকানে আজ অনেক কাজ।"

লালু বলল, "দুপুরে আসবি না?"

"না। বিকেলে দেখা হবে।"

গজপতি আর লালু নিজেদের অফিসঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। গণপতিও।

কারখানার শেডের কাছে গিয়ে গণপতি বলল, "নে চলে যা, বাই বাই।" বলে গণপতি চলে গেল।

গজপতি আর লালু শেডের মধ্যে ঢুকল। ঢুকে যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। বাইরে আজ বেশ মেঘলা। দিন দুই ধরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হয়েছে। কাল রাত্রেও হয়েছিল। সকালে বৃষ্টি না থাক, বাদলা আবহাওয়া আর ঘন মেঘলা হয়ে আছে।

শেডের তিন দিক ঢাকা। সামনের দিকেও দশ আনা আড়াল পড়েছে। আলো এমনিতেই কম ঢোকে, ভেতরটা আবছা অন্ধকার হয়ে থাকে। বাদলার দিন বলে আজকাল রোদ, আলো তেমন ঢুকতেই পারে না।

কিছুক্ষণ চোখে প্রায় কিছুই ঠাওরই হল না গজপতিদের। মুখে মাস্ক। চোখের গগল্‌স প্রায় ঠুলির মতন।

গজপতির মনে হল, শেডের ভেতরটা যেন কালো হয়ে আছে।

"লালুদা, চোখে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

"আমিও। বড় অন্ধকার লাগছে রে!"

"টর্চ আনা উচিত ছিল।"

"এখানে লা-লাইট না দিলে কাজ হবে কেমন করে!"

আলোর ব্যবস্থা এখনও হয়ে ওঠেনি। এদিকে ইলেকট্রিক আনার ব্যবস্থা নেই, উপায়ও নেই। গজপতিরা ঠিক করেছিল, আপাতত কাজকর্ম চালু হয়ে গেলে তারা গোটা দুই ছোট জেনারেটারের ব্যবস্থা করবে। একটা থাকবে শেডে, অন্যটা বিল্ডিংয়ে। তা সে-ব্যবস্থা এখনও হয়ে ওঠেনি। জেনারেটার দেখাশোনা হচ্ছে। ইলেকট্রিক পেতে-পেতে বছরখানেকের ধাক্কা। বেশিও লাগতে পারে।

গজপতি বলল, "দেখো তো, বাইরে আমি পানুকে দেখেছি একটু আগে। ওকে বলো, আমাদের অফিসঘর থেকে টর্চ এনে দিতে।"

লালু বাইরে গেল পানুকে খুঁজতে।

ঘোলাটে অন্ধকারে চোখ খানিকটা সয়ে গেল গজপতির। চোখ সয়ে গেলে সে দেখল, এক নম্বর ভাটি, যেখানে এতদিন সবজির খোসা জমিয়ে বস্তাখানেক নুন, চুন আর বালতি দশেক জল ঢালা হয়েছে—সেই ভাটির চারপাশে, মুখে কালো হয়ে কী যেন জমে আছে। মাস্কের নাক আর মুখের সামনে মশারির জালি, পাতলা গজ। তবু কোন ফাঁক দিয়ে গন্ধও আসছিল।

গজপতি দু-চার পা এগিয়ে গিয়ে কী মনে করে দাঁড়িয়ে পড়ল। এগোতে সাহস হল না, পায়ের তলায় ব্যাঙ না ইঁদুর বোঝা যাচ্ছে না।

লালুর আসতে সামান্য দেরি হল। টর্চ নিয়ে ফিরে এসেছে।

লালু বলল, "গজু, এই টর্চে হবে না। বড়-বড় টর্চ চাই। চার সেল, ছ' সেলের।"

গজপতি বলল, "হবে। শিকারে বেরোনোর সময় যেমন টর্চ লাগে—সেই রকম টর্চ আনব!'"

ওদের মুখ-মাথা ঢাকা। কথা বলতেও যেমন অসুবিধে, কান ঢাকা থাকায় প্রায় শোনাও যাচ্ছে না কথা। একটা আওয়াজ শুধু কানে আসছিল।

টর্চের আলো ফেলতেই যা দেখা গেল তাতে পা বাড়াতে সাহস হয় না। কত যে ব্যাঙ ঢুকে পড়েছে শেডের ভেতর! বড়-বড় ব্যাঙ, ছোট-ছোট ব্যাঙ, বোধহয় ব্যাঙাচিও। ইঁদুর চোখে পড়ছে। আরশোলা উড়ছে ফরফর করে।

খানিকটা ইতস্তত করে গজপতি বলল, "লালুদা, এ-ত্ত ব্যাঙ?"

লালু বলল, "বর্ষা পড়েছে তো, মাঠের ব্যাঙ মাঠ ছেড়ে এখানে ঢুকে পড়েছে।"

"কী করা যায়?"

"কিছু করার নেই। এখন চল..."

গজপতিরা সাবধানে কয়েক পা এগিয়ে গেল। এক নম্বর ভাটির কাছে গিয়ে লালু আর গজপতি আঁতকে উঠল। টর্চের আলোয় যা দেখা গেল তা বড় মারাত্মক। ভাটির গা চোখে দেখা যাচ্ছে না, মুখের গর্তটাও কালো হয়ে আছে। মোটা কালো একটা কম্বল যেন জড়ানো রয়েছে ভাটির গায়ে। মাছি আর মাছি। কত হাজার না লক্ষ মাছি যে জুটেছে ওখানে, কে জানে! দেখলে গা সিরসির করে।

লালু ভয় পেয়ে টর্চের আলো ফেলল এপাশে-ওপাশে, অন্য ভাটিগুলোর গায়ে।

ততক্ষণে যেন খানিকটা সে বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। শেডের মধ্যে এত কালো, এমন অন্ধকার দেখানোর একটা কারণ বোধহয় ওই মাছি আর মশা। মাছি তো আছেই, মশা বোধহয় তার অনেকগুণ বেশি। কালো-কালো পরদার মতন তারা চারপাশে ছড়িয়ে আছে।

লালুর গা ঘিনঘিন করছিল, ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বলল, "গজু—হ-রিব্‌ল! পালা।"

গজপতিও পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু এত দূর এগিয়ে এসে পালিয়ে যাওয়া ভাল দেখায় না। ইশারায় সে এগিয়ে যেতে বলল।

মাত্র কয়েক পা। তারপরই এক নম্বর ভাটি। গজপতিদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাছি-মশায় ভরতি হয়ে গেছে। নিতান্তই ওই পোশাকগুলো রয়েছে, নয়তো এতক্ষণে মাছি-মশার কামড়ে ওরা বোধহয় মরে যেত।

লালু কিছু বলার আগেই গজপতি মাটিতে বসে পড়ল। ভাটির নিচের দিকের কলের মুখ খুলবে। গুড়ের নাগরির চারপাশে মাছি যেমন ছেঁকে ধরে সেইভাবে গজপতিকে ছেঁকে ধরেছে মাছিতে। মাথার ওপর মশা উড়ছে। কিছু পোকাও জুটেছে যেন।

গজপতি মাটিতে বসে নলের প্যাঁচ খোলার চেষ্টা করল। পারল না। ভীষণ শক্ত। লালুকে হাত লাগাতে বলল।

লালুকেও হাত লাগাতে হল।

বেশিক্ষণ চেষ্টা করা গেল না। এভাবে কাজ করা যায়!

শেষপর্যন্ত অবশ্য প্যাঁচ খানিকটা আলগা হল। কিন্তু নল দিয়ে কিছুই বেরিয়ে এল না।

গজপতি উঠে পড়ল। বলল, "লালুদা, হবে না। ভেতরে মাল শক্ত হয়ে গেছে। জল ঢালতে হবে, জল ঢেলে নরম করতে হবে। দশ-পনেরো বালতি জল ঢালতে বলে দাও। কাল দেখা যাবে।"

লালু যেন বেঁচে গেল।

শেডের বাইরে এল দু'জনে। বাইরে আসতেই আলখাল্লা আর মাথার পাগড়ির ওপর ছেঁকে ধরা মাছি-মশাগুলো উড়তে লাগল বাতাসে।

বিকেলের গণপতি এল।

গণপতি আসতেই লালু সকালের এক ভয়াবহ বিবরণ দিয়ে বলল, "গণা, এভাবে কাজ হবে না। ইম্‌পসিব্‌ল...। লাখখানেক মাছি গায়ে বসে থাকলে কাজ করা যায়!"

গণপতি বলল, "তাই তো!"

গজপতি বলল, "গণাদা, গোড়াতেই একটা ভুল হয়ে গেছে। শেডের তিনপাশে কাচ দিয়ে নিলে মাছি-মশার উৎপাত সহ্য করতে হত না। তখন এতটা বুঝিনি।"

গণপতি কিছু যেন ভাবল। তারপর বলল , "এক কাজ কর। মশা-জালি লাগিয়ে নে।"

"মসকুইটো-নেট! এখানে পাওয়া যাবে?"

"না। এখানে পাওয়া যাবে না। তবে সরু পাতলা জালি পাওয়া যাবে। তাতে তোর মাছি গলতে পারবে না। আর পিনপিনে মশার বাচ্চা ছাড়া বড় মশাও বোধ হয় ঢুকতে পারবে না।"

গজপতির মনে হল, এখন আর কাচ দিয়ে শেডের তিন দিক আটকে ফেলা যাবে না। মানে, তাতে হুজ্জোত বাড়বে, কাজ পেছিয়ে যাবে। তার চেয়ে জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা অনেক সুবিধের। সময়ও বেশি লাগবে না। মাছিই আসল। মাছির উৎপাত না থাকলে মশা আর কত জ্বালাতে পারে তাদের।

লালু হঠাৎ বলল, "গণা, জাল লাগাতে বলছিস লাগা। লাগাতে-লাগাতে সময় লাগবে। আমি একটা কথা বলব?"

"বল।"

"দেওয়ালি-পোকা তাড়াবার মতন মাছি তাড়াবার একটা কা-কা-কায়দা আমি ভাবছি।"

"কী কায়দা?"

"এই ধর—হাত দুই-আড়াই করে ল-লম্বা দড়ির টুকরো। মোটা-মোটা দড়ি। গোরু বাঁধা দড়ির মতন। সেগুলো গুড়ের রসে ভিজিয়ে চপচপে করে শেডের মধ্যে টাঙিয়ে দিলাম, বিশ-পঁচিশটা। মাছিগুলো তখন সব ওই দড়িতে গিয়ে বসবে।"

লালুর কথা শুনে গণপতি জোরে হেসে উঠেছিল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, "কী বললি, দড়ি! গুড়ের রসে চোবানো দড়ি!...মন্দ বলিসনি তো। একবার এক্সপেরিমেন্ট করে দেখলে হয়।"

গজপতি বলল, "না, না, ওতে আর ক'টা মাছি তাড়ানো যাবে। তার চেয়ে জালই ভাল।"

"জাল লাগাতে-লাগাতে যে সময় লাগবে সে ক'দিন লালুর ফ্লাই-ক্যাচিং সিস্টেমটাও লাগিয়ে দে। ভেরি চিপ, ভেরি ইজি!"

লালু খুশি হয়ে বলল, "আমি বলছি কাজ হবে।...নে চল, আজই ফেরার পথে দড়ি আর গুড় কিনে নিয়ে যাই। পানুকে দিয়ে কালই দড়ি ঝুলিয়ে দেব।"

গণপতি বলল, "হ্যাঁ চল। যাওয়ার সময় বাজার ঘুরে একবার জালটাও দেখে যাওয়া যাবে।"

কয়েকটা দিন গজপতিরা কম চেষ্টা করল না। অনেক হাঙ্গামা হুজ্জোতির পর ভাটির নল থেকে বিচিত্র এক পদার্থ বেরোতে শুরু করল। পদার্থটা অবশ্য কলের প্যাঁচের মুখের কাছে দেখার উপায় ছিল না। নল দিয়ে সেটা সোজা গিয়ে পড়ছিল অন্য জায়গায়, এক বড়সড় চৌবাচ্চায়। চৌবাচ্চাটা তো আর শেডের মধ্যে নয়, বিল্ডিংয়ের মধ্যে।

লালু আর গজপতি দু'জনেরই মনে হল, কিছু ভুলচুক তাদের হয়ে গেছে। ভাটির মধ্যে যদি একটা ঘানির মতন কিছু লাগানো যেত তবে—অনেক আগেই কাজ হতে

পারত। বেশি করে জল থেকে ঘানির মতন পেষাই করতে পারলে পদার্থটা কবেই হড়হড় করে বেরিয়ে আসত। এত আঁট হয়ে যেত না, আর তাদেরও অত বিভ্রাট করতে হত না।

তা যা হয়েছে আপাতত তাতেই খুশি তারা।

সাতদিনের মধ্যে বাকি তিনটে ভাটির মুখের নল থেকেও খানিকটা পদার্থ এসে জমল চৌবাচ্চায়।

গজপতি বলল, "লালুদা, এবার আর ভাটি নয়, আমরা এখন ওয়েট করব। দেখি, মালগুলো চৌবাচ্চার মধ্যে জমে কী অবস্থা হয়। তারপর আবার ভাটির মুখ খোলা যাবে। ততদিনে ওরা জাল লাগাবার কাজ শেষ করুক।"

লালু বলল, "তা করুক। কিন্তু এবার তো তোকে উনুন জ্বালিয়ে দিতে হয়।"

চৌবাচ্চার দু'পাশে দুটো বড়-বড় উনুন পাতা হয়েছিল। নেমন্তন্ন বাড়িতে যেমন উনুন পাতা হয় রান্নাবান্নার জন্যে। উনুনে আগুন দিলে তার তাত লাগবে চৌবাচ্চায়। ভেতরের মালপত্র তাতে নাকি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে আঁট হয়ে উঠবে। সেই জিনিসটাই হবে জুতো তৈরির ভেজিটেব্‌ল লেদার।

লালুর কথায় সায় দিয়ে গজপতি বলল, "ঠিক বলেছ। এখন বর্ষাকাল। বড় ড্যাম্প। আগুন না জ্বাললে মাল জমতে দেরি হবে। কালই উনুন জ্বালিয়ে দেব।"

তেরো

একটানা বর্ষা আর থামছিল না। শ্রাবণ-ভাদ্র পেরিয়ে গেল। আশ্বিনের গোড়ায় মনে হল, আকাশ খানিকটা পরিষ্কার হয়েছে। রোদও ঘোলাটে নয়, বেশ ঝরঝরে। চারপাশের ভিজে স্যাঁতসেঁতে চেহারাটা পালটে গিয়েছে অনেকটা।

গজপতিদের জুতো কারখানার চারদিকে এখন সবুজ হয়ে উঠেছে। খটখটে শুকনো মাঠগুলো আর নেড়া দেখায় না। ঘাস গজিয়েছে মাঠে, বুনো ঝোপঝাড় লতায়-পাতায় ভরে গিয়েছে। নিচু জমিতে জল জমে আছে কোথাও-কোথাও। লোকো-ট্যাঙ্কের মস্ত পুকুর জলে থইথই করছে। তারই একপাশে গজপতিদের বাতাস-পাখা, মানে উইন্ড মিল। একেবারে দেশি কায়দায় তৈরি। তালগাছ-সমান মাথা। গোটাচারেক কাঠের পাখা মাথার ওপর লাগানো। বাতাস-পাখার তলার দিকে—মাটির কাছে, গোরুর গাড়ির চাকার মতন এক যন্ত্র। বাতাসে পাখা ঘুরছে, নিচের চাকা ঘুরছে, পুকুরের জল টেনে নিচ্ছে, নিয়ে নালা দিয়ে জুতো কারখানার ভেতরে বিরাট এক চৌবাচ্চায় জমা করে দিচ্ছে। অবশ্য পাখাটা না লাগালেও চলত। নালা দিয়ে জল আসত নিজের থেকেই। পুকুর এখন কানায়-কানায় ভরা, আর আশপাশের মাঠের জমি নিচু।

গজপতিদের কারখানার বারো আনাই এখন তৈরি হয়ে গিয়েছে। কম্পাউন্ডওয়াল গাঁথা হয়ে গেছে পুরোপুরি। ফটক লাগানো হয়েছে। কারখানার শেডের তিনদিক জাল দিয়ে ঘেরাও শেষ হয়েছে। পাকা বাড়িটাও প্রায় শেষ হয়ে এল। কারখানার

মধ্যে মাটি খুঁড়ে যে ডোবা কাটানো হয়েছিল সেখানে বর্ষার জল জমেছে, তবে ঝিঝিয়া, মানে গজপতির ক্যারাক্যারাম্বুলা তেমন একটা চোখে পড়ছে না। কোথাও হয়তো পাতলা একটু শ্যাওলার মতন ভাসছে জলের ওপর। অবশ্য জল যতক্ষণ ভালমতন না থিতিয়ে যাচ্ছে, খানিকটা পচে যাচ্ছে, ঝিঁঝিয়া জন্মাবে কেমন করে।

কারখানার ভেতরটাও মন্দ দেখায় না। অল্প-অল্প সাজানো-গোছানোই দেখায়। পাকা বাড়িতে দু-চারটে মেশিন বসানো হয়েছে। এই মেশিনগুলোর এক-আধটা গজপতির মাথা থেকে বেরিয়েছে, তৈরি করানো হয়েছে এখানকার কামারশালা থেকে। বাকি দু-একটা কিনে আনানো হয়েছে কানপুর থেকে।

সবই হয়েছে একরকম, কিন্তু মুশকিল বেধেছে, অন্য জায়গায়। যে-চৌবাচ্চায় এতদিন ধরে ভেজিটেব্‌ল লেদার, মানে শিট জমানো হচ্ছিল সেই শিট আর চৌবাচ্চার মধ্যে থেকে বার করা যাচ্ছে না। কেন যে এরকম হল, কে জানে!

কারখানার অফিসঘরে বসে কথা হচ্ছিল। গণপতি বলল, "গজা, আমি তখনই বলেছিলাম, তোরা বড় দেরি করছিল। পনেরো দিন ম্যাক্সিমাম। তার জায়গায় তোরা ঠিক এক মাস জমিয়ে রাখলি। এখন একেবারে মোক্ষম হয়ে জমে গেছে, সিমেন্ট জমানো মতন!"

লালু বলল, "আমরা বুঝব কেমন করে। ফা-ফার্স্টে তো দশ-বারো দিন দেখলাম চৌবাচ্চার মধ্যে শু-শুধু কাদার মতন কী পড়ে আছে। কাঠি দিয়ে নাড়লে আমসত্ত্ব উঠে আসছিল।"

"আমসত্ত্ব?"

"ওইরকম দেখতে, কালো-কালো। তবে শুকোয়নি। জুস-জুস। কাঠিতে লেগে যাচ্ছিল।"

মাথা হেলিয়ে গজপতি বলল, "লালুদা ঠিকই বলেছে। জিনিসটা কিছুতেই ড্রাই হচ্ছিল না। দু'পাশে দুই চুল্লি ছিল, অত হিট পাচ্ছিল, তবু শুকোচ্ছিল না। এদিকে এই বর্ষা। আরও একটা চুল্লি বাড়িয়ে দিলাম। নো রেজাল্ট!"

গণপতি বলল, "তুই আরও কত কী ঢাললি ভেতরে শুকোবার জন্যে।"

গজপতি বলল, "ড্রাই ঢাললাম, আর 'শিরিষ-গোলা।"

লালু বলল, "গণা, এ হল আসলি শিরীষ। আমরা নিজেরা আঠা তৈরি করে নিয়েছিলাম। মাত্তর দু' বালতি।"

গণপতি বলল, "আরও ঢাললে পারতিস। লালু, তুই—তোর মাথায় যে কী পোরা আছে?"

লালু গম্ভীর হয়ে বলল, "মা-মাথা নিয়ে কথা বলিস না গণা। এই মাথা নিয়ে এত করলাম। লাস্টে একটু আটকে যাচ্ছে, কী করব!"

গজপতি শান্ত ধাতের মানুষ। গণাদার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে দেখে কথা কাটাকাটি থামিয়ে দিয়ে বলল, "গণাদা, নতুন কাজে ভুল হয়। আমার তো হাতে-কলমে কাজ করার অভ্যেস নেই। বিদ্যে শিখেছি। তা ছাড়া আমি যা করছি সবই আমাদের

মেথডে। ইন্ডিয়ান স্টাইলে। স্বদেশি কায়দায়। ভুলচুক হবেই। শুধরে নেব। একটা এক্সপিরিয়েন্স তো দরকার। ঠিক কি না বল?”

গণপতি বলল, “এখন কী করবি বল?”

“তুই বল?”

তিন মাথা মুখোমুখি বসে ভাবল খানিকক্ষণ।

শেষপর্যন্ত গণপতি বলল, “আমি একটাই উপায় দেখছি।”

“কী!”

“চৌবাচ্চাটা ভেঙে ফেল।”

গজপতি আর লালু অবাক হয়ে একই সঙ্গে বলল, “ভেঙে ফেলব?”

“না ভেঙে কিছু করা যাবে না। এমনিতে তোদের ভেজিটেব্ল লেদার উঠবে না।”

লালু বলল, “অত বড় চৌবাচ্চা ভেঙে ফেলব। কী বলছিস গণা!”

গণপতি অক্লেশে বলল, “আরে রাখ তো! কতকগুলো ইট ভাঙবি, তার আবার কথা। একটা চৌবাচ্চা তৈরি করতে ক' পয়সা লাগে? আমি বলছি গজা, কালই চৌবাচ্চা ভেঙে ফেল।”

গজপতি কেমন বোকার মতন বলল, “তারপর?”

“প্রথমে না হয় একপাশের দেওয়াল ভাঙ। ভেঙে ওই তোদের জমে যাওয়া শিটটার তলা থেকে চাড় দিয়ে জিনিসটা ছাড়িয়ে নে। একেবারে সহজ ব্যাপার।...যদি একদিককার চৌবাচ্চা ভাঙলে হয়ে যায়, ভাল কথা। নয়তো দু'দিককার ইটগুলো ভেঙে ফেলবি।”

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর গজপতি বলল, “তুই যা বলছিস তা ছাড়া উপায় নেই, গণাদা। ঠিক আছে, কাল তা হলে চৌবাচ্চাই ভাঙব। লালুদা, তুমি মহাদেবকে বলো, কাল সকালেই লোক লাগাবে; চৌবাচ্চার ইট খসিয়ে নিতে হবে। হুড়মুড় করে ভাঙলে চলবে না। ভাল মিস্ত্রি দরকার।”

লালু বলল, “হয়ে যাবে। মহাদেবকে আজও আমি দেখেছি। কাছেই ঘোরাঘুরি করছিল। দেখছি তাকে।”

“দ্যাখো।”

লালু মহাদেবকে কন্ট্রাক্টারকে খুঁজতে চলে গেল।

পরের দিন সকাল থেকেই শুরু হল চৌবাচ্চা ভাঙার কাজ। গণপতি নিজেই দাঁড়িয়ে থাকল সামনে। পাশে গজপতি আর লালু।

বোঁদে আড্ডির মিস্ত্রিমজুরে চৌবাচ্চাটা তৈরি করেছিল। চৌবাচ্চার ইট খসাতে গিয়ে দেখা গেল, একটু জোরে হাতুড়ি মারলেই ইট খসে যাচ্ছে, না হয় ভেঙে যাচ্ছে। যেটুকু জোর শুধু সিমেন্টের জন্যে। তাও সিমেন্টের মাপ কম। একেবারে দায়সারা কাজ। চুরি আর ফাঁকিবাজির কাজ।

গণপতির মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল। বোঁদেকে সে হটিয়ে দিয়েছে কারখানার কাজ থেকে। ভেগে পড়েছে বোঁদে। হাতের কাছে তাকে পেলে গণপতি হয়তো বোঁদের

মাথাই ফাটিয়ে দিত।

অত বড় চৌবাচ্চার একদিককার ইট খসাতে ঘণ্টাখানেক লাগল মাত্র। চৌবাচ্চার তলায় যে-পদার্থ জমে আছে, এতক্ষণে স্পষ্ট করে তা দেখা গেল।

লালু বলেছিল, আমসত্ত্বের মতন দেখতে।

গণপতির মনে হল, পদার্থটা মোটেই আমসত্ত্বের মতন দেখতে নয়, বরং কুচকুচে কালো, অনেকটা জামসত্ত্বের মতন দেখতে। অবশ্য গণপতি জানে না, জামসত্ত্ব হয় কিনা। তবে একবার সে মধুবনীতে কাঁঠালসত্ত্ব খেয়েছিল। কাঁঠালসত্ত্ব যদি হতে পারে জামসত্ত্ব হবে না কেন!

পদার্থটা দেখতে-দেখতে গণপতি এবার বলল, "নে, এবার তুলে ফেলার ব্যবস্থা কর।" বলে সামনে তাকাতেই পানু—মানে পং-কে দেখতে পেল। গণপতি বলল, "এই যে পংসাহেব। নাও, হাত লাগাও।"

পানু মাটিতে বসে পড়ে কী যেন দেখল। হাত দিয়ে টেপাটিপি করল। তারপর বলল, "সার, এ একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছে।"

গণপতি লালুর দিকে তাকাল। "লালু, তুই দেখ তো?"

বলার দরকার ছিল না লালুকে। সে নিজেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এতরকম ঝঞ্ঝাট করে মাছি মশা ইঁদুরের কামড় খেয়ে যাও-বা শেষপর্যন্ত একটা কিছু তৈরি করা গেল তাও যদি কাজে না লাগানো যায়, তবে তো সবই বৃথা। লালুর ভাষায়, ওয়াটার ফল হল, মানে জলে গেল।

মাটিতে বসে পড়ল লালু। বসে পড়ে দেখল দু-চার মুহূর্ত। ভাল করে বুঝতে পারল না। শক্ত তো নিশ্চয় হয়েছে। কিন্তু কতটা শক্ত? পানুকে একটা শক্ত কিছু আনতে বলল, লোহার শিক বা চাবি গোছের যা হোক একটা জিনিস, হাতের কাছে যা জোটে।

পানু একটা মোটা ভাঙা লোহার টুকরো এনে দিল কুড়িয়ে।

লালু সেই লোহার টুকরো দিয়ে টিপে, খুঁচিয়ে, দাগ কেটে ভাল করে দেখল। তারপর বলল, "ভেরি হার্ড হয়ে গেছে রে, গণা! একেবারে যেন আয়রন শিট। এ তোর এমনিতে তোলা যাবে না। মনে হচ্ছে তলার দিকটাও জব্বর হয়ে জমে গেছে। চাড় দিয়ে তুলতে হবে।"

গজপতি বলল, "টেনে বার করা যাবে না?"

"না। তলা একেবারে এঁটে বসেছে। টানতেই পারবি না।"

গণপতি বলল, "ঠিক আছে। যাহা বাহান্ন, তাহা তিপ্পান্ন! আর একটা দিক ভেঙে ফেল চৌবাচ্চার। তারপর দু' পাশ থেকে শাবল-গাঁইতি মেরে চাড় দিয়ে তুলে নে।"

শাবল-গাঁইতির কথায় গজপতি "হায়, হায়", করে উঠল। এ কি পাথর না লোহার চাদর যে, শাবল-গাঁইতি মেরে তোলা হবে। ওসব করতে গেলে জিনিসটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

গণপতি বলল, "দাঁড়া, আগে অবস্থাটা দেখা যাক। তারপর ব্যবস্থা হবে।"

চৌবাচ্চার আরও একটা পাশের ইট খসিয়ে নেওয়া হল। অর্থাৎ ভেঙে ফেলাই

হল। তারপর বহু হুজ্জত করে, কোদালের আর ছেনির আগা দিয়ে চাড় মেরে জিনিসটা কোনওরকমে তুলে নিয়ে সরিয়ে ফেলা গেল।

তা সেই প্রায়-চৌকো পদার্থটা নয়-নয় করেও ফুটচারেক চওড়া, লম্বা পাঁচ, সাড়ে পাঁচ ফুট হবে। দেখতে কালো। একেবারেই চকচকে ভাব নেই। মসৃণও নয়। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট গর্ত।

লালু কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে হতাশ গলায় বলল, "গজু, সব বরবাদ হয়ে গেল রে! এই জিনিস দিয়ে জুতো হবে কেমন করে। বরং খড়ম হতে পারে।"

গজপতিও হতাশ হয়েছিল। তবে লালুর মতন নয়। পকেট থেকে স্মেলিং সল্টের শিশি বার করে জোরে-জোরে শুঁকল বারকয়েক। শিশিটা লালুর দিকে বাড়িয়ে দিল। এখানে কাজ করতে-করতে মাথা এমন ধরে যায় যে, স্মেলিং সল্ট না টানলে মাথা সাফ হয় না। এটা গজপতির ধারণা।

স্মেলিং সল্ট টেনে নিয়ে গজপতি মাথা সাফ করে নিল। সময় লাগল সামান্য। তারপর বলল, "নো প্রবলেম। জুতোর সোলের পক্ষে শক্তই ভাল। টেকসই হবে। তা ছাড়া শক্ত জিনিস নরম করা যায়।"

"কেমন করে?" লালু বলল।

"আছে। সে আমি করে ফেলব।...কিন্তু গণাদা, চৌবাচ্চা তো ভেঙে ফেললে। আবার একটা তৈরি করতে হবে। আমি ভাবছি এবার একটা নালার মতন তৈরি করব। সরু। লম্বা। তাতে হালকা নরম ভেজিটেব্‌ল লেদার তৈরি হবে। জুতোর তলায় শক্ত সোল, ওপরে নরম ভেজ লেদার।"

গণপতি বলল, "করিস। তবে তার আগে, তোর এই লোহা-মার্কা জিনিস দিয়ে একটা কাজ করে ফেল।"

"কী!"

"বুট। লোহা কারখানার বুট জুতো। দারুণ হবে। হেভি। আমি দেখেছি, বি জি লোহা কারখানার ওয়ার্কাররা হেভি বুট পরে ফটফট করতে-করতে কারখানার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। গজা, আইডিয়াটা খুব ভাল। বুটের তলায় তোর ওই আয়রন সোল, আর ওপরে মোটা ক্যাম্বিস। হেভি হবে রে, গজা। ফ্যাক্টরি বুট। লাপাজু!"

লালু বলল, "প্র-প্রথমেই ফ্যাক্টরির বুট জুতো। বাঃ, তা হলে কার্তিকের নামে প্র-প্রথম জুতোটা পুজো চড়ানো যাবে কেমন করে?"

"হ্যাং ইওর কার্তিক। কার্তিকও বুট জুতো পরতে পারে। না হলে আমরা বিশ্বকর্মার নামে পুজো চড়াব।"

গজপতি মাথা নাড়ল। বলল, "গণাদা, ক্যাম্বিস কি তোমার ওই কাপড়ের জুতো তো হাতের পাঁচ। ওতে আর বাহাদুরির কী আছে। কাপড় আনো, কাঁচি দিয়ে কাটো, আর সেলাই মারো।...আমি প্রথমে ওসব করব না। পিওর ভেজিটেব্‌ল শু করব। একটু দেরি হবে, এই যা!"

পানু বলল, "সার, আমি জুতোর মধ্যে পিচবোর্ড লাগাতে পারি। এমন করে লাগিয়ে রং করে দেব, খদ্দের বুঝতেই পারবে না—চামড়া না পিচবোর্ড। কলকাতায়

আমি এ-কাজ শিখেছি।

গণপতি যেন তারিফ করে বলল, "বাঃ! ভেরি গুড। চিটিং মাস্টার। তুমি আর কী-কী শিখেছ পং?"

পানু এবার লজ্জা পেয়ে গেল।

চোদ্দ

চৌবাচ্চার মধ্যে থেকে যে বিচিত্র পদার্থটি অনেক কষ্টে বার করে আনা হল সেটি যেমন শক্ত তেমনই পুরু। চার বাই পাঁচ ফুটের সেই শক্ত কাঠের মতন বস্তুটি নিয়ে কম বিভ্রাট দেখা দিল না।

গজপতি লালু—এমন কী বুদ্ধিধর গণপতিও বুঝতে পারছিল না—কেমন করে এটিকে কাটা যাবে। ছোট ছোট টুকরো করে না কাটলে তো কাজ হবে না।

গজপতির হাতে এখন তিনটে মেশিন। আরও দুটো এখন পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি। অবশ্য সে-দুটো অন্য কাজের জন্যে।

হাতে-থাকা তিনটে মেশিনের মধ্যে একটা হল কাটিং মেশিন। অন্য দুটোর মধ্যে রয়েছে সেলাই মেশিন আর প্রেসার মেশিন।

কাটিং মেশিনটা অবিকল সেলাই মেশিনের মতন দেখতে। পা দিয়ে চালাতে হয়। সেলাই কলের যেখানে ছুঁচ-সুতোর কাজকর্ম হয়, এই মেশিনের সেখানে রয়েছে সরু করাত। খুবই শক্ত। পাতলা। ফিনফিনে। পাতলা কাঠের নকশা করার সময় এই ধরনের মেশিন কাজে দেয়। চামড়া পাতলা হলেও দিব্যি কাটা যেত, শুধু করাতটা খুলে ধারালো ছুরি বসিয়ে নিলেই কাজ হত। সেই ছুরিও আছে। কিন্তু ওই মেশিন দিয়ে তো আর কাঠ কি লোহার মতন শক্ত জিনিস কাটা যায় না। তা ছাড়া অত বৃহৎ একটা পদার্থ।

অনেক ভেবেচিন্তে গণপতি পরামর্শ দিল, "গজা, জাস্ট লাইক কাঠ চেরার মতন বড় করাত দিয়ে চিরে ফেল আগে। চিরে ফেলে ছোট ছোট টুকরো করে নে।"

পরামর্শটা ভালই। কিন্তু কাঠগোলা ছাড়া কাজটা হবে কেমন করে। অত বড় করাত তো কাঠগোলাতেই থাকে; কাঠ চেরাই হয়।

লালু বলল, "ষষ্ঠীকে খবর দিতে হয়!"

ষষ্ঠী হল কাঠগোলার মালিক পান্নাবাবুর ছেলে। লালুদের বন্ধু।

গণপতি বলল, "দিতে পারিস। দুটো লোক আর করাত নিয়ে চলে আসবে। একদিনের কাজ।"

গজপতি বলল, "যত তাড়াতাড়ি হয়।"

কাঠগোলা থেকে কাঠ চেরাই করাত আনা কি অত সহজ! লালু ব্যাপারটা বোঝাল গণপতিকে।

গণপতি বলল, "তা হলে একটা গোরুর গাড়ি ডেকে জিনিসটা কাঠগোলায় পাঠিয়ে দে। লালু তুই সঙ্গে যা। দাঁড়িয়ে থেকে চিরিয়ে আনবি।"

লালুরও মনে ধরল কথাটা। যদিও গজপতি সামান্য খুঁতখুঁত করছিল।

গণপতির পরামর্শ মতনই কাজ হল। কাঠগোলা থেকে চেরাই হয়ে এল কাঠের পুরু তক্তার মতন জিনিসটা।

এসব ঘটেছে গত হপ্তায়।

এখন চলেছে অন্য কাণ্ড।

গজপতি কতকগুলো শক্ত বোর্ড মতন কাগজে জুতোর নকশা কেটে পানুকে ধরিয়ে দিয়েছে। নকশা মানে পায়ের পাতার মাপ-জোক। পানুকে এখন সেগুলো কেটে নিতে হবে।

কাটিং মেশিনের সামনে বসে পানু হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। জিনিসটা মোটা। কাটিং করার মুখের ফাঁকে ঢোকানোই যাচ্ছে না। তবু জোর জবরদস্তি করে বারকয়েক দেখল পানু। অসম্ভব।

লালু আর গজপতি হাত লাগাল। কোনওমতেই সম্ভব নয়। সেলাই মেশিনের ছুঁচের মুখ যেখানে, সেখানে যে ক্লিপ থাকে—তার মধ্যে কি তেরপলের কাপড় ঢোকানো যায়। অবশ্য এ-মেশিনের ক্লিপ বা ধরার জায়গাটায় যথেষ্ট ফাঁক। তবু ঢোকানো গেল না।

গজপতি হতাশ হয়ে বার কয়েক মুখ মুছল রুমালে। লালু বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। একের পর এক এত বাধা পড়লে কাজ করা যায়। নস্যি টানল লালু। সিগারেট ফুঁকল। তারপর বলল, "গজা, সামথিং—মানে পাওয়ারফুল শ-শনিটনি আমাদের পেছনে লেগেছে। যা করতে চাইছি তাতেই বাধা। এখন কী করা যাবে!"

গজপতির মাথায় কিছু এল না।

পানু কাছেই ছিল। বলল, "সার, একটা কাজ করলে হয়।"

তাকাল লালু। "কী কাজ?"

"দুটো মুচি ধরে আনি।"

"মুচি?"

"হ্যাঁ সার। মুচিরা শক্ত শক্ত চামড়া কেটে জুতোয় হাফসুল দেয়। ওদের কাছে যে চামড়াকাটা চিস্‌লু থাকে—তার ভীষণ ধার। ওরা কেটে দেবে।"

লালু বুঝতে পারল। বাটালি। রাস্তার মুচিরা জুতোর হাফ্‌সোল দেওয়ার সময় যা দিয়ে চামড়া কাটে সেই জিনিস। পুরু চামড়া, পাতলা চামড়া সবই কেটে ফেলে চোখের পলকে। কিন্তু চিস্‌লুটা কী বস্তু? চিজ্‌ল্ না কি? বা অন্য কিছু?

পানুর কথাটা অবশ্য পছন্দ হল লালুর। সত্যি তো, এত ভাববার কী আছে। শহর থেকে একজোড়া মুচি ধরে আনলেই তো কাজটা হয়ে যায়।

লালু গজপতিকে বলল, "গজা, গুড অ্যাডভাইস! কী বলিস! পং ম-মন্দ বলেনি।"

গজপতি কেমন হতাশভাবে তার কাটিং-মেশিনটার দিকে তাকিয়ে থাকল। সে কেমন করে বুঝবে জমানো জিনিসটা এত পুরু আর শক্ত হয়ে উঠবে। এখন আর কিছু করার উপায় নেই। আবার কতদিন পরে নতুন ভেজ-লেদার তৈরি হয়ে আসবে তার জন্যে বসে থাকা যায় না। তার আগে অন্তত একবার হাতে-কলমে দেখা দরকার এই

জিনিসে কতটা কাজ হয়! নতুন একটা জিনিস তৈরি হল—এটা চোখে একবার দেখতে না পেলে স্বস্তি হয়, না ভাল লাগে। ভুল-ভ্রান্ত যা হয়েছে, হবে—তা পরে ধীরে ধীরে শুধরে নিলেই চলবে। তার আগে দু-চারটে জুতোর নমুনা দেখা দরকার। সে যেমনই হোক।

লালু বলল, "কী রে?"

গজপতি মাথা নেড়ে সায় দিল। মানে, তবে তাই হোক।

লালু বলল, "পং, যাও বেরিয়ে পড়ো। বাজারের আগেই মুচি পেয়ে যাবে। ধরে আনো। বলবে, কাজ সা-সামান্য, টাকা বেশি।"

পানু বলল, "বাজার অনেক দূর, সার। স্টেশনের কাছেও মুচি পাব।"

"যেখান থেকে পারো, ধরে নিয়ে আসবে।"

পানু চলে গেল।

গজপতির তেষ্টা পেয়ে গিয়েছিল। কাছেই একটা জলের কুঁজো। জল গড়িয়ে খেল সে।

লালু বলল, "গজা, মন খারাপ করিস না; তোর কোনও দোষ নেই। কী করবি!"

গজপতি বলল, "কপাল খারাপ লালুদা। নয়তো কবেই আমাদের কাজটা হয়ে যেত বলো!"

লালু সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "গজু, এ তো ক-কলাগাছের কাঁদি নয়। বড় কাজে সময় লাগে। আর তো মাত্তর ক'টা দিন। আসছে হপ্তায় তোর জুতো হয়ে যাবে। দ্যাখ, আমি বলছি।"

গজপতি কিছু বলল না।

পানু কোত্থেকে দুই মুচি ধরে আনল। এরা হল কাকা-ভাইপো। কাকার বয়েস বছর চল্লিশ হতে পারে, ভাইপোর বয়েস বছর পনেরো।

কাকা কাজকর্ম জানে। ভাইপো এখনও কাটাকুটির কাজ রপ্ত করতে পারেনি। জুতো-পালিশ, সামান্য সেলাই-ফোঁড়াই শিখেছে। ছোকরার দোষ হল, সব কথাতেই হাসে। দেখতে কিন্তু বেশ। মুখটি বড় মিষ্টি।

কাকার নাম ভজন। ভাইপোর নাম, ছোরু।

ভজন লালুকে চেনে। এই শহরের লোক, না চিনবে কেন!

ভজন এক ভেবে এসেছিল, এসে দেখল অন্য কাণ্ড। ঘাবড়ে গেল। ব্যাপারটা যে কী বুঝতে পারল না। এত যন্ত্রপাতি, এতরকম কায়দাকানুন সে জীবনেও দেখেনি।

লালু বলল, "ভজন! তুমি! ভালই হয়েছে। দাও তো বাবা আমাদের একটু কাজ করে। তোমাকে খু-খুশ করে দেব।" বলে পানুর দিকে তাকাল, "নাও পং, ওকে বুঝিয়ে দাও কী করতে হবে!"

পানু ভজনকে বোঝাতে লাগল।

ভজন জীবনে অনেক রকম জুতোর কাজ করেছে। এমনকী, শহরের কোনও কোনও বাবু তাকে অর্ডার দিয়ে জুতোও বানিয়ে নেয়। বিশেষ করে বাচ্চাদের জুতো।

জুতো তৈরির কাজটা সে জানে। তবে দু-পাঁচ জোড়ার বেশি জুতোর অর্ডার সে সারা বছরে পায় না।

ভজন সব দেখেশুনে প্রথমে মাথা নাড়তে লাগল। মানে, এ-কাজ সে পারবে না।

লালুও নাছোড়বান্দা।

শেষপর্যন্ত ভজনকে বসতে হল। পানু একটা মোটা কাগজ দিল। কাগজটা পাতলা বোর্ডের মতন। পায়ের মাপে কাটা। ওই বোর্ডটা রেখে, ওরই মাপে মাপে ভেজ-লেদার কেটে দিতে হবে।

ভজন তার চামড়া কাটার বাটালি বার করল। একটা পেনসিল চাইল লালুর কাছে, মাপে মাপে দাগিয়ে নেবে।

পেনসিল দিল লালু।

ভজন অনেকক্ষণ ধরে কী ভাবল। সে চামড়া কাটতে পারে। কত শক্ত শক্ত চামড়া কেটেছে, কাঁচা চামড়া, শুকনো চামড়া, মায় ষাঁড়ের চামড়া পর্যন্ত। কিন্তু এটা যে কী পদার্থ তার মাথায় আসছিল না। এ-জিনিস কি কাটা যাবে!

"বাবুজি! ইয়ে কোন চিজ হ্যায়!"

লালু মাথা চুলকে বলল, "হ্যায়—। আচ্ছা চিজ হ্যায়। চামড়া নেহি। ইয়ে ভেজিটেব্‌ল চামড়া।"

"কিয়া? ভে...ভজুয়া..."

"আরে না না। ভজুয়া চামড়া নেহি, ঘাসসে বানায়া চামড়া!"

ভজন এমন কথা জীবনে শোনেনি। ঘাস দিয়ে চামড়া হয় নাকি? ছোরু তো হেসেই মরে।

ভজনকে বোঝানোর ক্ষমতা লালুর নেই। অত কথা বলার দরকারই বা কী! লালু নিজেও বা কতটুকু বোঝে এই ভেজিটেব্‌ল লেদারের।

ভজন শেষপর্যন্ত হাতের কাজ নিয়ে বসল।

বসল। কিন্তু বুঝতে পারল, চামড়া কাটার সহজ কাজ এটা নয়। কাটার জিনিসটা বড়ই শক্ত। কাঠের মতন। এ-কাজ ছুতোর মিস্ত্রির, তার নয়। তাকে ধরে না এনে লালুবাবুরা যদি ছুতোর মিস্ত্রি ধরে আনত ভাল করত।

লালু আর পানু কিন্তু ভজনকে ছাড়বে না।

ভজন তার বাটালি বার কয়েক শানিয়ে ধার বাড়িয়ে নিল। একবার করে শানায় আর ভাইপোকে কী যে বলে নিজের ভাষায়, বোঝা যায় না।

ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় একটা তবু কাটা গেল দেখানো মাপ মতন।

ভজন ততক্ষণে ঘামতে শুরু করেছে।

লালু বলল, "গজু। অ্যানাদার টু পিস—! কী বলিস!"

গজপতি মাথা দোলাল।

ভজন ছুতোনাতা করে পালাবার চেষ্টা করছিল। এ-কাজ কি তার পক্ষে সম্ভব! না, ভাল লাগে! ভজনের ভাইপো ছোকরা অতি চালাক। কাকাকে বার কয়েক খইনি খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে সে পালিয়ে গেছে কখন।

বিকেলের আগে-আগে আরও দু'-জোড়া জুতোর সোল কেটেকুটে দিয়ে ভজন উঠে পড়ল। আর সে পারবে না। শিশুগাছের তলায় নিজের জায়গাটুকুতে বসে কাজ করতে পারলে এতক্ষণে ভজনের একটুও ক্লান্তি হত না। কাজ করত, গল্প করত, খইনি খেত, বিড়ি ফুঁকত, চাই কি দু-এক ভাঁড় চা খাওয়াও হত। হাত দুটো এভাবে জ্বলে যেত না।

ভজন তার ঝোলাঝুলি নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই লালু তাকে কুড়িটা টাকা দিল। কুড়ি টাকা কম নয় ভজনের কাছে।

টাকা দিয়ে লালু বলল, "কাল সকালে চলে এসো। আরও দু-চারটা কেটে দিয়ে যেও।"

ভজন মাথা হেলিয়ে যেভাবে পালালো, মনে হল না—সে আর এ-পথ মাড়াবে! কুড়ি টাকার লোভেও সে আর আসছে না।

ভজন চলে গেলে পানু বলল, "সার, এগুলো কী করব? খানিকটা নরম না করলে তো কাজ করা যাবে না!"

গজপতি কিছু বলার আগেই লালু বলল, "গজু, আমার মনে হয়, ওগুলো ভিজিয়ে দেওয়া যাক। কী বলিস?"

গজুপতি বলল, "দাও। কোথায় ভেজাবে!"

"কেন, বালতিতে। জলের মধ্যে ডুবনো থাক চব্বিশ ঘণ্টা। কাল একেবারে নেতিয়ে যাবে।"

গজপতি মাথা নেড়ে সায় জানাল। বলল, "জলে এক কাপ অ্যাসিড দিয়ে দিও।"

পানু গেল বালতি জোগাড় করতে।

সন্ধেবেলায় বাড়িতে গণপতির সঙ্গে বৈঠকে বসল লালু আর গজপতি।

গণপতি লালুর মুখে ভজন-বৃত্তান্ত শুনল। শুনে বলল, "তা তোবা এবার কী করবি?"

গজপতি বলল, "ভাবছি। জুতোর তলা হলে তো হবে না, ওপরও চাই। কী করব বলো তো গণাদা?"

গণপতি বলল, "আমি তো বলেছিলাম, কারখানার বুট জুতো কর। তোর মনে ধরল না। চাঁদিরামের কাছে তাঁবুর তেরপল-কাপড় পাওয়া যায়। ওই কাপড় আর তোদের জুতোর সোল দিয়ে ফ্যাক্টরি বুটস্ করতিস।"

গণপতি মাথা নাড়ল। বলল, "করলে হত। তবে তাতে লাভ কী!...গণাদা, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। নিউ আইডিয়া।"

"কী আইডিয়া?"

গজপতি লালুর দিকে তাকাল। লালু অবশ্য কিছুই জানে না।

লালুও গজপতির দিকে তাকিয়ে থাকল।

গজপতি বলল, "গণাদা, এখন—এই সময়টায় আমার হাতে জুতোর ওপরটা করার মতন কোনও পাতলা ভেজ লেদার নেই। একটু-আধটু থাকলেও বর্মি চপ্পল

করে ফেলতাম। সবই নতুন করে করতে হবে আমাদের। তার আগে আমি ভাবছি, সুসুমারি স্লিপার করব।"

"কী স্লিপার?"

"সুসুমারি। জাপানে দেখেছি।"

"সেটা আবার কী?"

"দড়ির লেস দেওয়া চটি। রোমান টাইপ। সেকালে চলত। মানে ওপরে থাকবে নাইলন দড়ি। কালারফুল। আর তলায় থাকবে আমাদের কারখানার সোল—! গণাদা, আগেকার দিনে লোকে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে জুতো তৈরি করত। সেই জুতো পরে ঘুরত ফিরত, চ্যারিয়ট রেস করত। আমি চামড়ার স্ট্র্যাপের বদলে নাইলন দড়ি লাগাব। ভাল লাগবে দেখতে!"

গণপতির মুখে কথা নেই। ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল হাঁ করে।

লালু তোতলাতে লাগল। বলল, "দ-দড়ি বাঁধা জুতো!...তো-তো—ইয়ে—গজু, দড়িটা পায়ে না বেঁধে গ-গলায় বাঁধলে কী হয়?"

গণপতি বেজায় জোরে হেসে উঠল হঠাৎ। তারপর লাফিয়ে উঠে বলল, "গজা! দিস্ ইজ্ লাপাজু! তুই তোর বাহামরি জুতোর নাম দে চ্যারিয়ট জুতো।"

পনেরো

রবিবার সকালে দোতলার গোলঘরে পতি-পরিবারের যথারীতি চা-পানির আসর বসেছিল।

বর্ষা করে কেটে গেছে। এখন শরৎ। আর ক'দিন পরেই দুর্গাপূজো। চারপাশের অবস্থাটা কেমন পালটে গিয়েছে। এখানে এমনই হয়। শুকনো-শাকনা, খটখটে, খানিকটা পাহাড়ি জায়গা। বর্ষা ফুরোতেই আকাশ, আলো, মাঠঘাঠের চেহারা পালটে যায়। মনোরম হয়ে ওঠে আবহাওয়া।

পতি-পরিবারের বৃদ্ধ কর্তা ধনপতির শরীর দিনকয়েক ভালই যাচ্ছিল। তাঁকেও তেতলা থেকে চেয়ারে করে দোতলার গোলঘরে নামিয়ে আনা হয়েছে আজ।

মহীপতি, উমাপতি, বৃহস্পতি, ঝিললি সবাই ছিল চায়ের আসরে। খাওয়াদাওয়া চলছিল, চায়ের কাপ শেষ হতে-না-হতেই আবার ভরে উঠছিল। গল্পগুজব, হাসি-তামাশা যেমন চলে সেইরকমই চলছিল।

গজপতির দেখা নেই এখনও।

ধনপতি বারবার খোঁজ করছিলেন নাতির।

গণপতি ঠাকুরদাকে বোঝাচ্ছিল, গজপতি আসছে। এই এসে পড়ল বলে। ও একটা জিনিস নিয়ে আসছে বলে দেরি হচ্ছে।

মহীপতি বাবার সঙ্গে পুজোর ব্যাপার নিয়ে কথা বলছিলেন। এই শহরে পতি-পরিবারের প্রতিষ্ঠা যেমন, সেইরকমই অনেক দায় ঘাড়ের ওপর। তা ছাড়া নানা জায়গায় সাহায্য, দান-খয়রাতি আছে; পুজোর সময় প্রায় শ'খানেক ধুতি-গামছা বিলি

হয় গরিব মহল্লায়।

মহীপতি আর উমাপতি বাড়ির কর্তার সঙ্গে এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

এমন সময় গজপতি এল।

গজপতির পরনে পাজামা, গায়ে পাঞ্জাবি। অবশ্য পাঞ্জাবির ঝুল হাঁটুর তলায় গিয়ে নেমেছে।

গজপতির হাতে একটা চমৎকার ব্যাগ। কিট্ ব্যাগ।

গজপতি আসতেই ধনপতি খুশি হয়ে বললেন, "আয় দাদা, আয়।"

গজপতি ব্যাগটা নামিয়ে রাখল। তারপর এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল ঠাকুরদাকে, পরে জ্যাঠা আর কাকাকে।

হঠাৎ এই প্রণামের ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না ধনপতি। মহীপতিরাও নয়।

ধনপতি চোখে কম দেখেন। বয়েস তো কম হল না। চশমাটা খুলে রেখেছিলেন সামান্য আগে। কান-জড়ানো চশমা। বেশিক্ষণ পরতে ভাল লাগে না। চশমা পরতে পরতে নাতিকে দেখলেন। "কীরে দাদা, আজ তোর জন্মদিন নাকি?"

মহীপতিও অবাক হয়েছিলেন। বললেন, "জন্মদিন! গজুর আজ জন্মদিন! তা কেমন করে হবে।"

উমাপতি বললেন, "বাবা, গজু আশ্বিন মাসেই জন্মেছে। তবে একেবারে শেষে। আজ তো মাত্তর বারো।"

গণপতি কিছুই বলছিল না। দু' পাত্র চা খাওয়ার পর মিটিমিটি হাসছিল। ঝিললিকে ইশারায় বলল, গজাকে চা-খাবার দে।

ঝিললি খাবারের ডিশ সাজাতে লাগল।

গজপতি তার ঠাকুরদাকে বলল, "দাদা, আজ আমি আমার কারখানার জুতো এনেছি সঙ্গে করে। তোমাদের দেখাব।"

ধনপতির বোধহয় বুঝতে একটু দেরি হল। তারপর তাঁর সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে গেল। নাতির কৃতিত্বে বৃদ্ধ যেন ভীষণ তৃপ্তি পেয়েছেন। বললেন, "তাই বল দাদা! খুব খুশি হয়েছি। তুই আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করলি।"

ঝিললি ততক্ষণে খাবারের ডিশটা দাদার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। রগড় করে ঠাকুরদাকে বললে, "দাদাভাই, তুমি যে কী বলো! জুতোতে কি বংশের মুখ উজ্জ্বল হয়! পা উজ্জ্বল হতে পারে।"

জোর একটা হাসির দমকা বয়ে গেল যেন।

গজপতি ছোট বোনকে দেখল। ঝিললি দিনদিন বড় বেশি আশকারা পেয়ে যাচ্ছে। বলল, "না বুঝে কথা বলিস না! পাকামি ছাড়া আর কিছু শিখিসনি। একটা ফ্যামিলির একটা ব্যবসাই বিরাট হতে পারে। কেন, টাটা বাটা জানিস না! মাথায় তোর কী আছে কে জানে!"

ঝিললি কানই করল না দাদার ধমকে। হাসতে লাগল খিলখিল করে। হাসতে হাসতে কাপে চা ঢালছিল।

ধনপতি নাতনিকে বললেন, "দিদি, তুই বড় পেছনে লাগিস!"

মহিপতি বললেন, "বাবা, আমি আর উমা দু-একবার ওর কারখানা দেখতে গিয়েছি। কিছুই বুঝিনি। তবে খুব এলাহি কাণ্ড করছিল। আমরা বললাম, অত আটা একসঙ্গে মাখিস না, সামলাতে পারবি না, যতটা পারবি গোড়ায় গোড়ায় ততটা মাখ। তারপর তো রইলই সব—।"

উমাপতি বললেন, "অসুবিধে হচ্ছিল নানারকম। অমন তো হয়ই। তা হালে খানিকটা সামলে উঠেছিল। গজু একটা কাজ করল, বাবা।"

গণপতির পকেটে রুমাল নেই। জামার হাতায় মুখ মুছে হাসি আড়াল করতে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল।

গজপতি বলল, "দাদা, পুজোর এখনও বারো-চোদ্দ দিন বাকি। পুজোর আগে যদি পঁচিশ-পঞ্চাশ জোড়া জুতো আমাদের এখানে ফেলে দিতে পারতাম, লোকে তাকিয়ে দেখত। তারপর আসত দেওয়ালি। ভালই হত। কিন্তু আমাদের ভুলচুকের জন্যে তা আর হল না। অনেক কিছু অদলবদল করতে হবে, শোধরাতে হবে।...তা শীতের আগে বাজারে আর মাল বার করতে পারব না। তা ছাড়া গিরিডির বানোয়ারিজির সঙ্গে আমাদের কথা আছে, জুতোর সোল এজেন্সি তাঁকে দিতে হবে। ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা না বলে তো কিছু করতে পারি না।"

ধনপতি মন দিয়ে সব শুনছিলেন। হুড়োহুড়ি তিনি পছন্দ করেন না। মাথা নেড়ে বললেন, "ঠিক কথা। একেবারে সাচ্চা বাত, দাদা। কথার খেলাপ করে যারা তারা ব্যবসাদার হতে পারে না। তোদের অত হুড়োহুড়ি করার কী আছে! ধীরেসুস্থে যা করার করবি। দু-চার মাস দেরিতে কী আসে-যায়!"

গজপতি চায়ের পেয়ালায় মুখ দিয়েছিল। দু-চার চুমুক চা খেয়ে বলল, "আমি ক'টা নমুনা জুতো এনেছি। তোমাদের দেখাব।"

ধনপতি বললেন, "বেশ করেছিস। ভাল করেছিস। তোর অত সাধের জিনিস, আমরা চোখে না দেখলে ভাল লাগবে কেন!...তা আগে চা-জলখাবারটা খেয়ে নে। এত দেরি করে এলি, সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।"

ঝিললি খুনসুটি করে বলল, "ঠাণ্ডা চা খেলে শরীর ভাল থাকে, দাদাভাই। জাপানিরা গরম চা মুখে দেয় না।"

গজপতি কিছু বলল না। খানিকটা যেন অবজ্ঞাই করল বোনকে।

মহীপতির কী খেয়াল হল, উমাপতিকে বললেন, "উমা, এবার তবে গিরিডির বানোয়ারিজির কাছে চিঠিপত্র লিখতে হয়। উনি যদি এদিকে আসেন দেখা করে যাবেন। না হলে গণা আর গজু একবার গিরিডি ঘুরে আসুক।"

"পুজোর আগে গিয়ে কী লাভ! তার পরেই যাবে।"

বৃহস্পতি একপাশে বসে বসে খবরের কাগজের পাতা ওলটাচ্ছিল। হঠাৎ বলল, "গজুদা, পাবলিসিটি লাগিয়ে দাও এখন থেকেই। পাবলিসিটি ছাড়া ব্যবসা হয় না। এই দ্যাখো, ইসবগুলের ভুসির কী বিজ্ঞাপন!"

মহীপতির মনে ধরল কথাটা। বললেন, "তাই তো! বেস্পতির তো মাথা আছে।

পাবলিসিটিটা লাগিয়ে দিলেই হয়। পুজোর মুখ এখন, এই সময় থেকে পাবলিসিটি লাগালে কাজে দেবে।"

উমাপতি বললেন, "মন্দ কথা নয়। তবে, কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার আগে আমাদের এই শহরেই আগে জিনিসটা জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে।"

বৃহস্পতি বলল, "চ্যারিটি বিগন্‌স্ অ্যাট হোম।"

মহীপতি হেসে ফেললেন।

ঝিললি বলল, "জেঠু, ম-স্ত বড় দু-তিনটে সাইনবোর্ড করিয়ে শহরে লাগিয়ে দিতে হবে। পুজো মণ্ডপের কাছে একটা কাপড়ের ফেস্টুন।"

ধনপতি কথা না বললেও মাথা নেড়ে যাচ্ছিলেন।

বৃহস্পতি কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মহীপতি গণপতির দিকে তাকালেন। বললেন, "তোর দোকানের শো-উইন্ডোতে বেশ সাজিয়েগুছিয়ে গজুর স্যাম্পল জুতোগুলো রেখে দিলেই তো হয়। আর সুন্দর করে একটা কাপড়ে লিখিয়ে দোকানের মাথায় টাঙিয়ে দিবি।" বলে থেমে গেলেন। যেন কী লিখিয়ে নেওয়া হবে তা চট করে ভাবতে পারছিলেন না।

ঝিললি আর বৃহস্পতি প্রায় একই সঙ্গে বলল, "ছড়া করে, ছড়া লিখতে হবে। ছড়ায় দারুণ হবে।...গজুর জুতো পায় খোকন সোনা যায়।"

মহীপতি, উমাপতি, গণপতি সকলেই হেসে উঠল।

গজপতির চা খাওয়া শেষ হয়েছিল। খাবার বড় একটা মুখে তোলেনি।

ধনপতি বললেন, "দেখি দাদা, তোমার কারখানায় কেমন জুতো তৈরি হল?"

গণপতি একটি কথাও বলছিল না। চাপা হাসি লুকিয়ে চুপ করে বসে বসে শুনছিল সব।

গজপতি তার কিট্ ব্যাগটা তুলে নিল। মুখের চেইন খুলতে খুলতে বলল, "এগুলো নমুনা। এখনও ঠিকমতন ভেজিটেব্‌ল লেদার তৈরি করতে পারিনি। প্রসেসিংয়ে গোলমাল হয়ে গেছে। সেটা পরের বার ঠিক হয়ে যাবে। নমুনা হিসেবে এই তিন-চার জোড়া জুতো তৈরি করেছি।" বলে গজপতি ব্যাগের ভেতর থেকে জুতো বার করতে লাগল।

জুতোগুলো বার করার সঙ্গে সঙ্গে পতি-পরিবারের চা-পানির আসরে যেন কী একটা ঘটে গেল। ওরা চমকে উঠল, না বোবা হয়ে গেল, ওদের চক্ষু চড়কগাছ হল, নাকি মাথা ঘুরে গেল—কী হল কিছুই বোঝা গেল না। শুধু বড় বড় চোখ করে সবাই তাকিয়ে থাকল।

অবাক আর বোবা না হয়ে উপায় কী! এমন জুতো এঁরা জীবনে কখনও দেখেননি। জুতোর কত রকমফের, কায়দাকানুন, ডিজাইন, ছাঁটকাট তাঁরা দেখেছেন, কিন্তু এই জুতো একেবারে আলাদা। জুতো বলতে তলায় কালচে মোটা কাঠের মতন একটা জিনিস—জুতোর তলা—মানে 'সোল'। আর ওপরে একরাশ নাইলনের দড়ি। দড়িগুলো নানা রঙের। নাইলনের চওড়া ফিতে, যা দিয়ে আজকাল ক্যাম্পখাট, চেয়ার বোনে—সেই ফিতেও আছে।

মহীপতি আর উমাপতি কেমন একটা শব্দ করলেন।

বৃহস্পতি আর ঝিললি কী বলল যেন।

ধনপতি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বললেন, "কই, দেখি একবার।"

গজপতি জুতোগুলো নিয়ে উঠে গেল তাঁর কাছে।

ধনপতি হাত বাড়িয়ে একটা জুতো নিলেন। দেখলেন ভাল করে। বললেন, "এটা কী জুতো দাদা?"

গজপতি বলল, "দাদা, এটার নাম দেব, 'রোমা রেসি'। দড়িগুলো বেঁধে নিতে হবে।...কী হয়েছে জানো? সোলটা এত শক্ত হয়ে গিয়েছিল যে, গর্ত করা যাচ্ছিল না। ছুতোর মিস্ত্রি ডেকে গর্ত করিয়ে নাইলন দড়িগুলো লাগাতে হয়েছে।...আগেকার দিনে রোমের লোক এরকম জুতো পরত। পরে চ্যারিয়ট রেস করত। জাপানে দেখেছি কেউ গ্রামে বেড়াতে গেলে এইরকম দড়ি-স্যান্ডেল পরে। ওরা অবশ্য ঘাসের দড়ি দিয়ে লেস করে।"

ধনপতি খানিকটা ভেবেচিন্তে বললেন, "তা এটাকে জুতো না বলে দড়ি বললেই হয়।"

গজপতি যেন ধাক্কা খেল ঠাকুরদার কথায়। সামলে নিয়ে অন্য একটা জুতো দেখাল। বলল, "দাদা, এটা এখনকার হাওয়াই চপ্পলের মতন করে করা। এটায় হাওয়াইয়ের মতন টেপ নেই, তিন-দড়ির বিনুনি রয়েছে। এগুলো বর্মি কায়দায় করা। এর নাম দেব 'লিজার'।"

ধনপতি দেখলেন জুতোটা। বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, নামটা কাঁচি দিলেও পারতিস দাদা! দেখতে তো কাঁচির মতন। পায়ের পক্ষে এ-জিনিস জুতসই হবে বলে তো মনে হয় না।

এতক্ষণে যেন বৃহস্পতি আর ঝিললি মুখে কথা পেল। বৃহস্পতি বলল, "গজুদা, কাঁচি নামটা ভাল। তুমি 'সিজার' বলতে পারো। একটা 'রোমান', আরেকটা 'জুলিয়াস সিজার'—খাসা হবে।"

ঝিললি হেসে ফেলে বলল, "একেবারে ফ্যান্টা!"

গজপতির মুখ কেমন শুকিয়ে গেল। তবু সে আরও দুটো নমুনা-জুতো বার করে দেখাল। একটার নাম 'অজান্তা', অন্যটার নাম, 'অল টাইম'। ধনপতি বললেন, "দাদা, তোর কারখানার জুতোগুলোর যা নমুনা দেখলাম, তাতে আমার মনে হচ্ছে, বাজারে এসব কাঁচিমাচি চলবে না। লোকে পায়ে দেওয়ার জন্যে জুতো কেনে, দেয়ালে টাঙিয়ে রাখার জন্যে নয়। যাকগে, যা হওয়ার হয়েছে। আবার একবার চেষ্টা করে দ্যাখ।"

মহীপতিও বাবার কথায় সায় দিলেন।

উমাপতি বললেন, "অত পয়সা খরচ করে কারখানা হল! কিছু তো একটা করতেই হবে।"

ঝিললি উঠে পড়ে বলল, "দাদা, জুতোগুলো দাও না। জেঠিমা-কাকিকে দেখিয়ে আনি।"

গজপতি ধমকে উঠে বলল, "না। তোকে পাকামি করতে হবে না। দেখাতে হয়, আমি দেখাব।"

বিকেলে গজপতি খুব মনমরা হয়ে কারখানায় গেল। সঙ্গে গণপতি আর লালু।

অনেকক্ষণ আলোচনার পর গজপতি বলল, "গণাদা, আমি তো আর কোনও উপায় দেখছি না। আবার একবার চেষ্টা করব। তারপর যদি একই রকম হয়।"

লালু বলল, "গজু, আমার মাথায় একটা বু-বুদ্ধি এসেছে। আমরা যেভাবে ভে-ভেজিটেব্‌ল লেদার তৈরি করলাম, ওই লেদার খুব পাকা-পো-পোক্ত। ধর, আমরা ওই দিয়ে জলের ট্যাঙ্ক তৈরি করলাম। না হয়, বড় বড় ট্রাঙ্ক। বাজারে ভাল চলবে।"

গজপতির পছন্দ হল না।

সন্ধে হয়ে গেল। এবার বাড়ি ফিরতে হবে।

কারখানার মাঠে তিনজনে আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়ল।

ফটকের বাইরে আসতেই দেখা গেল, একটা গোরু মাঠে চরতে চরতে পথ হারিয়ে এদিকে এসে পড়েছে। সঙ্গীসাথীদের ডাকছিল বোধহয়।

হঠাৎ গণপতির কী মনে হল। বলল, "গজা, গট্ দি আইডিয়া।"

গজপতি আর লালু তাকাল গণপতির মুখের দিকে।

গণপতি বলল, "শোন গজা, জুতোর কথা ভুলে যা। জুতোটুতো আমাদের দ্বারা হবে না। আমি বলি কী, এই এ-ত্ত বড় শেড, মাঠ, ঘাস, ক্যারা, কত কী রয়েছে, তুই এক কাজ কর। এখানে গোরু-মোষ ঢুকিয়ে দে। ভাল ভাল পাটনাইয়া গোরু, বিশাল বিশাল মোষ। তুই এখানে একটা ডেয়ারি করে ফ্যাল। নো প্রবলেম। গোরু-মোষকে যত ভাল ভাল খাওয়াবি তত দুধ দেবে বালতি ভরে। তোর এখানে এমন ঘাস...।" বলতে বলতে গণপতি থেমে গেল। ছোট ভাইকে দেখল। গজপতি দুঃখ পাক গণপতির মোটেই তা ইচ্ছে নয়। ভাইয়ের পিঠে হাত রেখে নরম করে বলল, "গজু, আমি তোকে ভাল অ্যাডভাইস দিচ্ছি। ডেয়ারি ফার্ম ফালতু জিনিস নয়। তুই লাইন পালটা। দুধ, দই, ঘি, মাখন, চকোলেট লাগিয়ে দে। দারুণ হবে।"

লালু বলল, "গজা, কো-কোথায় জুতো কোথায় গোরু-মোষ দুধ-মাখন। কী বলছিস তুই! প্রেস্টিজ ডাউন মেরে যাবে।"

গণপতি বলল, "লালু, আপ আর ডাউন দুটোই সংসারের নিয়ম। তুই একেবারে গাধা। বড় রেললাইনের কায়দাই হচ্ছে ডবল লাইন রাখা। আপ আর ডাউন। আমি বলছি, ডেয়ারি ইজ বেটার দ্যান ভেজিটেব্‌ল শু...!" বলে ভাইকে সান্ত্বনা দিয়ে আবার বলল, "গজা, তোর কপাল খারাপ। তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই। এক গোলে পিছিয়ে থেকে দু' গোল দেওয়ার মতন স্পিরিট নিয়ে খেলে যা!"

গজপতি ধীরে ধীরে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। বড়ই বিষণ্ণ। কিছু ভাবছিল। তারপর করুণ গলায় বলল, "না গণাদা, ডিফিট ভাল না। জুতো আমি এই কারখানাতেই তৈরি করব। তবে আর ভেজিটেব্‌ল নয়। চামড়ার, রবারের। তুই

কানপুরে, কলকাতায় লোক পাঠাবার ব্যবস্থা কর। যা যা দরকার সব আনাবার ব্যবস্থা করবি। মালপত্র, মেশিন, কাজের লোকজন! সমস্ত কিছু।...আর ওই সাইনবোর্ডটা থেকে ভেজিটেব্‌ল কথাটা মুছে দে।"

লালু বলল, "তুই ভাবিস না গজু, আমি নতুন করে সা-সা-সাইনবোর্ডটা লিখিয়ে নেব। 'শু' বানানটা যখন ভুল লিখেছে তখনই জানি কপাল টুসে দিয়েছে। আর ভুল হবে না।"

গণপতি গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, "যাই বলিস, কারখানার এই জায়গাটায় ডেয়ারি খারাপ হত না। তা যাকগে, তোর যা ইচ্ছে তাই কর।"

গজপতি হাসল। ম্লান হাসি। বলল, "এবার হবে। তুই দেখে নিবি।"

অলৌকিক কাহিনী

অলৌকিক

সিনেমা দেখতে গিয়ে বরদা এরকম একটা ঝঞ্ঝাটে পড়ে যাবে বুঝতে পারেনি। বরং যখন নিউ মার্কেটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন তার মেজাজ খুব হালকা। যতরকম বোঝা মাথার ওপর চাপানো ছিল সব নামানো হয়ে গেছে, পরীক্ষা খতম, এ জন্মের মতন বই মুখস্ত করার পালা শেষ। এ যন্ত্রণা আগেও শেষ হতে পারত, কিন্তু আজকাল যা হয়—গড়িয়ে-গড়িয়ে, এ বছরের পরীক্ষা আসছে বছরেও হবে কি হবে না করতে করতে পাক্কা দেড় বছর দেরি হয়ে গেল। তবু শেষমেশ যে হয়েছে, আর বরদা তার ল' ফাইনাল দিতে পারল, এতেই সে খুশি।

মেজাজটা হালকা, বেশ ফুর্তি-ফুর্তি লাগছিল বলে বরদা নবাবি চালে দুটো দামি টিকিট কিনে ফেলল। মানিকের আসার কথা। মানিক আগেই বলে দিয়েছিল, "তুই গিয়ে টিকিটটা কেটে ফেলবি, আমি পৌনে ছ'টা নাগাদ হাজির হব।"

মানিক বরদার বন্ধু; দূর সম্পর্কের একটা আত্মীয়তাও রয়েছে। ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের কাজ করে। বিশাল লম্বা-চওড়া চেহারা, দেখলে মনে হয় না-জানি কত বয়েস, পুলিশ-টুলিসে চাকরি করে নিশ্চয়, লালবাজারের কোনও সার্জেন্ট। আসলে ওসব কিছুই নয়, মানিকের চেহারার গড়নটাই যা দৈত্য-দৈত্য, স্বভাবে একেবারে ছেলেমানুষ, নরম মন, পকেটমারকেও দু-চারটে চড়চাপড় লাগাতে পারে না।

মানিকই বলে দিয়েছিল "দি ফিয়ার বলে একটা ছবি হচ্ছে। টিকিট কাটবি। ভুতুড়ে ছবি। টেরিফিক ছবি।"

বরদা ভেবেছিল, টিকিট-ফিকিট পাবে না। একেবারে ভুল ধারণা। ভিড় তেমন কিছু নয়। অজস্র টিকিট রয়েছে। তিন হপ্তার মাথায় কত আর ভিড় হতে পারে। হাজার হোক ভূতের ছবি তো!

মানিকের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বরদা একবার ওজন নিল ওয়েয়িং-মেশিনে। না, ওজন কমেনি। একটা সিগারেট খেল। পোস্টার আর ছবি দেখল সিনেমার। সে ভেবেছিল এডগার অ্যালান পোয়ের কোনও গল্প-টল্পর ছবি। তা নয়। অ্যালান পোয়ের গল্প নিয়ে ছবি আগে দেখেছে বরদা। সেই যে একটা ছবিতে কাটা মুণ্ডু নিয়ে লোফালুফি খেলার দৃশ্য—বিভ্রম বা দুঃস্বপ্ন যাই হোক—সেই দৃশ্যের কথা এখনও মনে আছে বরদার। রীতিমতো ভয় হয় দেখলে।

না, মানিকটা এখনও আসছে না। ছ'টা বেজে গেছে!

বরদা আবার একবার বাইরে এল, রাস্তার কাছে এসে দেখল, মানিকের কোনও পাত্তা নেই। রাস্তায় গিজগিজে ভিড়, হরদম গাড়ি ঢুকছে, নিউ মার্কেটের খদ্দের সব। লাইট হাউসের দিকে এখনও হল্লা, মারপিটের ছবি চলছে।

বরদা ঘড়ি দেখল নিজের। ছ'টা বারো। কতক্ষণ আর এভাবে অপেক্ষা করা যায়! হল কী মানিকের? অফিসে আটকে গেছে? ওর তো টহল মারার চাকরি। কোথাও গিয়ে ফেঁসে গেছে? আজকাল কলকাতার গাড়িঘোড়ার যা হাল, কোথায় কোন জ্যামে আটকে গেছে বলা মুশকিল।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যায়। এখন বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দেখাবে; তারপর ফিল্মস ডিভিশনের ছবি। মনে মনে বিরক্ত এবং অধৈর্যই হয়ে পড়ছিল বরদা। মানিকের হল কী? কোনও ঝামেলায় পড়েনি তো? আপদ-বিপদ?

শেষ পর্যন্ত আর অপেক্ষা করা গেল না।

বরদা কাউন্টারে এসে দাঁড়াল। সসঙ্কোচে বলল, "আমার যদি একটা উপকার করেন?"

কাউন্টারের ওপার থেকে পাকাচুল ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন।

বরদা বলল, "আমার এক বন্ধুর আসার কথা ছিল। তার টিকিট কেটেছি। এখনও সে এসে পৌঁছয়নি। আমি তার টিকিটটা আপনার কাছে রেখে যাই। যদি সে আসে, তাকে যদি দয়া করে দিয়ে দেন।"

ভদ্রলোক রাজি হচ্ছিলেন না। নিয়ম নেই। বরদা আবার একটু অনুরোধ করল। বিনয় করেই বলল, "প্লিজ টিকিটটা রেখে দিন।"

রাজি হলেন ভদ্রলোক। বরদা বলল, "আমার বন্ধুর নাম মানিক। আপনাদের কাউন্টার ক্লোজ হবার আগে যদি না আসে—টিকিটটা ছিঁড়ে ফেলে দেবেন।" বলে বরদা ছুটল সিঁড়ি ভাঙতে, লিফ্‌ট নিল না।

ইন্টারভ্যাল চলছিল। আবার ঘর অন্ধকার হল। গোটা দশেক স্লাইড। পরের ছবির ট্রেলার। তারপর ছবি শুরু হল।

প্রথম থেকেই আঁতকে উঠতে হয়। টাইটেলের মধ্যেই তিন-চারটে মৃত্যু, সবই দুর্ঘটনার মতন, স্বামী-স্ত্রী যাচ্ছে বেড়াতে, হঠাৎ গাড়ি উলটে আগুন ধরে গেল; বিশাল বাড়ির ছাদের কার্নিশে উঠে কাজ করছে একটা লোক, কোমরে প্রোটেকশান বেল্ট, হঠাৎ ঝোড়ো বাতাস এসে লোকটাকে ছুড়ে ফেলে দিল। কে একজন জলে সাঁতার কাটছিল—আচমকা তার পা ধরে জলের তলায় কে যেন টেনে নিয়ে যেতে লাগল। জলে ডুবে মরল লোকটা। শেষে দেখা গেল, কোথায় যেন এক প্রাসাদতুল্য বাড়ির বাগান, বাগানের মধ্যে মস্ত কাচের ঘর, নানা ধরনের উদ্ভিদ, লতাপাতা, ফুল। কাচের ঘরে বসে একটি মেয়ে ছবি আঁকছে, হঠাৎ কোথাও কিছু নেই; মাথার ওপরকার কাচের চাল ভেঙে পড়ল ঝনঝন করে। তারপর দেখা গেল, কেমন কিম্ভূত এক ছায়া যেন মাঠঘাট রাস্তার ওপর দিয়ে উড়ন্ত ধুলোর ঝাপটার মতন দূরে পালিয়ে যাচ্ছে।

বরদা রীতিমতো ডুবে গিয়েছিল ভৌতিক ক্রিয়াকলাপে। রোমাঞ্চ অনুভব করতে শুরু করেছিল। হঠাৎ অন্ধকারে নজরে পড়ল, তার পাশের সিটে কে যেন এসে বসেছে।

মানিক?

মানিক মনে করে বরদা কিছু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল হঠাৎ। না, মানিক নয়।

মানিকের ধারে-কাছেও যায় না লোকটা। দশাসই চেহারা মানিকের, এর চেহারা বেঁটেখাটো, রোগা-রোগা। অন্ধকারে কিছুই তো বোঝা যায় না। তবু আলো যখন খানিকটা স্পষ্ট হচ্ছে বরদা পাশের লোকটিকে লক্ষ করছিল। লোকটা এই সিটে এসে বসল কেন? এটা তো মানিকের সিট। বরদা টিকিট কেটেছে। তা হলে কি টিকিটটা কাউন্টার থেকে সেই ভদ্রলোক বেচে দিলেন নাকি? পয়সাটা পকেটে পুরলেন? কাণ্ড দেখেছ?

বরদা ছবি দেখতে লাগল। সামান্য মন খুঁতখুঁত করলেও কিছু বলা যাচ্ছে না লোকটাকে। সে যদি বলে, আমি টিকিট কিনে এসেছি, তা হলে বরদা কী বলবে! বা এমনও হতে পারে, বরদার বাঁদিকের সিটটা মানিকের। ডান দিকের সিটের নম্বর ওরই। বরদা তো সিটের নম্বর দেখে বসেনি, নম্বরটাও জানে না। আটটা সিট ছেড়ে বসতে বলেছিল, টর্চ দিয়ে সিট দেখিয়ে দিয়েছিল হাউসের লোক, বরদা যথারীতি এসে ঝপ করে বসে গেছে।

বরদারই ভুল হয়তো। ছবি দেখতে লাগল একমনে।

বেশ জমে উঠেছে ছবিটা। ব্রিলিয়ান্ট ফটোগ্রাফি। সেইরকম ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। সত্যিই রহস্য ধরিয়ে দিচ্ছে।

আড়চোখে লোকটার দিকে তাকাতেই বরদা দেখল, লোকটা এবারে একেবারে সিটের মধ্যে ডুবে গেছে। মানে, তার ঘাড় পিঠ সব নরম সিটের মধ্যে ডোবানো, মাথাও যেন দেখা যাচ্ছে না, বরং মাথাটা বুকের দিকে হেলে পড়েছে।

লোকটা হলে ঢুকে ঘুমোতে শুরু করল নাকি?

বরদা বিরক্ত বোধ করল। তার পাশের সিটে বসে একটা লোক ঘুমোবে—এ তার বরদাস্ত হচ্ছিল না। লোকটা হয়তো বরদারই পয়সায় কেনা টিকিট কাউন্টার থেকে হাতিয়ে এনে হলে ঢুকে ঘুমোচ্ছে। বাড়িতে কি ঘুমোবার জায়গা নেই? আশ্চর্য!

মুখ ফিরিয়ে বরদা আবার ছবি দেখায় মন দিল। পুরনো কোনও বাড়ি, দুর্গের মতন দেখতে, বিশাল বিশাল ঘর, বিচিত্র সব আসবাব, অজস্র রকমের অস্ত্র, কোনও কিছুরই অভাব নেই, অভাব শুধু মানুষের। একটিও লোক নেই, একেবারে জনহীন পুরী। এইভাবে ঘর থেকে ঘর যেন ঘুরে বেড়াবার পর একজনকে দেখা গেল। চুপসোনো বেলুনের মতন মুখ, বিশাল লম্বা নাক, গর্তে ঢাকা চোখ। একটা বড় কফিনের পাশে বসে আছে লোকটা। কফিনের ওপর অজস্র কারুকার্য।

বরদা আবার একবার চোখ ফেরাল। পাশের সিটের লোকটা একই ভাবে চেয়ারের মধ্যে ডুবে ঘুমোচ্ছে। আশ্চর্য! আরও তো অনেক সিট ফাঁকা পড়ে আছে, বরদার ডান দিকে গোটা পাঁচেক, বাঁ দিকে কম করেও সাত-আটটা। হতভাগা মরতে তার পাশে এসে জুটল কেন? অন্য কোনও ফাঁকা সিটে ঘুম মারলেই তো পারত।

মানিকের ওপরই রাগ হচ্ছিল বরদার। মানিকের জন্যেই এই অবস্থা!

যাক গে, মরুক গে! বরদা আবার ছবিতে মন দিল।

ছবি শেষ হয়ে এল। লোকজন উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে। বরদা একবার পাশের লোকটার দিকে তাকাল। অবিকল একই ভাবে ঘুমোচ্ছে।

বেশ খানিকটা ঠাট্টা ও বিরক্তির সঙ্গে বরদা বলল, "ও মশাই, উঠুন। অনেক ঘুমিয়েছেন।"

কোনও সাড়া-শব্দ নেই।

বরদা এবার লোকটার কাঁধে ঠেলা মারল আস্তে করে। কোনও ফল হল না।

ততক্ষণে ছবি শেষ। বাতি জ্বলে উঠেছে।

বরদা আলোয় একবার লোকটার দিকে তাকাল। তারপর উঠে দাঁড়াল। এ রকম বিচিত্র মানুষ সে জীবনেও দেখেনি।

চলে যাবার সময় বরদা আবার একবার ঝুঁকে পড়ে বলল, "এই যে স্যার, উঠুন, ছবি শেষ হয়ে গেছে।"

বলতে বলতে আচমকা বরদার নজরে পড়ল, লোকটার গলার কাছে জামার বোতাম খোলা, গেঞ্জিতে কীসের যেন দাগ ঘন হয়ে রয়েছে। অনেকটা দাগ। প্রায় বুক জুড়ে। রক্তের মতন মনে হচ্ছে। জামাটারও বুকের কাছে সেই দাগ ছড়িয়ে পড়েছে।

বরদার সমস্ত শরীর নিমেষের মধ্যে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেল। পা কাঁপতে লাগল থরথর করে, মুখ একেবারে ছাই, গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফাচ্ছিল। লাফাতে-লাফাতে গলার কাছে উঠে আসছিল।

প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল বরদা। গলা বন্ধ হয়ে গেল। লোকজন সব চলে যাচ্ছে। কী করবে সে? চেঁচাবে? লোক ডাকবে? তার পাশের সিটে বসে একটা লোক মরে গেল, সে বুঝল না! নাকি এখনও বেঁচে আছে লোকটা? কেমন করে মরল? স্ট্রোক? হার্টফেল? খুন? রক্ত এল কোথা থেকে? কে তাকে খুন করবে এই হলের মধ্যে! বরদার পাশেই লোকটা বসে ছিল। একটা শব্দও করেনি।

ভয়ে আতঙ্কে এমন হল বরদার যে, সে আর লোকটার দিকে তাকাতে পারল না। বরং তার মনে হল, এই মুহূর্তে তার পালিয়ে যাওয়া উচিত। যদি না যায়, তো সে নানারকম ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়বে। থানা, পুলিশ, আরও কতরকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারে!

বরদা যেন বেহুঁশের মতন তাড়াতাড়ি এগোতে লাগল। এখনও প্যাসেজ দিয়ে লোক যাচ্ছে। ভিড় সামান্য কমেছে। দু-একজন বরদার দিকে তাকাল। হয়তো লোকটার দিকেও। ওই একটিমাত্র লোক, যে এখনও বসে আছে। চোখে পড়ারই কথা। কে আর কবে সিনেমা শেষ হয়ে যাবার পর চেয়ারে বসে বসে ঘুমোয়।

নিজেকে অন্যের নজর থেকে বাঁচাবার জন্যে বরদা মুখ নিচু করে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল, মিশে গিয়ে এর-ওর পাশ দিয়ে ঠেলাঠেলি করে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্যে ছুটল। পালাতে লাগল।

সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামার সময় বরদা বেশ বুঝতে পারল—তার পা কাঁপছে, মাথা টলছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। হয়তো সে নিজেই এবার হার্টফেল করবে। হায় ভগবান!

একেবারে নীচে লবিতে নেমে এল বরদা। কোনও খেয়াল নেই। সে পালিয়ে যাচ্ছে। না পালিয়ে তার উপায় নেই।

"বরদা?"

বরদা কিছুই শুনল না। কাচের দরজার বাইরে সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। সামনে রাস্তা।

"এই বরদা!"

বরদার তখনও হুঁশ নেই।

"কী রে? কালা হয়ে গিয়েছিস নাকি?"

বরদা তাকাল। একেবারে থতমত চোখ। যেন চিনতে পারছে না। বুঝতে পারছে না, কে ডাকছে।

বরদার কাঁধে হাত পড়তেই চমকে উঠল সে। তাকাল। বিহ্বল দৃষ্টি। "মানিক?"

"ব্যাপার কী রে? কখন থেকে তোকে ডাকছি।"

"তুই?" বরদা ঢোঁক গিলল। গলা কাঠ। ঠোঁট চাটল, জিব শুকনো। তারপর মানিকের হাত ধরে ফেলল খপ করে। কথা বলতে পারল না। ঠোঁট কাঁপতে লাগল থরথর করে।

প্রায় কেঁদে ফেলল বরদা। "মানিক, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।"

"সর্বনাশ? কীসের সর্বনাশ?"

লোকের ঠেলা খেয়ে গাড়ি-বারান্দার মতন জায়গাটায় দাঁড়াল দুজনে।

বরদা ভীত গলায় বলল, "আমার সিটের পাশে একটা লোক বসে ছিল। মারা গিয়েছে।"

"মারা গিয়েছে?"

"বোধ হয় খুন। রক্ত রয়েছে বুকের কাছে। চাপ চাপ। সমস্ত জামাটা ভিজে গেছে।"

মানিক হাঁ করে বন্ধুর মুখ দেখতে লাগল। পাগল হয়ে গিয়েছে নাকি বরদা? ভূতের ছবি দেখতে এসে ওর ঘাড়ে ভূত ভর করল? মানিক বলল, "কী পাগলের মতন কথা বলছিস? সিনেমা হলে কেউ খুন হয়?"

"হয়েছে," বরদা বলল, "হয় খুন, না হয় স্ট্রোক।"

"তোর মাথা হয়েছে।"

"লোকটা এখনও চেয়ারের মধ্যে পড়ে আছে।"

"অসম্ভব। কেউ মারা গেলে চেয়ারে বসে থাকতে পারে না। গড়িয়ে পড়ে যাবে।"

"আমি তাকে বসে থাকতে দেখেছি।"

"তুই খ্যাপামি করছিস।"

বরদা প্রাণপণে মানিকের হাত চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিল। "তুই বিশ্বাস কর।"

মানিক বিশ্বাস করতে চাইল না। একটু ভাবল। "চল, গিয়ে দেখি।"

চমকে উঠল বরদা। "দেখবি? না না।"

"বাঃ, দেখব না! সত্যি যদি কোনও লোক হলের মধ্যে মারা গিয়ে থাকে—ম্যানেজারকে বলতে হবে।"

বরদা কাঠের মতন শক্ত হয়ে গেল। "না, চল, আমরা পালিয়ে যাই।"

মানিক বন্ধুর মাথা সম্পর্কে সন্দেহ করতে লাগল। বলল, "তোর সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।—একটা লোক সিনেমা দেখতে এসে হঠাৎ হার্টফেল করতে পারে, স্ট্রোকও হতে পারে। যদি তাই হয়ে থাকে, ম্যানেজারকে জানানো উচিত।"

হঠাৎ যেন কী খেয়াল হল বরদার। বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। "তুই কখন এসেছিস? আমি কাউন্টারে তোর জন্যে টিকিট রেখে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি তোর বদলে অন্য একটা লোক এসে পাশে বসল। বসেই ঘুমোতে শুরু করল। তারপর কখন মারা গেছে।"

মানিক জিভের শব্দ করল, যেন বরদার পাগলামি আর তার সহ্য হচ্ছে না। বলল, "আমার আসতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। তুই যে হলে ঢুকে যাবি, তা জানতাম। আমি যখন এলাম, কারেন্ট কাউন্টার ক্লোজ করে দিচ্ছে। একটা টিকিট চাইলাম। দিতে চাইল না, বলল শো শুরু হয়ে গেছে। আমিও নাছোড়বান্দা। শেষে একটা টিকিট দিল। বলল, "একজন তার বন্ধুর জন্যে রেখে গেছে। তোমার পাশেই তার সিট নাম্বার। পয়সাটা তাকে দিয়ে দিয়ো।"

বরদা বোবা হয়ে গেল। "তা হলে তো আমার রেখে আসা টিকিট।"

মানিক পকেট হাতড়ে টিকিটটা বার করতে লাগল।

"আমি তোর নাম বলে এসেছিলাম।"

"আমায় নাম জিজ্ঞেস করেনি।" পকেট থেকে টিকিটের ছেঁড়া টুকরোটা বার করল মানিক। "তোর টিকিটটা বার কর।"

বরদা পকেটে হাত দিল। হাত তখনও ঠাণ্ডা। ছেঁড়া টুকরোটা পাওয়া গেল।

মানিক নম্বর মেলাল। বলল, "একই রো, পাশাপাশি নম্বর। যাব্বাবা, তা হলে তুই এক জায়গায় আর আমি অন্য জায়গায় বসলাম কেমন করে?"

বরদাও কিছু বুঝতে পারছিল না। এ কেমন করে হয়? একই রো, পাশাপাশি নম্বর, তবু দুজনে দু জায়গায় কেমন করে বসল! নিশ্চয়ই কাছাকাছি বসেনি। বসলে মানিক অন্ধকারেও তাকে খুঁজতে পারত। সিনেমা ভেঙে যাবার পরেও হলের মধ্যে মানিক তাকে দেখতে পেত।

বরদা কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "তুই কোথায় বসেছিলি?"

"একেবারে সাইড ঘেঁষে পেছন দিকে।"

"আমারটা সামনে ছিল। আশ্চর্য!"

"আমার পাশে দুজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলেমেয়ে ছিল," মানিক বলল, "আমি ছেলেটাকে টিকিটের কথা জিজ্ঞেসও করেছিলাম। সে বলল, কোনও একস্ট্রা টিকিট কাউন্টারে সে রেখে আসেনি।...তোর কথাও আমার মনে হয়েছিল। তোকে দেখতেই পেলাম না হলে।"

"তা হলে?"

মানিক নিজেও এবার ধাঁধায় পড়ে গেল। ভাবছিল। তারপর বলল, "ভুল করেছে। সিট দেখাবার সময় লোকটা ভুল করেছে। রো পড়তে ভুল করেছে। নয়তো এরকম হতে পারে না।"

বরদা চুপ। তার মুখে কথা আসছিল না।

মানিক হঠাৎ বলল, " তুই তা হলে একটু দাঁড়া। আমি খোঁজ নিয়ে আসি।"

"কীসের খোঁজ?"

"নাইট শো শুরু হয়ে আসার সময় হচ্ছে। হলের মধ্যে যদি সত্যিই কেউ মরে পড়ে থাকে, গেটকিপার এতক্ষণে নিশ্চয় জানতে পারবে।...তুই দাঁড়া, আমি আসছি।"

বরদা বাধা দিতে গেল। বারণ করল। কিন্তু মানিক তার আগেই কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেছে।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বরদা। তার মনে হচ্ছিল, পালিয়ে যায়। মানিক আরও ঝামেলা পাকাল। বিপদে পড়তে হবে। মরা লোকটাকে এতক্ষণে নিশ্চয় পাওয়া গেছে। ওপরতলায় হইচই লেগে গেছে বোধ হয়। থানায় ফোন করছে ম্যানেজার।

বরদা আর দাঁড়াতে সাহস করল না। রাস্তার দিকে গেল। হাতের ছেঁড়া টুকরোটা ফেলে দিতেই যাচ্ছিল, কী খেয়াল হওয়ায় আবার একবার নম্বরটা দেখল। এটা ফেলে দিলেই হয়। বরদা সিনেমায় এসেছিল তার প্রমাণ কী? না, সে আসেনি। কে মারা গেছে না-গেছে সে জানে না।

টিকিটটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মুখ ওঠাতেই বরদার হঠাৎ নজরে পড়ল, তার প্রায় চোখের সামনে দিয়ে ওপাশের ফুটপাথ দিয়ে সেই লোকটা হেঁটে যাচ্ছে। অবিকল সেই লোক। বেঁটে, রোগা রোগা। মুখ নিচু করে আপন মনে চলে যাচ্ছে।

বরদা একেবারে থ'। মরা মানুষ আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল নাকি? চোখের ভুল? ভৌতিক ব্যাপার?

মানিক ততক্ষণে আবার ফিরে এসেছে। বেশ খেপে গিয়েছে যেন। বলল, "তুই পাগল হয়েছিস। নির্ঘাত পাগল হয়েছিস। হলে কেউ মারা যায়নি। কেউ নেই। গেটকিপার নাইট শোয়ের লোক ঢোকাচ্ছে।"

বরদা আঙুল দিয়ে লোকটাকে দেখাল। "ওই যে, ওই লোকটা।"

মানিক প্রথমে থতমত খেয়ে গেল। তারপর বরদাকে টান মেরে ছুটতে লাগল। লোকটাকে ধরতে।

ততক্ষণে শরবতের দোকানে পেরিয়ে ডান দিকে বেঁকে গিয়েছে লোকটা। চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

মানিক ছুটতে ছুটতে বলল, "তুই ঠিক দেখেছিস?"

"ওই রকমই দেখতে।"

"চল, দেখি।"

লোকটা চৌরঙ্গির রাস্তা পেরোচ্ছিল। কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। দু পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। এভাবে কেউ রাস্তা পেরোয় না এখানে। যে কোনও সময় চাপা পড়তে পারে লোকটা।

মানিকরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

লোকটা ওপারে চলে গেছে।

রাস্তা ফাঁকা হতেই মানিকরা আবার ছুটল।

ট্রাম লাইনের গায়ে গায়ে এসে দাঁড়াল লোকটা। তাকাল। যেন দেখল ট্রাম আসছে কি না।

বরদা আর মানিক ততক্ষণে বেশ কাছাকাছি এসে পড়েছে।

লোকটা হঠাৎ পেছন দিকে তাকাল। বরদা আর মানিককে দেখতে পেল।

কোথাও কিছু নেই, তবু সেই অদ্ভুত মানুষটা হাসতে লাগল। বিকট হাসি নয়, কেমন যেন মজার হাসি, আমোদ পাবার হাসি।

বরদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মানিকও।

বরদা বা মানিক কারও মুখে কথা আসছিল না। দুজনেই বার কয়েক ঢোঁক গিলল।

লোকটিও নির্বিকার। ঠোঁটে চাপা হাসি। মজার চোখ করে দেখছে বরদাদের।

এইভাবে কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়! অস্বস্তি লাগে। শেষে মানিক গলা পরিষ্কার করার শব্দ করল। বলল, "আপনার সঙ্গে দুটো কথা রয়েছে।" বলে মানিকের খেয়াল হল, লোকটা বাঙালি না অবাঙালি কে জানে। হিন্দি বলতে হবে নাকি? মানিক মনে-মনে হিন্দি সাজাতে লাগল।

লোকটি কিন্তু স্পষ্ট বাংলায় বলল, "বলুন।"

মানিক বলল, "আপনি কি একটু আগে সিনেমা হাউস থেকে বেরিয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমরাও সিনেমায় গিয়েছিলাম।" বলে মানিক বরদার দিকে আঙুল দেখাল। "আপনি আমার এই বন্ধুটির পাশের সিটে বসেছিলেন?"

মাথা নেড়ে লোকটি বলল, "বসেছিলাম।"

মানিক এবার বরদার দিকে তাকাল। "তুই বল এবার।"

বরদা তখনও নিজেকে ভাল করে সামলে নিতে পারেনি। আমতা-আমতা করে বলল, "আপনি আমার পাশে গিয়ে বসলেন। ছবি তো দেখলেনই না, ঘাড় মুখ গুঁজে ঘুমোলেন। আমি ভেবেছিলাম আপনি ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু ছবি শেষ হবার পর দেখলাম—আপনার বুকের কাছে রক্তের দাগ। আমি ভেবেছিলাম আপনি খুন হয়েছেন কিংবা মারা গেছেন। ভয় পেয়ে আমি পালিয়ে এলাম। পরে দেখছি আপনি দিব্যি বেঁচে আছেন।"

এবার লোকটি একটু জোরেই হেসে উঠল। বলল, "আচ্ছা, এই ব্যাপার!" এমন ভাবে বলল যেন ঘটনাটা তার কাছে কিছু নয়।

মানিক অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, "আমার বন্ধুকে আপনি অকারণ ভয় দেখালেন কেন? আপনার মতলবটা কী?"

লোকটা যেন আরও মজা পেয়ে গেল। বলল, "কেউ ভয় পেলে আমি কী করব! যদি বলি, আপনাকে দেখে আমারও ভয় লাগছে। পুলিশের লোক মনে হচ্ছে।"

তামাশা করছে লোকটা। বরদা অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "বাঃ, আপনি মড়ার মতন

চেয়ারে ঘাড় মুখ হেঁট করে বসে থাকবেন, আপনার জামায় রক্ত লেগে থাকবে, আর আমি ভয় পাব না?"

আবার ট্রাম আসছে। ভবানীপুরের দিকে যাবে। সামান্য আগে ওপাশের লাইন দিয়ে এসপ্লানেডের ট্রাম চলে গেছে। চৌরঙ্গি ধরে বাস, মিনিবাস, প্রাইভেট গাড়ি ছোটাছুটি করছিল।

মানিক বলল, "আপনি বড় অদ্ভুত! এমন একটা কাণ্ড করলেন যাতে লোকে ভয় পায়। এখন আবার বলছেন, লোকে ভয় পেলে আপনি কী করবেন। আপনি কি ভেলকিবাজি দেখিয়ে বেড়ান?"

লোকটি এবার আর হাসল না। মানিকের দিকে তাকিয়ে থাকল দু-চার মুহূর্ত। তারপর বলল, "আমি ওই ট্রামটায় উঠব। ইচ্ছে করলে আপনারা আমার সঙ্গে আসতে পারেন।" বলে একটু থেমে কী মনে করে আবার বলল, "আজ রাত হয়ে গেছে। যদি কাল যেতে চান—আসতে পারেন। আমার ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি। কথাবার্তা বলতে চান, বাড়িতে বসে বলা যাবে। কোনও ভয় নেই। আসবেন। অনেক ভেলকি দেখতে পাবেন।"

মানিক ভাবছিল, লোকটাকে ট্রামে উঠতে দেবে না। ধরে ফেলবে। আটকে রাখবে।

নিজের পকেট থেকেই লোকটি এক টুকরো কাগজ, কোনও রসিদ-টসিদের টুকরো বার করল, ডট পেন। হাতের তালুতে কাগজ রেখে ঠিকানা লিখল। লিখে বরদার দিকে এগিয়ে দিল। "আসবেন কাল। কোনও ভয় নেই। খারাপ লাগবে না।"

ট্রাম কাছাকাছি এসে পড়েছিল।

মানিক তখনও ভাবছে, লোকটাকে শেষ মুহূর্তে হাত ধরে টেনে রাখবে, যেতে দেবে না।

ট্রাম এল। হাত দেখাল লোকটি। দাঁড়াল ট্রাম।

মানিক হাত বাড়াল, ওকে যেতে দেবে না, হাত টেনে ধরবে।

লোকটার হাত ধরে ফেলেছিল মানিক। ধরামাত্র তার যে ঠিক কী হল বুঝল না, ইলেকট্রিক শক লাগার মতন আঙুল থেকে কাঁধ পর্যন্ত ঝিনঝিনিয়ে উঠল। অবশ হয়ে গেল হাত।

ততক্ষণে লোকটা ট্রামে গিয়ে উঠে পড়েছে।

মানিক তখনও হাত ঝাড়ছে, বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের বাহুমূল টিপছে। ট্রাম ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেল।

বরদা কিছু বুঝতে পারেনি। মানিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে, কী হল?"

মানিক চোখমুখ কুঁচকে বলল, "হাতটা ভেঙেই দিয়েছে রে! সাংঘাতিক জোর ভাই! কোন প্যাঁচ মারল কে জানে! বেটা জুডো প্লেয়ার।"

হাত সামলাতে সামলাতে হাঁটতে লাগল মানিক। বরদাও।

"চল, একটু চা খাই," বরদা বলল, "আমার গলা শুকিয়ে গেছে।"

চায়ের দোকানে এসে বসল দু বন্ধু।

বরদা ঠিকানা-লেখা কাগজটা বার করল। আলোয় রেখে দেখল। বলল, "লোকটার নাম সিদ্ধেশ্বর ভৌমিক; সদর স্ট্রিটের ঠিকানা।" বলে কাগজের টুকরোটা মানিকের দিকে এগিয়ে দিল।

মানিক নাম-ঠিকানা দেখতে দেখতে বলল, "যাবি?"

বরদা ভাবছিল। "বুঝতে পারছি না।"

"আমার রাগ হচ্ছে। লোকটা আমায় জব্দ করে গেল।"

"তোর চেয়েও আমি বেশি জব্দ হয়েছি। আমি কিছুই করিনি, তবু লোকটা আমায় নার্ভাস করে দিয়েছিল।"

"ওর মতলব কী?"

"ভগবান জানেন।"

"তা হলে চল, কাল যাই।"

বরদা দু হাতে মাথার চুল সামলাতে সামলাতে বলল, "আবার কোন ভেলকি দেখাবে কে জানে!"

মানিক বলল, "দেখালে দেখব। বিনি পয়সায় ম্যাজিক।"

"এসব লোক ভাল নাও হতে পারে।"

"মন্দ যদি হয় তবে এদের সত্যিই পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত। চল, যাই, কালকেই।"

পরের দিন বিকেলে বরদা আর মানিক সদর স্ট্রিটে গিয়ে হাজির। কলকাতার এই সব পাড়ার চেহারাটাই যেন কেমন, চালতাবাগান বাদুড়বাগান ইত্যাদি পাড়ার সঙ্গে মিল খায় না। সেকেলে বড়-বড় বাড়ি, ভাঙা রেলিং, কোথাও-কোথাও ভাঙা বাড়ির স্তূপ, বড়-বড় গাছ এদিককার চেহারা অন্য রকম করে রেখেছে। রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা।

সিদ্ধেশ্বর ভৌমিকের আস্তানা খুঁজে বার করতে একটু কষ্টই হল। পুরনো একটা বাড়ি ভাঙা চলছে। ইট-কাঠের স্তূপ জমেছে পাহাড়প্রমাণ। তারই গায়ে-গায়ে পাঁচিল ঘেরা একটা ছোট বাড়ি। ভাঙাচোরা ফটক খোলাই পড়ে আছে।

বরদারা ভেতরে ঢুকে চার পাশে তাকাল। আগাছার জঙ্গল চারদিকে, দু-চারটে মামুলি গাছও রয়েছে। নিম, জাম। একদিকে বুঝি আস্তাবল ছিল আগে, এখন মস্ত একটা উনুন চোখে পড়ে। বোধ হয় ধোপাখানা হয়েছিল।

বাড়ির এটা পেছন দিক কি না বোঝা গেল না। আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে ঘুরে আসতেই বোঝা গেল বাড়িটা দেড়তলা গোছের। সামনের দিকটা দেখতে খারাপ লাগে না। পাতাবাহারের গাছ। দু- চারটে লতা উঠেছে থাম বেয়ে, কিছু বাগান-সাজানো গাছ নিজের খেয়ালে বেড়ে উঠেছে।

লোকজন চোখে পড়ছিল না। কোথায় সিদ্ধেশ্বর?

ডান দিকে কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির মাথায় টালি দেওয়া। দেড়পাক ঘুরে ওপরে উঠেছে। বাড়িটার সামনের দিকটাই তা হলে দেড় বা দু তলা। পেছনটা একতলা।

মানিক বলল, "লোক কই রে?"

বরদাও অবাক হচ্ছিল। বাইরে একটা লোক নেই কেন? কোথায় গেল সব?

কাঠের সিঁড়ির দিকে এগোতে-এগোতে মানিক বলল, "এটা যদি ভুতুড়ে বাড়ি হয়, কী করবি?"

"ভুতুড়ে বাড়ি?"

"ধর, কালকের সিনেমার মতন হল। একটাও লোক নেই, জন নেই, আমরা এ ঘর ও ঘর ঘুরে যখন শেষ ঘরটায় গিয়ে পৌঁছলাম, দেখলাম বিরাট এক খাটের ওপর চাদরচাপা সিদ্ধেশ্বরের মৃতদেহ পড়ে আছে। তখন?" বলে মানিক ঠাট্টা করে হাসল।

বরদা বলল, "কালকের সিনেমায় কফিনের পাশে একটা গালতোবড়ানো নেড়া-মাথা লোক বসে ছিল। এখানেও একটা লোক নিশ্চয় থাকবে।"

"যদি না থাকে?"

"পালাব। কেটে পড়ব সেরেফ।...একটা হাঁক দে না?"

সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল মানিক। পাশে বরদা। সিঁড়িতে উঠবে কি না ভাবছিল।

এমন সময় পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। নীচেই কোথাও যেন ছিলেন সিদ্ধেশ্বর। সাড়া দিলেন।

বরদারা চমকে উঠেছিল।

এগিয়ে এলেন সিদ্ধেশ্বর। পরনে পাজামা, গায়ে একটা আলখাল্লা মতন। হাতে রবারের গ্লাভ্স। গ্লাভ্স খুলতে খুলতে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আসুন—আসুন। আপনাদের আসতে দেখেছি। একটা কাজ সারছিলাম। আসুন।"

সিদ্ধেশ্বর বেশ খাতির করে বরদাদের ডেকে নিলেন।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলার বারান্দায় এসে হাঁক দিলেন সিদ্ধেশ্বর। একটু পরেই ঢ্যাঙা চেহারার একজন বেরিয়ে এল ভেতরের ঘর থেকে।

চেয়ার-টেয়ার পেতে দিতে বললেন সিদ্ধেশ্বর।

বরদা আর মানিক এ-পাশ ও-পাশ দেখছিল। টানা বারান্দা। বারান্দার গা-লাগিয়ে পর পর তিনটি ঘর, পাশাপাশি। আগের দিনের রেওয়াজ মতন খড়খড়ি দেওয়া দরজার ও-পাশে কাচের ভাঁজ করা দ্বিতীয় দফার দরজা। পরদা ঝুলছিল।

বারান্দায় বিশেষ কিছু নেই। দু-চারটে ফুলের টব, পাখির শূন্য খাঁচা। সাদামাটা একটা বেঞ্চি। পুরনো একটা মোটরবাইকও চাকা খোলা হয়ে পড়ে আছে।

চেয়ার এল।

"বসুন", সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনারা বসুন, আমি ভেতর থেকে আসছি একবার।"

বরদারা বসল।

বিকেল পড়ে গিয়েছে। ঝাপসা হয়ে আসছিল। আর-একটু পরেই অন্ধকার নামবে। এরকম এক চুপচাপ, নিঝুম বাড়িতে এসে কেমন যেন লাগছিল বরদার। ভয় না উদ্বেগ, সে বুঝতে পারল না।

মানিক আজ খুব তক্কে-তক্কে আছে। সমস্ত কিছু নজর করছে। কাল সে বড় বোকা বনে গিয়েছিল। সিদ্ধেশ্বরকে লক্ষ রাখছে।

মানিক বলল, "কেমন মনে হচ্ছে রে?"

"বুঝতে পারছি না।"

"সিদ্ধেশ্বর খুব ভদ্রতা করছে।"

"তুই ওর ওপর চটে রয়েছিস?" বরদা হাসবার চেষ্টা করল। "আর চটিস না।"

সিদ্ধেশ্বর ফিরে এলেন, বসলেন। বললেন, "আগে চা খান।"

বরদা বলল, "আপনি এখানে একা থাকেন?"

"না। আমি এখানে থাকি না। মাঝে-মাঝে আসি।"

বরদা অবাক হল। "কে থাকে এখানে?"

"থাকে দু-একজন। আমাদেরই লোক।"

মানিক বলল, "আপনি কোথায় থাকেন?"

"আমাদের থাকার অন্য জায়গা রয়েছে, কলকাতায় নয়। কাজকর্ম করার সেন্টার আছে। সেখানে।"

"কীসের সেন্টার?"

"মুখে বললে আপনারা বুঝবেন না।" নরম করে হাসলেন সিদ্ধেশ্বর। সামান্য থেমে আবার বললেন, "মানুষের নানারকম লুকোনো শক্তি থাকে। সকলের নয়। কারও-কারও। কেউ কেউ আবার আচমকা একটা শক্তি পায়, আবার হারিয়ে ফেলে। আমরা মানুষের এই অবিশ্বাস্য, কিংবা বলতে পারেন অলৌকিক শক্তি নিয়ে হাতে কলমে পরীক্ষা করি। কেন এমন হয়? কী তার কারণ?"

"তার মানে ভুতুড়ে গবেষণা করেন?" মানিক বলল।

"তাও বলতে পারেন।"

এমন সময় ঢ্যাঙা চেহারার লোকটি চা নিয়ে এল। চা আর নোনতা বিস্কিট, কয়েকটা প্যাস্ট্রি।

লোকটা চলে যাচ্ছিল। সিদ্ধেশ্বর তাকে দাঁড়াতে বললেন। বলে বরদাদের দিকে তাকালেন। বললেন, "ওর নাম কেষ্টপদ মণ্ডল। ক্রিশ্চান। আমাদের কাছে আট-দশ বছর রয়েছে। কেষ্টপদ দু-একটা জিনিস পারে যা অন্যে পারে না। দেখবেন?"

মানিক বরদা কৌতূহল বোধ করল। বলল, "দেখি।"

সিদ্ধেশ্বর কেষ্টপদকে বললেন, "মণ্ডল, ওই পাখির খাঁচাটাকে তুমি ছোঁবে না। না ছুঁয়ে দুলিয়ে দাও।"

মানিক বরদার দিকে তাকাল। বরদা মানিকের দিকে। তারপর দুজনেই কেমন অবাক হয়ে কেষ্টপদর দিকে তাকাল।

কেষ্টপদ ধীরে-ধীরে পাখির খাঁচাটার কাছে গেল, গিয়ে হাত খানেক তফাতে দাঁড়াল।

মানিক বরদা তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিল।

মাথা সোজা করে খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল কেষ্টপদ। খাঁচাটা স্থির। কেষ্টপদও স্থির।

সময় বয়ে যাচ্ছিল। অন্ধকারও হয়ে এল ধীরে-ধীরে।

হঠাৎ যেন খাঁচাটা নড়ে উঠল। কেষ্টপদ আরও একটু পিছিয়ে এল। নড়তে লাগল খাঁচাটা। দুলতে লাগল। দুলতে দুলতে জোর হল। যেন ঝোড়ো বাতাসে খাঁচাটা দুলছে।

বরদা স্তম্ভিত। মানিক কাঠ হয়ে গেল।

যেন কোনও ভৌতিক শক্তিতে অদ্ভুতভাবে দুলছিল খাঁচাটা—অথচ বারান্দার কোথাও কোনও ঝোড়ো বাতাস নেই।

সদর স্ট্রিটের বাড়ি থেকে উঠতে উঠতে রাত হল। সিদ্ধেশ্বর বললেন, "চলুন, এগিয়ে দিয়ে আসি আপনাদের। এই রাস্তাটা ভাল নয়।"

যা ভাবা গিয়েছিল তা নয়; সিদ্ধেশ্বর কোনও ভেলকিঅলা নন, তুচ্ছ বা অবজ্ঞা করার মতন মানুষ নন। ভদ্র, মার্জিত, বুদ্ধিমান মানুষ। কথা বলতে পারেন চমৎকার। তাঁর কথা শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যেতে হয়, ভালও লাগে। অনেক গল্প করলেন তিনি। নিজের জীবনের কথাও বললেন সামান্য। কলকাতায় জন্ম, বাবা ছিলেন রেলের এঞ্জিনিয়ার, ছেলেবেলায় বিস্তর ঘুরেছেন বাবার সঙ্গে, বদলির চাকরি ছিল বাবার। মা একেবারে মাটির মানুষ। ধর্মকর্মে মায়ের বাতিক ছিল খুব। গোরখপুরে থাকার সময় এক সাধুজি মায়ের কাছে খুব আসতেন, তিনি ছিলেন সূর্যপূজারি। সিদ্ধেশ্বর ছেলেবেলায় দেখেছেন, সাধুজি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কখনও কোনও ছায়ার তলায় দাঁড়াতেন না, অন্নজল গ্রহণ করতেন না, সারাক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মেঘ-বাদলের দিনেও তাঁকে ঘরে ঢোকানো যেত না। এই সাধুজি বড় অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। সাধকপুরুষ। তিনি এমন অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেতেন আচমকা, যা কোনও মানুষই দেখতে পায় না। সাধুজি বাবাকে বলেছিলেন, বাবা ব্রিজ তৈরির কাজ করতে গিয়ে রেল অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবেন। বাবা সেইভাবেই মারা যান।

সাধুজি নিজের এই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিকে বলতেন অভিশাপ। কেমন করে এটা তাঁর মধ্যে এসেছিল জানেন না। এই জ্ঞান তাঁকে যন্ত্রণা দিত। তিনি নিজে গঙ্গায় ডুবে মারা যান। বোধ হয় আত্মহত্যা করেছিলেন।

সিদ্ধেশ্বর বাবার মতন এঞ্জিনিয়ার না হয়ে ডাক্তার হবার শখ নিয়ে মেডিক্যাল পড়তে ঢোকেন। বছর তিন-চার পড়ার পর ছেড়ে দেন। তারপর টোটো করে বেড়িয়েছেন নানা জায়গায়, ছোটখাটো কাজকর্মও করেছেন। শেষে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল নৈনিতাল বেড়াতে গিয়ে। তিনি মানুষের অস্বাভাবিক মানসিক ও শারীরিক শক্তি নিয়ে গবেষণা করছেন অনেক দিন ধরে। সেই ভদ্রলোকই পরে সিদ্ধেশ্বরকে নিজের কাছে টেনে আনলেন। তখন থেকেই সিদ্ধেশ্বর তাঁর সঙ্গে। ভদ্রলোকের বয়েস হয়ে গেছে অনেক, সিদ্ধেশ্বরকেই হাজার রকম জিনিস দেখাশোনা করতে হয়।

বরদা জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের সেই জায়গাটা কোথায়?"

সিদ্ধেশ্বর জায়গার নাম বললেন। বরদা জীবনেও নাম শোনেনি অমন জায়গার। বলল, "কোথায় সেটা?"

"দুমকার কাছেই। মাইল কয়েক দূর।"

"কী নাম?"

"পি পি রিসার্চ সেন্টার।"

"মানে?"

"প্যারাসাইকিক ফেনামেনন রিসার্চ সেন্টার। নামটায় সব বোঝায় না, তবু ওই নামই রয়েছে।"

মানিক অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল। বলল, "আপনি সিনেমাহাউসে বসে যে ভেলকি দেখালেন, আপনাদের কেষ্টপদ যে কাণ্ডটা দেখাল—এ সবই কি ওই পি পি?" বলে মজা করার মুখে হাসল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "খানিকটা তাই।...এসব আপনাদের বিশ্বাস করার কথা নয়। একসময়ে আমিও করতে পারতাম না। আজকাল পারি। আমরা সকলেই যে যার মতন একটা ছোটখাটো জগৎ নিয়ে বাস করি। বড় জগৎ অন্য রকম। সেখানে কত কী আশ্চর্য আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে যায় আমরা জানি না। বুঝি না। অবিশ্বাস করি। অবিশ্বাস করতে পারলে কথা থাকে না, কিন্তু কেউ যদি অবিশ্বাস না করে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে তবে কী হয়।"

বরদা মাথা নাড়ল। ঠিক কথা। বলল, "সেদিন একটা বিদেশি কাগজে একজনের কথা পড়ছিলাম; ছবিও দেখছিলাম। লোকটার নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা; কাঁটা, চামচ, ছুরি বেঁকিয়ে দিতে পারে শুধু চোখের দৃষ্টিতে।"

মানিকেরও যেন মনে পড়ল, এরকম একটা খবর সে কাগজে পড়েছে। বলল, "আমিও পড়েছি কোথাও। কাগজের খবর বলে বিশ্বাস করিনি।"

"কেন?" বরদা বলল।

"কাগজে কত গালগল্প বেরোয়; কে আর বিশ্বাস করে।"

সিদ্ধেশ্বর কিছু বললেন না। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার শেষে এসে পড়েছিল বরদারা।

বরদা হঠাৎ বলল, "আচ্ছা, আমরা যদি আপনাদের ওখানে যাই—আমাদের নিয়ে যাবেন? দেখতে দেবেন?"

কথার জবাব না দিয়ে সিদ্ধেশ্বর চৌরঙ্গি রোডের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কিছু ভাবছিলেন। তারপর খুবই আচমকা মানিককে জিজ্ঞেস করলেন, "ক'টা বাজল?"

মানিক ঘড়ি দেখল হাতের; সময় বলল।

সিদ্ধেশ্বর বরদার দিকে তাকালেন। "আপনাদের দেরি হয়ে গেল। আমারও কাজ রয়েছে। আচ্ছা, আসুন তা হলে," বলে সিদ্ধেশ্বর হাত তুললেন বিদায় জানাবার ভঙ্গি করে।

বরদা বলল, "আপনি আমাদের নিয়ে যেতে চান না?"

"কোথায়?"

"আপনাদের ওখানে?"

" চাই বই কী! যেতে চাইলেই যেতে পারবেন।" সিদ্ধেশ্বর আবার হাত তুলে হাসলেন। "আমি আর দাঁড়াব না, যাই।"

চলে গেলেন সিদ্ধেশ্বর।

বরদা আর মানিক সামান্য দাঁড়িয়ে থেকে হাঁটতে লাগল।

মানিক বলল, "তুই চট করে যাবার কথা বলতে গেলি কেন?"

বরদা বলল, "বললাম।"

"বললাম! মুখে এল আর বলে ফেললি?"

"কেন, বললে ক্ষতি কীসের?"

"যাবি তুই?"

"যেতে ইচ্ছে করছে। মানে, একবার গিয়ে দেখে এলে হয়।"

"এমন করে বলছিস যেন জায়গাটা বালিগঞ্জ কি বেহালা; ঝট করে গিয়ে দেখে আসা যায়।"

বরদা হাঁটতে হাঁটতে বলল, "তুই যাই বল, ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং।"

"গাঁজাখুরিও হতে পারে।"

"মানে?"

"যদি গিয়ে দেখিস সব বাজে, ধোঁকা..."

"কাল আমি সিনেমা হাউসে যা দেখেছিলাম সেটা ধোঁকা হতে পারে—আমার চোখের ভুলও হতে পারে। কিন্তু আজ কেষ্টপদ যা দেখাল, তুই নিজের চোখে দেখলি। অত বড় একটা পাখির খাঁচা কেউ ফুঁ দিয়ে কিংবা জোরে জোরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে দোলাতে পারে?"

মানিক মাথা নাড়ল। বলল, "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কোনও কায়দা আছে—আমরা যা ধরতে পারিনি।"

বরদা বলল, "কোনও কায়দা ছিল না।"

"তুই কেমন করে জানলি?"

কথার জবাব দিল না বরদা।

আরও একটু এগিয়ে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল বরদা। হাত বাড়িয়ে দাঁড় করাল। বলল, "চল, একটু ট্যাক্সি চড়া যাক।"

মানিকের ইচ্ছে ছিল না ট্যাক্সি চড়ার, অকারণ পয়সা খরচ। বরদা বরাবরই বেহিসেবি। বাড়ির অবস্থা ভাল। অভাব-টভাব তো বুঝল না কোনওদিন। মানিক এভাবে পয়সা ওড়াতে পারে না। ক্ষমতাও নেই তার।

ট্যাক্সিতে উঠে বরদা ড্রাইভারকে শ্যামবাজারের দিকে যেতে বলল। বলে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। "নে।"

সিগারেট ধরাল দুজনে। মানিক হাই তুলল বড় করে।

"সিদ্ধেশ্বরকে তোর ভাল লাগেনি?" বরদা জিজ্ঞেস করল বন্ধুকে।

মানিক চট করে জবাব দিল না। ভাবছিল। বলল, "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"সিদ্ধেশ্বরকে? কেন?"

"কেন তা বলতে পারব না। মনে হচ্ছে, ভদ্রলোকের কোনও মতলব রয়েছে।"

"মতলব?"

"অভিসন্ধি।"

"কীসের অভিসন্ধি?"

"সেটাই বুঝতে পারছি না। এত লোক থাকতে তোকে ওই ভেলকি দেখাবার কী ছিল কাল? আজকেই বা কেন—"

মানিককে কথা শেষ করতে না দিয়ে বরদা বলল, "তুই এখনও চটে রয়েছিস সিদ্ধেশ্বরবাবুর ওপর।"

"চটে নেই। আমার ভাল লাগছে না।...সিদ্ধেশ্বরের মোটিভ কী?"

"আমার কিন্তু ভালই লেগেছে ভদ্রলোককে।"

"বুঝতে পারছি। তোকে এরই মধ্যে বশ করে ফেলেছেন সিদ্ধেশ্বর।" বলে মানিক সামান্য ঠাট্টা করে হাসল। আবার হাই তুলল। বলল, "বড় ঘুম-ঘুম পাচ্ছে রে!"

দেখতে দেখতে ট্যাক্সিটা মেট্রো সিনেমার কাছাকাছি এসে গেল। সামান্য ভিড় এখানটায়। ট্রাফিক লাইটের জন্যে কিছু বাস-টাস, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ট্যাক্সি থামল।

গাড়িটা আবার চলতে শুরু করলে বরদা বলল, "আমার এখন ঢালা ছুটি। চল না, দিন কতক বেড়িয়ে আসি।"

"কোথায়? সিদ্ধেশ্বরদের রিসার্চ সেন্টার থেকে?"

"দুমকা-টুমকা ভাল জায়গা শুনেছি।"

"তুই যা। আমার উপায় নেই। আমি পরের গোলামি করি।"

"ছুটি নে।"

"ছুটি?"

সেন্ট্রাল অ্যাভিনু দিয়ে যেতে যেতে আচমকা বাঁ দিক করে ট্যাক্সি থেমে গেল। নেমে পড়ল ড্রাইভার। বনেট খুলল। খুটখাট করল একটু। ফিরে এসে আবার গাড়ি স্টার্ট দিল।

মানিক জিজ্ঞেস করল, "ঠিক আছে?"

মাথা হেলিয়ে ড্রাইভার বলল, ঠিক আছে।

বরদা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল। কলকাতা বড় অদ্ভুত শহর। এত বড় রাস্তার এই দিকটা এখন কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঝাপসা দেখাচ্ছে। সারাদিন পরে যেন রাস্তাটাও ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।

মানিক নামবে বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে; বরদা যাবে গ্রে স্ট্রিট। ট্যাক্সিটাকে ডান দিকে নিতে বলল বরদা। কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ধরে যাবে, পথে মানিককে নামিয়ে দেবে।

বাড়ি ফিরে বরদা নিজের ঘরে চলে গেল। তার ঘর তেতলায়। পুরনো আমলের বাড়ি, দেখতে অনেকটা মেসবাড়ির মতন মনে হয় ভেতরটা। লোকজনও কম নয় বাড়িতে। বরদা অনেক দিন আগেই তেতলায় উঠে গেছে। ছাদটাদ রয়েছে তেতলায়। অনেক ফাঁকা। আলো বাতাস পাওয়া যায়।

ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালল বরদা। জামা-প্যান্ট বদলাবে। পকেট থেকে পয়সাকড়ি, সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, রুমাল, বার করার সময় তার হাতে ভাঁজ করা কাগজ উঠে এল।

কী ব্যাপার?

কাগজটা খুলল বরদা। খুলে অবাক হয়ে গেল। তার বিশ্বাস হল না। ভাল করে দেখল।

সিদ্ধেশ্বর এই কাগজের টুকরোটা কখন যেন পকেটের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন, কিংবা গুঁজে দিয়েছেন, বরদা বুঝতেই পারেনি।

আলোয় মেলে ধরে লেখাটা পড়ল বরদা।

"আমি পরশুদিন—বুধবার ফিরে যাচ্ছি। আপনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আপনার বন্ধু মানিকবাবু নিজেকে যতটা চালাক মনে করেন ততটা চালাক তিনি নন। তিনি ইচ্ছে করলে আপনার সঙ্গে আসতে পারেন। না এলেও কোনও ক্ষতি নেই। আপনার সব দায়িত্ব আমার। কোনও ভয় নেই। আপনার কোনও ক্ষতি হবে না। আমি জানি, আপনি যাবেন। আগামী কাল বিকেলে আপনি একবার নিউ মার্কেটের সামনে আসবেন। পাঁচটা নাগাদ। কথা হবে। যদি না আসেন, বুঝব আপনি যেতে অনিচ্ছুক।"

বরদা বার কয়েক চিঠিটা পড়ল।

কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রেখে দেবার সময় হঠাৎ তার মনে হল, সিদ্ধেশ্বর যেন পেছনে কাঁধের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। শিউরে উঠে ঘাড় ঘোরাল বরদা—কেউ নেই।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছিল। কে যেন আসছে।

ছোট ভাই সারদা এল ছুটতে ছুটতে। "দাদা, শিগগির এসো। মানিকদা তোমায় ফোন করছে। মানিকদার কী যেন হয়েছে।"

বরদা আঁতকে উঠল। ফোন ধরতে ছুটল নীচে।

ফোন ধরে বরদা বলল, "হ্যালো—মানিক—মানিক?"

ওপাশ থেকে কার যেন গলা পাওয়া গেল, ভাঙা গলা, সামান্য জড়ানো। মানিকের গলা বলে মনে হয় না।

জড়ানো, ভাঙা-ভাঙা গলায় মানিক বলল, "বরদা, বাড়ি ফিরে আসার পর আমার চোখে কী যেন হয়ে গেছে। ভাল করে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সব ঝাপসা দেখাচ্ছে। সিদ্ধেশ্বর আমাদের কিছু খাইয়ে দিয়েছে চায়ের সঙ্গে। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে চোখে। ঘুম পাচ্ছে।"

বরদার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। বলল, "কী বলছিস তুই! আমি তো চোখে দেখতে পাচ্ছি।"

"আমি ঝাপসা দেখছি।"

"ডাক্তারের কাছে যা।"

"ডাক্তারখানা থেকেই ফোন করছি।"

বরদা কোনও কথা খুঁজে পেল না। মানিক, বরদা, সিদ্ধেশ্বর—একই সঙ্গে চা

খেয়েছে। মানিককে কিছু খাইয়ে দেবার সুযোগ তো সিদ্ধেশ্বরের ছিল না। তবে?

"আমি কি তোর বাড়িতে আসব?"

"কাল সকালে আসিস। আজ এসে কী করবি।"

"তোকে কিছু খাওয়াবে কী করে? আমরা একই সঙ্গে চা খেয়েছি।"

"জানি না। সিদ্ধেশ্বর সবই পারে। আমার চোখ যদি কাল সকালে ঠিক না হয়ে যায়, আমি ওকে দেখে নেব।"

বরদা ফোন হাতে দাঁড়িয়ে থাকল। কথা বলতে পারল না।

নিউ মার্কেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বরদার পা ধরে গেল। সিদ্ধেশ্বরের দেখা নেই। আজ সে একলা। মানিক নেই। আসতে পারবে না মানিক। তা ছাড়া, সিদ্ধেশ্বর বরদার সঙ্গেই দেখা করতে চেয়েছেন, মানিকের সঙ্গে নয়।

অপেক্ষা করতে করতে বরদা যখন বিরক্ত বোধ করছে, সিদ্ধেশ্বর হাজির হলেন।

বরদা বলল, "আমি ভাবছিলাম আপনি বোধ হয় আজকের কথা ভুলেই গেলেন।" ঠাট্টার গলাতেই বলল বরদা, সামান্য বিরক্তিও রয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমি একটা কাজে আটকা পড়েছিলাম। কতক্ষণ এসেছেন আপনি?"

"পাঁচটার আগেই।"

"একটু দেরি হয়ে গেল...। চলুন আমরা বসি। আপনাকে আর দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না।"

পা বাড়াল বরদা। "কোথায় বসবেন?"

"আসুন। বসার জায়গা রয়েছে।"

বরদা সিদ্ধেশ্বরের পাশে-পাশে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, "আপনি মানিককে কাল কি কিছু খাইয়ে দিয়েছিলেন?"

ঘাড় ফেরালেন সিদ্ধেশ্বর। "কেন?"

"বাড়ি ফিরে ও চোখে খুব ঝাপসা দেখছিল। ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওষুধ নিয়ে চোখে দিয়েছে।"

"সকালে কেমন আছেন?"

"ভাল। চোখ পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

সিদ্ধেশ্বর কোনও কথা না বলে হাঁটতে লাগলেন। গ্লোব সিনেমার পাশের গলি দিয়ে নিয়ে চললেন বরদাকে।

বরদার সন্দেহ হল; মানিকের কথায় সিদ্ধেশ্বর অবাকও হলেন না, প্রতিবাদও করলেন না। তা হলে কি উনি কিছু খাইয়ে দিয়েছিলেন চায়ের সঙ্গে?

বরদা বলল, "মানিককে আপনি কোনও ওষুধ-টষুধ খাইয়ে দিয়েছিলেন?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। "না, আমরা কিছুই খাইয়ে দিইনি। আপনাদের ছোটখাটো যা হবে, সবই আমাদের দুষ্কর্ম, এ কথা কেন ভাবছেন? মানিকবাবুর সঙ্গে

আমার কোনও শত্রুতা নেই।"

"তা হলে?"

"হয়তো ওঁর কোনও চোখের রোগ আছে।"

গলি দিয়ে খানিকটা এগিয়ে বাঁ দিকের একটা বাড়িতে ঢুকে পড়লেন সিদ্ধেশ্বর। বরদাকে ডাকলেন। এমন বাড়ি বরদা জীবনে দেখেনি। কতকালের পুরনো বাড়ি, সোঁদা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, ইঁদুর আর ছুঁচোর আড়ত, ভাঙাচোরা কাঠের সিঁড়ি, গুদোমখানার দুর্গন্ধ, আর আলো না থাকার মতন, নীচে বড় বড় ঘর, কারা থাকে কে জানে। কেমন একটা শুকনো চামড়ার গন্ধও আসছিল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বরদা বলল, "এ বাড়িতে কারা থাকে?"

"বেশির ভাগ থাকে কেরলের লোক, নিউ মার্কেটের পেছনে যাদের বেতের জিনিসপত্রের দোকান। অনেকের গুদোমঘরও নীচে।"

তেতলায় এসে বরদা হাঁফ ছাড়ল। আলো-বাতাস পাওয়া গেল এতক্ষণে।

একটা ঘরে এসে বরদাকে বসালেন সিদ্ধেশ্বর। মোটামুটি বড় ঘর, মাথার ওপর পুরনো আমলের কড়িবরগা। পাখা ঝুলছে। বাতিও সিলিং থেকে ঝোলানো। বসার ব্যবস্থা বলতে মোটা মোটা সেকেলে সোফাটোফা, একপাশে একটা লোহার খাট, বিছানা পাতা রয়েছে খাটে। কোনার দিকে টেবিল। তার ওপর যাবতীয় জিনিস জড়ো করা।

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে বসিয়ে একটু বাইরে গেলেন; ফিরে এলেন আবার।

"কফি খান। রবিন ভাল কফি করে?"

বরদা ক্লান্তিবশত একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছিল।

সিদ্ধেশ্বর বসলেন। মুখোমুখি।

সামান্য চুপচাপ থেকে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনি কিছু ঠিক করলেন?"

বরদা সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকাল। "যেতে তো ইচ্ছে করে।"

"চলুন তা হলে?"

"একলা-একলা যেতে ভাল লাগে না। মানিক যদি যায়—"

"আপনি ভয় পাচ্ছেন!"

"না না, ভয় কীসের!" মাথা নাড়ল বরদা।

"মানিকবাবু চাকরি করেন, তাঁর যদি সুযোগ না হয়?"

"আমি ওকে রাজি করিয়ে নেবার চেষ্টা করছি।"

সিদ্ধেশ্বর সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "মানিকবাবু যেতে চাইলে আমার কোনও আপত্তি নেই; কিন্তু উনি যেতে না পারলেও আপনি চলুন।"

বরদা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল। কাল রাত্রে সে অনেকক্ষণ সিদ্ধেশ্বরের কথা ভেবেছে। মানুষটিকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না; আবার এমন কথাও মনে হয়, এত লোক থাকতে বরদাকে দুমকা নিয়ে যাবার জন্যে তাঁর আগ্রহ কেন? অবশ্য, বরদা নিজেই খানিকটা উৎসাহ ও কৌতূহল যে প্রকাশ করেছিল তা অস্বীকার করা যাবে না।

বরদা বলল, "আমাকে আপনি নিয়ে যেতে চাইছেন কেন? আমি তো আপনাদের ব্যাপার কিছু বুঝব না, শুধু যাব আর দেখব।" বলে বরদা হালকা করে হাসল, "তা ছাড়া আমার কোনও বিশেষ ক্ষমতাও নেই যে, আমায় নিয়ে গবেষণা করবেন।"

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে লক্ষ করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না কথার। পরে বললেন, "আপনি যেতে না চাইলে যাবেন না, তাতে কী! তবে যদি যান, অনেক কিছু দেখতে পাবেন, যা আগে কখনও দেখেননি।"

বরদা হেসে ফেলল। হালকা করেই বলল, "যা দেখেছি এতেই অবাক হয়েছি, স্যার।"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "এ-সব কিছু না। আশ্চর্য-আশ্চর্য ব্যাপার আপনি দেখতে পাবেন।...আপনি কি এমন কোনও মানুষ আজ পর্যন্ত দেখেছেন যার বাঁ হাতের ওপর রং দিয়ে উল্কি পরিয়ে দিলে সেটা ডান হাতেও ফুটে উঠবে? শুধু উল্কিই বা কেন, ধরুন তার বাঁ হাতে আপনি জোরে মারলেন কিছু দিয়ে—কালসিটে ফুটে উঠল। একটু পরে দেখবেন তার ডান হাতের সেই একই জায়গায় আর-একটা কালসিটে ফুটে উঠেছে।"

বরদা অবাক হয়ে সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকল। পাতা পড়ল না চোখের। কথাটা তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। বাঁ হাতের সঙ্গে ডান হাতের সম্পর্ক কী? কেমন করে তা হবে?

সিদ্ধেশ্বর নিজেই বললেন, "আমাদের ওখানে এমন লোকও আছে, যে চোখে দেখে না, কানে শোনে না। কিন্তু এক-একদিন সে কীসের এক আশ্চর্য শক্তি পায়, একেবারেই আচমকা—তখন সেই লোকটি আপনাকে হাত তুলে আকাশের তারা পর্যন্ত চিনিয়ে দিতে পারে, অনেক দূরের যে-কোনও শব্দ সে নির্ভুলভাবে চিনে নিতে পারে।"

এমন সময় সাধারণ একটা বেতের গোল ট্রে নিয়ে একটা লোক ঘরে এল।

বরদা লোকটিকে দেখল। দেখার মতন চেহারা। লম্বা চওড়া চেহারা, যেন লোহায় গড়া, কুচকুচে কালো রং গায়ের, মাথার চুল ছোট-ছোট, কোঁকড়ানো, নাকটা ভাঙা-ভাঙা, সাদা ধবধবে দাঁত, একদিকের কান নেই, মানে কানকাটা গোছের। গায়ে তার জাহাজি ডোরাকাটা গেঞ্জি, পরনে প্যান্ট।

ট্রে নামিয়ে রাখল লোকটি। দু মগ কফি, আর প্লেটে কয়েকটা প্যাস্ট্রি।

দাঁড়াল না লোকটি, চলে গেল।

বরদা বলল, "কে এই লোকটা?"

"ওর নাম রবিন, ঝাঁঝা অ্যাংলো কলোনিতে থাকত একসময়। রেলে চাকরি করত, ফায়ারম্যান ছিল। বড় সাংঘাতিক লোক। দুর্ব্যবহার করার জন্য চাকরি যায়। চাকরি-বাকরি যাবার পর থেকে দুষ্কর্ম করে বেড়াত। পরে আমাদের কাছে এসেছে।"

বরদা কফির মগ তুলে নিতে নিতে বলল, "ওরও কি কোনও বিশেষ ক্ষমতা আছে?"

সিদ্ধেশ্বর যেন একটু হাসলেন। "তা আছে বইকী।"

"কী ক্ষমতা?"

সিদ্ধেশ্বর প্যাস্ট্রির প্লেটটা তুলে বরদার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, "বললে আপনি ভয় পাবেন। অবশ্য আপনার ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। এই ধরুন আপনি—আপনাকে কোনও কারণে আমাদের দরকার। রবিনকে হুকুম করলেই সে আপনাকে যেমন করে হোক আমাদের কাছে পৌঁছে দেবে।"

বরদার হাত কেঁপে উঠল। বোকার মতন তাকিয়ে থাকল সিদ্ধেশ্বরের দিকে। ঢোঁক গিলল; বলল, "লোকটা গুণ্ডা?"

"তা বলতে পারেন।"

"আপনারা গুণ্ডা পোষেন?"

"না, তা নয়। আমরা চোর ডাকাত স্মাগলার নই যে, আমাদের গুণ্ডা পুষতে হবে। তবে আমাদের দু-একজন শত্রু রয়েছে। তারা নানাভাবে ক্ষতির চেষ্টা করে আমাদের। নিজেদের বাঁচাবার জন্যে রবিনের মতন দু-একজনকে রাখতে হয়।"

বরদা কফিতে চুমুক দিল। হাতে প্যাস্ট্রি।

সিদ্ধেশ্বরও কফি খেতে লাগলেন।

বরদা বলল, "এই বাড়ি—মানে ফ্ল্যাটটি কি আপনাদের?"

"হ্যাঁ। এখানে যিনি থাকেন তিনি এখন কলকাতায় নেই। রবিনও এখানে থাকে।"

"কে থাকে এখানে?"

"পালসাহেব। পালসাহেব একজন প্যাথলজিস্ট। আমাদের লোক। খানিকটা অ্যাবনরম্যাল। কাজকর্ম ভাল করেন। তবে খ্যাপামিটা মারাত্মক।" সিদ্ধেশ্বর হাসলেন।

বরদা বুঝতে পারছিল না তাকে সিদ্ধেশ্বর কোনও ফাঁদে ফেলছেন কি না! প্রথম থেকে দেখলে মনে হয়, ধীরে-ধীরে যেন একটা জাল বরদার চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন সেটা গুটিয়ে নিতে চাইছেন সিদ্ধেশ্বর। আবার তেমন করে খুঁটিয়ে না দেখলে মনে হবে, যা ঘটেছে সবই আচমকা। বরদারা নিজেরাই সিদ্ধেশ্বরের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, সিদ্ধেশ্বর তাদের টেনে নিয়ে যাননি। কিন্তু সেই সিনেমা হাউস থেকে শুরু করে পরপর যা হয়েছে তা কি বরদাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে নয়?

বরদা হঠাৎ বলল, "আচ্ছা সিদ্ধেশ্বরবাবু, যদি আমি না যাই, আপনি কি ওই রবিন গুণ্ডাকে আমার পেছনে লাগিয়ে দেবেন?"

সিদ্ধেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন, জিভ কাটার ভঙ্গি করলেন। "আরে ছি ছি—তাই কি হয়? আপনি নিজের ইচ্ছেয় যাবেন, না হয় যাবেন না।"

বরদা নিশ্বাস ফেলল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। ভরসা হচ্ছে না। আমি আপনাকে বলছি, আপনার সমস্ত দায়িত্ব আমার। আমরা চোর ডাকাত খুনের দল নই। আমরা মানুষকে ঠকিয়ে পয়সা রোজগারের মতলব করি না। আপনার ক্ষতি আমরা কেন করব! আপনি আমার ওপর ভরসা করে চলুন। অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হবে।"

বরদা প্যাস্ট্রিটা শেষ করল। কফিতে মুখ দিয়ে বলল, "বাড়িতে একবার বলতে হবে।"

"বলবেন।"

"বাড়ির লোক যদি রাজি না হয়?"

"বেড়াতে যাচ্ছেন বললে কেন রাজি হবেন না। আপনি ছেলেমানুষ নন।"

বরদা আর কোনও কথা বলল না।

কফি খাওয়া শেষ হল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "একটা কথা আপনাকে এত আগেভাগে বলা উচিত নয়, তবু বলে রাখি। আপনাকে আমি আমার বন্ধু হিসেবেই নিয়ে যাব। কিন্তু সেখানে বিশেষ একজনের কাছে আপনার সঙ্গে আমি ঠিক বন্ধুর আচরণ করব না। বরং উলটো আচরণও করতে পারি। আপনি আমার অভিনয় মেনে নেবেন। নিজেও সেই রকম অভিনয় করবেন। আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন, চড় লাথি মারবেন, গালমন্দ করবেন। আপনি যত ভাল অভিনয় করবেন—ততই আমার সুবিধে।"

বরদা অবাক হয়ে বলল, "আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আজকাল সব ব্যাপারেই ভেজাল জোটে। আমাদের ওখানে কখনও-সখনও এই রকম জাল-মানুষ এসে যায়। হয় আমাদের ভুলে, না হয় তাদের কৃতিত্বে। আজ প্রায় চার-পাঁচ মাস ধরে এই রকম এক জাল প্রেত-বিশারদ এসে জুটেছে। আমার বিশ্বাস, লোকটা আমাদের এখানকার দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যাবার মতলব করেছে। যদি পালিয়ে যেতে পারে, মানুষকে ভুতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার দেখিয়ে রাতারাতি দেদার পয়সা কামিয়ে নেবে। আমাদের দেশে ভুতুড়ে ব্যাপারের বাজার খুব ভাল। লোককে ঠকানো সহজ। এ-দেশের মানুষ আরও সহজে ঠকে।"

বরদা আবার একটা সিগারেট ধরাল। বলল, "আপনি কি জাল ধরবার জন্যে আমাকে নিয়ে যেতে চান?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারব?"

সিদ্ধেশ্বর মাথা হেলিয়ে বললেন, "পারবেন।" তারপর শার্টের পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন। খামের মধ্যে ফোটো ছিল। ফোটোটা বরদার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, "দেখুন।"

হাত বাড়িয়ে ফোটোটা নিল বরদা। পোস্টকার্ড সাইজের ফোটো।

চোখের সামনে ফোটোটা ধরতেই বরদা চমকে উঠল। শব্দ করল অস্ফুট, পাতা আর পড়ে না চোখের। বুক ধকধক করছিল। গলা শুকিয়ে গেল বরদার। বরদা তোতলার মতো করে বলল, "এ ছবি কার? আমার মতন দেখতে?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "এই ছবি যার, সে হল জাল প্রেত-বিশারদ। আপনার মতনই দেখতে, কিন্তু সামান্য তফাত আছে। এর নাম মহাদেব দাশ। মহাদেবকে আমি একটা শিক্ষা দিতে চাই। ও একটা জোচ্চোর বদমাশ। যে মতলব নিয়ে সে আমাদের কাছে

এসেছে তার সেই মতলব আমি জানতে পেরেছি।...বরদাবাবু আপনি আমায় সাহায্য করুন।"

বরদা কেমন নির্বোধের মতন সিদ্ধেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কী বলবে বুঝতে পারল না।

সিদ্ধেশ্বর অনুনয়ের মতন করে বললেন, "আপনি আমায় সাহায্য করুন।"

বরদা যেন হুঁশ ফিরে পেল। বলল, "আপনি কি এই উদ্দেশ্যে আমার পিছু ধরেছেন?"

"আমি একটা কাজে কলকাতায় এসেছিলাম," সিদ্ধেশ্বর বললেন। "সেদিন যখন সিনেমা হাউসের কাছে অন্যমনস্কভাবে ঘোরাঘুরি করছিলাম, আপনাকে দেখতে পেয়ে যাই আচমকা। তখন থেকেই আমার মাথায় একটা অভিসন্ধি ঘুরছিল।"

"তার মানে আমাকে আপনি ফাঁদে ফেলেছেন।"

"তা নয়। তবে আপনি আমার একটা সুযোগ করে দিতে পারেন এইমাত্র।...আপনি বিশ্বাস করুন, আমরা যা করি গবেষণার জন্যেই করি, ভেলকি দেখিয়ে পয়সা কামাবার জন্যে নয়।"

"এই ছবিটা কি আপনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন আগেই?"

"না। আপনাকে দেখার পর সেইদিন রাত্রেই আমি সদর স্ট্রিট থেকে লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলাম পি সি রিসার্চ সেন্টারে। আজ সকালে সে ছবি নিয়ে ফিরেছে।"

বরদা আবার একবার খুঁটিয়ে ছবিটা দেখল। মহাদেব দাশ যদি কোনওদিন কলকাতায় এসে বরদার বাড়িতে ঢুকে পড়ে, বাড়ির লোক বোধ হয় সহজেই লোকটাকে বরদা বলে ধরে নেবে। আর যদি তখন বরদা বাড়ি থাকে—দুই বরদা নিয়ে এক হইচই পড়ে যাবে।

হঠাৎ কী মনে করে বরদা হেসে ফেলল। তারপর সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকাল। বলল, "আমি যাব। আপনার সঙ্গেই।"

দুমকা নয়, দুমকার কাছাকাছি। মানিক থাকলে এতক্ষণে নাচত, বলত—ফার্স্ট ক্লাস জায়গা রে! সত্যি চমৎকার, চোখ জুড়িয়ে যাবার মতন। বরদা কলকাতার পোকা; জন্মকর্ম খাস কলকাতায়, দু পুরুষ ধরে উত্তর কলকাতার বাসিন্দে। কলকাতায় থাকতে থাকতে চোখের ওপর কেমন একটা পরদা পড়ে যায়, গলি রাস্তা ফুটপাথের দোকান ট্রাম বাস দেখতে দেখতে এমন হয়ে যায় চোখের অবস্থা যে, আলো রোদ মাঠ গাছপালা কিছুই যেন আর সইতে চায় না চোখে।

বরদা বেশ বুঝতে পারছিল তার চোখের ময়লা পরদাটা পুরোপুরি কেটে যাচ্ছে। ওরা রামপুরহাটে নেমেছিল শেষ বিকেলে। সিদ্ধেশ্বর একলা এলে আগেই আসতেন। বরদার জন্যে একটা দিন পিছিয়ে দিলেন, দিয়ে বরদাকে সঙ্গে করেই নিয়ে এলেন।

রামপুরহাট থেকে বাস। কলকাতার মতন নয়, দেখলেই বোঝা যায় মফস্বলের বাস। তবু সিদ্ধেশ্বর বেশ খাতির পেলেন। চেনাজানা লোক তিনি। বাস-বোঝাই যাত্রীর মধ্যেও বরদাদের বসার ভাল জায়গা জুটেছিল।

বরদা কলকাতার পোকা হলেও দু-এক বছর অন্তর বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছে।

কখনও পরিবারের লোকজনের সঙ্গে, কখনও বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে। মধুপুর, দেওঘর, গিরিডি তার দেখা; সে হাজারিবাগের জঙ্গলেও ছিল এক রাত। কাজেই এই নতুন জায়গা একেবারে অচেনা ঠেকল না। সেই রকমই ধুধু উঁচুনিচু মাঠ, রাশি-রাশি গাছ, ছোট-ছোট বালিয়াড়ির মতন স্তূপ, আর টাটকা বাতাস যেন চারদিকে আপন খেয়ালে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। বাতাস, মাটি, গাছপালার গন্ধই কী সুন্দর।

বাস থেকে নামতে নামতে বিকেল পড়ে গেল।

মালপত্র বিশেষ কিছু ছিল না। বরদা একটা লম্বা-চওড়া সুটকেস নিয়েছে মাত্র। সিদ্ধেশ্বর বলেছিলেন, বিছানাপত্র নেবেন না—সব ব্যবস্থা রয়েছে। বরদা জামাকাপড় আর কিছু টুকিটাকি নিয়ে সুটকেসটা ভরিয়ে ফেলেছে। সিদ্ধেশ্বর নিজেও অনেকটা ঝাড়া-হাত-পা মানুষ, তাঁর হাতে একটা চামড়ার কিটব্যাগ।

বাসটা চলে গেল দুমকার দিকে।

সিদ্ধেশ্বর একটা টাঙা ভাড়া করলেন। বাস থামার জায়গাটাকে গ্রাম-গ্রাম লাগল। দু-চারটে পাকা বাড়ি ছাড়া বাদবাকি সবই খাপরার-চাল-ছাওয়া বাড়ি। পাঁচ-সাতটা দোকান। একপাশে হনুমান মন্দির। গোটা দুই মাল বোঝাই লরি দাঁড়িয়ে আছে। আলু পিঁয়াজের কেমন একটা গন্ধ আসছিল লরি থেকে।

টাঙায় উঠে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "এখান থেকে মাইল দুই।"

বরদা কিছু বলল না; ছেলেমানুষের চোখ করে চারদিক দেখছিল।

টাঙা চলতে শুরু করলে বরদার আবার মানিকের কথা মনে পড়ল। মানিক আসতে পারল না। বরদা একলা আসে এটাও তার ইচ্ছে ছিল না মোটেই। কিন্তু সব কথাবার্তা শুনে সে শেষ পর্যন্ত নিমরাজি হয়ে বলল, "ঠিক আছে, তুই যা। আমিও পরে আসব। কোনও ঝামেলা বুঝলে চিঠি লিখবি, আমি সুশোভনকে সঙ্গে করে চলে যাব।"

সুশোভন বরদাদের আর-এক বন্ধু। দারুণ ছেলে। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনই সাহস। পুলিশে চাকরি করে।

বরদা অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরাল। তার ঠিক ভয় করছিল না। সে এমন কিছু সাহসী ছেলে নয়, বরং অল্পতেই ঘাবড়ে যায়। কিন্তু দু-তিনটে দিন সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে মেলামেশা করে মানুষটির প্রতি তার কেমন বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে। সিদ্ধেশ্বর খারাপ লোক নন। মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান না। তবে ওই যে—ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা নিয়ে মাথা ঘামান এটাই যা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। নয়তো অন্য কোনও দোষ তাঁর নেই।

সন্ধের কালচে ভাবটা জমে আসার আগে যেন মনে হল ঝাপসা ভাবটা ফিকে হয়ে আলো ফুটছে। বরদার খেয়াল হয়নি। আকাশের দিকে তাকাতেই চাঁদ চোখে পড়ল, পরিষ্কার চাঁদ, প্রায় গোল; মানে কাছাকাছি পূর্ণিমা।

টাঙাটা নুড়ি পাথরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। চাকার শব্দ। ঘোড়ার পায়ের খুরের শব্দ। টাঙার চারদিক থেকে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজও উঠছিল।

বরদা শালবন দেখতে লাগল। সামান্য তফাতে শালের বন। বনের মাথায় চাঁদ।

বাতাসে যেন শালপাতার গন্ধ জড়িয়ে আছে।

খুশি হয়ে বরদা বলল, "জায়গাটা ওয়ান্ডারফুল।...ওটা শালবন তো?"

সিদ্ধেশ্বর মাথা দুলিয়ে হাসলেন, "হ্যাঁ, শাল। এদিকে শাল আর পলাশই বেশি। অন্য গাছও আছে।"

"আপনারা জায়গাটা ভালই বেছে নিয়েছেন।"

একটু চুপ করে থেকে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "বেছে নিয়েছি ঠিক নয়, এক বেহারি ভদ্রলোক—যমুনাপ্রসাদ—আমাদের জায়গাটা এক রকম দানই করে দেন। তাঁর অনেক জমিজায়গা ছিল—মানুষটিও ছিলেন ধর্মভীরু, পরলোক সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা ছিল, অনেক কিছু বিশ্বাস করতেন তিনি, আত্মাটাত্মা, প্রেতট্রেত...। নিজে একটু-আধটু চর্চাও করতেন।"

বরদা সিদ্ধেশ্বরের মুখের দিকে তাকাল একবার, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শালবনের তলায় গড়িয়ে পড়া চাঁদের আলো দেখতে লাগল। হালকা ঠাণ্ডাও লাগছিল।

অন্যমনস্কভাবেই বরদা বলল, "ভূতপ্রেত নিয়ে আবার কেউ চর্চা করে নাকি? আপনিই না বলেছিলেন, ওসব নিয়ে লোক ঠকানো কারবার চলে!"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "আমি তা বলিনি। বলেছি, কিছু লোক রয়েছে যারা এ-সব নিয়ে ব্যবসা করে, পয়সা কামায়। আবার কেউ-কেউ আছে যারা সত্যি সত্যি এর চর্চা করে।"

"সত্যি-সত্যি চর্চা?" বরদা কৌতুকের গলায় বলল। তাকাল আবার সিদ্ধেশ্বরের দিকে।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "মানুষের নানা খেয়াল থাকে, কৌতূহল থাকে।"

"আপনারা তো ঠিক ভূতপ্রেত চর্চা করেন না?"

"না।"

"মহাদেব দাশ করে?"

"চর্চা করে না; ও কিছু ফন্দি আঁটছে। কীসের ফন্দি তা আমি এখনও ঠিক ধরতে পারিনি। তবে আমার মনে হয়, আমাদের এখানে যারা আছে তাদের দু-একজনকে ও ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে লোক ঠকাবার ব্যবসা ফাঁদবে। পয়সা রোজগার করবে।"

বরদা টাঙার ঝাঁকুনিতে সামান্য গড়িয়ে গিয়েছিল, ভালভাবে বসল, বলল, "আচ্ছা সিদ্ধেশ্বরবাবু, সত্যি সত্যি কি মানুষে ভূতের চর্চা করে?"

সিদ্ধেশ্বর যেন হাসলেন একটু, বললেন, "করে। আমাদের দেশের দু-একজনের নাম আমি শুনেছি। কাশীর কাছে এক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, লোকে তাঁকে শুকলজি বলত। আমি তাঁকে দেখিনি। পঞ্চাশ-ষাট সাল আগেই তিনি মারা গেছেন। শুনেছি তিনি বিদেহী আত্মার চর্চা করতেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা তাঁর বইও ছিল।" সিদ্ধেশ্বর একটু থেমে আবার বললেন, "আরও একজনের কথা শুনেছি, পঞ্চানন সাহানা, বর্ধমান জেলার লোক। তাঁরও নামডাক ছিল, সেও ধরুন বছর ত্রিশ আগে। তিনিও মারা গেছেন।"

বরদা তাকিয়ে তাকিয়ে ছায়া দেখছিল শালবনের। চাঁদের আলো আর ছায়া যেন বনের গা দিয়ে টাঙার সঙ্গে সমানে ছুটছে। আবার কখনও কখনও বন যেখানে পাতলা, জ্যোৎস্না প্রায় পুকুরের জলের মতন পড়ে আছে। খাসা জ্যোৎস্নাও ফুটেছে আজ। যত রাত বাড়বে, আরও যেন ঝকঝক করে উঠবে চাঁদের আলো।

বরদা বলল, "এ-সব, আপনি যা বলছেন তা কি সত্যি?"

সিদ্ধেশ্বর মাথা নেড়ে বললেন, "আমি জানি না। তবে এটা নতুন কিছু নয়। ভূতই বলুন আর প্রেতই বলুন, এর চর্চা সব দেশেই আছে। হেনরি করনেলিস অ্যাগরিপ্পা বলে কোনও নাম কখনও শুনেছেন?"

"না।"

"মাদাম ব্লাভেট্‌সকি?"

"না মশাই, শুনিনি। এঁরা কারা?"

"এঁরা বিখ্যাত অকালটিস্ট। হেনরি করনেলিস ফিফটিনথ্‌ সেঞ্চুরির লোক। তবে মাদাম ব্লাভেট্‌সকির নামটাই বেশি শোনা যায়। তিনি নাইনটিনথ্‌ সেঞ্চুরির।"

বরদা চাঁদের আলো দেখার কথা ভুলে গেল। বলল, "অকাল্‌টিস্ট? মানে ভূতের—মানের ভূতের কী বলব—ভূতের বিশেষজ্ঞ?"

"না না, ভূতের নয়; বলতে পারেন ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যের যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা। তার মধ্যে প্রেত-ট্রেত থাকতে পারে।"

বরদা চুপ করে গেল।

রাস্তাটা ছোট, উঁচু-নিচু, রাস্তার পাশে ফাঁকা-ফাঁকা জমি, ঝোপঝাড় দু- চারটে গাছ—আর একটু তফাতেই টানা শাল জঙ্গল। তবে জঙ্গলটা এখন যেন শেষ হয়ে এল। তেপান্তর মাঠ চোখে পড়ছে, মস্ত একটা টিলা, দু-চারটে কুঁড়েও যেন একপাশে জ্যোৎস্নার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে।

ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাঁধা ছিল। ঝুনঝুন শব্দ হচ্ছিল।

বরদার হঠাৎ কেমন অসহায়-অসহায় লাগল। কোথায় কলকাতা আর কোথায় এই নির্জন শাল-জঙ্গল, চাঁদের আলো। দু-একটা গোরুর গাড়ি আগে চোখে পড়লেও এখন আর মানুষজন, গাড়ি কিছুই চোখে পড়ছে না। এ পথে কি মানুষ চলে না?

বরদার কেমন ভয় ভয় লাগল। সে কি ভাল করল এসে? এখানে কি তার মন টিকবে? কে জানে সিদ্ধেশ্বরের রিসার্চ সেন্টারে পৌঁছে সে কী দেখবে? অস্বাভাবিক কিছু মানুষ, না হয় কিছু পাগল। বড়জোর দেখবে এক-একজন এক-একরকম অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখায়। কী লাভ হবে তাতে?

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছি।"

"আর কতটা?"

"আধ মাইল মতন।"

"কোন দিকে?"

সিদ্ধেশ্বর টিলাটা দেখালেন, বললেন, "ওর পেছন দিকে।"

বরদা সামান্য চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, "সিদ্ধেশ্বরবাবু, আপনি তো আমাকে

নিয়ে এলেন, কিন্তু আমি যদি থাকতে না পারি?”

“কেন পারবেন না? পারবেন।”

“আমরা জলের মাছ, এই ডাঙায় কি ভাল লাগবে?” বলে বরদা হাসবার চেষ্টা করল। “মানিক থাকলে তবু হত।”

সিদ্ধেশ্বর বললেন, “আপনার কোনও অসুবিধে হবে না। খাওয়া-দাওয়া-শোওয়া—কোনও কষ্ট পাবেন না। আপনি আপনার মতন ঘুরে বেড়াবেন, আমাদের লোকজন দেখবেন। শুধু একটিমাত্র কাজ আপনি করবেন না, অন্তত আমাকে না জানিয়ে—।”

“কী কাজ?”

“মহাদেবের সঙ্গে মেলামেশা করবেন না। ওকে সব সময় এড়িয়ে যাবেন। যদি কখনও মনে হয় আমার, আমি আপনাকে ওর সঙ্গে মেলামেশা করতে বলে দেব। লোকটা ধুরন্ধর, ধূর্ত। ও আপনাকে দেখে কেমন চমকে যায়—আজই দেখবেন।”

বরদা বলল, “মহাদেবের সঙ্গে লড়তে গিয়ে বেঘোরে আমি না মরি মশাই!”

সিদ্ধেশ্বরবাবু হাসলেন। “মরার কথা তুললেন বলেই বলছি। আমি বেঁচে থাকতে আপনি মরবেন না। আপনি আমার বন্ধু, আশ্রিত। আমি আমার স্বার্থে আপনাকে এনেছি, কাজ শেষ হলে আমি নিজে আপনাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আসব।”

বরদা কোনও জবাব দিল না।

টাঙাটা যথারীতি ছুটছিল। অজস্র জোনাকি জ্বলছে একজোড়া গাছের তলায়। বুনো পাখি ডাকল কোথাও। ঠাণ্ডা লাগছিল বরদার।

আরও খানিকটা এগিয়ে এল টাঙা। সিদ্ধেশ্বর হাত তুলে দেখালেন। বললেন, “ওই দেখুন আমাদের জায়গা।”

তাকাল বরদা। খুব একটা কাছে নয় সিদ্ধেশ্বরদের রিসার্চ সেন্টার। স্পষ্ট করে কিছু চোখে না পড়লেও একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছিল জায়গাটার। মনে হল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একতলা টানা কিছু বাড়িটাড়ি। ব্যারাক বাড়ির মতন দেখাচ্ছিল। টিমটিম আলোও চোখে পড়ছিল বরদার।

ধবধবে চাঁদের আলোয় একটা মফস্বলি হাসপাতাল কিংবা কোনও ছোট মিলিটারি ব্যারাক বাড়ি পড়ে থাকলে বোধ হয় এইরকমই দেখায়।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, “বরদাবাবু, আপনার নামটা যদি কয়েক দিনের জন্যে পালটে নিতে চান তাও পারেন।”

বরদা বলল, “না, নাম আমি পালটাব না মশাই।”

হাসলেন সিদ্ধেশ্বর। “না পালটালেন। মহাদেব দাশের সঙ্গে মিলিয়ে একটা নাম দেওয়া যেত।”

“মহাদেবের বয়েস কত?”

“আপনার চেয়ে দু-এক বছরের বড়।”

“আমার সঙ্গে ওর চেহারার এমন মিল কেমন করে হল?”

“ও-রকম হয়। হামেশাই হয়। তবে খানিকটা অমিলও আছে।”

"কী?"

"মহাদেবের কান বড়; আপনার ছোট। মহাদেবের নাক আপনার চেয়েও বসা। তার কাঁধের দুপাশ উঁচু মতন। আরও আছে ছোটখাটো; আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

টাঙাটা হঠাৎ ঝাঁকি মেরে উঠল। তার পরই দেখা গেল গাড়িটা প্রায় উলটে যাবার অবস্থা। ঘোড়াটা সামনের পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়েছে যেন।

টাঙাঅলা ঘোড়াকে বাগে আনল।

বরদা বলল, "আচ্ছা ঘোড়া তো! উলটে দিত মশাই।"

সিদ্ধেশ্বর হেসে ফেললেন। "ঘোড়ারা ওরকম করে।"

বরদা সাবধানে বসল।

আরও খানিকটা এগিয়ে আসার পর বরদা বাড়িটা পুরোপুরি দেখতে পেল। ছোট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কম্পাউন্ড। কাঠের ফটক। পাঁচিল ঘেঁষে কিছু গাছপালা। বাড়ির মাথায় টালির ছাদ। জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়ছে টালির ছাদে।

ফটকের কাছাকাছি টাঙাটা পৌঁছতেই সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমাদের এখানে ইলেকট্রিক আলো নেই। আপনার একটু অসুবিধে হবে।"

বরদা কোনও জবাব দিল না।

ফটকের সামনে এসে টাঙা দাঁড়াল।

সিদ্ধেশ্বর টাঙা থেকে নেমে ফটক খুললেন। বললেন, "দাঁড়ান, আমি লোক ডাকি, সুটকেসগুলো নামিয়ে নেবে।"

সিদ্ধেশ্বর সামান্য এগিয়ে কাকে যেন ডাকছিলেন।

বরদা নেমে দাঁড়াল। পায়ে ঝিঝি ধরে গেছে। কোমর-টোমর ব্যথা করছিল।

আর খুবই আচমকা টাঙাটাকে ঘুরপাক খাইয়ে ঘোড়াটা আবার সামনের পা তুলে চেঁচাতে লাগল।

বরদা সরে এল একপাশে।

ঘোড়াটা কেন যে সামনের পা তুলে চেঁচাচ্ছে বরদা কিছু বোঝবার আগেই সিদ্ধেশ্বর যেন এক ছুটে ফিরে এলেন।

তারপর অবাক হয়ে বরদা দেখল সিদ্ধেশ্বর ঘোড়াটাকে বাগে আনবার জন্যে প্রায় যেন তার মুখের দড়িদড়া ধরে ঝুলে পড়েছেন।

টাঙাঅলাও ততক্ষণে লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়েছে।

সিদ্ধেশ্বরই শেষপর্যন্ত জিতলেন।

কিন্তু ঘোড়ার খুরের ঠোক্কর খেয়ে তাঁর কপাল কেটে রক্ত পড়ছিল।

সারা রাত ভাল ঘুম হয়নি বরদার। নতুন জায়গা, পরিবেশটাও বিচিত্র; অস্বস্তি এবং গা-ছমছমে ভাব নিয়ে কেমন করে মানুষ ঘুমোতে পারে! ভোর হয়ে আসছে, অন্ধকার ফিকে হয়ে সবে ফরসা ফুটে উঠতেই বরদা বিছানার ওপর উঠে বসল। রাত্রে

যেন বরদার কোনও বল-ভরসা ছিল না, ভয়ে-ভয়ে থাকতে হয়েছিল, সকালে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, নিশ্চিন্ত হল।

বিছানায় কিছুক্ষণ বসে থাকল বরদা, যতক্ষণ না চোখে দেখার মতন পরিষ্কার হয়ে ওঠে সব। তার ঘরের জানলার অর্ধেকটা কাঠ, বাকিটা কাচ। পাল্লাগুলো কেমন তেড়াবাঁকা, ফাঁক হয়ে রয়েছে, হাওয়া আসে। বরদাকে একেবারে রাজার হালে না রাখলেও আতিথ্য-কর্মে সিদ্ধেশ্বরের ক্রটি ছিল না। লোহার খাট, তলায় নিশ্চয় স্প্রিং রয়েছে, বিছানায় শুলেই গা ডুবে যায়; গদি, তোশক, পরিষ্কার চাদর বালিশ—সবই বরদার জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছিল। ঘরে একটা চেয়ার রয়েছে, ছোট টেবিল। এর বেশি বরদা আর কী আশা করতে পারে!

চারদিক পরিষ্কার হয়ে আসতেই বরদা বিছানা ছেড়ে নেমে এল। জামাটা গায়ে দিল । তারপর দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

একেবারে ব্যারাক বাড়ির মতন দেখতে। গোটা দুই লম্বা-লম্বা টানা একতলা বিল্ডিং, পাশাপাশি নয়, একের গায়ে অন্যটা ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতন জুড়ে আছে, অন্য পাশে ছোট মতন একটা 'কটেজ'; পেছনের দিকে বোধ হয় রান্নাবান্নার ঘর। ব্যারাক বাড়ির কোনওটার মাথায় টালি, কোনওটার মাথায় খাপরা—মানে যাকে খোলার চাল বলে। মন্দ দেখায় না বাড়িগুলো। সত্যিই দেহাতি হাসপাতালের মতন দেখায়, কিংবা আশ্রম-টাশ্রম মনে হয়।

বরদা যেন নতুন কিছু দেখছে এইভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল পায়চারির ভঙ্গিতে। সকালের বাতাস তার ভাল লাগছিল। কেমন এক সুন্দর গন্ধ রয়েছে, ধুলো বালি ধোঁয়া নেই বাতাসে এক ফোঁটাও। নিশ্বাস নিতেও কী যে আরাম লাগে!

পি পি রিসার্চ সেন্টারের অবস্থা যে খুব ভাল তা নয়, তবু মোটামুটি চালিয়ে যাচ্ছে। চারপাশে কম্পাউন্ড ওয়াল। মধ্যিখানে আশেপাশে টুকরো-টুকরো বাগান। লতাপাতা ফুল চোখে পড়ে। দু-চারটে বড়-বড় গাছও নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, শাল নিম হরীতকী।

একেবারে পুরোপুরি সাদা হয়ে গেল চারপাশ। সূর্য উঠছে।

এতক্ষণ বরদা কোনও সাড়াশব্দ পায়নি; মানুষজনও দেখেনি। এবার গলা পেল।

সিদ্ধেশ্বরের কথা আবার মনে পড়ল বরদার। ভদ্রলোক কাল জোর চোট পেয়েছেন কপালে। ঘোড়ার খুরের ঠোক্কর। অনেকটা রক্ত পড়েছিল। পরে ওষুধ দিয়ে লিউকোপ্লাস্ট এঁটে দিয়েছিলেন। কেমন আছেন সিদ্ধেশ্বর? জ্বরজ্বালা হয়েছে নাকি? তবে সত্যিই তিনি অদ্ভুত মানুষ, ওই টাঙার ঘোড়ার সঙ্গে সমানে যুঝে গেলেন, হার মানলেন না। ঘোড়াটাকেই বাগে আনলেন।

টাঙাঅলা কাল আর ফিরে যায়নি। ফিরে যাবার হয়তো কথাও ছিল না। এতটা পথ একা-একা রাত্রে ফিরে যাবেই বা কী করে! ঘোড়াটাকে নিয়ে ফিরে যাওয়া বিপজ্জনক। টাঙাঅলা ভয় পেয়ে গিয়েছিল! আর ঘোড়াটাই বা অমন কেন করল কে জানে।

বরদা কেমন কৌতূহল বোধ করে টাঙা আর ঘোড়াটাকে খুঁজতে লাগল।

পি পি রিসার্চ সেন্টারের লোকজন এইবার সব একে-একে জেগে উঠছে। বাইরে আসছে। মুখটুখ ধুতেও যাচ্ছিল। বরদার দিকে কারও চোখ পড়ছে, কারও বা পড়ছে না। তাকাচ্ছে, দেখছে।

হঠাৎ বরদা কার যেন গলা শুনতে পেল। তাকাল। তাকিয়ে চমকে উঠল। সেই মহাদেব।

মহাদেবকে কাল দেখেনি বরদা। আজ সকালে দেখল।

মহাদেব তফাত থেকে লক্ষ করছিল বরদাকে। তারপর ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল।

বরদা ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হলেও কোনও অস্থিরতা দেখাল না। সিদ্ধেশ্বরের কথা মনে পড়ল, তাঁর উপদেশ। লোকটাকে পাত্তা দিলে চলবে না। অগ্রাহ্য করতে হবে।

মহাদেব কাছে এসে বলল, "নমস্কার"। বলে দু হাত জোড় করে যেন ঠাট্টার ছলেই নমস্কার জানাল বরদাকে।

বরদা দায়সারা গোছের নমস্কার জানাল।

"আপনিই তো কাল এলেন?" মহাদেব বলল।

ঘাড় নাড়ল বরদা।

"আপনার নাম?"

"বরদা মজুমদার।"

"কোথা থেকে আসছেন?"

"কলকাতা থেকে।"

"আমার নাম মহাদেব দাশ।"

বরদা কোনও জবাব দিল না, সামনের দিকে হাঁটতে লাগল।

পাশে-পাশে মহাদেবও হাঁটছিল। "এমন আশ্চর্য ঘটনা কেমন করে ঘটল, মশাই। আমরা যেন যমজ!"

বরদা নিজেকে সামলাচ্ছিল। সে যেন বিন্দুমাত্র অবাক হয়নি, গ্রাহ্যও করেনি, বলল, "কে বলল যমজ?"

"বলেন কী, চেহারার এমন মিল...!"

"শয়ে শয়ে পাওয়া যায়। আপনি এখানে থাকেন, নিজেকে ছাড়া দেখতে পান না। কলকাতায় যান—আবও পাঁচ-সাতটা মহাদেব পেয়ে যাবেন। দিল্লি যান, কম করেও দুটো।" বলেই কী মনে হল বরদার, মহাদেবকে জব্দ করার জন্যে বলল, "আমার ছোট ভাই, বছর দেড়েকের ছোট, অবিকল আমার মতন দেখতে। বাড়িতেই লোকে ভুল করে বসে। আপনার সঙ্গে আমার আর কতটুকু মিল?"

মহাদেব কথা বলতে পারল না। বোধ হয় বরদার সঙ্গে তার মিল-অমিল খুঁটিয়ে দেখছিল।

খানিকটা পরে বলল, "আপনি কী করেন?"

বরদা বলতে যাচ্ছিল, কিছুই করা হয় না; হঠাৎ তার মনে হল, একটু চালাকি করা ভাল। মহাদেবকে তার ঠিকুজি কোষ্ঠী জানানোর তো প্রয়োজন নেই। হাঁটতে হাঁটতে

একবার আকাশের দিকে মুখ তুলল, যেন মহাদেবের কথা শুনতে পায়নি। সূর্য উঠে গেছে। আকাশ থেকে রোদ নামছে ধীরে-ধীরে। বাঃ, চমৎকার।

মহাদেব পিছু ছাড়ল না। পাশেপাশেই হাঁটছিল।

"সিধুবাবুর বন্ধু আপনি?" মহাদেব আবার বলল।

বরদা বিরক্ত বোধ করলেও কিছু বলল না, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। "শত্রুও হতে পারি।"

"শত্রু?"

"কেন, শত্রু হতে পারা যায় না?" বলে নিজের বিরক্তি স্পষ্ট করেই জানিয়ে ফেলল, রুক্ষভাবে তাকাল মহাদেবের দিকে, তারপর হনহন করে এগিয়ে গেল।

মহাদেব দাঁড়িয়ে পড়ল।

সামান্য এগিয়ে হাঁফ ফেলল বরদা। আচ্ছা এক লোকের পাল্লায় পড়েছিল; আঠার মতন আটকে থাকে লোকটা। তবে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে, মহাদেব অতি চতুর এবং বুদ্ধিমান। বরদার মতন মানুষকে এক হাটে বেচে অন্য হাটে কিনতে পারে। কোনও সন্দেহ নেই, বরদার ওপর সে নজর রেখেছে।

আরও একটু এগিয়ে আসতেই টাঙাটা দেখা গেল। ঘোড়া আরও খানিকটা তফাতে। বাঁধা রয়েছে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে।

সিদ্ধেশ্বরকেও দেখতে পেল বরদা। দাঁড়িয়ে আছেন।

কাছে এসে বরদা বলল, "কেমন আছেন?"

সিদ্ধেশ্বরের কপালে লিউকোপ্লাস্ট। দু-চারটে আঁচড়ের দাগ নীল হয়ে আছে চোখের পাশে। বাঁ দিকের চোখের কাছটায় ফোলা। মুখটাও শুকনো।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "ব্যথা রয়েছে। রাত্রে জ্বর এসেছিল।"

"এখনও জ্বর আছে?"

"না বোধ হয়। দু-একদিন ভোগাবে। ওষুধপত্র লাগিয়েছি, সেরে যাবে।"

"আপনি ঘোড়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন কেন? ও হল পশু!"

সিদ্ধেশ্বর একটু যেন হাসলেন। "ঘোড়ার চেয়েও বড় পশু এখানে আছে।"

বরদা বুঝল না। বলল, "আপনাদের মহাদেবের সঙ্গে এইমাত্র পরিচয় হল।"

"দেখলাম।"

"ও মশাই ঘুঘু লোক। ঠিক নজর রেখেছিল। সকালেই ধরেছে।"

"কী জিজ্ঞেস করছিল?"

"ও তো আমায় জেরা করছিল," বরদা বলল। মহাদেবের সঙ্গে তার কথাবার্তা যা হয়েছে বলল সব।

"আমার কী মনে হয় জানেন সিদ্ধেশ্বরবাবু?" বরদা বলল, "আমার একটা ছদ্ম-পরিচয় তৈরি করে রাখা উচিত ছিল। নয়তো লোকটাকে আমি সামলাতে পারব না।"

সিদ্ধেশ্বর হেসে বললেন, "আপনি তো নামটাও পালটাতে চাইলেন না?"

"চাইনি। তখন বুঝিনি ব্যাপারটা। এখন অন্যগুলো পালটাতে চাই।"

সিদ্ধেশ্বর ভাবছিলেন। বললেন, "হবে। আমি আপনাকে বলে দেব।"

বরদা কিছু বলতে যাচ্ছিল, সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনি মুখটুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিন। প্রথমে আপনাকে আমাদের এই সেন্টারের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তাঁর কাছে নিয়ে যাব। তারপর একবার সব ঘুরিয়ে দেখাব।"

"উনি কোথায় থাকেন, আপনাদের প্রতিষ্ঠাতা?"

সিদ্ধেশ্বর পুবের দিকে হাত বাড়িয়ে সেই ছোট 'কটেজ'-টা দেখাল।

"কী নাম ওঁর?"

"যামিনীভূষণ মৈত্র।"

বরদা পুবের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সামান্য বেলায় বরদা গেল যামিনীভূষণকে দেখতে। সঙ্গে সিদ্ধেশ্বর।

ঢাকা বারান্দায় আর্মচেয়ারে বসে ছিলেন যামিনীভূষণ। বয়েস হয়েছে যথেষ্ট। সত্তরের ওপারে পৌঁছে কেমন নির্জীব হয়ে পড়েছেন। মানুষটিকে এখন দেখলে কেমন সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী মনে হয়। মাথায় একটি-দুটির বেশি চুল নেই, নেড়া। পরনে গেরুয়া কাপড়, পাট করা। গায়ে ফতুয়া। ফতুয়ার ওপর একটা চাদর ছিল। পায়ে পাতলা চটি, রাবারের। চোখে ভাল দেখতে পান না। গোল কাচের মামুলি চশমা চোখে। কোনওরকম শখ নেই, শৌখিনতা নেই, একেবারে সাদামাটা মানুষ।

বরদার কেমন ভক্তিই হল।

সিদ্ধেশ্বর আগেভাগেই বলে রেখেছিলেন নিশ্চয়। যামিনীভূষণ বরদাকে দেখলেন, কিন্তু বিশেষ কোনও কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। সাধারণ কথাবার্তাই বললেন। বরদার ঘরবাড়ির কথা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় থাকে বরদা—কে কে আছে বাড়িতে, এই জায়গাটা কেমন লাগছে ইত্যাদি।

বরদা কথা বলতে বলতে চারপাশ দেখছিল। যামিনীভূষণের অন্তত একটা শখ চোখে পড়ছিল বরদার। বারান্দার চারদিকেই ফুলের টব সাজানো। গাছপালা ভালবাসেন উনি। বাড়ির নীচেও ছোট বাগান। সবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, একটা শুকনো পাতাও পড়ে নেই কোথাও।

বারান্দার ডান দিকে বোধ হয় যামিনীভূষণের অফিসঘর। তেমন কিছু দেখা যাচ্ছিল না বারান্দা থেকে, শুধু টেবিল চেয়ার, বইয়ের এক-আধটা আলমারি চোখে পড়ছিল।

সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে দু-চারটে কথা সেরে যামিনীভূষণ বরদার দিকে তাকালেন। বললেন, "তুমি এখানে এসেছ যখন তখন তোমার সুখ-সুবিধে ভাল-মন্দ দেখা আমাদের কাজ। কোনও অসুবিধে হলে সিদ্ধেশ্বরকে বোলো।" বলে একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, "এখানে নানা রকম লোক থাকে, তাদের যেমন গুণও আছে কিছু কিছু, আবার অগুণও রয়েছে অনেকের। সব সময় একটু চোখ খুলে রেখো। নিজে ভাল করে চোখে কিছু না দেখে কোনও জিনিসই বিশ্বাস কোরো না। বরং অবিশ্বাস ভাল, তবু না-জেনেশুনে দেখে বিশ্বাস করে নেওয়া ভাল নয়।"

সিদ্ধেশ্বর ইশারায় উঠতে বললেন বরদাকে। বরদা উঠে পড়ল।

বেলা হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত মাঠময় রোদ। টাঙাঅলা তার গাড়ি নিয়ে চলে গেছে। ঘোড়াটাও নেই। লোকজন যে যার মতন ঘোরাফেরা করছিল। রান্নাঘরের দিকে ধোঁয়া উঠছে। কুয়োতলায় জলটল তোলা হচ্ছে, চাকার শব্দ আসছিল।

বরদার বেশ লাগল শব্দটা শুনতে। দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকাল কুয়োর দিকে।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমাদের জলের ব্যবস্থাটা পাকা করতে পারছি না। অনেক অসুবিধে। দুটো কুয়ো। একটায় হুইল দিয়ে জল তোলা হয়; আর-একটায় রয়েছে লাটা-খাম্বা।" বলে আঙুল দিয়ে রান্নাঘরের দিকে আরও একটা কুয়ো দেখালেন।

বরদা বলল, "পাম্প বসিয়ে নিন। ও, আপনাদের তো আবার ইলেকট্রিসিটি নেই।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আশাও নেই। তবে ডিজেল পাম্প দিয়ে বোধ হয় কাজটা সারা যায়।"

বরদা যদিও কিছু জানে না, বলল, "তা যায়।"

দুজনেই হাঁটতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে সিদ্ধেশ্বর হঠাৎ বললেন, "আপনি বরদাবাবু, একটা পাম্প কোম্পানির লোক হয়ে যান না?"

"মানে?" বরদা কিছু বুঝল না, অবাক চোখে তাকাল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "মহাদেবকে ধোঁকা দেবার জন্যে একটা কিছু বলা দরকার। আপনি যদি পাম্প কোম্পানির লোক হয়ে যান, তা হলে আপত্তি কীসের?"

মাথা নাড়াল বরদা। "পাগল নাকি আপনি মশাই, আমি কোনও পাম্প কোম্পানির নামই জানি না। ওসব আমার মাথায় আসে না।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "মাথায় আসবার আছে কী! আমি কলকাতায় গিয়ে কোনও পাম্প কোম্পানিতে দেখা করতে পারি। পারি কি না বলুন? তাদের লোক নিয়ে আসতে পারি এখানে। আপনিই সেই লোক। আপনার কোম্পানি আপনাকে পাঠিয়েছে কেমন পাম্প লাগবে, কোথায় বসানো হবে, জলের পাইপ কেমন করে বসালে সুবিধে হবে—এইসব তদারকি করে আসতে।"

বরদা হাত নাড়ল জোরে জোরে। "পারব না মশাই। আমি ধরা পড়ে যাব। পাম্প-এর 'প' পর্যন্ত আমি জানি না।"

"আপনি কি ভাবছেন মহাদেবই জানে?" সিদ্ধেশ্বর বললেন, "ওর অত খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করার বুদ্ধি হবে না। আর আপনিই বা ওর সঙ্গে এসব কথা বলবেন কেন! এখানে কী হবে না-হবে তা ঠিক করার মালিক যামিনীবাবু আর আমি।"

বরদা চুপ করে থাকল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমার অফিসে অনেক রকম কাগজপত্র পড়ে আছে। পাম্পের কথা আমি লিখেছিলাম কলকাতায় একবার। বোধ হয়, চিঠির জবাব, ক্যাটালগ, আরও কী কী পড়ে আছে ফাইলে।"

"আমরা কি এবার আপনার অফিসে যাব?"

"হ্যাঁ, চলুন। অফিসে আমাদের খাতা আছে। খাতায় এখানে যারা রয়েছে তাদের

নাম-ধাম, কে কবে এসেছে, কার কী বৈশিষ্ট্য সব লেখা আছে। একবার সেটা শুনে নেওয়া ভাল।”

সিদ্ধেশ্বর যেখানে থাকেন, তার পাশেই অফিসঘর।

ঘর ছোট, আসবাবপত্রও কম, তবু লোহার আলমারি, ছোট একটা সিন্দুক, কাচের আলমারিতে সাজানো কিছু ফাইল, বইপত্র, আরও টুকিটাকি জিনিস রয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর লোহার আলমারি খুলে একটা বাঁধানো খাতা বার করলেন।

বরদা একটা সিগারেট ধরাল। তার ডান দিকে খোলা জানলা। জানলা দিয়ে নিমগাছ চোখে পড়ছে। এক ঝাঁক চড়ুই আর শালিখ মাঠে নেমেছে। কাক ডাকছিল কোথাও।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, “আমাদের এখানে এখন এগারোজন রয়েছে, যারা দেখার মতন। কাজটাজ যারা করে তাদের কথা ধরছি না।” বলে সিদ্ধেশ্বর খাতার পাতা ওলটালেন। “এই এগারোজনের মধ্যে পাঁচজনকে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ করি। বাকি ছ'জন তুলনায় খানিকটা সাধারণ।”

“মহাদেবকে বাদ দিয়ে বলছেন?”

“হ্যাঁ।” মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। “যে পাঁচজনের কথা আমি বলছি—তাদের আমি পরে দেখাব। আগে শুধু তাদের পরিচয় শুনুন।”

বরদা কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে থাকল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, খাতায় চোখ রেখে, “প্রথম সীতারাম পাল। বয়স আটচল্লিশ। আদরার কাছে এক গ্রামে থাকত। ছেলেবেলায় এর কোনও বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। বছর কুড়ি-বাইশ বয়েসের সময় একবার আদরা প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে ছিটকে মাঠে পড়ে যায়। মাথায় চোট লেগেছিল, পা ভেঙে গিয়েছিল। ওই অ্যাক্সিডেন্টের পর সীতারাম শুধু বেঁচেই গেল না, ওর মধ্যে এক আশ্চর্য ক্ষমতা দেখা দিল। সীতারামের ডান হাতের কোথাও যদি কেটে চিরে দেওয়া যায়, তা হলে যেখান থেকে রক্ত পড়বে—বাঁ হাতেরও ঠিক সেই জায়গা থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত আসবে। এক হাতের যেখানে কালসিটে পড়ুক অন্য হাতেরও ঠিক সেই জায়গায় কালসিটে ফুটে উঠবে। যে-কোনও আঘাত, দুই অঙ্গে প্রায় সমানভাবে ফুটে ওঠে কেন? কী কারণে? আমরা এর কোনও সদুত্তর জানি না। সীতারাম এখানে বছর চারেক আছে। প্রথম থেকেই।”

বরদা শুনছিল। এই অদ্ভুত মানুষটির কথা সিদ্ধেশ্বর আগেও বলেছেন যেন।

“সীতারামের পর হল গোপীমোহন মণ্ডল। গোপীমোহনের বয়েস বছর চল্লিশ,” সিদ্ধেশ্বর বললেন। “গোপীমোহনকে আমরা পেয়েছি এক মেলায়। খেলা দেখাত গোপীমোহন। বরফের চাঁইয়ের ওপর শুয়ে থাকত; তার মুখের ওপর চাপানো থাকত সের খানেক বরফ। গোপীমোহনকে পনেরো-বিশ মিনিট পরে উঠিয়ে নিয়ে দেখা গিয়েছে, তার শরীর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে গরম হয়ে গিয়েছে নিজের থেকেই। এটা কেমন করে হয়?”

বরদার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। যত অদ্ভুত, বিদঘুটে যা কিছু সবই কি

সিদ্ধেশ্বররা এই পি পি রিসার্চ সেন্টারে জড়ো করে রেখেছেন? এটা নিশ্চয় কোনও পাগলাদের আড্ডা।

সিদ্ধেশ্বর খাতা উলটে তৃতীয়জনের নাম বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বাইরে যেন চেঁচামেচি শোনা গেল। আর তার পরই একজন ঘরে এল ঝড়ের ঝাপটার মতন। হাঁফাচ্ছিল। চোখমুখের চেহারা অস্বাভাবিক। লোকটা বলল, "বাবু, টাঙাঅলা আধ মাইলটাক দূরে মাঠে পড়ে আছে। টাঙাটা নেই। টাঙাঅলা বোধ হয় মারা গেছে।"

বরদা চমকে উঠল। বুকের কোথায় যেন এক ভয় ছিল লুকিয়ে, সেই ভয় সমস্ত বুকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, গলা বন্ধ হয়ে এল বরদার।

সিদ্ধেশ্বর খাতাটা টেবিলে ফেলে রেখেই উঠে পড়লেন।

বরদা চোখের পলক ফেলার আগেই সিদ্ধেশ্বর ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বিকেল পর্যন্ত সিদ্ধেশ্বরের খোঁজ পাওয়া গেল না।

বরদার ভাল লাগছিল না। সকালের দিকে তার মন-মেজাজ মোটামুটি ভালই ছিল, কিন্তু টাঙাঅলার খবরটা শোনার পর থেকেই বরদা কেমন মনমরা হয়ে গেল। বরদা এখানে একা। জায়গাটাও তার চেনা নয়। আর পি পি রিসার্চ সেন্টার তো একটা পাগল-টাগলদের আড্ডাখানা। এই রকম একটা জায়গায় বরদার একমাত্র ভরসা সিদ্ধেশ্বর। তিনিও নেই। টাঙাঅলার যে কী হল, সে মরল না বাঁচল, কাকে জিজ্ঞেস করবে বরদা? জনা দুই লোক—এখানে যারা কাজকর্ম করে—তারাও সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে চলে গেছে। বাদবাকি যারা, তারা কোনও খবর রাখছে বলেও মনে হল না বরদার।

কেমন একটা উৎকণ্ঠা ও ভয়ের মধ্যে দুপুরটা কাটল। এমনিতে তার কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না, স্নান-খাওয়া-দাওয়া কোনও কিছুর নয়, কিন্তু বরদাকে যে লোকটা দেখাশোনা করছিল সে টাঙাঅলা কিংবা সিদ্ধেশ্বরের খবর কিছুই দিতে পারল না।

বরদার মাথায় নানারকম চিন্তা আসছিল। সে ভেবে পাচ্ছিল না, যে টাঙাগাড়ি করে কাল তারা এতটা পথ এল, সেই টাঙার ঘোড়াটা হঠাৎ এই জায়গাটার কাছাকাছি এসে ওরকম লাফঝাঁপ শুরু করল কেন? ঘোড়াটা নিশ্চয় বুনো নয়, খ্যাপা নয়। যদি খ্যাপা ঘোড়া হত, টাঙাঅলা কি তাকে গাড়িতে জুড়ে নিত? অসম্ভব। সিদ্ধেশ্বর কাল বলেছিলেন, সব ঘোড়াই নাকি মাঝে-মাঝে পা ছোঁড়ে, চেঁচায় লাফিয়ে ওঠে। যদি তাই হয়, তবে আজ আবার সেই ঘোড়াটাই টাঙাঅলাকে মাঝমাঠে ফেলে দিয়ে পালাবে কেন?

কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না বরদা। ব্যাপারটা তার কাছে সহজ বা স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না।

দুপুরে শুয়ে শুয়ে বরদার রীতিমতো দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। কলকাতা ছেড়ে এইভাবে চলে আসা তার উচিত হয়নি। মানিক বারণও করেছিল। বরদা ঝোঁকের মাথায় চলে এল—সিদ্ধেশ্বরকে ভরসা করে। সিদ্ধেশ্বরকে কতটুকু চেনে বরদা? মুখের কথায় বিশ্বাস করেছে সে। কে বলতে পারে, সিদ্ধেশ্বর মুখে যা বলেছেন, কাজে তার উলটো

করবেন না? মানুষকে কি এত সহজে বিশ্বাস করা ঠিক হয়েছে!

দুপুর ফুরিয়ে বিকেল হল। বরদা বাইরে এসে দাঁড়াল একবার। এখনও রোদ রয়েছে গাছের মাথায়, আকাশ পরিষ্কার, জঙ্গলের বাতাস আসছিল, মাটির গন্ধও নাকে আসে। কিন্তু পুরো জায়গাটাই কেমন চুপচাপ। দু-চারজনকে চোখে পড়লেও যে যার নিজের মতন কাজকর্ম করে যাচ্ছে। মনেই হয় না, টাঙাঅলাকে নিয়ে কারও কোনও দুশ্চিন্তা রয়েছে।

বরদা ঠিক করল, সে এখানে থাকবে না। কালই চলে যাবে। সিদ্ধেশ্বরকে বলবে, "আমায় ছেড়ে দিন মশাই, আমি আপনাদের এ-সবের মধ্যে নেই, আমার ভাল লাগছে না।"

বিরক্ত হয়েই বরদা তার ঘরের সামনে পায়চারি করছিল, বিকেলও ফুরিয়ে এল, এমন সময় সিদ্ধেশ্বরকে দেখা গেল; তিনি ফিরলেন।

বরদা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সিদ্ধেশ্বরের কাছে গেল।

কাছে গিয়েই থমকে গেল। মানুষটিকে যেন আর চেনা যায় না। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কেমন চেহারা হয়ে গেছে সিদ্ধেশ্বরের। ধুলোয় ভরা বেশবাস। মাথার চুল রুক্ষ, এলোমেলো; সমস্ত মুখ কালচে, শুকনো। ভীষণ ক্লান্ত, হতাশ, বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল সিদ্ধেশ্বরকে। একটা চোখ আরও ফোলা-ফোলা দেখাচ্ছে।

বরদা টাঙাঅলার কথা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, তার আগেই সিদ্ধেশ্বর বললেন, "পরে বলব। সন্ধেবেলায়। আপনার ঘরে আসব।"

কোনও কথা বলার সুযোগ হল না বরদার; সিদ্ধেশ্বর ক্লান্ত পায়ে চলে গেলেন। বরদার মনে হল, টাঙাঅলা আর বেঁচে নেই।

দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল বরদার। আহা, বেচারা টাঙাঅলা!

সন্ধেবেলায় ঘরে লণ্ঠন জ্বলছিল।

বরদা বিছানায় বসে। সিদ্ধেশ্বর ঘরে এলেন।

হাত মুখ ধুয়ে-মুছে, জামা-টামা পালটে সামান্য ভালই দেখাচ্ছিল সিদ্ধেশ্বরকে, অন্তত বিকেলের সেই ঝোড়ো চেহারা আর তেমন প্রকটভাবে চোখে পড়ছিল না।

বরদা বলল, "আসুন। আপনার কথাই ভাবছিলাম।"

সিদ্ধেশ্বর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে বরদার কাছাকাছি বসলেন।

বরদা বলল, "টাঙাঅলা বেঁচে আছে?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর ধীরে-ধীরে। "না।"

বরদা যেন জানত কথাটা। চমকাল না। কিন্তু মুখ কালো হয়ে গেল।

চুপচাপ। বরদা কয়েক পলক সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকিয়ে থেকে অন্য দিকে চোখ সরাল। দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল তার। সিদ্ধেশ্বরও কেমন বিষণ্ণ মুখ করে বসে থাকলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সিদ্ধেশ্বর হঠাৎ বললেন, "আপনার কাছে সিগারেট আছে? দিন তো একটা, খাই।"

বরদার সিগারেট কমে এসেছিল। প্যাকেটটা এগিয়ে দিল।

সিদ্ধেশ্বর একটা সিগারেট নিয়ে দেশলাই চাইলেন।

বরদা এই ক'দিনের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরকে সিগারেট খেতে দেখেনি। এই প্রথম। হয়তো মানসিক অস্থিরতার জন্যে সিদ্ধেশ্বর সিগারেট খেতে চাইছেন।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমি ছিলাম না, আপনার কোনও অসুবিধে হয়নি তো?"

"না।"

"সময়মতন খাবার দিয়ে গিয়েছিল?"

"দিয়েছিল।"

"বিকেলে চা-জলখাবার পেয়েছেন?"

" চা খেয়েছি। জলখাবার খাইনি। ইচ্ছে করছিল না।"

"আর একবার দেবে। চা আনতে বলে এসেছি।"

বরদা অধৈর্য হয়ে বলল, "টাঙাঅলার কথা বলুন।"

সিদ্ধেশ্বর যেন চোখ সরিয়ে নিলেন। "কী বলব?"

"টাঙাঅলা কি মাঠেই মরে পড়ে ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"টাঙাটা ছিল?"

"কাছে ছিল না। দূরে ছিল। উলটে পড়েছিল, কাত হয়ে।"

"ঘোড়াটা?"

"জানি না।"

বরদা বেশ বুঝতে পারল, তার বুকের মধ্যে কেমন ধকধক করছে। উত্তেজনা, না ভয়?

বরদা সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "আপনি টাঙাঅলাকে নিয়ে কোথাও গিয়েছিলেন।"

মাথা হেলালেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "আমি জানতাম ও মারা গেছে। তবু নানারকম চেষ্টা করে দূরের একটা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"আপনি হাসপাতালে গিয়েছিলেন?"

সিদ্ধেশ্বর সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে বললেন, "টাঙা থেকে পড়ে কেউ ওভাবে মরে না।"

বুঝল না বরদা। "মানে?"

"মানে, কেউ টাঙা থেকে পড়ে গেলে ওভাবে মরে বলে আমার মনে হল না!"

"কী মনে হল আপনার?"

সিদ্ধেশ্বর আলগা করে সিগারেটে টান দিলেন, অন্যমনস্ক। বললেন, "আমার মনে হল কেউ যেন ওর ঘাড় ভেঙে দিয়েছে—যাকে আমরা মটকানো বলি। মাথার চেয়ে ঘাড়ই বেশি জখম। শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছিল।"

বরদা অবাক হয়ে বলল, "টাঙা থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে ঘাড় মটকে যেতে পারে

না? নাকি শিরদাঁড়া ভাঙতে পারে না?"

"পারে হয়তো। কিন্তু আমি যা চোখে দেখেছি, তাতে আমার মনে হল, আসুরিক কোনও শক্তি যেন তার ঘাড় ভেঙে মাথা মুখ প্রায় ঘুরিয়ে দিয়েছে, শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে ফেলেছে।"

বরদা চোখ বন্ধ করে ফেলল প্রায়। সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে মাঠে টাঙাঅলাকে দেখতে যাবার একটা ইচ্ছে সকালে তার একবার হয়েছিল। ভাগ্যিস যায়নি! সিদ্ধেশ্বর যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়, তবে সেই দৃশ্য বরদা দেখতে পারত না চোখে। মানুষের মুখ যদি উলটে ঘাড়ের দিকে চলে যায়—কী বীভৎস না দেখতে লাগে!

সিদ্ধেশ্বর নিজেই বললেন, "অথচ, দিনের বেলায় ফাঁকা মাঠে কে আর আসবে ওকে মারতে?"

"আপনি—" বরদা বলল, "আপনি মারার কথা কেন বলছেন?"

"জানি না। মনে হচ্ছে।"

"হাসপাতালে কিছু বলল না?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "আপনারা কলকাতার লোক, যা হয় সবই কলকাতার চোখ নিয়ে দেখেন। এখানে অত ব্যবস্থা নেই। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ছোট একটা হাসপাতাল। জ্বর-জ্বালার মিক্সচার দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু জানে না। তবু নেহাত দায়ে পড়ে নিয়ে গিয়েছিলাম হাসপাতালে। মরা মানুষকে হাসপাতালে দিয়ে কী আর লাভ হবে বলুন!" সিদ্ধেশ্বর বললেন ক্ষোভের গলায়।

বরদা কথা বলল না। সিদ্ধেশ্বর হয়তো ঠিকই বলেছেন, এই দেহাতের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। কলকাতা হলে অন্য কথা ছিল।

"ওর লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে," সিদ্ধেশ্বর বললেন, "কাল সকালে পোড়াতে নিয়ে যাবে।"

"হাসপাতালেই রেখে এসেছেন ডেড বডি?"

"হ্যাঁ।"

"তবু ডাক্তার কিছু বলল না দেখে শুনে?"

"না। টাঙা থেকে পড়ে মাথায়, ঘাড়ে-পিঠে চোট খেয়েছে শুনে খাতায় বোধহয় লিখে নিল।"

"তার মানে অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। "হ্যাঁ।"

দরজায় শব্দ হল।

সিদ্ধেশ্বর উঠলেন। দরজা খুলে দিলেন।

চা নিয়ে এসেছিল একজন। চা দিয়ে চলে গেল।

দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিয়ে এলেন সিদ্ধেশ্বর। চা খেতে খেতে বললেন, "আমি নিজেই খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি।"

চোখ তুলে তাকাল বরদা। "আমারও কেমন লাগছে! কাল আমরা যখন আসছিলাম, টাঙার ঘোড়াটা কোনও গোলমাল করেনি। হঠাৎ এখানে এসে ওরকম

খ্যাপার মতন লাফাতে লাগল কেন?”

সিদ্ধেশ্বর নীরব থাকলেন।

অপেক্ষা করে বরদা বললে, “আজ সকালে আমি ঘোড়াটাকে দেখেছি। গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল। আজ তো সে শান্তই ছিল। অবশ্য, আমি দূর থেকে দেখেছি।”

সিদ্ধেশ্বর বললেন, “ঘোড়াটা গাড়িতে জুতে নেবার সময় টাঙাঅলা নিশ্চয় দেখেছিল। তার যদি মনে হত, ঘোড়া বেচাল রয়েছে, গাড়িতে জুতে নিত না।”

“তা হলে?”

সিদ্ধেশ্বর অন্যমনস্ক গম্ভীর মুখে বললেন, “তাই ভাবছি।”

বরদা চা খেতে খেতে বলল, “আপনাদের এখানে নানারকম অদ্ভুত মানুষ থাকে। তারা অবাক-অবাক কাণ্ড করতে পারে। আপনিই বলেছেন। এদের মধ্যে এমনকী কেউ রয়েছে, যে এইসব করতে পারে? মানে এমন কেউ কি আছে যার শয়তানি করার অশেষ ক্ষমতা?”

সিদ্ধেশ্বর কয়েক পলক দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। চুপচাপ। চা খেলেন। তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, “ছিল। এখন নেই।”

“মানে?” বরদা কেমন চমকে উঠল। “মহাদেব ছাড়া আরও শয়তান ছিল?”

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। “এই কাজটা মহাদেবের নিজের হাতে করার নয়। তার এরকম কোনও ক্ষমতা নেই। আমি অন্য একজনের কথা ভাবছি।”

“কে?”

“আপনি তাকে দেখেননি। সুজন মালাকার।”

বরদার কানে নামটা নতুন শোনাল। সকালে সিদ্ধেশ্বর খাতা খুলে যাদের নামধাম পরিচয়ের কথা পড়ে শোনাচ্ছিলেন, তাদের মধ্যে সুজন মালাকার ছিল না। থাকার কথাও নয়। কেননা সিদ্ধেশ্বর জনা দুয়েকের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন মাত্র, বাকিদের পারেননি। টাঙাঅলার খবর শুনে খাতা ফেলে রেখে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। “তা ছাড়া সুজন তো এখন নেই”, বললেন সিদ্ধেশ্বর।

বরদা বলল, “সুজন মালাকার! নাম যার সুজন সে এত—”

বাধা দিয়ে সিদ্ধেশ্বর বললেন, “সুজন নিজে যে শয়তান ছিল তা নয় । কিন্তু তার এমন কিছু ক্ষমতা রয়েছে যা মানুষের অনেক সময় ক্ষতি করতে পারে। কেউ যদি সুজনকে কাজে লাগাতে চায়, লাগাতে পারে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, সুজনকে কেউ কাজে লাগিয়েছে।”

বরদা অবাক হয়ে বলল, “মহাদেব কি সুজনকে হাত করেছে?”

“করতে পারে।”

“আপনি কি তাকেই সন্দেহ করছেন?”

“অন্য কারুর কথা মনে পড়ছে না। টাঙাঅলা যেভাবে মারা গেছে তাতে আমার সন্দেহ হচ্ছে, সুজন ওই টাঙায় উঠেছিল। কোথা থেকে উঠেছিল আমি জানি না। তাকে কেউ দেখেনি। সুজনকে এমনিতে দেখলে মনেই হবে না, তার আসুরিক কোনও শারীরিক শক্তি আছে। কিন্তু এক-একসময় তার বেঁটেখাটো রোগাটে চেহারায়

আসুরিক এক শক্তি এসে হাজির হয়। সে শক্তি আমরা কল্পনা করতে পারব না।"

"কিন্তু টাঙাঅলার সঙ্গে তার শত্রুতা কীসের?"

"কোনও শত্রুতাই থাকার কথা নয়।"

"তবে?"

"বুঝতে পারছি না।"

বরদা সামান্য চুপচাপ থেকে শেষে বলল, "সুজন এখন কোথায় থাকে?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "এখানে কিছুদিন ছিল। মাস কয়েক। তাকে এখানে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। আমরা তাকে আর রাখতে চাইলাম না। এমনিতে তো ভালই, সাদামাটা, কিন্তু এক এক সময় তাকে কোনও শয়তান যেন ভর করত। তখন তাকে সামলাবার সাধ্য আমাদের ছিল না। ও ভীষণ বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। তখন আমরা তাকে তাড়িয়ে দিই।"

"সেই রাগেই কি—"

"না না। তা মনে হয় না। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, সুজন এদিকে আর নেই। আজ আমার মনে হচ্ছে, সুজন কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে।"

বরদা জিজ্ঞেস করল, "সুজনকে আপনারা কতদিন আগে তাড়িয়ে দিয়েছেন?"

"মাসখানেক আগে।"

বরদা কী ভেবে বলল, "মহাদেব তা হলে সুজনকে চেনে?"

"চেনে। ভাল করেই।"

"তা হলে কি মহাদেবের কোনও হাত আছে?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "অসম্ভব নয়।"

বরদা আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সিদ্ধেশ্বর উঠে পড়লেন। বললেন, "আমি যাচ্ছি। সাবধানে থাকবেন। কাল সকালে কথা হবে।"

সিদ্ধেশ্বর চলে গেলেন।

পরের দিন খানিকটা বেলায় সিদ্ধেশ্বরের লোক এসে বরদাকে ডেকে নিয়ে গেল অফিস-ঘরে।

সিদ্ধেশ্বর অফিসেই ছিলেন। গতকালের ধকল সামলে উঠতে পারেননি। চোখমুখ বসে রয়েছে, রুক্ষ-রুক্ষ চেহারা।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "বসুন। রাত্রে কোনও অসুবিধে হয়নি তো!"

বরদা বলল, "না। আপনি কেমন আছেন? কপালে ঘা?"

"ব্যথা কমছে।"

আরও কয়েকটা সাধারণ কথাবার্তার পর সিদ্ধেশ্বর বললেন, "কাল টাঙাঅলার ব্যাপারটার জন্যে সারাটা দিন বাইরেই কাটাতে হল। কোনও কাজ হল না। আজ আপনাকে নিয়ে আমাদের এই জায়গাটায় একটু ঘুরব। কাল আপনাকে কার-কার কথা বলেছি যেন?"

বরদা বলল, "দুজনের কথা বলেছেন।"

"ও, হ্যাঁ; মনে পড়েছে । সীতারাম আর গোপীমোহনের কথা বলেছি।" বলে সিদ্ধেশ্বর গতকালের সেই খাতাটা টেনে নিলেন।

বরদার মনে হল, সিদ্ধেশ্বর আগে থেকেই খাতা সাজিয়ে নিয়ে বসে ছিলেন।

খাতার ওপর হাত রেখে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "সীতারাম আর গোপীমোহনের কথা আপনার মনে আছে তো?"

ঘাড় হেলাল বরদা। তার মনে আছে। সীতারামের শরীরের একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। তার ডান কিংবা বাঁ অঙ্গ যেন এক; ডান হাতের কোথাও কেটে গেলে বাঁ হাতেরও মোটামুটি সেই একইরকম জায়গা থেকে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়ে। আশ্চর্য! আর গোপীমোহন—যে লোকটা নাকি মেলায় খেলা দেখিয়ে বেড়াত তার এমনই এক ক্ষমতা যে, বরফের চাঁইয়ের ওপর দশ পনেরো মিনিট শুইয়ে রেখে তারপর উঠিয়ে নিলে লোকটার শরীর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে গরম, স্বাভাবিক হয়ে আসে।

দুজনের কাউকেই স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে ফেলা যায় না। এদের যে এরকম কোনও ক্ষমতা আছে তাও বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু বরদা আপাতত বিশ্বাস করে নিচ্ছে। সিদ্ধেশ্বর এইসব অবিশ্বাস্য আজগুবি ব্যাপার দেখাবার জন্যেই তো তাকে টেনে এনেছেন।

সিদ্ধেশ্বর খাতার পাতা আর ওলটালেন না, বললেন, "আমি মুখেই বলি, খাতা খোলার দরকার নেই। সীতারাম আর গোপীমোহনের পর রয়েছে আমাদের অর্জুনপ্রসাদ, বংশী মাঝি আর গদাধর রায়। এই পাঁচজন হল আমাদের সবচেয়ে বেশি নজর করার লোক। এদের আমরা গ্রুপ 'এ'র মধ্যে ফেলি। অবশ্য তার মধ্যেও একটা ইতরবিশেষ রয়েছে।"

বরদা বলল, "অর্জুনপ্রসাদের স্পেশ্যালিটি কী?" বলে হালকা মুখে হাসল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "অর্জুনপ্রসাদ বেহারি। তার বাড়ি মুঙ্গেরে। বয়েস বছর চব্বিশ। অর্জুনপ্রসাদ ছেলেবেলায় তার বাবার সঙ্গে তুলোর দোকানে কাজ করত। বাবা মারা যাবার পর সে এখানে-সেখানে কাজ করে বেড়িয়েছে। শেষে ও রেলস্টেশনে চাঅলার কাজ করত। আমরা যখন তাকে নিয়ে আসি, তখন অর্জুনের অসুখ। লোকে বলত, তাকে ভূতে ধরেছে। এখানে আসার পর ধীরে-ধীরে সে ভাল হয়ে ওঠে।"

"তা না হয় হল, কিন্তু অর্জুনপ্রসাদের বিশেষ ক্ষমতাটা কী?"

"সেটা আপনাকে আগে বলব না। নিজের চোখেই দেখবেন।" সিদ্ধেশ্বর এমন মুখ করলেন যেন রহস্যটা চাপা দিয়ে রেখে মজা পাচ্ছেন।

বরদা বলল, "বেশ, স্বচক্ষেই দেখা যাবে।...আপনার অন্য দুই ওয়ান্ডার ম্যানের কথা বলুন—বংশীবদন আর, কী বললেন যেন, গদাধর?" বরদা হাসল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "বংশীকে আমরা জোগাড় করেছি কয়লাকুঠি থেকে। তার বাড়ি পাণ্ডবেশ্বর। বংশীর বয়েস বছর পঞ্চাশ। ও চোখে দেখতে পায় না। তার মানে বংশী জন্মান্ধ নয়, একবার আগুনের এক হলকা লেগে তার মুখের চামড়া পুড়ে যায়, চোখও অন্ধ হয়ে যায়। বংশী অন্ধ। আপনি ওকে দেখলেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু ওই

বংশীকে আপনি অন্ধকারে বাইরে নিয়ে আসুন, সে আপনাকে হাতে ধরে এখানকার প্রত্যেকটি জায়গায় নিয়ে যাবে, কোথায় কী আছে বলে দেবে, কে সামনে এসে দাঁড়াল তাও জানিয়ে দেবে। এমনকী—বংশী আপনাকে আকাশের কোথায় কোন তারা ফুটে আছে তাও বলে দিতে পারবে।"

বরদার বিশ্বাস হল না। বলল, "অন্ধরা অভ্যাসবশে অনেক কিছু পারে।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। কিন্তু কোনও অন্ধই তার অভ্যস্ত জীবনের বাইরে কিছু পারে না । বংশী পারে। আপনি নিজেই দেখবেন।"

বরদা আর ঘাঁটাল না। বলল, "এবার আপনাদের গদাধরের ইতিহাসটা শুনি।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "গদাধর পেশায় ছিল কুমোর। বাঁকুড়া জেলায় বাড়ি। হাঁড়িকুড়ি গড়ত। হাটে-বাজারে বেচত। তার মা বসন্ত রোগে মারা যায়। মা মারা যাবার পর থেকে গদাধর কেমন হয়ে যায়, খ্যাপাটে গোছের। নিজের খেয়ালে ঘুরে বেড়াত। একবার সে কোন শ্মশানে গিয়েছিল এক তান্ত্রিক সাধু দেখতে। তারপর কী হয়েছিল আমরা জানি না, গদাধরও বলতে পারে না। কিন্তু ওর মধ্যে একটা আশ্চর্য ক্ষমতা দেখা দেয়। গদাধর এমন অনেক কিছু আগে থেকে অনুভব করতে পারে যা আমরা পারি না।"

"যেমন" বরদা জিজ্ঞেস করল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "যেমন, অশুভ কিছু ঘটার আগে গদাধর হঠাৎ আপনাকে বলে দিতে পারে, কী ঘটবে। আপনাকে সাবধান করে দিতে পারে। সত্যি বলতে কী, আমাদের এখানে একজন ছিল, যে গদাধরের এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে ওকে এখানে নিয়ে আসে। অথচ এমনই কপাল, গদাধর তাকে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও সে দুমকা যাচ্ছিল সাইকেলে চেপে। তখন বর্ষাকাল। বাজ পড়ে মারা যায়।"

বরদা বলল, "এ-রকম আর-একজনের কথা আপনি আমায় আগেও বলেছেন।"

"হ্যাঁ, এক সন্ন্যাসীর কথা। সূর্যপূজারি। আমার বাবা সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।"

"গদাধর কি সেই ধরনের মানুষ?"

"না, গদাধর সাধারণ মানুষ; খ্যাপাটে। তার কোনও সাধনভজন নেই। কখনও-কখনও নিজের মনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গায়, ঠাকুর-দেবতার গান। সে আমাদের এই বাগানটাগান নিয়ে সময় কাটায়। নিজের মতন থাকে। তাকে কেউ কিছু বলে না।"

"আমি বোধ হয় তাকে দেখেছি। বাগানে।"

"দেখতে পারেন।"

সিদ্ধেশ্বর উঠলেন। বললেন, "চলুন, আমরা ওদিকে যাই।"

বাইরে এসে দাঁড়াল বরদারা।

খানিকটা বেলা হয়েছে। রোদ দেখে মনে হয় দশটার কাছাকাছি। আকাশ পরিষ্কার। গাঢ় নীল। উঁচুতে বুঝি চিল উড়ছে। লোকজনের গলা শোনা যাচ্ছিল। কাছাকাছি কোথা থেকে কাঠ কাটার শব্দ ভেসে আসছিল। বোধ হয় রান্নাঘরের দিকে

কেউ কাঠ চেরাই করছে।

বরদা বলল, "আপনাদের এই পি পি রিসার্চ সেন্টার বাইরে থেকে দেখলে কেমন যেন আশ্রম-আশ্রম লাগে, মশাই। মনেই হয় না—এখানে কিছু অ্যাবনরম্যাল লোকজন জুটিয়ে রেখেছেন।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমাদের এখানে যারা থাকে তাদের দেখলে আপনি চট করে কিন্তু বুঝতে পারবেন না কারও কোনও অস্বাভাবিকতা রয়েছে। দু-এক জায়গায় অবশ্য পারলেও পারতে পারেন।...ওই যে দেখুন—ওর নাম গোপীমোহন।"

বরদা তাকাল। টালি-ছাওয়া ব্যারাক বাড়ির সামনে একটা ছিপছিপে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক ঝাঁক পায়রাকে দানা খাওয়াচ্ছে।

লোকটিকে বরদা কালও দেখেছে। যদিও বরদা এখানে নতুন, তবু পুরো একটা দিন তার এই চৌহদ্দির মধ্যে কেটেছে, নামে না জানুক—চোখে অন্তত সবাইকেই প্রায় দেখেছে কাল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনাকে যে জনা পাঁচেকের কথা বলেছি, তারা ছাড়া আরও জনা পাঁচ-ছয় রয়েছে এখানে, যাদের আমরা অতটা নজর করি না, কিন্তু তারাও আমাদের চোখের বাইরে থাকে না। মজাটা কী জানেন বরদাবাবু, সাধারণ মানুষ যেভাবে খায়-দায়, ঘুরে বেড়ায়, কাজ করে, এরা এখানে সকলেই প্রায় সেইভাবে থাকে। কখনও-কখনও ওদের মধ্যে কারও ব্যবহারে ইতরবিশেষ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর আলাদা করে নজর দিতে হয়।"

"সবাই কি ওই টালির বাড়িতে থাকে?"

"না। পাশের বাড়িতেও থাকে।"

"তা আপনাদের এমন কোনও ঘরটর নেই যেখানে এদের ওপর পরীক্ষা চালান?"

"আছে বই কী। এই খড়ের ঘরের পাশে, এখান থেকে আড়াল পড়ে গেছে, ছোট-ছোট দুটো ঘর আছে। একটায় কিছু ওষুধপত্তর থাকে। অন্য ঘরটায় দরকার মতন পরীক্ষা করা হয়।"

"কে করে?"

"সতীশ।"

"কে সতীশ?"

"সতীশের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়নি। তাকে দেখেননি আপনি। সে এখানে একটানা থাকে না। সপ্তাহে দুবার করে আসে। যেদিন আসে, সেদিন থেকে যায়। আজ তার আসার দিন। নয়তো কাল আসবে।"

"সতীশ কি ডাক্তার?"

"হ্যাঁ। ডিগ্রি আছে। আবার সাইকোলজিস্ট।"

বরদা কোনও কথা বলল না।

টালি দেওয়া বাড়িটার কাছাকাছি এসে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "এখানে যারা আছে তারা মানুষ হিসেবে যতই অদ্ভুত হোক, সকলেই প্রায় সরল, সাধারণ, লেখাপড়াও তেমন কিছু জানে না, কেউ কেউ নিরক্ষর। আমি এদের কাছে বলব, আপনি জলের

পাম্প কোম্পানির লোক, কলকাতা থেকে দেখতে এসেছেন, জলের কী ব্যবস্থা করা যায়। ওরা কেউ কিছু বুঝবে না। আপনাকে কোনও গোলমেলে কথাও জিজ্ঞেস করবে না। মহাদেবই আপনাকে জ্বালাতে পারে। ওই লোকটাই ধুরন্ধর, শঠ। একটা জিনিস আপনি লক্ষ করবেন, যতক্ষণ আমি আপনার কাছাকাছি থাকব, মহাদেব এ-পাশে ঘেঁষবে না। আপনি কি ওর মুখ দেখতে পাচ্ছেন?"

"না।" বরদা মাথা নাড়ল। মহাদেবকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না।

"কাল বিকেলে ওকে দেখেছিলেন?"

"লক্ষ করিনি। তবে চোখে পড়লে মনে থাকত।"

"কাল থেকেই ও গা-ঢাকা দিয়ে আছে।"

"কেন?"

"টাঙাঅলা।"

বরদা সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকাল। "টাঙাঅলা তো ওর কোনও ক্ষতি করেনি।"

"না," মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর, "টাঙাঅলা ওর কোনও ক্ষতি করেনি।"

"তবে?"

সিদ্ধেশ্বর অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি তার ক্ষতি করতাম। আপনাকে আমি যখন নিয়ে এলাম এখানে, তখন থেকেই ও বুঝেছে ওর সর্বনাশ করার জন্যেই আমি আপনাকে এনেছি।"

বরদা ভাল বুঝতে পারল না কথাটা। বলল, "আপনি যদি এতই বুঝেছিলেন তা হলে—"

বাধা দিয়ে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমার দুটো ভুল হয়েছিল। বড় ভুল। আমি বুঝতে পারিনি এত তাড়াতাড়ি মহাদেব আমাকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করবে, আর এইরকম ভয়ংকর এক শিক্ষা। আগে বুঝতে পারলে টাঙাঅলাকে আমি বাঁচাতে পারতাম।"

বরদা বলল, "অন্য ভুলটা কী করলেন?"

"সুজন মালাকার। আমি কল্পনাই করিনি সুজন মালাকার আশেপাশে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে। এখন বুঝতে পারছি, এই মহাদেব শয়তান সুজনকে পুষে রেখেছিল। মানুষ যেভাবে তার ডালকুত্তা পোষে, মহাদেব সেইভাবে আমাদের চোখের আড়ালে সুজনকে পুষছিল। তাক বুঝে তাকে লেলিয়ে দিয়েছে।"

বরদা কথা বলতে পারল না। সিদ্ধেশ্বরের চোখমুখ যেন রাগে, ঘৃণায় ক্ষোভে টকটকে হয়ে উঠেছে।

মাত্র কয়েক পা হেঁটে সিদ্ধেশ্বর হঠাৎ বললেন, "বরদাবাবু, আমার প্রথম কাজ হবে সুজনের খবর নেওয়া। সে এখানে কোথায় আছে? কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে? কাল সে কোথায় ছিল? কখন সে টাঙাঅলার গাড়িতে চেপেছে?"

বরদা বলল, "এসব খবর আপনি কার কাছে পাবেন?"

"অর্জুনপ্রসাদের কাছে।"

"অর্জুনপ্রসাদ কি মহাদেবের দলে?"

"না। কিন্তু অর্জুনপ্রসাদ পারে। ওর এই ক্ষমতা আছে। যদি ভগবান দয়া করেন, অর্জুন আমাদের অনেক কিছু বলে দিতে পারবে। চলুন।"

বরদা কিছুই বুঝল না, সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে এগিয়ে গেল।

অর্জুনপ্রসাদ তার ঘরে ছিল না। সামান্য তফাতে গাছতলায় কাঠ-কুটো নিয়ে কাজ করছিল। সিদ্ধেশ্বর তাকে ডাকলেন।

অর্জুন যেন এক দৌড়ে চলে এল। সিদ্ধেশ্বরকে খুব খাতির করে যে বোঝাই যায়। তবে বরদার মনে হল না, অর্জুনের কোনও বিশেষ ক্ষমতা আছে। তার চেহারা থেকে সেটা অন্তত একেবারেই বোঝা যায় না। চব্বিশ বছরের জোয়ান চেহারা কি এই? মাথায় বেঁটে, গায়ে খরা, মুখে দু-চারটে দাগ বসন্তের। মাথার চুল খোঁচা খোঁচা। পরনে একটা পাজামা, গায়ে ছাই রঙের শার্ট। বরদা লক্ষ করে দেখল, অর্জুনের চোখ দুটোই যা বড় বড়, মুখের তুলনায় অস্বাভাবিক বড়, আর প্রায় গোল ধরনের দেখতে।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "কী করছিলে?"

অর্জুন কেমন যেন লজ্জা পেয়ে মাথা চুলকে বলল, "পিন্‌জ্‌রা।"

সিদ্ধেশ্বর একটু হাসলেন। তারপর ইশারা করে বললেন, "তোমার সঙ্গে দরকার আছে। অন্য কোথাও চলো।...ঘরে যাবে? না, থাক—; তুমি আমার সঙ্গে চলো।"

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে ডেকে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

সামান্য একটু এগিয়ে সিদ্ধেশ্বর সেই ছোট-ছোট দুটো ঘরের একটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন দুটো ঘরেরই দরজায় তালা। তাঁর কাছে চাবি নেই।

অর্জুনকে পাঠাতে পারতেন সিদ্ধেশ্বর চাবি আনতে, পাঠালেন না; নিজেই চলে গেলেন। বরদাকে বললেন, "দাঁড়ান, আমি আসছি।"

বরদা আর অর্জুন দাঁড়িয়ে থাকল।

কৌতূহল হচ্ছিল বরদার। অর্জুনের সঙ্গে দু-একটা কথা বলার চেষ্টা করল। অর্জুন বেশ মজার বাংলা বলে, দেহাতি হিন্দি মেশানো বাংলা, শুনতে ভালই লাগে।

"তোমার বাড়ি কোথায়, অর্জুন?"

"মুঙ্গের।"

"দেশে কেউ আছে?"

"কোই না, বাবু।"

"এখানে কত দিন আছ?"

"দো সাল, কুছ জাদা, বেশি হবে বাবুজি।"

"তুমি কি খাঁচা তৈরি করতে পারো?"

অর্জুন সরল মুখ করে হাসল।

সিদ্ধেশ্বর ফিরে এলেন চাবি নিয়ে।

ছোট ঘরের একটার তালা খুললেন। বরদারা ভেতরে ঢুকল।

ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায় এটা ওষুধপত্র রাখার ঘর। এক কোণে একটা আলমারি,

কাচের পাল্লা। আলমারির মধ্যে নানা ধরনের শিশি, বোতল, কৌটো। দেয়াল-তাকে পেটমোটা জার। একটা মাইক্রোস্কোপও রাখা আছে। আরও কিছু টুকিটাকি।

মাত্র একটা চেয়ার, সরু বড় টেবিল আর বেঞ্চি ছাড়া ঘরে অন্য আসবাব নেই। ঘরটা ছোট, নড়াচড়ার জায়গাও কম।

সিদ্ধেশ্বর জানলা দুটো খুলে দিলেন।

বরদাকে বসতে বললেন চেয়ারে। তারপর অর্জুনের দিকে তাকালেন। বললেন, "অর্জুন, আমি সুজনের খবর চাই।"

অর্জুন তাকাল। অবাক হয়েছে যেন। বলল, "সুজন! ও তো ভেগে গেছে, বাবু।"

"না। আমরা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ও যায়নি। আমার বিশ্বাস আশেপাশে কোথাও আছে! তুমি চেষ্টা করে দ্যাখো যদি ওকে দেখতে পাও।"

অর্জুন কিছুক্ষণ সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সিদ্ধেশ্বর অর্জুনকে বেঞ্চিতে বসতে বললেন।

অর্জুন বসল। বসে ঘরের চারদিকে তাকাল, তারপর জানলার দিকে বার-বার তার চোখ ফেরাতে লাগল।

সিদ্ধেশ্বর বুঝতে পারলেন, বাইরের আলো অর্জুনের পছন্দ হচ্ছে না।

" জানলা বন্ধ করে দেব?"

"থোড়া দিন।"

জানলা পুরো বন্ধ না করলেও অনেকটা ভেজিয়ে দিলেন সিদ্ধেশ্বর।

বরদা কিছুই বুঝতে পারছিল না। তার অবাক লাগছিল। অর্জুন কেমন করে সুজনের খবর জানবে?

অর্জুন বেঞ্চির ওপর বসে একটু সময় চোখ বুজে থাকল, তারপর তাকাল। মাথা তুলে ছাদ দেখল, দু হাতের তালুতে নিজের চোখ ঢেকে রাখল কিছুক্ষণ।

সিদ্ধেশ্বর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে।

অর্জুন হাত সরিয়ে নিল মুখের ওপর থেকে। নিচু মুখ করে বসল এবার, ঘাড় হেঁট।

বরদা অর্জুনকে দেখছিল। ঘরের মধ্যে আলোর ভাব কমে এসে ছায়া-ছায়া দেখাচ্ছে। বাইরে থেকে হালকা শব্দ ভেসে আসছিল মাঝে-মাঝে। পাখির ডাকও। অর্জুন নিচু মুখ করে বসে থাকতে থাকতে অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলল। চোখের পাতা বোজা। বরদা দেখল, অর্জুনের মুখের চেহারা পালটে গেছে। ঠিক কেমন যে দেখাচ্ছিল বরদা বুঝল না, তবে তার মনে হল—মানুষ যদি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, কিংবা আধো-আধো ঘুমে, তা হলে অনেকটা এইরকম দেখাতে পারে। একে কি সম্মোহিত অবস্থা বলে? কে জানে? অর্জুনের মুখ শান্ত, ঘুম-ঘুম। স্বাভাবিক ভাবেই নিশ্বাস নিচ্ছিল।

আরও খানিকটা সময় কেটে গেল। সিদ্ধেশ্বর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁর পলক পড়ছে না। তিনি যেন প্রত্যাশার মুখ নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

অর্জুন কিছুই বলছিল না। ঠোঁট বুজে আছে। একটুও নড়াচড়া করছে না।

বরদার কৌতূহল থাকলেও সে অর্জুনের ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না। অর্জুন কি ধ্যান করছে? কীসের ধ্যান?

শেষ পর্যন্ত অর্জুনের গলায় শব্দ ফুটল। অস্পষ্ট। কপাল কুঁচকে গেল, মুখের পেশি-টেশি কাঁপল সামান্য। অর্জুন বলল, "সুজন—সুজন আছে।"

"দেখতে পাচ্ছ?" সিদ্ধেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ।" মাথা আরও উঁচু করল।

"কী দেখতে পাচ্ছ?"

"সুজন খাটিয়ায় বসে আছে।"

"কোথায়?"

"পেড় আছে, লোটা আছে, একটা কুত্তাও আছে। পিছে..."

"কী আছে পেছনে?"

অর্জুনের কপাল আরও কুঁচকে গেল। চোখের পাতাও। যেন সে দেখবার চেষ্টা করছে সুজনের পেছনে কী আছে।

বরদা অবাক হচ্ছিল, কিন্তু বিশ্বাস করছিল না। একটা লোক এই ঘরের মধ্যে বসে দূরে কে কোথায় কেমন করে বসে আছে জানতে পারে না। জানা সম্ভব নয়।

অর্জুন বলল, "মালুম গাঁওকে ঘর। সুজন ঘরকে সামনে বসে আছে।"

"কোন গাঁও তুমি বুঝতে পারছ?"

"না বাবুজি।"

"সুজন কী পরে আছে?"

"লুঙ্গি। গায়ে কুর্তা ভি আছে।"

"কোনও চোট আছে ওর? দেখতে পাচ্ছ?"

"চোট নেহি।"

"তুমি আরও একটা জিনিস দেখতে পাবে, অর্জুন?"

"কী বাবুজি?"

"ওই টাঙাঅলাকে তুমি দেখেছ। তুমি কি বলতে পারো, সুজন কাল টাঙাঅলার গাড়িতে উঠেছিল কি না?"

অর্জুন চুপ করে গেল। তার চোখ আরও কুঁচকে থাকল কিছুক্ষণ, মাথাটা উঁচু করল। তারপর বলল, "না বাবুজি! আমি কুছু দেখতে পাচ্ছি না।"

সিদ্ধেশ্বর আবার বললেন, "পাচ্ছ না?"

"না বাবুজি!"

"আজ তুমি সুজনকে দেখতে পাচ্ছ?"

"জি।"

"সে কোনও গাঁয়ে লুকিয়ে রয়েছে। কাছাকাছি কোনও গাঁয়ে। ঠিক আছে, তোমায় আর দেখতে হবে না, অর্জুন।"

অর্জুন সঙ্গে-সঙ্গে চোখ খুলল না। সামান্য পরে খুলল। যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল।

সিদ্ধেশ্বর এগিয়ে গিয়ে জানলা দুটো খুলে দিলেন।

ঘরের আলোয় বরদা দেখল, অর্জুনের কপাল মুখ গলা গল-গল করে ঘামছে। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে।

সিদ্ধেশ্বর অর্জুনকে বললেন, "তুমি এবার যাও, অর্জুন। বাইরে হাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াও।"

অর্জুন চলে গেল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম। সুজন এখানেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। ঘাপটি মেরে।"

বরদা বলল, "আপনি অর্জুনের কথা বিশ্বাস করলেন?"

"করলাম। কেন?"

"আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলাম না। অর্জুন এই ঘরে বসে চোখ বুজে কেমন করে সুজনকে দেখতে পায়?"

সিদ্ধেশ্বর একটু হাসলেন। "পায়। অর্জুন অনেক কিছু দেখতে পায়—যা আমরা পাই না। ওর এই আশ্চর্য শক্তি আছে।"

"যতই শক্তি থাক, ঘরে বসে অনেকটা দূরে কে কী করছে তা দেখা সম্ভব নয়।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনার আমার পক্ষে নয়। অর্জুনের পক্ষে সম্ভব। ভগবান তাকে ওই আশ্চর্য ক্ষমতাটুকু দিয়েছেন। সব সময় সব কিছু ও দেখতে পায় না। কখনও-কখনও পায়। যেমন টাঙাঅলার গাড়িতে সুজন কাল ছিল কি না—অর্জুন দেখতে পেল না। অথচ আজ এখন সুজন কোথায় আছে, কোন বেশে, সে দেখতে পেল। আমরা অর্জুনকে অনেকবার পরীক্ষা করেছি—সে যা বলেছে তা প্রায়ই মিলে গেছে।"

বরদার বিশ্বাস হল না। বলল, "আপনি যে মিথ্যাকথা বলছেন তা নয়, তবে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। হয়তো আপনি ঠিকই বলছেন। আমি ভাবছি, এরকম দৈবক্ষমতা মানুষের কেমন করে হয়?"

সিদ্ধেশ্বর তর্ক করলেন না। বললেন "কেমন করে হয় জানার চেষ্টাই তো আমরা করছি, বরদাবাবু। এর কোনও ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দিতে পারব না। কেউ-কেউ বলেন, একটা সিক্সথ সেন্স। আদিম মানব জাতির মধ্যে নাকি ছিল। ক্রমে তা হারিয়ে গেছে। তবে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি, কোটিতে এক আধজনের মধ্যে তার একটু ছায়া এখনও থেকে গেছে।"

বরদা কিছু বলল না। চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। বলল, "চলুন বাইরে যাই।"

সিদ্ধেশ্বরও উঠলেন।

বাইরে এসে বরদা সিগারেট ধরাল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "চলুন, আমাদের এখানে আরও যারা আজব মানুষ রয়েছে তাদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।" বলে একটু হাসলেন।

বরদা বলল, "চলুন।"

সকালে যা বিশ্বাস করেনি বরদা, কিংবা তার বাধছিল বিশ্বাস করতে, রাত্রে সে সেটা বিশ্বাস করে নিল।

তেমন একটা রাতও হয়নি। বরদা নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে নানা রকম কথা ভাবছিল—হঠাৎ দরজায় খুটখুট শব্দ। তারপর দরজা খুলে মহাদেব ঘরে এল।

বরদা চমকে গিয়েছিল। সে আশাই করেনি মহাদেব তার ঘরে আসবে।

মহাদেব যেন পা টিপে টিপে সামনে এল। দাঁড়াল। তাকিয়ে থাকল। তার চোখের তলায় ঘৃণা, ওপরে অবজ্ঞার হাসি।

বেশ বিনীত ভঙ্গিতে নমস্কার করল মহাদেব। ঠাট্টাই করল। "ভাল আছেন স্যার?"

বরদা বিছানার ওপর উঠে বসেছিল। বিরক্ত চোখে দেখল মহাদেবকে। বলল, "আপনি আমার এখানে কেন? কী মনে করে?"

"আপনার সঙ্গে দেখা হয় না। নতুন মানুষ। খোঁজখবর নিতে এলাম।"

বরদা বলল, "আপনাকেই তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কাল থেকে।"

"আমি আপনাকে ঠিকই দেখি।"

"তা দেখতে পারেন।"

মহাদেব বসল না। দাঁড়িয়েই থাকল। দাঁত-চাপা হাসি। একেবারে শয়তান যেন। চোখ ছোট-ছোট করে দেখছে আর চাপা হাসি হাসছে।

মহাদেব বলল, "আপনি নাকি কলকাতার কোন টিউবওয়েল কোম্পানির লোক?"

"হ্যাঁ।"

"কোন কোম্পানি?"

"সেটা আপনার জানার কোনও দরকার নেই। আমায় বিরক্ত করবেন না।"

"আপনি কি কিছু ভাবছেন?"

"হ্যাঁ।" বরদা বিরক্ত হয়ে উঠছিল। অসহ্য লাগছিল লোকটাকে। তার কেমন যেন সন্দেহও হচ্ছিল।

মহাদেব শব্দ না করে হাসল। বলল, "সিধুবাবু এখন নেই। বাইরে বেরিয়েছেন সাইকেল নিয়ে। আপনি একা আছেন, তাই একটু গল্প করতে এসেছিলাম।"

"আমার এখন গল্প করার ইচ্ছে নেই।"

"ভাবছেন কিছু? টিউবওয়েলের কথা?" মহাদেব যেন খোঁচা মারল।

"হ্যাঁ। আপনি আমায় বিরক্ত করবেন না।"

মহাদেব গ্রাহ্য করল না। রসিকতা করে একটা সিগারেট চাইল।

বরদা সিগারেট দিল। মহাদেব সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ওড়াল। তারপর বলল, "আপনাকে খোলাখুলি ক'টা কথা বলে দিতে চাই।"

জবাব দিল না বরদা।

মহাদেব বলল, "আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন, সিধুবাবু আপনাকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছেন। এসে ভাল করেননি। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান।"

বরদার মাথা গরম হয়ে উঠল। "নিজের চরকায় তেল দিন।"

"আমার চরকায় তেল দেওয়া বন্ধ করে দেবার জন্যে আপনাকে আমদানি

করেছেন সিধুবাবু। তিনি ভুল করেছেন। আপনি ভুল করবেন না।"

"যদি করি?"

"করবেন না। আফসোস করতে হবে।"

বরদা মহাদেবের চোখ দেখতে দেখতে বলল, "যদি করতে হয়—করা যাবে।"

মহাদেব যেন রেগে গেল। বলল, "আপনি আমায় অবজ্ঞা করছেন?"

"করতেও পারি," বরদা বলল। সে নিজেই বুঝতে পারছিল না তার এত সাহস কেমন করে হচ্ছিল। বোধ হয় মহাদেবের ওপর ঘৃণা থেকে।

মহাদেব বলল, "শুনুন, আপনাকে সোজা বলি, আপনি যদি কাল-পরশুর মধ্যে কলকাতায় ফিরে না যান, আপনাকে বিপদে পড়তে হবে।"

"কেমন বিপদ?"

"ভাবছেন আমি মজা করছি আপনার সঙ্গে।...আপনাকে আমি যে বিপদে ফেলতে পারি—"

বরদা হঠাৎ কেমন খেপে গেল। বিছানা থেকে নেমে পড়ে বলল, "আমায় মেরে ফেলতে পারেন—এই তো?"

মহাদেব কঠিন গলায় বলল, "পারি।"

দু মুহূর্ত চুপ করে থেকে বরদা বলল, "যেমন করে টাঙাঅলাকে মেরেছেন?"

মহাদেব বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। বলল, "হ্যাঁ। টাঙাঅলার কথাটা একটু ভাববেন। সে যেভাবে মারা গেছে আপনি অবিকল ওইভাবে মরতে পারেন। ঘাড় মটকে ঘুরে যাবে, ঘাড়ের দিকে মুখ হয়ে যাবে আপনার।" মহাদেবের চোখ জ্বলছিল। "আপনাকে শিক্ষা দেবার জন্যেই ওকে মেরেছি।"

বরদা চমকে উঠলেও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "সুজন মালাকার তা হলে আপনার হাতেই রয়েছে?"

মহাদেব বলল, "হ্যাঁ। সুজন আমার। এখানকার নয়। সুজন আমার হাতে। আমি কাউকে পরোয়া করি না। সে যে কী ভয়ংকর আপনি জানেন না।"

বরদা জানে। শুনেছে। বলল, " সুজনকে আপনি পুষে রেখেছেন?"

"রেখেছি।"

"সিদ্ধেশ্বরবাবু ঠিকই ধরেছেন।"

"ধরবেন বইকী!...তিনি তো সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছেন সুজনের খোঁজ করতে। আশপাশের গ্রামে গিয়ে দেখবেন সুজন কোথায় লুকিয়ে আছে। দেখুন, তিনি সুজনকে খুঁজে পান কি না। কিংবা তিনিও টাঙাঅলা হয়ে না যান!"

বরদার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। বলে কী মহাদেব?

মহাদেব আর দাঁড়াল না। ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সিদ্ধেশ্বর না ফেরা পর্যন্ত বরদা ভয় আর উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করল। শান্তভাবে সে বসতে পারছিল না। একবার করে বাইরে যাচ্ছিল, এগিয়ে গিয়ে দেখছিল

সিদ্ধেশ্বরের ঘরে বাতি জ্বলছে কিনা। আবার নিজের ঘরে ফিরে আসছিল।

সে ভিতু মানুষ, অকারণ কোনও ঝঞ্ঝাট-ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তেও তার ইচ্ছে হয় না, কিন্তু আজ মহাদেব মানুষটাকে তার এতই খারাপ লেগেছে যে, বরদার রাগ হচ্ছিল ভীষণ। ঘৃণাও। লোকটা বদমাশ নয় শুধু, নৃশংস। কত তুচ্ছ কারণে সে টাঙাঅলাকে খুন করাল । বরদার বাস্তবিকই খানিকটা সন্দেহ থেকেই গিয়েছিল, সিদ্ধেশ্বর যতই বলুন। এখন আর তার কোনও সন্দেহ নেই, মহাদেব নিজের মুখে স্বীকার করেছে, টাঙাঅলার মৃত্যুতে তার হাত রয়েছে, সুজনকে দিয়ে খুন করিয়েছে টাঙাঅলাকে। কিন্তু কী দরকার ছিল নিরীহ টাঙাঅলাকে খুন করার? বরদাকে ভয় দেখানোর জন্যে মিছিমিছি একটা মানুষ খুন! লোকটা জন্তু না পিশাচ?

সিদ্ধেশ্বর ফিরলেন আরও খানিকটা পরে।

বরদা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে সিদ্ধেশ্বরের ঘরের দিকে ছুটল।

ঘরে ঢুকে সিদ্ধেশ্বর সবে বসেছেন, বরদা এসে দাঁড়াল।

"আপনি মশাই আমায় বড় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন," বরদা বলল, "আমি ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম।"

"কেন?"

"শুনলাম আপনি সুজনের খোঁজ করতে বেরিয়েছেন সাইকেলে চড়ে, একা-একা?"

ঘরে জল ছিল খাবার। সিদ্ধেশ্বর নিজেই জল গড়িয়ে নিয়ে খেলেন। বললেন, "বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?"

বরদা বসল।

সিদ্ধেশ্বরকে সামান্য ক্লান্ত দেখাচ্ছিল । বললেন, "আপনাকে কে বলল আমি সুজনের খোঁজ করতে গিয়েছিলাম?"

"মহাদেব।"

"মহাদেব?"

বরদা মহাদেবের কথা বলল, লোকটা বরদার ঘরে ঢুকে কেমন করে শাসিয়ে গেছে, তার বিবরণ দিল। "আমায় বলল কী জানেন? সুজনকে খুঁজতে গিয়ে আপনিই না টাঙাঅলা হয়ে যান।"

সিদ্ধেশ্বর শুনছিলেন সব। সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "আমি তো বেচারা টাঙাঅলা নই। তা ছাড়া আমি জেনেশুনেই গিয়েছি। মহাদেব কেমন করে ভাবল আমি হাত খালি করে সুজনকে খুঁজতে যাব!" বলে সিদ্ধেশ্বর জামা তুলে কোমরের কাছে একটা চামড়ার বেল্ট-মতন দেখালেন। একপাশে ছোরার খাপ, সরু লম্বা মতন, মামুলি ছোরাছুরি নিশ্চয় নয়। সরু, লম্বা ছোরা বোধ হয়।

বরদা অবাক গলায় বলল, "আপনি এ-সবও জানেন?"

জামাটা কোমরের ওপর আবার ফেলে দিলেন সিদ্ধেশ্বর। "জানি। যাদের সঙ্গে ঘর করি, তারা তো সাদামাটা মানুষ নয়। যাকগে ও-কথা। মহাদেব আপনাকে শাসিয়ে গেল তা হলে?"

"দুদিন সময় দিয়েছে কলকাতা ফিরে যাবার জন্যে।"

সিদ্ধেশ্বর যেন ভাবছিলেন। চোখের পাতা বুজে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর বললেন, "মহাদেব নিজেকে যতটা ধূর্ত মনে করে ততটা নয়। তা ছাড়া ও তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একটার-পর-একটা ভুল করে যাচ্ছে।"

"ভুল?"

"টাঙাঅলাকে কেন মারতে গেল! টাঙাঅলা না মরলে সুজনের কথা আমি জানতে পারতাম না। তারপর ও যখন বুঝল, ধরা পড়ে গিয়েছে, আপনাকে শাসাতে এল। মহাদেব ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে ফেলে এখন আর সামলাতে পারছে না। বোকার মতন কাজ করছে। এখন ও ভুল করবে। মাথা ঠিক রাখতে পারবে না।"

বরদা বলল, "আপনি এবার তা হলে ওকে ধরুন।"

সিদ্ধেশ্বর কোনও জবাব দিলেন না। টেবিলের ওপর বাতি জ্বলছিল। শিস উঠছে একপাশে। বাতিটা কমিয়ে দিলেন। সিদ্ধেশ্বরের ঘর সাদাসিধে, খাট আছে, দেরাজ আছে একটা, টেবিল আর চেয়ার। সামান্য ক'টা বই।

বরদা বলল, "মহাদেবকে আর আপনি এগোতে দেবেন না। আবার কাকে মেরে বসবে!"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "মহাদেবকে ধরার আগে সুজনকে ধরতে চাই।"

"তার কোনও খোঁজ পাননি?"

"পেয়েছি। কিন্তু ধরতে পারিনি। ও কাছেই গন্‌ডিয়া বলে একটা গাঁয়ে ছিল, সেখানে আট-দশ ঘর কাঠুরিয়া থাকে। ওই গাঁ ছেড়ে ও অন্য কোনও জায়গায় পালিয়ে গিয়েছে। কোথায়, তা কেউ বলতে পারল না। আমি তিন-চারটে গাঁ ঘুরে এলাম। সুজনকে দেখেছে সকলেই—অথচ বলতে পারছে না সে কোথায় রয়েছে।"

বরদা তেমন একটা অবাক হল না। এই ফাঁকা, বসতিহীন জায়গা, দু-একটা ছোট-ছোট দেহাতি গ্রাম, এখানে ঝোপে-জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকা এমনকী কঠিন। আবার এই জায়গা এমন যে, একবার কাউকে চোখে দেখলে তার পক্ষে গা-আড়াল দিয়ে বেশিদিন থাকাও মুশকিল। ভিড়ে মিলিয়ে যাবার সুযোগ নেই।

"সুজন কি পালিয়ে গেছে?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

"মনে হয় না পালিয়েছে।"

"কেন?"

"মহাদেব কি তাকে ছেড়ে দেবে?"

"মহাদেবের সঙ্গে ওর এত খাতিরই বা কীসের?"

সিদ্ধেশ্বর ম্লান হাসলেন। বললেন, "শয়তানের সঙ্গে শয়তানেরই খাতির হয়।...তবে সুজন বোকা, নির্বোধ। ওর ওই পাশবিক শক্তি ছাড়া কিছু নেই। তাও খানিকটা ভৌতিক। মহাদেব ওকে কিছু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হাত করেছে।"

বরদা বলল, "কিন্তু লোকটার ভয় থাকতে পারে। মানুষ মারার পর সে যদি বুঝে থাকে—ধরা পড়লে পুলিশের হাতে পড়তে হবে, তা হলে তো পালাতেও পারে।"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। "সুজনের সেটুকু বুদ্ধিও নেই। ও হল জন্তু। বুদ্ধি বলে

কিছু থাকলে মহাদেবের পাল্লায় পড়ে! না, অকারণ একটা মানুষকে ওইভাবে মারে?"

বরদা চুপ করে থাকল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "চলুন, একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।"

বাইরে এসে বরদা চারপাশে তাকাল একবার। শান্ত। ঠিক যেন কোনও আশ্রম; কোনও-কোনও ঘরে আলো জ্বলছে, কোনওটা অন্ধকার; সাড়াশব্দও তেমন পাওয়া যাচ্ছে না, গাছ পাতার মাথায়-গায়ে চাঁদের আলো। শীত-শীত করছে। এমন শান্ত নির্জন জায়গায় কেমন করে এই খুনোখুনি, শয়তানি এসে ঢুকল! আশ্চর্য!

বরদাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমার সন্দেহ, মহাদেব এখানকার আরও দু-একজনকে হাত করেছে। সুজন ছাড়াও তার দলে লোক আছে।"

বরদা বলল, "কেমন করে বুঝলেন?"

"না বুঝলে আর বলছি কেন! সুজনের কাছে খবর পৌঁছে দিচ্ছে কে? আছে কেউ। আমার বিশ্বাস, মহাদেব এখানকার আরও দু-একজনকে হাত করেছে। তার মতলব ছিল, জনা তিন-চার লোক নিয়ে সে যদি চলে যেতে পারে, বাইরে গিয়ে একটা ভেলকিবাজির ব্যবসা ফাঁদবে। টাকা-পয়সা কামাবে। দেখতে দেখতে বড়লোক হয়ে উঠবে।"

বরদা বলল, "অত সোজা?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "সোজা বলেই তো বলছি। মানুষ রহস্য জিনিসটা ভালবাসে, পছন্দ করে। এটা শুধু আমাদের দেশ বলে নয়, সর্বত্রই। আমাদের এখানে আরও বেশি। মন্ত্রতন্ত্রের ওপর বিশ্বাস, অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা দেখার জন্যে ধরনা দেওয়া আমাদের স্বভাব। এ দেশে ভগবানের চেয়ে ভগবানের চেলাদের প্রতিপত্তি বেশি। তাই না?"

বরদা অস্বীকার করতে পারল না। এই রকমই তো হয়, কে কোথায় তামার মাদুলি হাতে নিয়ে সোনা করে দিয়েছে, কে এক পুরিয়া ছাই খাইয়ে মরোমরো রোগীকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, এসব শোনা মাত্র মানুষ ছোটে।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, মহাদেব ভেতরে ভেতরে এই মতলবই এঁটেছিল। সে এখান থেকে দু-তিন জনকে হাত করে নিয়ে যাবে, তারপর বাইরে গিয়ে পয়সা-কড়ি লুঠবে।" বলে একটু থামলেন তিনি; আবার বললেন, "আমরা এখানে যাদের এনেছি, তাদের দেখিয়ে পয়সা করতে তো চাই না, আমরা চাই মানুষের—কোনও কোনও মানুষের মধ্যে যে অস্বাভাবিক, অবিশ্বাস্য শক্তি আছে—তার একটা ব্যাখ্যা বার করতে। আমাদের উদ্দেশ্য আলাদা। মহাদেবের অন্য মতলব।"

বরদা বলল, "সুজন ছাড়া আর কাকে কাকে মহাদেব হাত করেছে?"

সিদ্ধেশ্বর হাঁটতে লাগলেন। ধীরে ধীরে। কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন, "সেটা খুঁজে বার করতে হবে। তবু আমার ধারণা, গোপীমোহনকে সে দলে টানতে পারে।"

"গোপীমোহন! যাকে বরফের চাঁইয়ের ওপর দশ-পনেরো মিনিট শুইয়ে রেখে তুলে নেবার পর দেখতে দেখতে আবার গরম, স্বাভাবিক হয়ে আসে?"

"হ্যাঁ, তাকেও টানতে পারে।"

"কেন?"

সিদ্ধেশ্বর একবার বরদার দিকে তাকালেন। বললেন, "গোপী একসময় খেলা দেখাত, বলেছি না আপনাকে? ছোট-ছোট সার্কাস পার্টির লোক তাকে ভাড়া করে নিয়ে মেলায় মেলায় খেলা দেখিয়ে বেড়াত। গোপীকে খেলা দেখানোর কাজে ব্যবহার করা খুব সোজা। কাজও দেবে। মহাদেব তার ভক্তদের বোঝাতে পারবে সে একটা মানুষকে কেমন আশ্চর্য ক্ষমতা দিতে পারে। স্বয়ং ভগবান সে।"

বরদা বলল, "সীতারামকেও কি হাত করেছে মহাদেব?"

"না। সীতারামকে দিয়ে ওর সুবিধে হবে না। সীতারাম, অর্জুন, বংশী মাঝি, গদাধর, এদের মহাদেব নিতে পারবে না। ওরা নির্লোভ। তা ছাড়া মহাদেবের ফাঁদে তারা পা দেবে বলে মনে হয় না।"

"তা হলে আর কে থাকল?"

"আছে। আপনি তাকে দেখেছেন হয়তো, কিন্তু পরিচয় জানেন না।"

"কে?" বরদা কৌতূহল বোধ করছিল।

"চাঁদু। ভাল নাম শীতল।...দেখেননি তাকে? মাথায় বেঁটে, গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, কপালের কাছে কাটা দাগ, টেরা চোখ...। সাইকেল নিয়ে হরদম ছোটাছুটি করে।"

বরদার মনে পড়ল। বলল, "দেখেছি।"

"চাঁদুকে আমরা অর্জুনদের দলে ফেলি না। তার অত উঁচু দরের ক্ষমতা নেই।"

বরদা তার ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। বাতি জ্বলছে ঘরে, দেখা যাচ্ছে না। জানলা দরজা বন্ধ।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "চাঁদু যে কোনও মানুষের গলা বার কয়েক শোনার পর নকল করতে পারে। এত ভাল নকল করতে পারে যে, আসল আর নকল ধরা যায় না। তা ছাড়া তার অন্য গুণ হল সে প্রচণ্ড পরিশ্রমী। এখানে তার অনেক কাজ। আমরা তাকে কাজের জন্যে রেখেছি, অন্য কোনও কারণে নয়।"

বরদা চাঁদুর ব্যাপারটা ভাল বুঝল না। বলল, "চাঁদুকে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে মহাদেবের কীসের লাভ হবে?"

"তা হবে।...আপনি এখন বুঝতে পারছেন না। যে মানুষ উপস্থিত নেই, যদি আড়াল থেকে তার গলা আপনি শুনতে পান, আপনার কি মনে হয় না লোকটা আশেপাশে কোথাও রয়েছে?" সিদ্ধেশ্বর একবার আকাশের দিকে মুখ তুললেন, আবার নামালেন। "সহজ একটা উদাহরণ দিই। ধরুন আপনি রাত্তিরে ঘুমোচ্ছেন, বাইরে থেকে আমার গলা করে চাঁদু ডাকল। আপনি নিশ্চয় ঘুম ভেঙে উঠে দরজা খুলে দেবেন। তারপর দেখবেন, সুজন ঘরে ঢুকছে—চাঁদু আড়ালে সরে গেছে।"

বরদা কথাটা বুঝতে পারল। ভয়ও পেল। বলল, "বলেন কী! মহাদেব আমার ঘরে ওইভাবে সুজনকে ঢুকিয়ে দেবে?"

সিদ্ধেশ্বর হাসলেন। "না, তা বোধ হয় করবে না মহাদেব। তবে চাঁদুকে হাতে পেলে মহাদেবের 'টিম'টা এখনকার মতন ভাল হবে। যে-কোনও জায়গায় গিয়ে

জাঁকিয়ে বসতে পারে, বুজরুকি করে, লোককে ধাঁধা খাইয়ে বড়লোক হয়ে যেতে পারে দুদিনে।"

বরদা দরজায় হাত রাখল, "আসবেন?"

"না, আর যাব না। রাত হয়ে যাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে আপনি শুয়ে পড়ুন। আপনার খাবার এসে হয়তো ফেরত চলে গেছে। খবর দিয়ে দিচ্ছি। আমার অন্য একটা কাজ আছে।"

"কী কাজ?"

"পরে শুনবেন।...আমারও চোখ আছে সবদিকে। মহাদেব আজ বিকেল থেকে কী কী করেছে, কোথায় গেছে, কার সঙ্গে ঘোঁট পাকিয়েছে তার খোঁজ নেব।"

বরদা বলল, "আপনি কি এখানে স্পাই রেখে দিয়েছেন?"

"এখন রাখছি। না রাখলে মহাদেব কখন যে কী করে বসবে, বুঝতে পারব না। ভুল একবার হয়েছে, দ্বিতীয়বার যেন না হয়।"

বরদা বলল, "আজ মহাদেব যে আমার ঘরে এসেছিল, এটা আমি না বললেও আপনি তা হলে জানতে পারতেন?'

"পারতাম। তবে আপনাদের মধ্যে কী কথাবার্তা হল, তা জানতে পারতাম না।"

বরদা বোকার মতন হাসল।

দরজার ছিটকিনি তোলা ছিল। সাধারণ একটা তালাও দিয়ে গিয়েছিল বরদা। তালা খুলল।

"আমার ওপর যে মাত্র দু-তিন দিনের নোটিশ আছে মশাই," বরদা বলল, "মহাদেব আমায় টাঙাঅলা করে ছেড়ে দেবে বলেছে।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "মহাদেব নিজের ফাঁদে পা দিয়েছে, তার কী অবস্থা হয় দেখুন! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওর সাধ্য নেই—আপনার কিছু করে।"

বরদা নিশ্বাস ফেলে ঘরে ঢুকল।

সিদ্ধেশ্বর আর দাঁড়ালেন না।

হঠাৎ বরদার কেমন যেন সন্দেহ হল। বাতির আলো এত কম কেন? বিছানার দিকে তাকাল। কিছু নেই। আলো জ্বলছে টেবিলের ওপর। ঘাড় পিঠ নুইয়ে খাটের তলা দেখল। দেখেই মনে হল, খাটের তলায় রাখা তার সুটকেসটা খোলা।

বরদা থতমত খেয়ে গেল। তার ঘরে কেউ ঢুকেছিল। কে এসেছিল আবার? মহাদেব, না অন্য কেউ?

কেন এসেছিল? সিদ্ধেশ্বরকে কি ডাকবে আবার?

বরদা বাইরে বেরিয়ে এল। সিদ্ধেশ্বর অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। আর ডাকল না তাঁকে। কিন্তু ভীত হয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙতে বেলাই হয়ে গিয়েছিল বরদার। এখানে এসে পর্যন্ত সে ভোরবেলাতেই উঠে পড়ে, বেড়ায়-চেড়ায়, সকালের ঠাণ্ডা অথচ সতেজ হাওয়া খায়,

আকাশ দেখে, রোদ ওঠা নজর করে, গাছপালা, পাখি—কত কী লক্ষ করে মুগ্ধ চোখে। তার ভাল লাগে। শরীর-মনও ঝরঝরে হয়ে ওঠে। আজ আর সকালে উঠতে পারল না বরদা, বেলা হয়ে গেল, চোখ মেলে দেখল, রোদ আসছে জানলার ফাঁক ফোকর দিয়ে।

বাইরে এসে বরদা বুঝল, বেলা অনেকটাই হয়ে গেছে। রোদ আর ফিকে নেই। কাল সারারাত বরদার ঘুম হয়নি। না হবার কারণ মহাদেব। মহাদেব তাকে শাসিয়ে যাবার জন্যে ততটা নয় যতটা অন্য কারণে। মানে, বরদা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, তার ঘরে ঢুকে সুটকেসের ডালা কে খুলেছিল? কেন খুলেছিল? এখানে চোর-টোর থাকার কথা নয়; বরদার ঘরেই বা কেন চুরি করতে আসবে? কী রয়েছে বরদার যে চুরি করবে?

সুটকেসটা বরদা ভাল করে দেখেছে। জামা, প্যান্ট, পাজামা, গেঞ্জি—এইসব পোশাক-টোশাক ছাড়া তার সুটকেসে তেমন কিছু ছিল না। টাকাপয়সা বরদা সুটকেসে রাখেনি। কিছু তো চোখে পড়ল না বরদার যে বলবে, অমুক জিনিসটা আমার চুরি গিয়েছে! তা হলে চোর কেন এসেছিল? কোন মতলবে? চোরই বা কে?

এই বিচ্ছিরি চিন্তার সঙ্গে আরও একটা চিন্তা যেন লেজুড় হয়ে মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। সিদ্ধেশ্বর বলছিলেন, বেঁটে-বাঁটকুল চাঁদু অন্য মানুষের গলার স্বর নকল করতে পারে, চাঁদু সিদ্ধেশ্বরের গলা নকল করে মাঝরাতে যদি বরদাকে ডাকে—বরদা নিশ্চয়ই ঘুম ভেঙে উঠে দরজা খুলে দেবে, আর তখন চাঁদুর বদলে হয়তো দেখা যাবে সুজন দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা মহাদেব! কী করবে তখন বরদা?

ভয়, ভাবনা, দুশ্চিন্তা একবার চেপে বসলে আর কি যেতে চায়? বরদার মাথায় এই সব চেপে বসল। ঘুম আর কোথা থেকে আসবে? বরং সব সময়েই কেমন যেন ছমছমে হয়ে থাকল মনের ভেতরটা। কান পড়ে থাকল দরজায়।

একেবারে শেষ রাতে বরদা ঘুমিয়ে পড়েছিল। কতক্ষণ আর জেগে থাকতে পারে মানুষ! ঘুমোবার আগে সে একটা মোটামুটি ধারণা খাড়া করে নিয়েছিল। ব্যাপারটা তার মাথায় এসেছে এবার। আসলে সিদ্ধেশ্বর আর মহাদেবের মাঝখানে সে হাজির হয়ে গেছে। ইচ্ছে করে নয়, নিজের মর্জিতেও নয়, সিদ্ধেশ্বরই বরদাকে হাজির করেছেন; আর মহাদেব সিদ্ধেশ্বরের মতলব ধরতে পেরে বরদার ওপরই বেশি খেপে উঠেছে।

আরও পরিষ্কার করে ব্যাপারটা ভাবলে বোঝা যায় যে, সিদ্ধেশ্বর তাঁদের এই পি পি রিসার্চ সেন্টারে যাদের এনেছেন, যারা তাঁদের গবেষণার বিষয়—মহাদেব তাদের কয়েকজনকে ভাগিয়ে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইছে। মহাদেবের উদ্দেশ্য, বাইরে গিয়ে ভেলকি দেখানো, মানুষ ঠকানো এবং রাতারাতি টাকাপয়সা কামিয়ে বড়লোক হওয়া। মহাদেব চাইছে অর্থ আর প্রতিপত্তি। সিদ্ধেশ্বর চাইছেন মহাদেবকে তাড়াতে। একলা মহাদেবকেই।

বরদা বুঝতে পারল না, মহাদেবকে যদি তাড়ানোই তাঁর ইচ্ছে, তবে সোজাসুজি তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন না কেন? এত ঘোরপ্যাঁচ কীসের? মহাদেবকে তাড়ানোর

জন্যে বরদাকে কলকাতা থেকে ধরে আনার কারণ কী? সিদ্ধেশ্বরের সেই ক্ষমতা এবং প্রভুত্ব রয়েছে যাতে তিনি সরাসরি মহাদেবকে ঘাড় ধরে এখান থেকে বার করে দিতে পারেন। তবু কেন দিচ্ছেন না? এর রহস্যটা কোথায়?

বরদা সিদ্ধেশ্বরের মতিগতি কিছুই বুঝতে পারছে না। বরং তার মনে হল, যে কাজ সহজে করা যেত, সিদ্ধেশ্বর সেটা জটিল করে তুলছেন অকারণে, আর এই জন্যেই একটা অসহায় নিরীহ লোক মারা গেল।

হাত-মুখ ধুয়ে চা-জলখাবার খেয়ে বরদা সোজা সিদ্ধেশ্বরের অফিস-ঘরে গেল। অফিস-ঘর খোলা। কেউ নেই।

বরদা খোঁজ করতে গেল সিদ্ধেশ্বরের ঘরে। দরজায় তালা ঝুলছে।

এদিক-ওদিক দেখল বরদা, সিদ্ধেশ্বর নেই। কেউ জানে না, তিনি কোথায় গেছেন।

ওপর ওপর দেখলে কিছুই বোঝা যায় না; যে যার মতন কাজকর্ম করছে, জল উঠছে কুয়ো থেকে, কাঠ চেরাই হচ্ছে, পেছনের সবজি-বাগানে কাজ করছে জনা দুই লোক, গাছের ছায়ায় বসে কেউ গল্প করছে, কেউ বা ঘরেই রয়েছে।

বরদা বুঝতে পারছিল না সিদ্ধেশ্বর কোথায় গেছেন! সুজনের খোঁজেই সাত সকালে বেরিয়ে পড়েছেন নাকি! হতে পারে। মানুষটি জেদি, কাল তিনি বিফল হয়েছেন, আজ হয়তো সফলও হতে পারেন।

এখানে-ওখানে উঁকি মেরে, খানিকটা পায়চারি করে বরদা নিজের ঘরেই ফিরে আসছিল, হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল। দাঁড়াল বরদা, কান পাতল, মোটরবাইকের শব্দ। কোন দিক দিয়ে শব্দটা আসছে বোঝা যায় না।

গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বরদা।

সামান্য পরে ফটকের সামনেই মোটরবাইক দেখা গেল। সিদ্ধেশ্বর পেছনে বসে ছিলেন। সামনে নতুন মানুষ।

সিদ্ধেশ্বর নামলেন। ফটক খুলে দিলেন।

মোটরবাইক চালিয়ে যে লোকটি ভেতরে ঢুকলেন, বরদা তাঁকে লক্ষ করতে লাগল। বয়েস বেশি নয়; তবু বরদার চেয়ে বড়। ছিপছিপে চেহারা, গায়ের রং ময়লা, মাথার চুল কোঁকড়ানো, চোখে চশমা।

সিদ্ধেশ্বর ফটক বন্ধ করে হেঁটে-হেঁটেই আসছিলেন। মোটরবাইক সোজা খড়ের ঘরের দিকে চলে গেল এঁকে বেঁকে।

বরদা কয়েক পা এগিয়ে গেল সিদ্ধেশ্বরের দিকে।

"কোথায় গিয়েছিলেন? সকাল থেকেই বেপাত্তা!" বরদা সামান্য চেঁচিয়ে বলল।

সিদ্ধেশ্বর অল্প দূরেই ছিলেন, এগিয়ে আসছিলেন। বললেন, "কাছেই ছিলাম।"

বরদা একটু অপেক্ষা করল। সিদ্ধেশ্বর সামনে এলেন।

" সুজনের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলেন?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ।" মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর।

"কোনও খবর পেলেন?"

সিদ্ধেশ্বর ইশারায় ডাকলেন বরদাকে। ডেকে হাঁটতে লাগলেন। বললেন, "সুজন

এখানেই আছে।”

“এখানে?” বরদা অবাক হয়ে তাকাল। “কোথায়?”

“ধারে-কাছে।”

বুঝতে পারল না বরদা। সুজন যে কাছাকাছি কোথাও রয়েছে, এ তো আগেও শুনেছে। কিন্তু কোথায়?

“ধারে-কাছে মানে কোথায়?” বরদা কৌতূহল বোধ করছিল।

সিদ্ধেশ্বর কিছু বললেন না, হাঁটতে লাগলেন।

হাঁটতে হাঁটতে সিদ্ধেশ্বর অন্য কথা পাড়লেন। “সতীশকে দেখলেন?”

“সতীশ! মানে ডাক্তার?”

“হ্যাঁ।”

বরদারও সেইরকম মনে হয়েছিল একবার। গতকাল সতীশ ডাক্তারের আসার কথা ছিল, আসতে পারেননি; আজ আসার কথা। অবশ্য বরদা ভাবেনি যে, মোটরবাইক চেপে ডাক্তার আসবে।

“উনি কোত্থেকে আসেন?”

“আসে অনেক দূর থেকে। আগে ট্রেনে এসে বাস আর টাঙা করে আসত। আজকাল একটা মোটরবাইক কিনেছে সেকেন্ড হ্যান্ড। ওতে চেপেই আসে। ভোর ভোর বেরোয়, ঘণ্টা আড়াইয়ের মধ্যে পৌঁছে যায়। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আজ ও থাকবে। কাল সকালে আবার চলে যাবে।”

বরদা বলল, “আপনি কি ওঁকে রাস্তায় দেখলেন?”

“হ্যাঁ।”

নিজের ঘরের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বর। পকেট থেকে চাবি বার করে তালা খুললেন।

বরদা বলল, “কাল একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে।”

দরজা হাট করে খুলে ভেতরে ঢুকলেন সিদ্ধেশ্বর। জানলা খুলে রেখে গিয়েছিলেন আগেই। “বসুন...কী ঘটনা ঘটল আবার?”

বরদা কালকের ঘটনার কথা বলল। কে যেন তার ঘরে গিয়ে সুটকেস খুলেছিল। অথচ কিছু নেয়নি, কিছুই চুরি যায়নি।

সিদ্ধেশ্বর রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন। বরদা যখন তাঁর ঘরে বসে কথাবার্তা বলছিল কাল রাত্রে, তখন কে তার ঘরে গিয়ে তালা খুলল, সুটকেস হাতড়াল? এমন দুঃসাহস কার হবে?

সিদ্ধেশ্বর চিন্তিতভাবেই বললেন, “আপনি ভুল করছেন না তো?”

“না।”

“আশ্চর্য...সুটকেস ভাল করে দেখেছেন?”

“দেখেছি।”

“কিছু খোয়া যায়নি?”

মাথা নাড়ল বরদা।

সিদ্ধেশ্বর কিছু যেন ভাবছিলেন। ভাবতে ভাবতেই বললেন, "আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।"

চলে গেলেন সিদ্ধেশ্বর। বরদা বসেই থাকল। বসে বসে সিদ্ধেশ্বরের ঘর দেখতে লাগল। জানলা খোলা, রোদ এসে পড়েছে ঘরে। সাদামাটা অথচ গোছানো ঘর। পুব দিকে একটা পুরনো ধরনের টেবিল। কাগজপত্র, দু-একটা বই, পত্রিকা পড়ে আছে। ফাউন্টেন পেনের কালি। কাচের চৌকোনা পেপারওয়েট। পরিষ্কার বিছানা। একটা মাত্র আলমারি একদিকে। দেয়ালে দু-চারটে ফোটো টাঙানো।

ফিরে এলেন সিদ্ধেশ্বর। বোধ হয় চোখে-মুখে জল দিয়ে এসেছেন। ভেজা-ভেজা দেখাচ্ছিল।

বিছানার একপাশে বসলেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "আপনি বোধ হয় ভাল করে সুটকেস দেখেননি?"

"কেন?"

"একেবারে অকারণে কেউ সুটকেস খুলতে পারে না!"

"কিন্তু আমি দেখেছি।"

"নজর করেননি, বা খেয়াল করেননি," সিদ্ধেশ্বর বললেন,"ছোটখাটো জিনিস আপনার নজর এড়িয়ে গেছে।"

"সুটকেসে আমার জামাকাপড় ছাড়া এক-আধটা বই ছিল। আপনি নিজেই দেখেছেন হাওড়া স্টেশন থেকে আমি কিনেছিলাম সময় কাটানোর জন্যে। একটা বই পড়ছি, বাকি দুটো সুটকেসে ছিল। এ ছাড়া আর তো কিছু ছিল না। একটা ছোট নোটবই মতন ছিল। তাতে নিজের নাম-ঠিকানা ছাড়া সামান্য কিছু এনট্রি ছিল। ওটা কোনও কাজের জিনিস নয়।"

সিদ্ধেশ্বর বরদার চোখে-চোখে তাকিয়ে বললেন, "নোটবইটা আছে?"

বরদা এই আচমকা প্রশ্নে কেমন থতমত খেয়ে গেল । একবার মনে হল, দেখেছে; আবার মনে হল, দেখেনি। ঠিকমতন খেয়াল করতে পারল না বরদা। দমে গিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে, দেখেছি।"

সিদ্ধেশ্বর হাসির মুখ করলেন, "আপনি বোধ হয় শিওর নন। ঠিক আছে, আমরা পরে গিয়ে দেখব।"

"নোটবই না থাকলে কী হবে?"

"হবে আর কী! আপনার আসল পরিচয়টা ওরা জানতে পেরে যাবে। বাড়ির ঠিকানাও।"

বরদা যেন ঘাবড়ে গেল। বলল, "আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। গিয়ে দেখে আসব একবার?"

"দাঁড়ান না, আমিও যাব।" বলে সিদ্ধেশ্বর জানলার দিকে তাকালেন । কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, "ধরুন যদি নোটবই পাওয়াও যায়, তাতেই বা কী! আপনার বাড়ির ঠিকানা একবার দেখে নিয়ে মুখস্থ করে নেওয়াও যায়, বা কাগজে টুকে নিলেও চলে। কাজেই নোটবইটা থাকা না থাকায় কিছুই আর আসে-যায় না।"

এমন সময় একটা লোক টিনের ট্রে করে চা আর পাঁউরুটি নিয়ে এল।

বরদা সকালের জলখাবার খেয়েছিল, সে শুধু চা নিল।

সিদ্ধেশ্বর লোকটাকে বললেন, "ডাক্তারবাবুকে চা পাঠানো হয়েছে?"

লোকটি বলল, "হয়েছে।"

খিদে পেয়ে গিয়েছিল বোধ হয় সিদ্ধেশ্বরের। রুটি-চা খেতে খেতে বললেন, 'আপনার আসল পরিচয় মহাদেব যদি জেনে গিয়েও থাকে, তাতেও আমার অবাক হবার কিছু নেই। সে তো ধরেই ফেলেছে আমি আপনাকে নিয়ে এসেছি আমার কাজ হাসিল করতে! ও শুধু আপনার কলকাতার বাড়ির ঠিকানা জানত না। সেটা জেনে নিল। জেনে নিয়ে কী কী করতে পারে? এক, আপনার বাড়ির ঠিকানায় চিঠি দিতে পারে, ভয় জাগিয়ে তুলতে পারে বাড়িতে—যাতে বাড়ি থেকে আপনাকে পত্রপাঠ চলে যেতে লেখে। দুই, মহাদেব আপনার নকল সেজে আপনার বাড়িতে যেতে পারে। না, সেটা সম্ভব নয়। অত সাদৃশ্য আপনাদের চেহারার মধ্যে নেই। তা ছাড়া গলার স্বর। দুজনের গলার স্বর আলাদা। মহাদেব ধরা পড়ে যাবে।"

বরদা একটা সিগারেট ধরাল। "আমি কাল একটা কথা ভাবছিলাম। বলব?"

"বলুন।"

"মহাদেবকে আপনি সরাসরি তাড়িয়ে দিচ্ছেন না কেন?"

একটু চুপ করে থেকে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "দিচ্ছি না তার কারণ রয়েছে। একটা কারণ, মহাদেবের মতন মানুষকে তাড়িয়ে দিলে সে বাইরে গিয়ে কী যে করবে, কত লোকের সর্বনাশ করবে তা কেউ বলতে পারে না। অন্য কারণটা হল, মহাদেব আমাদের এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিক যে ক'জন সাঙ্গোপাঙ্গ জোগাড় করেছে তা আমিও জানি না। তার দলে ক'জন আছে, তা সঠিকভাবে জানা দরকার। মহাদেবকে তাড়াবার পর যদি দেখি কম করেও আরও তিন-চারজন চলে গেল, তখন কী করব? মহাদেব তো তাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে তাণ্ডব করবে!"

"তারা যাবে কেন?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

"যেতে পারে। আমাদের এই জায়গাটা তো জেলখানা নয় যে, জোর করে আটকে রাখব। নিজের ইচ্ছেয় তারা চলে যেতে পারে।"

বরদা কথাটা ভাবল। সিদ্ধেশ্বর ঠিকই বলেছেন। যদি কেউ চলে যেতে চায় স্বেচ্ছায়, তাকে বাধা দেবার কোনও আইনগত অধিকার পি পি রিসার্চ সেন্টারের নেই।

সিদ্ধেশ্বরের চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি অন্যমনস্কভাবে বরদার কাছে একটা সিগারেট চাইলেন।

বাইরে এল বরদা সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে। দরজা ভেজিয়ে দিলেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "চলুন সতীশকে দেখে যাই।"

রোদ খুব ঘন। বেলা অনেকটাই হয়ে গিয়েছে। দশটা বাজল বোধহয়। আকাশ হালকা নীল।

বরদা বলল, "সুজনকে দেখতে পেয়েছেন?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। "না, দেখতে পাইনি। তবে বুঝতে পেরেছি ও খুব

কাছাকাছি কোথাও রয়েছে।"

"কেমন করে বুঝতে পারলেন?"

"আজ খুব ভোরে উঠে আমি অন্য দিকে গিয়েছিলাম। পশ্চিমের দিকে কিছু বসতি আছে। বেশির ভাগ লোকই খেত-খামার নিয়ে থাকে। খোঁজখবর করে জানলাম, সুজন গতকাল এদিকেই ছিল। ওকে কাল যে খেতে দিয়েছিল—তার নাম ফাগুয়ালাল। ফাগুয়ালাল কলাইয়ের চাষ করে। ও বলল, সুজন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চলে যায়।"

"কোথায় চলে যায়?"

"সেটা ও জানে না। তবে আমার বিশ্বাস, সুজন জঙ্গলের কাছে যে পোড়ো চালাবাড়ি আছে, সেখানে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে।"

"চালাবাড়ি জঙ্গলে কেন?"

"ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বিট পোস্ট ছিল একসময়।"

"এখান থেকে কত দূর?"

"মাইল দেড়েক।"

"আপনি কি ওখানেই গিয়েছিলেন?"

"না।" মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। "দিনের বেলায় সুজনের মুখোমুখি হওয়া মুশকিল। ও যদি দেখতে পায়, আমার গা ঢাকা দেবার উপায় থাকবে না।"

"আপনি আপনার সেই অস্ত্র নিয়ে যাননি?"

"সঙ্গে ছিল। তবে সামনা-সামনি সুজনকে ঘায়েল করার ক্ষমতা আমার নেই। তার গায়ে যে ক্ষমতা, তাকে আসুরিক বলা যায়। সুজনের সঙ্গে দিনের বেলায় লড়তে যাওয়া পাগলামো। পিস্তল, রিভলভার থাকলে আলাদা কথা।"

"কিন্তু কাল তো আপনি দুপুরেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন।"

"খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। কোথায় থাকতে পারে আন্দাজ করতে গিয়েছিলাম।" বলে সিদ্ধেশ্বর হঠাৎ থেমে গেলেন, তারপর বরদার মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে বললেন, "আপনি শুনলে অবাক হবেন, সুজন দিনের বেলায় সবই দেখতে পায়, কিন্তু সূর্য অস্ত যাবার পর ওর চোখের জোর কমে যায়, রাত্রের দিকে সুজন প্রায় অন্ধ। রাত্রে ওর চোখের জোর নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু চোখ যত যায়, তার ঘ্রাণশক্তি তত বাড়ে। ভাল জাতের শিকারি কুকুরের মতন তখন ওর নাক-ই সব। সুজনকে যুঝতে হলে রাত্রেই সুবিধে। তবে রাত্রে ও শিকারি কুকুর, ভয়ংকর। বরদাবাবু, আমার কিন্তু একটা দুশ্চিন্তা হচ্ছে।"

বরদা তাকাল। "কী দুশ্চিন্তা?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনি বলছেন, আপনার সুটকেস থেকে কিছু খোয়া যায়নি। আমার সন্দেহ হচ্ছে, কিছু নিশ্চয় খোয়া গিয়েছে। ছোটখাটো কোনও জিনিস, যা আপনার নজরে পড়েনি। যেমন ধরুন, রুমাল, গেঞ্জি কিংবা এইরকম কিছু।"

বরদা অবাক গলায় বলল, "রুমাল বা গেঞ্জি চুরি করে কী হবে?"

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে ভয় দেখাতে চাইছিলেন না; যতদূর সম্ভব সাধারণ গলায়

বললেন, "সুজনের জন্যে দরকার। সুজন আপনাকে দেখেনি। চেনে না। আপনি এই চৌহদ্দির বাইরেও যান না। এমন হতে পারে, মহাদেব আপনার ব্যবহার করা কোনও জিনিস সুজনের কাছে পৌঁছে দিতে চায়।"

"আমার জিনিস! কেন?"

"গন্ধ। আপনার ব্যবহার করা জিনিসে যে গন্ধ থাকবে, সেই গন্ধ শুঁকে সুজন আপনাকে চিনে নেবে। কুকুর যেমন চিনে নেয়। শিকারি কুকুর। এই গন্ধ চিনেই সুজন যে-কোনও দিন রাত্তিরে হানা দিতে পারে আপনার ঘরে।"

বরদা চমকে উঠল। সিদ্ধেশ্বর কি তার সঙ্গে তামাশা করছেন? ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন মিছেমিছি? নাকি যা বলছেন তা মোটেই তামাশা নয়? নিজেও কি বিচলিত হয়ে পড়েছেন সিদ্ধেশ্বর? কিন্তু এটাই বা কেমন করে হয়? সুজন দিনের বেলায় চোখে দেখতে পায়, রাত্রে পায় না। দিনে সে চোখে দেখে শয়তানি করে, আর রাত্রে গন্ধ শুঁকে। সুজন কি তা হলে অর্ধেক মানুষ-শয়তান আর বাকি অর্ধেক পশু-শয়তান?

হঠাৎ কেমন উত্তেজিত, অধৈর্য, বিরক্ত হয়ে বরদা বলল, "যথেষ্ট হয়েছে। এবার আপনি আমায় চলে যেতে দিন। এমন জানলে আমি এখানে আসতাম না। এটা মশাই রিসার্চ সেন্টার, না খুনোখুনির জায়গা! আপনাদের রেষারেষির মধ্যে আমায় কেন টেনে আনলেন? মহাদেব, সুজন, যার যা খুশি করুক, আমার কী! আমায় ছেড়ে দিন।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনাকে ছেড়ে দেব কেমন করে বরদাবাবু? আপনাকে ছেড়ে দিলেও কি আপনি পৌঁছতে পারবেন? যদি টাঙাঅলার মতন হয়ে যায়, তখন?"

বরদার চোখের পাতা পড়ল না। সিদ্ধেশ্বরকে দেখতে লাগল। আর আজই প্রথম, তার কেমন যেন ঘৃণা হল সিদ্ধেশ্বরের ওপর। সব জেনেশুনেই ভদ্রলোক বরদাকে এই বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন।

বরদার ঘরে এলেন সিদ্ধেশ্বর।

মন মেজাজ খারাপ ছিল বরদার। কথাবার্তাও বলছিল না সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে। সে এই ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেতে চায়। সিদ্ধেশ্বর যতই বলুন, মহাদেব সুজন কাউকে তার বিশ্বাস নেই। ঘরে আসার সময় বরদা এ-কথাও ভাবছিল যে, মানিককে একটা চিঠি লিখে দেবে কি না এখানে চলে আসতে। চিঠি বা টেলিগ্রাম কোনওটাই এখান থেকে সরাসরি করা যাবে না। ছুটতে হবে দুমকা। সেটা কি সম্ভব!

ঘরে এসে বরদা খাটের তলা থেকে সুটকেসটা টেনে বার করল। করে বিছানার ওপর রাখল।

সিদ্ধেশ্বর প্রায় পাশেই দাঁড়ালেন। বরদার বিরক্তি, উদ্বেগ, আতঙ্ক সবই তিনি বুঝতে পারছিলেন। ঘাঁটাচ্ছিলেন না বরদাকে। বরং নিজেও চুপচাপ কিছু ভাবছিলেন।

সুটকেস খুলে বরদা বলল, "নিন দেখুন।" রাগের মাথায় বলল। দেখার কথা তার,

সিদ্ধেশ্বরের নয়।

সিদ্ধেশ্বর শান্ত গলায় বললেন, "আগে নোটবইটা দেখুন। তারপর যা-যা আছে একে একে নামিয়ে, বিছানায় রাখুন।"

বরদা মোটা পুলওভারটা তুলে নিল। ওপরেই ছিল। শীতের কথা ভেবে এনেছিল। তেমন কিছু ঠাণ্ডা এখনও পড়েনি এখানে। পুলওভার ছাড়াই চলে যাচ্ছিল। তা ছাড়া এখানে এসে পর্যন্ত তো ঘরে বসেই দিন কাটছে, গায়ে চড়াবার দরকারও হয়নি।

পুলওভার তুলতেই নোটবইটা পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি তুলে নিল বরদা। "এই তো নোটবই।" বলে পাতা ওলটাতে লাগল।

সিদ্ধেশ্বর বিন্দুমাত্র পুলকিত হলেন না। বললেন, "ভাল কথা। তবে নোটবই থাকলেও যা না-থাকলেও তাই। মহাদেব যদি আপনার কলকাতার বাড়ির ঠিকানা খুঁজে থাকে, সেটা পেয়ে গেছে। টুকে নিয়েছে অন্য কাগজে। এবার আপনি অন্য সব দেখুন। আপনার কি মনে আছে, সুটকেসে কী-কী ছিল?"

বরদার মতন বেখেয়ালের মানুষের পক্ষে অত মনে রাখার কথা নয়। কলকাতা থেকে আসার সময় সে যে কী নিয়েছিল কেমন করে বলবে। ফর্দ করে তো নেয়নি। বউদি একটা জিনিস নিতে বলে, মা আর-একটা বলে, ঠিক ঠিক যে কী নিয়েছিল সে জানে না। মোটামুটি মনে আছে।

বরদা একটা-একটা করে জিনিস তুলে বিছানার ওপর রাখতে লাগল: বুশ শার্ট, প্যান্ট, পাজামা, গেঞ্জি, জাঙিয়া, দাড়ি কামানোর ব্লেড এক প্যাকেট, এক শিশি লোশান, মাথা ধরার বড়ি কয়েকটা, রুমাল।

সবই তো রয়েছে। বরদা খেয়াল করতে পারল না কোন জিনিসটা নেই। বলল, "আমার কিছু মনে পড়ছে না। সবই রয়েছে দেখছি।"

সিদ্ধেশ্বর এক নজরে সুটকেসটা দেখছিলেন। জিনিস তাঁর নয়, তিনি কেমন করে বুঝবেন, সুটকেসে কী ছিল, কী-বা খোয়া গিয়েছে।

খানিকটা যেন হতাশই হলেন সিদ্ধেশ্বর; বললেন, "নিন, সুটকেসটা গুছিয়ে ফেলুন।"

বরদা বলল, "মহাদেব কি তা হলে আমার ঠিকানা নিয়ে সরে পড়ল?"

সিদ্ধেশ্বর কোনও জবাব দিলেন না।

বরদা সুটকেস গোছাতে লাগল।

ঘরের চারদিকে অকারণে তাকাতে লাগলেন সিদ্ধেশ্বর। দেখার মতন কিছু নেই। ফাঁকা দেয়াল, একটা ছোট মতন দেয়াল-তাক। একদিকে কাঠের র‍্যাক, জামাকাপড় ঝুলিয়ে রাখার জন্যে। বরদার পাজামা গেঞ্জি পাঞ্জাবি ঝুলছে।

ঘরের মেঝেতে চোখ পড়ল সিদ্ধেশ্বরের। বরদার দামি মজবুত শু জুতো রাখা রয়েছে।

চোখ সরিয়েই নিচ্ছিলেন সিদ্ধেশ্বর, হঠাৎ তাঁর কী যেন মনে পড়ে গেল। সিদ্ধেশ্বর বরদার দিকে তাকালেন। "আপনি মোজা আনেননি?"

বরদা অবাক চোখে তাকাল। "মোজা! হ্যাঁ, মোজা আনব না কেন?"

"ক জোড়া এনেছেন?"

সঙ্গে সঙ্গে বরদার খেয়াল হল, সে একজোড়া মোজা পরে এসেছিল, আর-এক জোড়া তার সুটকেসে ছিল। ক্রিম রঙের মোজা, নাইলনের। কিন্তু মোজাটা তো দেখল না সুটকেসে।

হয়তো খেয়াল করেনি; ভুল হয়ে গেছে। বরদা দ্রুত হাতে সুটকেস থেকে আবার সব নামিয়ে ফেলল। খুঁজল। মোজা নেই। তাকাল সিদ্ধেশ্বরের দিকে, "আমার একজোড়া মোজা নেই। ক্রিম রঙের।"

সিদ্ধেশ্বর চোখ ফিরিয়ে জুতোর দিকে তাকালেন। "জুতোটা দেখুন তো?"

বরদা সুটকেস ফেলে রেখে জুতোর দিকে গেল। কোমর নুইয়ে এক পাটি জুতো তুলে নিল। কী আশ্চর্য! তার ক্রিম রঙের মোজা জুতোর মধ্যে গোঁজা।

অন্য পাটিটাও তুলে নিল। সেই একই ব্যাপার। ক্রিম রঙের মোজা জোড়া ছিল সুটকেসে। সেগুলো জুতোর মধ্যে এল কেমন করে? আর এই জুতোর মধ্যে চেক-কাটা মোজা ছিল, যা সে পরে এসেছিল সে-দুটো কোথায়?

বরদা বিহ্বল গলায় বলল, "তাজ্জব ব্যাপার! আমার নতুন মোজা এই জুতোর মধ্যে কে গুঁজে দিয়ে গেছে। আর পুরনো জোড়া নেই।" বলে বরদা ঘরের চারদিকে পুরনো মোজার জন্যে তাকাতে লাগল।

সিদ্ধেশ্বর কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকলেন। তারপর বললেন, "আপনার পুরনো মোজাই চুরি করেছে।"

"পুরনো মোজা! কেন? নতুনটাই বা কেন জুতোর মধ্যে রেখে গেল?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "নতুনটা রেখে গেছে অন্য কারণে। আপনি জুতো পরার সময় অত খেয়াল করবেন না। সাধারণত কেউ করে না। মোজা না থাকলে বরং জুতো পরার সময় খেয়াল হয়, মোজা গেল কোথায়! তাই না?"

বরদা বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। "পুরনো মোজা চুরি করার কারণ?"

"মহাদেবের কাজে লাগবে। প্রথমত মোজাটা আপনি পরেছিলেন। আপনার পায়ের গন্ধ রয়েছে। নতুনটায় না থাকতে পারত।"

বরদা চমকে উঠল। "তার মানে ওই পুরনো মোজা-জোড়া মহাদেব সুজনকে দিয়ে দেবে?"

সিদ্ধেশ্বর মাথা হেলালেন, "আমার সেই-রকম মনে হয়। আপনাকে আমি একটু আগেই বললাম, সুজন রাত্তিরে প্রায় কানা হয়ে থাকে, কিন্তু তখন তার ঘ্রাণশক্তি শিকারি কুকুরের মতন হয়ে ওঠে। সুজন আপনাকে দেখেনি, চেনে না; তবু সে যদি আপনার মোজার গন্ধ শুঁকতে পায়, আপনাকে ঠিক চিনে বার করে নেবে।"

বরদার গা যেন শিউরে উঠল। বিশ্বাস করা মুশকিল। কিন্তু যা-সব কাণ্ড-কারখানা এখানে সে দেখছে, তাতে অবিশ্বাস করা যায় না। হতে পারে সুজন মানুষ হলেও তার মধ্যে কুকুরের এই গুণ রয়েছে। পুলিশরা যে কুকুর পোষে, তাদের কাজই তো হল গন্ধ শুঁকে খুনে বদমাশদের ধরার চেষ্টা। না, অবিশ্বাসের কিছু নেই। সুজন সবই

পারে। যে মানুষ একজন নিরীহ টাঙাঅলার ওপর চড়াও হয়ে তার মুণ্ডুটাকেই দুমড়ে ঘাড় ভেঙে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে, তার অসাধ্য কাজ কী-ই বা থাকতে পারে।

বরদা ব্যাকুল গলায় বলল, "আপনি বলছেন, মহাদেব এইবার সুজনকে আমার পেছনে লেলিয়ে দেবে?"

সিদ্ধেশ্বর কিছু বললেন না। বলার কিছু নেই। মহাদেবকে আর বেশি এগোতে দেওয়া উচিত নয়, সে এখন খেপে গেছে, আবার একটা মানুষ খুন করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

বরদা ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল। বলল, "আপনি চুপ করে থাকলেই হবে? আমাকে কেন আপনি টেনে আনলেন এখানে?"

সিদ্ধেশ্বর বোবা হয়ে থাকলেন।

বরদা ছটফট করছিল। সুটকেসটা ঠেলে দিল। বলল, "আমি কলকাতায় ফিরে যাব। আপনি ব্যবস্থা করে দিন। ওসব সুজন-টুজন আমি জানি না। আপনি নিজে না পারলে, অন্য লোকজন দিয়ে আমায় রামপুরহাট পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন। আমি চলে যাব।"

সিদ্ধেশ্বর এবার কথা বললেন। "আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? আমরা তো রয়েছি।"

বরদার অসহ্য লাগল। বলল, "আপনারা থেকেও তো এত কাণ্ড হচ্ছে! কী করতে পারছেন আপনি? মহাদেব আপনার নাকের ওপর শয়তানি চালিয়ে যাচ্ছে, কিছুই করতে পারছেন না।...তা আপনাদের ব্যাপার আপনারা সামলান, আমাকে দয়া করে কলকাতার গাড়িতে তুলে দিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে, আর নয়—।"

সিদ্ধেশ্বর বুঝলেন, বরদাকে এখন আর ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। বললেন, "বেশ, আপনি যদি সত্যিই ফিরে যেতে চান সে ব্যবস্থা করা যাবে। তবে আপনাকে আমি বলছি, মহাদেবের অত সাধ্য হবে না যে, এখানে বসে সে আপনার ক্ষতি করবে!"

"করছে, তবু বলছেন তার সাধ্য হবে না!"

"না, মহাদেব এখন পর্যন্ত আপনার কোনও ক্ষতি করেনি। আপনাকে সে সাবধান করছে, ভয় দেখাচ্ছে। ক্ষতি করার ফন্দি আঁটছে অবশ্য, কিন্তু পারবে না।...থাকগে, আমি সতীশের কাছে যাচ্ছি। আপনি যদি যেতে চান চলুন।"

বরদার কোনও আগ্রহ হল না। বলল, "আপনি যান।"

"সতীশের সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতাম।"

মাথা নাড়ল বরদা। সে যাবে না।

সিদ্ধেশ্বর চলে গেলেন।

বরদা সামান্য সময় দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর বসে পড়ল বিছানায়। না, আর এক মুহূর্তও তার এখানে থাকার ইচ্ছে নেই। কলকাতাতেই সে ফিরে যেতে চায়। মানিক ঠিকই বলেছিল, বলেছিল, "তুই যাস না বরদা, ঝঞ্ঝাটে পড়ে যাবি।" ঠিকই বলেছিল।

দুপুর কাটল। বিকেলও কেটে গেল। বরদা ঘরে বসে বসেই সময় কাটাল। কখনও বই পড়ার চেষ্টা করল, কখনও চুপচাপ শুধু শুয়ে থাকল, ভাবল। বিকেল পড়ে যাবার পর সে বাইরে এসে পায়চারি করল খানিকক্ষণ। একটা ব্যাপার দেখে সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। পি পি রিসার্চ সেন্টারের মধ্যে এত বড় একটা বিপদ, অথচ কারও যেন মাথাব্যথা নেই, ভয় নেই, যে যার মতন কাজকর্ম করছে, ঘুরছে ফিরছে। মহাদেব কিংবা সুজনকে নিয়ে ওদের ভাবনা-চিন্তা না হবার কারণ কী?

বিকেল শেষ হবার মুখে মুখেই একজন এসে বরদাকে খবর দিল, সিদ্ধেশ্বর তাকে ডাকছেন।

বরদা বলতে যাচ্ছিল, সে যাবে না। তারপর মাথা ঠাণ্ডা করে বলল, "আসছি।"

লোকটা চলে গেল।

বরদা ঘরে ঢুকে সুটকেসে চাবি দিল। কাল চাবি দেওয়া ছিল না। দরকার হত না চাবি দেবার। বাইরে এসে দরজায় তালা দিল। পলকা সস্তা তালা। থাকা না-থাকা সমান। কাল তো তালা দেওয়াই ছিল। তবু তার ঘরে লোক ঢুকেছিল কত সহজে।

মাঠ বাগান পেরিয়ে বরদা সিদ্ধেশ্বরের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘরে সিদ্ধেশ্বর একা ছিলেন না; সতীশ ডাক্তারও ছিল।

বরদা আসামাত্রই সিদ্ধেশ্বর স্বাভাবিক গলায় বললেন, "আসুন। আপনার সঙ্গে সতীশের আলাপ করিয়ে দিই।"

আলাপ হল। সতীশকে খারাপ লাগার কথা নয়, একটু বেশি কথা বলে, গলার স্বর মোটা, গম্ভীর, কিন্তু শুনতে ভাল লাগে। চোখ দুটো ভীষণ ঝকঝকে। তাকিয়ে থাকলে মনে হয় যেন কীসের এক আকর্ষণে টেনে নিচ্ছে।

সন্ধে হয়ে গেল। বাতি জ্বালিয়ে নিলেন সিদ্ধেশ্বর।

সিদ্ধেশ্বরই বললেন হঠাৎ, "বরদাবাবু, আপনি কলকাতায় যাবেন বলছিলেন। কাল যদি আপনাকে কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করি, কেমন হয়!"

বরদা সিদ্ধেশ্বরের চোখে চোখে তাকাল। "কখন?"

"সকালের দিকে হবে না। রাত্তিরে একটা গাড়ি রয়েছে।"

"রাত্তিরে?"

"সতীশ আপনাকে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। ও আজ থেকে গেল, কাল সকালে ফিরে যাবে বলছিল, আমি আটকে রাখলাম।"

বরদা ঘাড় ফিরিয়ে সতীশের দিকে তাকাল। সতীশ কীসের একটা কাগজ দেখছে।

বরদা আবার সিদ্ধেশ্বরের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। "রাত্তিরে কেন?"

সিদ্ধেশ্বর সরাসরি প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন, বললেন, "আপনি সতীশের মোটরবাইকের পেছনে বসে চলে যাবেন। বেশি সময় লাগবে না।"

বরদার কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। সিদ্ধেশ্বর যেন জেনেশুনে বুঝে তাকে রাত্রে পাঠাতে চাইছেন। বলল, "রাত্তিরে যাওয়া কি নিরাপদ হবে?"

"সুজনের কথা ভেবে বলছেন?"

বরদা কোনও জবাব দিল না।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "সুজন মোটরবাইকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে পারবে না—" বলে একটু যেন হাসলেন, "সতীশ ভাল মোটরবাইক চালায়, ঘণ্টায় ষাট-সত্তর মাইল..." কথাটা শেষও করলেন না সিদ্ধেশ্বর।

সতীশ এবার বরদার দিকে তাকাল। বলল, "আপনাকে আমি পৌঁছে দেব। ভাববেন না। আমার অনেক লোক আছে স্টেশনে। গাড়িতে তুলে দেবে আপনাকে।"

এমন সময় একটা লোক চা নিয়ে এল।

সতীশ, সিদ্ধেশ্বর, বরদা চা নিল।

লোকটা চলে যাচ্ছিল। সিদ্ধেশ্বর তাকে ডাকলেন, "যশোদা কোথায়? তাকে একবার পাঠিয়ে দাও।"

লোকটা চলে গেল।

চা খেতে খেতে সিদ্ধেশ্বর সতীশকে বললেন, "সতীশ, যশোদাকে দিয়ে তুমি ও কাজটা করতে পারো।"

সতীশ একটু ভাবল। "যশোদা পারবে?"

"আমার মনে হয় পারবে।"

"মহাদেব কি তাকে বিশ্বাস করবে?"

"মহাদেব কাউকেই বিশ্বাস করবে না। তবু তাকে যে-কোনও ভাবে ওষুধটা খাওয়াতে হবে। যশোদা মহাদেবের পাশের ঘরে থাকে, তার ফন্দিফিকির জানা আছে অনেক। ওকে দিয়েই চেষ্টা করো।"

বরদা কিছুই বুঝতে পারছিল না কথাবার্তার। তার আড়ালে সিদ্ধেশ্বররা কী যে পরামর্শ করেছেন কে জানে। কিন্তু বরদা এটা বুঝতে পারছিল, মহাদেবকে আর বেশি বাড়াবাড়ি করতে দিতে চান না সিদ্ধেশ্বর।

বরদা বলল সিদ্ধেশ্বরকে, "কাল আমি কলকাতা যাবার সময় আপনি কোথায় থাকবেন?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "কাছাকাছি থাকব আপনার। ভয় নেই।"

পরের দিন সকাল থেকেই বরদার মন কলকাতার জন্যে ছটফট করতে লাগল। আজ সে ফিরে যাচ্ছে। কাল সকালে তার নিজের বাড়িতে। এই সব মহাদেব, সুজন, এদের হাত থেকে বাঁচবে সে। সিদ্ধেশ্বরের কথায় ভুলে কী বাজে জায়গায় না এসে পড়েছিল। যত সব ভুতুড়ে কাণ্ড। শুধু ভুতুড়েই বা কেন, পৈশাচিক ব্যাপার-স্যাপার! এমন জানলে কে আসত এখানে!

সত্যি বলতে কী, বরদা যে কৌতূহল নিয়ে এসেছিল তা কিন্তু মিটল না। দু-একজন নিশ্চয় তাকে অবাক করেছে, যেমন অর্জুনপ্রসাদ; তবে অবাকের চেয়ে ঘেন্না, বিরক্তি, রাগই তার বেশি হয়েছে। একটা নিরীহ টাঙাঅলাকে কেমন করে মারল এরা। আহা! এখানে গোপীমোহন, বংশীবদন যারাই থাক, যতই কেননা তাদের অদ্ভুত অদ্ভুত ক্ষমতা থাক, এদের মধ্যেই আবার মহাদেব আছে, সুজন আছে।

শয়তানের দল।

সিধুবাবু তাঁর রিসার্চ সেন্টার নিয়ে থাকুন, বরদা তার নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারলেই খুশি।

কলকাতার জন্যে মন ছটফট করলেও ভেতরে ভেতরে একটা উদ্বেগ বোধ করছিল বরদা। কেমন যেন চাপা ভয়। সতীশ ডাক্তারের মোটরবাইকের পেছনে চেপে তাকে স্টেশন পর্যন্ত যেতে হবে, অনেকটা রাস্তা, তাও আবার সন্ধেবেলা। কেউ কি জোর করে বলতে পারে রাস্তায় কিছু ঘটবে না! সুজন কোথায় ঘাপটি মেরে থাকবে কে জানে!

সবই যখন বুঝছেন সিদ্ধেশ্বর, আর সন্দেহও করছেন, মহাদেব সুজনকে লেলিয়ে দেবার জন্য তৈরি, টাঙাঅলার মতন বরদারও ঘাড় মটকে যেতে পারে—তখন কেন তিনি বরদাকে সন্ধেবেলায় পাঠাচ্ছেন? সকালেও তো পাঠাতে পারতেন?

সিদ্ধেশ্বরের মতলবও বরদার ভাল লাগছিল না। ভদ্রলোক কেমন ফন্দি এঁটে তাকে কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন, কত রকম ভেলকি দেখিয়ে! কে জানে, কী মতলব তিনি মনে মনে এঁটে রেখেছেন? আজ সন্ধেবেলায় বরদার ভাগ্যে কী রয়েছে ভগবানই জানেন!

কলকাতায় ফিরে যাবার জন্যে মন যতই ব্যাকুল হোক, দুশ্চিন্তাও হচ্ছিল বরদার। ভয়ও পাচ্ছিল।

খানিকটা বেলায় বরদা নিজেই সিদ্ধেশ্বরের খোঁজ করতে গেল। অফিসে তিনি নেই। ঘরেও নয়।

আরও বেলায় বরদা যখন নিজের ঘরে বিরস, শুকনো মুখে শুয়ে শুয়ে বিকেলের কথা ভাবছে, সিদ্ধেশ্বর তার ঘরে এলেন।

বরদা বিছানার ওপর উঠে বসল। "আপনাকে খুঁজে খুঁজে ফিরে এলাম।"

"শুনেছি," সিদ্ধেশ্বর বললেন। বসলেন চেয়ারে।

বরদা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। লক্ষ করল সিদ্ধেশ্বরকে, তারপর বলল, "আপনি আমার যাবার যে ব্যবস্থা করেছেন, তাতে আমার কেমন ভরসা হচ্ছে না। কিছুই বুঝতে পারছি না।"

সিদ্ধেশ্বর যেন হাসলেন, চাপা হাসি। বললেন, "ভয় পাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ," বরদা স্পষ্ট করে বলল।

"ভয়ের কী আছে! আপনি তো সতীশের মোটরবাইকের পেছনে থাকবেন। সে জোরেই গাড়ি চালায়। সুজন কি গাড়ির চেয়েও জোরে ছুটতে পারবে?"

"সে আপনি জানেন। আপনিই বলেছেন সে শিকারি কুকুরের মতন—।"

"সেটা তার ঘ্রাণ-শক্তির বেলায়। পায়ে ছোটার বেলায় নয়।"

"বুঝলাম। কিন্তু ওই সুজনই তো ছুটন্ত টাঙায় উঠেছিল। ছুটন্ত টাঙাও কম জোরে যায় না।"

সিদ্ধেশ্বর যেন বরদার বোকামিটা দেখছিলেন, বললেন, "টাঙা আর মোটরবাইকে অনেক তফাত। তা ছাড়া, এমনও তো হতে পারে, সুজন টাঙাঅলাকে রাস্তার মধ্যে

থামিয়েছিল। টাঙাঅলা কেমন করে জানবে, যে সুজন টাঙায় উঠে তার ঘাড় মটকাবে।"

কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে। সুজন টাঙা থামাতেই পারে, একা একা ফিরে যাচ্ছে টাঙাঅলা, মাঠের মধ্যে হাত দেখাল সে, কেনই বা দাঁড়াবে না! তা ছাড়া এদিকে যদি আসা যাওয়া থাকে টাঙাঅলার, তবে সুজনের মুখ অন্তত চেনা। বেচারা হয়তো ভেবেছিল, সুজন টাঙায় চড়ে খানিকটা যাবে।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "দিনের বেলায় যাওয়ার চেয়ে সন্ধেবেলায় যাওয়াই তো ভাল। দিনের বেলায় সুজন সবই দেখতে পায়, রাত্তিরে তার চোখের জোর একেবারেই কমে যায়। সেদিক থেকে আপনি নিরাপদ। একজন রাতকানা কতক্ষণ আর মোটরবাইকের পেছনে পেছনে ছুটবে?"

বরদা খানিকটা ভরসা পাবার চেষ্টা করল। বাস্তবিকই সুজন যদি রাতকানা হয়ে যায়, তার পক্ষে মোটরবাইকের পেছনে ছোটা সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, সে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে কিংবা কিছু ছুড়তে পারে বরদাদের দিকে। সতীশ ডাক্তার নিশ্চই সেটুকু সামলাতে পারবে।

"আপনি কাল বলেছিলেন," বরদা বলল, "আমরা যখন যাব আপনি কাছাকাছি থাকবেন। কোথায় থাকবেন?"

অন্যমনস্কভাবে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "থাকব। ঠিক কোথায় তা এখন বলতে পারছি না। তবে আপনাকে বিপদে ফেলে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকব না।"

বরদা এটা বিশ্বাস করে নিল। সিদ্ধেশ্বর সেরকম মানুষ নন।

সামান্য চুপচাপ থাকল বরদা। তারপর বলল, "আচ্ছা, আপনি আমায় একটা কথা পরিষ্কার করে বলবেন?...কলকাতা থেকে আপনি আমায় খুঁজে-পেতে, মানে ঘটনাচক্রে আমায় দেখতে পেয়ে এক মতলব ঠাউরে এখানে নিয়ে এলেন। মহাদেবের সঙ্গে আমার চেহারার মিল রয়েছে দেখেই ধরে এনেছিলেন আমাকে। কিন্তু এই চেহারার মিল দিয়ে কী করবেন ভেবেছিলেন আপনি? মানে, কেমনভাবে সেটা কাজে লাগাবেন ঠাওরেছিলেন?"

সিদ্ধেশ্বর মুখ তুলে বরদার দিকে চেয়ে থাকলেন। কিছু ভাবছিলেন। জবাব দেবার কোনও আগ্রহই যেন তাঁর নেই।

বরদা জবাবের আশায় অপেক্ষা করতে লাগল।

শেষে কথা বললেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "আমার একটা মতলব ছিল। আপনাকে বোধ হয় আগেও বলেছি। আপনাকে মহাদেব সাজিয়ে দেখতাম, তার দলে ক'জন ভিড়েছে এখানকার। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতন হত ব্যাপারটা।"

"আমাকে মহাদেব সাজাতেন?"

"হ্যাঁ। আপনি যদি মহাদেব না সাজেন তা হলে তার সঙ্গে কাদের আঁতাত হয়েছে, কে কে তার দলে ভিড়েছে, কেমন করে জানব!"

"মানে, আমাকে দিয়ে আপনি মহাদেবের পার্ট করাতেন?"

"অনেকটা তাই।"

"আর আসল মহাদেব?"

"তার ব্যবস্থা হত। ওকে একটা দিন বা একটা রাত গুম করে রাখার মতন জায়গা আমাদের এখানে অঢেল।"

বরদা আরও কৌতূহল বোধ করে বলল, "আসল মহাদেব গুম হত, আমি নকল মহাদেব হয়ে কেমন করে তার আঁতাতের লোকদের ধরতাম—সেটা একটু বলবেন?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "যা হয়নি তা বলে লাভ কী! সুযোগ-সুবিধে বুঝে মতলব ঠিক করতে হয়। আসল মহাদেবই আমাদের যেরকম শিক্ষা দিল, তাতে নকল মহাদেবকে কাজে লাগাবার ভাবনাই ভাবতে পারলাম না।...যাকগে, মহাদেব চাইছিল আপনি কলকাতায় ফিরে যান। সে আপনাকে তিনদিনের সময় দিয়েছিল। একটা দিন দেরি হয়ে গেছে বোধ হয়। তাতে কিছু হবে না। আপনি তো ফিরেই যাচ্ছেন। মহাদেব খুশি হবে। মনে হয় না, সে আর আপনার সঙ্গে কোনও শত্রুতা করবে।" বলে উঠে পড়লেন সিদ্ধেশ্বর।

বরদা বলল, "কাল আপনারা, আপনি আর সতীশবাবু মহাদেবকে কীসের ওষুধ খাওয়ানোর কথা বলছিলেন?"

সিদ্ধেশ্বর চেয়ার সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, "তেমন কোনও ব্যাপার নয়। আপনি যাতে নিরাপদে চলে যেতে পারেন তাই আপনার যাবার সময় ওকে একটু ঘুম পাড়িয়ে রাখার কথা হচ্ছিল।" বলে সিদ্ধেশ্বর দরজার দিকে পা বাড়ালেন, "দুর্জনকে বিশ্বাস করা যায় না, কী বলেন?"

বরদা বিছানা থেকে নেমে আসছিল; সিদ্ধেশ্বর দরজা পেরিয়ে হঠাৎ মুখ ফেরালেন। তাঁর যেন কিছু মনে পড়ে গিয়েছিল। বললেন, "আপনার সঙ্গে তো মাল কিছুই নেই। সুটকেস সামলে মোটরবাইকে যেতে পারবেন না। ওটা আগেই দিয়ে দেবেন। স্টেশনে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব। গোপাল নিয়ে যাবে।"

"যাবে কেমন করে?"

"সে ভাবনা আমাদের। সাইকেল নিয়ে বাস স্ট্যান্ডে যাবে, সেখান থেকে বাস ধরবে। তবে বিকেল নাগাদ দিয়ে দেবেন সুটকেস। নয়তো সময় মতন পৌঁছতে পারবে না।"

বরদা সুটকেসের কথা আগে ভাবেনি। সত্যিই সুটকেস সামলে মোটরবাইকের পেছনে বসে রামপুরহাট পর্যন্ত যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

সিদ্ধেশ্বর আর দাঁড়ালেন না, চলে গেলেন।

বরদা উঠল। বেলা হয়ে গিয়েছে। স্নান খাওয়া করতে হবে।

দুপুরে আর বরদার ঘুম হল না। গড়িয়ে গড়িয়ে কাটাল। কাল সে কলকাতায় নিজের বাড়িতে এতক্ষণ গড়াগড়ি করছে। বিকেলেই বেরিয়ে পড়বে মানিকের খোঁজে। মানিককে সব বলতে হবে, এখানকার কথা।

সিদ্ধেশ্বরকে আজ কেমন গম্ভীর, ক্ষুব্ধ মনে হল। বরদা চলে যাচ্ছে বলেই হয়তো। তিনি নিশ্চয় অনেক কিছুই ভেবেছিলেন। কোনওটাই কাজে এল না। বরদার কোনও

দোষ নেই। সে জেদাজেদি করে চলে যাচ্ছে বলে সিদ্ধেশ্বরের রাগ হলেও বরদার কিছু করার নেই। এখানকার ঝঞ্ঝাট যদি মামুলি হত, বরদা সাহায্য করতে পারত সিদ্ধেশ্বরকে। কিন্তু তা যখন নয়, ব্যাপারটা খুনোখুনির মধ্যে গিয়ে পড়েছে, কিছুই করতে পারবে না বরদা। নিজের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করা যায় না।

দশ রকম ভাবতে ভাবতে বিকেল হল। বরদা উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। গোছগাছ প্রায় সেরেই রেখেছে, সামান্য যা বাকি আছে সেরে নেবে।

হাত মুখ ধুয়ে আসতে গেল বরদা। ধুয়ে এসে জামাকাপড় পালটে ফেলবে। গোপাল আসবে সুটকেস নিতে। আর গড়িমসি না করাই ভাল।

একেবারে শেষ বিকেলে সিদ্ধেশ্বর এলেন। বললেন, "আপনার খাবারদাবার একটা টিফিন কেরিয়ারে করে গোপালকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সময়মতন ও আপনার সুটকেস, রাত্রের খাবার আর ট্রেনের টিকিট নিয়ে স্টেশনে হাজির থাকবে। আপনি তৈরি হয়ে নিন। সতীশ একটু পরেই আসছে।"

"আপনি?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

"আমি যতটা পারি এগিয়ে থাকছি। ঝাড়িখাস বলে একটা জায়গা আছে, ওখানেই থাকব। ওখান থেকেই বিদায় জানাব আপনাকে।"

বরদা সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন। কিন্তু আমার অবস্থাটা যদি আপনি বুঝতেন—"

বরদাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সিদ্ধেশ্বর বললেন, "না না, রাগ করব কেন? আমার নিজের ভুল হয়েছিল। যাক গে, ওসব আর ভাববেন না; যাবার সময় হয়ে এসেছে। আপনি তৈরি হয়ে নিন। আমি যাই।"

সিদ্ধেশ্বর আর দাঁড়ালেন না, চলে গেলেন।

বরদার তৈরি হওয়ার কিছু ছিল না। সে সাজগোজ সেরেই বসে ছিল। যাবার সময় চুলটা একবার আঁচড়ে নেবে, রুমালে মুখ মুছবে; জুতোটা পায়ে গলিয়ে ফিতে বাঁধবে, আর কী!

একটা সিগারেট ধরিয়ে বরদা অপেক্ষা করতে লাগল সতীশের।

আলোর ফিকে ভাবটুকু দেখতে দেখতে মুছে গেল কখন। অন্ধকার হয়ে গেল। আবার অন্ধকারের মধ্যে হালকা জ্যোৎস্না ফুটে উঠল ক্রমশ।

সতীশই দেরি করে এল। ডাকল, "আসুন।"

বরদা বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। "দেরি হয়ে গেল না?"

"হল একটু। গাড়িটা গণ্ডগোল করছিল। ঠিক করে নিলাম।"

"পৌঁছতে পারব তো?"

"বলেন কী! কতক্ষণ আর লাগবে। হাই স্পিডে বেরিয়ে যাব। আসুন।"

বরদা সতীশের মোটরবাইকের পেছনে গিয়ে বসল। বলল, "আমার কিন্তু অভ্যেস নেই। আনাড়ি। জোরে যাবেন না।"

সতীশ হাসল। বলল, "ভাল করে ধরে বসুন। এসব রাস্তা ভাল নয়। মাঝে মাঝে লাফাবে।"

স্টার্ট দিল সতীশ। বরদা সতীশকে আঁকড়ে ধরল।

ছোট একটা পাক খেয়ে গাড়ি ফটকের কাছে। মালী ফটক খুলে দিল। একেবারে মাঠে গিয়ে পড়ল মোটরবাইক।

বরদা একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। জায়গাটা তার ভালই লেগেছিল, কিন্তু বড় গোলমেলে ব্যাপার এখানে, মনের স্বস্তি-শান্তি নিয়ে থাকা যায় না। ওপর ওপর কেমন শান্ত, নিরিবিলি, আশ্রম-আশ্রম মতন, অথচ ভেতরে কী ভয়ংকর!

মোটরবাইকের শব্দটা প্রথম দিকে কানে লাগছিল। এখন আর লাগছে না। বোধ হয় ফাঁকা মাঠেঘাটে ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসের সঙ্গে। সন্ধে হয়ে গেছে। আসবার দিন বরদা যে-রকম চাঁদের আলো দেখেছিল, তার চেয়েও খানিকটা যেন স্পষ্ট আলো দেখছে আজ। শীত না থাক, আমেজটা রয়েছে। গাছপালা কালচে। চাঁদের আলো যেন জলের ঝাপটার মতন গায়ে মাথায় লেগে আছে।

হেডলাইট জ্বালানোই ছিল। সতীশ তেমন জোরে যাচ্ছে না। গাড়িটা মাঝে মাঝেই লাফাচ্ছিল।

যেতে যেতে দু-একটা কথা বলল সতীশ। বাতাসে শোনা যায় না। বরদা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জবাব দিল। তার মনে এখনও খানিকটা উদ্বেগ রয়েছে। মনে হয় না ভয়ের কিছু আছে, তবু বরদা একেবারে নির্ভয়, নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না।

সতীশ গাড়ি জোর করল। আলোটা তিরের ফলার মতন সামনের দিকে ছুটছে। আশপাশ নিঃসাড়। মাঝে মাঝেই ঝোপঝাড় যেন ছুটে এসে রাস্তা আগলে দাঁড়াতে চাইছে, আবার সরে যাচ্ছে। কোথাও বা ফাঁকা মাঠ। উঁচু-নিচু। জ্যোৎস্নার মধ্যে শুয়ে আছে। বিশাল কোনও নিম বা কাঁঠালগাছ কিংবা অন্য কিছু স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে।

পলাশবন এসে গেল। এদিকে যেন আরও পরিষ্কার জ্যোৎস্না। বরদার মনে হল, এই রকম কোনও একটা জায়গায় সিদ্ধেশ্বরের থাকার কথা। মানুষটি বড় অদ্ভুত। বরদাকে উনি কাজে লাগাতে এনেছিলেন। পারলেন না। একটু যেন দুঃখই হল বরদার।

হঠাৎ সতীশ যেন কী বলল।

বরদা শুনতে পেল না।

গাড়িটা যেতে যেতে ধীর হয়ে আসছিল, তার শব্দ বন্ধ হল, তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে সামান্য এগিয়ে থেমে গেল।

"কী হল?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

"বুঝতে পারছি না। নামুন। দেখছি কী হল?"

বরদা নামল। সতীশও। নেমে পড়ে গাড়িটাকে স্ট্যান্ডের ওপর দাঁড় করাল। তার টুল-বক্সে যন্ত্রপাতি টর্চ রয়েছে। গাড়ির আলো নিবিয়ে দিল সতীশ। টুল-বক্স থেকে টর্চ বার করল।

বরদা রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এভাবে মোটরবাইক বিগড়ে যাওয়ায় সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। উদ্বেগও বোধ করছিল।

সতীশ কখনও ঝুঁকে পড়ে, কখনও উবু হয়ে বসে কী সব দেখছিল। দেখতে

দেখতে নিজের মনে যেন কিছু বলল।

আর ঠিক সেই সময় বরদা সামান্য দূরে কার পায়ের শব্দে চমকে উঠে তাকাল। তাকিয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

মহাদেব।

যার হাত থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল বরদা, সেই শয়তান মহাদেবই চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে এল বরদার। ভয়ে কেমন অদ্ভুত শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সতীশ। হাতের টর্চটা ফেলল মহাদেবের মুখে। জোরালো আলো।

আলো মুখে পড়তেই মহাদেব বোধ হয় বিরক্ত হল। চোখের পাতা বুজল। মাথা নাড়ল।

মহাদেবের সামান্য পিছনে সিদ্ধেশ্বর। আগে তাঁকে দেখা যায়নি, খেয়ালও করেনি বরদা। সিদ্ধেশ্বরকে দেখে যে ভয় পেল তাও নয়, তবু একটু বুঝি সাহস হল।

সিদ্ধেশ্বর বড়-বড় পা ফেলে একেবারে মহাদেবের পিঠের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পোশাকটা অদ্ভুত। কালো প্যান্ট, কালচে শার্ট। গায়ের সঙ্গে পোশাকটা লেপটে রয়েছে।

বরদার গলা উঠছিল না। বুক ধকধক করছে। বলল, "আপনি?"

সিদ্ধেশ্বর ঠাট্টার গলা করে বললেন, "কাছাকাছি থাকব বলেছিলাম।" বলে মহাদেবের দিকে ইশারা করে দেখালেন। "ওকে একটু ভাল করে দেখুন তো! কী মনে হচ্ছে?"

বরদা নজর করে দেখল। কয়েক মুহূর্ত দেখার পর তার গলা দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল। মহাদেবের পরনে বরদার প্যান্ট, বরদার-শার্ট, বরদার মতনই দেখাচ্ছে তাকে। আচমকা দেখলে বরদারই যেন মনে হত, সে ভূত দেখছে।

"আমার প্যান্ট, জামা...।"

"আপনার মতনই দেখাচ্ছে না?"

ঘাড় নাড়ল বরদা। দেখাচ্ছে। বলল, "প্যান্ট জামাও চুরি করেছিল?"

"না। করেনি। আমরা করেছি। সুটকেস থেকে।"

কথাটা ধরতে পারল না বরদা প্রথমে। তারপর বুঝতে পারল। সিদ্ধেশ্বর আগেভাগেই সুটকেস নিয়ে নিয়েছিলেন বরদার, বলেছিলেন গোপালকে দিয়ে স্টেশনে পাঠিয়ে দেবেন। বরদা এবার বুঝতে পারল, সিদ্ধেশ্বর ধোঁকা দিয়েছিলেন বরদাকে, ধোঁকা দিয়ে সুটকেসটা হাতিয়ে নিয়েছিলেন। সেই সুটকেস থেকে প্যান্ট শার্ট বার করে মহাদেবকে দিয়েছেন পরতে। কিন্তু কেন?

মহাদেব চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, তার নিজের যেন চেতনা নেই। আচ্ছন্নের মতন হয়ে আছে। চোখের পাতা আধ-বোজা, ঘুম-ঘুম ভাব। সামান্য

দুলছে। মুখে কথা নেই। বরদাদের দেখছে, কিন্তু খেয়াল নেই।

বরদা বলল, "কী হয়েছে ওর?"

সিদ্ধেশ্বর বাঁকা করে হাসলেন, "ওষুধের গুণ।"

"কী ওষুধ?"

সিদ্ধেশ্বর সতীশকে দেখিয়ে দিলেন। "ডাক্তার জানে।"

সতীশ দু পা এগিয়ে গিয়ে মহাদেবের চোখ-মুখ দেখল আবার। মহাদেব আবার বিরক্ত হল। আলো যেন সহ্য করতে পারছিল না।

সতীশ সিদ্ধেশ্বরকে বলল, "আরও ঘণ্টাখানেক থাকতে পারে। তারপর আর ইনজেকশনের এফেক্ট থাকবে না।"

বরদা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সিদ্ধেশ্বর বললেন, "তা হলে আর দেরি করে লাভ নেই। তুমি এদিকে একটু চক্কর মেরে দ্যাখো।"

টর্চটা নিবিয়ে ফেলল সতীশ। নিবিয়ে বরদার হাতে দিল। বলল, "ধরুন।"

বরদা টর্চটা হাতে নিল।

সতীশ মোটরবাইকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, সিদ্ধেশ্বর বললেন, "বাতি জ্বেলো না। জ্যোৎস্না রয়েছে। এদিকে ধীরে ধীরে বার কয়েক চক্কর মারতে পারবে না?"

সতীশ জ্যোৎস্নার আলো দেখল। বলল, "পারব বোধ হয়।"

"দরকার পড়লে গাড়ির আলো জ্বেলে নিয়ো। না জ্বালানোই ভাল।"

সতীশ কেমন অক্লেশে স্টার্ট দিল গাড়িতে। বরদা বুঝতে পারল না, যে গাড়ি বিকল হয়ে রাস্তায় পড়েছিল এতক্ষণ, সেটা এখন কেমন করে ঠিক হয়ে গেল? এটাও কি ধোঁকা?

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সতীশ বলল, "কতটা চক্কর মারব, সিধুদা?"

"কতটা আর। সিকি মাইলটাক। আমার মনে হয় সুজন এরই কাছাকাছি কোথাও রয়েছে।"

সতীশ বিশ-পঁচিশ গজ এগিয়ে গিয়ে গাড়ির মুখ ঘোরাল। ঘুরিয়ে পলাশ বনের দিকে আবার ফিরে চলল, "ধীরে ধীরে, মোটরবাইকের শব্দটা এই ফাঁকায় ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

মহাদেব যেন আর দাঁড়াতে পারছিল না। জড়ানো শব্দ করল। টলে গেল। তারপর বসে পড়ল রাস্তায়। সিদ্ধেশ্বরের পায়ের কাছে। সিদ্ধেশ্বর দু পা পিছিয়ে গেলেন।

বরদার আর ধৈর্য থাকছিল না। তাকে আর কত অবাক করবেন সিদ্ধেশ্বর! পরপর এত কাণ্ড কেন? মনে-মনে কী ভেবে রেখেছেন সিদ্ধেশ্বর? বরদার আড়ালে সতীশের সঙ্গে কোনও মতলব এঁটেছেন তিনি?

বরদা বলল, "আপনি আমায় কলকাতায় পাঠাবার নাম করে এসব কী করছেন আমি বুঝতে পারছি না। মহাদেব কোথা থেকে এল? আপনি সুজনকেই বা কেন খুঁজছেন? তার মতন লোককে এই অবস্থায় যেচে কেউ ডাকে?"

সিদ্ধেশ্বর চারপাশ তাকালেন। দেখলেন। বললেন, "আজ আপনার কলকাতা ফেরা হবে না।"

অবাক হল না বরদা। বলল, "আপনি আমাকে কলকাতা পাঠাবার নাম করে অন্য মতলব ঠাউরেছেন।"

"হ্যাঁ।"

"আমায় বলেননি কেন?"

"বললে আপনি রাজি হতেন না। ভয় পেতেন।" বলে মহাদেবের দিকে ইশারা করলেন, "ওর সঙ্গেও একটু চালাকি করলাম।"

"মানে?"

"আপনি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন এটা জানার পর মহাদেব কি চুপ করে বসে থাকবে? কী মনে করেন আপনি মহাদেবকে? ও কি মিথ্যে মিথ্যে আপনার পুরনো মোজা চুরি করেছিল?" বলে মহাদেবের দিকে তাকালেন। "সুজনকে ও তৈরি করে রেখেছে। তাই না মহাদেব?"

মহাদেব মাঠের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। মাথা টলে পড়েছে বুকের কাছে। তার কোনও হুঁশ নেই।

সিদ্ধেশ্বর একবার টর্চটা জ্বালতে বললেন বরদাকে, জ্বেলে মহাদেবের মুখের ওপর ফেলতে বললেন।

বরদা টর্চ জ্বালল। মহাদেবের মুখে ফেলল। মনে হল, মহাদেব আর একটু পরেই হয়তো মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

সিদ্ধেশ্বর টর্চ নেবাতে বললেন। বরদা টর্চ নেবাল।

জ্যোৎস্না যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চারদিক ফাঁকা, ঝিমঝিম করছে জ্যোৎস্না, পলাশবনের দিক থেকে মোটরবাইকের শব্দ ভেসে আসছে, শীতের কুয়াশা জমছে হালকা, গাছপালার গায়ে ছায়া আর চাঁদের আলো জড়ানো।

বরদা বলল, "আপনি আমায় কলকাতা পাঠাবার নাম করে এসব কেন করলেন? আমি বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে চাইনি।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমার কপাল খারাপ বরদাবাবু, আগে বুঝতে পারিনি এরকম একটা ঝঞ্ঝাটে আমাকেও পড়তে হবে।...ও কথা থাক, আজ আপনি কলকাতায় ফিরে যেতে চাইলেও পারতেন না। মহাদেব আপনাকে ছাড়ত না।"

"কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন—?"

"যা বলেছিলাম ভুলে যান। আপনি ভয় পেয়েছিলেন বলে ভরসা দিয়েছিলাম। কিন্তু এটা আপনি নিশ্চয় করে জানবেন, মহাদেব আপনাকে ছাড়ত না। আজও নয়। সুজনকে আপনার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে।"

বরদা চারদিকে তাকাল। যেন সুজন কোথাও আছে কি না দেখল। বলল, "কেন? আমি তো ফিরেই যাচ্ছিলাম। মহাদেব আমায় কলকাতায় ফিরে যেতে বলেছিল। সময় দিয়েছিল তিন দিন। জিজ্ঞেস করুন। আমার একদিন দেরি হয়ে গিয়েছে এই যা।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "যে লোক নিরীহ একজন টাঙাঅলাকে অকারণে পিশাচের মতন খুন করায়, তার কথা আপনি বিশ্বাস করেন? ও আপনাকেও টাঙাঅলার মতন

খুন করত। করবে ভেবেছিল। তার ব্যবস্থাও করে রেখেছে। আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন, দেখতেই পাবেন।"

বরদার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আবার। তাকাল মহাদেবের দিকে। না, মাটিতে লুটিয়ে পড়েনি মহাদেব, দু হাত দু পাশে রেখে বসে আছে। লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় না। মহাদেবের পক্ষে সবই সম্ভব।

ঘৃণা হল বরদার। শয়তানটা কী অক্লেশে বেচারা টাঙাঅলাকে খুন করিয়েছে। নিরীহ, নির্দোষ, হতভাগ্য টাঙাঅলা! টাঙাঅলার তুলনায় বরদা তো মহাদেবের ঘৃণার পাত্র, শত্রু। কেননা বরদাকে কলকাতা থেকে সিদ্ধেশ্বর নিয়ে এসেছিলেন মহাদেবকে শায়েস্তা করতে।

"ও কথা বলছে না কেন?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

"কথা বলার অবস্থায় নেই।"

"কেন?"

"ওর কোনও বোধ নেই। কিছু বুঝতে পারছে না।"

বরদার কানে মোটরবাইকের শব্দটা অদ্ভুত লাগছিল। সতীশ অনেক কাছে এসে গিয়েছে, তবু দেখা যাচ্ছে না। গাছপালার ছায়ার সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে সতীশ আর তার মোটরবাইক।

"মহাদেবকে আপনারা না ওষুধ খাওয়াবার কথা বলছিলেন?" বরদা বলল।

"ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল। তারপর আজ ইনজেকশানও করা হয়েছে।"

"কখন?"

"বিকেলে। সতীশ করেছে।"

"কী ইনজেকশান?"

"আমি ঠিক জানি না। সতীশ জানে।"

"ওকে আপনি নিয়ে এলেন কেমন করে এতটা রাস্তা?"

"গোরুর গাড়ি করে।"

বরদা অবাক হয়ে বলল, "গোরুর গাড়ি? কোথায় গোরুর গাড়ি? আমি তো দেখিনি?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "দেহাতের মানুষ আমরা, গোরুর গাড়ি ছাড়া চলে নাকি? গাঁয়ের মানুষদের এটাই তো ভরসা।"

বরদা বুঝতে পারল, গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে মহাদেবকে, মানে বেহুঁশ মহাদেবের শরীরটাকে এতটা রাস্তা বয়ে এনেছেন সিদ্ধেশ্বর। কোনও সন্দেহ নেই, বরদারা বেরিয়ে পড়ার অনেক আগেই সিদ্ধেশ্বর বেরিয়ে পড়েছিলেন। উনি তো বরদাকে বলেই এসেছিলেন, 'আমি তা হলে এগিয়ে যাচ্ছি।'

বরদা বলল, "আপনি কি সোজা এই রাস্তা ধরে এসেছেন? দেখতে পেলাম না তো?"

"খানিকটা সোজা এসেছি, তারপর জঙ্গলের মধ্যে মেঠো রাস্তা ধরে।"

"একলা এসেছেন?"

"একলা। মহাদেবের যদিও করার ক্ষমতা কিছু নেই, তবু ওর হাত দুটো বেঁধে রেখেছিলাম।" বলে একটু যেন হাসলেন।

বরদা বলল, "আপনার কি এখানে এসেই অপেক্ষা করার কথা ছিল?"

"হ্যাঁ। এই জায়গাটাকেই ঝাড়িখাস বলে। পলাশবনের এই দিকটাকে। কাছেই গ্রাম রয়েছে কাঠুরেদের।"

বরদা বুঝতে পারল, সতীশের সঙ্গে সিদ্ধেশ্বর ভেতরে ভেতরে এই মতলবটাই তবে এঁটেছিলেন। সিদ্ধেশ্বর নিজে মহাদেবকে নিয়ে এখানে এসে অপেক্ষা করবেন, আর সতীশ আনবে বরদাকে। সবই মতলব-মতন করা হয়েছে, ছক অনুযায়ী। সতীশের মোটরবাইক খারাপ হয়ে যাওয়াটা নিছকই ধোঁকা দেওয়া।

সতীশ কাছাকাছি এল। এসে আবার বাইকের মুখ ঘুরিয়ে পলাশবনের দিকে চলে গেল।

অনেকক্ষণ ধরেই দাঁড়িয়ে আছে বরদা। পা ধরে যাচ্ছিল। মহাদেব মাটিতে বসে। এই মহাদেবকে একেবারে নির্জীব, অক্ষম, অসহায় দেখাচ্ছিল। তার কিছু করার নেই। কথাও বলতে পারছে না। হয়তো বলতেও চাইছে না।

বরদা আবার একবার টর্চ জ্বালল, মুখ দেখল মহাদেবের।

মুখে আলো পড়ায় মহাদেব মাথা তুলল। বিরক্ত হল। কী যেন বলল, তারপর জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল।

টর্চটা নিবিয়ে দিল বরদা।

"মহাদেবকে কী করবেন ভেবেছেন?" বরদা জিজ্ঞেস করল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমরা কিছু করব না। যা করার সুজন করবে।"

"সুজন?"

"সুজন তো মহাদেবের বন্ধু। সে আসুক। দেখুক মহাদেবকে।"

সুজনের নামেই বরদার আবার কেমন ভয় ভয় করে উঠল। বলল, "সুজন আসবে?"

"আসবে। আসার কথা। মহাদেব তার বন্ধুকে ডেকেছে, আসবে না কেন?"

"মহাদেব কি সুজনকে আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি জানেন ঠিক?"

"বেশ তো, দেখুন না—?"

সতীশ আবার ফিরে আসছে। একবার তার গাড়ির বাতিটা জ্বালল। আবার নিবিয়ে দিল। নির্জন, নিস্তব্ধ এই প্রান্তরে মোটরবাইকের ফটাফট শব্দটা কেমন ভৌতিক শোনাতে লাগল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বরদা বলল, "সুজন যদি আসে, আমরা কী করব?"

"আমরা কিছু করব না। শুধু দেখব। দেখব, সুজনের মুখের সামনে যে শিকার রেখেছি সেই শিকারের কী অবস্থা হয়!"

বরদা চমকে উঠে বলল, "মহাদেব তো সুজনের বন্ধু। সুজন ওর হাতের লোক।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "মহাদেবের গায়ে আপনার প্যান্ট-জামা রয়েছে। সুজন মানুষ চিনবে না, রাত্তিরে সে গন্ধ চিনেই আসবে। চোখেও ভাল দেখতে পাবে না। আর মহাদেবকে তো দেখছেন, তার কথা বলার মতন অবস্থা নেই।"

বরদাকে আর বলতে হল না, সে বুঝতে পারল, সুজন যদি শিকারি কুকুরের মতন গন্ধ শুঁকে একবার মহাদেবের দিকে চলে আসতে পারে, তবে মহাদেবের আর বাঁচার আশা নেই। কিছুই করতে পারবে না মহাদেব। তার কোনও ক্ষমতাই থাকবে না নিজেকে বাঁচাবার। টাঙাঅলার মতন অবস্থা হবে তার।

ভয়ে কেমন শিউরে উঠল বরদা। বলল, "মহাদেব মরবে?"

সিদ্ধেশ্বর কঠিন গলায় বললেন, "টাঙাঅলা কেমন করে মরেছিল আপনি কি দেখেছিলেন? মহাদেবকে আজ সেইভাবে মরতে হতে পারে। নিজের ফাঁদে নিজেই পড়েছে মহাদেব, আমার কিছু করার নেই।"

সতীশ তখন সামান্য দূরে। দূর থেকেই চেঁচিয়ে কী যেন বলল। শোনা গেল না।

তাকালেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "সুজন বোধ হয়।"

বরদা কেঁপে উঠল। তাকিয়ে থাকল।

কিছুই নজরে আসছিল না। তারপর চোখে পড়ল, ছায়ার মতন কে যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এদিকেই।

"সুজন?" বরদা বলল, বলেই হাত চেপে ধরল সিদ্ধেশ্বরের।

সুজন এগিয়ে আসছিল। ধীরে ধীরে। দাঁড়াল একবার। তাকাল যেন এদিক-ওদিক, তারপর পা পা করে এগিয়ে আসতে লাগল।

বরদার মনে হল, সুজন চোখে এ-সময় ভাল দেখতে না পেলেও কানে তো শুনতে পায়, সতীশের গলা সে শুনেছে, শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। একবার দেখে নিল। হয়তো সাবধান হল।

মহাদেবের এতটা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হচ্ছিল না বরদার। ভয় করছিল। হাত-পা কাঁপছিল। চাপা গলায় বলল, "চলুন, আমরা সরে যাই।"

সিদ্ধেশ্বর বরদার হাত ধরে টানলেন, "হ্যাঁ, এখানে আর নয়।"

বরদা কয়েক পা পিছু হটল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে প্রায় দৌড় দেবার মতন করে অনেকটা পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। কাছাকাছি একটা ঝোপের সামনে।

সিদ্ধেশ্বর হাত ছেড়ে দিয়েছিলেন বরদার। তিনিও পিছিয়ে এলেন খানিকটা—তবে বরদার মতন দৌড়লেন না।

বরদা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল। জ্যোৎস্নার হালকা ভাবটা কেটে গেছে অনেকক্ষণ; সামান্য গাঢ় দেখাচ্ছিল চাঁদের আলো। ঝিঁঝির ডাকের মতন একটা শব্দ চারদিকে, বাতাসে শীতের কনকনে ভাব। বরদা ভয়ে যতটা কাঁপছিল, শীতে ততটা নয়।

সতীশ তার মোটরবাইকের এঞ্জিন বন্ধ করে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

বরদা দূর থেকে সুজনকে দেখছিল। সবই অস্পষ্ট; তবু মনে হল, চেহারাটা সাধারণ নয়। দৈত্যের মতনই দেখাচ্ছিল তাকে। বেশ লম্বা, এক মাথা চুল, বাবরি ধরনের। বোধ হয় গায়ের রংও কালো। মহাদেবের একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছিল সুজন।

সিদ্ধেশ্বর খানিকটা পিছিয়ে এসে দাঁড়ালেন। বরদা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে—অত পেছনে নয়, তার থেকে সামান্য এগিয়ে।

মহাদেবের জন্যে দুঃখ করার কোনও কারণ নেই। শয়তানটা তাকে মারতে চেয়েছিল। টাঙাঅলাকে মেরেছে। তবু এখন অসহায় মহাদেবের জন্যে কেমন যেন দুঃখই হল বরদার। হিংস্র বুনো বাঘের মুখের সামনে দড়ি-বাঁধা ছাগলকে রেখে দিলে যেমন অবস্থা হয় তার, মহাদেবেরও সেই অবস্থা। কিছু করার নেই মহাদেবের।

সুজন মহাদেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মহাদেব তার পায়ের কাছে।

বরদার বুক ধকধক করছিল। চোখের সামনে একজন অন্য আরেক জনের ঘাড় মটকাবে—এই দৃশ্য সে দেখতে পারবে না। তার অত সাহস নেই। কলকাতার রাস্তায় কোথাও কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে শুনলে তার ধারেকাছে সে এগোয় না।

চোখ বন্ধ করল না বরদা, কিন্তু সতর্ক থাকল; তেমন কিছু দেখলেই সে চোখের পাতা বুজে ফেলবে।

সুজন মহাদেবকে তুলে ধরেছে। উঠতে পারছে না মহাদেব। টলে পড়ছে। সুজন মহাদেবকে কোনও রকমে দাঁড় করিয়ে যেন গন্ধ শুঁকতে লাগল জামার। ঝাঁকি দিল। মুঠো করে চুল ধরল; ঝাঁকুনি দিল বার কয়েক। তারপর অদ্ভুত এক শব্দ করল, পশুর মতন।

মহাদেব তার হাত দুটো মাথার ওপর তুলল। তারপর কী যে হল, বরদা বুঝল না—, সুজন মহাদেবের গোটা শরীরটা মাথার ওপর তুলে নিল। দু হাতে মহাদেবকে মাথার ওপর তুলে আচমকা ছুড়ে দিল। আর্তনাদ করে উঠল মহাদেব। এই নিস্তব্ধ জঙ্গলে মহাদেবের সেই করুণ আর্তনাদ বীভৎস শোনাল। হাত পা অসাড় হয়ে এল বরদার।

সুজন দৈত্যের মতন দাঁড়িয়ে। হাত কয়েক দূরে মহাদেব পড়ে আছে। তার আর্তনাদ থামছে না। যন্ত্রণার, কান্নার অদ্ভুত এক শব্দ ভেসে আসছিল।

সিদ্ধেশ্বর হঠাৎ বরদাকে ডাকলেন, "টর্চটা আপনার কাছে?"

বরদার গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনও রকমে সাড়া দিল।

"আমায় দিন।"

ঝোপ ছেড়ে এগোবার সাহস হল না বরদার।

সিদ্ধেশ্বর নিজেই সামান্য পিছিয়ে এলেন। "দিন।"

বরদা টর্চটা দিল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনি যেখানে আছেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন। ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করবেন না। দৌড়বেন না।"

"আপনি?"

"আমি সুজনের কাছে যাচ্ছি।"

"সুজনের কাছে?" বরদা চমকে উঠল।

"মহাদেব এখনও মরেনি। মরবে। সুজন আবার তাকে ধরবে। ওই দেখুন—।"

সুজন আবার মহাদেবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ধরবে আবার। এবার হয়তো পুরো ঘাড়টাই ভেঙে দেবে। হাত দুটো সাঁড়াশির মতন সামনের দিকে বাড়ানো।

সিদ্ধেশ্বর কিন্তু দাঁড়ালেন না। এগিয়ে চললেন।

বরদা দেখল, সিদ্ধেশ্বরের এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে তাঁর সেই সরু ছোরা। ছোরাটা যে তাঁর সঙ্গে ছিল, বরদা জানত না।

সিদ্ধেশ্বর যে কেন যাচ্ছেন, কী তাঁর মতলব—বরদা বুঝতে পারছিল না। মহাদেব মরছে মরুক, সিদ্ধেশ্বর কেন যাচ্ছেন ওই দৈত্যটার কাছে!

এগিয়ে যেতে যেতে সিদ্ধেশ্বর চিৎকার করে বললেন, "সুজন—সুজন; আমি এখানে।"

সুজন মহাদেবের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল, ঝুঁকে পড়ে তাকে তুলে নিয়েছিল মাটি থেকে। হঠাৎ ডাক শুনে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাকাল। কিন্তু ততক্ষণে মহাদেবের আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

যদিও জ্যোৎস্না তবু সুজন যেন সিদ্ধেশ্বরকে দেখতে পাচ্ছিল না। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না বলেই শুধু নয়, সিদ্ধেশ্বরের গায়ে কালো পোশাক। তাঁকে ছায়ার মতন মনে হচ্ছিল। তিনি রাস্তার ধার ঘেঁষে এগোচ্ছিলেন, গাছের ছায়ায় গা ঢেকে যেন। কিন্তু জায়গাটা মাঠের মতন, গাছ তেমন একটা নেই।

সুজন চারদিক তাকাচ্ছিল। শব্দ অনুমান করেই। সিদ্ধেশ্বরকে দেখতে পাচ্ছিল না।

এগিয়ে গেলেন সিদ্ধেশ্বর। অনেকটা কাছাকাছি। তারপর টর্চ জ্বাললেন।

সুজন ঘুরে দাঁড়াল।

আলোটা আবার নিবিয়ে দিলেন সিদ্ধেশ্বর। দিয়ে এক ছুটে রাস্তার অন্য পাশে চলে গেলেন। "সুজন, আমি এখানে।"

সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল সুজন।

সিদ্ধেশ্বর যেন সুজনের সঙ্গে খেলা করতে লাগলেন। একবার কাছে যান, আবার দু-চার পা পিছিয়ে আসেন; কখনও রাস্তার ডান পাশে, কখনও বাঁ-পাশে। আবার কখনও মাঝ-মধ্যিখানে। ঝপ করে টর্চটা জ্বালান, নিবিয়ে দেন। মাঝে-মাঝে মুখে আলো ফেলেন সুজনের। আলো চোখে পড়তেই সুজন দু-হাতে চোখ আড়াল করে নেয়। চিৎকার করে জন্তুর মতন।

বরদা কিছুই বুঝতে পারছিল না, কিন্তু খেলাটা দেখছিল। অপলকে। সিদ্ধেশ্বর সুজনকে যেন ডাকছেন কাছে আসার জন্যে, তাঁকে ধরার জন্যে।

সুজন যেন কানামাছির খেলায় চোখ-বাঁধা চোরের মতন একবার এদিকে এগোচ্ছিল, আর একবার অন্য দিকে। সিদ্ধেশ্বরকে সে আন্দাজ করতে পারছিল না। ক্রমশই খেপে যাচ্ছিল। দু হাত বাড়িয়ে এদিক-ওদিক এগোচ্ছিল; চেঁচাচ্ছিল—যেন

একবার সিদ্ধেশ্বরকে ধরতে পারলেই সে এই খেলার পরিণামটা বুঝিয়ে দেবে সিদ্ধেশ্বরকে।

সিদ্ধেশ্বরও সুজনকে ক্রমশ নিজের পছন্দ মতন জায়গায় টেনে নিচ্ছিলেন, ধোঁকা দিয়ে দিয়ে। মহাদেবের কাছ থেকে খানিকটা টেনেও নিলেন। দুজনেই এখন ফাঁকায়। বেশ কাছাকাছি।

হঠাৎ সিদ্ধেশ্বর আলো জ্বেলে আবার সুজনের চোখে ফেললেন। হাত তুলে চোখ আড়াল করল সুজন। রাগে চেঁচিয়ে উঠল। গালাগাল দিল সিদ্ধেশ্বরকে। সিদ্ধেশ্বর আলো নেবালেন।

আলোটা নিবিয়ে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে সুজন লাফ মারল।

সিদ্ধেশ্বর সরে যাবার জন্যে নিজেও লাফ মেরেছিলেন কিন্তু পারলেন না, পড়ে গেলেন। বোধ হয় হাতে টর্চ ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। ছোরাটাও।

বরদার তাই মনে হল।

কিন্তু সিদ্ধেশ্বর কোনওরকমে সরে গিয়েছিলেন, সরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গড়িয়ে গেলেন।

সুজন এবার আর ভুল করল না।

সিদ্ধেশ্বরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সুজন, পশু যেমন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বরদার গলা দিয়ে আঁতকে ওঠার শব্দ হল। চোখ বুজে ফেলল সে। সিদ্ধেশ্বর যেচে সুজনের হাতে ধরা দিলেন। সুজন ওঁকে মেরে ফেলবে।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কী যেন ঘটে গেল। কে যে যন্ত্রণায় ভীষণ চিৎকার করে উঠল তাও বুঝল না বরদা। তার সর্বাঙ্গ অসাড়। হাত-পা ঠাণ্ডা হিম। কপালে তবু ঘাম জমছে। কোনও রকমে চোখ খুলল বরদা। দেখল, সিদ্ধেশ্বর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন, পারছেন না। কোনও রকমে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। একপাশে হেলে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন। আর সুজন টলতে টলতে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পারল না, পড়ে গেল মাটিতে।

কী ঘটল বরদা বুঝল না। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর বেঁচে আছেন দেখে তার যেন নিশ্বাস পড়ল এতক্ষণে।

ডাক দিলেন সিদ্ধেশ্বর। সতীশকে, বরদাকে।

সতীশ তার মোটরবাইকের হেড লাইট জ্বালিয়ে চোখের পলকে সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বরদা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল।

মোটরবাইকের আলোয় সবই দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট করে। সুজনের গলার পাশ দিয়ে ছোরাটা চলে গেছে। মাটিতে পড়ে আছে সুজন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার গলা। রক্ত চুঁইয়ে কণ্ঠার কাছে নেমেছে, ঘাড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।

সুজন মাটিতে পড়ে। শ্বাস টানার শেষ চেষ্টা করছে যেন।

মহাদেবকে আর দেখার কিছু ছিল না। মরে পড়ে আছে। অবিকল টাঙাঅলার মতন। তার মুখ ঘাড়ের দিকে ঘোরানো।

বরদা দু হাতে মুখ ঢাকল।

সিদ্ধেশ্বর সতীশকে বললেন, "আমার বাঁ-হাতটা ভেঙে গেছে, সতীশ। কাঁধের কাছ থেকে আর নাড়তে পারছি না।"

সিদ্ধেশ্বরের বাঁ হাতটা সত্যিই কেমন অদ্ভুতভাবে দুলছিল, যেন হ্যাঙারে ঝোলানো জামার হাতা ঝুলছে।

সতীশ তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরল সিদ্ধেশ্বরকে।

সিদ্ধেশ্বরের ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। বললেন, "ও যদি আমার গলাটা ধরত, আমার কী অবস্থা হত, বুঝতে পারছ? কপাল ভাল, আমার গলা ধরতে পারেনি, কাঁধের কাছটায় ধরে ফেলেছিল।" হাঁফাচ্ছিলেন সিদ্ধেশ্বর।

সতীশ বলল, "আপনি যে সুজনের কাছে যাবেন আমি বুঝতে পারিনি।"

"না গেলে কী হত সতীশ, ও বেঁচে থাকত, আরও কত নিরীহ মানুষকে মারত। ও সত্যিই পিশাচ। আমি যে কেন ওকে ভুল করে আমাদের কাছে এনেছিলাম কে জানে! ও আর মহাদেব মিলে আমাদের সমস্ত কিছু নষ্ট করে দিচ্ছিল।"

সতীশ বরদাকে ডাকল। বলল, "আপনি ও-পাশটা ধরুন। সিধুদাকে গোরুর গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাই আগে; তারপর দেখি কী করতে পারি।"

বরদা সতীশের কথা মতন এগিয়ে এসে সিদ্ধেশ্বরকে ধরল। তাকাল একবার মহাদেবের দিকে। মরে পড়ে আছে রাস্তায়। হঠাৎ দেখলে, বরদা বলেই মনে হয়।

সুজনও মরছে। চোখের পাতা বুজে আসছে ওর; অসহ্য যন্ত্রণায় তার চোখ মুখ বীভৎস হয়ে উঠেছে। পিশাচের মৃত্যুর মতনই দেখাচ্ছিল।

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে বললেন, "আপনাকে আমি বাঁচাতে পেরেছি এ আমার ভাগ্য। কিন্তু কালও আপনার কলকাতায় ফেরা হবে না। থানা-পুলিশের একটা ব্যাপার রয়ে গেল। আপনাকে আরও দু-একদিন থাকতে হবে।"

বরদা বলল, "আপনি ভাববেন না। আমি থাকব।"

সিদ্ধেশ্বরকে নিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বরদা আবার ঝিঁঝির ডাক শুনতে পেল। সেই রকম ঝিমঝিমে জ্যোৎস্না, অসাড় গাছপালা। অথচ এমন নিস্তব্ধ, শান্ত, সুন্দর জায়গায় দুটো লোক মরে পড়ে থাকল। এই মাঠে।

বরদার দুঃখই হচ্ছিল।

অ লৌ কি ক কা হি নী

সিসের আংটি
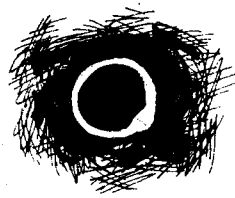
গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে গিয়েছিল শিশির। মাসখানেক আগে হলে সে গড়ের মাঠের ছায়াই মাড়াত না। শিশিরের বরাবরই ধারণা ছিল, যারা দিনে তিনবার করে জোয়ানের আরক খায় আর অনবরত চোঁয়া ঢেঁকুর তোলে, সেই অম্বুলের দল, আর ওই ঘি-দুধ-খাওয়া ভুঁড়িওলা পিপে-পিপিরা গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যায়। যাদের হার্ট বিগড়ে গিয়েছে, তাদের জন্যেই মাঠ-ময়দান; আর কিছু চোর ছ্যাঁচড়ের জন্যে। শিশির এর কোনওটার মধ্যেই পড়ে না; সে লোহা হজম করার শক্তি রাখে, তার চেহারা ছিপছিপে, পাড়ার জুবিলি ক্লাবের সেরা অলরাউন্ডার সে, টানা এক ঘণ্টা বল, কিংবা ঘণ্টা দুই ব্যাট করার পরেও তার হার্ট কাবু হয়ে পড়বে না। আর সে চোরছ্যাঁচোড়ও নয়। কাজেই কেন সে মাঠে হাওয়া খেতে যাবে। কোন দুঃখে? বন্ধু-বান্ধব, জুবিলি ক্লাব, আড্ডা, হুল্লোড় তো তার আছেই। আছে গদাইদার চায়ের দোকানে টেবিল ফাটিয়ে তর্কাতর্কি, খেলার মাঠ। হাতে যদি কিছুই না থাকে, তা হলে মারকুটে কোনও ইংরেজি ছবির দরজা খোলাই রয়েছে কলকাতায়। কোথায় আটকাচ্ছে শিশিরের যে সে গড়ের মাঠে গিয়ে পা-পা করে হাঁটবে!

একমাস আগেও শিশির যা অপছন্দ করত, ঘেন্না করত—এমনই কপাল তার, সেই বাজে ব্যাপারটা এখন তাকেই করতে হচ্ছে। একেই বলে ভাগ্য! দিব্যি ছিল শিশির, তরতর করে দিন কাটছিল, হঠাৎ সব কেমন অন্যরকম হয়ে গেল। তার এম কম পরীক্ষাটা চুকে যাবার পর সে দিন-পনেরোর জন্যে হাজারিবাগ বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে থাকেন শিশিরের বড় পিসিমা। এক সময় কোলে বুকে করে মানুষ করেছেন শিশিরকে। বাচ্চা বয়েসে শিশিরের মা মারা যান, পিসিমা তখন তার সব। মায়ের অভাব বুঝতে দেননি পিসিমা, আঁচলের তলায় নিয়ে বড় করেছেন শিশিরকে। সংসারে দু'জনের কাছে শিশিরের কোনও জারিজুরি নেই, বাবা আর বড় পিসিমা। পরীক্ষার পরই তাই পিসিমার কাছে ছুটেছিল। হুকুম ছিল পিসিমার। বছরে বার—দুই অন্তত পিসি-ভাইপোর দেখাসাক্ষাৎ হওয়া চাই; নয়তো বিপদ।

হাজারিবাগে এখন শুধু পিসি আর পিসেমশাই। চাকরি থেকে ছাড়া পেয়ে পিসেমশাই একটা ছোটখাটো পুরনো বাড়ি কিনে নিয়েছিলেন হাজারিবাগে। সেই ঘরবাড়ি সারিয়ে বুড়োবুড়িতে এখন দিব্যি আছেন। পিসতুতো দাদার চাকরি বম্বেতে। বিয়ের পর বোন রয়েছে পাটনায়। শিশির দিন-পনেরো পিসির ফাঁকা বাড়ি সরগরম করে, খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে, পিসির নানা রকম খুচরো কাজ সেরে দিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে এল।

কলকাতায় ফেরার সপ্তাহ-খানেক পরে হঠাৎ জ্বর। মাঝারি জ্বর। দিন-দুয়েকের

মধ্যে সেটা চড়ে উঠল, একশো চারের তলায় বড় নামে না। ডাক্তার বদ্যি, রক্ত পরীক্ষা, বুকের ছবি, সমস্ত কিছুই হল, বোঝাই গেল না টাইফয়েড না প্লুরিসি না অন্য কিছু। একগাদা ওষুধ খাওয়াই সার হল, তারপর জ্বর-চলে গেল। শিশির দুর্বল হয়ে পড়েছিল ঠিকই। কিন্তু এই অসুখের পর একদিন সে বুঝতে পারল, তার অদ্ভুত এক উপসর্গ দেখা দিয়েছে। প্রথমটায় অত ধরতে পারেনি, পরে বুঝতে পারল। সকালের দিকে স্বাভাবিক দুর্বলতা ছাড়া অন্য কোনও উপসর্গ থাকত না, কিন্তু যেই না বিকেল শেষ হল, সূর্য ডুবল—শিশিরের মাথা ধরে উঠল চড়াক করে। দেখতে-দেখতে মাথা ঘাড় টনটন করতে থাকল, চোখ জ্বালা করতে লাগল ভীষণভাবে, আর ক্রমশই শিশিরের কেমন ঘোর এসে জুটত। থেকে থেকে কেঁপে উঠত। দরদর করে ঘামত। ঘণ্টা তিনেক এইভাবে চলার পর সে কেমন অবাক-অবাক জিনিস ঘটতে দেখতে লাগল। তার শোবার ঘরের আলমারি মাটি থেকে হাত খানেক উঠছে, জলের গ্লাস বাতাসে ভাসছে, জিমি কুকুরটা বাঘের মতন বড় হয়ে গিয়েছে, রেডিয়োর মধ্যে দিয়ে গানের বদলে বিদঘুটে সব আওয়াজ বেরোচ্ছে—এইরকম কত কী।

বাবা আবার ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তার কিছুই বুঝলেন না। বিশ্বাস করতেও চাইলেন না। বড় ডাক্তারের কাছে যাওয়া হল। তিনিও বিশ্বাস করলেন না যে, শিশিরের সত্যিই অত কিছু হয়। তবে, অনেক রকম করে দেখেশুনে ভদ্রলোক বললেন, হরেক রকম ওষুধ খেয়ে শরীরের ধাত খানিকটা গোলমাল করতে পারে। সন্ধের দিকে মাথা ধরা, চোখ জ্বালা করা ওই জন্যে হতে পারে। "ভয়ের কিছু নেই; ওষুধপত্র এখন একদম খাবে না, সময় মতন খাওয়াদাওয়া, রেস্ট, বিকেলে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে হাওয়া খাওয়া, সব ঠিক হয়ে যাবে। রাত্রে শুধু একটা ঘুমের ওষুধ। চোখের ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে নেবেন।"

শিশির বাবার সঙ্গে চোখের ডাক্তারের কাছেও গেল। দিন-দুই দেখে-শুনে তিনি বললেন, "চোখ ঠিক আছে।"

তা হলে? এবার কি মাথার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে?

শিশিরের অসুখের খবরটা প্রথমে পিসিমাকে দেওয়া হয়নি। "দিলেই তো বুড়ি ধড়ফড় করে ছুটে আসবে।" শিশিরও না করে ছিল বাবাকে। তার পিসিমার ডাক-নাম বুড়ি, বাবা বেচারি বোনকে অনর্থক ভাবাতে কিংবা ছোটাছুটি করাতে রাজি ছিলেন না। তা ছাড়া সকালের দিকে শিশির তো ভালই থাকে, বিকেলেই যত উৎপাত।

"কী করব রে, তোর পিসিকে লিখব?"

"থাক না। আর ক'দিন দেখি!"

"বাড়ি ছেড়ে হুড়তে-পুড়তে আসবে, শশধর একলা থাকবে—তাই ভাবছি।"

"দেখি না। ওষুধের ব্যাড এফেক্টও হতে পারে।"

"দ্যাখ তবে আর দু-চার দিন।"

আরও কয়েকটা দিন কাটল। শিশির ভাল কিছু বুঝল না। সেই আগের মতন মাথার যন্ত্রণা, বিকেল ডুবলেই। সেই রকম ঘাড় টনটন, মেরুদণ্ড বেঁকে আসে ব্যথায়। বাড়িতে সন্ধের পর নানা রকম অদ্ভুত দৃশ্য—তাও দেখছে শিশির। একদিন দেখল,

আলমারির ডান দিকে যে কাচ আছে সেই বিশাল কাচটা ঝনঝন করে ভেঙে পড়ছে। শিশির ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। কাচ অবশ্য ভাঙেনি।

কেন তা হলে এই সব দেখছে শিশির? সে কি পাগল হয়ে যাবে?

সেদিন শিশির মাথা এবং ঘাড়ের যন্ত্রণা নিয়ে গড়ের মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বাড়ির গাড়ি খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে। গাড়ির পাশে তুলসীদা। তুলসীদা আজ বারো বছর ধরে শিশিরদের বাড়িতে। শুধু গাড়িই চালায় না, বাড়ির অন্য পাঁচটা ব্যাপারেরও খবরদারি করে। বাবার খুব বিশ্বস্ত। তুলসীদার খাতিরই অন্যরকম। তুলসীদার দায়িত্বে বাবা শিশিরকে হাওয়া খেতে পাঠান।

শিশিরের আর হাঁটতে ইচ্ছে করল না। সে বসল। মাটিতে।

কাছাকাছি অনেকেই বেড়াচ্ছে, বসে আছে কেউ-কেউ, কেউ বা শুয়ে রয়েছে আকাশের দিকে মুখ তুলে। গাছগুলোর মাথা কালো হয়ে গিয়েছে। অন্ধকার বেশ। বাস, ট্যাক্সি, মিনিবাস যাচ্ছে দূর দিয়ে। শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। রাস্তার আলো বড় একটা এখানে এসে পৌঁছচ্ছে না।

বসে থাকতে-থাকতে শিশিরের কেমন বমি-বমি লাগল। দু একবার ওয়াক তুলল। থুতু ফেলল শিশির। ঠিক এই সময় কে একজন সামনে এসে দাঁড়াল।

মুখ তুলল শিশির।

লোকটা শিশিরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক দণ্ড। তারপর বলল, "শরীর খারাপ লাগছে?"

মাথা নাড়ল শিশির। লোকটাকে দেখল। লম্বা রোগা-রোগা চেহারা। দাড়ি কামানো নেই। পরনে ধুতি। গায়ে শার্ট। মাথার চুল উশকো-খুশকো। বয়েস কম নয়।

লোকটা চলে গেল না। বরং কী ভেবে সামনে বসল।

শিশিরের সন্দেহ হল, চোর-ছ্যাঁচড় নয় তো!

মাটিতে বসে লোকটা একই ভাবে শিশিরকে দেখছিল। অপলক চোখে।

অস্বস্তি বোধ করল শিশির। লোকটা আকাশের দিকে মুখ করল। একেবারেই চুপচাপ।

"কী আছে, কাছে?" লোকটা হঠাৎ বলল, আকাশের দিকে তাকিয়েই।

শিশির বুঝতে পারল, লোকটা চোর গুণ্ডা ক্লাসের। এ-সব লোককে কিছুদিন আগে হলে পরোয়া করত না সে। মুখে দুটো বেমক্কা ঘুঁষি ঝেড়ে দিত। কিন্তু সে-শক্তি আজ তার নেই, কাজেই আজ এখন শিশির হাত তুলল না। তা ছাড়া তার মেরুদণ্ড পর্যন্ত ঘাড়ের ব্যথা ছড়িয়ে গিয়েছে, কপাল ছিঁড়ে যাচ্ছে। চোখ টসটস করছে জলে, ঝাপসা হয়ে আসছে।

শিশির রুক্ষ গলায় বলল, "পকেটে অনেক টাকা আছে। কেন?"

শিশির ইচ্ছে করেই বলল কথাটা। লোকটা আরও একটু এগোক, হাত বাড়াক— তখন শিশির শুধু একবার চেঁচিয়ে তুলসীদাকে ডাকবে। তারপর যা করার তুলসীদাই করবে, শিশির শুধু দেখবে।

লোকটা এবার মুখ নামাল। তাকাল শিশিরের দিকে। "টাকা নয়, অন্য কী আছে?"

"ঘড়ি।"

"আর কিছু নেই?"

"না।"

লোকটা আবার আকাশের দিকে তাকাল। যেন তারা দেখছে। কেমন নির্বিকার। "যা আছে সেটা না রাখাই ভাল। নয়তো আরও ক্ষতি হবে।"

শিশির লোকটার কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। কীরকম সাদামাটা কথা, সরাসরি গলা তুলেও কথা বলছে না। শান্ত, ঠাণ্ডা স্বর। বেশ সাহসী লোকটা, বড় ধরনের ছিনতাই পার্টি। সঙ্গে কি ছোরাছুরি রয়েছে? থাকতেই পারে।

"আমার সঙ্গে লোক আছে! ডাকব?" শিশির বলল।

"লোক ডাকবেন! কেন?" ন্যাকার মতন বলল লোকটা।

"কেন! চালাকি। মাঠে ছিনতাই করতে আসা হয়েছে?"

"ছিনতাই! সে কী?"

"চালাকি রাখো। আমি লোক ডাকছি। পুলিশও আছে কাছাকাছি।"

লোকটা একটু চুপ করে থেকে শেষে হেসে ফেলল। শব্দ করে নয়, আপন মনে। বলল, "আপনি আমায় চোর-বদমাশ ভেবেছেন। তা ভাবতে পারেন। এখন যা হাল আমার। বেশ, আমি উঠছি।" বলে উঠতে গিয়ে লোকটা না-উঠে বসেই পড়ল। বলল, "আপনি বরং আগে লোক ডাকুন। নয়ত সত্যিই ভাববেন, আমি চোর গুণ্ডা।"

শিশির অবাক। লোকটা তাকে বোকা বানাচ্ছে নাকি! বিরক্ত হয়ে শিশির বলল, "থাক, যথেষ্ট বাহাদুরি হয়েছে। যাও তুমি।"

এবার উঠে দাঁড়াল লোকটা। বলল, "আমি যা বললাম ভেবে দেখবেন।"

ব্যাপারটা শিশির কিছুই বুঝল না। লোকটাও চলে গেল। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে।

পাগল বোধ হয়। সেয়ানা পাগলও হতে পারে। যদি চোর-ছ্যাঁচড় হয়ে তবে খুব পাকা। কী আছে শিশিরের কাছে? কিছু না। পকেটে গোটা পনেরো টাকা আর হাতঘড়ি ছাড়া তার কিছু নেই।

॥ দুই ॥

লোকটার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরল শিশির।

শিশিররা থাকে ডাফ স্ট্রিটে। ঠাকুরদার আমলের বাড়ি। খুব বড়ও নয়, আবার ছোটও নয়। মাঝারি। শিশিরের ছেলেবেলায় তার বাবা বাড়িটার অনেক কিছু অদল-বদল করেছিলেন। এখন নীচে গ্যারাজ, ভজন দারোয়ানের থাকার জায়গা, বাবার মক্কেলদের বসার ঘর। পেছনের দিকে কাজের লোকরা থাকে। তুলসীদা থাকে অন্য পাশে।

বাড়ি ফিরে শিশির সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছে, বাবার সঙ্গে দেখা। অমৃতবাবু নীচে নামছিলেন। মক্কেলরা এসে বসে আছে। পেশায় তিনি অ্যাডভোকেট। আর

একমাত্র নেশা হল গানবাজনা শোনা। একসময় নিজে সেতারি হবার চেষ্টা করেছিলেন, হতে পারেননি, তবে ঝোঁকটা থেকে গিয়েছে, কাজকর্মের ফাঁকে ভাল গানবাজনা থাকলে এখনও শুনতে যান।

মানুষটা শৌখিন। পোশাকে-আশাকে পরিচ্ছন্ন। বাড়ির মধ্যে এলোমেলো কিছুই পছন্দ করেন না।

অমৃতবাবু নামছিলেন। পরনে দিশি ধুতি, গায়ে ফতুয়া-পাঞ্জাবি, ডান হাতে চাবির গোছা, চশমা।

"কী রে, এই ফিরলি? কেমন আছিস আজ?"

"সেই রকম," শিশির বলল।

"তোর চোখমুখ শুকনো দেখাচ্ছে! বেশি হেঁটেছিস?"

"না।"

"যা, জামাকাপড় ছেড়ে গা ধুয়ে ফেল। রাত্তিরে তোকে একটা কথা বলব।"

শিশিরেরও মনে হল, মাঠের লোকটার কথা বাবাকে বলে। বলল না, পরে বললেই চলবে।

নিজের ঘরে এসে শিশির কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল। তার মাথা ঘাড়ের যন্ত্রণা একই রকম। চোখও জ্বালা করছিল। গা-হাত ধোয়ার পর একটু আরাম লাগবে, তারপর আবার যে কে সেই।

খানিকক্ষণ জিরিয়ে শিশির বাথরুমে চলে গেল।

ভাদ্র মাস। দারুণ গুমোট চলছে। সাবান মেখে স্নান করার সময় হঠাৎ ডান হাত থেকে আংটিটা খুলে মেঝেতে পড়ে গেল। শিশির নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল আংটিটা। সোনার আংটি নয়, রুপোরও নয়। একেবারে সিসের আংটি। সিসে কি? হয়তো সিসেও নয়। কীসের যে, শিশির ঠিক জানে না। হাজারিবাগে পিসির বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দশটা ফালতু জিনিসের মধ্যে পেয়েছিল। আসলে আংটিটা ছিল পিসিমার হাতবাক্সে। একদিন পিসিমা তাঁর হাতবাক্স খুলে কী একটা খুঁজছিলেন। সেকেলে হাতবাক্স। শোনা যায় ঠাকুমার বিয়ের হাতবাক্স। বিলেতি পুতুল, হাতির দাঁতের ব্রোচ, রুপোর কাঁটা, হেয়ার পিন—এইসব সেকেলে কত জিনিস একসময় পড়ে থাকত বাক্সটায়। সবই ঠাকুমার। পিসির ওই বাক্সর ওপর বরাবরের লোভ। বড়পিসির বিয়ের সময় মায়ের স্মৃতি হিসেবে বাক্সটা পিসিমা নিয়ে নেন। তারপর যা হয়, ঠাকুমার সেই পুতুল, ব্রোচ, হেয়ার পিন আর নেই, কিন্তু দু-একটা পুতুল, টিনের কৌটোতে কোন ঠাকুরের মন্দিরের এক চিলতে মাটি, পিসিমার ছেলেবেলার ক্রুশ কাঁটা, টুকরো-টাকরা সোনার কুচি, পিসিমার নিজের খুচরো খরচের জন্যে কটা টাকা পড়ে আছে। আংটিটা ওই বাক্সে ছিল। ন্যাপথালিনের গুলি, মেশিনের ছুঁচ, তামার ডবল পয়সার পাশেই পড়ে ছিল আংটিটা।

শিশিরের চোখে পড়ে গেল আংটিটা। তুলে নিল। ভারী আংটি, সিকি ইঞ্চির মতন চওড়া মাথায় বিদঘুটে একটা আঁকাজোকা। সেটা হরফের মতন দেখায়। কখনও মনে হয় আরবি-ফারসি, কখনও মনে হয় নেপালি, কখনও আবার অন্য রকম কিছু। শিশির

আংটিটা নিয়ে নিল। সোনার আংটি সে পরে না। এই আংটিটা হাতে থাকলে বেশ অসাধারণ কিছু দেখাবে। তা ছাড়া ওই বস্তু দিয়ে কাউকে একটা ঘুঁষি মারলে দারুণ জমবে।

"এটা আমি নিলাম।"

"ওই আংটি কেউ পরে! তোকে একটা পোখরাজের আংটি দেব।"

"পোখরাজ দরকার নেই। এটাই নেব। কোথায় পেয়েছিলে এটা?"

"সারনাথে। তোর পিসেমশাই, আমি আর ঝুনু একবার কাশীতে গিয়ে দিন দশেক ছিলাম। একদিন সারনাথে বেড়াতে যাই। বেড়াতে-বেড়াতে মাঠে কুড়িয়ে পেয়েছিল ঝুনু। তা ওই আংটি আর কে পরবে। ফেলেই দিতাম, নেহাত অমন দেখতে বলে রেখে দিয়েছি।"

"কী লেখা আছে?"

"কে জানে! মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিনি। দরকার নেই আমার বুঝে।"

"আংটিটা নিলাম।"

"নে।"

শিশির আংটিটা নিয়ে খানিক মাজাঘষা করল। যেমন-কে প্রায় তেমনই থাকল। আংটিটা পরে নিল বাঁ হাতে। মাঝ আঙুলে। সামান্য ঢিলে হয়ে থাকল।

স্নান করে গা হাত মোছার সময় শিশিরের হঠাৎ মনে হল, মাঠের লোকটা তাকে বারবার বলছিল, "কী আছে কাছে? খুলে রাখুন।" কেন বলছিল? শিশিরেরও মনে হয়নি, এই সিসে বা লোহার আংটিটার কোনও মূল্য থাকতে পারে! কেউ এটা ছুঁয়েও দেখবে না। রাস্তায় ফেলে দিলে তাকাবে না কেউ। এতই অকিঞ্চিৎকর এটা যে, শিশিরের একবারের জন্যেও আংটিটার কথা মনে পড়েনি। আচ্ছা, লোকটা কি আংটিটা দেখেছিল? দেখতে পারে। জায়গাটা অবশ্য অন্ধকার-মতনই ছিল। তবু অমন বেঢপ আংটি চোখে পড়তে পারে লোকটার। কিন্তু লোকটা তো একবারও আংটির কথা বলল না।

অবশ্য এত কথা ভাববার কী আছে? আংটিটা খুলে রাখলে কি শিশির আগের মতন স্বাভাবিক হয়ে যাবে?

শিশির স্নান শেষ করে ঘরে এল। তার কৌতূহল হচ্ছিল। বিশ্বাস হচ্ছিল না। ঠিক আছে; দেখাই যাক না।

হাত থেকে আংটিটা খুলে শিশির টেবিলের ওপর রেখে দিল। দিয়ে মুখ মুছল, চুল আঁচড়াল। তারপর ঘরের বাইরে এসে মধুকে ডাকল।

মধু কাজ করছিল, সাড়া দিল। এল সামান্য পরে।

"চা দেবে না?" শিশির বলল।

"চা খাবে? তোমার এখন দুধ খাবার কথা।"

"দুধ পরে খাব। চা দাও।"

"চায়ের সঙ্গে আর কী খাবে?"

"দাও যা হয়—; ঝালটাল কিছু খাওয়াও না।"

"তুমি ঘরে যাও, চা আনছি।"

শিশির আবার ঘরে ফিরে এল। ফিরে এসে আবার একবার আংটিটা দেখল। তারপর জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পাশেই ভবানীবাবুদের বাড়ি। জানলায় দাঁড়ালে পাশের বাড়ির দেয়াল ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। বরং উলটো দিকের জানলায় দাঁড়ালে নীচের গলি চোখে পড়ে।

এই বাড়িটার সবই আছে; কিন্তু বড় চাপা। আকাশ দেখতে হলে ছাদে উঠতে হয়। ছাদে শিশির টব সাজিয়ে বাগান করেছিল, শখ মিটে যাবার পর টবগুলো পড়ে আছে। আবার বাগান করলে হয়।

বাড়িটা মাঝে-মাঝে বড় ফাঁকা লাগে। বাবা আর শিশির। শিশিরের এক দিদি আছে। সেই দিদি আর জামাইবাবু এখন বিলেতে। জামাইবাবু কার্ডিফে। আসছে বছর ফিরবে। দিদির শ্বশুরবাড়ি এন্টালিতে। দিদি কলকাতায় থাকলে মাঝে-মাঝে এ বাড়ি চলে আসে। তখন বেশ জমে যায়।

সকালের দিকটা শিশিরের মন্দ কাটে না। শরীর ভাল থাকে। বন্ধুবান্ধবরাও আসে। আজও জগন্নাথ আর বিশ্ব এসেছিল। জগন্নাথ মালদা যাবে বলছিল। আসছে হপ্তায়।

শিশির বিছানায় এসে বসল। মাথার যন্ত্রণা এখন কিছুক্ষণ কম থাকবে। তারপর আবার বাড়বে। দেখতে-দেখতে সেই ঘোর আসবে। কাঁপুনি আসবে। কাঁপুনি থামতে না থামতেই ঘাম। আর তার পরই অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য সেই সব দৃশ্য শিশিরকে দেখতে হবে। হয় আলমারি উঠে যাচ্ছে উঁচুতে, না হয় জিমি বিরাট হয়ে যাচ্ছে, অথবা বাতাসে কিছু ভেসে বেড়াচ্ছে, জানলার পাল্লা নরম হয়ে গলে যাবার মতন বেঁকে যাচ্ছে, বিদঘুটে সব দৃশ্য।

কেন এইসব দেখে শিশির? মানুষ নেশাভাঙ করলে অবাক-অবাক জিনিস নাকি চোখে দেখে। শিশির পান সিগারেট পর্যন্ত খায় না। তার মাথার গোলমালও নেই। কিন্তু এ-রকম চলতে থাকলে সত্যিই পাগল হয়ে যাবে শিশির।

আংটিটার দিকে আবার তাকাল শিশির। দেখা যাক, আজ কী হয়।

॥ তিন ॥

চা খাওয়া শেষ করে শিশির অন্যমনস্কভাবে ঘড়ির দিকে তাকাল। সোয়া আট। ঘড়িটা পুরনো। পুরনো বলেই বোধ হয় এখনও ভাল সময় দেয়। দু-চার মিনিট এদিক-ওদিক কিছুই নয়। আজকাল দেয়াল-ঘড়ির যা অবস্থা!

মাথা ধরা কিংবা ঘাড়ের যন্ত্রণা এখনও আগের মতন। বাড়ছে না, কমছেও না। তবে আগের হিসেব ধরলে এতক্ষণে বেড়ে ওঠার সময় হয়েছে। দেখা যাক কী হয়! শিশির আবার আংটিটার দিকে তাকাল।

"শিশির?" বাইরে কে ডাকল।

"কে?"

দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল বাবুদা।

"আরে বাবুদা? তুমি? কবে?" শিশির উঠে পড়ল। "এসো, এসো।"

বাবুর ভাল নাম বিমান। ভাল নামটা কারুর খেয়াল থাকে না, সেটা স্কুল-কলেজের নামের খাতায় পড়ে থাকত এক সময়, সার্টিফিকেটেও বিমান নামটা রয়েছে, অফিসের খাতাতেও লেখা আছে—কিন্তু বাবু নামটাই সর্বত্র চলে। বাবু শিশিরের চেয়ে বছর তিনেকের বড়, এ-পাড়ারই ছেলে, তবে এখন থাকে দুর্গাপুরে; চাকরি করে।

"কী রে, তোর হয়েছে কী!" বাবু ঘরে ঢুকে বলল। "আজ দুপুরে এসেছি। মা বলল, তোর নাকি খুব অসুখ করেছিল। ভেবেছিলাম বিকেলেই আসব। তা একবার বরানগর যেতে হল ছোড়দির বাড়ি। সেখান থেকেই ফিরছি।"

"বোসো।"

"বসছি। তোর হয়েছিল কী! শরীরটা তো খারাপই দেখাচ্ছে।"

শিশির হাসবার চেষ্টা করল। ম্লান হাসি। বলল, "আমার অসুখের কথা পরে শুনবে। একটু চা খাও। মধুকে ডাকি।"

"তোকে ডাকতে হবে না। মধু আমায় দেখেছে। নীচে কাকাবাবুর সঙ্গেও দেখা করে এসেছি।"

"কী বলল, বাবা?"

"কথা তেমন কিছু হল না। মক্কেলরা বসে আছে। বললেন, তুমি ওপরে যাও—ফেরার সময় একবার দেখা করে যেয়ো।"

বাবু বসল চেয়ারে। ছিমছাম, শক্তসমর্থ চেহারা বাবুর। মাথার চুল কোঁকড়ানো। চোখে চশমা।

শিশির বিছানায় গিয়ে বসল।

"কী অসুখ করেছিল তোর?" বাবু জিজ্ঞেস করল আবার।

শিশির তার অসুখের কথা বলল। হাজারিবাগ থেকে ফিরে আসার পর তার হঠাৎ কেমন জ্বর এল—সেই গোড়ার কথা থেকে একেবারে হালে কেমন করে দিন কাটছে তাও বলল। বলতে বলতে শিশিরের মুখে কষ্ট ও হতাশার ছাপ ফুটছিল, গলা ভারী শোনাচ্ছিল।

সব শোনা হয়ে গেলে বাবু অবাক হয়ে বলল, "বলিস কী, তুই সন্ধের পর অন্যরকম হয়ে যাস?"

মাথা হেলাল শিশির।

মধু চা নিয়ে এল বাবুর।

চায়ে চুমুক দিল বাবু। মধু চলে গেল। শিশিরের কথা বিশ্বাস হচ্ছিল না বাবুর। বারবার শিশিরের চোখমুখ দেখছিল।

শেষে বাবু বলল, "তুই কি সত্যি এই ভারী কাঠের আলমারি মাটি থেকে উঠতে দেখিস?"

"হ্যাঁ। দেখি।"

"কাচের গ্লাস, কাপ, এটা ওটা বাতাসে ভাসতেও দেখিস?"

"বললাম তো সবই দেখি। জিমি তো ওইটকু একহাতের কুকুর, সে একটা বাঘের মতন বড় হয়ে যায়।"

"জিমি কই?"

"আমি ভয় পাই বলে বাবা তাকে নীচে বেঁধে রাখতে বলেছে!"

বাবু চা খেতে খেতে কী যেন ভাবতে লাগল। তারপর বলল, "একে তো ইংরেজিতে হ্যালুসিনেশান বলে। বাংলায় কী বলা যায়? উদ্ভট দৃশ্য দ্যাখা? নাকি ভুতুড়ে কাণ্ড দেখা? চুলোয় যাক তোর ভূত। ...তুই এসব দেখিস কেন?"

"ভূতে পেয়েছে বলেই বোধ হয়।" শিশির ম্লান হাসল।

"না না, ভূতে পাবার ব্যাপার নয়। ...আচ্ছা, তুই আমার হাতের এই চায়ের কাপটা ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছিস?"

"পাচ্ছি।"

"এটা তো বাতাসে ভাসছে না। তা হলে? আচ্ছা তুই ওই আলমারিটা দ্যাখ, ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"তা হলে! তুই তো সবই ঠিকঠাক দেখছিস!"

শিশির বলল, "এখনও হয়তো ভূত ভর করেনি। করলে তখন কী হবে বলা মুশকিল। তা ছাড়া আজ একটা ব্যাপার হয়েছে।"

বাবুর চা খাওয়া শেষ হয়েছিল। কাপ রেখে দিল।

শিশির আজকের মাঠের ঘটনা থেকে শুরু করে আংটি খুলে রাখার কথা বলল, বলে আঙুল দিয়ে টেবিলের ওপর রাখা আংটিটা দেখাল।

বাবু অবাক হচ্ছিল যত, ততই কৌতূহল বোধ করছিল। বসে থাকতে পারল না। উঠে গিয়ে আংটিটা তুলে নিয়ে দেখতে লাগল।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানাভাবে দেখে বাবু বলল, "লেখাটা আরবি-ফারসি বলে মনে হচ্ছে না। তিব্বতি বোধহয়।"

"তুমি তিব্বতি লেখা দেখেছ?"

"না, দেখিনি। মানে এখন ঠিক মনে পড়ছে না, তবে কোথাও হয়তো দেখেছি।...তা এই আংটিটা কাউকে দেখালেই হয়, বলে দেবে।" বলে বাবু আংটি রেখে আবার ফিরে এল। ভাবছিল কিছু। বলল, "আমাদের দাশুর কে যেন মিউজিয়ামে চাকরি করে—দাশুকে বল না লোক খুঁজে বার করতে।"

শিশির বলল, "ও-সব পরের কথা; আগে দেখি সত্যিই আংটিটার জন্যে কিছু হচ্ছে কি না!"

বাবু শিশিরের পাশে এসেই বসল। বলল, "তা দ্যাখ। তবে এক একটা জিনিসের জন্যে এইরকম হয় শুনেছি।"

"গল্পে হয়।"

"না না, এমনিতেও হয়। কেন হয় বলা মুশকিল। তুই আমাদের কে এস-কে

জিজ্ঞেস করবি।"

কে এস মানে কৃষ্ণদয়াল সর্বাধিকারী। কাছাকাছি পাড়ায় থাকেন। এক সময় জুবিলি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। খেয়ালি লোক। বনেদি বাড়ির বংশধর। বাড়িতে খাওয়া-পরার অভাব নেই। কাজের কাজ কিছুই করেন না, আইনের বই বিক্রির একটা ব্যবসা রয়েছে দু পুরুষের, সেখানে একবার করে হাজিরা দেন। আর পৃথিবীর কোথায় কী আজগুবি কাণ্ড ঘটছে তার খোঁজ রাখেন। আত্মা-টাত্মার চর্চাও আছে। মানুষটি অবশ্য ভাল। জুবিলি ক্লাবের ছেলেদের ভালওবাসেন।

বাবু বিছানা থেকে ওঠার ভাব করে বলল, "আমি আজ চলি রে! কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাই। কাল আবার আসব। ক'টা বাজল?"

শিশির দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল। সওয়া আট।

সওয়া আট! হঠাৎ শিশিরের খেয়াল হল, সওয়া আট তো সে অনেক আগে দেখেছে। বাবুদা আসবার আগে। ঘড়িটা কি বন্ধ হয়ে গেল?

"বাবুদা?"

"বল।"

"ঘড়িটা দ্যাখো তো! কটা বেজেছে?"

"সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছে। নটা পঁয়ত্রিশ।"

"আমি সওয়া আটটা দেখছি।"

"সওয়া আট! কই, ন'টা পঁয়ত্রিশ...।"

শিশিরের সামান্য কাঁপুনি লাগছিল। জ্বর আসার মতন শীত-শীত করছে। আজও তা হলে সেই রকম হতে শুরু করল। শিশির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল।

"তুই চোখে ভুল দেখছিস," বাবু বলল।

কথা বলল না শিশির। সমস্ত পিঠে ব্যথা ছড়িয়ে যাচ্ছে, কাঁপুনি থামাবার জন্যে হাত মুঠো করল, শক্ত করল, শরীর যতটা সম্ভব কাঠকাঠ করার চেষ্টা করল। দাঁতে দাঁত চেপে কেমন অস্বাভাবিক চোখে সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল।

বাবু প্রথমটায় বুঝতে পারেনি, পরে বুঝল। বুঝে ভয় পেয়ে গেল।

"শিশির! এই শিশির।"

শিশির তখন প্রাণপণে কাঁপুনি সামলাবার চেষ্টা করছে। তার ঘাড় পিঠ নুয়ে পড়ছিল ক্রমশ। হাত দুটো জোর করে পেটের কাছে চেপে রেখেছে শিশির, পায়ের হাঁটু মুড়ে রেখেছে।

বাবু যে কী করবে বুঝতে পারছিল না। চোখ-মুখে জল ছিটিয়ে দেবে? বিছানা থেকে চাদর তুলে গায়ে জড়িয়ে দেবে? ঠকঠক করে কাঁপছে যে শিশির। ডাকবে কাউকে?

বিমূঢ়, বোবা, আতঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বাবু।

সামান্য পরে শিশিরের শরীর পিঠ থেকে কোমর পর্যন্ত ধনুকের মতন বেঁকে গেল। বমি করার শব্দ করল, অথচ বমি করল না।

বাবু দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে মধুকে ডাকতে লাগল, "মধু, মধু।"

মধু ঘরে আসার আগে শিশির ঘামতে শুরু করেছে। দরদর করে ঘামছিল, কপালে ঘাম, মুখময় ঘাম। গলা দিয়ে জল গড়াচ্ছে। চোখ দুটি আধবোজা। ক্লান্ত যেন।

ইশারায় জল খেতে চাইল শিশির।

জল এনে দিল মধু।

জল খেয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজেই থাকল শিশির। তারপর চোখের পাতা খুলল। দেখল বাবুকে।

"কী রে, ভাল আছিস?" বাবু জিজ্ঞেস করল।

মাথা হেলাল শিশির। হাত বাড়িয়ে তোয়ালে চাইল। ঘাম মুছবে।

মধু তোয়ালে এনে দিল।

মুখের কপালের ঘাম মুছে শিশির ঘড়ির দিকে তাকাল আবার। দশটা বাজতে মিনিট তিনেক। ঘড়ির কাঁটা আবার ঘুরছে। শিশির এবার আংটিটার দিকে তাকাল।

"বাবুদা, আমি ভীষণ ভুল করেছি। মাঠের লোকটাকে চোর-বদমাশ ভেবেছিলাম। লোকটা প্রায় ঠিকই বলেছে," আস্তে-আস্তে শিশির বলল, "আজ আমায় তেমন ভুগতে হল না। কিন্তু কাল কি লোকটাকে আর খুঁজে পাব।" বলতে-বলতে শিশির উঠে দাঁড়াল। অবসন্ন দেখাচ্ছিল তাকে।

॥ চার ॥

পরের দিন শিশির খানিকটা আগেই গড়ের মাঠের দিকে ছুটল। সঙ্গে বাবু। আকাশ কালো হয়ে রয়েছে। যে-কোনও সময় ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামতে পারে। অন্য দিন এ-সময় আলো একেবারে মরে যায় না; আজ মেঘলার জন্যে চারদিক ঝাপসা হয়ে এসেছে।

গাড়িতে যেতে-যেতে বাবু বলল, "ভাদ্র মাসের এই গুমোট আর সহ্য হচ্ছে না, এক পশলা জোর হয়ে গেলে গা জুড়োবে, কী বল?"

শিশির বলল, "তুমি আগে থেকেই টুকছ। বৃষ্টি পরে আসুক। এখন এলে লোকটাকে আর পাব? আমরাও তো মাঠে গিয়ে বসতে পারব না।

বাবু অতশত ভেবে বৃষ্টি আসার কথা বলেনি, এবার বলল, "তা ঠিক।"

এসপ্ল্যানেডের মুখে গাড়ির জটলা। ট্রাম, বাস, প্রাইভেট গাড়ি, ট্যাক্সি সব কেমন জটলার মধ্যে গায়ে গা লাগিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে। নানা ধরনের হর্ন বাজছে। চেল্লাচেল্লি। অফিস ভাঙা ভিড়ের শেষমেশ মানুষগুলো যে যেদিকে পারে ছুটছে।

বোধ হয় ট্রামের তার ছিঁড়ে গিয়েছিল কোথাও। বেশ খানিকটা পরে জটলা নড়াচড়া শুরু করল।

শিশির বিরক্ত হয়ে উঠছিল। একেই বলে বাধা। যেদিন একটু তাড়াতাড়ি কোনও কাজে বেরোতে চাইবে সেদিনই একটা-না একটা ঝামেলা।

জটলা ছাড়িয়ে গাড়ি সামান্য এগোতেই ঠাণ্ডা বাতাসের দমকা এল। বৃষ্টি বোধ হয়

এসে পড়েছে।

"বাবুদা?" শিশির বলল।

"বৃষ্টি আসার কথা বলছিস?" বাইরের দিকে তাকিয়ে বাবু জবাব দিল।

"হ্যাঁ। যাওয়াই সার হবে।"

"চল না। বৃষ্টি আসছে ভাবলেই আসে নাকি?"

শিশিরের কিন্তু মনে হল, বৃষ্টি আসছে।

আরও খানিকটা এগিয়ে হঠাৎ শিশির বলল, "বাবুদা, আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।"

তাকাল বাবু। "কীসের সন্দেহ?"

"ওই লোকটা আমায় নিশ্চয় চেনে!"

বোকার মতো তাকিয়ে বাবু বলল, "চেনে? কেমন করে চিনবে?"

"তা জানি না," মাথা নাড়ল শিশির। "যদি না-ই চিনবে কেমন করে আমার কাছে এসে বসল? কেনই বা বলবে যা আছে খুলে রাখুন, নয়তো আরও ক্ষতি হবে।"

বাবু রহস্যটা বুঝতে পারছিল না। এখন বলে নয়, কাল থেকেই সে কিছু বুঝতে পারছে না। ধাঁধার মতন লাগছে। কোথাকার আংটি কে শখ করে পরেছে তাই নিয়ে এত ঝঞ্ঝাট। ভূতের গল্পে এ সব হয়, তাই বলে সত্যি-সত্যি হবে কেন? আজ সকালে শিশিরদের বাড়ির বৈঠকখানায় বন্ধুদের আড্ডা বসেছিল। সবাই বলল, এ হতেই পারে না, আংটির ব্যাপারটা কিছুই নয়। আংটি পরার সঙ্গে শরীরের কী সম্পর্ক! রক্তমুখী নীলাটিলা পরলে রাতারাতি কেউ রাজা হয়ে যায়, কেউ বা ফকির। তা এ হল শোনা কথা। গল্প। জগন্নাথ বলল, তার পিসেমশাই তো কবে থেকে এক রক্তমুখী নীলা পরে আছে, কই রাজাও হয়নি, ফকিরও নয়।

"কই, কথা বলছ না?" শিশির বলল।

বাবু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, বলল, "আমি ভাবছি, তোকে লোকটা চিনবে কেমন করে? এই কলকাতা শহরে লাখ-লাখ মানুষ। তার মধ্যে কে হাতে কীসের একটা আংটি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার খোঁজ কি রাখা যায়? অসম্ভব।"

"হ্যাঁ। কিন্তু লোকটা যদি আমায় হাজারিবাগে দেখে থাকে।"

বাবু শিশিরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ক' মুহূর্ত। তারপর বলল, "লোকটাকে কি তুই হাজারিবাগে দেখেছিলি?"

মাথা নাড়ল শিশির, "না। মনে পড়ে না। কত লোককেই আমরা দেখি, অত কি খেয়াল রাখা যায়। হয়তো ও আমায় দেখেছে।"

বাবু কী বলবে বুঝতে পারল না। চুপ করে থাকল।

শিশির নিজেই বলল, "আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে, লোকটা আমায় হাজারিবাগে দেখেছে। হয়তো ওখানকার লোক। আমি কলকাতা ফিরে আসার পর ও নিজেও এখানে এসেছে।"

"কেন? ও তোর ঠিকানা পাবে কোথায়?"

"ঠিকানা পাবার অসুবিধে কী! পিসিমা পিসেমশাইয়ের কাছ থেকে জোগাড় করে

নিয়েছে।"

"তা হলে তো তোদের বাড়িতে যেতে পারত।"

"হয়তো গিয়েছিল। কে বলতে পারে...বাড়িতে সুবিধে করতে পারেনি। সাহস করেনি ঢোকার। তারপর নজর রেখেছে আমি মাঠে বেড়াতে আসি। তাই মাঠে এসে হাজির হয়েছে।"

"কেন? তার গরজ কীসের?" বাবু জিজ্ঞেস করল।

শিশির চুপ। সে বুঝতে পারছিল তার সন্দেহ তেমন জোরদার হয়ে উঠছে না। অনুমান কিংবা সন্দেহ তা অনেক রকমই করা যায়—কিন্তু তার পেছনে জোরদার যুক্তি না-থাকলে চলবে কেন? লোকটা হাজারিবাগের লোক হতে পারে, শিশিরকে সেখানে দেখাও সম্ভব। এটাও মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, হাজারিবাগ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে সে কলকাতায় এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু কেন? ওই আংটির জন্যে? কিন্তু লোকটা তো আংটি চায়নি! আর আংটি নেওয়াই যদি তার উদ্দেশ্য হয়—তবে সে কলকাতায় না এসে হাজারিবাগেই সেটা নিতে পারত। পিসিমার হাতবাক্স চুরি করলেই পেয়ে যেত আংটি।

না, শিশির কিছু বুঝতে পারছে না। হতাশ হয়ে নিশ্বাস ফেলল বেচারি।

গাড়ি মাঠে পৌঁছে গেল।

বৃষ্টি এখনও আসেনি। তবে বাদলা বাতাস দিচ্ছিল। আকাশে ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মাঠে লোকজন প্রায় নেই। বৃষ্টিতে ভেজার সাধ কারই বা হবে! যারা বেড়াতে এসেছিল তারা হয় পালিয়ে গিয়েছে, না হয় পালাচ্ছে।

শিশির আর বাবু পায়চারি করছিল ধীরে-ধীরে। গাড়ি কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টির ফোঁটা পড়লেই ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠবে।

আজ মাঠ একেবারেই ফাঁকা দেখাচ্ছে। রোজকার মতন গাড়ি-ঘোড়া সামান্য দূর দিয়ে আসা-যাওয়া করলেও অন্যদিনের মতন গমগমে ভাব নেই এদিকে।

চারদিকে চোখ রেখে শিশির লোকটাকে খুঁজছিল। তাকে আজ পাবার কথা নয়। তবু যদি বরাতজোরে দেখা হয়ে যায় ভাল হয়।

বাবু বলল, "আজ আর হবে না রে, বৃষ্টিও এসে গেল।"

দু-এক ফোঁটা জল নাকে মুখে লাগছিল শিশিরের। বৃষ্টি এসে পড়েছে। চারদিকে তাকিয়ে শিশির বলল, "হ্যাঁ। চলো, গাড়িতে গিয়ে বসি।"

গাড়ির দিকেই ফিরতে লাগল দু'জনে।

হঠাৎ শিশির কেমন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বাবুর হাত ধরল। কাকে যেন দেখছে।

তাকাল বাবু। শিশির কাউকে দেখছে। কাকে? সামান্য তফাতে দুটো লোক। গায়ে-গায়ে নয়, তবে দু পা আগু-পিছু হয়ে হন-হন করে চলে যাচ্ছে। আলো স্পষ্ট থাকলে লোক দুটোকে দেখা যেত। ঝাপসা অন্ধকার, তার ওপর বৃষ্টি নেমেছে, ওদের ভাল করে দেখাই যাচ্ছিল না।

শিশির বলল, "সেই লোকটার মতন।" তার গলা কেঁপে উঠল যেন।

বাবু তাকিয়ে থাকল। "কোনটা?"

"ওই যে ওই। পাজামা-পরা।"

বাবু দেখল, দুজন লোকই এবার এক রকম ছুটতে ছুটতে সামনের দিকে চলে গেল। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে।

বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নেমে গেল।

বাবু শিশিরের হাত ধরে ছুটতে ছুটতে গিয়ে গাড়িতে বসল।

তুলসী গাড়িতে স্টার্ট দিতে যাচ্ছিল, শিশির বারণ করল। "না, তুলসীদা, আর একটু পরে যাব।"

অবাক হয়ে তুলসী বলল, "বৃষ্টির মধ্যে বসে থাকবে?"

"থাকি একটু।"

জলের ঝাপটার জন্যে জানলার কাচ তুলে দিতে হয়েছে। বাইরের কিছু তেমন চোখেও পড়ে না। তবু শিশির কাচের ভেতর দিকটা হাত দিয়ে পরিষ্কার করতে লাগল অন্যমনস্কভাবে।

বাবু বলল, "তুই কি ঠিক দেখেছিস?"

"মনে তো হচ্ছে।"

"তোর ভুলও হতে পারে। দুটো লোকই বা কেন?"

শিশির সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "হতে পারে ভুল। একবার ভাল করে দেখলে বুঝতে পারতাম। বৃষ্টিটা এসে সব গণ্ডগোল করে দিল।" বাইরে বেশ জোরে বৃষ্টি নামায় আর কিছু চোখে পড়ছিল না।

বাবু বলল, "দ্বিতীয় লোকটা কে?"

"জানি না। হয়তো ওর সঙ্গীও নয়। লোক পাশাপাশি হাঁটলেই যে চেনাশোনা হবে এমন কী কথা আছে।"

বাবু চুপ করে থাকল।

দেখতে দেখতে বৃষ্টি আরও জোর হল। গাড়ির মধ্যে জানলার সমস্ত কাচ বন্ধ। ক্রমশই গুমোট হয়ে উঠছিল ভেতরটা। বাবুর ঘাম হচ্ছিল। রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে বলল, "ভেপসে যাচ্ছিরে।"

গুমোট শিশিরেরও লাগছিল। জানলার কাচ নামাবার চেষ্টা করে আবার তুলে দিল। জল আসছে। রুমাল নেড়ে হাওয়া খাবার চেষ্টা করল।

তুলসী চুপ করে বসে। সেও ঘামছিল।

বেশ কিছুক্ষণ জোর বৃষ্টি হবার পর জলের তোড় কমল। থামল না। বাবু প্রায় স্নান করে উঠেছিল। তার দিকের জানলার কাচ নামিয়ে দিল। ঠাণ্ডা, ভিজে বাতাস এল হু-হু করে।

বাবু বলল, "একটা কাজ করলে হয়।"

"কী?"

"গাড়িটাকে ওই গাছতলার নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলে হয়।"

"তাতে কী হবে?"

"লোকটাকে গাড়িতে ডেকে নেব।"

ভাবল শিশির। " ডাকলে সে আসবে কেন?"

"বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজছে, গাড়িতে এসে বসবে।"

শিশিরের মনে হল, কথাটা বাবুদা মন্দ বলেনি। লোকটাকে ডেকে নেওয়া যায় গাড়িতে। কাল বড় রুক্ষ ব্যবহার করেছিল শিশির ওর সঙ্গে। আজ না হয় ভাল ব্যবহার করবে। মাফ চাইতেও পারে।

"তুলসীদা," শিশির বলল, "গাড়িটাকে একটু বাঁয়ে করে ওই বড় গাছটার তলায় নিয়ে যেতে পারো?"

না পারার কারণ ছিল না।

গাড়িতে স্টার্ট দিল তুলসী। হেডলাইট জ্বালিয়ে ধীরে ধীরে গাছতলার দিকে এগিয়ে গেল।

কিন্তু কী আশ্চর্য, গাছতলায় কেউ নেই।

শিশির অবাক হয়ে বলল, "আশ্চর্য তো, এই বৃষ্টির মধ্যে লোকটা কখন পালাল?"

বাবুও বুঝতে পারল না, লোক দুটো কখন চলে গিয়েছে গাছতলা ছেড়ে।

॥ পাঁচ ॥

জল আর জটলা ঠেলে পাড়ায় ফিরতে ফিরতে সন্ধে পেরিয়ে গেল। বৃষ্টির তোড় নেই। এখনকার মতন হয়তো থামবে, আবার যদি রাত্রে আসে।

বাবু বারবার শিশিরকে লক্ষ করছিল। শেষে বলল, "তা হলে চল না, একবার কে এস-এর বাড়ি হয়ে যাই।"

তাকাল শিশির। কে এস মানে কৃষ্ণদয়াল সর্বাধিকারী। কৃষ্ণদয়ালের বাড়ি সুকিয়া স্ট্রিটে, শিশিরের বাড়ি থেকে এমন কিছু দূরে নয়। ওঁর কাছে যাবার কথা আজ সকালেও উঠেছিল।

শিশির বলল, "গেলে হয়। তবে সন্ধে হয়ে গিয়েছে; যদি শরীর খারাপ হয়, তখন কী করব, বাবুদা?"

বাবু একটু ভাবল। বলল, "আংটিটা তো তোর হাতে নেই...।"

"পকেটে আছে।"

"তা থাক। শরীর খারাপ যদি হয়, ফিরে আসব।"

শিশির কোনও জবাব দিল না।

ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল, বাদলা হাওয়া। এদিকে রাস্তায় জল দাঁড়ায়নি, ফুটপাথের গা ঘেঁষে অবশ্য গোড়ালি-ডোবা জল জমেছে।

শিশির বলল, "কেষ্টদাকে কি বাড়িতে পাব?"

"তুই বলিস কী? কেষ্টদা সন্ধেবেলায় কোথায় যাবেন। বাড়িতে বসে আড্ডা মারছেন।"

দোনামোনা হয়ে শিশির বলল, "বেশ, চলো। তবে আমি বাড়ি না ফিরলে বাবা ভাববে।"

বাবু বলল, "আমরা কেষ্টদার বাড়িতে বসব, তুলসীদা গিয়ে একটা খবর দিয়ে আসবে কাকাবাবুকে।"

কথাটা পছন্দ হল শিশিরের। বলল, "চলো তা হলে।"

বাড়িতেই ছিলেন কৃষ্ণদয়াল। খবর পেয়ে নেমে এলেন নীচে। শিশিরদের দেখে খুশি হয়ে বললেন, "আরে জগাই-মাধাই যে। এসো এসো। পথ ভুলে নাকি? চলো বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।"

কৃষ্ণদয়ালের বনেদিয়ানা তিন পুরুষের। একসময় যথেষ্ট ধনীও ছিলেন। বংশের ছেলেমেয়েরা শাখা-প্রশাখার মতন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় সেই ধনগৌরবের অনেকটাই এখন খোওয়া গিয়েছে, তবু যা আছে মন্দ নয়। অন্তত চলে যায় কৃষ্ণদয়ালের। তা ছাড়া তিনি নিজে তো আইন-বই বিক্রির একটা ব্যবসাও করেন।

কৃষ্ণদয়াল মোটামুটি সজ্জন। বয়েস পঁয়তাল্লিশের ওপরে। ফরসা গোলগাল চেহারা, মুখটি গোল, মোলায়েম। চোখে চশমা পরেন হাই পাওয়ারের। সেকেলে গোল-গোল চশমা। এই চশমা আর বাবার আমলের এক ফোর্ড গাড়ি তাঁর আভিজাত্যের যেন আট আনা ধরে রেখেছে।

বৈঠকখানায় শিশিরদের নিয়ে এসে বসালেন তিনি। রীতিমতো বড় ঘর, আসবাবপত্র সেকেলে, কিন্তু কোনওটাই ঠুনকো নয়। পুরনো ছবি, অচল ঘড়ি, পুরনো পাখা—সবই রয়েছে।

"বোসো, বাবু। শিশির, তোমার শুনলাম অসুখ-বিসুখ করেছিল। ভাল আছ? বোসো।"

শিশিররা বসল।

"চা খাবে তো?...আর কী খাবে? কাটলেট?"

"না না, কাটলেট খাব না।"

"কেন হে। কাটলেটে কী দোষ করল? ভাল জায়গা থেকে আনিয়ে দিচ্ছি।"

বাবু মাথা নাড়ল। বলল, "না কেষ্টদা, আজ শুধু চা খাব। পরে এসে কাটলেট খেয়ে যাব একদিন। আমরা বিশেষ দরকারে এসেছি।"

কৃষ্ণদয়াল দেখলেন দু'জনকে। তারপর বললেন, "দাঁড়াও তা হলে, চায়ের জন্যে হাঁক ছেড়ে আসি। আমার গোপাল-ঠাকুর ম্যালেরিয়া বাধিয়ে বসে আছে। কলকাতায় এখন বেশ ম্যালেরিয়া হচ্ছে হে। সাবধানে থেকো।"

কৃষ্ণদয়াল হাঁক ছাড়তে বাইরে গেলেন।

শিশির বলল, "বাবুদা, যা বলার তুমি বলো। আমার বেশি কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। মাথাটাও ধরে আছে।"

বাবু ঘাড় হেলাল। সে-ই নাহয় যা বলার বলবে।

কৃষ্ণদয়াল ফিরে এলেন। হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার।

"তোমার যেন কী অসুখ করেছিল, শিশির। কার কাছে শুনলাম যেন—। বলাই? না, বলাই নয়, গোবিন্দ হবে বোধ হয়। ভাবছিলাম একদিন দেখতে যাব। তা শরীরটা

যেন শুকিয়ে গেছে। কী হয়েছিল তোমার? ম্যালেরিয়া না টাইফয়েড?"

কৃষ্ণদয়াল বসলেন।

বাবু বলল, "ওর অসুখের ব্যাপার নিয়ে আপনার কাছে আসা।"

কৃষ্ণদয়াল অবাক হলেন। "অসুখের ব্যাপার নিয়ে আমার কাছে। আমি কি ডাক্তার নাকি?"

"অসুখটা বড় অদ্ভুত, কেষ্টদা।"

"অদ্ভুত। ডাক্তার কী বলছে?"

"ডাক্তাররা তেমন বুঝছে না, পাত্তাও দিচ্ছে না।"

কৃষ্ণদয়াল সিগারেট ধরালেন। "তা আমার চেনা বড় ডাক্তার বলতে..."

"না, না, ডাক্তারের জন্যে আসিনি। আপনাকে ব্যাপারটা বলতে এসেছি।"

কৃষ্ণদয়াল শিশিরকে খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগলেন। "বলো, শুনি।"

"আমি বলছি," বাবু বলল।

"তুমি কেন। শিশির বলুক।"

"ওর মাথা ধরে আছে।"

"ও। বেশ, তুমিই বলো।"

বাবু শিশিরের অসুখের কথা আগাগোড়া বলতে লাগল। মাঝে-মাঝে শিশির দু'-একটা কথা যোগ করছিল।

কৃষ্ণদয়াল খুব মন দিয়ে সব শুনছিলেন। বোঝাই যাচ্ছিল, তিনি যত শুনছিলেন ততই অবাক হচ্ছিলেন।

চা এসেছিল। চায়ের সঙ্গে অমলেট।

চা খাওয়া শেষ হবার পরও বাবু কথা বলছিল। আজকের ঘটনা।

কৃষ্ণদয়াল তিন নম্বর সিগারেট ধরালেন। ধরিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন। কেমন যেন বোবা হয়ে গিয়েছেন।

অনেকক্ষণ পরে শিশিরকে বললেন, "আংটিটা কোথায়?"

"আমার পকেটে।"

"কই? একবার দাও তো দেখি।"

শিশির পকেট থেকে আংটি বার করল। কাগজে মুড়ে রেখেছে।

কৃষ্ণদয়াল আংটিটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নানাভাবে দেখলেন। এমনকী, নিজের আঙুলেও পরলেন।

"তুমি কি আর আংটি পরছ না?" কৃষ্ণদয়াল শিশিরকে বললেন।

"আজ পরিনি।"

"তাতে ভাল আছ?"

"এখন পর্যন্ত আছি। শুধু মাথাটা ধরে রয়েছে।"

"হুঁ।"

আবার কিছুক্ষণ আংটিটা দেখলেন কৃষ্ণদয়াল। তারপর বললেন, "এই যে

লেখা—এটা তোমরা কী বললে?"

"আরবি ফারসি তিব্বতি—কী যে আমরা বুঝতে পারছি না", বাবু বলল।

"বোঝা যায় না", কৃষ্ণদয়াল বললেন, "ব্যাপারটা কী জানো, সারা পৃথিবীতে এত রকমের হরফ আছে যে, কোনটা কীসের আমরা বুঝতে পারি না। জানিই না তো কেমন করে বুঝব।"

"আমি বলছিলাম," বাবু বলল, "একজন কাউকে—মানে এক্সপার্ট কাউকে খুঁজে বার করে লেখাটা দেখানো ভাল।"

"হুঁ। তা ঠিক আছে। আমার এক বন্ধু আছে—তার এ-সব ব্যাপারে বিদ্যে আছে খানিকটা; তাকে বলব।"

শিশির বলল, "লেখা যাই থাক, তাতে এমন হবে কেন?"

কৃষ্ণদয়াল মাথা নাড়লেন। "হওয়া উচিত নয়। তবু জগৎ বড় অদ্ভুত হে। কত রকম জিনিস আছে, কেন হয়, কী যুক্তিতে হয়—ধরা যায় না।"

আংটিটা হাতের মুঠোয় রেখে কৃষ্ণদয়াল শিশিরের মুখের দিকে তাকালেন, যেন জগৎ-রহস্যের বহু সংবাদ তিনি জানেন।

সামান্য পরে কৃষ্ণদয়াল বললেন, "ফাস্ট গ্রেট ওয়ার—মানে তোমার সেই উনিশ শো চোদ্দ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল কেমন করে জানো তো? ইতিহাস বইয়ে নিশ্চয় পড়েছ, অস্ট্রিয়া আর হাঙ্গেরির যুবরাজ ফার্ডিনান্ড তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে সারাজেভো শহরের মধ্যে দিয়ে গাড়ি করে যাচ্ছিলেন। আচমকা রাস্তার মধ্যে পিস্তল চালিয়ে যুবরাজদের দু'জনকেই হত্যা করা হয়। পড়েছ না ইতিহাসে?"

মাথা নাড়ল শিশির। পড়েছে বলেই মনে হল।

কৃষ্ণদয়াল বললেন, "ওই ঘটনা থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। কিন্তু যে মটরগাড়িতে চেপে যুবরাজ আর তাঁর স্ত্রী শহর বেড়াতে গিয়ে মারা গেলেন, সেই গাড়ির কী হয়েছিল জানো?"

মাথা নাড়ল বাবু। শিশির তাকিয়ে থাকল। তাদের জানার কথা নয় গাড়িটার কী হয়েছিল।

কৃষ্ণদয়াল বললেন, "সেই গাড়ি পরে হাত পালটে অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীর কর্তা জেনারেল পোটিয়োরেকের কপালে বর্তাল। কিন্তু হল কী জানো। ভদ্রলোক যুদ্ধ করতে গিয়ে গোহারা হারলেন। তাঁকে মুখ-মাথা নিচু করে ভিয়েনায় ফিরতে হল। পরাজয়ের লজ্জায় পাগল হয়ে গিয়ে মারা গেলেন তিনি।"

বাবু কিছু বলতে যাচ্ছিল। কৃষ্ণদয়াল হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, "শোনো শোনো, সেই গাড়ি যারই হাতে গিয়েছে, তারই কপালে মন্দ ছাড়া অন্য কিছু ঘটেনি। জেনারেলের পর গাড়িটা গেল এক ক্যাপ্টেনের হাতে। ন' দিনের মাথায় গাড়ি হাঁকাতে গিয়ে ক্যাপ্টেন দুজন চাষিকে মেরে নিজেও গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে মারা গেলেন। তারপর এর-ওর হাত পালটে-পালটে গাড়িটা অনেক জায়গায় ঘুরল; যার হাতে যায়—তারই সর্বনাশ করে। গাড়ির মালিককে হয় জীবনে মারে, না হয় হাত-পা ভেঙে ঠুঁটো করে দেয়। বারো-চোদ্দো জনের জীবন শেষ করে দেবার পর সেই গাড়ি

শেষ পর্যন্ত জমা পড়ল ভিয়েনার মিউজিয়ামে। সেই অভিশপ্ত গাড়ি এখন মিউজিয়ামেই পড়ে আছে।"

বাবু অবাক হয়ে বলল, "এ-রকম সত্যিই হয় নাকি?"

কৃষ্ণদয়াল বললেন, "বইয়ে তো তাই পড়েছি।"

"আপনি বলছেন, ওই আংটিটাও সেই রকম? অভিশপ্ত?"

"এখনই কিছু বলছি না। আরও দেখে-শুনে বলতে হবে।"

শিশির বলল, "আংটিটা তা হলে আমি এখন না-পরলাম। দেখি কী হয়।"

"হ্যাঁ, এখন পোরো না। দিন দুই দ্যাখো।... আমিও একটু ভাবি। পারলে পরশু একবার এসো।" কৃষ্ণদয়াল হাত বাড়িয়ে আংটিটা ফেরত দিলেন শিশিরকে।

॥ ছয় ॥

বাড়ি ফেরার পরেও ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। শিশির অন্য দিনের মতো বাড়াবাড়ি কিছু বুঝতে পারছিল না। সন্ধের তুলনায় মাথা অবশ্য বেশি ধরা-ধরা লাগছে, চোখও জ্বালা করছে, সর্দিটর্দি হলে যেমন হয়। অন্য কোনও উপসর্গ নেই। তা হলে কি বুঝতে হবে, ওই আংটিটাই যত নষ্টের মূল।

নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে শিশির নানারকম ভাবছিল। ঘড়িতে প্রায় ন'টা। বাবা এখনও নীচে, মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলছেন। বাবুদা বাড়ি চলে গিয়েছে। বাইরে আবার বৃষ্টিও নেমেছে। তবে জোরে নয়। শব্দ শুনতে পাচ্ছিল শিশির।

কে এস-এর কথা বারবার মনে পড়ছিল শিশিরের। মানুষটিকে এলেবেলে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অনেক রকম খবর তিনি রাখেন। তাঁর সব কথা যে শিশিররা বিশ্বাস করেছে তা নয়, তবে একেবারে অবিশ্বাস করতে পারছে না। মিথ্যে কথা বলার লোক কৃষ্ণদয়াল নন। তা হলেও সত্যিসত্যি একটা মোটর গাড়ি নিয়ে এত কাণ্ড হয়েছে কি না একবার বই পড়ে দেখতে হবে। কৃষ্ণদয়াল বলেছেন, তিনি বইটা পড়তে দেবেন।

শিশির মাঠের লোকটার কথা ভাবছিল; ভেবে আরও অবাক হচ্ছিল। একেবারে আকাশ থেকে পড়েছিল যেন কাল। কোথাও কিছু নেই, হুট করে কাছে এসে বসে পড়ল। বেশ খানিকটা হেঁয়ালি করে চলেও গেল। আজ লোকটাকে আবার মাঠে দেখার কোনও কারণ ছিল না, তবু তাকে দেখা গেল, কিন্তু ধরা গেল না। ও কি শিশিরকে বা শিশিরের গাড়ি দেখতে পেয়ে পালিয়ে গেল?

কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আংটির মতন লোকটাও রহস্যময়। শিশির কি পিসিমাকে একটা চিঠি লিখবে? চিঠি লেখা কিছুই নয়, কিন্তু কী জানতে চাইবে শিশির? মনে মনে একটা খসড়া করতে লাগল সে। করতে গিয়ে দেখল, গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। না, বসে বসে হাতে কলমে খসড়া করাই ভাল।

শিশির উঠল। টেবিলের ড্রয়ারে কাগজ-কলম দুই-ই গোছানো রয়েছে।

বিছানায় এসে বালিশ বুকে করে শুয়ে পড়ল শিশির, শুয়ে চিঠির খসড়া করতে

লাগল।

'পিসিমা, তোমার কাছ থেকে যে আংটিটা নিয়ে এসেছিলাম সেই আংটি নিয়ে আমি ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছি। আংটিটা আমার হাতে ছিল। আশ্চর্য ব্যাপার, আংটি হাতে থাকার সময় আমার বেশ শরীর খারাপ হয়। দিন দুই আগে একটা অজানা অচেনা লোক আমায় মাঠে পাকড়াও করে। সে আমায় বলে, যা আছে সব খুলে ফেলে দিতে। আমি বুঝতে পারিনি সে আংটির কথা বলছে। লোকটাকে আমি তাড়িয়ে দিই। পরে বুঝলাম লোকটা আংটির কথা বলছিল। আংটিটা খুলে ফেলে দেখছি, ভালই আছি একরকম। এই লোকটা কে? সে কেমন করে আংটির কথা জানল? তোমার কিংবা পিসেমশাইয়ের কাছে কেউ কি আমার খোঁজ করেছে? কলকাতার ঠিকানা নিয়েছে? না নিলে এতবড় কলকাতায় সে কেমন করে আমায় চিনবে? ধরবেই বা কেমন ভাবে? আংটির ব্যাপারটা ভাল করে আমায় জানিয়ো। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, আংটিটা তো তোমাদের কাছেও ছিল—কিন্তু কিছু তো হয়নি! তবে আমার কাছে থাকলে কেন হবে?'

পায়ের শব্দে শিশির ঘাড় তুলে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। তুলসীদা।

"কী তুলসীদা?"

"বাবু পাঠালেন।"

"বাবা? কেন?"

তুলসী দু পা এগিয়ে এল। তাকাল কাগজ-কলমের দিকে। "তোমার খবর নিয়ে যেতে বললেন।"

"ও! আমি ভাল আছি। বাবার আর ক'জন মক্কেল বাকি আছে?"

"একজন রয়েছেন। বৃষ্টির দিন, তাড়াতাড়ি চলে গেছেন সব।"

শিশির সোজা হয়ে বসল।

"তুমি লেখাপড়া করছ?" তুলসী বলল।

"না না, চিঠি লিখছিলাম পিসিমাকে। হল না। মানে গুছিয়ে লিখতে পারছি না।"

তুলসী হাসল। "পিসিমণিকে চিঠি লিখবে, তার আবার গুছোবে কী! চিঠি কি গোছাবার জিনিস?"

শিশির হেসে ফেলল। তুলসীদা এ-বাড়িতে থাকতে-থাকতে কথা শিখেছে ভাল। লেখাপড়াও খানিকটা জানে তুলসীদা। বাংলা কাগজ, বই পড়ে। কাগজ তো বেশ মন দিয়েই দেখে, শিশিরও অত খুঁটিয়ে কাগজ দ্যাখে না।

শিশিরের হঠাৎ কেমন খেয়াল হল, বলল, "আচ্ছা তুলসীদা, তুমি তো নীচেই থাকো, বাইরের দিকেও নজর থাকে তোমার। থাকে না?"

"বাসায় থাকলে থাকে।" তুলসী বলল।

"তুমি আমাদের বাড়ির সামনে কাউকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছ? মানে নতুন মুখ?"

তুলসী কথাটা প্রথম ধরতে পারেনি। বোকার মতন কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল শিশিরের দিকে। তারপর তার খেয়াল হল। বলল, "হামেশাই লোকজন আসা-যাওয়া

করে দাদা। বাবুর কত মক্কেল আসে। নতুন-নতুন মক্কেলও।”

“না না, আমি তেমন লোকের কথা বলছি না। এমন কোনও লোক, যে আমাদের বাড়ির দিকে নজর করে, খোঁজ-খবর নেয়?”

তুলসী সামান্য ভাবল। মাথা নাড়ল। “না।”

শিশির কেমন হতাশ হল।

তুলসী চলে যাচ্ছিল, যেতে গিয়ে দরজার কাছ থেকে ফিরে এল। বলল, “দাদা, পরাগ বলে যে-লোকটা এসেছিল...।”

তাকাল শিশির। “পরাগ? ও, প্রয়াগ। তুমি ওকে পরাগ বলো কেন?”

“ওই হল। পরাগ এ-বাড়িতে কাজ করতে এসেছিল। মাসটাক থেকে চলে গেছে। কিন্তু লোক ভাল নয়।”

শিশিরের মাথায় যেন কীসের ঝলক এসে লাগল। সত্যি তো প্রয়াগ বলে একজন এ-বাড়িতে কাজ করতে এসেছিল। বিহারি। তার বাড়ি বলত, পরেশনাথে। পরেশনাথ আর হাজারিবাগ কাছাকাছি। মাত্র দুটো স্টেশনের ফারাক। লোকটা হয়তো হাজারিবাগের লোক, মিথ্যে করে বলত পরেশনাথের। প্রয়াগের চেহারা ছিল ষণ্ডামার্কা। কালো কুচকুচে রং গায়ের। ছোট-ছোট কান, খুদে-খুদে চোখ। গলায় একটা মাদুলি বা কবচ ঝুলিয়ে রাখত। প্রয়াগকে বাবা চাকরি দিয়েছিল এ-বাড়িতে।

“তুলসীদা?”

“হুঁ।”

“প্রয়াগকে এ-বাড়িতে কে এনেছিল?”

“কেউ আনেনি, দাদা। সামনে ওই যে পানের দোকান—সুখলাল, তার কাছে আসত পরাগ, চাকরি জুটিয়ে দেবার কথা বলত। পানঅলা ওকে এ-বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। পরাগ এসে বাবুর হাতে-পায়ে ধরে। বাবু ওকে কাজে নেন।”

শিশির যেন ধাঁধার খানিকটা ধরে ফেলেছে, সামান্য উত্তেজিত হয়ে বলল, “প্রয়াগ চলে গেল কেন?”

“ওর পোষাচ্ছিল না।...হাতির খোরাক ছিল বেটার।”

“গিয়েছে কবে?”

“তা মাসটাক হবে।”

শিশির ঘুরে বসে খাটের পাশে পা ঝুলিয়ে দিল। “ও কোথায় গিয়েছে জানো তুমি, তুলসীদা?”

“না। কেমন করে জানব?”

“এখানে ও কোথায় থাকত? মানে কার কাছে উঠেছিল?”

তুলসী একটু ভেবে বলল, “বলত হাতিবাগানে ওর দেশের লোকজন আছে।”

“সুখলাল নিশ্চয় জানে। তুমি সুখলালের কাছে খবর নিয়ে প্রয়াগকে খুঁজে বার করতে পারবে?”

তুলসী অবাক চোখ করে বলল, “কী হবে ওকে খুঁজে বার করে?”

“দরকার আছে।”

তুলসী আর কিছু বলল না। ঘর ছেড়ে চলে গেল।

শিশির মনে মনে একটা ছক সাজাতে বসল। প্রয়াগ হাজারিবাগের কাছাকাছি জায়গার লোক। হয়তো হাজারিবাগের। এমন হতে পারে, ওকে কেউ এ-বাড়িতে ঢোকাবার জন্যে তার দেশ থেকে নিয়ে এসেছিল। প্রয়াগকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে শিশিরদের বাড়িতে কায়দা করে ঢুকিয়েও দিয়েছে। তারপর প্রয়াগের কাছ থেকে খবর নিয়েছে এ-বাড়ির শিশিরের। যে-লোকটাকে মাঠে দেখা যাচ্ছে, সে যে শিশিরের বাড়ির খবর জেনে নিয়ে মাঠে হাজির হচ্ছে, তাতে আর সন্দেহ কী। খুবই চতুর লোকটা। ফন্দিবাজ। কিন্তু সে কেন শিশিরের পেছনে লাগবে? কীসের দরকার তার? আংটিটার? আংটিটা বাগাবার তাল করছে?

শিশির চঞ্চল হয়ে বিছানা ছেড়ে নামল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করল বার কয়েক। বৃষ্টি পড়েই চলেছে। মেঘ ডাকছে মাঝেমাঝে।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ আয়নার দিকে চোখ পড়ল শিশিরের। চোখ পড়তেই কেমন চমকে গেল। আয়নার কাচের ওপর একটা ঝাপসা ছায়ার মতন পড়েছে। কীসের ছায়া বোঝা যাচ্ছে না। কোনও মানুষের, না জন্তুর?

সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় ফেরাল শিশির। "কে?"

কোনও সাড়া নেই। পায়ের শব্দও শোনা গেল না।

দরজার কাছে গেল শিশির। বারান্দা ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই।

ঘরে ততক্ষণে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে। আলনা থেকে দুটো প্যান্ট ঝপঝপ করে মাটিতে পড়ে গেল। বিছানার ওপর থেকে লেখার প্যাডটা দমকা বাতাসে উড়ে গিয়ে যেন মাটিতে পড়ল। আর আয়নার কাচটা হঠাৎ ফেটে চিড় খেয়ে বিশ্রী দেখাতে লাগল।

শিশির বুঝতে পারল, তার শরীর আবার খারাপ হচ্ছে। ঘাড়-পিঠ টনটন করে উঠল। বিকারের রোগীর মতন চোখে সব ঝাপসা দেখাচ্ছে। জ্বর আসার মতন কাঁপছে সর্বাঙ্গ। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

ভয় পেয়ে শিশির কোনও রকমে বিছানা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। শুয়ে পড়বে ভাবছিল, অথচ দেখল বিছানার ওপর অজস্র ভাঙা কাচ ছড়ানো। শোবার উপায় নেই। কে এত কাচ ছড়াল? কোথা থেকে কাচ এল?

চিৎকার করে উঠল শিশির। চিৎকার করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ছুটে।

বারান্দায় কেউ নেই। বৃষ্টি পড়ছে।

"মধু মধু। তুলসীদা...।"

মধু ছুটতে ছুটতে এল। এসে দেখল, শিশির কেমন দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"কী হয়েছে, দাদাবাবু?"

শিশির আঙুল দিয়ে ঘরটা দেখাল।

মধু ঘরে গেল। ফিরে এল সামান্য পরে। অবাক হয়ে বলল, "ঘরে তো কিছু নেই।"

শিশির তখন দরদর করে ঘামছিল।

॥ সাত ॥

প্রয়াগের কোনও হদিশ পাওয়া গেল না।

তুলসী এসে বলল, "পরাগ অন্য কোথাও চলে গেছে।"

শিশির কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "চলে গেছে মানে। তুমি ওর জানাশোনা এমন কাউকে পেলে না যে বলতে পারে কোথায় গেছে প্রয়াগ?"

তুলসী বলল, "পরাগের এক মামাকে পেলাম। গাঁয়ের মামা। সে বলল, ও নাকি কাশীপুরে চলে গিয়েছে। পাত্তা জানা নেই। আর-একজন বলল, বউবাজারে গিয়ে রিকশা টানছে। কার কথা ধরবে তুমি? আবার কেউ কেউ বলল, দেশে ফিরে গিয়েছে।"

বাবু কাছেই বসেছিল। শুনছিল সব। শিশিরের মুখে প্রয়াগের ব্যাপারটা তার শোনা হয়ে গিয়েছে। বাবু বলল, "ওদের এই রকমই কাণ্ড। কলকাতায় আসে গতর খাটিয়ে রোজগার করতে। এক জায়গায় বড় থাকে না। তবে শুনেছি, দূরে গিয়ে পেটের ধান্দা যদি না করতে হয় নিজেদের মহল্লা কেউ ছাড়ে না। প্রয়াগ নিশ্চয় কাছাকাছি নেই।"

শিশির রীতিমতো হতাশ হয়ে উঠছিল, বলল, "তুলসীদা, তুমি আরও খোঁজ নাও, ওকে ধরা চাই।"

তুলসী অবাক হয়ে বলল, "তোমার কি মাথা খারাপ? আমি খোঁজটা নেব কোথায়? কাশীপুরে, না বউবাজারে?"

কথাটা মিথ্যে বলেনি তুলসী। কোথায় কাশীপুর, আর কোথায় বউবাজার? এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত। কাশীপুর কি ছোট জায়গা? সেখানে হাজার হাজার বেহারি। কত বস্তি। কত রকম কাজকর্ম। প্রয়াগ কোথায় আছে, কীসের কাজ করছে না জানলে খোঁজ নেওয়া অসম্ভব। সেই রকম বউবাজারে কয়েকশো রিকশা ছুটছে দিবারাত্র। প্রয়াগকে কে খুঁজে বার করবে?

শিশির আর কোনও কথা বলল না। চুপ করে থাকল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তুলসী বলল, "আমি পানঅলাকে বলেছি। সে খোঁজ করবে। আমিও আর-একবার হাতিবাগান মহল্লায় যাব। যদি কেউ কিছু বলতে পারে। তবে পরাগকে ধরা মুশকিল।"

তুলসী আর দাঁড়াল না; চলে গেল।

আরও একটু বসে থেকে বাবু বলল, "নে ওঠ, সন্ধে হতে চলল।"

আজ কৃষ্ণদয়ালের বাড়ি যাবার কথা। গতকাল শিশির কোথাও বেরোয়নি। সারাদিন বাড়িতেই ছিল। মাঠের দিকেও যাওয়া হয়নি। পরশুর সেই বৃষ্টি কাল সকাল থেকে ছিনে-জোঁকের মতন লেগে থাকল। রোদ উঠল না; হুড়মুড় করে আকাশও ভেঙে পড়ল না, কিন্তু সারাটা দিন টিপটিপ লেগেই থাকল। এমন বেয়াড়া আবহাওয়া যে, মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

কাল বাবার সঙ্গে শিশির কথা বলেছে। বাবা প্রয়াগের ব্যাপারে কিছুই বলতে

পারলেন না। লোকটা এসে পায়ে ধরেছিল, বাবা রেখে দিয়েছিলেন বাড়িতে। লোকটা একটু ষণ্ডা ধরনের হলেও ও তো বেচাল কিছু করেনি। বরং বাবাকে খুবই খাতির দেখাত।

শিশির বলল, "তুলসীদা বলছিল, লোকটা ভাল ছিল না।"

অমৃতবাবু হেসে বললেন, "তুলসীর একটা দোষ আছে। বাইরের লোক বাড়িতে আনলেই ওর মুখ গোমড়া হয়ে যায়। ও তো বাড়ির ম্যানেজার। ওকে ডিঙিয়ে কেউ কিছু করলেই তুলসীবাবুর রাগ হয়।"

হাসাহাসি করেই বাবা কথাটা উড়িয়ে দিলেন।

শিশির অবশ্য বাবার মতন প্রয়াগকে নিরীহ ভাবতে পারল না। লোকটাকে একবার অন্তত ধরা চাই।

বাবু আবার বলল, "কী রে উঠবি না?"

"হ্যাঁ, উঠছি।" বলে উঠে দাঁড়াল শিশির। "আজও মাঠে যাওয়া হল না?"

"তাতে আর কী হয়েছে? কাল যাব।"

"তুমি তো ফিরে যাবে পরশু?"

"তা তো যেতেই হবে। তবে তুই ভাবিস না। আমি খবর পেলেই আসব। তোর যদি কোনও দরকার হয় চিঠি লিখে দিবি। তোকে একটা ফোন নম্বরও দিয়ে যাব।"

শিশির জামা গায়ে দিয়ে চুল আঁচড়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ বলল, "জানো বাবুদা, কাল আমার কিছু হয়নি। একেবারে ও-কে ছিলাম। সামান্য একটু মাথা ধরেছিল। তাও রাত্রে ঠিক হয়ে গেল।"

"বাঃ। ভাল খবর।"

"যদি এইভাবে ঝঞ্ঝাটটা কেটে যায়, বেঁচে যাই।"

বাবু উঠে পড়ল। "সেরে উঠছিস যখন তখন আর ভাবনা কী। আমি বলছি তুই একেবারে সেরে যাবি।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শিশির বলল, "হেঁটেই যাব।"

"তা ছাড়া কী। কাছেই তো।"

দুজনে বাড়ির বাইরে এল। আজ আবহাওয়া ভাল। বৃষ্টি নেই। সকালে খানিক রোদ খানিক মেঘলা-মেঘলা ভাবে দিন কেটেছে।

হাঁটতে হাঁটতে শিশির বলল, "বাবুদা, আমি ঠিক করেছি, একবার হাজারিবাগ যাব।"

"হাজারিবাগ?"

"হ্যাঁ। এই ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করতে হবে।...আমি বুজরুকি মানতে রাজি নই। আংটি আংটি, তার অদ্ভুত ক্ষমতা আসে কোথা থেকে!"

বাবু বলল, "হাজারিবাগে গিয়ে কী করবি? বুজরুকি তদন্ত?" বলে বাবু হাসল।

শিশির মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, সে তদন্তই করবে। ওই আংটি, মাঠের সেই লোক, প্রয়াগ—এদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই নাকি? শিশিরের বিশ্বাস কিছু একটা ভেতরের রহস্য আছে।

কথা বলতে বলতে দুজনে কৃষ্ণদয়ালের বাড়ি পৌঁছে গেল।

শিশির বলল, "বাবুদা, আজ আমার বেশ ফ্রেশ লাগছে। বোধ হয় আজই প্রথম।"

বাবু হেসে বলল, "ভূত পালিয়েছে আর কী! ভালই হয়েছে।"

কৃষ্ণদয়াল বোধ হয় দুজনের জন্যে অপেক্ষাই করছিলেন। খবর পেয়ে নীচে নেমে এলেন।

বৈঠকখানা-ঘরে শিশিররা বসে ছিল। কৃষ্ণদয়াল ঘরে ঢুকে বললেন, "কী শিশির, আছ কেমন?"

শিশির হাসির মুখ করল। "আজ বেশ ভাল আছি।"

কৃষ্ণদয়াল বসলেন। "আংটিটা খুলে রাখার পর আর কোনও গণ্ডগোল হচ্ছে না তা হলে?"

শিশির বলল, "পরশুদিন খানিকটা হয়েছিল। গতকাল কিছু হয়নি। একটু মাথা ধরেছিল, তাও পরে ছেড়ে গেল। আজ খুব ভাল লাগছে।"

বাবু ঠাট্টা করে বলল, "আজ শিশির লাফাতে লাফাতে এসেছে, কেষ্টদা। ওর ওল্ড ফর্ম ফিরে পেয়েছে।"

কৃষ্ণদয়াল হাসলেন। সিগারেট ধরালেন। "আংটিটা আর পরছ না তো?"

"না।"

"রেখেছ কোথায়? পকেটে না আলমারিতে?"

"আলমারিতে তুলে রেখেছি।"

"বেশ করেছ। এখন পোরো না। দু-পাঁচ দিন থাক। এ সময়টা লক্ষ করে দ্যাখো—কিছু হয় কি না! যদি ভাল থাকো তবে ভালই। তারপর আবার একবার পরে এক্সপেরিমেন্ট করবে।"

বাবু বলল, "পরার দরকার কী?"

"দরকার নেই কেন? আংটিটার সত্যিই কোনও অলৌকিক গুণ আছে কি না—আরও ভাল করে পরীক্ষা হয়ে যাবে। ঠিক কি না শিশির?"

শিশির মাথা নাড়ল। কথাটা ঠিকই।

কৃষ্ণদয়াল বললেন, "আমি দু-একজনের সঙ্গে কথা বলেছি। বিশেষ ফল হয়নি। তবে একজন বলছে, কারও শরীরে কোনও ধাতুর—মানে মেটাল-এর একটা রিঅ্যাকশন থাকে? ব্যাপারটা কীরকম জানো? এই ধরো সবাই যেমন নাইলনের মোজা পরতে পারে না, পায়ে চুলকুনির মতন হয়ে যায়, কিংবা ধরো মেটাল ফ্রেমের চশমা পরলে কানের পাশে ঘা হয়ে যায়—অনেকটা সেই রকম। এক-একজন মানুষের শরীর, তার ধাত এক-একরকম। কারও তেল সহ্য হয়, গন্ধ সহ্য হয়, যে-কোনও খাবার সহ্য হয়। কারও কারও হয় না। সেইরকম কোনও কোনও ধাতু কারও শরীরে একেবারেই সহ্য হয় না। সিসে, তামা, এমনকী রুপোও নয়।" কৃষ্ণদয়াল সিগারেটের টুকরোটা নিবিয়ে দিলেন। বললেন, "যদিও লাখে দশ লাখে একজনকে হয়তো পাওয়া যায় যার শরীরে বিশেষ কোনও ধাতুর আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া হয়—তবু ঠিক অতটা হবার কথা নয় শিশির, যা তোমার হয়েছে।"

বাবু বলল, "আপনি কি বলতে চান শিশিরের মেটাল রিঅ্যাকশন থেকে অসুখটা হয়েছিল?"

"না না, তা আমি বলছি না।" কৃষ্ণদয়াল বললেন, "মেটাল রিঅ্যাকশন শরীরে হতে পারে। তাও হয়তো ঘা হবে, কিংবা চামড়া লাল হবে, ঘামাচির মতন বিজগুড়ি বেরোবে। শিশিরের বেলায় তা তো হয়নি বাবু। ওর যা হয়েছে সেটা মোটেই বাইরের ব্যাপার নয়।"

বাবু একবার শিশিরের দিকে তাকাল। বলল, "ওর তো জ্বরজ্বালা সেরে যাবার পর যেটা হচ্ছে সেটা—"

এমন সময় চা-জলখাবার এল।

কৃষ্ণদয়াল বললেন, "আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না, মেটাল থেকে কোনও মেন্টাল রিঅ্যাকশন হতে পারে। আমি বরং বলব, আংটিটার সঙ্গে কোনও ইতিহাস জড়িয়ে আছে। ওটা ভৌতিক হতে পারে; বা বলা যায়—ওই আংটির কোনও অদ্ভুত ক্ষমতা আছে।"

শিশির বলল, "আপনি ভুতুড়ে গল্প বিশ্বাস করেন?"

"করতে চাই না। তবু করতে হয় কখনও কখনও।"

শিশির চুপ করে গেল।

॥ আট ॥

কয়েকটা দিন বেশ কাটল।

শিশির সন্ধের দিকে ভালই থাকছিল। মাথার যন্ত্রণা নেই, ঘাড়-পিঠ ব্যথাও করছে না, এমন কিছু দেখছে না যাতে ভয় পাবে। বেশ সুস্থ। খানিকটা ঝোঁক করেই একদিন সিনেমা দেখে এল একলা-একলা। কই, কিছুই তো হল না। তার মানে শিশির ভাল হয়ে গিয়েছে।

এর মধ্যে মাঠেও গিয়েছিল দিন দুই। একাই। বাবু দুর্গাপুর ফিরে গিয়েছে। অবশ্য গাড়ি করেই গিয়েছিল মাঠে তুলসীদার সঙ্গে। তবে শিশির তুলসীদাকে কাছাকাছি রাখেনি। আগের মতন এক জায়গায় চুপ করে বসেও সময় কাটায়নি শিশির। খানিকটা ঘোরাফেরাও করেছে। নজর রেখেছে সেই অদ্ভুত লোকটাকে যদি আবার দেখতে পায়। পায়নি। লোকটাও যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে।

এখন তা হলে কী করা যায়?

আংটিটা কি আবার আলমারি থেকে বের করে পরে দেখবে? যদি যাচাই করতে হয়, আংটিটা পরার দরুনই এমন কাণ্ড ঘটল কি না, তবে ওটা আবার পরে দেখতে হয়। কে এস তাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, আবার একবার পরে এক্সপেরিমেন্ট করা দরকার।

শিশির ঠিক সাহস পাচ্ছিল না। একটানা এতদিন ভোগার পর নতুন করে ঝুঁকি নিতে তার ইচ্ছে করছিল না। আবার ব্যাপারটাকে ধামা-চাপা দিতেও ভাল লাগছিল

না একেবারে। কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কী?

কৃষ্ণদয়ালের সঙ্গে আবার দেখা করল শিশির। দু-চারটে সাধারণ কথাবার্তার পর শিশির বলল, "আমি ভাবছি, আংটিটা যেমন আছে তেমনই থাক এখন। তার আগে একবার হাজারিবাগে পিসিমার কাছে যাই।"

কৃষ্ণদয়াল বললেন, "গিয়ে কী করবে?"

"খোঁজখবর করি।"

"কীসের খোঁজ করবে? আংটির?"

শিশির মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

কৃষ্ণদয়াল সামান্য ভাবলেন। বললেন, "আংটির ব্যাপারে নতুন কিছু জানতে পারলে ভালই। কিন্তু পারবে কী? তোমার পিসিমাও তো কিছু জানেন না শুনেছি। তোমরাই বলেছ।"

শিশির চুপ করে থাকল। কথাটা ঠিকই। আংটিটার ইতিহাস যা শোনা গিয়েছে তার চেয়ে বেশি কিছু শোনার আশা করা যায় না। তবু...অনেক সময় সব কথা মানুষের মনে থাকে না, বলতেও ভুলে যায়। পিসিমার কাছ থেকে শিশির যখন আংটিটা নেয়, তখন পিসিমাও ওই আংটি নিয়ে মাথা ঘামাননি, শিশিরও নয়। এখন হয়তো পিসি মাথা ঘামাবেন।

কৃষ্ণদয়াল বললেন, "আমার তো মনে হয়, আংটিটা আবার তোমার পরা দরকার। পরীক্ষা করে দ্যাখো, সত্যিই ওই আংটির কোনও ক্ষমতা আছে কি না?"

শিশির দ্বিধার গলায় বলল, "আবার যদি আগের মতন হয়?"

"হতে পারে," কৃষ্ণদয়াল ঘাড় হেলিয়ে বললেন, "আবার নাও হতে পারে।"

শিশির কৃষ্ণদয়ালকে লক্ষ করছিল। বলল, "যদি হয়?"

"হলে খুলে রাখবে।" কৃষ্ণদয়াল নতুন করে সিগারেট ধরালেন। এটা তো ঠিকই শিশির, আংটিটা আর যাই করুক তোমায় প্রাণে মারবে না। যদি মারার হত, আগেই মারত। তা ছাড়া, তুমি জানতে না বলে অত ভুগেছ, আংটিটা তোমার হাতে ছিল বরাবর। এখন তুমি সবই জানো, বেগতিক দেখলেই খুলে ফেলবে।"

শিশির মাথা নাড়ল। কথাটা ঠিকই।

চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর শিশির বলল, "সেই লোকটাকেও আর মাঠে দেখতে পাচ্ছি না।"

"হ্যাঁ, লোকটাও অদ্ভুত।"

"একবার যদি দেখতে পেতাম—"

"পেলে ভাল হত। না পেলে আর কী করবে। আমি বরং বলি, তুমি যা করবে একটা একটা করে করো। প্রথমে আংটিটা পরো। দিন তিন-চার দ্যাখো। যদি দ্যাখো কিছুই হল না, আংটিটা গঙ্গার জলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এসো।"

"তা না হয় দিলাম কেষ্টদা, কিন্তু আমার অসুখ?"

"ওটা তোমায় ভুলে যেতে হবে। সব অসুখের কারণ খোঁজা বৃথা। বড়-বড় ডাক্তারও অনেক অসুখের কারণ বলতে পারেন না।"

শিশির চুপ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "বেশ, আপনি যা বলছেন তাই করি।"

শিশির উঠতেই যাচ্ছিল, কৃষ্ণদয়াল বললেন, "ভাল কথা, আংটিটা আমি একজনকে দেখাতে চাই। কী লেখা আছে দেখাব। যদি পড়তে পারে।"

"কাকে দেখাবেন?"

"গুপ্তসাহেব বলে এক ভদ্রলোককে। তাঁর কিছু চর্চা রয়েছে। পুরনো কয়েন—মানে ওই পয়সা টাকা এই সব জমান। বলে রেখেছি।"

"বেশ, দেখাবেন। আগে তাঁকে দেখাবেন, না আগে আমি পরব।"

"তুমি আগে পরে নাও, পরে আমি দেখাব।"

শিশির উঠে পড়ল।

এগিয়ে দিতে এসে কৃষ্ণদয়াল বললেন, "কবে পরবে?"

"কাল, না হয় পরশু।"

"পরশু পোরো। তবে একটা কথা বলে দিই। আংটিটা পরার পর বাইরে কোথাও বেরিয়ো না কদিন।"

"কেন?"

"সাবধানের মার নেই। বাড়িতেই থেকো। আমি তোমার খোঁজ নিতে যাব রোজই সন্ধেবেলা, কেমন? ঘাবড়াবার কিছু নেই। যদি তোমাকে হাজারিবাগে যেতেই হয়, যাবে। দরকার পড়লে আমিও যাব।"

শিশির আর কিছু বলল না।

বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই শিশির পেছনে পায়ের শব্দ পেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, তুলসী।

"কী তুলসীদা?"

"পরাগের খবর পেয়েছি।"

"পেয়েছ! কই?" শিশির এমনভাবে তাকাল যেন তুলসীর পেছনেই প্রয়াগ দাঁড়িয়ে আছে।

তুলসী বলল, "পরাগ কাশীপুরেই আছে। হাতিবাগানে ও এসেছিল কাল। দেখা করে ফিরে গিয়েছে।"

"কোথায় আছে, কাশীপুরে?"

"রেল ব্রিজের কাছে। জায়গাটার নাম বলতে পারল না। গুদোম আছে। পরপর।"

শিশির কিছু ভাবল। তারপর বলল, "জায়গার নাম না জানলে ওকে তুমি খুঁজে পাবে কেমন করে?"

তুলসী বলল, "মহল্লা জানতে পেরেছি যখন, খুঁজে খুঁজে বার করে নেব।"

"বেশ। তবে একবার ওকে ধরে আনো। বাবার নাম করে বলো, বাবু একবার দেখা করতে বলেছেন।"

তুলসী মাথা নাড়ল।

শিশির নিজের ঘরে এসে বাতি জ্বালাল। পাখা চালিয়ে দিল। গরমটা কমে এসেছে, তবু এক-একদিন কেমন গুমোট হয়ে থাকে। আজ সেইরকম গুমোট। আবার কি বৃষ্টি হবে? হতেই পারে। বর্ষার দিন।

বিছানায় বসল শিশির। আবার তাকে আংটিটা পরতে হবে তা হলে? যুক্তির দিক থেকে কে এস ঠিকই বলেছেন, যাচাই না করে কোনও কিছুকেই সত্যি বলে ধরে নেওয়া ঠিক নয়। ওই আংটির কোনও অদ্ভুত গুণ থাকতে পারে, আবার নাও পারে। যদি থাকে, তবে শিশির আংটি পরলে নতুন করে কোনও কোনও উপসর্গ দেখতে পাবে। যদি আগের মতন কিছু না হয়, তবে বুঝতে হবে আংটিটা নির্দোষ।

ধরে নেওয়া যাক আংটিটা কিছুই নয়। মামুলি। যদি তাই হয় তবে আংটি খুলে রাখার পর শিশির ভাল থাকছে কেন? কেনই বা সেই মাঠের লোকটা তার কাছে এসেছিল?

হাজার ভেবেও শিশির এ-সব 'কেন'র জবাব খুঁজে পায়নি এ ক'দিন। আজও পাবে না। কাজে-কাজেই কে এস যা বলেছেন, একটা-একটা করে ব্যাপার বেছে নিয়ে দেখা যাক কোনটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। সেটাই ঠিক কথা।

শিশির অন্যমনস্কভাবে আলমারির দিকে তাকাল। আলমারির আয়নায় নিজেকে দেখাও যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত দেখল শিশির নিজেকে, তারপর উঠল।

আংটিটা একবার দেখা যাক। আজ ক'দিন শিশির আংটিটা ছোঁয়নি।

চাবি খুঁজে নিয়ে আলমারি খুলল শিশির।

শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি—আরও কত কী, অগোছালো করে রাখা। তারই একপাশে শিশির আংটি রেখেছিল।

প্রথমটায় আংটি খুঁজে পেল না শিশির। বুক ধক করে উঠল। চুরি হয়ে গেল নাকি?

ব্যস্তভাবে কিছু প্যান্ট-জামা মাটিতে ফেলে ভাল করে হাতড়াতেই আংটিটা পাওয়া গেল।

হাতে নিয়ে দেখল শিশির।

নীচে কুকুরটা চেঁচাচ্ছে। বাবার হুকুমে বেচারি এখনও নীচে বাঁধা থাকে। শিশিরকে দেখতে পেলে এমন ছটফট করে কাঁদে যে, মায়া হয় শিশিরের। ওকে আবার ওপরে নিয়ে আসতে হবে।

"দাদা?"

শিশির দরজার দিকে তাকাল। তুলসীদা।

তুলসী বলল, "কর্তাবাবু তোমায় একবার ডাকছেন।"

"যাচ্ছি।"

তুলসী চলে গেল।

আংটি রেখে, মাটির ওপর পড়ে থাকা প্যান্ট-শার্ট কোনওরকমে আলমারিতে গুঁজে শিশির বাইরে এল।

সিঁড়ি দিয়ে নামছে, দেখল বাবা নিজেই ওপরে আসছেন।

অমৃতবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। ছেলেকে দেখছিলেন।

শিশির সামনে আসতেই অমৃতবাবু একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন। টেলিগ্রাম।

"বুড়ির অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। কী অ্যাকসিডেন্ট লেখেনি। বোধ হয় সিরিয়াস। তোমায় একবার যেতে লিখেছে।" অমৃতবাবু উদ্বেগের গলায় বললেন।

পিসিমার অ্যাকসিডেন্ট? শিশির টেলিগ্রামটা পড়তে লাগল। পিসেমশাই টেলিগ্রাম করেছেন।

শিশির বলল, "আমি কালই যাব?"

"যাও। হঠাৎ বুড়ির কী হল বুঝতে পারছি না।"

শিশিরও বুঝতে পারছিল না, পিসিমার অ্যাকসিডেন্ট আংটির জন্য কি না।

॥ নয় ॥

কলকাতা ছেড়েছিল শিশির বেলা দশটা নাগাদ। সামান্য আগে আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল; পাঠানকোট তো গাড়ি নয়, মালগাড়ি। আচ্ছা এক ট্রেন বাবা! শিয়ালদা থেকে ছাড়ল আধ ঘণ্টা দেরি করে। তারপর গদাইলশকর চালে আসানসোল পর্যন্ত এল। ধানবাদে এসে এঞ্জিন বিগড়ে আরও দেরি। গোমোয় এক কাণ্ড হল। শিশিরদের পাশের কম্পার্টমেন্টের এক ভদ্রলোক অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে মরতে বসলেন। পরেশনাথে এসে আবার গাড়ি অচল হল। বিরক্ত, বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল শিশির। এমন জানলে এই গাড়িতে সে আসত না। কিন্তু বেলার দিকে আর গাড়িই বা কোথায়!

হাজারিবাগে পৌঁছবার কথা সন্ধের দিকে, সেই গাড়ি রাত নটা নাগাদ দয়া করে শিশিরকে যথাস্থানে পৌঁছে দিল।

এই রকমই হয়। যখনই তাড়া থাকবে বাধাও এসে জুটবে পরপর। শিশির কত রকম উদ্বেগ-আশঙ্কা নিয়েই না সময় কাটিয়েছে। কী হল পিসিমার? না জানি বাড়ি পৌঁছে কাকে কোন অবস্থায় দেখবে। তাড়া ছিল শিশিরের, অথচ সেই দেরি হয়ে গেল।

কে জানে এ-সব ওই আংটির জন্যে কি না? কে এস বারণ করেছিলেন আংটিটা সঙ্গে নিতে। শিশির একবার ভেবেছিল নেবে না। পরে নিয়ে নিল। মন খুঁতখুঁত করেছিল, ভয়ও হয়েছিল খানিকটা, তবুও কেমন যেন জেদ করেই আংটিটা সঙ্গে নিল। অবশ্য আঙুলে পরল না। প্যান্ট শার্টের সঙ্গে সুটকেসের মধ্যে রেখে দিল। হাতে থাকলে কী হত বলা যায় না, হয়তো শিশির নিজেই একটা আপদ-বিপদ ঘটিয়ে বসত।

যাক, ভালয়-ভালয় এসে পৌঁছনো হল, এই যথেষ্ট।

ট্রেন থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে দৌড়ে শিশির ওভার-ব্রিজের দিকে ছুটল। টিকিটটা কোনওরকমে রেলবাবুর হাতে গুঁজে দিয়ে সিঁড়ি উঠতে লাগল। চেনা মুখ একটাও

চোখে পড়ল না। ওভারব্রিজে এসে একবার দাঁড়াল, তাকাল এদিক ওদিক। বাদলা বাতাস গায়ে লাগছে। আকাশে মেঘ। চারদিক ভিজে-ভিজে। বোধ হয় সন্ধেবেলায় বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। এদিকেও তা হলে বর্ষা চলছে।

পিসিমার বাড়ি ধানোয়ার রোডে। হাসপাতাল আর পুকুরের কাছাকাছি। ধীরে-সুস্থে হাঁটলে মিনিট পনেরো, পা চালিয়ে গেলে দশ মিনিট। শিশির জোরে-জোরেই হাঁটতে লাগল।

চারদিক ঘুটঘুট করছে। ডান দিকের বাড়িগুলোয় লোকজন নেই নাকি? একেবারে চুপচাপ, নিস্তব্ধ। এখানে অবশ্য সবই চুপচাপ থাকে এ-সময়। তবু এখন গরমকাল, নটার মধ্যে এমন নিঝুম হয়ে যাবে কেন? বোধ হয় বর্ষার জন্য।

শিশির ছোটার ভঙ্গিতে খানিকটা এগিয়ে গেল। তারপর সেই গাছের ঝোপ। ঝোপের তলা দিয়ে মাঠ ভেঙে যেতে পারলে অনেকটা শর্টকাট হত। কিন্তু সে-সাহস হল না শিশিরের। এ-সব জায়গায় বড় সাপখোপ। বিশেষ করে মাঠে-ঘাটে। তার ওপর গরমকাল, বৃষ্টির দিন। শিশির টর্চও আনেনি।

মাঠের পথ না নিয়ে শিশির রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। ট্রেনটাও স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বাঁ দিকে তাকাল। বালিয়াড়ির মতন উঁচু ঢিবি, ট্রেন দেখা গেল না, শব্দটা কানে আসছিল।

পিসিমা কেমন আছেন কে জানে! কী যে হল পিসিমার! বাবা রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছেন। "তুই পৌঁছেই আমায় টেলিগ্রাম করবি। তেমন হলে আমাকেও যেতে হবে। আর যদি শশধর বলে, বুড়িকে কলকাতায় আনানো যাবে, নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবি তোরা।"

বাঁ দিকে পরপর দু-তিনটে বাড়ি। বাতি জ্বলছে। শিশির একবার আলোর দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার জোরে পা চালাল।

ট্রেনটা চলে গিয়েছে। কোনও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

আচমকা শিশিরের মনে হল, তার পেছন পেছন কেউ আসছে। তাকাল শিশির। কাউকে দেখতে পেল না। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

আরও সামান্য এগিয়ে আবার পেছনের দিকে তাকাল শিশির। এবার দেখতে পেল। কে যেন আসছে।

হয়তো কোনও যাত্রী। কিংবা অন্য কেউ। তবু দাঁড়িয়ে না থেকে শিশির হাঁটতে লাগল।

লোকটাও জোরে-জোরে হেঁটে আসছে।

প্রায় ধানোয়ার রোডের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল শিশির। লোকটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

কাছে এল লোকটা। মালকোঁচা-মারা ধুতি পরনে, গায়ে শার্ট। লম্বাচওড়া চেহারা। মস্ত এক গোঁফ।

শিশির কথা বলল না। দস্যুর মতন চেহারা—এই লোকটা কে?

শিশিরকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে লোকটাও দাঁড়াল। দেখল শিশিরকে।

"কাঁহা যাইয়ে গা?" লোকটা বলল।

শিশির এতক্ষণ পরে দেখল, লোকটার হাতে একটা লাঠি, রুলের মতন।

"ধানোয়ার রোড," শিশির বলল।

"ভোলাবাবুকো কোঠি?"

"নেহি। শশধরবাবুকো। তালাওকে বাগল।"

"আচ্ছা, চলিয়ে।"

শিশির পা বাড়াল। লোকটাও।

নিজের পরিচয় দিল লোকটা। থানার কনস্টেবল। নাম গঙ্গাধর চৌবে। লোকে চৌবে বলে। দিন দুই আগে ভোলাবাবুর কুঠিতে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। থানার লোকজন একটু নজর রেখেছে এদিকটায়।

শিশির শুনল। দু-একটা কথাও বলল। এদিকে ডাকাতি বড় একটা হয় বলে শিশির জানত না। সিজন টাইমে লোকজন বেড়াতে এলে চুরিচামারি হয় বলে শুনেছে।

শিশিরের কী মনে হল, হঠাৎ বলল, "ভোলাবাবুকো কোন কোঠি?"

চৌবে ভোলাবাবুর কুঠির হদিস দিল। চিনতে পারল শিশির। বিশাল বাড়ি। ভদ্রলোক নাকি কোলিয়ারি-মালিক ছিলেন একসময়।

এখানে থাকেন না। মাঝে-মাঝে আসেন। শিশির ভদ্রলোককে দেখেনি।

হাসপাতালের কাছাকাছি এসে শিশির দাঁড়াল। এবার তাকে মাঠ দিয়েই যেতে হবে।

চৌবে সোজা যাবে।

শিশির মাঠের পথ ধরল।

বাদলা বাতাস আবার জোর হয়েছে। গাছপালার পাতা কাঁপছে শব্দ করে। হাসপাতালের কোয়ার্টারে বাতি জ্বলছিল।

পিসিমার বাড়ির যত কাছাকাছি আসতে লাগল ততই বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগল শিশিরের। কী দেখবে, কী শুনবে, কে জানে!

খানিকটা এগিয়ে পিসিমার বাড়ি। বাড়ির ওপাশে পুকুর।

বাড়িতে আলো জ্বলছে।

আলো জ্বলছে দেখে বোধ হয় একটু স্বস্তি পেল শিশির।

সদরের ফটক খুলে বাগানে ঢুকল শিশির। ছোট বাগান। সামান্য এগিয়ে বারান্দা। সিঁড়িতে পা দিয়ে কেমন অবশ অবশ লাগতে লাগল।

"কে?"

পিসেমশাইয়ের গলা। দরজা বন্ধ। তবু গেট খোলা, সিঁড়ি ওঠার শব্দ কানে গিয়েছে পিসেমশাইয়ের।

"আমি।"

দরজা খুলে শশধর বাইরে এলেন। শিশিরকে দেখে কেমন অবাক। "তুই? এখন? কোত্থেকে?"

শিশিরেরই অবাক হবার পালা। কেমন বোকার মতন সে বলল, "টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি। কী হয়েছে পিসিমার?"

শশধর কিছুই যেন বুঝতে পারছিলেন না। "টেলিগ্রাম? কার?"

"আপনার।"

"আমার টেলিগ্রাম? কাকে? কবে? কী বলছিস তুই?"

শিশির কেমন ধাঁধায় পড়ে গেল।

"কে গো?" ভেতর থেকে পিসিমার গলা শোনা গেল।

"শিশির।...আয়, ভেতরে আয়।"

সুটকেস হাতে শিশির ঘরে এল।

পিসিমা ততক্ষণে ঘরে এসে হাজির হয়েছেন। ভাইপোকে দেখে যত খুশি ততই অবাক। সামনে এসে শিশিরের গালে হাত বোলাতে লাগলেন। "তুই হঠাৎ?"

"আমি হঠাৎ, না তুমি হঠাৎ—" শিশির কথা গোছাতে পারল না। ভাল করে পিসিমাকে দেখল। তার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি। এই তো পিসিমা দিব্যি হাসিখুশি মুখ করে তার দিকে তাকিয়ে। পাশেই পিসেমশাই।

শিশির বলল, "কাল একটা টেলিগ্রাম পেলাম কলকাতায়। তোমার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে সাঙ্ঘাতিক। বাবা আমায় পাঠিয়ে দিল।"

"অ্যাকসিডেন্ট? আমার? বলিস কী?"

শশধর বললেন, "টেলিগ্রাম ভাল করে দেখেছিস?"

"বাবা দেখেছে।"

"কিন্তু আমরা তো কোনও টেলিগ্রাম করিনি।"

শিশির সেটা বুঝতে পারল। কেন টেলিগ্রাম করবেন পিসেমশাই? পিসিমা তো চমৎকার রয়েছেন। এ নিশ্চয় ভাঁওতা। কিন্তু কেন?

"তুই এত রাত করে এলি?" পিসিমা বললেন।

"ট্রেন লেট। দাঁড়াও। আমার মাথা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তুমি ঠিকই আছ। পিসেমশাইও টেলিগ্রাম করেননি। তা হলে কে মিথ্যে টেলিগ্রাম করল? করলই বা কেন?

"দাদা ভাল আছে?"

"হ্যাঁ। ...না, টেলিগ্রাম পাবার পর থেকে দুশ্চিন্তা করছে।"

শশধর বললেন, "কই, টেলিগ্রামটা কোথায়?"

"টেলিগ্রাম কি আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। বাবার কাছে আছে।"

শশধর সামান্য ভাবলেন। বললেন, "কোনও ভুল হয়নি তো?"

মাথা নাড়ল শিশির। তারপর বলল, "এটাও ওই আংটির ব্যাপার? কেউ আমাকে ভুলিয়ে এখানে হাজির করতে চাইছিল।"

"আংটি? কোন আংটি?" পিসিমা বললেন।

"তোমার ওই সিসের আংটি। মিস্টিরিয়াস ব্যাপার।"

॥ দশ ॥

সকালে বারান্দায় বসে শিশির চা-জলখাবার খাচ্ছিল। পাশেই শশধর।

আগের দিন রাত্রে শিশির সবই বলেছে। এত কথা পিসিমা বা পিসেমশাই কারও জানা ছিল না। কেমন করেই বা জানবেন! কেউ তো জানায়নি।

শিশিরের পিসিমার ডাক নাম বুড়ি, ভাল নাম আশালতা। সব শুনে আশালতা প্রথমেই খানিকটা কেঁদে নিলেন। ভয়ে এবং অভিমানে। "এত কাণ্ড হয়ে গেল, তোরা আমায় কিছু জানালি না?" চোখ মুছতে মুছতে বললেন আশালতা। তারপর আংটিটা শিশিরের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিতেই যাচ্ছিলেন, শশধর কোনও রকমে সামলালেন।

সকালে চা খেতে-খেতে শিশির বলল, "বাবাকে একটা টেলিগ্রাম করতে হবে, পিসেমশাই।"

মাথা নাড়লেন শশধর। বললেন, "নটা নাগাদ পোস্টঅফিসে যাব। তার আগে টেলিগ্রাম হবে না এখানে।"

শিশির অনুমান করল, বিকেলের দিকে বাবা টেলিগ্রাম পেয়ে যাবেন কলকাতায়।

শশধর নিজেই বললেন, "খোঁজটাও নিয়ে আসতে হবে।"

তাকাল শিশির। খেয়াল করেনি কথাটা।

"আমার নামে ফলস্ টেলিগ্রাম কে করল?" শশধর বললেন, "ব্যাপারটার খোঁজ নিতে হবে। কেনই বা করল?"

শিশির কথাটা ভেবেছে আগেই। বলল, "বোধ হয় আমাকে এখানে টেনে আনার জন্যে।"

শশধর সিগারেট পাকাতে পাকাতে বললেন, "আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমাকে এখানে হাজির করে কার কী লাভ?"

"আংটি।"

শশধর জবাব দিলেন না। ভাবছিলেন। সিগারেট পাকানো হয়ে গেলে বললেন, "ওই আংটি যে বাড়িতে আছে তাই আমি জানতাম না। তোমার পিসিমার হাতবাক্সে কত কী আজেবাজে জিনিস পড়ে থাকে—কে আর দেখতে যাচ্ছে। কে জানত ওই আংটির এত ক্ষমতা!"

শিশির বলল, "প্রচণ্ড ক্ষমতা।" বলে হাসল।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে শশধর বললেন, "আংটিটা তোমার পিসিমার হাতবাক্সে কতকাল পড়ে আছে। কেউ ছুঁয়েও দেখেনি। তুমিও তো কত আসো-যাও, তুমিও দ্যাখোনি। হঠাৎ তোমার নজরে পড়ল, শখ হল পরতে—তাতেই এত কাণ্ড হল! বিশ্বাস হয় না, শিশির। আবার যা শুনছি, তাতে অবিশ্বাসও করতে পারছি না।"

আশালতা বারান্দায় এলেন।

"তোকে এখন আর কলকাতায় ফিরতে হবে না," আশালতা বললেন। মনে-মনে এটা বোধহয় স্থির করে ফেলেছেন তিনি, ভাইপোকে এখন কলকাতায় ফিরে যেতে

দেবেন না।

"আমি ফিরছি না," শিশির মাথা নেড়ে বলল।

"না, ফিরবি না। দাদাকে আমি লিখে দিচ্ছি। অসুখে ভুগে-ভুগে কী বিশ্রী চেহারাই হয়েছে! থাক এখন এখানে।"

শশধর বললেন, "খানিকটা পরে আমি পোস্টঅফিস যাচ্ছি। দাদাকে টেলিগ্রাম করব। তাতেই লিখে দেব, শিশির এখন ফিরছে না। তুমি একটা চিঠি লিখে রাখো। বিকেলে পোস্ট করে দেওয়া যাবে।"

আশালতা আর দাঁড়ালেন না। সকালে অনেক কাজ সংসারে। শিশিরের চা-জলখাবার খাওয়া শেষ হয়েছিল, তিনি কাপ প্লেট তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

সামান্য বসে থেকে শিশির উঠল। সিঁড়ি দিয়ে বাগানে নামল। তাকাল চারিদিকে। আজ কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই। রোদ উঠে রয়েছে। তাতও মন্দ না। বেলায় হয়তো গরম বাড়বে।

পিসিমাদের বাড়ির বাগান ছোট, কিন্তু পরিষ্কার। পিসেমশাই নিজের হাতে বাগান তদারকি করেন। জবা, বেল, জুঁই—যেখানে যা আছে—সব ফুলগাছের গোড়া পরিষ্কার। শুকনো পচা পাতা কোথাও পড়ে নেই। পাঁচিলের একপাশে একটা শিউলি গাছ। এখনও ফুল ফুটছে না। সময় হয়ে এসেছে ফুল ফোটার।

শিশির বাগানের মধ্যে পায়চারি করার ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। বাড়ির পেছন দিক থেকে জল তোলার শব্দ আসছে। জল তুলছে ভরতু। ভরতু এ-বাড়িতে কাজ করে। থাকেও এখানে।

বাগানে পায়চারি করতে করতেই শিশির বলল, "আমিও আপনার সঙ্গে পোস্টঅফিস যাব।"

"বেশ তো; যাবে।"

"আচ্ছা একটা কথা—"

"বলো?"

"এমনও তো হতে পারে টেলিগ্রামটা মোটেই এখান থেকে করা হয়নি?"

"তা হতে পারে। তবে অন্য জায়গা থেকে করলে কোত্থেকে করতে পারে! এক যদি টাউন থেকে করে। টেলিগ্রামটা দেখতে পারলে বোঝা যেত কোনখান থেকে করা হয়েছে। তোমার বাবা বোধ হয় সেটা খেয়াল করেননি। ও-সময় করাও যায় না।"

শিশির সিঁড়ির কাছাকাছি এল। তাকাল পিসেমশাইয়ের দিকে। পরে বলল, "আমার মনে হয় দিন কয়েক আমি এখানে ঘোরাফেরা করলেই কিছু আন্দাজ করতে পারব।"

শশধর কোনও জবাব দিলেন না।

পোস্টঅফিসে যথা সময়েই হাজির হলেন শশধর। সঙ্গে শিশির।

পোস্টমাস্টারমশাই শশধরের মুখ-চেনা। নতুন এসেছেন এখানে। শশধর প্রথমটায়

কলকাতায় টেলিগ্রাম লিখে জমা দিলেন। পরে বললেন কথাটা।

পোস্টমাস্টার বিশ্বাস করলেন না।

"আমি কোনও টেলিগ্রাম করতে আসিনি, মাস্টারবাবু। এলে আপনি আমায় দেখতেন।"

পোস্টমাস্টারমশাই খেয়াল করতে পারলেন না। তারপর খোঁজ খবর করে কাগজপত্র ঘেঁটে যা জানালেন, তাতে শশধর আর শিশির দুজনেই অবাক হল। এখান থেকেই টেলিগ্রাম করা হয়েছে। কে যে ফর্ম লিখে করে গিয়েছে টেলিগ্রাম, বলা মুশকিল। অত কেউ নজর করেনি।

পোস্টঅফিস থেকে বেরিয়ে এসে শশধর বললেন, "আশ্চর্য, অন্য লোক এসে আমার নাম দিয়ে টেলিগ্রাম করে গেল!"

শিশির এখন আর বেশি অবাক হচ্ছিল না। সে স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, তাকে এখানে ধরে আনার জন্যে এই ফাঁদ পাতা হয়েছিল। সেই ফাঁদে ধরাও পড়েছে সে। কিন্তু কেন এখানে আনা হল শিশিরকে? কে আনল? কীসের স্বার্থে?

"আমার সঙ্গে শত্রুতা করার মতন এখানে তো কেউ নেই শিশির," শশধর আপন মনে কথা বলার মতন করে বললেন। "আমরা দুই বুড়োবুড়ি এক পাশে পড়ে আছি। সদ্ভাব ছাড়া অসদ্ভাব কারও সঙ্গে নেই। আর কার সঙ্গেই বা অসদ্ভাব থাকবে, এখানে কটা লোকই বা বরাবর থাকে!"

শিশির বলল, "আপনি নিমিত্ত মাত্র। আসলে যা করা হয়েছে—সবই আমার জন্যে।"

"তোমার জন্যেই বা হবে কেন?"

শিশির সে-কথার কোনও জবাব দিল না।

সামান্য হেঁটে এসে শিশির বলল, "আপনি বাড়ি যান পিসেমশাই। রোদ চড়ে উঠছে। আমি একটু ঘুরে ফিরে যাব।"

শশধর আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, তারপর মনে হল, আপত্তি করার কোনও কারণ নেই। দিনের বেলায় এখানে এমন কিছু ঘটবে না যাতে শিশিরের কোনও বিপদ হতে পারে।

শশধর বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

শিশির সামান্য দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর স্টেশনের পথ ধরল।

এখানকার রাস্তাঘাট তার চেনা। অজস্র বার এসেছে। মুখচেনাও রয়েছে অনেকের। বাজারের কাশীনাথকে সে চেনে। যথেষ্ট আলাপ। কাশীনাথের চা-মিষ্টির দোকান। বুকিং ক্লার্ক ধরণীকেও সে বেশ চেনে। ধরণীবাবুর বয়েস কম। এই স্টেশনে বছর খানেক আছেন। তাসের নেশা। আর মাঝে-মাঝে হার্মোনিয়াম বাজিয়ে গান। মজার লোক। এই রকম আরও কিছু চেনাশোনা আছে।

হাঁটতে হাঁটতে শিশিরের মনে হচ্ছিল যারা তাকে ফাঁদে ফেলে এখানে নিয়ে এসেছে, তারা বোধ হয় তেমন চালাক নয়। কেননা নিজেরাই তারা ধরা পড়ে গিয়েছে। মানে, তারা বলে দিচ্ছে যে, এখানেই আপাতত তারা রয়েছে। কলকাতার

মতন শহরে গা ঢাকা দিয়ে থাকা কিছুই নয়; এমন কী, শিশিরের মতন ছেলেকেও কাবু করে ফেলা সহজ। কিন্তু এখানে গা ঢাকা দেওয়া অসম্ভব। আর শিশির যদি পিসিমার সেবা-যত্নে দিন দশ পনেরো খাওয়া-দাওয়া করে আরাম করে তবে সে আবার আগেকার শিশির হয়ে উঠবে।

কেমন একটু হাসিই পেল শিশিরের। বেটারা বোকা। ফাঁদ পেতেছ তোমরা, কিন্তু ঘুঘু দ্যাখোনি।

শিশিরের মনে হল, ব্যাপারটা আরও একটু গড়ালে সে দুর্গাপুরের বাবুদাকে চিঠি লিখবে। বাবুদা যদি কিছুদিন ছুটি নিয়ে এসে এখানে থাকে—শিশিরের কাছে, তবে দারুণ হবে। কে এস কেও একটা চিঠি লেখা দরকার। শিশির হঠাৎ চলে এসেছে—এটা তাঁকে জানিয়ে দেওয়া ভাল।

অন্যমনস্কভাবে শিশির স্টেশনের কাছাকাছি চলে এসেছিল, হঠাৎ কে যেন তাকে ডাকল।

তাকাল শিশির। কাউকে দেখতে পেল না। কাছাকাছি যে দু-চারজন মানুষ রয়েছে তারা তাকে ডাকেনি। তাদের কাউকেই চেনে না শিশির।

তেঁতুল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে শিশির লোকটাকে খুঁজছিল। কে তাকে ডাকল?

॥ এগারো ॥

শোনার ভুল কিংবা মনের ভুল ভেবে শিশির আবার পা বাড়াতেই শব্দ শুনল হাসির। এবার বংশীকে দেখতে পেল।

জল-টাঁকির দিক থেকে বংশী এগিয়ে আসছে। আসলে চোখের সামনে বালিয়াড়ির মতন উঁচু একটানা ঢিবি থাকলে আড়ালের মানুষকে কেমন করে আর দেখা যায়!

বংশী এখানকার লোক। বাজারে তার একটা ছোটখাটো স্টেশনারি দোকান রয়েছে। শিশিরেরই সমবয়সী। তাস খেলার নেশা খুব। আবার আজগুবি গল্প বলায় ওস্তাদ। শিশিরের সঙ্গে ভাব আছে বংশীর।

কাছে এসে বংশী এক চোট হেসে নিল। তারপর বলল, "হঠাৎ?"

শিশির বলল, "চলে এলাম।" বলে হাসল। "তুমি ওদিকে কোথায় গিয়েছিলে?"

বংশী গিয়েছিল তার বাড়িতে। একটা কাজ ছিল। শেষ করে লাইন টপকে শর্টকাট করে ফিরছে। দোকানে যাবে।

শিশিরকে হাত ধরে টানল বংশী। "চলো, দোকানে গিয়ে বসবে।"

আপত্তি করল না শিশির।

দুজনে বাজারের দিকে হাঁটতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে বংশী বলল, "কলকাতা থেকে ঝপ করে চলে এলে যে? এত তাড়াতাড়ি তো তুমি আসো না!"

শিশির জবাব দিল না। বংশীর কেন, যে-কোনও লোকেরই এটা চোখে পড়ার

কথা। শিশির বছরে বার দুইয়ের বেশি এখানে আসে না। সে জায়গায় মাত্র সেদিন ঘুরে গিয়ে আবার এসেছে এতে তো বংশী অবাক হবেই।

সামান্য চুপচাপ থেকে শিশির শেষে বলল, "একটা কাজ ছিল।"

"ও!" বংশী আর আগ্রহ দেখাল না।

শিশির অন্য কথা ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে সাধারণভাবে বলল, "এখানে বৃষ্টি কেমন হচ্ছে?"

"মোটামুটি। বর্ষা এবার যাই-যাই করছে।"

"কলকাতাতেও," শিশির বলল। "আর কী খবর বলো? তোমার তাস-পার্টি কেমন চলছে?"

হাসল বংশী। মাথা নেড়ে বলল, "মাঝে-মাঝে বসে। রোজ হয় না। আমার বাড়িতে অসুখ-বিসুখ চলছে। মায়ের শরীর খারাপ।"

"কী হয়েছে?"

"পেটে আলসার বোধ হয়। এখন একটু ভাল।"

কথা বলতে বলতে বাজারে পৌঁছে গেল দু'জনে। এখন সব ফাঁকা। মানে লোকজন নেই প্রায়। একটা বাস সবে টাউন থেকে এসে পৌঁছল। দোকানপত্র খোলা আছে। রাস্তার একপাশ জুড়ে গাছের ছায়া। ছায়া দিয়ে হাঁটতে লাগল শিশিররা।

সামান্য এগিয়ে বংশীর দোকান।

"তোমাদের এখানে নাকি খুব জোর ডাকাতি হয়েছে?" শিশির বলল।

"হ্যাঁ, আমিও শুনলাম। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। ভোলাবাবুর বাড়িতে ডাকাতি করা মুশকিল। ওদের লোকলশকর আছে। বন্দুক আছে। তবু ডাকাতি হয়ে গেল। এখানে কিছু বদমাশ টাইপের লোক জুটেছে।"

শিশির শুনল। কিছু বলল না।

বংশীর দোকান খোলা। তার একজন বুড়োমতন লোক আছে। দোকানে বসেছিল।

বংশী দোকানে এসে বলল, "কালুদা, তুমি একবার ডাক্তারবাবুর কাছে যাবে। বলবে, ওষুধ দুপুর পর্যন্ত চলবে। নতুন ওষুধ নিয়ে বাড়ি চলে যাও। আর শোনো, দোকানে বলে যাও, দুটো চা দিয়ে যাবে।"

কালুদা চলে গেল।

দোকানের ভেতর বসল দু'জনে। একটা টেবিল-পাখা চলছে। শিশির আর বংশী গায়ে হাওয়া লাগাতে লাগল।

এ-সময় বংশীর দোকানে বড় একটা খদ্দের আসে না। সকালের দিকে কিছু আসে, আর আসে সন্ধের দিকে। সন্ধের দিকেই বরং বেশি। বেশির ভাগ বাঙালি বংশীর দোকান থেকেই জিনিসপত্র কেনে। না কিনলে হয়তো দোকান তুলে দিতে হত। সিজ্‌ন টাইমের তিন-চার মাসের ওপর ভরসা করে তো আর বারো মাস দোকান চালানো যায় না।

দু'জনেই একটু গা জুড়িয়ে নিল। চা এল সামান্য পরে।

শেষে শিশির বলল, "তুমি এখানকার লোকজন সবাইকে চেনো বংশী?"

"চিনব না? বাঃ। আমার বাড়ি এখানে।"

শিশির ভাবল। কথাটা বলবে, না বলবে না? বংশী ভাল ছেলে। তাকে কিছু বললে ক্ষতি হবে না। বরং উপকার হতে পারে।

শিশির বলল, "তোমাকে ক'টা কথা বলব! কথাগুলো কিন্তু অন্য কাউকে বলতে পারবে না।"

বংশী হেসে ফেলল। নিজের পেটে গুঁতো মারল। বলল, "আমি পেট-পাতলা। তবে তেমন কিছু হলে বলব না।"

"তেমন কিছুই তোমাকে বলব।"

"বলো।"

শিশির আংটির কথা তুলল না। ওটা এখন থাক। টেলিগ্রামের কথাটাই বলল বংশীকে।

বংশী অবাক। বিশ্বাস করতে পারছিল না। "তুমি ঠিক বলছ?"

"বাঃ! নয়তো আমি আসব কেন হঠাৎ?"

বংশী মাথা চুলকে বলল, "এইটুকু জায়গা। সবাই প্রায় সবাইকে চেনে। তোমার পিসেমশাইকেও। কে এমন বদমাইশি করবে? কেনই বা করবে?"

কেন করবে শিশির তা ভাঙল না। বলল, "তামাশা করার জন্য করেছে?"

"ধ্যাত। তামাশা এ-সব নিয়ে কেউ করে?"

"জব্দ করার জন্যে?"

"তোমার পিসেমশাই মাটির মানুষ! তাঁকে কেন জব্দ করতে চাইবে?"

"তবে?"

বংশী ভাবছিল। কোনও সদুত্তর পাচ্ছিল না।

শিশির এবার কথা ঘোরাল। "আচ্ছা, আমি দুজন লোকের কথা বলছি। একজনের নাম জানি না, অন্যজনের জানি। প্রথমজনের কথা তোমায় বলছি। ভেবে দ্যাখো তো এ-রকম কাউকে এখানে দেখেছ কি না?"

বংশী তাকিয়ে থাকল।

শিশির কলকাতায় গড়ের মাঠে দেখা লোকটার বর্ণনা দিল। প্রায় নিখুঁতভাবে।

বংশী ভাবতে লাগল। মাঝে-মাঝে এটা ওটা জিজ্ঞেস করছিল। কান ঘাড় চুলকেও যেন মানুষটাকে মনে আনতে পারছিল না।

"না, এ-রকম কাউকে আমি দেখিনি।" বলে বংশী নস্যির কৌটো বার করল।

"কিছুদিন আগেও নয়? ধরো, আমি যখন এসেছিলাম?"

মাথা নাড়তে নাড়তে বংশী নস্যির বড়সড় টিপ নাকে গুঁজল। তারপর আচমকা বলল, "তুমি সিংহীবাবুর কথা বলছ না তো?"

"সিংহীবাবু! কে সিংহীবাবু?"

"কে সিংহীবাবু তা জানি না। রেলফটকের কাছে একটা বাড়িতে থাকতেন। পাগলা ধরনের। রোগা দেখতে। তবে তাঁর বয়েস হয়েছে। ছেলে ছোকরা নয়।"

"কী করতেন সিংহীবাবু?" শিশির উত্তেজিত হয়ে উঠল।

"বলা মুশকিল। আমি জানি না। শুনেছি, সিংহীবাবু বাইরে থেকে এসে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। ওঁর নাকি পাওয়ার ছিল।"

"কীসের পাওয়ার?"

"ওই—ওই নানা রকম অদ্ভুত কাণ্ড দেখাতে পারতেন।"

"এখন উনি নেই?"

"দেখিনি অনেকদিন!"

"বাড়িতে গেলে খোঁজ পাওয়া যাবে না?"

"বাড়িতে বোধ হয় একলাই থাকতেন। ওঁর কেউ আছে বলে শুনিনি। দেখিওনি কাউকে।"

শিশির মনে-মনে ঠিক করল, আজই বাড়ি ফেরার সময় একবার দেখে যাবে সিংহীবাবুর বাড়ি। "ফটক পেরিয়ে ডান দিকে?"

"হ্যাঁ পুকুরের কাছে, প্রথম বাড়ি।"

"ও বুঝেছি। সেই ভাঙা-ভাঙা বাড়িটা।" শিশির বাড়িটা মনে করতে পারল।

"আরও একজন কে?" বংশী জিজ্ঞেস করল।

শিশির একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সামলে নিয়ে বলল, "অন্য লোকটার নাম প্রয়াগ। ষণ্ডামার্কা দেখতে। কুচকুচে কালো। পরেশনাথে বাড়ি। বেটাকে একেবারে ক্রিমিন্যালের মতন দেখায়।"

বংশী সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "প্রয়াগ নয়, আমি ওই টাইপের একজনকে জানি, তার নাম সুখিয়া। বেটা খুনে। ডাকাত। পুলিশের ভয়ে পালিয়েছে এখান থেকে। ও তো বগোদর থেকে এসেছিল। এক নম্বরের শয়তান।"

শিশির কেমন দ্বিধায় পড়ল। প্রয়াগ আর সুখিয়া কি একই লোক?

॥ বারো ॥

স্নান-খাওয়া শেষ করে দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিল শিশির। ঘুমের মধ্যে একবার গড়ের মাঠের সেই লোকটাকে স্বপ্ন দেখল। লোকটা সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকল শুধু। কিছু বলল না। চোখমুখ একবারে নির্বিকার। শিশির নিজেই কিছু বলতে যাচ্ছিল, ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভাঙার পর শিশির আলস্য-জড়ানো চোখ নিয়ে কিছুক্ষণ ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর হাই তুলে উঠে বসল বিছানায়।

বাইরে রোদ মরে যাচ্ছে। পাখি ডাকছিল বাগানে। বাড়ি একেবারে চুপচাপ নয়; পিসিমার গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

জল তেষ্টা পেয়েছিল শিশিরের। উঠে পড়ল।

ভেতরের বারান্দায় এসে দেখল পিসিমা শুকনো কাপড়চোপড় তুলে নিয়ে গুছিয়ে একপাশে জড়ো করছেন।

জল চাইল শিশির।

আশালতা জল এনে দিলেন।

শিশির জল খেয়ে গ্লাসটা বাড়িয়ে দিচ্ছে পিসিমার দিকে, আশালতা বললেন, "দাদা এতক্ষণে টেলিগ্রাম পেয়ে গিয়েছে, কী বলিস?"

"এত তাড়াতাড়ি? সন্ধে নাগাদ পেয়ে যেতে পারে।"

"তাও ভাল। অকারণ একজনকে ভোগানো।" বলে আশালতা একটু থেমে ক্ষোভের গলায় বললেন, "আজকাল লোকজন বড় নচ্ছার হয়ে গিয়েছে। নয়তো অমন করে কেউ মিথ্যে-মিথ্যে টেলিগ্রাম করে!"

শিশির চুপ করে থাকল।

"তোর পিসেমশাই বলছিলেন, কেউ শয়তানি করে এমন কাজ করেছে।"

শিশির মাথা নাড়ল। "কোনও সন্দেহ নেই।"

"তুই কিন্তু হুটহাট করে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াবি না।"

শিশির হাসল। বলল, "না-বেড়ালে শয়তানটাকে ধরব কেমন করে।"

"তোকে আর শয়তান ধরতে হবে না।"

শিশির আবার একটু হেসে সিঁড়ি দিয়ে ভেতরের চাতালের দিকে নেমে গেল। এটা বাড়ির পেছন দিক। খানিকটা বাঁধানো চাতাল, তারপর কুয়োতলা, আশেপাশে কয়েকটা কলা আর পেঁপে গাছ।

আকাশ, গাছ দেখতে দেখতে শিশির বাঁধানো কুয়োর কাছে এসে দাঁড়াল। বংশীর আসতে দেরি আছে। বলেছে একেবারে শেষ বিকেলে আসবে। বংশী এলে দু'জনে বেরোবে। কোথায় যাবে তা অবশ্য ঠিক নেই। ঘুরেফিরে হয়তো বংশীর দোকানে গিয়েই বসবে।

আজ বংশীর দোকান থেকে ফেরার সময় শিশির সিংহীবাবুর খোঁজ করেছে। রেল-ফটক পেরিয়ে ডান দিকের বাড়িটা যদি সিংহীবাবুর হয় তবে ভদ্রলোক ও-বাড়িতে নেই। দরজা জানলা সব বন্ধ। তালা ঝুলছে বাইরের দরজায়। কারও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। আশেপাশে, কাছাকাছি, অন্য বাড়ি নেই। তফাতে আছে।

শিশির ভাল করে অন্য খোঁজ নিতে পারেনি। তবু তার মনে হচ্ছে, সিংহীবাবু বাড়িতে নেই, ফাঁকাই পড়ে আছে বাড়িটা।

এখন কথা হল, সিংহীবাবু আর সেই গড়ের মাঠের লোক একই কি না! চোখে না-দেখা পর্যন্ত শিশির কিছু বলতে পারে না। হয়তো আলাদা লোক। তা যদি হয়, তবে যাও বা একটু ধরাছোঁয়া যাচ্ছিল রহস্যটার, তাও গেল।

অবশ্য একটা ব্যাপারে শিশির নিঃসন্দেহ। রহস্য যতই জটিল হোক এখানেই তার সূত্র রয়েছে। কারণ মিথ্যে টেলিগ্রাম করে আনানো হয়েছে শিশিরকে। আর সেটা অকারণে হতে পারে না।

শিশির বাঁধানো কুয়োর পাড়ে বসল একটু, তারপর উঠে পড়ল। হাতমুখ ধুয়ে বরং তৈরি হওয়া যাক। বংশী এলে বেরিয়ে পড়বে।

বংশীর আসতে দেরিই হল সামান্য। শশধর তখন বাগানের কাজ সেরে ঘরে ঢুকছিলেন। শিশির সেজেগুজে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় চললে?"

"একটু ঘুরে আসি। বংশী এসেছে।"

"রাত কোরো না।"

"না।"

বংশী ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। শিশির কাছে এসে বলল, "চলো।"

দু'জনে মাঠ ভেঙে হাঁটতে লাগল।

শিশির বলল, "বংশী, তোমার সেই সিংহীবাবু বোধ হয় নেই। বাড়ি তালাবন্ধ।"

বংশী বলল, "দেখেছ তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু শুনলাম আছেন।"

"আছেন?" শিশির অবাক হল।

বংশী বলল, "দুপুরে বাড়িতে শুনলাম সিংহীবাবু আছেন।"

"কে বলল?"

"আমাদের বাড়িতে লেটুয়া বলে একজন কাজ করে। তার বাবা বেশ খানিকটা পাগলা ধরনের। গাঁয়ে লেটুয়াদের বাড়ি। ওর বাবা বাড়ির এটা-ওটা কুমড়ো, ঝিঙে এনে সকালে বাজারে বেচতে বসে। দু' এক টাকা যা বেচতে পারে তাই লাভ। লেটুয়ার বাবা সিংহীবাবুর কাছে যায়। সিংহীবাবু তাকে ওষুধ দেয় খেতে।"

"ওষুধ! কী ওষুধ?"

"পাগলামি সারানোর ওষুধ।... তা আমি লেটুয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, সে তো বলল, তার বাবা সিংহীবাবুর দাবাই খাচ্ছে।"

শিশির বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, "কিন্তু আমার তো বাইরে থেকে বাড়িটা দেখে মনে হল, ও-বাড়িতে কেউ থাকে না।"

বংশী বলল, "তোমার ভুল হয়েছে। চলো না, যাবার সময় দেখে যাই।"

"চলো।"

হাসপাতালের দিকে হাঁটতে লাগল দু'জনে। মাঠ ভেঙে এগিয়ে গিয়ে বড় রাস্তা ধরবে।

আলো কম আসছে। বাতাস দিচ্ছিল। আকাশে কোথাও তেমন মেঘ নেই, তবু বাতাসটা বাদলা-বাদলা লাগছিল।

বংশী বলল, "আচ্ছা, একবার থানায় গেলে কেমন হয়?"

"থানা! কেন?"

"থানায় গিয়ে ওই ফলস্ টেলিগ্রামটার কথা বললে হয়। আমার চেনা জানা আছে থানার ছোট দারোগার সঙ্গে। বাঙালি। রায়বাবু। হেমচন্দ্র রায়।

শিশির কথাটা ভেবে দেখেনি আগে। থানায় গিয়ে ব্যাপারটা জানানো যায় কি না তাও সে জানে না।

"থানায় গিয়ে লাভ হবে?" শিশির বলল।

"লোকসানই বা কী! ব্যাপারটা তো চিটিং।"

"হ্যাঁ, একটা মতলব নিশ্চয় আছে।"

"আমি তাই ভাবছিলাম—থানায় গিয়ে একবার জানিয়ে এলে হয়।"

"আচ্ছা সে হবেখন। আগে সিংহীবাবুর পাত্তা নাও।"

রাস্তায় পৌঁছে গিয়েছিল শিশিররা। খানিকটা দূরে সিংহীবাবুর বাড়ি।

বংশী বলল, "আচ্ছা, তুমি সিংহীবাবুর খোঁজ করছ কেন?"

"আমি খোঁজ করছি! কই, না!"

"বাঃ, তুমিই তো একজন—একজন কেন হবে দু'জনের ডেসক্রিপশান দিলে, বললে—আমি এদের কাউকে এখানে দেখেছি কি না।"

শিশির বুঝতে পারল সে ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছে। বংশী কিছুই জানে না। টেলিগ্রামের কথা ছাড়া অন্য কোনও কথাই শিশির বংশীকে বলেনি।

শিশির ভাবল সামান্য; বলল, "ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। তোমায় সব কথা বলিনি।"

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বংশী। "মানে?"

"মানে—মানে তুমি সব জানো না। আমি একটা ব্যাপারে দু'জনকে সন্দেহ করছি। তাই তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম।"

"ও! তা তোমার ব্যাপারটা কী?"

শিশির তাকাল বংশীর দিকে। "ব্যাপারটা জটিল। তোমায় পরে বলব। তবে এটুকু জেনে রাখো, ওই টেলিগ্রাম করানোর মধ্যে একটা মতলব রয়েছে। আমায় কলকাতা থেকে এখানে ধরে আনা।"

"কেন?"

"এখন বুঝবে না। সব শুনলে বুঝতে পারবে।"

"ও!"

সিংহীবাবুর বাড়ির সামনে চলে এসেছিল শিশিররা। বংশী হাত তুলে দেখাল। "এই বাড়ি।"

অন্ধকার হয়নি, তবু ঝাপসা ভাব হয়েছে চারদিকে। আকাশের তলায় আলো নেই। দু'টুকরো মেঘ ধীরেসুস্থে ভেসে যাচ্ছে। সিংহীবাবুর বাড়ির বাইরে সামান্য পাঁচিল। ভেতরে গাছপালা। ছোট একটা ফটক সামনে। ফটক খোলাই ছিল, তালা পড়েনি। বাড়িতে লোকজন আছে বলে মনে হচ্ছিল না। চুপচাপ।

বংশী ফটক পার হয়ে ভেতরে ঢুকল। পেছনে শিশির।

পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা ঘরের বাইরে তালা ঝুলছে। অন্য ঘর ভেতর থেকে বন্ধ।

বংশী দু'চার ধাপ সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠল। তালাবন্ধ ঘরের সামনে দাঁড়াল। দেখল এদিক-ওদিক।

শিশির বলল, "তখন আমি এই রকমই দেখেছি। বাড়িতে লোক নেই।"

বংশী অকারণে বার দুই ধাক্কা মারল দরজায়, "অবাক কাণ্ড।"

"কেন?"

"আমায় বলল আছে..."

"ভুল বলেছে। বাড়িতে লোক থাকলে এই দশা হয় বাড়ির? দেখছ না, সারা বারান্দা ধুলোয় ভর্তি।"

বংশী দাঁড়িয়ে থাকল সামান্য। তারপর বলল, "ঠিক আছে, আমি খোঁজ নিয়ে নেব।"

শিশির বারান্দা থেকে নেমে আসছিল, হঠাৎ বংশী বলল, "আরে তালা তো খুলে গেল।"

শিশির থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘুরে দাঁড়াল।

বংশী বলল, "আমি তালাটা দেখছিলাম। খুলে গেল।"

শিশিরও দেখল দরজার কড়ায় তালাটা ঝুলছে।

"কী ব্যাপার বলো তো?" বংশী বলল।

শিশির নিজেই অবাক হয়েছিল। বলল, "তালাটা বোধ হয় ভাল-মতন লাগেনি। তুমি ধাক্কাধাক্কি করেছ, টেনেছ, খুলে গিয়েছে।"

"সিংহীবাবু তালা লাগিয়েছেন অথচ ভাল করে দেখেননি তালাটা লেগেছে কি না?"

"ভুল তো হয় মানুষের।"

"তা হলে চলো ভেতরটা একবার দেখে যাই।"

শিশির বারণ করতে যাচ্ছিল, তার আগেই বংশী দরজার তালা খুলে ফেলে জোর ধাক্কা দিল দরজায়।

দরজা খুলে গেল।

॥ তেরো ॥

ভেতরে অন্ধকার। কিছুই চোখে পড়ছিল না।

বংশী বলল, "টর্চ আছে?"

"না।" বলে শিশিরের আফসোস হল। টর্চ রাখা উচিত ছিল। এসব জায়গায় টর্চ ছাড়া সন্ধের পর বেরোনো উচিত নয়, বিশেষ করে এই বর্ষা-বাদলার দিনে। ভুল হয়ে গিয়েছে শিশিরের।

"দেশলাই?"

"না," শিশির মাথা নাড়ল।

বংশীর পকেটেও নস্যির ডিবে ছাড়া অন্য কিছু নেই।

অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিয়ে বংশী বলল, "এ বাড়িতে ইলেকট্রিক আছে কি না তাও জানি না।"

শিশির কিছু বলল না। এদিককার রাস্তায় সবে ইলেকট্রিকের লাইন টানা হয়েছে,

কোনও-কোনও বাড়িতে আলো-টালো জ্বলে, তবে সব বাড়িতে এখনও ইলেকট্রিক পৌঁছয়নি।

বংশী দেয়ালে হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, "তুমি একটা জিনিস লক্ষ করেছ?"

"কী?"

"ঘরের মধ্যে ভ্যাপসা গন্ধ তেমন নেই।"

শিশির লক্ষ করেনি। নাক টানল বার কয়েক। বলল, "তাই মনে হচ্ছে।"

"ঘর যদি অনেকদিন বন্ধ থাকত, গন্ধ হত না?"

কথাটা ঠিকই বলেছে বংশী। শিশির বলল, "কিন্তু বাইরে দেখলে মনে হয়, এ-বাড়িতে কেউ থাকে না।"

"তুমি বোধ হয় তখন ভাল করে দেখোনি সব। তাছাড়া বাড়ির পেছন দিকও রয়েছে, সেখান দিয়ে কেউ যদি আসা-যাওয়া করে তুমি বুঝবে কেমন করে।"

শিশির যতটা পারে ঘরটা লক্ষ করছিল। অস্পষ্ট ভাবে কয়েকটা জিনিস তার নজরে আসছিল। একপাশে ফাঁকা তক্তপোশ, টিনের চেয়ার একটা, একরাশ খবরের কাগজ, ছেঁড়া জামাটামা মাটিতে পড়ে আছে, আর তক্তপোশের ওপর কিছু শিশি বোতল।

বংশী বলল, "তুমি একটু দাঁড়াবে। আমি একটা আলো জুটিয়ে আনি।"

"আলো? পাবে কোথায়?"

"পেয়ে যাব। ওদিকে কামাখ্যাদের বাড়ি। না হলে কিশোরদের বাড়ি আছে। দাঁড়াও একটু।" বংশী বাইরে যাবার জন্যে দরজার দিকে পা বাড়াল। "ভয় করবে?"

শিশির অবাক হল। "ভয়! কেন?"

"না এমনি বলছিলাম। তুমি না হয় বাইরে এসে দাঁড়াও। আমি আসছি।"

বংশী চলে গেল।

শিশির বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। রাস্তা দিয়ে কেউ চলে যাচ্ছিল। রেল-ফটকের দিকে মালগাড়ি যাবার শব্দ। এই শব্দটা শিশির বেশ চিনে ফেলেছে।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে শিশির ভাবছিল। কোথাকার জল কোথায় যে গড়িয়ে যাচ্ছে কে জানে। সবই কেমন ধাঁধা। আংটি থেকে শুরু করে যা-যা ঘটছে তার কিছুরই মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকী, এই সিংহীবাবুও এক ধাঁধা। সকালে এই বাড়িতে এসে শিশিরের এক রকম মনে হল, আর সন্ধেবেলায় এসে অন্য রকম হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এ-বাড়িতে আসা যাওয়া আছে। নয়তো তালা আলগাভাবে লাগানো থাকবে কেন? কেন ঘরের মধ্যে গুমোট, ভ্যাপসা গন্ধ থাকবে না?

শিশির আবার আকাশের দিকে তাকাল। তারা ফুটেছে। বাতাসে বাদলার ভাব থাকলেও কেমন এক গন্ধ। হয়তো শরতের। কে জানে ভাদ্র মাস শেষ হয়ে গেল কিনা!

বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে দাঁড়াল শিশির। এইভাবে একা-একা অন্ধকার নির্জন বাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভাল লাগছিল না। ভয়ের কোনও ব্যাপার নেই,

কিন্তু অস্বস্তি কেমন করে তাড়াবে।

আকাশের দিকে আবার একবার তাকাল শিশির। দেখতে দেখতে আরও কত তারা ফুটে উঠল।

আর সঙ্গে সঙ্গে শিশির কীসের শব্দ শুনে মুখ ফেরাল। আশেপাশে কেউ নেই। তা হলে শব্দ হল কীসের? গাছপালার?

শিশির কান পাতল। নজর করল চারপাশ।

বাড়ির পেছন দিকেই শব্দ হয়েছে। কীসের শব্দ? কেউ কি রয়েছে পেছনে? নাকি কেউ পেছন দিক দিয়ে ঢুকছে বাড়িতে। শিশির এ-বাড়ির কিছুই জানে না। পেছন দিয়ে কি ঢোকার রাস্তা আছে? রাস্তা যদি নাও থাকে, পাঁচিল টপকে নিশ্চয় ঢোকা যায়।

কিন্তু কে এসেছে পেছনে? সিংহীবাবু?

শিশির রাস্তার দিকে তাকাল। বংশী আসছে না কেন?

চঞ্চল হয়ে শিশির বাড়ির ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাড়িটার পেছন দিক দেখতে পাচ্ছে না। না পেলেও সে জানে, বাড়ির পেছন দিকে মাঠ, মাঠের পর মস্ত পুকুর। কোনও লোক যদি মাঠ আর পুকুরপাড় দিয়ে আসে কিংবা চলে যায়—এখান থেকে দেখা বা বোঝার উপায় নেই। এই অন্ধকারে তো নয়ই।

আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর রাস্তায় আলো পড়ল। কেউ আসছে। টর্চ ফেলছে বারবার। বংশী।

বংশী আরও কাছে এল।

"তুমি রাস্তায়?" বংশী বলল।

"হ্যাঁ। শোনো, বাড়ির পেছন দিকে আমি একটা শব্দ পেয়েছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে টর্চ ফেলল বংশী। গাছপালা, পাঁচিলে আলো পড়ল।

"কেমন শব্দ?" বংশী জিজ্ঞেস করল।

"নড়াচড়ার মতন...।"

"চলো, দেখি।"

ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকে গাছপালার পাশ দিয়ে পেছনে যাবার চেষ্টা বৃথা হল। পথ নেই। কম্পাউন্ড ওয়ালের সঙ্গে বাড়ির দু-দিকেই ইটের গাঁথনি তোলা। গাঁথনির মাথায় কাচের টুকরো। যাবার রাস্তা বন্ধ। তার মানে, সরাসরি কেউ বাগান দিয়ে পেছনে যেতে পারবে না।

বংশী টর্চ ফেলে ইটের গাঁথনি দেখতে দেখতে বলল, "অদ্ভুত। এ-রকম আর দেখা যায় না। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ?"

"কী?"

"এই গাঁথনি কিন্তু খুব পুরনো নয়।"

"বুঝলাম না।"

"গাঁথনি নতুন। একেবারে দু-চার দিনের মধ্যে নয়, কিন্তু, কয়েক মাস আগেকারও নয়, ইচ্ছে করেই এটা করেছে।"

"কেন?"

"যে কোনও লোক হুট করে ঢুকে পেছন দিকে যেতে পারবে না।"

শিশির চুপ করে থাকল।

বংশী বলল, "চলো, ভেতরে যাই। ব্যাপারটা দেখে আসি।"

সিঁড়ি দিয়ে আবার বারান্দায় উঠে দুজনে ঘরে ঢুকল।

বংশী আলো ফেলল ঘরের চারপাশে। ফাঁকা তক্তপোশ, টিনের চেয়ার, পুরনো কাগজ ছাড়াও যা চোখে পড়ল তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ঘরের একপাশে একটা কোদাল আর কুড়ুল রাখা আছে।

ঘরের ভেতর দিকের জানলা বন্ধ। ভেতর আর পাশের ঘরের দরজাও বন্ধ। ধাক্কা দিল বংশী। কোনওটাই খুলল না।

জানলা দেখতে-দেখতে বংশী বলল, "ব্যাপার দেখেছ। এদিকে ছিটকিনি, জানলা তো খুলে যাওয়া উচিত। তবু খুলছে না। তার মানে ও-পাশ থেকেও বন্ধ করা আছে। দরজারও সেই অবস্থা। ভেতরের, পাশের কোনও দরজাই খোলা যাবে না।"

"তা হলে?"

"উপায় নেই। ফিরে যেতে হবে।"

কথা বলল না শিশির।

বংশী আরও বার-দুই দরজায় লাথি মারল। তারপর বলল, "আজ আর কিছু করা যাবে না। কাল দেখব।"

ঘরের বাইরে এল বংশী। দরজা বন্ধ করল। "তালাটা ঝুলিয়ে দিয়ে যাই।"

কোনও রকমে তালাটা কড়ায় ঝুলিয়ে বংশী বলল, "ব্যাপারটা বেআইনি হল। তাই না?"

"বেআইনি?"

"লোকের বাড়ি ঢুকে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম, বেআইনি হল না? সিংহীবাবু থানায় ডায়েরি লেখাতে পারেন।"

শিশির প্রথমটায় খেয়াল করেনি। হঠাৎ তার মাথায় এল, আচ্ছা—সিংহীবাবু কি স্রেফ ইচ্ছে করেই তালাটা খুলে রেখেছিল। শিশিরদের ফাঁসাবার জন্যে।

"বংশী?"

"বলো।"

"এটা ফাঁদ নয় তো।...আমাদের ঘরে ঢোকাবার জন্যে তালা খুলে রাখা হয়েছিল।"

বংশীর খেয়াল হল কথাটা। ভাবল। বলল, "হতে পারে ফাঁদ। কিন্তু আমরা যে এসেছিলাম তার প্রমাণ কোথায়?"

বংশীর পুরো কথা শেষ হবার আগেই রাস্তায় কার গলা পাওয়া গেল।

তাকাল বংশী। আলো ফেলল।

"ননীকাকা।"

শিশির তাকাল। মুখ দেখল।

ননীবাবু কাছাকাছি এলেন। দাঁড়ালেন। "কে, বংশী না?"

"হ্যাঁ।"

"এদিকে কোথায়? ওটি কে! মুখ দেখেছি মনে হচ্ছে।"

"শশধরবাবুর আত্মীয়। কলকাতা থেকে এসেছে। আসে মাঝে-মাঝে।"

"তাই চেনা-চেনা মনে হল। তা কোথায় গিয়েছিলে এদিকে?"

"এই এসেছিলাম। আচ্ছা, আপনি সিংহীবাবুকে দেখেছেন?"

"হ্যাঁ। কবে যেন দেখলাম। পরশু না তরশু। দেখেছি।"

বংশী শিশিরের মুখের দিকে তাকাল।

॥ চোদ্দো ॥

বংশীর দোকানে বসে শিশিরকে সব কথাই খুলে বলতে হল। না বলে উপায় ছিল না। এখানে বসে যদি খোঁজ খবর করতেই হয় শিশিরকে, বংশী ছাড়া উপায় নেই। শিশির একা কতটুকু করতে পারে। আর বাবুদাকেও তো সে হাতের কাছে পাচ্ছে না।

কথা শেষ করে শিশির বংশীর দিকে তাকিয়ে থাকল।

বংশীর চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। আকাশ থেকে পড়েছে যেন। কথা বলতে পারছিল না বংশী।

এমন সময় একজন ঢুকল দোকানে। হুঁশ হল বংশীর।

চেনা খদ্দের। গায়েমাখা সাবান, কনডেন্সড মিল্কের টিন, টুকটাক আরও কিছু কিনে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

দোকান ফাঁকা। বংশী বেশ বড় ডোজের টিপ নিল নস্যির। তার চোখ ছলছল করে উঠল। হাঁচল বার-দুই। রুমালে নাক পরিষ্কার করল। তারপর বলল, "তুমি তো দারুণ ফ্যাচাঙে পড়ে গেছ।"

শিশির চুপ করে থাকল।

বংশী আবার একবার নাক মুছে নিল। বলল, "দাঁড়াও, চা বলে আসি। খাবে কিছু? নিমকি? সেউভাজা?"

শিশির কিছু বলার আগেই বংশী দোকান ছেড়ে চলে গেল!

সামান্য পরে দোকানে ফিরে এসে বংশী বলল, "তুমি ঠিকই ধরেছ। তোমায় এখানে প্যাঁচ মেরে টেনে আনা হয়েছে।"

"তা তো বুঝেছি! কিন্তু কেন?" শিশির বলল।

"মতলব আছে। আংটিটা হাতাবার জন্য হতে পারে।"

"কিন্তু কেমন করে জানবে যে আংটিটা আমি আনব! কলকাতা থেকে না-ও তো আনতে পারি!"

বংশী ভাবল। "আংটি তুমি আনোনি?"

"এনেছি।"

"বেশ করেছ।...এখন কী করা যায় বলো?"

"বুঝতে পারছি না। তুমিই বলো।"

"আমি বলব!" বংশী একটু মাথা চুলকে নিল। পরে বলল, "আমি বলব, প্রথমে আমাদের একবার থানায় যাওয়া দরকার। মিথ্যে টেলিগ্রামের ব্যাপারটা জানিয়ে আসা উচিত।"

"তাতে লাভ হবে?"

"হতেও পারে। বলেছি না, আমার চেনা লোক আছে থানায়।"

"তারপর?"

"সিংহীমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করা।"

"আমি যে-লোকটার কথা বলছি সেই লোক আর সিংহীবাবু যদি এক লোক না হয়?"

"না হলে আর কী করা যাবে! তবে, তুমি যে-সময়ের কথা বলছ, মাসখানেকের বেশি হবে, সিংহীবাবুকে আমি দেখিনি। আমার মনে হয়, ভদ্রলোক এখানে ছিলেন না কিছুদিন। আবার ফিরে এসেছেন। সে খোঁজ আমি করে নেব। আমার হাতে ছেড়ে দাও।"

শিশির কথা বলল না।

বংশী নিজে থেকেই বলল, "সিংহীবাবু বেশ খানিকটা অন্যরকম লোক। আমরা তাকে পাগলা-গোছের ভাবতাম। এখন দেখতে হবে, কেমন পাগল।"

এমন সময় চা এল। চায়ের সঙ্গে শালপাতার ঠোঙায় করে টাটকা সেউভাজা দিয়ে গেল ময়রার দোকানের ছেলেটা।

চা খেতে খেতে বংশী বলল, "এই জায়গাটা বরাবর ভালই ছিল। আজকাল খানিকটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। চুরি-ডাকাতি হচ্ছে। তা ছাড়া, আমরা শুনেছি, কিছু খারাপ লোক আড্ডাও গেড়েছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কিছুদিন আগে নদীর কাছে জঙ্গলে একটা খুনও হয়েছে।

"খুন?"

"হ্যাঁ। যে খুন হয়েছিল সে এখানকার লোকই নয়। কে তাকে নিয়ে এল, কেন খুন করল ভগবানই জানেন।"

শিশির চা আর সেউভাজা খেতে লাগল।

বংশী বলল, "তুমি ঘাবড়ে যেয়ো না। আমি পাত্তা লাগাচ্ছি। চোখকান খুলে রাখলে কোনও একটা হদিস পেয়ে যাব। বুঝলে?"

শিশির বলার মতন কিছুই পেল না, চুপ করে থাকল।

চা খাওয়া শেষ হল।

আরও একটু বসে থেকে শিশির উঠব উঠব করছে, বংশী বলল, "বাড়ি গিয়ে করবে কী? বোসো।"

"রাত হলে পিসিমা ভাববে।"

"না, রাত করব না। তোমার কাছে আলো নেই। আমি তোমায় পৌঁছে দেব।"

"কী দরকার..."

দোকানে লোক ঢুকল আবার। মাঝবয়েসি ভদ্রলোক।

"বংশী?"

"ফটিকদা?"

"আমার সেই আয়ুর্বেদ মাজন আনিয়েছ?"

"কাল দেব।"

"তোমার কাল যে কবে শেষ হবে! দাও, চা দাও দুশো। আর একটা তেল দাও। নারকেল তেল। ছোট টিন। কই, ডিবেটা কোথায়?"

বংশী নস্যির ডিবে এগিয়ে দিয়ে চা ওজন করতে লাগল।

ফটিকদা নামের ভদ্রলোক নস্যি নাকে গুঁজে শিশিরকে দেখছিলেন। "ইনি কে?"

"আমার বন্ধু। শশধরবাবুর আত্মীয়।"

"ও! এখানে থাকেন?"

"না। কলকাতায় থাকে। বেড়াতে এসেছে।"

"ভাল।"

"ফটিকদা, আপনি আমাদের সিংহীবাবুকে দেখেছেন?"

"সিংহী! কোন সিংহী হে! এখানে আট-দশটা সিংহী। মোহন সিং, ভগীরথ সিং, দ্বারকা সিং... সিংয়ের রাজত্ব।" ফটিকবাবু নিজের রসিকতায় হাসলেন।

বংশী বলল, "না না, ওই রেল-ফটকের কাছে যিনি থাকেন। সিংহীমশাই। পাগলা-পাগলা মানুষ।"

"ও! প্রসন্নবাবুর কথা বলছ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেখব না কেন?"

"আমি ভদ্রলোককে অনেকদিন দেখিনি। একটা দরকার ছিল।"

"উনি তো ছিলেন না এখানে।"

"তাই হবে। কোথায় গিয়েছিলেন হঠাৎ?"

"কলকাতায়।"

"ফিরলেন কবে?"

"ক-বে? এই তো সেদিন। দিন-চারেক আগে বোধ হয়।"

বংশী একবার শিশিরের দিকে তাকাল। চোখে-চোখে কথা বলার মতন দৃষ্টি।

চায়ের প্যাকেট বেঁধে দিয়ে বংশী নারকেল তেলের টিন পেড়ে নিল।

ফটিকবাবু পয়সা মিটিয়ে দিয়ে চলে যাবেন বংশী হঠাৎ বলল, "ফটিকদা, সিংহীমশাই কোথাকার লোক?"

দাঁড়ালেন ফটিকবাবু। "তা জানি না। তবে এদিককার নয়।" তারপর চলে গেলেন।

ফটিকবাবু চলে যেতেই শিশির বলল, "ভদ্রলোক কে?"

"গুডস ক্লার্ক। রেল-ফটকের কাছে বাঁ পাশে যে রেল-কোয়ার্টারস আছে, সেখানে থাকেন। সিংহীবাবুর প্রতিবেশী একরকম।"

শিশির তাকিয়ে থাকল।

বংশী বলল, "এবার কী মনে হচ্ছে! মিলে যাচ্ছে না খানিকটা। সিংহীবাবু

কলকাতায় গিয়েছিলেন, ফিরেও এসেছেন দু-তিন দিন আগে। তারপর তোমার নামে টেলিগ্রাম...।"

শিশিরও অবাক হচ্ছিল। সন্দেহ বাড়ছে বইকী।

বংশী বলল, "আমার ভাই বিশ্বাস, সিংহীবাবুর বাড়িতে কিছু একটা হয়।"

"হয়? কী হয়?"

"তা বলতে পারব না। কেমন একটা লুকোচুরির ব্যাপার দেখলে না? বাড়ির বাইরে একরকম, ভেতরে একরকম! ভদ্রলোক করেন কী!"

"তুমি তো বলছিলে ওষুধপত্র দেন।"

"হ্যাঁ, কিন্তু উনি তো ডাক্তার কবিরাজ নন। টোটকা ছাড়েন।"

"আরও কী গুণ আছে বলছিলে—!"

"শুনেছি।...তা কাল আমরা প্রথমেই একবার সিংহীবাবুকে ধরব। কী বলো?"

"তুমি যা বলবে!"

"বেশ, কাল সকালে সিংহীবাবুর বাড়ি যাব।"

আরও খানিকটা বসে উঠে পড়ল বংশী। দোকান বন্ধ করবে।

শিশিরও উঠে দাঁড়াল।

"এখানে এক ধুরন্ধর আছে," বংশী বলল, "চোর-ছ্যাঁচড়ার খবরাখবর রাখে। নাম মহাবীর।"

শিশির কিছু বুঝল না।

বাইরে এসে দোকানে তালা দিতে দিতে বংশী বলল, "তার কাছে প্রয়াগের খোঁজ নেব। আমি তো তোমার দু নম্বর লোকটাকে ধরতে পারছি না।"

দুজনে এবার হাঁটতে লাগল। স্টেশনের দিক দিয়েই যাবে।

বাজারের রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে বংশী বলল, "আংটিটা আমায় একবার দেখিয়ো তো!"

ঘাড় নাড়ল শিশির। দেখাবে।

"আচ্ছা—" বংশী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। "কাল যদি তুমি আংটিটা পরে সিংহীর বাড়ি যাও কেমন হয়!"

"আংটি পরে?"

"তোমার হাতে আংটি দেখলে ভদ্রলোকের চোখমুখের ভাব কেমন হয় দেখা যেত। ঠিক কি না?"

শিশির ভাবল। বলল, "মন্দ হয় না। তবে ওই আংটি পিসিমা আমায় পরতে দেবে না।"

"লুকিয়ে পরবে।"

"উপায় নেই। আংটি এখন পিসিমার জিম্মায়।"

বংশী হতাশার শব্দ করল।

আবার হাঁটতে লাগল দুজনে।

খানিকটা এগিয়ে এসে বংশী বলল, "কিশোরদের বাড়িতে টর্চটা ফেরত দিয়ে

আমি চলে যাব। তোমাকেও এগিয়ে দেওয়া হবে।”

শিশিরও কী একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ শুনল অন্ধকারে একটা সাইকেল হুড়মুড় করে তার ঘাড়ের কাছে চলে এসেছে। সরে যাবার জন্যে লাফ মারার আগেই শিশিরের ঠিক ঘাড়ের কাছে কী একটা লাগল। বেশ জোরে। যন্ত্রণার শব্দ করল সে। সঙ্গে সঙ্গে বংশী দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মারল সাইকেলঅলাকে। লোকটা রাস্তায় ছিটকে পড়ল। সাইকেল-সমেত।

॥ পনেরো ॥

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

বংশী সাইকেলঅলাকে ধরেছিল ঠিকই, কিন্তু ধরা পড়ার পর সে যেভাবে কাকুতি-মিনতি শুরু করল দেহাতি ভাষায় তাতে বংশী তাকে আলগাই দিল। আর সেই ফাঁকে লোকটা পালাল।

বংশী অবাক। লোকটা পালাল কেন? সাইকেল ফেলে রেখেই পড়িমরি ছুট মারল! আশ্চর্য!

শিশির ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে।

“লেগেছে তোমার?” বংশী জিজ্ঞেস করল।

“না, একটু। ঘাড়ের কাছে। বেটা আনাড়ি। নতুন শিখেছে বোধ হয়।”

বংশী টর্চ ফেলে তখনও লোকটার পালাবার পথ দেখছে। সোজা রাস্তায় ছোটেনি; ডান দিকে ছুটেছে। মানে, উধাও হয়ে গিয়েছে অন্ধকারে। ওর পেছনে তাড়া করা বৃথা।

শিশির বলল, “আলো নেই, ঘণ্টি নেই, লটপট করে সাইকেল চালায়—ভূত একেবারে। নাও, চলো।”

বংশী বলল, “হ্যাঁ, চলো। বেটা সাইকেল ফেলে পালাল।” বলে টর্চ ফেলে সাইকেলটা দেখছিল।

“ভয়ে পালিয়েছে। পরে এসে আবার নিয়ে যাবে। আর ওই তো সাইকেলের দশা।”

বংশী শেষবারের মতন সাইকেলের ওপর আলো ফেলে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চোখে পড়ল, হাত কয়েক তফাতে কিছু একটা পড়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল জিনিসটা। তারপরই বুকের মধ্যে ধক করে উঠল।

“সর্বনাশ! দেখেছ!” বংশী শিউরে উঠল।

শিশির দেখল। হাতখানেক লম্বা একটা লোহার রড। রডের এক মাথায় লোহার ছোট চাকা। চাকার দাঁত রয়েছে।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝল না শিশির, তবে আন্দাজ করতে পারল, ওটা কোনও অস্ত্র।

বংশী জিনিসটার ওজন দেখল হাতে করে। বলল, “বেশ ভারী। দ্যাখো।”

শিশির হাতে নিয়ে দেখল।

বংশী বলল, "আমি বুঝতে পেরেছি। বেটার হাতে এই মারাত্মক জিনিসটা ছিল। তোমার মাথায় মারত। মেরে পালাত। খুব জোর বেঁচে গিয়েছ।"

শিশির এবার ভয় পেল। বংশী যা বলছে তা হতেই পারে। অন্ধকারে কেউ যদি সাইকেল চেপে এসে আচমকা তার মাথায় ওই অস্ত্র দিয়ে মারত, কোনও সন্দেহ নেই, জোর জখম হত শিশির। মাথার খুলিই হয়তো ফেটে যেত।

বোবা হয়ে গেল শিশির।

বংশী বলল, "বেটা আমায় বোকা বানিয়ে পালাল। ইস্, আগে এটা যদি দেখতে পেতাম!" বলে আফসোসের শব্দ করল।

"লোকটা কে?" শিশির বলল।

"বুঝতে পারলাম না। চেনা বলে মনে হল না।"

"এখানকার লোক?"

"হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। এখানে অনেক নতুন লোকের আমদানি হয়েছে। তাদের কেউ হবে। আমার দুঃখ হচ্ছে বেটাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলাম।"

শিশিরেরও আফসোস হচ্ছিল।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই। বংশী একটু ভাবল। তারপর বলল, "চলো, সাইকেলটাকে কোথাও জমা দিয়ে তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিই।"

বংশী রাস্তা থেকে সাইকেল কুড়িয়ে নিল। নিয়ে বলল, "এই সাইকেলটা কালকে আমি থানায় জমা দেব। আর এটাও।" বলে রডটা দেখাল।

ধনিয়ার দোকানে সাইকেল জমা দিয়ে বংশী আর শিশির হাঁটতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে শিশির বলল, "কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে যাবে আমি তো বুঝতে পারছি না, বংশী।"

বংশীও ভাবছিল। বলল, "কথাটা ঠিকই। আমার এখন মনে হচ্ছে, তোমার জীবনটাও তেমন নিরাপদ নয়। এই সাংঘাতিক জিনিস দিয়ে সত্যিই যদি মাথায় মারত, কী হত বলতে পারো?"

"মরেই যেতাম।"

"ঠাট্টা নয়, মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারত। যাক, তোমায় একলা ছেড়ে না দিয়ে আমি ভালই করেছি।"

শিশির স্বীকার করল, সে একলা থাকলে সাইকেলঅলা তাকে আরও সুবিধে-মতন পেয়ে যেত।

"তুমি আর একলা সন্ধেবেলায় ঘোরাফেরা কোরো না," বংশী সাবধান করে দিল।

"বাড়িতে বসে থাকব?"

"দিনের বেলায় ঘোরাঘুরি কোরো, তবে রাত্তিরে একলা নয়।"

শিশিরের বেশ খারাপই লাগছিল। সে কোনওদিনই গোবেচারি, ভিতু, ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে ছিল না। হাত-পা সেও চালাতে জানে। দু-পাঁচটা চড়-ঘুসি ঝাড়ারও ক্ষমতা রাখে। কিন্তু এখন সে কেমন ভিতু হয়ে গিয়েছে। নিজের ওপরই রাগ হচ্ছিল

শিশিরের, ঘেন্না ধরে যাচ্ছিল। না, এভাবে চলতে পারে না। সাহসী হতে হবে তাকে। তবে, আজ যেমন হল, পেছন থেকে যদি কেউ আচমকা আক্রমণ করে, শিশির কী করবে?

রেললাইনের পাশের রাস্তা ধরে হাঁটছিল দুজনে। রেলের সিগন্যালের আলো দেখা যাচ্ছে। বাতাস ঠাণ্ডা। মাঠ দিয়ে আলো দুলিয়ে কারা চলে যাচ্ছে।

শিশিরের মনে হল, বাবুদাকে এখন তার দরকার। বংশী রয়েছে, তবু বাবুদাকে আনানো উচিত। কালই চিঠি লিখবে বাবুদাকে।

বংশীকে বাবুদার কথা বলল শিশির।

সব শুনে বংশী বলল, "ঠিক আছে। আনাও। আমাদেরও দলে ভারী হওয়া দরকার।"

আরও খানিকটা এগিয়ে বংশী বলল, "কাল কিন্তু থানায় যেতে হবে প্রথমে। থানায় গিয়ে ডায়েরি লেখাব। বুঝলে?"

"আজকের ব্যাপারটা লেখাবে?"

"নিশ্চয়। আমাদের হাতে এতবড় প্রমাণ!" বলে বংশী সেই লোহার অস্ত্রটা দেখাল।

শিশির আর কিছু বলল না।

শিশিরকে বাড়ির ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বংশী চলে গেল।

ফটক খুলে ভেতরে ঢুকল শিশির। চোখে পড়ল বারান্দায় পিসেমশাই বসে আছেন। পাশে অন্য একজন। দুজনে চেয়ারে বসে। মাঝখানে বেতের টেবিল।

সিঁড়ি দিয়ে শিশির বারান্দায় উঠল।

ডাকলেন শশধর।

দাঁড়িয়ে পড়ে শিশির তাকাল। আবার দেখল ভদ্রলোককে।

শশধর বললেন, "ইনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। এখানেই থাকেন। কাছাকাছি। এঁর নাম প্রসন্নকুমার সিংহ।"

শিশিরের পা যেন আটকে গেল। এই সেই সিংহীবাবু। না, এই ভদ্রলোক মোটেই গড়ের মাঠে দেখা সেই লোক নয়। শিশিরের চোখের পাতা পড়ছিল না।

প্রসন্নবাবু শিশিরকে দেখছিলেন। তেমন কোনও আগ্রহ যেন নেই।

শিশিরও লক্ষ করছিল সিংহীবাবুকে। একেবারে ছেলে-ছোকরা নন ভদ্রলোক। তবে তেমন একটা বয়স্কও নন। বছর-চল্লিশের মতন। রোগা মুখ। চোখ দুটি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকার মতন দেখায়। মাথায় অল্প চুল।

প্রসন্ন বললেন, "আপনি কি আমার বাড়ির দিকে গিয়েছিলেন?"

শিশির অপ্রস্তুত হয়ে গেল। পিসেমশাইয়ের দিকে তাকাল একবার। সত্যি কথা বলবে, না মিথ্যে কথাই বলবে? ইতস্তত করতে লাগল শিশির।

শশধর বললেন, "আরে ওকে আবার আপনি-টাপনি কী! তুমি বলুন।"

শিশির বলল, "আপনার খোঁজে ঠিক নয়...। কে বলল?"

"আমায় তুমি কোথাও দেখেছ?"

প্রশ্নটা একেবারে সরাসরি। শিশিরকে টলিয়ে দেবার চেষ্টা নাকি? শিশির মাথা নাড়ল। "না, কোথাও দেখিনি।"

"তা হলে? আমার খোঁজ করছিলে কেন?"

শিশির চুপ। কোনও জবাবই মুখে আসছিল না।

প্রসন্ন গলায় অদ্ভুত ধরনের শব্দ করলেন।

শশধর বললেন, "আমি একটু আসছি। বোসো শিশির।"

উঠে গেলেন শশধর। কেন গেলেন বোঝা গেল না। শিশির বসল না। দাঁড়িয়ে থাকল।

"তুমি আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলে," প্রসন্ন বললেন, "তোমার সঙ্গে ও ছেলেটা ছিল—ওই যে যার দোকান আছে বাজারে।"

শিশির বুঝল, কথা এড়িয়ে লাভ নেই। সিংহীবাবু পাগলই হোন আর যাই হোন—চোখ খুলে রেখেছেন। হয়তো কানও।

"আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম," শিশির বলল। "সকালের দিকে গিয়েছিলাম। কাউকে দেখিনি। তাই সন্ধেবেলাতেও গিয়েছিলাম।"

"কেন?"

একটু ভাবল শিশির। "আমি একজনকে খুঁজছি।"

"কাকে?"

"নাম জানি না।"

"বাঃ, নাম জান না, আন্দাজে আমার বাড়ি চলে গেলে? কেন?"

শিশির রেগে গেল। কেন রাগল সে জানে না। বলল, " তাতে অপরাধ কী হয়েছে?"

"অ-পরাধ!...তোমরা আমার বাড়ির তালা ভেঙেছ।" প্রসন্ন প্রায় ধমকে উঠলেন।

"আমরা ভাঙিনি। তালা খোলাই ছিল। দরজায় ঝুলছিল।"

প্রসন্নর চোখ ছোট হল। "আমি যদি থানায় গিয়ে জানাই তোমরা আমার বাড়িতে তালা ভেঙে ঢুকেছ! তা হলে?"

"যান আপনি থানায়। আমরাও কাল থানায় যাচ্ছি।"

প্রসন্ন থেমে গেলেন। নজর করে দেখলেন শিশিরকে। "তোমরাও থানায় যাবে? কেন?"

"থানায় গিয়ে বলব, কেন!"

প্রসন্ন এবার গলা নরম করলেন, "কেন? আমায় বলতে আপত্তি আছে?"

শিশির বলল, "আপনাকে বলে লাভ নেই।"

"ও, আচ্ছা!"

প্রসন্ন উঠে দাঁড়ালেন।

শিশির দরজা দিকে তাকাল। পিসেমশাই আসছেন না।

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "তোমার পিসেমশাইকে বোলো, আমি পরে আবার আসব।" বলে সিঁড়ি নামতে নামতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘাড় ফেরালেন। তারপর বললেন, "আমি বাড়িতে থাকব কাল। দরকার থাকলে এসো। সকালের দিকে পাবে।"

প্রসন্ন বাগান দিয়ে চলে গেলেন ফটক পর্যন্ত। ফটক খুললেন।

শিশির অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

॥ ষোলো ॥

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার পরই শিশির ঠিক করে নিল, সিংহীবাবুকে সে এড়িয়ে যাবে না। ভদ্রলোক ভাল মন্দ যেমনই হন, অন্যায় করেছেন। বাড়ি বয়ে এসে শিশিরকে ধমকে গিয়েছেন। হ্যাঁ, ওভাবে কথাবার্তা বললে অন্য আর কী ভাবা যেতে পারে! থানায় যাবেন বলে শাসালেন। কেন, থানায় যাবার মতন কী ঘটেছে? আর তুমি যদি থানায় যাও, আমিই বা কেন পারব না? অবশ্য এটা ঠিক, শিশিরের থানায় যাবার সঙ্গে সিংহীবাবুর কোনও সম্পর্ক নেই। মানে, থানায় গিয়ে সে যদি ডায়েরি লেখায়—সিংহীবাবুকে কোনও ভাবেই জড়ানো যাবে না। কিন্তু সিংহীবাবু যদি সত্যিই থানার খাতায় ডায়েরি লেখান, শিশির আর বংশীকে জড়িয়ে ফেলতে পারেন।

একটা ব্যাপার দেখে শিশিরের কেমন অবাক লাগছে। কাল যখন সিংহীবাবুর ধমকানি সামলাতে শিশিরও পালটা থানায় যাবার কথা বলল, ভদ্রলোক কেমন গলা নামিয়ে নিলেন। কেন? আর ঠিক কী কারণে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শিশিরকে ওঁর বাড়ি যাবার জন্যে বলে গেলেন? এখানেই ধোঁকা লাগছে।

শিশির আজ তিনটে কাজই সারবে। এক, সে সিংহীবাবুর বাড়ি যাবে সকালেই। দুই, বংশীর সঙ্গে থানায় যাবে। তিন, বাবুদাকে দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে এখানে চলে আসতে বলবে। বিকেলের পর একা-একা ঘোরাফেরা করা শিশিরের আর উচিত নয়।

সকালে চা-জলখাবার খাবার সময় পিসেমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলল শিশির।

"ভদ্রলোক যেন কেমন!" শিশির বলল।

শশধর বললেন, "আমার সঙ্গে আলাপ ছিল না। রাস্তাঘাটে দেখেছি। শুনেছি, ফটকের কাছে থাকেন। পাগলা ধরনের।"

"বাইরে পাগলা!"

"কেন!"

শিশির কোনও জবাব দিল না।

শশধর বললেন, "উনি এসেছিলেন কেন?"

এবারে শিশির ঠিকমতন জবাব খুঁজে পেল না। বলল, "আমরা ওঁর বাড়িতে দেখা

করতে গিয়ে দেখা পাইনি, তাই।"

"তুমি কেন গিয়েছিলে দেখা করতে?" শশধর জিজ্ঞেস করলেন।

"এমনি।" শিশির কথা ভাঙল না। উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।

সিংহীবাবুর বাড়ি ঢুকতেই শিশির ভদ্রলোককে দেখতে পেল। বাইরে বেতের মোড়া নিয়ে বসে আছেন।

ভয় নয়, কেমন এক অস্বস্তি নিয়ে এগিয়ে গেল শিশির।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে শিশির কিছু বলতে যাচ্ছিল, প্রসন্ন বললেন, "এসেছ? এসো।"

অভ্যর্থনা দেখে শিশিরের মনে হল, মনে-মনে সিংহীমশাই যেন জানতেন, শিশির আসবে।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই শিশির বলল, "ডেকেছিলেন কেন?"

"ডেকেছিলাম! কই, আমি ডাকিনি।"

শিশির অবাক। মাথা গরম হয়ে উঠল। "আপনি আসতে বলেননি?"

"বলেছিলাম দরকার থাকলে সকালে আসতে পারো।"

মুখ লাল হয়ে উঠল শিশিরের। আচ্ছা মানুষ তো! রাগের মাথায় শিশির বলল, "আপনার সঙ্গে আমার কী দরকার!"

"দরকার যদি না থাকে তবে কাল সন্ধেবেলায় চোরের মতন এসেছিলে কেন?"

শিশির বুঝতে পারছিল, মানুষটি প্যাঁচোয়া। মচকাবার লোক নন। সে যে কী করবে বুঝতে পারল না। সামান্য পরে বলল, "চোরের মতন আসিনি। আপনি ভুল বুঝছেন। কাল সকালেও আমি এসেছিলাম। কাউকে দেখতে পাইনি। বিকেলেও কাউকে দেখতে না পেয়ে..."

"বুঝেছি। আর বলতে হবে না। তা তুমি যখন সকাল-বিকেল আমার বাড়িতে এসে ধরনা মারছ, তখন বাপু দরকারটা তো তোমার! তাই না?"

কথাটা ঠিকই। তবু রাগ পড়ল না শিশিরের। বলল, "দরকার আর নেই। একজনের খোঁজ করছিলাম বলে এসেছিলাম। দরকার ফুরিয়েছে।" বলে শিশির রাগের মাথায় চলেই আসছিল।

প্রসন্নবাবু ডাকলেন, "আরে আরে, রাগ করছ কেন! শোনো।"

ঘুরে দাঁড়াল শিশির।

"তোমরা—কলকাতার ছেলেছোকরারা বড় বদমেজাজি হও," প্রসন্ন বললেন, "রাগের কথা আমি কিছু বলিনি। বলেছি? এসো, ভেতরে এসো। রোদে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ কথা বলবে!"

শিশিরের রাগ না পড়লেও সিংহীবাবুর কথাবার্তার ধরন অন্য রকম লাগল কানে। তামাশা করছেন নাকি?

"চলো, ভেতরে গিয়ে বসি।" প্রসন্নবাবু আবার বললেন, মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ইতস্তত করল শিশির। তারপর বারান্দায় উঠল।

কালকের সেই ঘর। কাল ঘরের ভেতর দিকের দরজা ও-পাশ দিয়ে বন্ধ ছিল। আজ খোলা রয়েছে।

প্রসন্ন ঘরের ভেতর দিয়ে পেছনের বারান্দায় এলেন। একটা বেঞ্চি পাতা রয়েছে একপাশে। ক্যাম্বিসের হেলানো চেয়ারও চোখে পড়ল। ভেতরের দিকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অল্প-কিছু গাছপালা। ছায়া। ছোট কুয়ো। দেহাতি এক বুড়ো কাজকর্ম করছিল।

"বোসো।" বসতে বললেন প্রসন্ন।

শিশির বসল। বসে বললে, "বাইরে থেকে মনে হয় এ-বাড়িতে কেউ থাকে না।"

প্রসন্ন বললেন, "বাইরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। ভেতরে থাকি। যাওয়া-আসাও বেশির ভাগ সময় ভেতর দিয়ে। ওই যে দেখছ।"

শিশির দেখল। পেছনের পাঁচিলের দিকে ছোট একটা ফটক। মানুষটি সত্যিই অদ্ভুত। বাড়ির সামনের দিকে জঙ্গল রেখে ভেতরের দিকে দিব্যি থাকেন।

"এবার বলো, তুমি আমার খোঁজে কেন এসেছিলে!" প্রসন্ন বললেন।

শিশির দু মুহূর্ত ভেবে বলল, "আমি একজনকে খুঁজতে এসেছিলাম।"

"সে কে?"

"তাকে আমি কলকাতায় দেখেছিলাম। নাম জানি না।"

"আমার সঙ্গে তার মিল আছে?"

"না, না। মিল নেই। তবে মুখে বর্ণনা শুনলে খানিকটা আপনার মতন মনে হয়। বংশী আমায় বলেছিল, আপনার সঙ্গে দেখা করতে। কোনও মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে বলেনি।"

"বুঝেছি।"

শিশিরের রাগ পড়ে আসছিল। "আমরা কোনও মতলব নিয়ে আপনার বাড়িতে আসিনি। কিন্তু বাড়ির বাইরের চেহারা যা, তাতে অবাক হয়েছি। আর আপনার তালা আমরা ভাঙিনি। ওটা খোলাই ছিল।"

প্রসন্ন এমন চোখ করে তাকালেন যেন ব্যাপারটা তিনি ভুলেই গিয়েছেন। তিনি অন্য কিছু ভাবছিলেন।

শিশির ভাবছিল, এবার উঠে পড়বে কি না! কিন্তু ভদ্রলোককে একটু না বাজিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না।

দু জনেই সামান্য চুপচাপ। বাগানে কাক, চড়ুই ডাকাডাকি করছে। সামনের দিকে ফাঁকা মাঠ, ঢালু হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে অনেকটা। বাঁ দিকে পুকুর। দূরে প্রান্তর। আরও দূরে বনজঙ্গলের ঝোপ। চড়া রোদে মাঠঘাট টকটক করছিল।

প্রসন্ন নিজেই বললেন, "আমার মতন কাউকে তুমি খুঁজছ এখানে?"

শিশির মাথা নাড়ল। "হ্যাঁ।"

"এখানে তেমন কেউ আছে?"

"খুঁজে দেখতে হবে।" শিশির সরাসরি কোনও জবাব দিল না।

"ছোট জায়গা। খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না।"

প্রসন্নর গলায় যেন চাপা কৌতুক ছিল।

শিশির হঠাৎ বলল, "আপনি এখানে নতুন তাই না?"

"কেন?"

"আমি ক'মাস আগে যখন এখানে এসেছিলাম, আপনাকে দেখিনি।"

প্রসন্ন এবার হাসির মুখ করলেন। "চোখে পড়িনি তোমার।"

"ছিলেন আপনি?"

"ছিলাম।"

শিশির মনে-মনে হিসেব করল। বলল, "আমি বেশি দিন ছিলাম না। কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলাম। আপনিও তো কলকাতা যান।"

"যাই। ক'দিন আগেই গিয়েছিলাম।"

শিশির বুঝতে পারল, যেদিক দিয়েই ধরবার চেষ্টা করছে সে, সিংহীবাবু বেশ সহজেই পিছলে যাচ্ছেন। "কলকাতায় আপনার বাড়ি?"

"না।"

"কোথায় বাড়ি?"

"কাশী।"

"ও! বেনারসের লোক আপনি!"

প্রসন্ন এবার একটু হাসলেন। "তুমি যাকে খুঁজছ তার নাম কী?"

চোখে-চোখে তাকাল শিশির। "নাম জানি না।"

"নাম জানো না? থাকে কোথায়?"

"তাও জানি না। এখানে থাকতে পারে।"

আবার চুপচাপ। শিশির ভাবছিল, এবার উঠে পড়া ভাল। ভদ্রলোককে কায়দা করা তার সাধ্য নয়। বংশীর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

উঠে পড়ার ভঙ্গি করল শিশির। "আমি তা হলে উঠি!"

"উঠবে! চা খাবে না?"

"চা! না না, আমি এইমাত্র বাড়ি থেকে চা খেয়ে বেরিয়েছি।"

"বেশ। তা হলে এসো।"

শিশির উঠে দাঁড়াল।

প্রসন্ন আচমকা বললেন, "একটু দাঁড়াও।" বলে তিনি উঠলেন। উঠে ঘরে চলে গেলেন, বাঁ দিকের ঘরে। ভেতর দিকের ঘর, শিশির ভেতর দিকের ঘরদোর আগে কিন্তু দেখেনি। আজ বাড়ির ভেতর দিকটা দেখছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল শিশিরকে।

প্রসন্ন ফিরে এলেন। হাতে একটা ছবি। ফটোগ্রাফ।

"তুমি যাকে খুঁজছ, দেখো তো এই ছবিটা তার কি না?" প্রসন্ন একটা পোস্টকার্ড সাইজের ফটো দিলেন।

শিশির ছবিটা নিয়ে দেখল। দেখেই চমকে উঠল। সিংহীমশাইয়ের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। বলল, "হ্যাঁ, এই ভদ্রলোক। এঁর ছবি আপনি কোথায়

পেলেন? চেনেন এঁকে?"

"না- চিনলে তোমায় ফটো দেখাব কেন," প্রসন্নর মুখে হাসি। যেন বিদ্রূপ করছেন।

শিশির বলল, "কোথায় থাকেন ইনি। কী নাম?"

"ইনি এখানে থাকেন না। নাম শুনে কোনও লাভ নেই। তা ইনি কি তোমার কোনও ক্ষতি করেছেন?"

শিশির এমন অদ্ভুত মানুষ জীবনে দেখেনি। সিংহীমশাইকে বড় বেশি রহস্যময় মনে হচ্ছিল।

"না, আমার কোনও ক্ষতি করেননি। বরং আমার উপকার করতে চেয়েছিলেন। আমি ওঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি।"

"জানি।"

"জানেন?"

মাথা হেলালেন প্রসন্ন। বললেন, "তুমি কে, কেন এখানে এসেছ, আমি জানি। তোমার অসুখের কথাও আমার জানা।"

শিশির নির্বাক। সিংহীমশাইকে দেখছিল। পলক পড়ছিল না চোখের।

অনেকক্ষণ পরে প্রসন্ন বললেন, "আমি তোমার শত্রু নই। তোমার শত্রুতা যারা করছে, তাদের আমি চিনি। তুমি চেনো না।"

॥ সতেরো ॥

শিশির বংশীর দোকানে এসে দেখল, জনাদুয়েক খদ্দের নিয়ে বংশী ব্যস্ত। শিশিরকে বসতে বলে বংশী তার কাজ সেরে নিল।

দোকান ফাঁকা হলে বংশী বলল, "কী ব্যাপার বলো! আজ থানায় যেতে হবে।"

শিশির মনে মনে তখনও কেমন বিমূঢ় হয়ে ছিল। প্রসন্নবাবু তাকে বোবা, বোকা করে ছেড়েছেন। ভদ্রলোককে সত্যিই রহস্যময় মনে হচ্ছে।

শিশির বলল, "কাল বাড়ি ফেরার পর অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে।"

বংশী তাকাল। অবাক গলায় বলল, "আবার কাণ্ড?"

মাথা দোলাল শিশির। "বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি সিংহীবাবু বারান্দায় বসে আছেন।"

"বসে আছেন!"

"হ্যাঁ। খুব একচোট ঝাল ঝাড়লেন প্রথমে। থানায় যাবেন বলে ভয় দেখালেন।"

"কেন?"

শিশির কালকের সব কথা তাকে খুলে বলল। তারপর আজকের কথা, একটু আগে যা যা ঘটেছে সিংহীবাবুর বাড়িতে—সবই বলল।

বংশী অবাক হয়ে শুনছিল সব। যত শুনছিল ততই বোকা হয়ে যাচ্ছিল।

কথা শেষ করে শিশির চুপ করল।

বংশী থ মেরে বসে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর মাথা পরিষ্কার করার জন্য নস্যির টিপ নিল। হাঁচল বারকয়েক। ঝট করে উঠে বাইরে চলে গেল। ফিরে এল সামান্য পরে।

"সব তালগোল পাকিয়ে দিল যে।" বংশী বলল। "সিংহীবাবু সব জানেন?"

"জানেন বলেই মনে হল।"

"কেমন করে জানলেন?"

"তা বলেননি।"

ভাবল বংশী। বলল, "তোমায় যার ফটো দেখালেন—সে কে, কোথায় থাকে তাও বললেন না?"

"না।"

"আশ্চর্য।"

শিশির কোনও কথা বলল না।

বংশী সামান্য চঞ্চল হল। কিছু বলতে যাচ্ছিল, দেখলে আর এক খদ্দের ঢুকছে দোকানে।

খদ্দেরটি বিদায় হল সঙ্গে সঙ্গে। গুঁড়ো দুধ কিনতে এসেছিল। নেই। বংশী বলল, "সিংহীবাবুকে তোমার বিশ্বাস হয়?"

শিশির হ্যাঁ-না কিছু বলল না। "ভদ্রলোক মিস্টিরিয়াস।"

"শুধু মিস্টিরিয়াস কেন, হয়তো তারও বেশি।"

"মানে?"

"তিনি যখন সবই জানেন তখন চুপ মেরে থাকলেন কেন? বলে দিলেই পারতেন কারা তোমার শত্রুতা করছে?"

শিশির বলল, "বললেন কোথায়?"

"আবার যেতে বলছেন তোমায়?"

"স্পষ্ট করে নয়। তবে, সেই রকমই ভাব দেখালেন।"

চা এল কাপে। চায়ের সঙ্গে গরম শিঙাড়া।

বংশী বলল, "নাও, চা খাও।...দ্যাখো, আমার মনে হচ্ছে, সিংহীবাবুর এটা উলটো চালও হতে পারে। মানে, তিনি আমাদের বন্ধু সেজে থাকতে চান। মুখে বন্ধু, আড়ালে শত্রু।"

শিশির কিছুই বুঝতে পারছিল না। সন্দেহ তো সকলকেই করা যায়। সিংহীবাবুকে আরও বেশি। কিন্তু সন্দেহ করে বসে থাকলে কাজের কাজ কতদূর হবে!

বাইরে বেশ রোদ। রাস্তায় লোকজন যাচ্ছে। একটা বাস এল টাউন থেকে। ধুলো উড়িয়ে স্টেশনের দিকে চলে গেল। কারা যেন চেঁচাচ্ছে। দেহাতি এক বুড়ো রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে বলছে কিছু। হয়তো পাগল।

বংশী বলল, "একটা কথা ঠিক। অন্ধকারে ঢিল ছুড়তে ছুড়তে এক জায়গায় লেগে গিয়েছে। আমরা সিংহীবাবুকে ট্রেস করতে পেরেছি। এখন তিনি বন্ধু না শত্রু সেটা পরে দেখা যাবে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু কী করব এখন?"

"কেন! থানায় যাব," বংশী বলল, "যা করার এক এক করে করতে হবে।"

"থানায় যাব?"

"নিশ্চয়। ফল্‌স টেলিগ্রাম, রাত্রে সাইকেল চেপে এসে পেছন থেকে মারার চেষ্টা। এগুলো আগেভাগে লিখিয়ে রাখা ভাল।"

শিশিরেরও মনে হল, থানায় গিয়ে কথাগুলো জানিয়ে আসা ভাল।

চা খেতে খেতে আরও কিছু কথা হল। সিংহীবাবুকে নিয়েই।

সেই বুড়ো মতন লোকটি দোকানে আসতেই বংশী বলল, "কালুদা, তুমি খানিকক্ষণ থাকো। আমি বাইরে যাব।"

চা খাওয়া শেষ করে বংশী উঠে পড়ল। দোকানের একপাশে গতকালের সেই মারাত্মক অস্ত্রটা পড়ে ছিল। বলল, "চলো।"

বাইরে এসে শিশির বলল, "একটা কথা বংশী।"

"বলো?"

"থানায় সব ঘটনা বলার দরকার নেই। শুধু টেলিগ্রাম আর কালকের কথা বললেই হবে।"

বংশী কিছু ভাবল। বলল, "চলো তো থানায়, তারপর দেখা যাবে।"

দোকান থেকে থানা বেশি দূরে নয়। বেলা হয়ে উঠছিল। রোদ চড়ে গিয়েছে। রাস্তায় দুটো ট্রাক দাঁড় করানো। মাল বোঝাই।

বংশী বলল, "বুঝলে শিশির, মাত্র ক'বছর আগেও জায়গাটা কত ভাল ছিল, এখন কত রকম ব্যবসাদার, গুণ্ডা বদমাশ এসে জুটেছে। বারোটা বেজে গিয়েছে এখানকার।"

শিশিরেরও সেই রকম মনে হল।

থানার সামনেই ছোট দারোগার সঙ্গে দেখা।

বংশীকে দেখে তিনি হাসলেন। "আরে বংশী!"

আলাপ করিয়ে দিল বংশী ছোট দারোগার সঙ্গে। "শিশির, এঁর কথা তোমায় বলেছি, রায়বাবু। হেমচন্দ্র রায়।"

নমস্কার করল শিশির।

শিশিরের পরিচয় দিল বংশী।

হেমবাবু মানুষটিকে মোটেই পুলিশের লোক বলে মনে হয় না। একেবারেই কাঠখোট্টা চেহারা নয়। বরং গোলগাল থলথলে গড়ন। মুখে হাসি। মাথার চুল ছোট। গোঁফ রয়েছে। চোখ দুটি অবশ্য সাদামাটা নয়। মনে হয়, তিনি বেশ সতর্ক চোখেই সব দেখেন।

বংশী বলল, "আপনার কাছে একটা দরকারে এসেছি।"

"হাতে ওটা কী?" হেমবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"বলছি!"

"চলো অফিসে চলো।"

হেমবাবু শিশিরদের নিয়ে অফিসে ঢুকলেন। "বোসো বংশী। বসুন আপনি।"

নিজের জায়গায় বসলেন হেমবাবু। উলটো দিকের চেয়ারে বংশী আর শিশির।

হেমবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। "বলো বংশী! কী ব্যাপার?"

বংশী শিশিরের দিকে তাকাল। "তুমি বলবে?"

"না। তুমিই বলো।"

বংশী সামান্য ভূমিকা সেরে নিয়ে কথাগুলো বলতে লাগল।

হেমবাবু এমন মুখ করে শুনছিলেন যেন তাঁর কান এখানে মন অন্য কোথাও।

বংশীর বলা শেষ হল।

হেমবাবু কিছুক্ষণ কোনও কথা বললেন না।

শিশিররা অপেক্ষা করছিল, হেমবাবু কী বলেন শোনার জন্যে।

হেমবাবু শেষে কথা বললেন, "টেলিগ্রাম কে করেছে ধরা মুশকিল হবে না। কিন্তু কাল যে তোমাদের ওপর সাইকেল নিয়ে চড়াও হয়েছিল তাকে কি আর পাবে! সে হয়তো চম্পট দিয়েছে।"

বংশী বলল, "লোকটাকে আমি চিনতে পারলাম না।"

"হুঁ, তা ওই মাথা ভাঙার অস্ত্রটা তো ভালই বানিয়েছে। ওটা রেখে যাও। এখানে দেখছি এটা ভালই চলছে।"

"মানে?"

"ও জিনিস আরও দুটো জোগাড় হয়েছে থানায়।"

বংশী অবাক হল। তাকাল শিশিরের দিকে। হেমবাবু যেন কিছু চেপে রেখে বললেন, "তুমি বলছ, শিশিরবাবুকে জখম করতে চেয়েছিল লোকটা?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?" হেমবাবু শিশিরের দিকে তাকালেন। "আপনাকে মিথ্যে টেলিগ্রাম করে এখানে আনানো হয়েছে বলছেন। আবার দেখা যাচ্ছে, আপনাকে জখম করার চেষ্টাও করা হয়েছিল। কেন? আপনি কে?"

শিশির বুঝতে পারল, দেখতে যতই হাসিখুশি হন না হেমবাবু, ভেতরে সেই পুলিশ। পেটের কথা টেনে বার করতে পারেন। কোনও জবাব না দিয়ে সে বংশীর দিকে তাকাল। যেন বলল, এবার কী হবে।

বংশী শিশিরের চোখ দেখে বুঝতে পারল ব্যাপারটা। বলল, "সেটাই তো কথা। কেন ওকে মিথ্যে বলে এখানে আনাল? আর কেনই বা জখম করার চেষ্টা করল।"

"আমিও তাই জিজ্ঞেস করছি," হেমবাবু বললেন, "শিশিরবাবুকে এখানে আনানোর কারণটা কী?"

শিশির মাথা নাড়ল। "জানি না।"

হেমবাবু শিশিরকে লক্ষ করছিলেন। গভীরভাবে। বললেন, "জানি না বললে চলবে কেমন করে! আপনাকে মশাই কলকাতা থেকে ভুলিয়ে টেনে আনার তো একটা কারণ থাকবে।"

শিশির অসহায় বোধ করছিল। ভেতরের কথা থানায় বলতে ইচ্ছে নেই।

বংশী কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল। "আমরা তো সেই জন্যই আপনার কাছে এসেছি। শিশির নিজেই বুঝতে পারছে না, কেন তাকে আনা হয়েছে।"

হেমবাবু হাসলেন। বললেন, "বুঝতে পেরেছি। বেশ, তা আমায় কী করতে হবে?"

বংশী বলল, "লোক দুটোকে যদি খুঁজে বার করতে পারেন। কে ফল্‌স টেলিগ্রাম করেছিল, আর কেই বা শিশিরকে জখম করতে গিয়েছিল।"

"আচ্ছা! তা চেষ্টা করে দেখি। প্রথমটা পারা যাবে। দ্বিতীয়টা বোধ হয় পারা যাবে না।" বলে হেমবাবু থানার জমাদারকে ডাকলেন। তারপর নিজেই বললেন, "বংশী, তোমার ওই অস্ত্রটা থানায় জমা দিয়ে যাও।"

"আজ্ঞে, ওই জন্যেই এনেছি।"

"এই ধরনের অস্ত্র এখানে চালু হল কেমন করে ভাবছি।"

জমাদার এল। হেমবাবু ইশারায় তাকে অস্ত্রটা দেখালেন। রেখে দিতে বললেন থানায়।

"আমরা কি তা হলে কিছু লিখিয়ে যাব?" বংশী বলল।

"যেতে পারো। না, থাক...। আজ নয়। আমি শুনে রাখলাম। দরকার হলে পরে লিখিয়ে যেয়ো।"

শিশির বুঝল এবার তাদের উঠতে হবে।

"আমরা তা হলে উঠি?"

"এসো।"

উঠে পড়ে বংশী হঠাৎ বলল, "একটা কথা বলব রায়বাবু?"

"বলো?"

"রেল ফটকের কাছে, পুকুরের গায়ে একটা বাড়ি আছে। বাড়িটায় সিংহীবাবু বলে এক মিস্টিরিয়াস ভদ্রলোক থাকেন। তাঁর সম্পর্কে একটু খোঁজ নেবেন?"

হেমবাবু বংশীদের মুখ দেখলেন। "কেন?"

"আমরা ভদ্রলোকের একটু খোঁজখবর নিতে চাই।"

কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে হেমবাবু বললেন, "দেখি।...তোমরা তাঁকে চেনো?"

"না। মুখে আমি চিনি। শিশিরের সঙ্গে কাল আলাপ হয়েছে।"

"ভদ্রলোক সম্পর্কে তোমাদের কৌতূহল কেন?"

বংশী মাথা চুলকে বলল, "এমনি। পরে বলব।"

থানা থেকে বেরিয়ে এসে শিশির বলল, "তুমি ভুল করলে বংশী!"

"কেন?"

"সিংহীবাবু যদি জানতে পারেন আমরা তাঁর পেছনে পুলিশ লাগিয়েছি—ব্যাপারটা ভাল হবে না।"

বংশী বলল, "মন্দই হোক, তবু ভদ্রলোকের ব্যাপার আমাদের জানা দরকার।"

৷৷ আঠারো ৷৷

দিন দুই-তিন চুপচাপ কাটল।

ততদিনে কলকাতা থেকে অমৃতবাবুর চিঠি এসেছে। বোনের খবর পেয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। শিশির যেন দিন কয়েক হাজারিবাগে কাটিয়ে আসে।

বাবা না-বললেও শিশির থাকত। একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত সে যায় কেমন করে!

এর মধ্যে একদিন সকাল থেকে তুমুল বৃষ্টি। সকাল গেল, দুপুর গেল, বৃষ্টির আর বিরাম নেই। মাঝে-মাঝে কমে, আবার আসে। আকাশ জুড়ে মেঘ আর মেঘ। বৃষ্টির জলে মাঠঘাট জল থইথই করতে লাগল। বিকেল থেকেই ব্যাঙের ডাক। যেন ব্যাঙের রাজত্ব এটা। সন্ধের মুখে খানিকটা থামল বৃষ্টি। চারদিকে অন্ধকার। ঝিঁঝি ডাকছে। আবহাওয়াটা বেশ।

সারাটা দিন শিশির ঘরে বসেই কাটিয়েছে। পুরনো কিছু বই ছিল বাড়িতে—তারই পাতা উলটেছে; আর পিসিমা-পিসেমশাইয়ের সঙ্গে গল্প করেছে।

সন্ধের পর যখন আবহাওয়াটা ভুতুড়ে-ভুতুড়ে মনে হচ্ছে, শিশির বারান্দায় দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখছিল, প্রসন্নবাবু এসে হাজির।

প্রথমটায় বুঝতে পারেনি শিশির। টর্চ হাতে কে আসছে কেমন করে বুঝবে?

সিংহীবাবুকে দেখে শিশির অবাক হয়ে গেল। এই বৃষ্টি বাদলের দিনে, এমন বেয়াড়া আবহাওয়ায় সিংহীবাবু বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছেন। ব্যাপার কী?

ছাতা বন্ধ করে সিংহীবাবু সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে এলেন।

শিশির বলল, "আপনি! এই বৃষ্টি বাদলার মুখে?"

প্রসন্ন বললেন, "তোমার কাছে এসেছি।"

"এই দুর্যোগে?"

"বৃষ্টি এখন ছিটেফোঁটা। আমার বাড়িও দূরে নয়।"

শিশির বলতে যাচ্ছিল, 'মাঠের জলকাদা ভেঙে এসেছেন, পা ধুয়ে নেবেন?' কথাটা বলতে গিয়েও বলল না। মানুষটাকে তার ভয়ও হয়, পছন্দও হয় না তেমন।

"ঘরে গিয়ে বসবেন?" শিশির বলল।

"না। এখানেই বসা ভাল।"

শিশির কিছু বুঝল না। বারান্দার ভেতর দিকে চেয়ার সাজিয়ে দিল। "বসুন।"

"তুমিও বোসো।"

"বসছি। ভেতরে একটু বলে আসি।"

শিশির চলে গেল। ফিরে এল সামান্য পরেই। চেয়ার টেনে বসল। তারপর কথা শুরু করার মতন করে বলল, "আজ প্রচণ্ড বৃষ্টি হল।"

"হ্যাঁ। বৃষ্টির জন্যে আমারও দেরি হল, নয়তো সকালেই আসতাম।"

শিশির একটা ব্যাপার সন্দেহ করেছিল। মুখে তা প্রকাশ করল না। বরং কিছু জানে না এমন ভাব করে বলল, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

প্রসন্ন বললেন, "তোমরা থানায় গিয়েছিলে?"

শিশির ঠিকই সন্দেহ করেছিল। সিংহী জানতে পেরেছেন। মিথ্যে বলে লাভ নেই। বলল, "হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।"

"তোমরা বেশি চালাক?"

"চালাকির কথা কেন বলছেন? আমরা গিয়েছিলাম নিজেদের দরকারে। মিথ্যে টেলিগ্রাম কে করেছিল কলকাতায়, সেটা জানা দরকার আমার। আর কে আমায় মারবার চেষ্টা করেছিল সেটাও জানা উচিত।"

প্রসন্ন সামান্য চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, "তোমার ব্যাপার তুমি জানতে পারো। কিন্তু আমার কথা কেন জানিয়েছ?"

শিশির এবার হকচকিয়ে গেল। যা ভেবেছিল সে, ঠিক তা-ই হয়েছে। বংশীকে সে বলেছিল, সিংহীবাবুর কথা থানায় জানানো উচিত নয়। বংশী শুনল না। এবার ঠেলা সামলাও।

শিশির বলল, "আপনার কথা আমি কিছু বলিনি।"

প্রসন্ন কেমন রেগে গেলেন। "মিথ্যে কথা বলছ আবার?"

শিশিরও চটে গেল। "আমি বলছি, আমি বলিনি।"

"তোমার শাগরেদ বলেছে, এই তো?"

"হ্যাঁ।"

"ব্যাপারটা একই হল। তুমি যদি না বলতে সে বলবে কেন?"

কোনও জবাব দিতে পারল না শিশির। এটা ঠিকই, সিংহীবাবু সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ায় তার বাস্তবিক কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। তবে ভয় ছিল।

শিশির বলল, "আমি নিজে বলিনি। কিন্তু আমরা তো থানায় আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলিনি।"

কথাটা বলার পরই শিশিরের মনে হল, সে এবার মিথ্যে কথাই বলল। প্রসন্নবাবু সম্পর্কে খোঁজ করতে বলা এক রকম বিরুদ্ধেই বলা বইকী! সন্দেহ না থাকলে মানুষ অন্যের খোঁজ করতে বলবে কেন?

প্রসন্ন বললেন, "তুমি জানো থানা থেকে আমার বাড়িতে লোক এসেছিল?"

শিশির কেমন অপ্রস্তুত। হেমবাবু তো আচ্ছা মানুষ! তারা কি হেমবাবুকে বলেছিল, আপনি প্রসন্নবাবুর বাড়িতে লোক পাঠান। পুলিশ বড় অদ্ভুত।

"কে গিয়েছিল?" শিশির বলল।

"তোমাদের বন্ধু।"

"বন্ধু! কে বন্ধু?" শিশির বুঝেও না বোঝার ভাব করল।

"হেম রায়।"

শিশির খোঁচাটা হজম করল।

প্রসন্ন একটু চুপ করে থেকে বললেন, "ভেবো না থানার ছোটবাবু হিসেবে এসেছিল! ধুতি জামা পরে বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে হাজির। ভাব করল, আলাপ করতে এসেছে।"

শিশির বলল, "তা হলে আর আমাদের দোষ দিচ্ছেন কেন! কেউ যদি আলাপ করতে যায়, আমরা কী করতে পারি!"

প্রসন্ন বলে চললেন, "আলাপ থেকেই বুঝলাম কারা তাকে পাঠিয়েছে।"

এমন সময় ভেতর থেকে ডাক এল। পিসিমা ডাকছেন।

শিশির উঠল। বলল, "আসছি।"

প্রসন্নবাবু বসে থাকলেন। এখন বৃষ্টি পড়ছে না। ঘন অন্ধকারে ছেয়ে আছে চারদিক। ঝিঝির ডাক একটানা বেজে চলেছে। বারান্দায় ব্যাঙ উঠেছে কয়েকটা।

শশধর এলেন। "নমস্কার! কেমন বর্ষা দেখছেন?"

নমস্কার জানালেন প্রসন্নবাবু। "ভালই বৃষ্টি হল আজ। কেমন আছেন আপনি?"

"এই আছি। একদিন আপনার কাছে যাব যাব করেও যাওয়া হল না!"

"আসুন না একদিন। এত কাছে বাড়ি।"

"যাব, নিশ্চয় যাব।"

আরও কিছু সাধারণ কথাবার্তা। শিশির এল! চা নিয়ে এসেছে।

"নিন, চা খান।" শশধর বললেন।

চা নিলেন প্রসন্ন।

আর একটু বসে শশধর উঠে গেলেন। শিশির বসল।

প্রসন্ন বললেন, "তুমি আমার পেছনে পুলিশ লেলিয়ে ভাল করোনি! আমি তোমায় আগেই বলেছি তোমার সঙ্গে আমি শত্রুতা করছি না।"

কোনও জবাব দিল না শিশির। মানুষটি যদি তার শত্রু না হয়, তা হলে বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্বের মতন কোনও কাজ করেছেন কি?

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

প্রসন্ন বললেন, "তুমি আমার সম্পর্কে কী জানতে চাও?"

শিশির খানিকটা অবাকই হল। সিংহীবাবু এত সোজাসুজি কথা বলছেন! ভাবাই যায় না। পুলিশের গুঁতো নাকি?

শিশির বলল, "জানতে চাই অনেক কিছু। আপনি বলবেন?"

"না, সব কথার জবাব দেব না। যে কথার জবাব দেওয়া যায়, দেব।"

মচকায় তবু ভাঙে না, সিংহীবাবু দেখি সেই ধরনের মানুষ। শিশির বলল, "আপনি কোথাকার লোক?"

"ওটা বাজে প্রশ্ন! আমি নানা জায়গায় থেকেছি। ইউপি, বিহার, তোমাদের কলকাতা।"

"আপনি শুনেছি নানা রকম ওষুধপত্র জানেন?"

"জানি। আমার খানিকটা কবিরাজী জ্ঞান আছে।"

"আপনার এখানকার বাড়িতে অনেক শিশি-বোতল দেখেছি। আপনি কি ওষুধপত্র তৈরি করেন?"

"সামান্য।" কাটা কাটা জবাব প্রসন্নবাবুর।

শিশির একটু চুপ করে থেকে বলল, "আপনি আমায় যে ফটোটা দেখিয়েছেন—

তিনি কে তা বলেননি।"

প্রসন্ন বললেন, "সে তোমাদের কলকাতাতেই থাকে। আমার জানাশোনা।"

"তার পরিচয়টা কেন বলছেন না?"

"জেনে তোমার লাভ হবে না। তা ছাড়া ও তোমার কোনও ক্ষতি করেনি।"

প্রসন্ন চা খেয়ে কাপটা মাটিতে নামিয়ে রাখলেন।

শিশির বলল, "বেশ, প্রয়াগ বলে একটা লোক আমাদের বাড়িতে কাজ করত। তাকে আপনি জানেন?

প্রসন্ন যেন হাসলেন একটু। "কেন বলো তো?"

"আমি তাকে খুঁজেছি। পাইনি।"

"পাবে না। সে তোমাদের বাড়িতে ঢুকেছিল কেন জানো?"

"না।"

"আচ্ছা, একটা কথা মনে করে দ্যাখো। প্রয়াগ যতদিন তোমাদের বাড়িতে ছিল ততদিন তোমার শরীর খারাপ হত। ও চলে যাবার পর তোমার শরীর খারাপ কমে গেল না?"

শিশির ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে।"

"ঠিক বলছ?"

"এক রকম ঠিক। তবে প্রয়াগ যাবার পরও হয়েছে।"

"প্রয়াগ তোমার খাবারদাবার, জল, চা—এসব দিত?"

শিশির অবাক হল। "হ্যাঁ, দেবে না কেন?"

প্রসন্ন এবার একটু হাসলেন। "তোমার কখনও কিছু সন্দেহ হয়নি? মনে হয়নি, অসুখের সঙ্গে ওই প্রয়াগের কোনও সম্পর্ক আছে?"

শিশির আকাশ থেকে পড়ল। "তার মানে—মানে আপনি বলতে চাইছেন প্রয়াগ আমাকে..." কথাটা শেষ করতে পারল না শিশির।

প্রসন্ন বললেন, "প্রয়াগ তোমাকে খাবারের সঙ্গে ওষুধ দিত কি না তা তুমি জানো না। এ রকম অনেক ওষুধ আছে যেগুলো যতক্ষণ শরীরে কাজ করে, ততক্ষণ বোধবুদ্ধি সব গোলমাল হয়ে যায়।"

শিশির যেন চোখের সামনে থেকে বিরাট এক পর্দা সরে যেতে দেখল। সত্যিই তো। দিনের বেলায় তার শরীর খারাপ হত না। হত সন্ধের আগে-আগে। হ্যাঁ, ঠিক। এবার মনে পড়ছে। প্রয়াগ তাকে দুপুরের দিকে জল-চা দিত।

ভয় পেয়ে শিশির বলল, "ও কি আমাকে বিষ দিত?"

"বিষ! হ্যাঁ, তা বিষ বলতে পারো।"

"কী বিষ!"

"ওটা তুমি বুঝবে না।"

শিশির কিছুক্ষণ বোকার মতন বসে থাকল। তারপর বলল, "কিন্তু প্রয়াগ যাবার পরও তো আমার শরীর খারাপ হয়েছে।"

প্রসন্ন বললেন, "সেটা তোমার ভাববার কথা। প্রয়াগ থাকতে তোমার অসুখ শুরু

হয়েছিল, সে চলে যাবার পর কমল কি না! তা ছাড়া এটাও তোমায় ভেবে দেখতে হবে—বাড়িতে তোমার এমনকী কেউ আছে যে ওই প্রয়াগের কথামতন পরে চলেছে কি না?"

শিশিরের কেমন মাথা গোলমাল হয়ে গেল। সিংহীবাবু বলছেন কী! তাদের বাড়িতে এমন কেউ থাকতেই পারে না।

প্রসন্ন হঠাৎ বললেন, "আবার বৃষ্টি আসছে। আমি উঠি। তুমি কাল আমার বাড়িতে এসো, কথা হবে।"

॥ উনিশ ॥

পরের দিন বংশীর দোকানে পা দিয়েই শিশির বলল, "নাও, এবার ঠেলা বোঝো; তোমার হেমবাবু সিংহীমশাইকে খেপিয়ে দিয়েছে।"

বংশী কিছুই বুঝতে পারল না। বলল, "কেন? আবার কী নতুন কাণ্ড ঘটল?"

শিশির বসল। বলল, "দাও তোমার নস্যির ডিবেটা দাও। বর্ষার চোটে সর্দি হয়ে গিয়েছে। মাথা ভার।"

বংশী নস্যির ডিবে বাড়িয়ে দিল। শিশির আঙুলের ডগায় নস্যি নিয়ে জোরে টান মারল। তারপর হাঁচতে লাগল।

বার পাঁচ-সাত জোরে-জোরে হেঁচে নাক মুখ পরিষ্কার করল। চোখ ছলছল করছে। বলল, "কাল ওই বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে রাত্তির বেলায় এক ফাঁকে সিংহীবাবু হাজির। তিনি যা বললেন তাতে আমার মাথা ঘুরে গেল।"

শিশির একে-একে সব কথা বলল বংশীকে।

বংশী কেমন বোকা হয়ে গেল। মাথা চুলকে বলল, "হেমবাবু অত কাঁচা পুলিশ নন। আমি বিশ্বাস করি না। সিংহীবাবু যতটা চালাক হেমবাবু তার চেয়ে কম নয়। আমার মনে হয়, হেমবাবু কোনও প্যাঁচ খেলে এসেছেন। পরে গিয়ে জেনে নেব। কিন্তু পরের ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলেছে যে।" বলে বংশী নিজের মাথায় গোটা কয়েক গাঁট্টা মারল।

দোকানে খদ্দের এসেছিল। কাগজে লেখা ফিরিস্তি নিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে।

বংশী ফিরিস্তি মিলিয়ে টুথপেস্ট, চা, জুতোর কালি, টর্চের ব্যাটারি আরও কত রকম খুচরো জিনিস দিতে লাগল।

শিশির রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে থাকল। কাল রাত্রে তার ঘুম হয়নি ভাল করে। কত রকম কী ভেবেছে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে লোকটাকে দিয়ে দিল বংশী। হিসেব করল। প্রায় তেইশ টাকা।

জিনিস নিতে যে এসেছিল সে কাজের লোক। বাড়ি থেকে চিরকুট নিয়ে এসেছে। ফতুয়ার পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বার করে এগিয়ে দিল।

বংশীর কাছে ভাঙানি ছিল না। এত সকালে পঞ্চাশ টাকার ভাঙানি থাকবেই বা কেমন করে।

বংশী বলল, "রেজকি নেই। মিষ্টির দোকান থেকে ভাঙিয়ে আনো। যাও, আমার নাম করে বলো, ভাঙিয়ে দেবে।"

লোকটা টাকা ভাঙাতে চলে গেল।

বংশী আর-একবার হিসেবটা দেখে নিচ্ছিল। দেখে নিয়ে কাগজটা উলটে রেখে দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, শিশির হঠাৎ বলল, "সিংহীবাবুর একটা কথা আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে।"

তাকাল বংশী।

"আমায় কেউ কোনও রকম একটা খারাপ ওষুধ খাওয়াচ্ছিল লুকিয়ে। আর সেটা প্রয়াগ?"

বংশী বলল, "সে তুমি বুঝতে পারবে। তোমার অসুখের প্রথম থেকে ভাল করে ভেবে দেখলেই ধরতে পারবে।"

"ভেবে দেখেছি। প্রথম যখন অসুখ করে প্রয়াগ ছিল না। তা সে তো করতেই পারে অসুখ। কিন্তু অসুখ থেকে সেরে ওঠার মুখে প্রয়াগ আমাদের বাড়িতে আসে। তখন থেকে যাচ্ছেতাই কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। তারপর প্রয়াগ যখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, শরীরও ভাল হতে লাগল। অবশ্য প্রয়াগ যাবার পরও হয়েছে। তবে কম। শেষ পর্যন্ত সেরে গেল। এটাকে তুমি কাকতালীয় ব্যাপার বলবে?"

বংশী বলল, "না; তবে প্রয়াগ যাবার পরও তোমার অসুখ ছিল বলছ! সেটা কেমন করে হবে?"

শিশির বলল, "আমি ভেবেছি। ওষুধের আফটার এফেক্ট বলতে পারতাম। তা বলছি না। কারণ ওই ওষুধের গুণ যদি চব্বিশ ঘণ্টারই হত, আমি সকালের দিকে ভাল আর সন্ধের পর খারাপ থাকতাম না। আমার মনে হয়, ওষুধের গুণ পাঁত-সাত ঘণ্টা কি বড় জোর আর-একটু বেশি থাকত। বিকেলের গোড়ায় ওষুধ পড়ত পেটে—সন্ধেতে তার অ্যাকশন সব চেয়ে বেশি হত। আবার ধীরে ধীরে সেটা কেটে যেত। সকালে ভাল থাকতাম।" বলে শিশির একটু থামল, বলল, "কাজেই ওই ওষুধ খাবার জের হিসেবে প্রয়াগ চলে যাবার পরও ভুগেছি ক'দিন—তা আমার মনে হয় না।"

"কী মনে হয় তোমার?"

শিশির বলল, "মনে তো একরকমই হতে পারে। প্রয়াগ চলে যাবার পরও কেউ দিন কয়েক ওষুধটা খাইয়েছে। কিন্তু কে? আমাদের বাড়িতে সন্দেহ করার মতন কেউ নেই। প্রয়াগ ছাড়া সবই পুরনো লোকজন। তারা কখনও এ-কাজ করবে না।"

বংশী শিশিরের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল।

শিশির বলল, "সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সিংহীবাবু আরও জটিল করে দিলেন ব্যাপারটা।"

টাকা ভাঙিয়ে ফিরে এল লোকটা।

বংশী তার পাওনা টাকাপয়সা নিল। জিনিসপত্রগুলো বড় ঠোঙায় ভরে রেখেছিল কিছু, কিছু ছিল খুচরো। এগিয়ে দিল।

লোকটার কাঁধে গামছা ছিল। বেঁধে নিল ভাল করে। সওদা নিয়ে চলে গেল লোকটা।

বংশীর হঠাৎ খেয়াল হল, চিরকুট ফেলেই চলে গিয়েছে ও।

চিরকুটে হিসেব লেখা আছে। তা ছাড়া বাড়িতে যদি মালপত্র মিলিয়ে নিতে চায়—চিরকুটটা দরকার।

শিশির বলল, "ব্যাপারটা কী?"

"কাগজটা ফেলে গেল—! দাঁড়াও দেখি লোকটাকে—। বংশী চিরকুটটা হাতে করে বাইরে গেল দোকানের। তারপর হাঁক পেড়ে হাত নেড়ে ডাকতে লাগল লোকটাকে।

চিরকুট হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বংশী অন্যমনস্কভাবে আবার একবার কাগজটা দেখল। ততক্ষণে ফিরে এসেছে লোকটা। সে নিজেই হাত বাড়াল।

বংশী হঠাৎ কেমন থ' হয়ে দাঁড়িয়ে একবার কাগজটা উলটে-পালটে দেখল, তারপর লোকটাকে। শেষে কাগজটা ফেরত দিয়ে দিল তাকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল লোকটাকে, তারপর যেন লাফ মেরে দোকানে ফিরে এল। "শিশির?"

শিশির বংশীর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

বংশী যেন উত্তেজিত। বলল, "হ্যাঁ, আর-একটু আগে যদি নজরে পড়ত!" বলে কপাল চাপড়াল।

"টেলিগ্রাম! মানে?"

"ওই লোকটা কোন কাগজে ফর্দ লিখিয়ে এনেছিল জানো? টেলিগ্রাম ফর্মের কাগজে। পোস্ট অফিসের ফর্ম। আধখানা ছিঁড়ে তার পেছনে বাড়ির লোক ফর্দ লিখে দিয়েছে।"

শিশির তখনও যেন ধরতে পারছিল না কথাটা। বলল, "তাতে কী হয়েছে?"

"কী হয়েছে?...আরে, তুমি বুঝতে পারছ না—টেলিগ্রাম ফর্ম বাড়িতে যাবে কেন?"

বংশী কথাটা গুছিয়ে বলতে না পারলেও শিশির এবার বুঝে ফেলল ব্যাপারটা। লোকের বাড়িতে অকারণে টেলিগ্রাম ফর্ম থাকে না। বংশী সন্দেহ করছে কিছু।

শিশির বলল, "তুমি তো অদ্ভুত কথা বলছ?"

"কেন?"

"বাড়িতে কেউ টেলিগ্রাম ফর্ম রাখতে পারবে না? হয়তো দরকারে নিয়েছিল। দু-একটা ফর্ম বাড়িতে থাকতেই পারে। কাজে লাগেনি..., পড়েছিল, ছুটকো কাগজ, কেউ ছিঁড়ে বাজারের ফর্দ লিখেছে।"

বংশী বলল, "বাড়িতে টেলিগ্রাম ফর্ম রেখে দেয়—এমন মানুষ এখানে কম। দু-চারজন বিজনেসম্যান রাখতে পারে। এমনি লোক রাখবে কেন? যখন দরকার পড়বে পোস্ট অফিসে গিয়ে ফর্ম নেবে।"

"তুমি চেনো ওই লোকটাকে? কোন বাড়িতে কাজ করে জানো?"

"লোকটাকে মুখে চিনি। ও কাজ করে যে বাড়িতে সেটা লাইনের ওপারে—। বাড়িটা সামান্য দূরে। একেবারে ফাঁকায় বলতে পারো। বাড়িটা যাঁর ছিল তিনি বেচে দিয়েছেন। অন্য লোক কিনেছে।"

"নাম কী?"

"ভবতোষ সান্যাল।"

"একলা থাকেন?"

"না, পরিবারের লোকজন আছে। স্ত্রী, মা, এক বোন।"

"চেনো তুমি?"

"ওই মুখ চেনা। আমার দোকান থেকে জিনিসপত্র কেনেন কিছু কিছু।"

"কী করেন ভদ্রলোক?"

"তা তো ভাই আমি ঠিক জানি না। তবে ভদ্রলোক আজ বছর খানেকের ওপর আছেন। একটা চোখ শুনেছি অন্ধ। কলকাতার লোক ওঁরা।"

শিশির সন্দেহের তেমন কিছু খুঁজে পাচ্ছিল না। এক ভদ্রলোকের বাড়িতে যদি দুটো টেলিগ্রাম ফর্ম থাকে, আর সেটা ব্যবহার না হওয়ার দরুন বাড়ির লোক যদি তাতে ফর্দ লিখেই ফেলে তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।

শিশিরের হাসি পেল। বলল, "বংশী, আমরা একেবারে ঝানু গোয়েন্দা হয়ে যাচ্ছি! সব ব্যাপারেই সন্দেহ।"

বংশী বলল, "তুমি ঠাট্টা করছ?"

"না। তবে টেলিগ্রাম ফর্মের ব্যাপারটা আমাকে তেমন নাচাচ্ছে না।"

"তুমি অন্য জিনিস ভাবছ। কলকাতার কথা।"

"তা ভাবছি।"

"ভাবছ, তোমার বাড়িতে এমন কে থাকতে পারে যে তোমায় প্রয়াগের চেলা হয়ে ওষুধ খাওয়াতে পারে? তাই না?"

"ঠিক ধরেছ। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। বিশ্বাসও করছি না।"

বংশী বলল, "আমি ভাই একটা কথা তোমায় স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। সিংহীবাবু তোমাকে যাই বলুন, আমি তাঁকে সন্দেহ করি। মুখে বন্ধু বললেই বন্ধু হয় না। যদি বন্ধুই হবেন—কেন খোলাখুলি সব বলছেন না?"

শিশির কোনও জবাব দিল না।

বংশী নিজেই আবার বলল, "তুমি মনে কোরো না, হেমবাবু ওই সিংহীর ভড়কিতে ভুলবেন। আজ হোক কাল হোক হাঁড়ির খবর ঠিক টেনে বার করবেন উনি।"

"দেখা যাক।"

"আর টেলিগ্রামের ব্যাপারটা তুমি উড়িয়ে দিচ্ছ। আমি দিচ্ছি না।"

"কী করবে?"

"ভেবে দেখি। অন্তত পোস্ট অফিসে গিয়ে একবার খোঁজ করব—দেখি, ভবতোষবাবুর বাড়ি থেকে কোনও লোক এসে ফর্ম নিয়ে গিয়েছে কি না। বা ও

বাড়ির কেউ সেইদিন টেলিগ্রাম করতে এসেছিল কি না—যেদিন তোমাদের বাড়িতে টেলিগ্রাম করা হয়।"

শিশির চুপ করে থাকল।

॥ কুড়ি ॥

দুটো দিন এরকম চুপচাপ।—কিছু ঘটল না। ঘটলেও শিশিরের করার কিছু ছিল না। একে বেজায় কাঁচা সর্দি, নাক-গলা জ্বলে যাচ্ছে সর্বক্ষণ, তার ওপর বাড়িতে গোড়ালি মচকে ফেলে ল্যাংচাতে লাগল।

বংশী এসেছিল খোঁজ করতে। বলে গেল, সে ভবতোষবাবুর বাড়ির খোঁজখবর করছে।

শনিবার সন্ধেবেলায় বাবু এসে হাজির। খোঁজ করে করে নিজেই হাজির হয়েছে। শিশির খুব খুশি। "আমি ভেবেছিলাম তোমার দেরি হবে আসতে।"

"পাগল! তোর চিঠি পেয়ে আর কি বসে থাকতে পারি। সাত দিনের ছুটি ম্যানেজ করে পালিয়ে এসেছি।"

"বেশ করেছ। এদিকে কত কী যে হয়ে যাচ্ছে, বাবুদা; পাগলা হয়ে যাচ্ছি।"

"তা তো বুঝতেই পারছি। সব শুনব।"

শশধর আর আশালতা দুজনেই বাবুকে দেখে খুব খুশি। আশালতা আগে থেকে চিনতেন বাবুকে, কলকাতার বাড়িতে বহুবার দেখেছেন। শিশিরের প্রায় সব বন্ধুকেই চেনেন তিনি।

গল্পগুজব, হইহই করে সন্ধেটা কেটে গেল।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর শিশিরের ঘরে দুজনে দু বিছানায় শুয়ে কথাবার্তা শুরু হল। বাবুর জন্যে নেয়ারের খাট ঢোকানো হয়েছে ঘরে। বাবুর খুব আরাম লাগছিল। সে চুপ করে শুয়ে ছিল আর শিশির এক-এক করে বলে যাচ্ছিল সব। মাঝে-মাঝে বাবু দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করছিল।

সব শোনা হয়ে গেলে বাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "আংটিটা তা হলে ফল্‌স?"

শিশির কোনও জবাব দিল না।

বাবু নিজেই বলল, "আংটি ফল্‌স। কিন্তু তোকে নিয়ে এই শয়তানি করার পেছনে কার কী মতলব রয়েছে? তুই কারও সাতেপাঁচে নেই। তোর সঙ্গে কারও কোনও শত্রুতা নেই। তোর পেছনে লাগবে কেন?"

শিশির বড় করে নিশ্বাস ফেলল। "কী জানি!"

বাবু খানিকটা চুপচাপ থাকল। পরে বলল, "দ্যাখ, আমার মনে হচ্ছে যতক্ষণ না একটা মোটিভ বার করা যাচ্ছে ততক্ষণ আমরা শুধু অন্ধকারেই ঢিল ছুড়ে মরব। একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয় কারও আছে। কী উদ্দেশ্য?"

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না, বাবুদা। আমার আরও অবাক লাগছে—আমাদের কলকাতার বাড়িতে এমন কে আছে যে প্রয়াগের চলে যাবার পরও আমায় ওষুধ খাওয়াত? বিশ্বাসই হয় না। সবাই পুরনো; সবাই বিশ্বাসী। আশ্চর্য!"

বাবু চুপ করে থাকল। ভাবছিল। অনেকক্ষণ পরে হাই তুলে বলল, "সিংহীবাবু লোকটাকে দেখিনি। তুই যা বলছিস তাতে মানুষটাকে তো খারাপ মনে হচ্ছে না। ওঁর কাছে সারেন্ডার করবি নাকি? হয়তো অনেক কিছু জানেন উনি।"

শিশির বলল, "বংশী অন্য কথা বলছে। তার মতে সিংহীবাবু ঘোড়েল। মানুষটির সম্পর্কে ঠিক করে কিছু না জেনে অতটা এগোতে বারণ করছে।"

বাবুর আবার হাই উঠল। ঘুম পাচ্ছিল তার। বলল, "কাল ভেবে দেখা যাবে। নে, ঘুমো। কাল তোদের সিংহীবাবুকে দেখব। বংশীর সঙ্গেও আলাপ হবে।"

বাবু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

বংশী তখনও দোকানে আসেনি। কালুদা ছিল। শিশির আর বাবু দোকানে এল।

কালুদার সঙ্গে শিশিরের বেশ জানাশোনা হয়ে গিয়েছে। খাতির করে বসাল। বলল, "চা খাও দাদা। বংশীদা এই এল বলে।"

বেশ খানিকটা কেটে গেল। বংশী আর আসে না। শিশির যখন অধৈর্য হয়ে উঠেছে বংশী এসে হাজির। সাইকেলে করে এসেছে।

শিশির বলল, "বাঃ! কতক্ষণ ধরে বসে আছি। এই আমার বাবুদা।"

বংশী হাসল। "বুঝতে পেরেছি। কালুদাকে ছেড়ে দিই। বাজার করে বাড়ি যাবে।"

দোকানে ঢুকে বংশী কালুদাকে টাকা দিল। কী কী নিতে বলেছে বাড়িতে বুঝিয়ে দিয়ে বলল, "একটু তাড়াতাড়ি করবে কালুদা, বেলা হয়ে গিয়েছে।"

কালুদা বাজারের থলি দোকানেই এনে রেখেছিল। টাকা আর থলি নিয়ে চলে গেল।

বংশী বসল। বসতে না বসতেই এক খদ্দের। টাকা-বারোর জিনিস বেচে বংশী বাবুকে বলল, "আপনি খুব পয়া, স্যার। পা দিতে না দিতেই খদ্দের।

বাবু আর শিশির হেসে উঠল।

শিশির ঠাট্টা করে বলল, "আমি তোমার দোকানে বসে থাকলে খদ্দের আসে না বংশী?"

বংশী বলল, "আসে। কিন্তু বাবুদা আরও পয়া। একটা খবর আছে।"

শিশির তাকাল। "নতুন খবর?"

"হ্যাঁ। আমার কি এমনি-এমনি দেরি হল নাকি? খবরের জন্যে গিয়েছিলাম। নিয়ে তবে ফিরছি।"

"কী খবর?"

"দাঁড়াও বলছি। চা খেয়েছ?"

"খেয়েছি। কালুদা খাইয়েছে।"

"তা হলে আমার জন্যে একটা হাঁক মেরে আসি—" বলে বংশী দোকানের বাইরে

গেল।

বাবুর মজা লাগছিল বংশীকে দেখে। বলল, "খুব ছটফটে, তাই না?"

একটু পরেই ফিরে এল বংশী। এসেই শিশিরকে বলল, "আজ সকালে আমি ভবতোষ সান্যালের বাড়ি গিয়েছিলাম।"

শিশির প্রথমটায় খেয়াল করেনি। বোকার মতন তাকাল। "ভবতোষ...।"

"আরে সেই যে, যার বাড়ির কাজের লোক টেলিগ্রাম ফর্মের...।"

"ও! সেই বাজারের ফর্দের কাগজ?"

"হ্যাঁ।"

ব্যাপারটার কোনও গুরুত্ব শিশির সেদিন দেয়নি। আজও দিল না। তবে কৌতূহল বোধ করল।

বংশী বলল, "আমি একটা ছুতো করে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাড়ির কাছে পৌঁছে মনে হল, ছুতোটা টিকবে না। দু-দিন পরে কেউ যদি গিয়ে বলে সেদিন দেড় টাকা বেশি নিয়ে নিয়েছিলাম ভুল করে, ফেরত দিতে এসেছি, লোকে কি বিশ্বাস করবে! তার চেয়ে এমনি চলে যাওয়া ভাল।"

পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করে বংশী বড় মাপের দু-টিপ নস্যি নাকে ভরল। সারা নাকময় নস্যি, চোখ ছলছল করে উঠল।

নাক মুছে বংশী বলল, "কী করলাম জানো?"

"শুনি।"

"সটান বাড়িতে ঢুকে সান্যালমশাইয়ের খোঁজ করলাম। ভদ্রলোক বসার ঘরে ডেকে পাঠালেন। নমস্কার করে বললাম, 'আমি এখানকার লোক। স্টেশনের কাছে বাজারে আমার একটা স্টেশনারি দোকান আছে। হয়তো আমায় দেখেছেন। আপনার বাড়ি থেকে মাঝে-মাঝে লোকজন গিয়ে খুচরো জিনিসপত্র কিনে আনে। কিন্তু স্যার, আমি বাঙালির ছেলে, ছোট্ট দোকান আমার। যদি দয়া করে আমার দোকান থেকে পুরো বাজারটাই নেন বড় উপকার হয়। তা ছাড়া স্যার, আরও একটা কথা আছে। পুজোর সময় আমি কিছু বাড়তি জিনিস আনতে চাই। যদি বাড়ি থেকে আমায় আগেভাগে জানিয়ে দেন—কী কী লাগবে বাড়িতে, আমি আনিয়ে দেব।" বলে বংশী হাসল। হাসির অর্থটা এই, কেমন চাল দিলাম বলো?

শিশির হাসল। "তারপর?"

সান্যালমশাই বললেন, "বেশ তো, আমি বলে দেব বাড়িতে।"

"তুমি কি আর-একটা ফর্দ আশা করছ, টেলিগ্রামের কাগজে?"

"না। আমি ভদ্রলোকের বাড়ি এবং মানুষটিকে একটু কাছ থেকে দেখতে গিয়েছিলাম।"

"কী দেখলে?"

"বোধ হয় আমার যাওয়া বিফল হত। কিন্তু ভাই, আমি যখন সান্যালমশাইয়ের বাড়িতে ঢুকছি—তখন একজনকে দেখলাম।"

"কে?"

"সেই লোকটা, যে সেদিন সাইকেল চালিয়ে হাতে লোহার ডাণ্ডা নিয়ে তোমায় ঘায়েল করতে এসেছিল?"

শিশির চমকে উঠল। "সে কী?"

"আমি যখন বাগানের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম লোকটাকে দেখলাম। সে বেটা আমাকে দেখতে পেয়ে গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিল।"

বাবু ঘটনাটা শুনেছিল। বলল, "আপনি ঠিক দেখেছেন?"

"একেবারে ঠিক। তোমার মনে আছে শিশির, লোকটা সাইকেল ফেলে বাজারের ডান দিক দিয়ে ছুটেছিল?"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"তার মানে বেটা সোজা ছুট মেরে মাঠ ভেঙে সান্যাল-বাড়িতে এসে ঢুকেছিল।"

শিশির একবার বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বংশীর দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। বলল, "ও বাড়িতে লোকটা কী করে?"

"কাজকর্ম কিছু করে। নাও করতে পারে। সান্যালবাবুর গুণ্ডাও হতে পারে লোকটা।"

"বলছ কী?"

বংশী মাতব্বরের মতন মুচকি হাসল।

তার চা এসেছিল। চা নিল বংশী। ছোকরা চলে গেল চা দিয়ে। চায়ে চুমুক দিয়ে বংশী বলল, "অবাক হবার আরও ব্যাপার আছে শিশিরবাবু।"

"শুনি।"

"ভবতোষ সান্যালের বাড়িতে একজোড়া বাঘা কুকুর। কী ডাক! তবে চোখে দেখতে পেলাম না।"

"কুকুর থাকতেই পারে। অবাক হবার কী আছে?"

"না কুকুরের জন্যে হইনি। কিন্তু ও বাড়ির বসার ঘরে সিংহীবাবুকে আসতে দেখলে কেমন হয়?"

শিশির অবাক। আকাশ থেকে পড়ল যেন। "সিংহীবাবু! ও বাড়িতে?"

"হ্যাঁ স্যার। ভদ্রলোক জানতেন না যে আমি ও বাড়িতে গিয়েছি। আমায় দেখে ভেতরে ভেতরে ভদ্রলোক জোর চমকে উঠেছিলেন নিশ্চয়। মুখে সেটা বোঝালেন না। যেন আমায় চেনেন না।"

বাবু বলল, "দুজনে জানাশোনা আছে?"

"আলবাৎ আছে। সান্যালমশাই তুমি বলে কথা বললেন সিংহীবাবুর সঙ্গে।"

"তারপর?"

"তারপর আমায় ভদ্রভাবে তাড়িয়ে দিলেন।"

শিশির আর বাবু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। মাথায় কিছু ঢুকছিল না।

বংশী চা শেষ করল। বাবু বলল, "দুজনের মধ্যে তা হলে ভাবসাব আছে?"

"নিশ্চয়।"

শিশির মাথা চুলকোতে লাগল। "ব্যাপার তো আরও জটিল হয়ে গেল, বাবুদা।

তুমি বলছিলে সিংহীবাবুর কাছে সারেন্ডার করতে। এ তো দেখছি, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।"

বংশী বলল, "আমি তোমায় বারবার বলছি শিশির, সিংহীবাবুর ভড়কিতে তুমি ভুলো না। ও গভীর জলের মাছ।"

"তাই দেখছি।"

সামান্য অপেক্ষা করে বংশী বলল, "ভাই আমি আগে কোনওদিন ভবতোষ সান্যালের বাড়ির মধ্যে যাইনি। বাইরে থেকে দেখেছি। ভদ্রলোককেও দেখেছি এক-আধ দিন। গাড়িতে বসে আছেন। বাজারে গাড়ি এসেছে। উনি একপাশে বসে আছেন। কোনও দিন রাস্তায় নামেননি। চোখে সবসময় রঙিন কাচের চশমা, গগ্‌লস্ ধরনের। আজ ও বাড়িতে গিয়ে দেখলাম—এলাহি কাণ্ড। পুরনো বাড়ি না হলেও অন্যের বাড়ি কিনে কী কাণ্ড করেছে ভাই। খুব ধনী লোক। বাড়ির ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হল, দুর্গের মতন পাকাপোক্ত।"

বাবু বলল, "ভদ্রলোক কতকাল এখানে আছেন?"

"বছরখানেক।"

"কী করেন?"

"জানি না। কলকাতার লোক। ঠিকানা জানি না। তবে ভদ্রলোকের চেহারা সুন্দর। বনেদি চালচলন। চুরুট খান। গলা গম্ভীর।"

শিশির বলল, "সিংহীবাবুর কাছ থেকে ভদ্রলোকের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।"

"তুমিও যেমন," বংশী বলল, "তুমি ভদ্রলোকের খোঁজ করার আগে ভদ্রলোকই তোমার খোঁজ করে ফেলেছেন। আমারও।"

শিশির হতাশ গলায় বলল,"না, আর আমাদের দ্বারা কিছু হবে না। এত প্যাঁচালো ব্যাপার। আমার মাথায় ঢুকছে না কিছু।

বংশী বলল, "হবে না কী হে! আলবাত হবে। হাল ছাড়ার পাত্র আমি নই।"

বাবু বলল, "বাড়িটা একবার দেখা যায় না?"

"বাইরে থেকে যায়। বিকেলে বেড়াতে যাবেন ওদিকে। দেখতে পাবেন। তবে ভেতরে ঢোকা মুশকিল।"

বাবু বলল, "বেশ, বাইরে থেকেই আজ একেবারে দেখে আসব।"

॥ একুশ ॥

শিশিরকে দেখাতে হল না, বাবু দূর থেকেই বুঝতে পারল, বিরাট ওই বাড়িটা ভবতোষ সান্যালের। বোঝা অবশ্য কঠিন ছিল না। চারদিক ফাঁকা, মাঠ আর মাঠ, শুধুমাত্র একটিই বাড়ি; বাড়ির একেবারে গায়ে গায়ে কোনও লোকালয় নেই, সামান্য তফাতে দু-চার ঘর দেহাতির বাস।

বাবু প্রথমে কিছু বলেনি। খানিকটা এগিয়ে এসে বলল, "বাড়িটা কিন্তু তত বড় নয়, চৌহদ্দিটাই বিরাট।"

শিশিরেরও মনে হল; উঁচু পাঁচিল, গাছগাছালির জন্যে বাড়িটাকে যেন আরও বড় মনে হয়। আসলে বাংলো ধরনের বাড়ি, যতখানি ইমারত তার অন্তত চার গুণ ফাঁকা জমি। আর বাগান।

শিশির বলল, "বাবুদা, এই জায়গায় লোকে এত বড় বাড়ি করে?"

বাবু বলল, "টাকাপয়সা থাকলেই করে। শখ। এ রকম শখ বনেদি বাঙালি বাবুদের খুবই ছিল আগে। আজকাল আর নেই।"

"না থাকাই ভাল। পয়সা নষ্ট।" শিশির বলল।

রেললাইনের গা বেয়ে সরু হাঁটা পথ। সেই পথ ধরে শিশিররা এসেছিল। সোজা পথ তারা ইচ্ছে করেই এড়িয়েছে। কিন্তু বলা যায় না। কে কোথায় নজর রাখছে কে বলবে!

আরও খানিকটা এগিয়ে এল শিশিররা। এই জায়গা থেকে বাড়িটাকে মোটামুটি দেখা যায়। তারা রেললাইনের পাশে দাঁড়িয়ে, জায়গাটা উঁচু, আশপাশের মাঠঘাট বেশ খানিকটা নিচু জমিতে। বাড়িটাও। রেল-লাইন থেকে অন্তত শ'খানেক গজ দূরে বাড়ি। চার দিকে পাঁচিল। বাড়ির সামনের দিকে বড়সড় গাছপালা না থাকলেও পেছন দিকে যে আছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল। কোথাও কোনও লোকজন চোখে পড়ছিল না। কুকুরের ডাক দু-চার বার শোনা গেল।

বাবু বলল, "বিস্তর পয়সাঅলা লোকের বাড়ি, বুঝলি?"

"সে তো বোঝাই যায়," শিশির বলল।

বাবু বলল, "তা নয়। একটা জিনিস লক্ষ করলে টাকার বহরটা বুঝতে পারবি।"

"কী জিনিস?"

"গেটের কাছে একটা ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে, তার মাথায় সার্চলাইট দেখেছিস?"

শিশির দেখেছিল, কিন্তু খেয়াল করেনি। বলল, "হ্যাঁ, ওই উঁচু পোস্টটা তো!"

"আর একটা জিনিস দ্যাখ। অত উঁচু পাঁচিল। তবু পাঁচিলের ওপর আরও হাত-দুই উঁচু করে তার কাঁটা লাগানো। সান্যালমশাই সব দিক এত সামলে রেখেছেন কেন? চোর-ডাকাতের ভয়ে?"

"তা ছাড়া আর কেন হবে?"

"এদিকে আবার কুকুরও আছে। বোধ হয় বন্দুকও রাখেন।"

শিশিরেরও মনে হল, সান্যালমশাই প্রয়োজনের বেশি সতর্ক, সাবধানী। এত সাবধান হবার কী আছে? কোনও গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছেন নাকি? নাকি, সবটাই শখ, টাকা ছড়ানোর আনন্দ।

বাবু বলল, "একবার ভেতরে গিয়ে দেখতে পারলে হত।"

"থাক, বাবুদা। হুড়োহুড়ি করে লাভ নেই। বাড়িটা দূর থেকে দেখলে এই যথেষ্ট। ভেতরটা পরে হবে। নাও, আর নয়, আলো মরে আসছে, ফেরো।"

বাবুও বুঝতে পারছিল, আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। বিকেল ফুরিয়ে গিয়েছে, আলো মরে আসছে, খানিকটা পরে অন্ধকার হয়ে যাবে। অন্ধকার হয়ে গেলে কষ্ট হবে ফিরতে।

পাশাপাশি হাঁটার মতন চওড়া রাস্তা নয়, আগুপিছু হয়ে হাঁটছিল দুজনে।

বাবু বলল, "সিংহী আর সান্যাল—এরা কি বন্ধু?"

"তাই মনে হয়।"

" কিন্তু যদি শত্রু হয়?"

"কেন, শত্রু হবে কেন? শত্রু হলে সিংহীবাবু ও বাড়িতে যাবেন কেন?"

"বাইরে বন্ধু, ভেতরে শত্রু। সিংহীবাবু না তোকে বলেছেন, উনি তোর শত্রু নন। কিন্তু উনি জানেন, কে তোর শত্রুতা করছে।"

শিশির বলল, "সিংহীবাবুর কথা বাদ দাও। আমায় যা বলেছেন সেটা একটা চালও হতে পারে। বংশীই ঠিক বলেছে। মানুষটি অত সোজা নন।"

বাবু কোনও জবাব দিল না।

অনেকক্ষণ আর কোনও কথাবার্তা নেই। একটা গাড়ি আসার সিগন্যাল দেখা যাচ্ছিল। সবুজ হয়ে রয়েছে সিগন্যাল।

শিশির বলল, "একটা জিনিস কিন্তু বেশ বোঝা গেল।"

"কী?"

"আংটিটা কিছু নয়। ওটা ব্লাফ।"

"তাই মনে হচ্ছে। এরকম ব্লাফ হয়তো আরও পাওয়া যাবে।"

হঠাৎ শিশিরের নজরে পড়ল, তাদের উলটো দিক দিয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে। লোকটাকে এতক্ষণ নজরে পড়েনি। আশ্চর্য! কোথায় ছিল লোকটা? লুকিয়ে ছিল? লুকোবার মতন জায়গা কোথায়? রেললাইনের পাশে ঝোপঝাড়, ঢিবি, একটা ভাঙা কেবিনও পড়ে আছে। এরই কোথাও লুকিয়ে ছিল নাকি?

"বাবুদা, একটা লোক আসছে।"

বাবু দেখল। বলল, "কে?"

"জানি না।"

"এমনি লোক হতে পারে।"

"হ্যাঁ, পারে। আবার নাও পারে! আমার মাথা ফাটাবার চেষ্টা হবার পর থেকেই আমি সাবধান হয়ে গিয়েছি।"

বাবু কেমন ভয় পেয়ে গেল। একটা লোক উলটো দিক থেকে আসছে এটা দেখা গেলেও তার হাতে কিছু আছে কি নেই তা দেখা যাচ্ছিল না।

"লোকটার যদি বদ মতলব থাকে," শিশির বলল, "আজ আমি ছেড়ে কথা বলব না।"

"কী করবি?"

"মারব।"

"মারবি? শুধু হাতে?"

"বেটার নাকে মারব। নাক দারুণ জায়গা। তুমি দুটো পাথর কুড়িয়ে নাও তো। একটা আমায় দাও।"

বাবু রেললাইন থেকে দুটোর বেশি পাথর কুড়িয়ে নিল। একটা পাথর শিশিরকে

দিল। শিশির হাতের মুঠোয় রাখল পাথরটা।

"বাবুদা?"

"বল।"

"লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল।"

"দেখেছি।"

শিশিরও দাঁড়াল। তাকাল ডাইনে বাঁয়ে। রেললাইনের গা দিয়ে গড়ানো জমি। দরকার হলে দৌড়নো যেতে পারে। কিন্তু এই সন্ধের মুখে দৌড়নো খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কোথায় হোঁচট খেয়ে পড়বে কে জানে।

লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ে বিড়ি-সিগারেট কিছু ধরাল। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল, তারপর আগুনের ফুলকি চোখে পড়ল। মিটমিট করে জ্বলছে।

শিশির এগোতে লাগল।

বাবু বলল, "শুধু হাতে বেরোনো উচিত হয়নি।"

"সে পরে ভেবো। এখন ওর দিকে চোখ রাখো।"

দু দিক থেকে দুই পক্ষই ক্রমশ মুখোমুখি হতে লাগল। শিশিরের হাতের মুঠো আরও শক্ত হল। পাঁচ-সাত পা তফাত থাকতেই লোকটা আবার দাঁড়াল। শিশিররাও দাঁড়িয়ে পড়ল। পাজামা আর হাফ-হাতা শার্ট পরা একটা লোক, মাথার চুল ছোট ছোট, গোল মুখ।

শিশির সাবধানে দু পা এগিয়ে গেল।

লোকটা একেবারে গায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "কিতনা টাইম হুয়া বাবু?"

শিশির দুটো হাতই পিঠের দিকে আড়াল করে রেখেছিল। ঘড়ি দেখার জন্যে হাত সামনে আনল না। বলল, "ঘড়ি নেই।"

লোকটা বিড়িই খাচ্ছিল। হিন্দি মেশানো বাংলায় বলল, "বাবুলোকের হাতে ঘড়ি না থাকে।" কথায় কেমন যেন টিটকিরির ভাব।

শিশির বলল, "ঘড়িসে তোমার কাম কী? কোথায় যাবে?"

"ওহি কোঠিমে।" বলে সান্যালমশাইয়ের বাড়ি দেখাল।

"আচ্ছা! ওই কুঠিতে কাজ করো?"

"জি।"

"কীসের কাজ কর?"

"গাড়ি চালাই।"

"ড্রাইভার!"

লোকটা এবার পাশ কাটাবার জন্যে পা বাড়াল। শিশিরের পেছনে বাবু। শিশির সাবধানে জায়গা দিল লোকটাকে। বাবু সরে গেল।

কোনও কথা না বলে লোকটা পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

এবার গাড়ি আসার শব্দ শোনা গেল। শিশির লোকটাকে পেছন ফিরে দেখল খানিক। তারপর বলল, "চলো বাবুদা।

স্টেশনের দিকে আবার পা বাড়াল দুজনে। গাড়িটা প্রায় এসে পড়ল। মালগাড়ি।

স্টেশনের দিক থেকেই আসছে। এঞ্জিনের আলো পড়ছিল লাইনে। ধবধব করে উঠল এদিকটা।

শিশির বলল, "বাবুদা, লোকটা ড্রাইভার নয়। গাড়ি চালায় না।"

"কেমন করে বুঝলি? চিনিস ওকে?"

"লোকটার বাঁ হাতের কবজির কাছ থেকে নুলো-মতন। বেঁকা, রোগা। এই হাতে গাড়ি চালানো যায় না।"

"তুই দেখেছিস?"

"হ্যাঁ। আমি সারাক্ষণ ওর হাতের দিকে নজর রেখেছিলাম।"

"তোর তো দারুণ চোখ।"

"ঠকে শিখতে হচ্ছে।"

"ও তা হলে মিথ্যে কথা বলল?"

"কোনও সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় লোকটা আমাদের আগেই দেখেছে। হয় ও দেখেছে, কিংবা অন্য কেউ! আমাদের লক্ষ করার জন্যই এসেছিল। কিন্তু কেমন করে এল, কোথা থেকে এল বুঝতে পারছি না।"

আর কথা বলা গেল না। মালগাড়ি যাচ্ছিল। লাইন কাঁপছিল, শব্দ হচ্ছিল বিশ্রী। বাবু বলল, "লোকটা তা হলে সান্যালমশাইয়ের ইনফরমার?"

শিশির বলল, "তা ছাড়া আবার কী! আমাদের ওপর চারদিক থেকে এত নজর দেখে বেশ ভয় হচ্ছে, বাবুদা! গভীর ব্যাপার কিছু আছে! তাই না?"

বাবু বলল, "তাই মনে হচ্ছে।"

॥ বাইশ ॥

স্টেশন ঘুরে শিশিররা এল বংশীর দোকানে। দোকান খোলা, বাতি জ্বলছিল। একাই ছিল বংশী।

শিশির আর বাবু দোকানে পা দিতেই বংশী চেঁচিয়ে উঠল, "আসুন বাবুদা। গিয়েছিলেন ওদিকে?"

বাবু জবাব দেবার আগেই শিশির বলল, "গিয়েছিলাম। ওখান থেকেই আসছি!"

দোকানের ভেতরে এসে দাঁড়াল শিশির। বংশীর দোকান ছোট হলেও কোথাও এলোমেলো ভাব নেই। খদ্দেরদের বসার জন্যে এক জোড়া টুল। ভেতরের দিকে চেয়ার। গায়ে গায়ে।

বাবুই আগে বসল। অনেকটা হাঁটা হয়েছে। পা ধরে গিয়েছিল।

শিশির বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ, বংশী। বাড়িটা যেন মিলিটারি মার্কা। অত উঁচু পাঁচিল, তার ওপর কাঁটাতার। ওদিকে আবার এক টাওয়ার লাইট।"

বংশী বলল, "হ্যাঁ, মিস্টার সান্যাল চারদিক দেখে-শুনে থাকতে ভালবাসেন," বলে একটু হাসল। "যাক, তোমাদের অভিযানটা শুনি।"

শিশির বসল। বলল সব। তারপর জিজ্ঞেস করল, "তুমি তো ও বাড়ির গাড়ির

ড্রাইভারকে দেখেছ। ওই নুলো লোকটা নিশ্চয় গাড়ি চালায় না?"

মাথা নাড়ল বংশী। "ওদের গাড়ি চালায় বুড়োমতন একটা লোক, মাথায় কাঁচাপাকা চুল; চোখে চশমা।"

শিশির বাবুকে বলল, "দেখলে বাবুদা, আমি তোমায় আগেই বলেছি, ও বেটা মিথ্যে কথা বলল।"

বাবু ঘাড় নাড়ল। কথাটা ঠিকই। বাবু বংশীর দিকে তাকিয়ে বলল, "একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। রেললাইনের পাশ দিয়ে যে হাঁটাপথ সেই পথ দিয়ে কত লোকজন যায়, সব সময়েই। আমরা দুজন ওই রাস্তায় যাচ্ছি এটা কি নজরে পড়ার মতন ঘটনা! নিশ্চয় নয়। কেউ যদি আমাদের দিকে সব সময় চোখ রাখে, তবেই বুঝতে পারবে আমরা কোথায় যাচ্ছি, কী করছি। তাই না?"

শিশির বলল, "আমি তো তোমায় আগেই বলেছি, আমাদের ওপর ওদের সব সময় নজর আছে।"

বাবু বলল, "ওদের মানে কাদের? সিংহীর না সান্যালের? যদি সিংহীর নজর থাকে তা হলে সে সান্যালের ইনফরমার।"

বংশী বলল, "এটা আর নতুন কথা কী! আমি নিজের চোখেই তো দেখেছি।"

মাথা নাড়ল বাবু। বলল, "না, তুমি সিংহীবাবুকে সান্যালের বাড়িতে দেখেছ। একজনের বাড়িতে বাইরের কাউকে দেখলেই তাকে অতটা সন্দেহ করা কি ঠিক? হয়তো সিংহীবাবু কোনও কাজে সান্যালমশাইয়ের কাছে গিয়েছিলেন।"

"তা কেমন করে হয় বাবুদা?" বংশী বলল।

"হতে পারে না? ধরো, তুমি যে সান্যালমশাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলে এটা যদি আমি দেখতাম, আমিও কি তোমায় ইনফরমার ভাবতাম! সিংহীমশাই ও বাড়িতে প্রায় যান কি না, বা গেলেও সান্যালমশাইয়ের সঙ্গে তাঁর কেমন সম্পর্ক এটা জানতে হবে।"

বংশী বলল, "সেটা জানা মুশকিল নয়। থানার হেমবাবুই জেনে দিতে পারবেন। তবে আমার কথা যদি বলেন, আমি সিংহীবাবুকে বিশ্বাস করি না। ভদ্রলোক শিশিরের প্রায় সব কথাই জানেন। কেন? এত কথা, জানার উদ্দেশ্য কী তাঁর।"

বাবু চুপ করে গেল। সে যা শুনেছে শিশিরের মুখে তাতে অবশ্য সিংহীমশাইকে বিশ্বাস করার চেয়ে অবিশ্বাসই বেশি করতে হয়।

শিশির বলল, "বংশী, এবার একটু চা খাওয়া দরকার। অনেক হেঁটেছি।"

"বোসো, বলে আসছি।"

"কিছু নোনতাও দিতে বলো, খিদে পেয়ে গিয়েছে।"

বংশী দোকান ছেড়ে বাইরে গেল।

শিশির বলল, "বাবুদা বংশী বোধ হয় ঠিকই বলছে। সিংহীমশাইকে আমিও প্রায় বিশ্বাস করতে বসেছিলাম। কিন্তু এখন আর করি না।"

বাবু বলল, "আমি বিশ্বাস করতে বলছি না। আমি বলছিলাম, লোকটাকে হাতে রাখা দরকার। ওর কাছ থেকে আমরা যদি কিছু জানতে পারি সেটা আমাদের লাভ।

নয় কি! এই যে আজ আমরা বুঝতে পারছি—আংটির ব্যাপারটা একেবারে বাজে, ধোঁকাবাজি—এটা তো সিংহীমশাইয়ের কথা থেকেই বোঝা গেল। সে রকম যদি জানতে পারা যেত, কে তোর শত্রুতা করছে, কেন করছে—তা হল আজ এত অন্ধকারে থাকতে হত না।"

শিশির কিছু বলল না। ভাবছিল। বাবু অন্যমনস্কভাবে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। তারপর ধরাল।

এমন সময় দোকানে এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক এলেন। তিনি দোকানে পা দিয়ে শিশির আর বাবুকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকালেন। যেন বংশী কোথায় লুকিয়ে আছে দেখছিলেন।

শিশির বলল, "বংশী চায়ের দোকানে গিয়েছে, আসছে। আপনি বসুন।"

ভদ্রলোক বসলেন না। চৌকাঠের দিকে ফিরে গিয়ে বাইরের দিকটা দেখতে লাগলেন।

সামান্য পরেই বংশী এল। ভদ্রলোক বললেন, "অভয়কে তুমি টাকা দিয়েছিলে; এই নাও তোমার রসিদ। টাউনের ওরা তোমার জিনিস এই হপ্তার শেষে পাঠিয়ে দেবে।"

রসিদ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, বংশী হঠাৎ বলল, "শিবুয়াকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই চলত, আপনি কষ্ট করে কেন এলেন চ্যাটার্জিদা!"

"কষ্ট করে নয় হে; এদিকেই যাচ্ছি। একবার থানায় যাব।"

"থানায়?"

"আমাদের বাস একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়েছে। থানায় একবার লিখিয়ে আসি।"

"কার গাড়ি? কোথায় অ্যাকসিডেন্ট হল?"

"মিস্টার সান্যালের গাড়ি। মাইলখানেক দূরে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সিরিয়াস কিছু নয়। ধাক্কা। সান্যাল গাড়িতে ছিলেন না; অন্য একজন ছিল, এদিককার লোক। দোষ ঠিক বাস ড্রাইভারের নয়। যাই, একবার বলে আসি থানায়। কোম্পানির বাস। বুঝতেই তো পারছ।" চ্যাটার্জিমশাই চলে গেলেন।

শিশির বলল, "বাস সার্ভিসের ম্যানেজার না?"

"হ্যাঁ, চ্যাটার্জিদা। ভীষণ ভাল লোক।"

"সান্যালমশাইয়ের গাড়ির সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট? কখন হল ব্যাপারটা?"

"বোধ হয় দু-এক ঘণ্টার মধ্যে। টাউন থেকে বাসটা এল তো খানিকটা আগে। বোধ হয় তখন।"

"তা হলে আমরা যখন বাড়িটা দেখে ফিরছি তখনই হবে," বলে শিশির বাবুর মুখের দিকে তাকাল।

চা আর শিঙাড়া নিয়ে একটা ছোকরা এল। শালপাতার ঠোঙা করে গরম শিঙাড়া এনেছে, কেটলি করে চা। মাটির খুরিও এনেছিল। শালপাতার ঠোঙা রেখে চা দিয়ে ছোকরা চলে গেল।

শিশির শিঙাড়া খেতে খেতে বলল, “বংশী, বাবুদা একটা কথা বলছিল। বলছিল, আমরা যদি এইভাবে অন্ধের মতন ঘুরে বেড়াই কোনও কাজ হবে না। সিংহীবাবুই হোক আর সান্যালবাবুই হোক কোনও একজনের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। তার মানে এই নয় যে, আমরা ওদের বিশ্বাস করছি। কিন্তু ব্যাপারটা কী তা আন্দাজ করতে হলে একটা পালটা চাল তো দিতেই হবে। বাবুদা বলছিল, সিংহীবাবুকে চালের ঘুঁটি করলে কেমন হয়। ভদ্রলোক নিজেই আমাকে বলেছেন, তিনি আমার শত্রু নন।”

বংশীর মুখে গরম শিঙাড়া। কথা বলতে পারল না।

বাবু হেসে বলল, “বংশী, যুদ্ধের একটা বড় চাল হল দুজন যদি শত্রু থাকে—তার মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিয়ে নিজের কাজে লাগানো।”

বংশী বলল, “কথাটা ঠিক বাবুদা। কিন্তু কে যে বড় শত্রু আর কে ছোট শত্রু তা তো বুঝতে পারছি না। ধরুন ওরা দুজনে যদি এমন একটা সাঁট আগেই করে থাকে তা হলে আমরা তো সিংহীবাবুর খপ্পরে গিয়ে পড়ব।”

কথাটা শিশিরের মনে ধরলেও বাবুর ধরল না। বাবু বলল, “দ্যাখো বংশী, কার স্বার্থ কতটা আগে আমাদের জানা দরকার।”

“কিন্তু স্বার্থ কী তা তো ধরতেই পারছি না।”

“সিংহীর সঙ্গে ভাব পাতিয়ে সেটা জানতে হবে।”

বংশী চা খেল দু-চুমুক। বলল, “বেশ তা হলে আপনারা ও লাইনে চেষ্টা করুন। আমি অন্য লাইনে করি।”

“তোমার লাইনটা আবার কী?”

“আমি ভবতোষ সান্যালের আগের ব্যাপারটা জানতে চাই। শোনা কথা কোনও কাজের কথা নয়। ভদ্রলোক এত ধনদৌলত কেমন করে করলেন, আগে সত্যি সত্যি কী করতেন, এখানেই বা কেন এভাবে রয়েছেন—এটা জানা দরকার।” বলে বংশী একটু থামল, বার-দুই চুমুক মারল আবার চায়ে। বলল, “একটা কথা কিন্তু ঠিক। ওই টেলিগ্রাম সান্যালমশাই করেছিলেন।”

শিশির বলল, “ওটা তোমার সন্দেহ, প্রমাণ কোথায়?”

“প্রমাণ আমি দেব। পোস্টঅফিসের সবাইকে আমি চিনি। পোস্টমাস্টার নতুন, অন্যরা পুরনো। তাদের আমি বলে রেখেছি। তবে, ওই সান্যালমশাইয়ের যে কলকাতায় টেলিগ্রাম করার শখ আছে—এটা আমায় পোস্টঅফিসের যাদবজি আজ বলেছেন। উনি মাঝে-মাঝেই কলকাতায় টেলিগ্রাম করেন।”

শিশির রীতিমতো অবাক হয়ে গেল। বলল, “কলকাতায়! কেন?”

“তা বলতে পারব না। লোকজন আছে, হয়তো ব্যবসাপত্রও আছে কিছু। যাদবজি বলেছে, এবার থেকে লক্ষ রাখবে কীসের টেলিগ্রাম যায়।”

রাত না হলেও বাবু উঠে পড়ল। বলল, “বংশী, আমরা যাই। বেশি রাত করব না। আমাদের একটু সাবধানে থাকা ভাল।”

বংশী বলল, “আসুন। টর্চ আছে?”

"হ্যাঁ।"

বাবু আর শিশির বেরিয়ে পড়ল। বাবুই বলল, "চল, বড় রাস্তা দিয়ে ঘুরে যাই।"

দুজনে বাঁ দিকে এগোল।

খানিকটা এগিয়ে একটা মোড়। তেমাথা। মোড়ের মুখে আসতেই দেখল চ্যাটার্জিদা। থানা থেকে ফিরছেন বোধ হয়। এতক্ষণ থানায় তিনি কী করছিলেন কে জানে।

শিশিরই দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাছাকাছি এলেন চ্যাটার্জিবাবু। চোখ তুলতেই দেখতে পেলেন শিশিরকে।

শিশির হাসি-হাসি মুখ করল। "থানা থেকে ফিরছেন?"

"হ্যাঁ।"

"এত দেরি?"

"দেরিই হয়ে গেল। থানায় গিয়ে শুনলাম মিস্টার সান্যালের গাড়ি আবার একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। গাড়ির দরজা খুলে একজন পড়ে গিয়েছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে।"

"সে কী! কে পড়ে গেল?"

"সিংহীবাবু বলে এক ভদ্রলোক।"

শিশির কেমন শব্দ করে উঠল। পাশেই বাবু। বাবু বোকার মতন তাকিয়ে থাকল চ্যাটার্জিবাবুর দিকে।

॥ তেইশ ॥

কথায় বলে, রাখে হরি মারে কে? সিংহীবাবুরও সেই অবস্থা। ভদ্রলোক যেভাবে পড়েছিলেন, তাতে বড় রকম আঘাত পেতে পারতেন। মাথায় লাগতে পারত, কোমর পিঠ গুঁড়িয়ে যেতে পারত, অন্ততপক্ষে হাত-পা ভাঙতে পারত। একেবারেই তেমন কিছু হল না, কাঁধে আর বাঁ হাতে লাগল। হাসপাতাল সিংহীবাবুকে রাখেনি। তখনকার মতন ওষুধপত্র দিয়ে, বাঁ হাতের কবজির কাছে ক্রেপ ব্যান্ডেজ বেঁধে ছেড়ে দিল।

শিশিররা তাই পরের দিন বিকেলই সিংহীবাবুকে তাঁর বাড়ির সামনে দেখতে পেল। বারান্দায় বসে ছিলেন ভদ্রলোক।

শিশিরের চোখ পড়তেই সে বাবুর হাত টিপে অবাক গলায় বলল, "বাবুদা, সিংহীবাবু!"

বাবু তাকাল। দেখল। বারান্দায় কাঠের চেয়ারে এক রোগা মতো ভদ্রলোক বসে আছেন। গায়ে গেঞ্জি।

বাবু কিছু বলার আগেই শিশির বলল, "চলো, খবর নিয়ে আসি।"

রাস্তার ধার ঘেঁষেই সিংহীবাবুর বাড়ি। ফটক খুলে শিশির আর বাবু ভেতরে ঢুকল।

সিংহীবাবু ওদের দেখছিলেন। কয়েক পা এগিয়ে শিশির সিঁড়ির মুখে এসে বলল, "আপনি ভাল আছেন? কাল রাত্তিরে শুনলাম, আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।"

সিংহীবাবু বিরক্ত হলেন না। বরং ভদ্রভাবে বললেন, "এসো।" বলে বাবুকে দেখালেন চোখের ইশারায়।

"বাবুদা। আমার বন্ধু। কলকাতায় একই পাড়ায় থাকি। বাবুদা দুর্গাপুরে কাজ করে। বেড়াতে এসেছে এখানে।" শিশির বলল।

"ও!" সিংহীবাবু এমন চোখ করে তাকালেন যেন বাবুর পরিচয় তিনি এই প্রথম পেলেন। কিন্তু বেশ বোঝা গেল, তিনি কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন।

শিশির বলল, "কেমন করে অ্যাক্সিডেন্ট হল?"

"দরজা খুলে পড়ে গিয়েছিলাম," সিংহীবাবু বললেন। "বোসো তোমরা, একটা কিছু দিতে বলি।"

"আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা একটু দাঁড়িয়েই থাকি!"

"না না, তা কেমন করে হয়। দাঁড়াও একটু...।" সিংহীবাবু উঠে ভেতর-ঘরে গেলেন।

শিশির নিচু গলায় বলল, "বাবুদা, যন্ত্রে অন্য রকম সুর বাজছে। একটু নরম-নরম লাগছে।"

"ব্যাপার কী?"

"বুঝতে পারছি না।"

"যদি নরম-নরম লাগে, তা হলে একটু টিপে দ্যাখো না—যদি কিছু শোনা যায়।"

"দাঁড়াও, দেখছি।"

বাবু বাড়িটা দেখতে লাগল। আজকাল বিকেল পড়তে-না-পড়তে অন্ধকার হয়ে আসে। শিশিররা একটু আগেভাগেই বেরিয়েছিল, তবু বোঝা যাচ্ছে, আর বড়জোর আধ ঘণ্টা, তার পরই গাঢ় অন্ধকার হয়ে যাবে।

সিংহীবাবু এলেন। তাঁর কাজের লোকটা ছোটমতন এক বেঞ্চি নিয়ে পেছন-পেছন এল। পেতে দিল বেঞ্চিটা।

"বোসো," সিংহীবাবু বসতে বললেন।

শিশিররা বসল। বসেই শিশির জিজ্ঞেস করল, "আপনার লেগেছে কোথায়? শুধু হাতে? ভাঙেনি তো?"

সিংহীবাবু বললেন, "ভাঙেনি বোধ হয়। কবজির কাছটায় মচকে গিয়েছে। তাও কী যন্ত্রণা! কাঁধে লেগেছে। ব্যথা বেশ।"

"কেমন করে হল?"

সিংহীবাবু প্রথমটায় কথার জবাব দিলেন না। কিছু যেন ভাবছিলেন। চোখের দৃষ্টি ফাঁকা-ফাঁকা লাগল সামান্য, তারপর কেমন কঠিন হয়ে এল। একবার শিশিরকে দেখলেন, তারপর বাবুকে। বললেন, "কেমন করে হল—শুনলে কি কিছু বুঝতে পারবে! তবু শোনো—"

সিংহীবাবু অ্যাক্সিডেন্টের বিবরণ দিলেন। তিনি সান্যালমশাইয়ের গাড়ি করে

বগোদর গিয়েছিলেন। ফেরার পথে গাড়িটা বাসের সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট করে। দোষ গাড়ির ড্রাইভারের। বাসটাকে বাঁকের মাথায় এমন করে ওভারটেক করল যে, বাসের মুখটা লাগল গাড়ির পেছনের দরজায়। সিংহীবাবু তখন পেছনে বসেছিলেন। অ্যাক্সিডেন্টের পর বাঁ দিকের দরজাটা আলগা হয়ে গেল। ঠিকমতন বন্ধ হচ্ছিল না। সান্যালমশাইয়ের ড্রাইভার তখন সিংহীবাবুকে সামনে এসে বসতে বলল। বসলেন সিংহীবাবু। তার পর আবার এক জায়গায় এসে বিশ্রী এক বাঁকের মাথায় তাঁর দরজা খুলে গেল—তিনি পড়ে গেলেন। আর একটু এদিক-ওদিক হলে তিনি মরতেন। কপালজোরে বেঁচে গিয়েছেন।

শিশির বলল, "সত্যিই আপনার ভাগ্যের জোর আছে। ভগবান বাঁচিয়েছেন।"

সিংহীবাবু চুপ। খানিকটা পরে বললেন, "হ্যাঁ, ভগবান আমায় বাঁচিয়েছেন, কিন্তু আমি নিজেও একটু সাবধানে ছিলাম," বলে বাঁ হাতটা ধীরে ধীরে বুকের কাছে ওঠালেন। যন্ত্রণার মুখ করলেন। সামলে নিয়ে বললেন, "তুমি আমায় বিশ্বাস করলে না, আমার কথা শুনলে না, তা হলে তোমায় সব বলতে পারতাম।"

শিশির অপ্রস্তুত। কী বলবে বুঝতে পারছিল না। শেষে বলল, "আমি আপনাকে অবিশ্বাস করলাম কোথায়? আপনি ভুল বুঝেছেন।"

"করোনি অবিশ্বাস?"

"বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোনওটাই করিনি।"

"তা হলে থানার লোক আসে কেন আমার বাড়িতে?"

"আমি পাঠাইনি। বিশ্বাস করুন।"

"তোমার ওই বন্ধু বংশী পাঠিয়েছিল?"

শিশির দু-তরফ বজায় রেখে বলল, "না, বংশীও পাঠায়নি। তবে সে আর আমি থানায় গিয়েছিলাম। কেন গিয়েছিলাম তাও আপনাকে বলেছি। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, একটা লোক আমায় যদি রাস্তায় জখম করার চেষ্টা করে, আমি কী আর করতে পারি! থানায় গিয়ে তো জানাতেই হবে।"

সিংহীবাবু অত সহজে ভোলার মানুষ নন। বললেন, "তা বলে থানার লোক আমার কাছে আসবে?"

শিশির চুপ করে থাকল। বংশী এই কাঁচা কাজটা না করলেই পারত।

বাবু এতক্ষণ কোনও কথা বলছিল না। সিংহীবাবুকে দেখছিল আর কথা শুনছিল দুজনের। এবার কী ভেবে বলল, "থানার লোকরা বড় উলটোপালটা কাজ করে। আমি তো ভাবতেই পারি না, তারা আপনার কাছে কেন আসবে?"

সিংহীবাবু কথাটা শুনলেন, কোনও মূল্যই দিলেন না। শিশিরকে বললেন, "তুমি নিজে এসে ভালই করেছ। নয়তো আমিই তোমার কাছে যেতাম। কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

"বলুন।"

"এখন বলব কি না ভাবছি—" বলে বাবুর দিকে তাকালেন সিংহীবাবু।

শিশির বুঝল। বলল, "বাবুদা আমার বন্ধু। সবই জানে। আপনি ওর কাছে বলতে

পারেন।”

সিংহীবাবু বললেন, “জানি। তবে কথাগুলো অন্য কানে না যাওয়াই ভাল।”

“যাবে না।”

“মুখে বলছ যাবে না, কিন্তু আর-একটু পরে গিয়েই তো তোমার বন্ধু বংশীকে বলবে।”

শিশির অস্বীকার করতে পারল না। “বংশীকে বললে কোনও ক্ষতি হবে না, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন।”

“ও খুব চতুর। কিন্তু সব জায়গায় তো চালাকি চলে না। তোমার ওই বংশী-বন্ধু ভবতোষ সান্যালের বাড়ি গিয়েছিল কেন?”

শিশির একবার বাবুর মুখের দিকে তাকাল। তারপর সিংহীবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, “ওর দোকানের ব্যাপারে।”

“না।”

“আমাকে তাই বলেছে।”

“তুমি ভীষণ মিথ্যেবাদী, সত্যি কথা বলতে পারো না?” সিংহীবাবু ধমকে উঠলেন। “আমার কাছে মিথ্যে কথা বোলো না। আমি বারবার তোমায় বলেছি, আমায় তুমি বিশ্বাস করতে পারো। আমি তোমার শত্রু নই।”

বাবু আড়ালে গা টিপল শিশিরের। বলল, “শিশিরের মাথা গোলমাল হয়ে যায়। ও কিন্তু কোনও দিন আপনাকে শত্রু মনে করে না।”

এবারও বাবুকে উপেক্ষা করে সিংহীবাবু বললেন, “আমি বলছি। কেউ ওকে বলেছে ভবতোষবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় আছে। ও শুনেছে কোনওভাবে। তাই ভবতোষবাবুকে বাজিয়ে দেখতে গিয়েছিল। তাই না?”

শিশির নিশ্চিন্ত হল। আর যাই হোক, সিংহীবাবু আসল ব্যাপারটা ধরতে পারেননি। বংশী গিয়েছিল এক মতলব নিয়ে, গিয়ে সে দু-চারটে অন্য ব্যাপার জানতে পেরেছে।

শিশির বলল, “আপনাকে ও দেখেছে ও-বাড়িতে এটা বলেছে। আর কিছু বলেনি।”

“তার বেশি আর কী বলবে! কারও বাড়িতে আসা-যাওয়া করলে, আলাপ থাকলে সেটা কি অন্যায়?”

“না না, তা কেন হবে!”

“তোমার বন্ধুকে সেটা বলে দিয়ো।” বলে সিংহীবাবু একটু থেমে হঠাৎ বললেন, “তুমি ভবতোষবাবুকে চেনো?”

“না।”

“দেখোনি কখনও?”

“না না, দেখিনি।”

“এখানের কথা বলছি না। কলকাতাতেও দেখোনি?”

শিশির অবাক হচ্ছিল। বুঝতে পারছিল না। বলল, “আমি ওঁর নামই শুনিনি

কোনও দিন?”

সিংহীবাবু যেন একটু হাসলেন। “তোমাদের বাড়িতে তোমার বাবার কাছে অনেক মক্কেল যায়। কারা যায় তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করো না। যদি ভবতোষ গিয়ে থাকেন তুমি নিশ্চয় দেখোনি।”

কথাটা ঠিকই। বাবার কাছে কত মক্কেল আসছে কে তার খেয়াল রাখে। শিশির বলল, “আপনি আমার বাবার কথা জানলেন কেমন করে?”

“জানি,” সিংহীবাবু রহস্যের গলায় বললেন, “আমি তোমার—তোমাদের নাড়িনক্ষত্র জানি, শিশির। আমি যত জানি তুমিও তত জানো না। কিন্তু তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারছ না!”

শিশির বিহ্বল হয়ে বাবুর দিকে তাকাল। তারপর সিংহীবাবুকে বলল, “আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি। প্রতিজ্ঞা করলাম।”

সিংহীবাবু একটু চুপচাপ থাকলেন, তারপর বললেন, “শোনো শিশির, আমার অ্যাকসিডেন্ট এমনি হয়নি। আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল ভবতোষ।”

শিশির আর বাবু দুজনেই চমকে উঠল।

সিংহীবাবু বললেন, “আমি তোমায় সব বলব। সব।”

॥ চব্বিশ ॥

শিশির আর বাবু বোকার মতন বসে থাকল। বুঝতে পারছিল না, সিংহীবাবু কী এমন কথা শোনাবেন। কৌতূহল হচ্ছিল, আবার কেমন ভয় ভয় করছিল।

ততক্ষণে চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। রাস্তা দিয়ে একটা গোরুর গাড়ি যাচ্ছিল। অন্ধকারেই। চাকার শব্দ হচ্ছিল বিশ্রী। দুটো খেঁকি কুকুর কোথাও ঝগড়া করছে।

সিংহীবাবু বললেন, “বাতি দিতে বলি। বোসো।” বলেই তিনি উঠলেন।

সিংহীবাবু চলে যেতেই শিশির গলা নামিয়ে বলল, “বাবুদা, কী মনে হচ্ছে তোমার?”

বাবু বলল, “আমার তো ভালই মনে হচ্ছে।”

“ভাল?”

“সিংহীবাবু ভবতোষের ওপর হাড়ে হাড়ে চটেছেন। শুধু চটেছেন কেন বলব, ভবতোষকে তিনি তাঁর শত্রু মনে করেছেন। যে মানুষ সিংহীবাবুকে প্রাণে মারতে চেয়েছিল, তাঁকে তিনি নিশ্চয় বন্ধু বলে আর মনে করবেন না। আমাদের তো ভালই হল।”

শিশির বলল, “আমার মনে হচ্ছে, সিংহীবাবু মনে-মনে কিছু ভেবেছেন। তেমন যদি হয় বাবুদা, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। কিন্তু আমি ভাবছি, উনি আমাদের কথা এত জানলেন কেমন করে? কী যে বলবেন তাও বুঝতে পারছি না।”

সিংহীবাবু ফিরে এলেন। হাতে লণ্ঠন। এ বাড়িতেও ইলেকট্রিক নেই।

লণ্ঠনটা বারান্দার একপাশে রেখে দিয়ে বসলেন সিংহীবাবু। মিটমিটে আলোয় অস্পষ্ট করে তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছিল। গম্ভীর মুখ। কেমন এক ক্ষোভও রয়েছে।

সামান্য অপেক্ষা করে সিংহীবাবু বললেন, "তুমি কোনওদিন ভবতোষবাবুকে দ্যাখোনি বললে, শিশির। সেটা হতে পারে। কিন্তু এবার তোমাকে আমি ক-টা কথা বলি। মন দিয়ে শোনো। তোমার ঠাকুরদা নিশিকান্ত...কী, নামটা ঠিক বলেছি?"

শিশির যেন আকাশ থেকে পড়ল। ভদ্রলোক তার ঠাকুরদারও নাম জানেন? আশ্চর্য! খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। শিশির বলল, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আপনি কেমন করে জানলেন?"

সিংহীবাবুর মুখে বোধ হয় পাতলা হাসি খেলে গেল। "কেমন করে জানলাম, সে-সব প্রশ্ন পরে। আগে আমি যা বলছি তার সঙ্গে তোমার পরিবারের কথা মিলিয়ে নাও। ভুল হলে বোলো।"

বাধ্য ছেলের মতন মাথা নাড়ল শিশির।

"নিশিকান্তবাবু, মানে তোমার ঠাকুরদা ছিলেন ব্যবসায়ী। তাঁর ব্যবসা ছিল আইনের বইয়ের। দোকান ছিল ধর্মতলা স্ট্রিটে। লালগোলার লোক। কলকাতায় এসে মামাতো এক দাদার সঙ্গে ওই বইয়ের ব্যবসাপত্র শুরু করেন। ব্যবসাটা বেশিদিন চলেনি। দাদার সঙ্গে অশান্তি শুরু হয়। তখন নিশিকান্তবাবু, তোমার ঠাকুরদা, নিজের চেষ্টায়, ধারকর্জ করে নিজের দোকান দেন ল-বুকস-এর। দোকান আর ব্যবসা দুইই ভাল জমে ওঠে। এ সব জানো তুমি?"

মাথা হেলাল শিশির। "আমি গল্প শুনেছি।"

"নিশিকান্তবাবু ব্যবসায় ফেঁপে উঠছিলেন দেখে তাঁর সেই মামাতো দাদার ধারণা হল, তোমার ঠাকুরদা বিস্তর টাকাপয়সা সরিয়ে আগের ব্যবসা ফেল পড়িয়েছেন। এই নিয়ে দুই পক্ষে ঝগড়া, অশান্তি। এমনকী, মামলা-মোকদ্দমা।...শেষপর্যন্ত একদিন তোমার ঠাকুরদাকে ভাড়াটে লোক দিয়ে মেরে ফেলা হল। তখন যুদ্ধের সময়, কলকাতায় ব্ল্যাক আউট চলছে, একটা গাড়ি এসে নিশিকান্তবাবুকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন।...তোমার তখন জন্ম হয়নি।"

শিশির একেবারে পাথর। সিংহীবাবু এত কথা জানেন! অন্তত চল্লিশ বছর আগের ঘটনা। এ-সব শিশির নিজেই ভাল করে জানে না। আবছা-আবছা শুনেছে। বলল, "আপনাকে এ-সব কথা কে বলেছে? জানলেন কেমন করে?"

শিশিরের কথায় কান না দিয়ে সিংহীবাবু বললেন, "তোমার বাবা তখন নতুন উকিল। তিনি জানতে পারেন। থানা, পুলিশ, মামলা মোকদ্দমা শুরু হয়ে যায়। চ্যাটার্জিসাহেব নামে এক বিখ্যাত ল-ইয়ারকে নিয়ে তিনি মামলা লড়তে থাকেন। তাঁর মামাতো জ্যাঠাটিকে এমন করে জড়িয়ে ফেলেছিলেন মামলায় যে, জ্যাঠার সবই যেতে বসেছিল। তা ফাঁসিকাঠে ঝুলতে ঝুলতে তিনি বাঁচলেন। প্রাণে বাঁচলেন, কিন্তু মামলা চালাবার খরচ জোগাতে গিয়ে ভদ্রলোক ভিখিরি। মারাও গেলেন। ভবতোষ হল তাঁর ছেলে। সম্পর্কে তোমার বাবার জেঠতুতো ভাই, তোমার কাকা।"

শিশিরের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। ভবতোষবাবু তার কাকা কী আশ্চর্য!

বাবুর দিকে তাকাল। বাবু একেবারে বোকার মতন বসে। এসব কিছুই তার জানা ছিল না।

সিংহীবাবু বললেন, "তোমার ঠাকুরদার সেই দোকান অন্য লোক কিনে নিয়েছিল। ভবতোষ আগে দুঃখকষ্টে মানুষ হয়নি। তবে তার বাবা মারা যাবার আগে থেকেই টাকা পয়সার টানাটানি বুঝতে পারছিল। বাবা মারা যাবার পর ভিখিরি। তবে মানুষটি ধুরন্ধর। পারে না এমন কাজ নেই। নানারকম বেআইনি লোক-ঠকানো ব্যবসা, চুরি-জোচ্চুরি করে সে আজ বড়লোক। তার অর্থের অভাব নেই। কিন্তু একটা জিনিস সে ভুলতে পারছে না। তার বিশ্বাস, তোমার বাবার জন্যেই তার বাবার শেষ জীবন দুঃখকষ্টের মধ্যে কেটেছে, মারা গিয়েছে তার বাবা।"

সিংহীবাবুর কাজের লোকটি চা নিয়ে এল।

"নাও, একটু চা খাও," সিংহীবাবু বললেন।

শিশির আর বাবু চা নিল। সিংহীবাবুও হাত বাড়িয়ে চা নিলেন।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। বাতাসে খানিক ঠাণ্ডা ভাব। শরৎকালের সন্ধে বলে বেশ বোঝা যায়। আকাশ তারায়-তারায় ভরা।

শিশির বলল, "এত পুরনো ব্যাপারের সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক?"

সিংহীবাবু কাশলেন, তারপর গলা পরিষ্কার করে বললেন, "ভবতোষ নানাভাবে তোমার বাবাকে জব্দ করার চেষ্টা করেছে। পারেনি। সোজা কথা, সে তোমার বাবার ওপর হাড়ে-হাড়ে চটা। তার যে কী আক্রোশ তোমার বাবার ওপর, তুমি জানো না। প্রতিশোধ নিতে চায়। পারে না। তার ওপর এমনই কপাল তার, ভবতোষের বিরুদ্ধে এক জাল জোচ্চুরির মামলা এনেছেন পি, রায় বলে এক ভদ্রলোক। ব্যবসা সংক্রান্ত মামলা। ভবতোষ বিপদে পড়ে রয়েছে। সে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করেছে। কলকাতার বাড়িতেই। একটা মিটমাট করিয়ে দিতে বলেছিল। তোমার বাবা রাজি হননি। হ্যাঁ, আর-একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, ভবতোষ তোমার বাবাকে কীসের কিছু কাগজপত্র দেখিয়ে হাজার ত্রিশ-চল্লিশ টাকা চেয়েছে। কী কাগজ তা আমি জানি না। তোমার বাবা টাকা দিতে চাননি।"

বাবু চুপচাপ ছিল। এবার কথা বলল। "এত রকম গোলমালের মধ্যে শিশির কেমন করে আসে?"

"আসত না। ঘটনাচক্রে হঠাৎ এসে গেছে। ভবতোষের ধারণা, শিশিরের বাবাকে যখন কোনও মতেই জব্দ করা যাচ্ছে না, তখন শিশিরকে এমন একটা অবস্থায় এনে ফেলা, যে-অবস্থা ওর বাবা সহ্য করতে পারবেন না। নরম হতে বাধ্য হবেন। বিশেষ করে পি. রায় কোম্পানির মামলায় যদি ওরা জিতে যায়, ভবতোষকে হয় গলায় দড়ি দিতে হবে, না হয় জেলে বসে ঘানি ঘোরাতে হবে।"

"আপনি বলতে চাইছেন, শিশিরকে কবজা করে ভবতোষ ব্ল্যাকমেইল করতে চায়?"

"হ্যাঁ, সেইরকম।"

শিশির বলল, "আমি একটা কথা ভাবছি। বাবা কি জানেন না, ভবতোষ এখানে

আছে? আমায় তো কিছু বলেননি কোনও দিন?”

সিংহীবাবু আবার যেন হাসলেন একটু। বললেন, “ভবতোষের আসল নাম তোমার বাবা জানেন, নকলটা নয়। ভবতোষের আসল নাম শ্যামসুন্দর। ভব ওর ডাক নাম। সেই থেকে ভবতোষ।

শিশির বলল, “বাবাকে আমি লিখব।”

সিংহীবাবু বললেন, “এখন নয়। পরে লিখো। আমি বলব কখন লিখতে হবে। তা এটা তো যা শুনলে, অর্ধেক, বাকিটা শুনবে না?”

“বলুন।”

॥ পঁচিশ ॥

শিশির আর বাবু ধীরে ধীরে চা খেতে লাগল। এত গরম, ঠোঁট জিভ পুড়ে যাচ্ছে। স্বাদ আহামরি।

সিংহীবাবু বললেন, “ভবতোষের পরিচয় তোমরা শুনলে। তবে একটা কথা সব সময় মনে রেখো, আমি যতটা জানি তোমাদের বললাম। এর বাইরেও থাকতে পারে।”

কাছেই রেললাইন, ফটক। একটা ট্রেন আসার শব্দ হচ্ছিল। এই সময় গয়া প্যাসেঞ্জার আসার কথা। বোধ হয় প্যাসেঞ্জার গাড়িটাই আসছে।

“আমার পরিচয়”, সিংহীবাবু বললেন, “দেবার মতন কিছু নয়। আমাদের আদি বাড়ি শ্রীরামপুর। বাবা কলকাতায় একটা স্কুলে পড়াতেন। অঙ্ক আর বিজ্ঞান। বাড়ি শ্রীরামপুরে হলেও কলকাতাতেই আমরা থাকতাম। অখিল মিস্ত্রি লেনে। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। বাবা মারা যাবার পর আমার মামা আমাদের কাশীতে নিয়ে গেলেন। মামা কাশীতেই থাকতেন। সেখানেই আমার ছেলেবেলার অর্ধেক কেটেছে, মানে কলকাতা ছাড়ার পর থেকে বাকিটা। ওখানেই বড় হয়েছি। ওই মাঝে মাঝে হয়তো মির্জাপুর, এলাহাবাদে গিয়ে থেকেছি। তা আমার মামার দু রকম কাজকর্ম ছিল।

একটা বড় বাঙালি হোটেলে তিনি ম্যানেজারি করতেন। মালিক মারা যাবার পর তাঁর স্ত্রী মামার হাতেই সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। হোটেলের কাজটা ছিল মামার চাকরি। আর অন্যদিকে মামার ছিল নানারকম টোটকা ওষুধপত্র তৈরি করার বাই। তিনি কিন্তু কবিরাজ ছিলেন না। কাশীর এক বিখ্যাত কবিরাজ তুলসীচরণ সেনশর্মা মামাকে ছেলের মতন ভালবাসতেন। মামা সেখানে কিছু কিছু কবিরাজি শিখেছিলেন। আমাকে মামা কবিরাজ তুলসীচরণের কাছে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র শিখতে লাগিয়ে দেন। আমার কপাল খারাপ, আট মাসও শিখলাম না। তুলসীচরণ দেহ রাখলেন। বছর চার পরে মামাও মারা গেলেন। বাড়িতে অনেক পোষ্য। আমার মামাতো ভাই মামার হোটেলের ম্যানেজারগিরির চাকরিটা নিল। আর আমি গোধুলিয়ার কাছে একটা দোকান খুলে বসলাম। ওই কাশীতেই আমার সঙ্গে ভবতোষের প্রথম পরিচয়।”

সিংহীবাবু থামলেন। যন্ত্রণা হচ্ছিল হাতে । কষ্টের শব্দ করলেন। রাস্তা দিয়ে কারা

যেন চলে যাচ্ছিল। এখানকার লোক জন। কাজকর্ম সেরে যে যার মতন বাজার করে ফিরছে। গামছায় বাঁধা পুঁটলি, হাতে ঝোলানো।

বাবু চা নামিয়ে রাখল। অর্ধেকের বেশি খেয়েছে। আর খেতে পারছিল না। শিশির বলল, "হালে পরিচয়, না আগে?"

সিংহীবাবু বললেন, "না না, হালে নয়। বললাম যে, আমি যখন কাশীতে কবিরাজি আর টোটকার ওষুধ বেচতাম, তখন আলাপ। কেমন করে আলাপ ঘটল, বলি। মামা মারা যাবার পর হোটেলের ম্যানেজারগিরির কাজটা নিয়েছিল আমার মামাতো ভাই—তা তো বলেছি তোমাদের। সেই হোটেলে ভবতোষ এসে উঠেছিল ওর স্ত্রীকে নিয়ে। একদিন দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে ভবতোষের চোট লাগে। কানের দিকে এমন একটা চাপা জখম হল যে, যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছিল। মাথা তোলার সাধ্য হচ্ছিল না। আরও উপসর্গ ছিল নানারকম। ডাক্তাররা ওষুধপত্র দিয়ে কিছুই করতে পারছিল না। আমার ভাই আমাকে ধরে নিয়ে যায় তার হোটেলে। আমি ওষুধ দিয়ে দিন দুয়েকের মধ্যে ভবতোষকে আরাম করে তুলি। সেই আলাপ।"

"কী হয়েছিল ওঁর?"

"তা আমি জানি না। স্নায়ুতে কিছু হয়েছিল, স্নায়ুর জখম।"

"আপনি আন্দাজে ওষুধ দিলেন?"

"হ্যাঁ। তোমাদের ডাক্তারিও চোদ্দো আনা ওষুধ দেয় আন্দাজে। তুমি নিজেই জানো তোমার অসুখে কত আন্দাজি ওষুধ খেয়েছ!"

শিশির আর অবাক হল না। সিংহীবাবুর কাছে সত্যিই তার কিছু গোপন নেই।

বাবু বলল, "সেই আলাপের পর কী হল বলুন?"

সিংহীবাবু বললেন, "আলাপের পর ভবতোষ আমার দোকানে দু-তিনবার এসেছে। আমাকে হোটেলে যেতে হয়েছে। গল্পগুজব করেছি দুজনে।...ভবতোষ ভেতরে যেমনই হোক, বাইরে সদালাপী। চট করে মানুষকে বশ করতে পারে।"

বাবু যেন ঠাট্টা করেই বলল, "আপনাকেও বশ করেছিল!"

"হ্যাঁ। আমি বশ হয়েছিলাম...তা সে কথা থাক। ভবতোষ কলকাতায় ফিরে গেল। আমার সঙ্গে দু-চারটে চিঠিচাপাটি চলত। বছর খানেকের মধ্যে আমাদের সংসারে আবার একটা ঝড় এল। মা মারা গেল। বোন গেল। অবশ্য তার শ্বশুরবাড়িতে। ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল। মামাদের বাড়িতেও সেই অবস্থা। সব তছনছ হয়ে গেল। আমি কাশী ছেড়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়লাম কলকাতায়। ভবতোষের সঙ্গে দেখা করলাম।"

সিংহীবাবু আবার থামলেন। পুরনো কথা ভাবছিলেন বোধ হয়।

বাবু একটা সিগারেট খাবার জন্যে উশখুশ করছিল। কেমন ইতস্তত করে বলল, "আমি একটা সিগারেট খাব?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খাবে। খাও।" সিংহীবাবু বললেন।

"আপনি খান সিগারেট?"

"না। আগে খেতাম।...তা দাও একটা, খাই।"

বাবু উঠে গিয়ে সিংহীবাবুকে সিগারেট দিল। ধরিয়ে দিল দেশলাই জ্বেলে। তারপর নিজে সিগারেট ধরাল।

সিংহীবাবু সিগারেটে টান দিলেন ধীরে। বললেন, "মানুষ এক-একটা এমন ভুল করে যে, তার আর চারা থাকে না। আমারও সেই ভুল হল। ভবতোষকে আমি বলেছিলাম, টাকাপয়সা পেলে আমি একটা ওষুধের কারবার খুলতে পারি। তবে কলকাতায় নয়, কাশীতেও নয়, গোরখপুরে। কেন বলেছিলাম—তার কারণ আছে। কবিরাজি টোটকা—এই সব ওষুধ বড়লোকদের জন্যে নয়, তারা বিশ্বাসও করে না। যারা গরিব, যাদের বিশ্বাস আছে গাছগাছড়ায়, তারা আমাদের কাছে আসে। ইউ পি-র দিকে গাঁ-গ্রামের মানুষ আজও আয়ুর্বেদের দিকে তাকিয়ে থাকে।...আমার কথা শুনে ভবতোষ আমায় টাকা দিতে রাজি হল।"

"বুঝেছি," শিশির বলল, "আপনি ভবতোষের টাকা নিয়ে তার খপ্পরে গিয়ে পড়েন।"

"হ্যাঁ; কথাটা একরকম তাই," সিংহীবাবু বললেন। 'টাকা ভবতোষ আমায় দিয়েছিল। আমি নিয়েছিলাম। গোরখপুরে গিয়ে আমি ওষুধের একটা ব্যবসাও শুরু করি। মোটামুটি ভালই চলছিল ব্যবসা। কিন্তু আবার আমার কপাল ভাঙল। আচমকা গোরখপুরে দেখা দিল প্লেগ। একেবারে মহামারী হয়ে। সবাই প্রাণের ভয়ে পালাতে লাগল। আমিও পালিয়ে গেলাম কাশীতে। আর তখনই আমি এমন একটা ওষুধ বরাতজোরে পেয়ে গেলাম, যা মানুষকে উন্মাদ রোগ থেকে বাঁচাতে পারে। না না, কোনও রোগেরই যেমন শেষ ওষুধ হয় না, এরও তাই। নানাধরনের উন্মাদ-ব্যাধি এই ওষুধে সারে, আবার অনেক উন্মাদ-রোগ সারে না। এই ওষুধের কথা ভবতোষকে আমি জানালাম। আবার অর্থসাহায্য চাইলাম।"

"এবারও সাহায্য পেলেন?"

"হ্যাঁ। কিন্তু একটা কথা এখানে বলে রাখি। আমি যে ওষুধের কথা বলছি, তাতে যেমন উন্মাদ-রোগ সারার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনই আবার এই ওষুধ তৈরির সময়, কমপোজিশানের হেরফের ঘটালে মানুষকে উন্মাদ করে তোলা যায়।"

শিশির কেমন চমকে উঠল। সন্দিগ্ধ হল। "আপনি কি এই কথাটাও ভবতোষকে জানিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর?"

"তারপর একদিন ভবতোষ লোক দিয়ে আমায় ডেকে পাঠাল হঠাৎ।"

"কলকাতায়?"

"না, এখানে।"

"এখানে কেন?"

"ভবতোষ তখন এখানেই থাকতে শুরু করেছিল। কলকাতায় তেমন যেত না কাজেকর্মে ছাড়া।"

"আপনাকে ডাকার কারণ?"

"তুমি।"

"আমি?" শিশির যেন আঁতকে উঠল।

সিংহীবাবু সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিলেন। বললেন, "হ্যাঁ, তুমি।...তুমি তোমার পিসিমার বাড়ি এসেছিলে বেড়াতে। ভবতোষ তোমাদের অনেক খবরই রাখত, কিন্তু এটা জানত না যে, তোমার পিসিমা পিসেমশাই এখানে থাকেন। একদিন সে তোমাদের বাজারে দেখতে পেয়ে যায়। তোমায় সে দেখেছে। কলকাতার বাড়িতে। খোঁজখবর করে ভবতোষ বুঝল, তুমি তার চিরশত্রুর ছেলে।"

শিশির যেন বাকিটা বুঝে ফেলল। "আমি ক-মাস আগে এখানে এসেছিলাম। তখন ভবতোষ আমায় দেখেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমি এখানে থাকতে থাকতেই আপনাকে আনান?"

"হ্যাঁ, লোক পাঠিয়ে ধরে আনান।"

"উদ্দেশ্য?"

"তোমায় কষ্ট দেওয়া, ভোলানো, প্রায় উন্মাদ করে তোলা।"

শিশির কেমন ঘৃণার চোখে সিংহীবাবুর দিকে তাকাল। লোকটা মানুষ না পশু? বাবু বলল, "আপনাকে কাজে লাগিয়েছেন ভবতোষ?"

"হ্যাঁ, লাগিয়েছে।"

"আপনার স্বার্থ কী?"

সিংহীবাবু চুপ। অনেকক্ষণ পরে বললেন, "অর্থ। ভবতোষ আমার কাছে হাজার-পনেরো টাকা পেত। ঋণ। আমি শোধ করতে পারিনি।...আমাদের শর্ত ছিল, ভবতোষের কথামতন কাজ করলে আমায় আরও পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া হবে।"

"তার মানে—আমায় পাগল করতে পারলে আপনি পঁচিশ হাজার টাকা আরও পাবেন?" শিশির ঘৃণায়, রাগে যেন কাঁপছিল।

সিংহীবাবু বললেন, "শর্ত সেই রকম ছিল। কিন্তু আমি তোমায় পাগল করিনি। আমার ওষুধের কিছু হেরফের করেছিলাম।"

"কেন?"

"তুমি নিজেই ভেবে দেখো, কেন!"

॥ ছাব্বিশ ॥

ছিল একরকম, হয়ে গেল অন্যরকম। সমস্ত কিছুই কেমন উলটে পালটে গেল। শিশির এখন আর আগের মতন অত অবাক হতেও ভুলে গিয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। একের পর এক ধাক্কা খেতে খেতে যেমন খানিকটা সয়ে যায়, শিশিরও বারবার অবাক হতে হতে এখন আর তেমন অবাক হয় না। কিন্তু সিংহীবাবুর মুখে সব কথা শুনে সে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।

সেদিন আর বংশীর দোকানে যাওয়া হল না। সোজা বাড়ি।

বাড়ি আসার পথে শিশির বলল, "বাবুদা, পিসেমশাইকে একবার জিজ্ঞেস করব?"
"করবি না কেন? নিশ্চয়ই করবি।"
"কিন্তু একবার কলকাতাতেও যেতে হবে। বাবার কাছ থেকে সব শুনতে চাই।"
"যাবার দরকার কী? চিঠি লেখ।"
চিঠি লেখায় যেন আগ্রহ নেই এমন গলায় শিশির বলল, "চিঠিতে কি এ সব কাজ হয়?"
বাবু বলল, "হবে না কেন? কীসের এমন ভারী কাজ যে চিঠিতে হবে না।"
শিশির একটু চুপ করে থেকে অন্য কথা তুলল। "সিংহীবাবু যা বললেন তোমার বিশ্বাস হল?"
"আমার ভাই ভদ্রলোককে খারাপ লোক বলে মনে হল না। মতলব খারাপ থাকলে এত কথা আমাদের বলতেন না।"
"কিন্তু ভবতোষের সঙ্গে সিংহীবাবুর ঝগড়াটা বাধল কেন? তুমি লক্ষ করে দেখো, সিংহীবাবুর কথা যদি সত্যি হয়, ভবতোষ ঠিক যেমনটি চাইছিলেন সিংহীবাবু তেমনটি করছিলেন না। সিংহীবাবু যেন কম কম করছিলেন। তাই না?"
"আমি তোর কথা বুঝতে পারছি না," বাবু বলল।
"বাঃ, তা হলে শুনলে কী! সিংহাবাবু তো স্পষ্টই বললেন ভবতোষ আমায় আরও বেশি কষ্ট দিতে চেয়েছিলেন, প্রায় পাগলা করে দেবার ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন— সিংহীবাবু সেটা করেননি।"
সামান্য ভাবল বাবু। বলল, "মনে হল, সিংহীবাবু ওরকম কিছু বলতে চাইছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট করে বলেননি। পরে হয়তো শোনা যাবে।"
দুজনে কথা বলতে বলতে হাসপাতালের মাঠ পেরিয়ে কাছে চলে এল। বাবুর হাতে টর্চ। আর সামান্য এগোলেই শিশিরের পিসিমার বাড়ি।
আচমকা কে যেন শিশিরকে ডাকল। দাঁড়িয়ে পড়ল শিশির।
তেঁতুলগাছের অন্ধকার থেকে হেমবাবু বেরিয়ে এলেন। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা চেহারা। পুলিশের পোশাকের নামগন্ধ নেই।
"আপনি? এদিকে কোথায়?" শিশির বলল।
"বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। এটি কে?"
শিশির হেমবাবুর সঙ্গে বাবুর পরিচয় করিয়ে দিল।
সামান্য দুটো রগড়ের কথা বলে হেমবাবু শিশিরের দিকে তাকালেন। "বংশীর দোকান থেকে ফেরা হচ্ছে?"
"না।"
"কোথায় গিয়েছিলেন তবে?"
"এই—" শিশির বলতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। বলল, "এদিকে বেড়াচ্ছিলাম।"
"কতটা বেড়ানো হল?"
হেমবাবুর গলার স্বরে ঠাট্টা। শিশির বুঝতে পারল। বলল, "ধানোয়ার রোড ধরে

অনেকটা গিয়েছিলাম।"

হেমবাবু পকেট থেকে সিগারেটের কেস বার করলেন। ধরালেন। "পুলিশের চোখে অত সহজে কি ধুলো দেওয়া যায়?" বলে হাসলেন। শিশির একেবারে অপ্রস্তুত।

হেমবাবু নিজেই বললেন, "আমি ভাই আপনাদের ওই সিংহীর বাড়িতে বাইরে বসে থাকতে দেখেছি। অনেকক্ষণ ছিলেন আপনারা।"

শিশির বলার মতন কিছু খুঁজে পেল না। তার লজ্জা করছিল। কেন সে মিথ্যে কথাটা বলতে গেল!

বাবু বলল, "ধরেছেন ঠিক। আমরা বাজারের দিকেই বেড়াতে যাচ্ছিলাম, সিংহীবাবুকে দেখতে পেয়ে তাঁর খোঁজ নিচ্ছিলাম। উনি ডাকলেন, বসতে হল। গল্প করতে করতে দেরি হয়ে গেল।"

হেমবাবু হেসে উঠলেন। "তা হলে মিথ্যে বলার কী দরকার ছিল?"

শিশির অপ্রস্তুত গলায় বলল, "দরকার কিছুই ছিল না হেমবাবু, ভয়ে বললাম। সিংহীবাবু মনে করেন, আমরা আপনাকে বলে, ওঁর পেছনে পুলিশ লাগিয়েছি। ভীষণ খেপে গিয়েছেন। একটু নরম করার চেষ্টা করছি।"

হেমবাবু অনেকটা ঠাট্টার মতন করে বললেন, "সিংহীবাবুর সঙ্গে এখন কি বন্ধুত্ব করা হচ্ছে?"

"না", শিশির সাবধানে বলল, "ওঁর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। দেখা হয়ে গেল। তাই কথা বলছিলাম। কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল।"

হেমবাবু আর কিছু বললেন না। অন্ধকারেই আবার পা বাড়ালেন। "আমি চলি। এদিকেই খানিকক্ষণ থাকব। যান, আপনারা বাড়ি যান।" হেমবাবু অন্ধকারেই মিলিয়ে গেলেন।

বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে শিশির বলল, "কী ব্যাপার বলো তো, বাবুদা? হেমবাবু এদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?"

বাবু বলল, "আমি কেমন করে বলব! তোরাই জানিস!"

"সিংহীবাবুর ওপর নজর রাখছেন?"

"হতে পারে।"

শিশিরের হঠাৎ মনে পড়ল, ক-দিন আগে যে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে ওদিকে, তার কোনও গন্ধ পেয়েছেন নাকি হেমবাবু? গন্ধ পেয়ে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

শশধর ঢাকা বারান্দায় বসেছিলেন।

শিশিররা বাড়ি আসতেই শশধর বললেন, "এত সকাল সকাল আজ—?"

"স্টেশনের দিকে যাইনি, এদিকেই ঘুরছিলাম।" শিশির একটা চেয়ার টেনে বাবুকে এগিয়ে দিল। নিজেও বসল অন্য চেয়ারে। দু-চারটে এলোমেলো কথার পর শিশির বলল, "পিসেমশাই এখানে ভবতোষবাবুকে চেনেন আপনি?"

"ভবতোষ! কোন দিকে থাকেন? আমাদের এদিকে তো ভবতোষ বলে কেউ নেই।"

"এদিকে নয়, স্টেশনে ঢোকার আগে। ডানদিকে যে বিশাল বাড়ি...।"

"ও, বুঝেছি! না, আমার সঙ্গে পরিচয় নেই। শুনেছি ওঁর কথা। একদিন বাজারের দিকে দেখেছিলাম। গাড়িতে ছিলেন।"

"ভবতোষবাবুর কথা কিছু শুনেছেন?"

"খুব ধনী লোক। ব্যবসায়ী। কলকাতায় মস্ত ব্যবসাপত্র আছে।"

"আর কিছু নয়?"

"না," মাথা নাড়লেন শশধর। "হঠাৎ ভবতোষবাবুর কথা কেন?"

শিশির একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমি একটা কথা শুনলাম। সিংহীবাবু বললেন। ওঁর বাড়িতে বসে বসে গল্প করছিলাম। ওনার মুখেই শুনলাম।

"কী শুনলে?"

শিশির বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে নিল একবার, তারপর কথাগুলো বলতে শুরু করল।

শশধর শুনছিলেন মনোযোগ দিয়েই। শিশির শোনা কথার সবটা বলল না। প্রথমের দিকটা বলল, পরেরটা চেপে গেল। ভবতোষ আর সিংহীবাবু দেখাসাক্ষাৎ, কেমন করে শিশিরকে দেখতে পেয়ে গেলেন ভবতোষ, আর তারপর শিশিরকে নিজের মুঠোয় পুরে তার বাবাকে জব্দ করার ষড়যন্ত্র—এ-সব কথা শিশির একেবারেই তুলল না। তুললেই বিপদ, শশধর নিজে নিরীহ মানুষ, ভয় পেয়ে যাবেন। তার চেয়েও বিপদ হবে পিসিমাকে নিয়ে। পিসেমশাইয়ের কাছ থেকে একবার যদি পিসিমার কানে যায়—আর রক্ষে থাকবে না। কান্নাকাটি তো কিছুই নয়, পিসিমা আর একদণ্ড ভাইপোকে এখানে রাখবেন না, নিজেই হয়তো শিশিরকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ছুটবেন। যেন, যার জিনিস তার হাতে জিম্মা করে না দিয়ে আসা পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি নেই।

শিশির ঠিক এই সময় কলকাতায় ফিরতে চায় না। ধাঁধার খানিকটা স্পষ্ট হয়েছে এতদিনে। বাকিটা তাকে জানতেই হবে।

শশধর সব শুনলেন, তারপর বললেন, "অমৃতদা নিজের সব কথা তো বলেন না শিশির। তবে আমি একটু-আধটু শুনেছি। যা শুনেছি তার বারো আনাই তোমার পিসিমার মুখে।"

"পিসিমা জানে?"

"জানে মানে—তার বাবার—অর্থাৎ তোমার ঠাকুরদার কথাটা জানে। কিন্তু পরে যেসব কাণ্ড হয়েছে তার কথা জানে না। জানার সুযোগই হয়নি। আর তুমি তো চেনো তোমার বাবাকে। নিজের মামলা-মোকদ্দমা, মক্কেল এসব নিয়ে বাড়িতে গল্প করেন না।"

"সিংহীবাবু আমার ঠাকুরদার কথা যা বলেছেন, তা সত্যি?"

"আমিও মোটামুটি ওই রকমই শুনেছি।"

"ঠাকুরদাকে তা হলে খুনই করা হয়েছিল?"

"সেটাই সন্দেহ করা হয়।"

"আমিও শুনেছি। তবে স্পষ্ট করে কেউ বলেনি।"

"বলেনি, কারণ প্রমাণ তো করা গেল না। আমি তো বাবা তখন তোমার পিসেমশাই হইনি, আর তোমার পিসিমার বয়েস তখন পনেরো-ষোলো হবে। তোমার বাবা সদ্য ওকালতি শুরু করেছেন। এত পুরনো কথা মনে রাখাই মুশকিল।...তবে আমার মনে হচ্ছে, তুমি যা শুনেছ সিংহীবাবুর মুখে, সেটা ঠিকই।"

শিশির কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দূরে আওয়াজ শুনল। বন্দুকের। মনে হল ধানোয়ার রোডের দিক থেকেই আওয়াজ এল। দু-দুবার শব্দ। আওয়াজটা ছড়িয়ে গেল ফাঁকায়। শিশিররা চমকে উঠল।

বাবু বলল, "বন্দুক ছোড়ার আওয়াজ।"

শশধর উঠে দাঁড়ালেন, "বন্দুক ছুড়ছে? কে? এখানে তো বন্দুক ছোড়ার লোক নেই।"

ততক্ষণে আশালতাও বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

॥ সাতাশ ॥

সকালে উঠে শিশির প্রথমেই বাবাকে চিঠি লিখতে বসল। ভবতোষ ওরফে শ্যামসুন্দর সান্যালের ব্যাপারটা সরাসরি বাবার কাছ থেকে জানতে চায়।

শিশির বোকা নয়। সে জানে খোলাখুলি সব বললে বাবা ভয় পেয়ে যেতে পারেন। বাবা ভিতু ধরনের মানুষ তা নয়; বরং ভেতরে-ভেতরে শক্ত, সহজে ঘাবড়ে যান না। শিশিরের অসুখের পর থেকে খানিকটা যেন ভয়ে-ভয়ে থাকেন। শিশির বাবাকে ভয় পাওয়াতে চায় না।

গুছিয়ে, অনেক কথা বাদ দিয়ে শিশির লিখে ফেলল। লিখে বাবুকে দিল। "বাবুদা, একবার পড়ে দ্যাখো। ঠিক আছে তো?"

বাবু চিঠিটা পড়ল। "ঠিক আছে।"

"আজই এটা পোস্ট করব। চলো, চা জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। কাল কে যে বন্দুক চালাল সেটাও খোঁজ করতে হবে।"

কালকের বন্দুক ছোড়ার ব্যাপার নিয়ে বাড়িসুদ্ধু সবাই অনেকক্ষণ আলোচনা করেছে। শশধরের ধারণা, ডাকাত-টাকাতের ব্যাপার হতে পারে। ভোলাবাবুর কুঠিতে ডাকাতি হয়ে যাবার পর ওই রকমই সন্দেহ হয়। আশালতা মনে করেন, ডাকাতরা আরও রাত করে আসে, অত কাঁচা কাজ তারা করবে না। শব্দটা অন্য কিছুর। কীসের তা তিনি বলতে পারেন না। বাবু আর শিশির অন্যরকম সন্দেহ করছিল, কিন্তু পিসেমশাইয়ের কাছে কিছু বলল না। রাত্রে শুয়ে শুয়ে আলোচনা করল। হেমবাবুর ব্যাপার হতে পারে। তিনি কি সন্দেহজনক কিছু দেখেছিলেন?

দুজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমেই গেল সিংহীবাবুর কাছে।

বাইরেই ছিলেন সিংহীবাবু।

"কাল আপনার বাড়ি থেকে ফিরে যাবার খানিকটা পরে গুলি ছোড়ার শব্দ

পেলাম। শুনেছেন আপনি?" শিশির জিজ্ঞেস করল।

মাথা হেলালেন সিংহীবাবু। "তোমরা যাবার অনেকটা পরে ঘটনাটা—মানে ওই শব্দ শোনা গেছে। ন-টা সোয়া-ন-টা নাগাদ।"

"গুলির শব্দ না?"

"হ্যাঁ।"

বাবু বলল, "মাঠের দিকে শব্দটা হল বলে আমাদের মনে হয়েছে। আপনার বাড়ির কাছাকাছি কোথাও কেউ বন্দুক ছুড়েছিল?"

সিংহীবাবু কয়েক পলক রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, "তোমরা চলে যাবার পর আমি ভেতরে চলে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। হাতটায় যন্ত্রণা হচ্ছিল। শুয়ে শুয়েই শব্দটা কানে গেল। আমি আর উঠিনি। আমার বাড়ির কাছেই কেউ গুলি চালিয়েছে।"

"আপনি একবার দেখবার চেষ্টাও করলেন না?"

"না," সিংহীবাবু মাথা নাড়লেন। "দেখে লাভ কী? আমার কাছে বন্দুক থাকলে দেখবার চেষ্টা করতাম।"

শিশিরের কেমন সন্দেহ হল; বলল, "আপনি কিছু সন্দেহ করছেন?"

"করছি", মাথা নাড়লেন সিংহীবাবু। "আমার সন্দেহ ভবতোষের লোক এসেছিল।"

শিশির আর বাবু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। বাবু বলল, "আপনি ঘরে রয়েছেন, তা জেনেও বাইরে কেউ বন্দুক চালাবে কেন?"

"আমিও সেটা বুঝতে পারছি না। কাল আমরা যখন বারান্দায় বসে কথা বলছিলাম—তখন রাস্তা থেকে কেউ গুলি চালাতে পারত। চালালেও অন্ধকারে আন্দাজে চালাতে হত। গুলিটা নষ্ট হত। না-হয় আমাদের তিনজনের যে কোনও লোকের গায়ে লাগতে পারত। ভগবান তোমাদের বাঁচিয়েছেন।"

শিশির শিউরে উঠল। সিংহীবাবু যা বলছেন তা ঠিকই। তারা তিনজনে বারান্দায় বসে কথা বলছিল কাল সন্ধেবেলায়। একটা টিমটিমে লণ্ঠন জ্বলছিল হাতকয়েক তফাতে। রাস্তা থেকে ভাল করে নজর করলে হয়তো তাদের দেখা যেত। কিন্তু বন্দুকের নিশানা ঠিক করে গুলি ছোড়ার মতন অবস্থা ওটা নয়, কাজেই গুলি ছুড়লে সেটা নষ্টও হতে পারত, বা তাদের যে কোনও একজনের গায়েও লাগতে পারত।

শিশির বলল, "ভবতোষের লোক কি আপনাকে খুন করতে এসেছিল?"

"আমার তাই মনে হয়।"

"কেন?"

"কারণ সে তার লোক দিয়ে আমায় একবার, পরশুদিনই মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। পারেনি।"

"পারেনি বলেই আবার চেষ্টা করবে?"

"করবে না? করাই তো স্বাভাবিক। ভবতোষ আগেই বুঝেছে আমি আর তার দলের লোক নই, বন্ধু নই। উলটে আমি এখন তার শত্রুপক্ষের লোক হয়ে গিয়েছি।

আমাকে সে সরাতে চায়।”

“শত্রুপক্ষ মানে আমাদের লোক?”

“তা ছাড়া আর কী!” বলে সিংহীবাবু যেন একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। বললেন, “শিশির, কাল আমি অতটা বুঝিনি। যদি আমার মনে হত, ভবতোষের লোক এত তাড়াতাড়ি, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আবার আমার প্রাণটি কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে তা হলে আমি তোমাদের নিয়ে বারান্দায় বসে কথা বলতাম না। লোকটা খেপে গিয়েছে। না হলে এত ধড়ফড় করে কাজ করত না। আমার ধারণা, কাল আমরা বাইরে বসে কথা বলছি—এটা ওর লোক নজর করেছে। হয়তো তাতে আরও ঘাবড়ে গিয়েছে।”

শিশির আর বাবু বলার মতন কথা খুঁজে পেল না। ভবতোষ কি তাদের প্রত্যেককে সারাক্ষণ নজরে রেখেছে! আশ্চর্য! তার হাতে এত লোক?

বাবু বলল, “কিন্তু আপনি যখন বাড়ির মধ্যে তখন ভবতোষের লোক গুলি চালাবে কেন বুঝতি পারছি না, সিংহীদা।” বাবুর মুখে ‘সিংহীদা’ বেশ মানিয়ে গেল। সিংহীবাবু কিছু মনে করলেন না।

সিংহীবাবু বললেন, “আগেই বলেছি, এই ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না। এ রকম বোকামি কেন তার লোক করবে?”

শিশির বলল, “এমনও তো হতে পারে, আপনি যা ভাবছেন তা নয়।”

“তা হলে কী?”

“ধরুন ডাকাতির চেষ্টা বা অন্য কিছু?”

“রাত ন’টায় কেউ ডাকাতি করতে আসে না। তা ছাড়া ক-দিন আগে অত বড় ডাকাতি হয়ে যাবার পর পুলিশের নজর আছে এদিকে।”

শিশিরের মুখ দিয়ে হেমবাবুর নামটা বেরিয়ে পড়েছিল, অনেক কষ্টে সামলে নিল।

সামান্য চুপচাপ।

সিংহীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কোথায় যাচ্ছ তোমরা?”

শিশির লুকোল না, বলল, “প্রথমে পোস্টঅফিস যাব। বাবাকে একটা চিঠি লিখেছি। চিঠিটা ফেলে আসব।”

“চিঠি লিখে ভালই করেছ। ভবতোষের আসল নামটা লিখেছ? শ্যামসুন্দর?”

“হ্যাঁ।”

“পরের মুখে ঝাল খাওয়া ভাল নয়, তুমি ঠিক কাজই করেছ।...আমার কথা লিখেছ কিছু?”

শিশির একবার বাবুর মুখের দিকে তাকাল, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, “আপনার কথা সামান্যই বলেছি। মানে আপনার মুখ থেকে যে ব্যাপারটা শুনেছি তার বেশি কিছু বলিনি। বললে বাবা ভয় পাবেন।”

কিছু যেন ভাবলেন সিংহীবাবু, তারপর বললেন, “আমি তোমায় যতটা পেরেছি বলেছি, পরে হয়তো আরও শুনবে। যাক, তোমরা যাও। একটা কথা এখন থেকে মনে রেখো। আমাদের ওপর ভবতোষের নজর আছে। সাবধানে ঘোরাফেরা করবে।

আর সন্ধের পর বাইরে ঘুরবে না।”

মাথা নাড়ল শিশির। সে বুঝতেই পারছে, ব্যাপার আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। সাবধানে থাকতে হবে।

পোস্টঅফিসে চিঠি ফেলে শিশিররা বংশীর দোকানে আসতেই দেখল, বংশী গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে।

বংশী শিশিরদের দেখে প্রথমেই বলল, “কী, কাল কেমন বন্দুকবাজি হল?”

শিশির অবাক। “তুমি জানলে কেমন করে?”

“সব জানি। দুবার আওয়াজ পেয়েছ গুলির! তাই না?”

“হ্যাঁ।”

“গুলি দুটো হেমবাবু ছুড়েছিলেন। পিস্তলের গুলি।”

বাবু আর শিশির একেবারে বোকার মতন তাকিয়ে থাকল।

॥ আঠাশ ॥

বংশী মুচকি মুচকি হাসছিল। তার হাসি দেখে মনে হবে, সে যেন মস্ত ভেলকি দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে শিশিরদের।

নিজেকে সামলে নিল শিশির; বাবুর দিকে তাকাল একবার। তারপর বংশীর দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, “হেমবাবুকে আমরা দেখেছি। তিনি হাসপাতালের মাঠে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।”

“জানি।”

“উনি গুলি ছুড়লেন কেন?”

বংশীর আঙুলের ডগায় নস্যির টিপ তৈরি ছিল। নাকে গুঁজে জোর টান মারল। টান দেখে মনে হবে, নেশাটা যেন ব্রহ্মতালুতে গিয়ে ঠেকল। ক-মুহূর্ত চুপচাপ। রুমালে নাক মুছে ছলছল চোখে বংশী বলল, “হেমবাবু খানিকটা আগে এসেছিলেন। স্টেশনের দিকে গিয়েছেন। কালকের কথা বললেন। তোমরা দুজনে সিংহীবাবুর বাড়িতে বসে আড্ডা জমিয়েছিলে।”

মাথা নাড়ল শিশির। “হ্যাঁ; কিন্তু তার সঙ্গে গুলি ছোড়ার সম্পর্ক কী?”

“তার সঙ্গে নেই; তবে সিংহীবাবুর সঙ্গে আছে।”

“মানে?”

“গুণ্ডা মতন একটা লোক সিংহীবাবুর বাড়ির সামনে ঘুরছিল। হেমবাবুর চোখে পড়ে যায়। লোকটা বাড়ির পেছন দিক দিয়ে পাঁচিল টপকাবার চেষ্টায় ছিল। হেমবাবুর নজরে পড়ে যাওয়ায় তিনি ওকে হাঁক মেরে দাঁড়াতে বলেন। লোকটা বর্শা ছুড়ে হেমবাবুকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেছিল । পারেনি। তাড়া খেয়ে লোকটা পুকুরের দিকে দৌড়তে শুরু করে। হেমবাবু গুলি ছোড়েন। ধরা যায়নি।”

ব্যাপারটা এতক্ষণে সহজ হল। শিশির আর বাবু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

সিংহীবাবু মোটামুটি ঠিকই ধরেছেন, তবে ভুল হয়েছে অন্য জায়গায়, যে লোকটা সিংহীবাবুর বাড়ি চড়াও হতে গিয়েছিল সে গুলি ছোড়েনি, গুলি ছুড়েছেন পুলিশের হেমবাবু।

এতক্ষণ বাবু আর শিশির দোকানের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বসেনি। এবার ভেতরে ঢুকে বসল।

বাবু বলল, "লোকটা পালিয়ে গেল?"

বংশী বলল, "সিংহীবাবুর বাড়ির পেছন দিকে মাঠ, পুকুর। গাছপালাও আছে। পালানো সহজ। একবার ছুট লাগাতে পারলে কে ধরবে! চার দিক ফাঁকা।"

শিশির কিছু ভাবছিল। বলল, "হেমবাবু রাত্তিরবেলায় ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন কেন বংশী?"

"মাঝে-সাঝে ঘোরেন। কাল ঘুরছিলেন অন্য কারণে। বোধ হয় খবর পেয়েছিলেন ডাকাত দলের কেউ ওদিকে ঘোরাফেরা করছে।"

"তোমায় বলেছেন হেমবাবু?"

"কথা থেকে তাই মনে হল!"

"সিংহীবাবুর ওপর চোখ রাখার জন্যে নয় তা হলে?" বাবু বলল।

"না।"

শিশির বুঝতে পারছিল বংশীর কাছে নতুন খবরগুলো লুকিয়ে রাখা যাবে না। সেটা উচিতও নয়। বংশী তাদের বন্ধু। যথাসাধ্য সাহায্য করছে সে শিশিরকে। সিংহীবাবু বংশীকে পছন্দ না করতে পারেন, কিন্তু শিশিররা বংশীকে বাদ দিয়ে কিছু করতে পারবে না। তা ছাড়া বংশীরও জানা উচিত সিংহীবাবুকে সে যা ভাবে তিনি মোটেই তা নন।

"তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। বলছি। আগে চা খাওয়াও।"

বংশী একটু দেখল শিশিরদের, তারপর উঠল। চায়ের কথা বলতে চলে গেল।

শিশির বাবুকে বলল, "বাবুদা, বংশীকে পুরো ব্যাপারটা বলে ফেলি। ও বোধ হয় সিংহীবাবুর অ্যাকসিডেন্টের খবরও জানে না।"

বাবু বলল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

একজন খদ্দের এসে হাজির দোকানে। বংশীকে দেখতে না পেয়ে কিছু বলল। "এখানেই গেছেন। আসছেন..." বাবু বলল। লোকটা বেহারি। বাংলা বুঝতে অবশ্য তার কষ্ট হল না। দোকানের চৌকাঠে সে দাঁড়িয়ে থাকল।

সামান্য পরেই বংশী দোকানে এল। কথা বলল লোকটার সঙ্গে। কিছু কিনতে আসেনি সে। রেলের টিকিটবাবুর কাছ থেকে কীসের খবর দিতে এসেছে। খবর দিয়ে চলে গেল।

শিশির বলল, "তোমায় ক-টা খবর দেব, চমকে উঠো না।"

বংশী হাসল। "সিংহীবাবুর খবর?"

"কেমন করে বুঝলে?"

"যেরকম জমিয়ে বসেছ ওখানে, বুঝতে বাকি থাকে না।"

বাবু বলল, “না বংশী, খবর মামুলি নয়। দারুণ খবর।”

বংশী শিশিরের দিকে তাকাল।

শিশির কোনও ভূমিকা করল না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব বলে গেল।

বংশী অবাক হয়ে শুনছিল। তার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। মাঝে-মাঝে তার বিস্ময় জানাচ্ছিল।

ততক্ষণে চা এল। চা আর গরম কুচো নিমকি।

বংশী বলল, “হেমবাবু ঠিকই বলছিলেন। বলছিলেন, সিংহীমশাইয়ের বাড়িতে চোর ডাকাত ঢোকার তো কারণ নেই, তবু লোকটা ও-বাড়ির পেছনে কী করছিল?”

“লোকটা চোর-ডাকাত নয়,” বাবু নিমকি মুখে দিয়ে বলল, “সিংহীবাবুকে ঘায়েল করতে গিয়েছিল। হয়তো খুন।”

শিশির মাথা হেলাল। “কোনও সন্দেহ নেই। ভবতোষ এখন যেমন করেই হোক সিংহীমশাইকে সরাতে চায়। আমার তাই মনে হচ্ছে।”

বংশী চায়ে চুমুক দিল। “খবরটা হেমবাবুকে দেওয়া দরকার।”

“আবার থানা পুলিশ? সিংহীবাবু চটে যাবেন।”

“বোকা হলে চটবেন, বুদ্ধিমান হলে চটবেন না,” বংশী বলল, “ওঁর জীবন কি সস্তা? ভদ্রলোককে মারবার চেষ্টা করা হচ্ছে এ কথা তিনি থানায় জানাবেন না?”

কথার মধ্যে ছেদ পড়ল। জনা দুয়েক খদ্দের এসেছে। একজনের আবার লম্বা ফিরিস্তি। বংশী খদ্দেরকে মালপত্র দিতে লাগল। শিশির আর বাবু চা নিমকি খাচ্ছিল। খানিকটা সময় গেল বংশীর খদ্দের বিদায় করতে। ততক্ষণে তার চা জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছে।

শিশিরই আবার কথা তুলল। “থানায় বললে লাভ হবে কিছু?”

“সিংহীবাবুর বাড়ির ওপর নজর রাখবে।”

“সে রকম নজর হেমবাবু কি রাখছেন না?”

“না,” মাথা নাড়ল বংশী। “খোঁজখবর করা আর নজর রাখা এক কথা নয় শিশির। হেমবাবুকে আজই সব বলা দরকার। উনি স্টেশনের দিকে গিয়েছেন—এখনি ফিরবেন। এখান থেকেই আমরা দেখতে পাব। তোমরা ওঁর সঙ্গে থানায় যাও। সব কথা বলো।”

বাবু এবার একটা সিগারেট ধরাল। “হিতে বিপরীত হবে না তো?”

“আমার মনে হয় না।”

শিশির বলল, “একটা কথা তুমি ভেবে দেখছ না, বংশী। সিংহীবাবুর কথা তুলতেই আরও দশটা কথা উঠবে। তখন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। হাজার হোক, সিংহীবাবুর তো দোষ আছে। তিনি ভবতোষের হয়ে আমাকে অসুস্থ করে তুলেছিলেন। কাজেই আমার মনে হয় সিংহীবাবুর সঙ্গে কথা না বলে থানায় গেলে তাঁর বিপদও হতে পারে। তা ছাড়া বাবার কাছ থেকে চিঠির জবাব না পাওয়া পর্যন্ত হুট করে আমি কিছু করতে চাইছি না।”

বংশী চুপ করে গেল। ভাবছিল। হঠাৎ সে হাত বাড়িয়ে বাবুর কাছে একটা

সিগারেট চাইল। "দিন তো বাবুদা, বুদ্ধির ঘরে ধোঁয়া লাগিয়ে নিই।"

বাবু সিগারেট দিল। দেশলাইও সঙ্গে দিল।

বংশী সিগারেট ধরিয়ে টান মারল জোরে-জোরে। কাশল বার কয়েক। তারপর বলল, "সিংহীবাবুর লাইফের ওপর অ্যাটেম্পট্ একবার যখন শুরু হয়েছে, আবার হবে। তাঁকে এই বিপদের হাত থেকে কে বাঁচাবে? ভদ্দরলোক নিজে কি পারবেন? তিনি তো গুণ্ডা নন।"

শিশির একটু হাসল, মুচকি হাসি। "তুমি তো ওঁকে দু চোখে দেখতে পারতে না, বিশ্বাস করতে চাওনি! এখন তোমার মত পালটে গেল?"

"না," মাথা নাড়ল বংশী, "পুরোপুরি পালটায়নি। খানিকটা পালটেছে। সিংহীবাবুকে আমি এখনও ষোলো আনা বিশ্বাস করতে পারছি না, শিশির।"

"পারছ না?"

"না। কেন পারছি না বলতে পারব না। যে লোক অন্যের কাছে টাকা খেয়ে তোমায় আজে-বাজে ওষুধ খাইয়ে পাগল করে তোলার চেষ্টা করেন সেই মানুষটি মোটেই ভাল নন। তিনিও শয়তান। রাতারাতি তিনি ধর্মপুত্র হয়ে গেলেন—আর ভবতোষ একা শয়তান হল, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।"

বাবু আর শিশির মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

"তা হলে?" শিশির বলল।

"জানি না। ভবতোষ আর সিংহীবাবু—কে কী মতলব আঁটছেন বলা মুশকিল। কে কাকে মুঠোয় করার খেলা খেলছে বলা যায় না। তবে হ্যাঁ, সিংহীবাবুকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ভবতোষ যদি তাঁকে খুন করার জন্য লোক লাগিয়ে থাকেন—আমাদের কাজ হবে খুনে গুণ্ডার হাত থেকে ভদ্রলোককে বাঁচানো। পুলিশের কাছে গেলে সহজ হত। যদি পুলিশের কাছে না যেতে চাও, আমি অন্য একটা ব্যবস্থা করতে পারি।"

"কী?"

"আমার হাতে লছুয়া বলে একটা লোক আছে। সে হল কাঠুরে। জঙ্গলে গাছ কাটত। এখনও ডাক পড়লে গাছ কাটতে যায়। পানবিড়ির দোকান দিয়ে বসে আছে ফটকের কাছে। তাকে কুড়ুল হাতে দেখলে তুমি ভিরমি খাবে। আমার রাবা ওকে একরকম মানুষ করেছিলেন বাচ্চা বয়সে। লছুয়া আমায় খুব ভালবাসে। দাদা বলে ডাকে। বেটা আমায় ধমক-ধামকও মারে। লছুয়াকে আমি সিংহীবাবুর বডিগার্ড করে রাখতে পারি। সিংহীবাবুর ক্ষতি হলে আমাদের ক্ষতি। ভবতোষের বিরুদ্ধে সে সবচেয়ে বড় প্রমাণ, বুঝলে?"

শিশিরের বুঝতে কোনও অসুবিধে হল না। বলল, "বুঝেছি।"

॥ ঊনত্রিশ ॥

বিকেলে বেড়াতে বেরোবার সময় শিশির আর বাবু আশালতাকে একটু ধোঁকা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আশালতা ঠিক বুঝলেন না। শুধু বললেন, "কাঁধে থলি নিয়ে

কোথায় যাচ্ছিস?"

শিশির একমুখ হেসে বলল, "কোথাও নয়। এই বাজারের দিক থেকে ঘুরে আসব। বংশীর জন্যে..." বলে শিশিরের আর কথা জুটল না মুখে; তারপর ফট করে বলল, "ওর জন্যে জামা প্যান্ট আছে। এখানকার দরজিকে দেখাবে। কলকাতার ছাঁটে প্যান্ট-শার্ট করাবে কিনা তাই...!"

আশালতা অতশত বুঝলেন না। ভাইপোর কথাই বিশ্বাস করে নিলেন। শশধর বোধ হয় কাছাকাছি কোনও বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন, তাঁকে বারান্দায় বা বাগানে দেখা গেল না।

বাড়ির বাইরে এসে শিশির নিজের মনে হেসে উঠল। "বাবুদা, আর একটু হলেই ক্যাচ হয়ে যেতাম। ঝপ করে কি মিথ্যে কথা মুখে আসে, তাও পিসিমার সামনে?"

বাবু সবই বুঝতে পারছিল। তারও কম হাসি পায়নি। মাঠ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাবু মাথার ওপর তাকাল। মস্ত মস্ত নিম আর কাঁঠাল গাছের মাথায় ঝাপসা অন্ধকার জমতে শুরু করেছে। দল বেঁধে পাখিরা ফিরে আসছে এবার, তাদের কিচির-মিচির ডাকে জায়গাটা ভরে গিয়েছে; হাসপাতালের সামনে কারা যেন একটা ঘোড়া বেঁধে রেখেছে। ঘোড়াটা হঠাৎ ডাক ছাড়ল বিশ্রীভাবে। বাবু কিছু ভাবছিল। বলল, "বংশী ভাল না মন্দ করল বুঝতে পারছি না।"

"কেন? খারাপ কী করেছে?"

"কী জানি! বেশি রিস্ক নেওয়া হচ্ছে।"

"রিস্ক নেওয়া হচ্ছে ঠিকই; কিন্তু বেশি বলছ কেন? আমরা ভবতোষকে একটা পালটা চমক দেব! তার বেশি কিছু নয়।"

বাবু প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল। বলল, "ভবতোষ ভড়কি খাবার মতন লোক নয়।"

"দেখাই যাক।...তার আগে সিংহীবাবুকে তুমি ম্যানেজ করো। ভদ্রলোক সবই যেন বেঁকা চোখে দেখেন।"

"চলো, দেখি।"

কথা বলতে বলতে শিশিররা সিংহীবাবুর বাড়ির কাছাকাছি চলে এল। দেখতে পেল সিংহীবাবুকে। বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন।

কাছে এসে বাবু বলল, "আপনি এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন?"

"ভেতরে যাচ্ছিলাম, তোমাদের দেখতে পেয়ে দাঁড়ালাম। এখনও সন্ধে-হয়নি।"

"হাতের ব্যথা কমল?" শিশির জিজ্ঞেস করল।

"সময় লাগবে। কালকের চেয়ে একটু কম।...চলো, ভেতরে যাবে তো?"

"না। বসব না।"

"যাবে কোথায়? বাজারে না স্টেশনে? যেখানেই যাও সাবধানে যাবে। আমি বরং বলি, তোমরা সন্ধের পর পথে-ঘাটে ঘুরো না।"

বাবু বলল, "আমরাও আপনাকে সেই কথাটা বলতে এসেছি। আপনি বিকেলের পর বাড়ির বাইরে একেবারেই থাকবেন না।"

সিংহীবাবু যেন তত অবাক হলেন না। "কালকের কথা বলছ?"

"হ্যাঁ।" বাবু মাথা নাড়ল। "কাল কী হয়েছিল আপনি জানেন। কিন্তু আপনি আসল ব্যাপারটা জানেন না।"

সিংহীবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

বাবু বলল, "কাল একটা লোক বর্শা হাতে আপনার বাড়ির পেছন দিকে ঘোরাঘুরি করছিল। তাকে ওইভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশের লোক তাড়া করে। ভেবেছিল ডাকাতদলের কেউ হবে। গুলি পুলিশ চালিয়েছিল। আপনি যে ভাবছিলেন ভবতোষের লোক চালিয়েছে তা নয়।"

সিংহীবাবু এবার অবাক হলেন। "কে বললে-তোমাদের?"

বাবু সামান্য ইতস্তত করল! বলল, "আমরা সকালে বাজারে লোকের মুখে শুনেছি। লোকে অবশ্য আপনার বাড়ির কথা বলছে না, বলছে পুকুরের কাছে বর্শাহাতে ডাকাতের কাউকে দেখা গিয়েছিল। ব্যাপারটা তো বুঝতেই পারছেন। লোকটা আপনার বাড়ির কাছেই ঘুরছিল।" বাবু কথা বলতে বলতে ঘাবড়ে যাচ্ছিল। কথা চেপে এর বেশি আর কী বলা যায়।

সিংহীবাবু বললেন, "তা পুলিশ এখানে কোত্থেকে এল?"

"এদিকে আজকাল প্লেন ড্রেসে পুলিশ ঘোরে। ডাকাতির পর থেকে।"

"ও!...তা আর কী শুনলে?"

"লোকটাকে ধরা যায়নি; পালিয়ে গিয়েছে।"

শিশির বলল, "আপনি ঠিকই ধরেছেন, ভবতোষের লোক আপনার দিকে নজর রেখেছে। তারা গুলি হয়তো চালায়নি, কিন্তু বর্শা-হাতে বাড়ির মধ্যে ঢোকার চেষ্টা তো করছিল। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই কথা প্রায়। আপনি যে এখন ভবতোষের ভাড়াটে গুণ্ডা-বদমাশদের নজরে আছেন সব সময়—সেটা ঠিকই। নিজেই আপনি বলছিলেন। সত্যি আপনার জীবনের ক্ষতি হতে পারে। তাই বলছিলাম, যতটা পারেন সাবধানে থাকবেন।"

সিংহীবাবু কী যেন ভাবলেন। "সাবধানেই আছি।"

বাবু শিশিরের দিকে তাকিয়ে যেন পরামর্শ চাইছে এমনভাবে বলল, "একটা বিশ্বাসী কাউকে রাত্তিরে রাখা দরকার, তাই না শিশির?"

"রাখলে ভাল হয়," শিশির নিরীহের মতন বলল।

সিংহীবাবু দুজনের মুখ দেখলেন। বললেন, "না, কোনও লোক আমি রাখব না। কে বিশ্বাসী হবে আর কে হবে না কেউ বলতে পারে না। উটকো লোককে পয়সা খাওয়ালে সে যে অবিশ্বাসের কাজ করবে না—এর কোনও প্রমাণ আছে!"

শিশির হঠাৎ বলল, "আমরা কিন্তু একজনকে রাখব ভাবছি। আমাদের জন্যে। বিপদ তো আমাদেরও।"

সিংহীবাবু যেন বিরক্ত হলেন, "তোমাদের ব্যাপার তোমরা ভেবে দেখো। কাকে রাখছ? লোক ঠিক করেছ?"

"না, কাল পরশু করব। পিসেমশাইকে বলেছি।"

"ও!"

শিশির আর দাঁড়াতে চাইল না। বাবুকে বলল, "চলো, বাবুদা।" বলে সিংহীবাবুর দিকে তাকাল। "আপনি ভেতরে যান।—ও, একটা কথা। ভবতোষের বাড়িতে কতরকম অস্ত্র আছে আপনি জানেন?"

সিংহীবাবু অবাক হয়ে বললেন, "কেন?"

"এমনি; জিজ্ঞেস করছি। বন্দুক তো আছেই।"

"বন্দুকের বেশি আছে। বন্দুকের নিশানা ভুল হতে পারে, তার কুকুরের হয় না। কুকুর তো নয়, একটা বাঘ।—এ সব কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?"

"এমনি। কৌতূহল। আপনি ভেতরে যান, আমরা একটু ঘুরে আসি।"

শিশিররা চলে যাচ্ছিল, সিংহীবাবু আচমকা বললেন, "একটা কথা তোমাদের বলে দিই। ভবতোষ বরাবরের শয়তান। তার সঙ্গে চালাকি করার চেষ্টা কোরো না। তোমরা ছেলেমানুষ। কতটুকু ক্ষমতা তোমাদের?"

শিশির বলল, "ক্ষমতা দিয়ে সব সময় লড়াই হয় না, বুদ্ধি দিয়েও হয়।"

আর দাঁড়াল না শিশিররা।

কয়েক পা এগিয়ে এসে বাবু বলল, "কেঁচে গেল রে! সিংহীকে ম্যানেজ করতে পারলাম না।"

শিশির বলল, "ওঁর এখন সব ব্যাপারেই সন্দেহ। আমাদের সন্দেহ করছেন কি না কে জানে।"

এবার অন্ধকার হয়ে এসেছে। দুজনে পা চালিয়ে বংশীর দোকানের দিকে এগোল।

বংশী অপেক্ষাই করছিল।

শিশির দোকানে ঢুকেই বলল, "তোমার ফরমাশ-মতন জিনিস জোটাতে পারলাম না, বংশী।" বলে ব্যাগটা রাখল। "পিসিমার চোখ বাঁচাতে একটা প্যান্ট চাপা দিয়ে এনেছি।"

বংশী বলল, "কী কী পেয়েছ?"

"একটা মরচে ধরা ভোজালি, লোহার একটা আঁকশি, আর আধ শিশি স্পিরিট—স্টোভ ধরাবার।"

বংশী বলল, "ভোজালিটা রেখে দিয়ে যাও দোকানে, ধার করিয়ে নেব।"

বাবু বলল, "বংশী, ব্যাপারটা কিন্তু অনেক দূর গড়াতে পারে। ভেবে দেখেছ ভাল করে?"

মাথা হেলিয়ে বংশী বলল, "ভেবে দেখেছি। আমরা ভবতোষের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছি না বাবুদা; ভদ্রলোককে একটু ঘাবড়ে দিতে যাচ্ছি।"

" তাতে লাভ?"

"একটা লোক যদি একতরফা লাঠি ঘোরায় তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার আমাদের হাতে ইট-পাটকেল আছে।" বলে বংশী হাসল। "আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন, ভবতোষকে আমরা শুধু জানান দিয়ে আসব যে তার বাড়ির ওপর আমাদেরও নজর আছে।"

॥ ত্রিশ ॥

বাবু কিছু বলল না, বংশীর এই যেচে ভবতোষের বাড়ির সামনে গিয়ে কিছু-একটা করা তার পছন্দ হচ্ছিল না। কিন্তু শিশির বংশীর কথায় যেভাবে নেচে উঠেছে তাতে বাবু আর কী করতে পারে।

"কখন যাবে?" শিশির জিজ্ঞেস করল বংশীকে।

"আর খানিকটা পরে। দোকান আজ আর খুলে রাখব না। বন্ধ করে চলে যাব। নাও, ততক্ষণে তুমি এই ছেঁড়া কাপড়টাকে টুকরো করে বল করে পাকিয়ে নাও। ভেতরে ইটের টুকরো দেবে যাতে ওজন হয়, কাগজ-টাগজ জড়াবে, তারপর কাপড়। গোটা আট-দশ হলেই হবে। বড়-বড় বল করবে। বেশি টাইট কোরো না।"

বংশী দোকানের একপাশে জড়ো করে রাখা কাপড়ের টুকরো, কাগজ, ছেঁড়া মশারির ফালি দেখাল।

বাবু বলল , "ওই ছোট টিনটা কীসের?"

"পেট্রলের। জোগাড় করেছি।"

শিশির কাপড়ের টুকরো, কাগজ টেনে নিয়ে বসে পড়ল! বংশী ঠাট্টা করে বলল, "ভবতোষ আমাদের চা খাওয়াবে বলে মনে হয় না, এক কাপ করে চা খেয়ে নিলে ভাল হয় না, বাবুদা?"

মাথা নাড়ল শিশির। "বলে এসো।"

বংশী নস্যির টিপ নাকে গুঁজে বেরিয়ে গেল।

বাবু বলল, "আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না, ব্যাপারটা কী করবি তোরা?"

শিশির বলল, "ভবতোষকে বুঝিয়ে আসব, আমরা আছি। তার চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি।" তামাশার গলা করে বলল শিশির। তারপর একটু থেমে আবার বলল, "একটা কথা কি জানো বাবুদা? ভবতোষ যদি বুঝতে পারে, আমরাও তার পেছনে লেগেছি, লোকটা একটু-না-একটু ঘাবড়াবেই। আর ও যদি ভেবে নেয়, আমরা ভয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি তা হলে দাপিয়ে বেড়াবে। একটা কথা তুমি জেনে রেখো, কালকের ঘটনার পর ভবতোষ খানিকটা সাবধান হবেই। ধরো যদি ওর গুণ্ডাটা কাল ধরা পড়ত হেমবাবুর হাতে, কী হত?... ওকে এবার খানিকটা ঘাবড়ে দেওয়া দরকার। এখনই রাইট টাইম।"

শিশিরের কথার মধ্যে বংশী ফিরে এল। বলল, "চা খেয়ে আমি আমার অস্ত্রটা ঠিক করে নেব।"

"কী অস্ত্র তোমার?"

"দেখতেই পাবে। এ হল দেহাতি যন্ত্র। আগুন ছোড়ার।"

বাবু আর শিশির একই সঙ্গে বলল, "সে কী! কোথায় সেটা?"

"শেলফের আড়ালে রেখে দিয়েছি।...একটা গুপ্তিও আমার কাছে আছে।"

"দারুণ," শিশির হাসল। "বংশী তুমি যদি একটা যাত্রা পার্টির পিস্তল জোগাড় করতে পারতে—যাতে শুধু আওয়াজ হত—তা হলেই কেল্লা ফতে হত।"

বংশী বলল, "ভেবো না। আমাদের সঙ্গে একজন থাকবে যে পিস্তলের বাবা।"

শিশির আর বাবু কিছু বুঝল না। বলল, "কে, হেমবাবু?"

"না, হেমবাবু থাকবেন না। আমি লছুয়াকে নিয়ে যাব। সে সঙ্গে থাকবে। তাকে আমি স্টেশনের ওভারব্রিজের কাছে থাকতে বলেছি।"

বাবু বলল, "ভবতোষের বন্দুক কি তোমার লছুয়ার কুড়ুলের চেয়ে মারাত্মক নয়?"

বংশী বলল, "আপনি ভুল করছেন, বাবুদা। ভবতোষ অত কাঁচা কাজ করবে না। বন্দুক চালালে সে পুলিশের হাতে গিয়ে পড়বে। যেচে পুলিশের খপ্পরে সে যাবে না।"

চা খেয়ে গোছগাছ করে বেরোতে খানিকটা সময় গেল। ততক্ষণে একেবারে অন্ধকার হয়ে গিয়েছে চতুর্দিক।

দোকান বন্ধ করে বংশী তালা লাগাল। বলল, "আপনারা স্টেশনের দিকে হাঁটতে থাকুন, বাবুদা। আমি একটা কাজ সেরে আসছি। আপনারা স্টেশনের ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবেন।"

বাবু আর শিশির পা বাড়াল। বংশী উলটো মুখে চলে গেল কোথাও।

দু-একটা জিনিস বাবুদের হাতে গছিয়ে দিয়েছে বংশী। কিন্তু এমন কিছু দেয়নি যা থেকে কোনওরকম সন্দেহ হতে পারে। শিশির তার ঝোলার মধ্যে পেট্রলের ছোট টিন আর স্পিরিট ঢুকিয়ে নিয়েছে। তার পকেটে বিঘত-খানেক চৌকো বান্ডিল, কাগজ দিয়ে মোড়া। বান্ডিলের মধ্যে কাপড়ের গোল-গোল বল। অন্য হাতে একটা ছড়ি। আসলে সেটা গুপ্তি। অস্ত্রগুলো বংশীই জোগাড় করেছে। বোধ হয় তারই জিনিস। বংশী কয়েকটা রুমাল আর ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোও বাবুর পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বলছে, কাছে রাখুন—দরকার পড়তে পারে।

স্টেশনের দিকে যেতে যেতে শিশির বলল, "অ্যাডভেঞ্চারের মতন লাগছে; না, বাবুদা?"

বাবু অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমার তেমন সুবিধে মনে হচ্ছে না।"

"তুমি ভয় পাচ্ছ?"

"ভরসাও পাচ্ছি না।"

শিশির হেসে উঠল। "যখন বংশী প্ল্যান করছিল তখন তো কিছু বলনি?"

বাবু যেন অস্বস্তি বোধ করল। "ব্যাপারটা এত বুঝিনি।"

"কোনও ভয় নেই। টর্চটা নিয়েছ তো?"

"নিয়েছি।"

আর কোনও কথা বলল না শিশির।

স্টেশনের ওভারব্রিজে এসে দাঁড়াল দুজনে। সামান্য আগে কলকাতার গাড়ি চলে গিয়েছে। প্লাটফর্মে তখনও কিছু লোকজন, ফেরিঅলা। আলো জ্বলছে স্টেশন জুড়ে। রেলের টিকিটবাবু ওভারব্রিজের নীচে দাঁড়িয়ে। টিকিট নিয়ে কার সঙ্গে যেন বচসা করছেন।

শিশির একবার আকাশের দিকে তাকাল। অনেক তারা ফুটেছে। মেঘ-টেঘ

কোথাও নেই। বাতাসও ঠাণ্ডা। জঙ্গলে মাঠ-ঘাটের গন্ধও নাকে লাগে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বাবুর কিছু চোখে পড়ে গেল। বাবু শিশিরের হাত ধরে টানল, বলল, "ওই দেখ।"

বাবুর চোখের ইশারা মতন শিশির প্লাটফর্মের দিকে তাকাল। জলের কলের কাছে লছুয়া দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত তার চেহারা। মাথায় অনেকটা লম্বা, চোখে পড়ার মতন; শরীর-স্বাস্থ্য ভীষণ কিছু নয়, অন্তত বাইরে থেকে বোঝা যায় না। লছুয়ার হাত দুটো সত্যিই দেখার মতন, এত লম্বা যে সহজেই নজরে পড়ে। মাথা কামানো। পরনে ধুতি। খাটো ধুতি। মালকোঁচা মেরে পরেছে। গায়ে একটা ফতুয়া। কোমরে গামছা জড়ানো।

শিশির এই লোকটাকে আগেও দেখেছে। কিন্তু ভাল করে নজর করেনি। বংশীর কাছে লছুয়ার কথা শোনার পর তার কেমন কৌতূহল হয়েছিল।

শিশির বলল, "ওর কুড়ুল কই?"

বাবু বলল, "বোধ হয় শুধু হাতে এসেছে।"

সামান্য পরেই বংশীকে চোখে পড়ল। বংশী বুকিংঅফিসের পাশ দিয়ে লাইন টপকে প্লাটফর্মে উঠেছে। লছুয়ার প্রায় কাছাকাছি এসে সে যেন কিছু বলল তাকে। তারপর ওভারব্রিজের দিকে তাকিয়ে শিশিরদের খুঁজতে লাগল।

শিশির হাত তুলে নিজেদের দেখাল।

বংশী ডাকল তাদের।

শিশির বলল, "চলো, বাবুদা।"

প্লাটফর্মে নেমে জলের কলের কাছাকাছি আসতেই বংশী বলল, "চলো, আর দেরি করব না। আমরা লাইনের পাশ দিয়ে খানিকটা যাব, তারপর ডাইনে নেমে রাস্তা ধরব। কাঁচা রাস্তা। তবে খারাপ নয়, ভবতোষের গাড়ি যায়।"

শিশির আর বাবু লছুয়ার দিকে তাকাল।

বংশী বলল, "ও আসবে। আমাদের খানিকটা পেছনে থাকবে।"

"ওর কুড়ুল কই?"

"আছে," বংশী হাসল। "লুকিয়ে রেখেছে। নাও, চলো।"

"তোমার যন্ত্রটা কোথায়?"

"এই তো।..." বংশী পিঠের দিকে আড়াল করে রেখেছিল তার যন্ত্র।

পা বাড়াল বংশী। লছুয়াকে বলল, "তু থোড়া ঠাহর যা।" বলে হঠাৎ বাবুকে বলল, "একটা সিগারেট দিন তো বাবুদা, লছুয়াকে গরম করে দিই।"

বংশী বাবুর কাছ থেকে সিগারেট দেশলাই চেয়ে নিয়ে লছুয়ার দিকে এগিয়ে গেল। কিছু যেন বোঝাল লছুয়াকে, বুঝিয়ে ফিরে এল।

প্লাটফর্ম দিয়ে হাঁটতে লাগল তিনজনেই। লছুয়া থাকল খানিকটা পেছনে।

হাঁটতে হাঁটতে বংশী বলল, "ভবতোষের বাড়িতে পাহারাদার আছে। তবে সেই পাহারাদার চব্বিশ ঘণ্টা যে বাইরের দিকে নজর রাখবে তা মনে হয় না। এ-দিককার সব বড়লোকদের বাড়িতেই দরোয়ান থাকে, না হয় মালি। তারা ফাঁকিবাজ।

ভবতোষের বাড়ির পাহারাদার অতটা ফাঁকি মারতে পারবে না। তবু সে-বেটা আমাদের আগেভাগে দেখতে পাবে বলে মনে হয় না।"

"ওর তো একটা ওয়াচ পোস্টের মতন ব্যবস্থাও আছে," বাবু বলল।

"তা আছে। কিন্তু সেখানে সারাদিন লোক বসে থাকে নাকি? কোনও কারণ নেই থাকবার। ওটা ভবতোষের শখ হয়তো, কিংবা ধরুন, লোককে ভড়কি দেবার চেষ্টা, নিজের প্রেস্টিজ বাড়ানো।"

"তা জানি না। তবে আমাদের সেদিন কেউ দেখেছিল।"

"আচমকা দেখে ফেলতে পারে বাবুদা, তার জন্যে ওই টঙে ওঠার দরকার করে না। ও বাড়ির ছাদ থেকেও এই ফাঁকা জায়গার চারপাশে দেখা যায়। তা সে দিনের বেলায়, এই অন্ধকারে নয়। নিন, এবার ডান দিক দিয়ে গড়গড়িয়ে নীচে নামুন, রাস্তায়।" বলে বংশী টর্চের আলো দেখাল।

সামান্য ঢালু পায়ে-চলা সরু পথ। তিন জনেই রাস্তায় নেমে এল। টর্চ নিবিয়ে দিল বংশী। বলল, "আমরা কিন্তু আর টর্চ জ্বালব না। নেহাত দরকার পড়লে যদি জ্বালতেও হয়, কাচের ওপর হাত চাপা দিয়ে জ্বালব।"

শিশির বলল, "বংশী, আমাদের আক্রমণটা কোন দিক দিয়ে হবে? সামনের দিক দিয়ে না পেছনের দিক দিয়ে?" বলে শিশির হাসল। তারপর নিজের মনেই বলল, "এ যেন ভবতোষের দুর্গ আক্রমণ!"

বংশী বলল, "পাশাপাশি জায়গা থেকে। ভবতোষের বাড়ির একটা দিকে মাটির উঁচু ঢিবি আছে, পাথরের চাঁই পড়ে আছে বড় বড়। আমরা সেখান থেকেই অ্যাটাক করব।"

"মানে, তোমার যন্ত্র থেকে আগুনের গোলা ছুড়বে?" শিশির ঠাট্টা করেই বলল।

"হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে পাঁচিল টপকে ভেতরে গিয়ে পেট্রল ছড়িয়ে আসতে হবে।"

শিশির অবাক হয়ে বলল, "অত উঁচু পাঁচিল টপকাবে কে?"

"লছুয়া," বংশী বলল।

॥ একত্রিশ ॥

ভবতোষের বাড়ির কাছাকাছি এসে শিশিররা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। কেউ কোথাও নেই। চারদিকে অন্ধকার। বিশাল বাড়িটার কম্পাউন্ড ওয়াল ঘন কালো ছায়ার মতন দেখাচ্ছিল। ফটক বন্ধ।

বংশী সতর্কভাবে চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে বাড়িটা দেখছিল। শেষে বলল, "আমি একবার গেটের দিকটা দেখে আসি, তোমরা এখানে দাঁড়াও।" বংশী ফটকের দিকে এগিয়ে গেল।

ভবতোষের বাড়ি থেকে অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে শিশিররা দাঁড়িয়ে। তাদের বাঁ দিকে ঢালু মাঠ, ডান দিকে একটা বেঁটে মতন গাছ। কীসের গাছ কে জানে!

জায়গাটা গা-আড়াল দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মতন; হাত কয়েক তফাতে বড় একটা পাথরও রয়েছে।

শিশিরের ভয় করছিল না। উত্তেজনাও নেই। তারা বাস্তবিক ভবতোষের সঙ্গে লড়তে আসেনি, এসেছে লোকটাকে একটু ভয় পাইয়ে দিতে। মানে, ভবতোষ এতদিন একতরফা তার বিক্রম দেখাচ্ছিল, ভাবছিল—তার সঙ্গে যোঝবার লোক নেই। আজকের পর ভবতোষ অন্তত দুটো জিনিস বুঝতে পারবে। সে বুঝবে যে, তার ওপর অন্য পক্ষ নজর রাখছে, আর এটাও বিলক্ষণ বুঝে নেবে, শিশিররা তার সঙ্গে পাঞ্জা কষতে এগিয়ে এসেছে। এরপর কি লোকটা ভয় পাবে না?

বোধ হয় ভয় পাবে। সাবধানও হবে। ভবতোষ খানিকটা সাবধান হলে সিংহীবাবুর পক্ষে ভাল। তাঁর প্রাণের আশঙ্কা কমবে। আবার উলটোটাও হতে পারে। ভবতোষ খেপে যেতে পারে। তবে অত কাঁচা লোক সে নয়।

রেললাইনে একটা মালগাড়ি এসে পড়েছিল। শিশির একবার লাইনের দিকে তাকাল। ডিজেল ইঞ্জিন। চারপাশ কাঁপিয়ে একরাশ মালগাড়ি টানতে টানতে চলে যাচ্ছে স্টেশনের দিকে।

বাবু শিশিরের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে। হাত কয়েত তফাতে লছুয়া। তার হাতে কুড়ুল। কুড়ুল হাতে লছুয়াকে দেখলে সত্যিই ভয় করে।

বংশী আসছে না। গেটের কাছে ছায়াটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। কোথায় সে মিলিয়ে গেল।

শিশির একবার আকাশের দিকে তাকাল। অজস্র তারা ফুটেছে। চমৎকার দেখাচ্ছিল আকাশটা। এমন সময় শিশিরের কানে গেল কে যেন শিস দিচ্ছে। তাকাল শিশির। খুব ধীরে ধীরে টেনে টেনে বংশী শিস দিচ্ছে। আবার তাকে ফটকের দিকে দেখা গেল।

"বাবুদা, বংশী ডাকছে। তুমি দাঁড়াও। আমি যাচ্ছি।"

শিশির এগিয়ে গেল।

বংশী ফটকের একপাশে দাঁড়িয়ে। শিশির কাছে এল।

বংশী বলল, "গেট খোলা। মানে তালা চাবি পড়েনি এখনও। এমনি বন্ধ।"

শিশির বলল, "সবে সন্ধেরাত; পরে তালা পড়বে।"

"আমি গেট খুলে একটু উঁকিঝুঁকি মেরেছি," বংশী বলল, "আশেপাশে কাউকে দেখতে পেলাম না। না দরোয়ান, না মালী। বাড়িতে আলো জ্বলছে।"

শিশির বংশীর মুখ দেখছিল। "কী মনে হয়?"

"বুঝতে পারছি না। হতে পারে ওরা বাড়ির দিকে ওদের ঘরে আছে। আমরা আসব তা তো জানে না।"

"তোমার মতলব কী?"

"একটা কথা ভাবছি। গেট যখন খোলা রয়েছে, তখন পাঁচিল-টাচিল না টপকে এই দিক গিয়েই তো কাজ সারা যায়।"

শিশির বুঝতে পারল। বংশী আগে যা ভেবেছিল, পাঁচিল টপকে গিয়ে একটা

ছোটখাটো লঙ্কাকাণ্ড করবে, এখন সেটা আর ওইভাবে করতে চায় না।

শিশির সামান্য ভেবে বলল, "কিন্তু ধরো এটা যদি ভবতোষের ফন্দি হয়? ও আমাদের লোভ দেখাচ্ছে।"

"কেন? ভবতোষ কেমন করে জানবে আমরা আসব?"

"ওর লোকজন যদি নজর করে থাকে?"

"কেউ নজর করেনি।" বলে বংশী অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাকে নস্যি গুঁজল। "তুমি একবার দেখ না গেটের কাছে গিয়ে..."

শিশির ফটকের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়াল দু মুহূর্ত। তারপর একদিকের পাট ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকল।

ভবতোষের বাড়ির বাগানের এক ছাঁদ আছে। সামনের দিকে ফুলবাগান। দু-চারটে সাধারণ ঝাঁকড়া ফুলের গাছ ছাড়া বাকি যা সবই ছিমছাম ধরনের। অর্থাৎ এমন কোনও বড় গাছ নেই যার আশেপাশে লুকিয়ে থাকা যায়।

দু-চার পা এগিয়ে শিশির চারদিক ভাল করে লক্ষ করল। বাগান অন্ধকার হলেও বাড়িতে বাতি জ্বলছে। গানের শব্দও আসছিল। ভবতোষের বাড়িতে কেউ রেডিয়ো চালিয়ে রেখেছে। গ্রামোফোনও বাজাতে পারে। কোনটা বাজছে তা অবশ্য বোঝা যায় না। শিশিরের মনে হল, বংশী মন্দ কথা বলেনি। অকারণ হাঙ্গামা না করে এই ফটক দিয়েই তারা ভেতরে যেতে পারে।

ফিরে এল শিশির। বলল, " তুমি ঠিকই বলেছ। কোথাও কাউকে দেখতে পেলাম না।"

বংশী বলল, "আমি একটা মতলব ঠাউরে নিয়েছি। তুমি গ্যারাজের দিকটা দেখেছ? ওদিকে কাঠকুটো পড়ে আছে একপাশে, শুকনো পাতাও রয়েছে ছড়িয়ে। ওখানেই আগুন লাগাব।"

শিশির অবাক। বলল, "গ্যারাজের কাছে আগুন লাগাবে? তারপর যদি কোনওভাবে আগুন ছড়িয়ে গাড়িতে লাগে?"

"লাগলে লাগবে। কিন্তু ওখানে আগুন লাগাবার সুবিধে অনেক। গেট থেকে গ্যারাজটা কাছে। আমরা চটপট কাজ সারতে পারব। তা ছাড়া, ওখানে আগুন লাগলে—তুমি যে ভয় করছ ওরাও ওই ভয় করবে। গাড়ি সামলাতে ছুটে আসবে। আমরাও সেফ্‌লি পালাতে পারব।"

শিশির ভেবে দেখল, বংশী মতলবটা ভালই এঁটেছে।

বংশী আর দেরি করতে চাইল না; বলল, "চলো, কাজটা সেরে ফেলি।"

বাবু আর লছুয়া চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বংশীরা বাবুর কাছে এসে পেট্রলের টিনটা তুলে নিল। তারপর লছুয়াকে ডাকল। লছুয়ার কাছে বংশীর সেই অদ্ভুত যন্ত্র জিম্মা করা ছিল। সেটা নিল।

বংশী লছুয়াকে নিয়ে আবার ফটকের দিকে চলে যেতে যেতে শিশিরকে বলল, "তুমি স্পিরিটের বোতল আর ন্যাকড়ার বলগুলো নিয়ে এসো। বাবুদা, আপনি এ দিকটায় নজর রাখুন।...আপনার দেশলাইটা লছুয়াকে দিয়ে দিন।"

বংশীরা এগিয়ে গেল।

বাবু বলল, "তোরা ফটক দিয়ে ঢুকবি?"

"হ্যাঁ। কেউ কোথাও নেই। সহজেই কার্যোদ্ধার হবে।"

বাবু বলল, "যা করবি সাবধানে করবি। আমি আছি।"

শিশির ফটকের কাছে পৌঁছে দেখল, বংশী লছুয়াকে নিয়ে গ্যারাজের দিকে চলে গিয়েছে। শিশিরও এগোতে লাগল।

গেট থেকে সামান্য তফাতেই গ্যারাজ। গ্যারাজের দরজা বন্ধ। পাশের জমিতে কিছু কাঠকুটো জড়ো করা আছে। বাগানের শুকনো পাতা, ময়লা চাঁই করে একপাশে রাখা। বোধহয় মালী সার তৈরি করার জন্যে রেখেছে।

পেট্রলের গন্ধ লাগল। তীব্র গন্ধ। লছুয়া আর বংশী পেট্রল ছড়াচ্ছে শুকনো কাঠকুটোয়, পাতায়। গন্ধটা বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

বংশী সরে এল। লছুয়া তখনও টিনের শেষ পেট্রলটুকু খালি করছে।

শিশিরকে টেনে নিয়ে বংশী ফটকের দিকে চলল। বলল, "এবার আমার বাজুকার খেলা।"

"বাজুকার খেলা মানে?"

বংশী তার যন্ত্রটা দেখাল। বলল, "বাজুকা জানো না? যুদ্ধের সময় বাজুকা দিয়ে ট্যাংক সাবাড় করা হয়। এটা হল দিশি বাজুকা। আমি ন্যাকড়ার বলগুলো আগুন ধরিয়ে পেট্রলে ভেজানো জায়গাটার দিকে ছুড়ব। তারপর লঙ্কাকাণ্ড হবে।"

শিশির বলল, "তার জন্যে তোমার বাজুকার দরকার কী? এমনিতেই তো জ্বালিয়ে পালিয়ে আসতে পারতাম।"

বংশী হেসে বলল, "এ তোমাদের কলকাতার ভেজাল পেট্রল নয়, খাঁটি পেট্রল। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পেট্রলের আগুন নিয়ে খেলা করা উচিত নয়। আর একটা কথা জানো, আগে তো জানতাম না ভবতোষ আমাদের জন্যে এমন সুবন্দোবস্ত করে রাখবে, তাই এই যন্ত্রটা সঙ্গে এনেছিলাম। দূর থেকে ফায়ার করব বলে।"

লছুয়া ততক্ষণে ফিরে আসছে।

বংশী শিশিরকে বলল, "তুমি ন্যাকড়ার বলগুলো স্পিরিটে ভিজিয়ে নাও সামান্য।"

লছুয়া পাশে এসে দাঁড়াল।

বংশী বলল, "যত বেশি সাবধান হওয়া যায় তত ভাল। আগুনের সামনাসামনি থাকলে আলোয় ওরা আমাদের দেখতে পাবে। একটু দূর থেকে আগুন ছুড়ে আমরা পালাব। বুঝলে তো?"

শিশির দু-তিনটে কাপড়ের বল স্পিরিটে ভিজিয়ে নিল।

বংশী একটা বল নিয়ে তার যন্ত্রের মুখে রাখল। বোঝা গেল, ভেতরে কোনও স্প্রিঙের ব্যবস্থা আছে। বলটাকে ছুড়ে দেবে ভেতর থেকে। একেবারে পাকা মিলিটারি কায়দায় বংশী বলল, "রেডি। এবার একটু আগুন লাগাতে হবে। লছুয়া, মাচিস লাগাও।"

শিশির কিছু বোঝবার আগেই লছুয়া কাপড়ের বলে আগুন লাগিয়ে দিল। স্পিরিটে ভেজানো বল। দপ করে আগুন জ্বলল।

বংশী তার বাজুকা থেকে প্রথম বলটা ছুড়ল।

বাহাদুরি আছে বংশীর। আগুনের বলটা জায়গা মতন গিয়ে পড়ল।

"আর একটা...জলদি।" বংশী বলল।

শিশির আর একটা বল দিতে না দিতেই গ্যারাজের দিকে আগুন ধরে গেল পেট্রলে।

বংশী দ্বিতীয় বলটা কোনও রকমে ছুড়তে পেরেছিল, তারপর আর পারল না, পেট্রলের আগুন বাতাসে যেন এক লহমায় অনেকটা ছড়িয়ে গেল। আলোয় আলো হয়ে উঠল বাগানের অনেকটা জায়গা। সঙ্গে-সঙ্গে কারা যেন চেঁচামেচি শুরু করে বাড়ির দিক থেকে ছুটে আসতে লাগল। কুকুরটা বেরিয়ে এল। বিকট ডাক ছাড়ছে। ওরা যেন বিহ্বল।

বংশী শিশিরের হাত ধরে টান মারল। "এবার পালাও। কুকুরটা ছুটে আসছে।"

লছুয়া ফটকটা বন্ধ করে দিল। বাঘের মতন কুকুরটা কাছাকাছি এসে গিয়েছে।

বাবুকে কিছু বলতে দিল না শিশির, হ্যাঁচকা টান মারল। "বাবুদা, ছোটো।"

ততক্ষণে ভবতোষের গ্যারাজঘরের দিকে আগুন লেগে চারদিক বেশ আলো হয়ে উঠেছে। হই-চই লেগে গিয়েছে। কুকুরটা আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল।

মাঠ দিয়ে বংশীরা চারজন ছুটছিল।

॥ বত্রিশ ॥

শিশিররা যে ভেবেছিল, তেমন কিছু ঘটল না। তারা ভেবেছিল, ভবতোষ খোঁচা খেয়ে চুপ করে বসে থাকবে না, পালটা কোনও চাল চালবে। সরাসরি না হলেও লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু একটা করবে। শিশিররা সাবধানে ছিল। চোখ-কান খোলা রেখেছিল। কিন্তু ভবতোষের তরফ থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না।

দু-তিনটে দিন কেটে গেল। বাবুর ছুটি ফুরিয়েছে। তার পক্ষে আর বসে থাকার উপায় নেই। শিশির বলল, "তুমি আর ক-টা দিন ছুটি বাড়িয়ে নাও, বাবুদা।"

বাধ্য হয়েই বাবুকে চিঠি লিখতে হল তার অফিসে। শিশিরকে ফেলে রেখে তারও যাবার ইচ্ছে ছিল না।

কলকাতা থেকেও চিঠি আসছে না অমৃতবাবুর। কী হল কে জানে?

তিন দিনের দিন শিশিররা সকালে বংশীর দোকানে যেতেই বংশী বলল, "কোনও খবর পেয়েছ?"

মাথা নাড়ল শিশির। "না। কীসের খবর?"

"আসবার সময় সিংহীবাবুকে দেখেছ?"

এবারও মাথা নাড়ল শিশির। তারা আজ মাঠ ভেঙে আমবাগানের তলা দিয়ে স্টেশনের রাস্তা ধরে এসেছে। স্টেশন হয়ে। সিংহীবাবুর বাড়ির দিকে যায়নি। শিশির

বলল, "আমরা শান্তি কুটিরের পাশ দিয়ে এসেছি। কেন, সিংহীবাবুর কী হল?"

বংশী কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল, তারপর বলল, "সিংহীবাবু নেই।"

শিশির আর বাবু চমকে উঠল। বিশ্বাস করতে পারছিল না কথাটা। বংশী কি ঠাট্টা করছে?

শিশির বলল, "নেই মানে?"

"মানে নেই। বাড়িতে নেই। কাল রাত থেকেই নেই।"

"কে বলল?"

"লছুয়া কাল রাত থেকে সিংহীবাবুর সাড়াশব্দ পায়নি। বাড়িতে কেউ নেই। বাইরে তালা ঝুলছে।"

শিশির যেন অসাড় হয়ে গেল। ঢোঁক গিলল। তার চোখমুখ কেমন ফ্যাকাসে দেখাল।

বাবু বলল, "আমরা কাল সকালে সিংহীবাবুকে দেখেছি। কথাও বলেছি। বিকেলে অবশ্য দেখিনি। সিংহীবাবু তো আমাদের কিছু বলেননি।"

বংশী বলল, "বিকেলেও ছিলেন। বাড়িতে সন্ধে পর্যন্ত তাঁকে দেখা গিয়েছে। তারপর বেপাত্তা।"

শিশিররা তখনও বসেনি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। বংশী হাতের ইশারায় বসতে বলল। বাবু আর শিশির বলল।

বাবু বলল, "ব্যাপারটা একটু খুলে বলো বংশী; বুঝতে পারছি না তোমার কথাবার্তা।"

বংশী ব্যাপারটা বলল। সিংহীবাবুর দিকে নজর রাখা দরকার বলে সে লছুয়াকে বলেছিল নজর রাখতে। কিন্তু ব্যবস্থাটা ছিল রাত্তিরের জন্যে; দিনে-দুপুরে কে আর সিংহীবাবুকে ঘায়েল করতে আসছে! বংশী একবারও ভাবেনি সকাল দুপুর বা বিকেলে কেউ সিংহীবাবুর বাড়ির দিকে ঘেঁষবে। লছুয়াকে যেমন বলা হয়েছিল, সে তেমনভাবেই চোখ রেখেছিল সিংহীবাবুর ওপর। রাত্রের দিকে মাঝে-মাঝেই ভদ্রলোকের বাড়ির কাছে ঘোরাঘুরি করত। এক নাগাড়ে বসে থাকত না। তার প্রয়োজনও ছিল না। লছুয়া রেলফটকের কাছে পানের দোকান দিলেও তার বাড়ি সিংহীবাবুর বাড়ির প্রায় উলটো দিকে। খাপরার চাল, মাটির ঘর, রাস্তার দিকে একফালি উঠোন। এই তার ডেরা। বাড়িতে বউ আর এক বাচ্চা রয়েছে। লছুয়ার আর-এক সম্পত্তি তার গোরুর গাড়ি। সেটা ভাড়া খাটায়। তা লছুয়ার কোনও দোষ নেই। তাকে যা বলা হয়েছিল, সেইমতন কাজ করেছে সে; কে জানত সিংহীবাবু রাত্তিরের আগেই বাড়ি থেকে অদৃশ্য হবেন।

সব শুনে শিশির বলল, "তুমি বলছ রাত্তিরে কিছু হয়নি?"

"না। রাত্তিরের দিকে লছুয়া নজর রেখেছিল। সে বলেছে, রাত্তিরে ওই বাড়িতে কেউ আসেনি, বা ও বাড়ি থেকে কেউ বেরোয়নি।"

"কিন্তু লছুয়ার কথা ভুল হলেও তো হতে পারে," বাবু বলল।

বংশী মাথা হেলাল। "পারে। কোন মানুষের আর ভুল না হয়। তবে লছুয়া বড়

পাকা লোক, তাকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল।"

শিশির অন্য কথা ভাবছিল। বলল, "কোথায় যেতে পারেন সিংহীবাবু?"

"তুমি বলো।"

"আমার মনে হচ্ছে, ভবতোষের লোক এসে ওঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।"

বংশী হেসে ফেলল। "এ তোমার বাড়াবাড়ি, শিশির। সিংহীবাবু ছেলেমানুষ নন যে, ভবতোষের লোক এসে তাঁকে সন্ধে নাগাদ ধরে নিয়ে যাবে।"

"সন্ধেবেলায় নাও হতে পারে," শিশির বলল।

"বেশ, তোমার কথাই ধরা যাক; তা হলেও তুমি বোঝাও—সিংহীবাবুকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে ক-টা লোক এসেছিল? তারা দরজা না ভেঙে ঘরে ঢুকল কেমন করে? আর সিংহীবাবুই যা একটুও চেঁচামেচি না করে কেমন করে চলে গেলেন?" বলে বংশী যেন মজার চোখে শিশিরকে দেখল কয়েক পলক। তারপর বলল, "একটা কথা তুমি ভুলে যেয়ো না। সিংহীবাবুর বাড়ির বাইরে তালা ঝুলছে। যদি দু-চারজন লোক এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যেত, তারা নিশ্চয় ঘরে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে যেত না। তা ছাড়া তোমায় আগেই বলেছি, সিংহীবাবু একটুও চেঁচামেচি করেননি। করলে লছুয়ার কানে যেত। সে বাড়ি থেকে শুনতে পেত।"

শিশিরের ভাল লাগছিল না। বাবুর দিকে তাকাল শিশির। বাবু বোকার মতন মুখ করে বসে আছে।

শিশির বংশীর দিকে তাকাল। "তোমার কী মনে হয়?"

"আমার দুরকমই মনে হয়। সিংহীবাবু হয় ভবতোষের কাছে গিয়েছেন নিজেই, না হয় তিনি এখান থেকে পালিয়েছেন।"

"পালিয়েছেন?" শিশির মাথা নাড়ল, যেন বিশ্বাস করল না কথাটা।

"পালাতে আপত্তি কীসের?"

"কিন্তু পালাবেন কেন?"

"কারণ এখানে তাঁর বিপদ বাড়ছে। তাঁর প্রাণ যেতে পারে। তা ছাড়া তাঁর আর তো কিছু করার নেই। ভবতোষের সঙ্গে তিনি একসময় হাতে হাত মেলালেও এখন দুজন দুজনের শত্রু। সিংহীবাবু ভবতোষের সঙ্গে যুঝতে পারলেন না। তাঁর আর এখানে বসে থেকে কী লাভ?"

কথাটা শিশির ভাবল। বংশীর যুক্তিতে কোনও ফাঁকি নেই। তবে, কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিল না শিশির। সিংহীবাবু যুঝতে না পারুন, ভবতোষের ওপর তাঁর রাগ দেখে মনে হয়েছিল, তিনি ভবতোষের ওপর প্রতিশোধ নিতে চান। পালিয়ে গেলে তো প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।

বাবু বলল, "বংশী, তুমি বললে, সিংহীবাবু নিজেই ভবতোষের বাড়িতে গিয়েছেন। তাই না? এ কথা কেন বললে?"

বংশী নস্যির কৌটো খুলে আঙুলে নস্যি তুলেছিল। বাবুর কথায় কোনও জবাব না দিয়ে ধীরে সুস্থে নস্যি টানল। নেশাটা মাথায় জমিয়ে নিয়ে নাক মুছতে মুছতে বলল, "বললাম, কেননা আমার এখনও পুরোপুরি সিংহীবাবুকে বিশ্বাস হয় না। তা

ছাড়া যদি সন্ধের পর সিংহীবাবু পালাতে যান—ঠিক তখন তাঁর জন্যে কোনও ট্রেন স্টেশনে থাকার কথা নয়। না কলকাতার গাড়ি, না গয়ার দিকের। ভদ্রলোককে সেই রাত পর্যন্ত স্টেশনে অপেক্ষা করতে হবে ট্রেনের জন্যে। অপেক্ষা করলে কারও না কারও চোখে পড়ার কথা। আমি খোঁজ করতে পাঠিয়েছি কালুদাকে, দেখা যাক কালুদা এসে কী বলে।"

শিশির অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সিংহীবাবু যদি পালিয়ে গিয়ে থাকেন তবে তো ভবতোষের বিরুদ্ধে বড় প্রমাণই নষ্ট হয়ে গেল। আর উনি যদি নিজের থেকে ভবতোষের কাছে গিয়ে থাকেন তবে ধরে নিতে হবে, দুজনের মধ্যে কোনও মিটমাট হয়ে গিয়েছে। বা কোনও একটা ষড়যন্ত্র নাকি? কে জানে! আসলে কী হয়েছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

শিশির বলল, "এখন আমরা কী করব?"

বংশী বলল, "প্রথমে জানবার চেষ্টা করব, সিংহীবাবুর কী হয়েছে? তিনি এখানে, না অন্য কোথাও চলে গিয়েছেন?"

"এখানে থাকলে কোথায় থাকবেন?" বাবু জিজ্ঞেস করল।

"ভবতোষের বাড়িতে," বংশী বলল।

"আমার কিন্তু বিশ্বাস, ভবতোষই সিংহীবাবুকে নিজের হেপাজতে নিয়ে গিয়েছেন।"

বংশী কোনও জবাব দিল না কথার।

অপেক্ষা করে শিশির আবার বলল, "বংশী, ভবতোষকে আমরা খুঁচিয়ে এসেছিলাম; এটা তার পালটা চাল নয় তো?"

"হতে পারে," বংশী বলল, "নাও হতে পারে।...যাকগে, তুমি কলকাতার চিঠি পেয়েছ?"

"না। কালও পাইনি। আজ পেতে পারি।"

"চিঠিটা আগে পাও, তারপর দেখা যাক—কী করা যায়?"

বাবু বলল, "কালুদা কতক্ষণ গেছেন?"

"খানিকটা আগে। ফিরবে এবার।"

"আমরা বসে যাই; দেখি কালুদা কোন খবর নিয়ে আসেন।"

"বসুন-না। কত আর বেলা হয়েছে," বংশী বলল।

শিশির আর বংশী রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে থাকল কালুদার আশায়।

কালু এল অনেকক্ষণ পরে। ততক্ষণে শিশিরদের চা-খাওয়াও শেষ হয়েছে। কালু দোকানে পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে বংশী বলল, "কী হল, কালুদা?"

কালু বলল, "সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ দেখেনি।"

"টিসি, এ এস এম, কুলি—কেউ দেখেনি?"

"না।" মাথা নাড়ল কালু।

বংশী শিশিরের দিকে তাকাল। "তার মানে সিংহীবাবু এখান থেকে চলে যাননি। আছেন এখানেই। কিন্তু কোথায়? ভবতোষের বাড়িতে নিশ্চয়।"

বাবু বলল, "তাঁর আর যাবার জায়গা কোথায়?"

বংশী মাথা ঝাঁকাল। "ভবতোষের বাড়ি এমন জায়গায় যে, চট করে কারও নজরে পড়বে না। আর সিংহীবাবু যদি নিজের ইচ্ছেয় গিয়ে থাকেন, তিনি গা-ঢাকা দিতেই গিয়েছেন, আমাদের নজরে পড়তে চাইবেন না।"

শিশির বলল, "আশ্চর্য! ভদ্রলোক ক-দিন আগে আমাদের কাছে অত কথা বললেন, আজ আবার সেই ভবতোষের বাড়িতে গিয়ে গা-ঢাকা দিলেন! সত্যি, কাউকে বিশ্বাস করা যায় না।"

বংশী বলল, "একপক্ষে ভালই হয়েছে শিশির। দুই পাপী একই জায়গায় গিয়ে জুটেছে। আমাদের সুবিধে হল। এবার আমাদের শেষ খেলা।"

শিশির বোকার মতন তাকাল, বুঝতে পারল না, শেষ খেলা বলতে বংশী কী বোঝাতে চাইছে!

॥ তেত্রিশ ॥

শিশিররা বাড়ি ফিরতেই আশালতা বললেন, "কোথায় ঘুরছিলি? দাদার চিঠি এসেছে।"

বাবার চিঠি? শিশির ছটফট করছিল চিঠির জন্যে। "কোথায়?"

"তোর পিসেমশাইকে জিজ্ঞেস কর।"

শিশির শশধরের খোঁজে যাচ্ছিল, আশালতা বললেন, " দাদা আমাদেরও চিঠি দিয়েছে। এবার তোকে কলকাতায় ফেরত পাঠাতে লিখেছে।"

কথাটা কানে তুলল না শিশির, পিসেমশাইয়ের ঘরের দিকে ছুটল।

চিঠিটা পাওয়া গেল শিশিরের ঘরে, টেবিলের ওপরই রাখা ছিল।

বার দুই চিঠিটা পড়ল শিশির, তারপর বাবুর দিকে বাড়িয়ে দিল।

বাবু বলল, "চিঠি পড়ে আর কী করব! কী লিখেছেন কাকাবাবু?"

"পড়ো না।"

পারিবারিক চিঠি বাবু পড়তে চায়নি প্রথমে, পরে পড়ল। চিঠি পড়া হয়ে গেলে বাবু বলল, "সিংহীবাবু তো সত্যি কথাই বলেছেন।"

শিশির কোনও কথা বলল না। বাবুর দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকল। একটা কথা তার মনে হচ্ছিল। বাবাকে চিঠি লেখার সময় সে অনেক কথা বাদ দিয়ে রেখেছিল। বাবা ভাবতে পারে, ভয়ও পেতে পারে ভেবে শিশির খোলাখুলি পুরো ব্যাপারটা জানায়নি। ফলে বাবার জবাবও বড় নয়। আর একটু পরিষ্কার হলে ভাল হত। তবে মোটামুটি সিংহীবাবুর কথা মিলে গিয়েছে।

কিন্তু সিংহীবাবু শেষ মুহূর্তে কোথায় পালালেন?

বেলা হয়ে গিয়েছিল। বাবু স্নানের জন্যে তৈরি হচ্ছে। শিশির এখন আর কোনও কথা তুলল না। পরে তুলবে।

দুপুরে শুয়ে শুয়ে কথা হচ্ছিল।

শিশির বলল, "বাবুদা, সিংহীবাবু আমাদের ভাবিয়ে তুললেন। বংশীর কথাই ঠিক মনে হচ্ছে।"

বাবু বলল, "আমি ভাই কিছুই বুঝতে পারছি না। ভবতোষ যদি লোক লাগিয়ে সিংহীবাবুকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে—তা হলে তাকে তো অন্য কোথাও পাচার করেও দিতে পারে।"

কথাটা শিশিরের খেয়াল হয়নি আগে। বাবুর কথায় কেমন অবাক হয়ে গেল। বলল, "পাচার? কেন? কেমন করে?"

"সিংহীবাবুকে এখানে রেখে ভবতোষের লাভ কী? বরং ক্ষতি।"

শিশির কথাটা ধরতে পারল। সিংহীবাবু ভবতোষের শত্রু। শত্রুকে ঘরে বসিয়ে রাখার বিপদ অনেক। পাচার করে দেওয়াই সুবিধের। কিন্তু কেমন করে ভবতোষ কাজটা করবে? "বাবুদা?"

"বল।"

"যদি পাচারই করতে হয়, সিংহীবাবুকে স্টেশনে নিয়ে যেতে হবে, রেলগাড়িতে চাপাতে হবে। অবশ্য লোক থাকবে ভবতোষের। কিন্তু বংশীদার যা খবর, কালুদা নিয়ে এল, সিংহীবাবু কাল স্টেশনে যাননি, মানে তাঁকে কেউ দেখেনি।"

বাবু বলল,"তুই ভবতোষকে অত বোকা ভাবছিস কেন! ভবতোষের গাড়ি আছে। গাড়ি করে সে সিংহীবাবুকে খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়েও তো রেলে চাপিয়ে দিতে পারে।"

শিশির বোকার মতন বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কথাটা তো ঠিকই। ভবতোষ তার গাড়িতে চাপিয়ে অনায়াসে সিংহীকে পাচার করে দিতে পারে। বা, কে বলবে, বেচারা সিংহীবাবুকে একেবারে বরাবরের মতন শেষ করে দিতেও তার আটকাবে কি না? একবার তো মেরে ফেলতেই গিয়েছিল ভদ্রলোককে। পারেনি। এবার কি ছাড়বে?

শিশিরের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। শুকনো মুখে সে বলল, "বাবুদা, ভবতোষ যদি বরাবরের মতন সরিয়ে দেয় সিংহীবাবুকে? ব্যাপারটা তো সোজা! এখানে চারদিকে বনজঙ্গল। কোথাও নিয়ে গিয়ে খুন করে বডি ফেলে দিল। কে আর খোঁজ পাবে!"

বাবু অস্বীকার করতে পারল না মনে-মনে। মুখে বলল, "অতটা কি আর করবে?"

"কেন নয়?"

"খুন করার মতন অপরাধ আর নেই।"

"কিন্তু এই অপরাধ একবার সে করতে গিয়েছিল। তার পরেও তার লোক সিংহীবাবুর বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। নয় কি?"

বাবুর মুখে জবাব নেই। সিংহীবাবুর কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, তবে শিশির যা বলছে তা সম্ভব।

দুজনেই চুপ করে থাকল। বাইরে দুপুর ফুরিয়ে যাচ্ছে। পুকুরের দিক থেকে বাতাস এসে বাগানের কলাঝোপের পাতা দোলাচ্ছিল। চড়ুই-কাক ডাকছে। রোদের

আভা সামান্য ম্লান হয়ে এল। হয়তো মেঘ ভেসে এসেছে। শুয়ে থাকতে থাকতে শিশির আচমকা বলল, "না বাবুদা, আর নয়। এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে ভবতোষের সঙ্গে আর লড়লে চলবে না। এবার মুখোমুখি হতে হবে।"

"মুখোমুখি?"

"হ্যাঁ। বাবার চিঠি পাবার পর মুখোমুখি হতে আপত্তি কোথায়?"

বাবু ভাবছিল।

শিশির নিজেই বলল, "আমি নিশ্চয় ভবতোষের কাছে গিয়ে বলতে পারি, কেন সে আমাকে পাগল করে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। কেন? আমি তার কোন ক্ষতি করেছিলাম?"

বাবু বলল, "ভবতোষ যদি বলে সে কিছুই করেনি।"

"করেনি? শয়তান কোথাকার!"

"সিংহীবাবুকে আমরা যদি হাতে না পাই, ভবতোষের কাছে গিয়ে প্রমাণ করতে পারব না।"

শিশিরের মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে বুঝতে পারল, বাবুদা ঠিক কথাই বলেছে। অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে শিশির বলল, "বসে থাকলে চলবে না, বাবুদা, চলো, আমরা বংশীর বাড়ি যাই। দুপুর তো শেষ হয়ে গেল। বংশীর সঙ্গে কথা বলে যা করার করতে হবে। আজই।"

বাবু বলল, "সেটাই ভাল।"

বংশী বাড়িতেই ছিল।

শিশিররা আসতেই বলল, "ঘরে বসবে? না বাইরে? বাড়ির বাইরে আমার ফেভারিট হরীতকী-তলা আছে। পাথর আছে বসার। বসবে?"

"তুমি দোকান যাবে কখন?"

"দেরি আছে।"

"তা হলে চলো, তোমার ফেভারিট জায়গায় গিয়ে বসি।"

বংশীদের বাড়ি পুরনো। বড় নয়, ছোট। বড় বেশি গাছপালায় ভর্তি। কেমন যেন অযত্ন চার দিকে।

বাইরে এসে শিশির বলল, "তোমার দোকান থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে বাবার চিঠি পেয়েছি, বংশী। সিংহীবাবু যা বলেছিলেন তা মোটামুটি ঠিক।" বংশী মুখ ফিরিয়ে দেখল শিশিরকে।

"বাবুদা একটা কথা বলল। কথাটা তুমি শোনো। বলো বাবুদা।"

হরীতকী-তলায় বসল তিনজনে। বংশীর হাতে নস্যির ডিবে। সে নস্যি নাকে গুঁজল।

বাবু তার সন্দেহের কথা বলল গুছিয়ে।

বংশী ঘাড়-মাথা চুলকে বলল, "বাবুদা, আপনি ঠিকই বলেছেন। ভবতোষ যদি সিংহীকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তবে তাঁকে হয় কোথাও পাচার করে দেবে, না হয় মেরে ফেলবে।" বলে মাঠের দিকে তাকিয়ে বংশী যেন গাছপালা ঝোপঝাড় দেখতে

লাগল। সূর্য অস্ত যাবার আর দেরি নেই। একেবারে হালকা রোদ। রোদের সঙ্গে ছায়াও মেশানো যেন। পরেশনাথ পাহাড়টা ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখাচ্ছিল।

শিশির বলল, "এখন কী করা যায় বংশী?"

বংশী গালে হাত দিয়ে ভাবুকের মতন বসে থাকল আরও কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "কাল সন্ধেবেলা বা তার পর পর সিংহীবাবু উধাও হয়েছেন। যদি ভবতোষ তাঁকে পাচার করে থাকে, তবে এতক্ষণ সিংহীবাবু কোথায় পৌঁছে গিয়েছেন বলা মুশকিল। তবে আমার মনে হয়, পাচার করার মতলব থাকলে সিংহীকে রাত্তিরে পাচার করা হয়েছে। দিনের বেলায় নিশ্চয় নয়। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে, কাল রাত্তিরে ভবতোষের গাড়ি বেরিয়েছিল কি না!"

"সেটা কেমন করে জানবে?"

"থানা থেকে খোঁজ নিতে হবে।"

"থানা?"

"বাইরে যাবার রাস্তা একটাই। থানার সামনে দিয়ে। হাবিলদার জানতে পারে।"

"নাও পারে।"

"উহুঁ! জানবে। এই জায়গাটা কলকাতা নয়, হামেশাই গাড়ি বাস লরি যায় না। বিশেষ করে রাত্তিরে গাড়িটাড়ি যায় না। গেলে থানা নজর রাখে। ডাকাতিটা হয়ে যাবার পর তারা আরও সজাগ।"

বাবু বলল, "তুমি তা হলে থানায় খোঁজ নিতে বলছ?"

"আমি নেব।"

শিশির বলল, "বংশী, ভবতোষ যদি সিংহীবাবুকে গুম করে থাকে?"

মাথা নাড়ল বংশী। "ভবতোষ বোকা হলে ওই কাজটা করতে যাবে। সে জানে, আমরা সিংহীবাবুর খোঁজ খবর রাখি, তারও রাখি। সিংহীবাবুকে গুম করলে আমরা ভবতোষকে সন্দেহ করব। থানায় যাব।...আমার মনে হয় না, ভবতোষ অতটা বোকামি করবে।"

"তা হলে সিংহীবাবু কোথায়?"

"আমার বিশ্বাস ভবতোষের বাড়িতে।"

"কিন্তু..."

"কিন্তু টিন্তু নয়। আমার এখনও সন্দেহ, সিংহীবাবু নিজেই ভবতোষের কাছে গিয়েছেন। কেন তা আমি জানি না।"

শিশির বলল, "বেশ, যদি তাই হয়, তা হলে আজ আমরা ভবতোষের বাড়িতে যেতে পারি না?"

বংশী জোরে-জোরে মাথা নাড়ল। "আলবাত পারি। আমি নিজেই ভাবছিলাম—তোমাদের কথাটা বলব। দেরি করলে ঠকতে হতে পারে। আমার মনে হয়, আজ সন্ধের পর আমাদের ভবতোষের বাড়ি হাজির হওয়া দরকার।"

"আমারও তাই ইচ্ছে," শিশির বলল, "কিন্তু কেমন করে তার মুখোমুখি হব? ওর সঙ্গে যুঝতে হলে..."

"আমরা পারব না এই তো?...আমি একটা কথা ভাই স্পষ্ট বলছি। এবার আমরা যা-ই করি না কেন, হেমবাবুর সাহায্য নিতে হবে। পুলিশের সাহায্য না নিলে আমরা পারব না। বিপদে পড়ে যাব। কি, তোমরা রাজি?"

বাবু বলল, "আমি রাজি।"

শিশির বুঝতে পারছিল, এখন আর তার 'না' বলার অর্থ হয় না। শিশির মাথা হেলিয়ে বলল, "বেশ, আমিও রাজি।"

বংশী উঠে দাঁড়াল, বলল, "তা হলে একটু দাঁড়াও, আমি বাড়ি হয়ে আসছি। তোমাদের দোকানে বসিয়ে থানায় যাব। তারপর দেখি কী করা যায়।"

॥ চৌত্রিশ ॥

থানা থেকে বেরিয়ে এসে বংশী বলল, "এখন ক'টা বাজে?"

বাবুর হাতে ঘড়ি ছিল; বলল, "সোয়া ছয়।"

বংশী চারদিক তাকিয়ে সন্ধের চেহারাটা দেখতে লাগল। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও নজর করলে কাছাকাছি জিনিস দেখা যায়। আকাশে সবে তারা ফুটতে শুরু করেছে। বাতাসটাও চমৎকার। শরতের বাতাস।

বংশী বলল, "ঘণ্টাখানেক কোথাও গিয়ে বসে থাকতে হবে। হেমবাবু তো তাই বললেন।"

শিশির আর বাবু বংশীর সঙ্গে হেমবাবুর কাছে এতক্ষণ বসেছিল। কথাবার্তা যা হবার সামনা-সামনি হয়েছে। সবই জানে শিশিররা। হেমবাবু বলেছেন, হাতের ক-টা কাজ সেরে তিনি বংশীদের জন্যে ব্যবস্থা করছেন। মানে, হেমবাবু নিজে শিশিরদের সঙ্গী হবেন, দু-চারজন পুলিশকেও তিনি রাখবেন সঙ্গে।

বাবু বলল, "কোথায় অপেক্ষা করবে?"

"ভাবছি। দোকান খুলব না, চাবি আনিনি। নয়তো দোকানে বসে থাকতাম।" বলে একটু যেন ভেবে নিয়ে বংশী আবার বলল, "স্টেশনেই চলো। প্লাটফর্মে টি-স্টলে বসে এক কাপ করে চা খেয়ে নেওয়া যাবে। একটা টর্চও জোগাড় করতে হবে আমায়।"

বাবুর কাছে টর্চ ছিল। আজকাল তারা টর্চ ছাড়া বিকেলে বেরোয় না। বাবু বলল, "টর্চ আমার কাছে আছে।"

"আর একটা থাকা দরকার," বংশী গম্ভীর চালে বলল।

তিনজনে হাঁটতে লাগল বাজারের রাস্তা দিয়ে। শিশির এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি, এবার বলল, "আমরা স্টেশনে গিয়ে বসে থাকলে হেমবাবু জানবেন কেমন করে?"

"জেনে ফেলবেন। উনি রেলের বুকিংঅফিসের দিকে থাকবেন বলেছেন। আমি সময় মতন হাজির হব।"

শিশির আর কিছু বলল না।

হাঁটতে হাঁটতে খানিকটা এগিয়ে এসে বংশী হঠাৎ দাঁড়াল। বলল, "তোমরা

এগোও শিশির, আমি আসছি। সুবলদার কাছ থেকে একটা টর্চ নিয়ে আসি।" বলেই বংশী ডান দিকে কোথায় চলে গেল। শিশিররা দাঁড়াল না, হাঁটতে লাগল।

বাবু বলল, "তোর কী মনে হচ্ছে?"

"কীসের?"

"সিংহীবাবুকে আমরা পাব ভবতোষের বাড়িতে?"

শিশির জানে না। বলল, "হেমবাবু তো খোঁজ করে বললেন, কাল রাত্রে বা আজ সকালে থানার লোক ভবতোষের গাড়িটাকে সামনে দিয়ে যেতে দেখেনি।"

বাবু কেমন করে যেন মাথা নাড়ল। বলল, "রাত্রে হয়তো চোখ রেখেছিল—যেমন রোজ রাখে। কিন্তু ভোরের দিকে যদি চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়?"

"চোখে ধুলো দেবার হলে সব সময়ে দেওয়া যায়, বাবুদা। তবে তাতে ঝুঁকি নিতে হবে। তবে সবই সম্ভব। এই যে সিংহীবাবু আমাদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালালেন, আমরা কিছু করতে পারলাম।...আমার মাথা এবার সত্যি-সত্যি খারাপ হয়ে যাবে। কোথাকার জল কোন দিকে গড়িয়ে চলেছে কিছুই বুঝতে পারছি না। সিংহীবাবু যদি কোথাও চলে গিয়ে থাকেন আমরা ভবতোষের কিছু করতে পারব না।"

"কেন? কাকাবাবুর চিঠি তো আছে।"

"তোমার মাথা খারাপ। বাবার চিঠি থেকে কিছু প্রমাণ হয় না?"

"হয় না।"

"না। সিংহীবাবু আর ভবতোষের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল, ষড়যন্ত্র হয়েছিল—বাবা তার কিছুই জানেন না। কে যে সিংহীবাবু বারা তা জানেনেই না। ভবতোষ দোষী কে প্রমাণ করবে?"

বাবু চুপ করে গেল। কথাটা শিশির ঠিকই বলেছে। ভবতোষ দোষী এ প্রমাণ কে করবে? সিংহীবাবুই সেটা করতে পারতেন।

সিংহীবাবুর ওপর বাবুর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। ভদ্রলোক তাদের মাচায় তুলে মই কেড়ে নিয়েছেন। কী দরকার ছিল তাঁর এই তামাশা করার! কোনও মানুষকেই বিশ্বাস করতে নেই। সিংহীবাবুকে বিশ্বাস করে তারা বোধহয় ঠকে গেল! কিন্তু কেন যে ভদ্রলোক এ-রকম করলেন কে জানে!

কোনও কথাবার্তা হল না দুজনের মধ্যে। বাস স্ট্যান্ডের কাছে সামান্য ভিড়। এইমাত্র বাসটা এসেছে। লোকজন নামছিল। স্টেশনে গাড়ি আসার সময় হয়ে এল।

ওভারব্রিজের সিঁড়িতে পা দিয়েই শিশিরের হঠাৎ কী খেয়াল হল, আবার মুখ ফিরিয়ে ভিড়ের দিকে তাকাল।

বাবু কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গিয়েছিল। পাশে শিশিরকে দেখতে না পেয়ে তাকাল। শিশির সিঁড়ির নীচের দিকে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ সে কেমন দ্রুত পায়ে বাসের দিকে চলে গেল।

বাবু কিছু বুঝল না। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

বাস থেকে যারা নেমেছিল তারা ততক্ষণে কুলি ডেকে মালপত্র চাপিয়ে

ওভারব্রিজের দিকে এগিয়ে চলেছে। কেউ-কেউ হাতে সুটকেশ ঝুলিয়ে বুকিংঅফিসের দিকে এগোচ্ছে। শিশির বোকার মতন চার দিকে তাকাচ্ছিল।

"কী রে, তুই নেমে এলি?" বাবু জিজ্ঞেস করল।

শিশির অন্যমনস্ক; তখনও যেন কাকে খুঁজছে।

"কী হল?"

"একজনকে যেন দেখলাম, চেনা-চেনা লাগল," শিশির বলল।

বাবু বুঝল না। "চেনা-চেনা! কাকে দেখলি?"

"সেটাই তো ধরতে পারছি না। প্রথমে খেয়াল করিনি। পরে খেয়াল হল। তাকেই দেখতে এলাম। এসে দেখি বেপাত্তা।"

বাবুর কাছে ব্যাপারটা হেঁয়ালির মতন লাগছিল। "কোথায় বেপাত্তা হল?"

"বুঝতে পারছি না। বাসের আড়াল দিয়ে মালগুদামের দিকে পালাল, না, রেল-লাইনের দিকে কেটে পড়ল, বুঝতে পারলাম না।"

"সিংহীবাবু?"

"না।"

"তবে?"

"কলকাতায় দেখেছি।"

"কোথায়?"

"বুঝতে পারছি না।...না না দাঁড়াও, মনে হচ্ছে এই রকম একটা লোক আমাদের বাড়িতে কাজ করতে ঢুকেছিল। হ্যাঁ...মনে পড়ছে, প্রয়াগ। তুলসীদা বলত, পরাগ। সেই রকম দেখতে। ষণ্ডামার্কা চেহারা।" শিশিরের মনে পড়ে গেল প্রয়াগকে। তার বাড়ি ছিল পরেশনাথে। সে অন্তত বলেছিল। পরেশনাথের কাছেই। সেই প্রয়াগও এখানে এসে জুটেছে নাকি? কিন্তু শিশির কি ঠিক দেখেছে? অন্ধকারে তার মানুষ চিনতে ভুল হয়নি তো?

বাবু বলল, "প্রয়াগ মানে সেই লোকটা, যে তোদের বাড়িতে কিছুদিন কাজ করার পর পালিয়ে গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ, সেই লোক।"

বাবু অকারণে চারপাশে তাকাল। "তোকে দেখতে পেয়েছিল?"

"জানি না। দেখতে না পেলে পালাবে কেন?"

বাবু সামান্য ভাবল। সত্যিই তো, লোকটা যদি শিশিরকে দেখতে না পেয়ে থাকে তা হলে পালাবে কেন? শিশির আরও একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "চলো, লোকটা প্রয়াগের মতন দেখতে মনে হল, তাই দেখতে এগোচ্ছিলাম, এখন আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। ওকে পাব না।"

আবার দুজনে ওভারব্রিজের দিকে পা বাড়াল। সিঁড়ি উঠতে-উঠতে শিশির বলল, "বাবুদা, প্রয়াগ যদি এখান এসে থাকে তবে আজই এল, ওই বাসে।"

"আগেও এসে থাকতে পারে।"

"কিন্তু ওকে কোনওদিন দেখিনি এখানে।"

"গা ঢাকা দিয়ে ছিল হয়তো।"

"হতে পারে। আবার এটাও হতে পারে, ভবতোষ ওকে আনিয়েছে। ও ভবতোষের লোক।" বাবু কোনও জবাব দিল না।

পেছন থেকে বংশীর গলা পাওয়া গেল। তাকাল দুজনে।

"তোমরা এখনও ওভারব্রিজে?" বংশী বলল।

"হ্যাঁ," শিশির বলল। "হঠাৎ একটা কাণ্ড হয়ে গেল।"

"কী কাণ্ড?"

শিশির বলল ঘটনাটা। বংশী শুনল সব। তারপর বলল, "তুমি বলছ লোকটা প্রয়াগ—মানে সেই লোক যে তোমায় লুকিয়ে ওষুধ খাওয়াত?"

"আমার সেই রকম মনে হল।"

বংশী কিছু ভাবল। "ঠিক আছে, তোমরা চায়ের স্টলে গিয়ে বোসো। আমি বাসঅলা আর কন্ডাক্টরদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আসছি—ওই রকম কোনও লোক এই বাসে এসেছে কি না?"

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

খানিকক্ষণ পরে বংশী ফিরে এল। বলল, "তুমি যে রকম বললে সেই রকম লোক কেউ ওই বাসে আসেনি। তবে কন্ডাক্টর বলল, ওইরকম একটা লোককে সে বাস স্ট্যান্ডে দেখেছে।"

"তার মানে?" শিশির বলল।

"মানে লোকটা বাসে না এলেও কাছাকাছি কোথাও ছিল। হয়তো বাসের প্যাসেঞ্জারদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে তোমায় নজর করছিল। বা, তুমি তাকে দেখতে পেয়েছ বুঝতে পেরে সে নিজেই গা ঢাকা দিয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল।"

শিশির ভাবল। বংশী যা বলছে সেই রকম হতে পারে। লোকটা তা হলে প্রয়াগ। প্রয়াগ না হলে এইভাবে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করবে কেন? শিশির বলল, "লোকটাকে তুমি কোথাও দেখতে পেলে না?"

"না," বংশী মাথা নাড়ল। "সে কি আর ধারে কাছে থাকবে! পালিয়ে গিয়েছে।"

"আশ্চর্য!"

"আশ্চর্য কী?"

"না, ভাবছি—প্রয়াগও এসে হাজির হয়েছে! আশ্চর্য নয়?"

বংশী হাসল। "তার মানে ভবতোষ নিজের চেলাদের সকলকেই হাতের কাছে জড়ো করছে। ভালই করছে। নাও, এবার চলো—!"

প্লাটফর্মে বেশ ভিড়। গাড়ি আসার সময় হয়ে গিয়েছিল। আলোয় ঝকঝক করছে প্লাটফর্ম। লোকজন এখনও আসছে।

তিনজনে এগোতে লাগল।

বংশী বলল, "প্লাটফর্ম দিয়ে চলো, ওদিকে নেমে লাইন টপকে বুকিংঅফিসের

দিকে যাব।" বংশী যেমন বলল শিশির আর বাবু সেইভাবে এগিয়ে চলল।

বাবু বলল, "হেমবাবু এসেছেন?"

"হ্যাঁ। তবে তিনি আমাদের সঙ্গে যাবেন না। আমরা আমাদের মতন যাব, উনি যাবেন দুজন প্লেন ড্রেস পরা পুলিশ নিয়ে।"

শিশির বলল, "আমরা কোন রাস্তা দিয়ে যাব?"

"আমরা সোজা রাস্তা দিয়ে যাব। হেমবাবুরা তফাতে থাকবেন।"

শিশির আর কিছু বলল না।

লাইন টপকে বুকিংঅফিসের সামনে আসতেই শিশিররা হেমবাবুকে দেখতে পেল। কার সঙ্গে যেন গল্প করছেন। রেলের লোক। হেমবাবুকে দেখে বোঝার উপায় নেই তিনি পুলিশের লোক। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা চেহারা।

হেমবাবুর চোখ ছিল। তিনি শিশিরদের দেখতে পেয়েছিলেন। চোখের ইশারায় বংশীকে এগিয়ে যেতে বললেন। বংশীরা দাঁড়াল না; এগিয়ে চলল।

সামান্য ভিড় ছাড়িয়ে ফাঁকায় এল শিশিররা। তারপর রাস্তা ধরল।

স্টেশনে গাড়ি চলে এল। দূর থেকেও লোকজনের হইহল্লা শোনা যাচ্ছিল। গাড়িটা বোধ হয় আজ ঠিক সময়েই এসেছে। এক একদিন দেড় দু-ঘণ্টাও দেরি করে।

সন্ধে হয়ে গিয়েছে। অন্ধকার এখনও জমাট হয়নি। বাবু বলল, "বংশী, আমরা কি সরাসরি ভবতোষের বাড়িতে যাব?"

"হ্যাঁ," মাথা নাড়ল বংশী। বলে হঠাৎ হাত বাড়াল, তারপর হালকা গলায় বলল, "একটা সিগারেট খাওয়ান, বাবুদা। আপনিও খান।"

বাবু ব্যাপারটা বুঝল না। সিগারেটের প্যাকেট বার করল। দুজনে দুটো সিগারেট ধরাল। লম্বা করে টান মেরে বংশী বলল, "বাবুদা, আগে আমরা চোরের মতন গিয়েছি। এবার রাজার মতন যাব। নো ভয়, নট কিচ্ছু।"

বাবু বলল, "তা তো দেখতেই পাচ্ছি। এবার ভেঙে বলো ব্যাপার কী?"

"ব্যাপার তেমন কিছু নয়। হেমবাবু বলেছেন, ভদ্রলোক যেমন ভদ্রলোকের বাড়িতে দেখা করতে যায় অবিকল সেইভাবে যেতে। অর্থাৎ আমরা বেড়াতে বেড়াতে যাব, গেটে দরোয়ান থাকলে বলব, ভবতোষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, বাবুকে খবর দাও। বুঝলেন?"

বাবু বলল, "বুঝলাম। কিন্তু ভবতোষ যদি দেখা করতে না চায়?"

"না চাইলে হেমবাবু আছেন।"

শিশির কথাবার্তা শুনছিল দুজনের। বলল, "ভবতোষের কাছে গিয়ে আমরা কী বলব?"

বংশী হেঁয়ালির গলায় বলল, "বলব, আলাপ করতে এসেছি।"

শিশির বিরক্ত হল। "বংশী, তুমি ব্যাপারটা নিয়ে মজা করছ।"

"মজা! মোটেই নয়। হেমবাবু যা বলে দিয়েছেন—আমি তাই বলছি। তোমরা ভাবছ, ভবতোষ আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। ভবতোষ অত বোকামি করবে না। যদি করে হেমবাবু আছেন।"

শিশির চুপ করে থাকল।

বংশী নিজের থেকেই বলল, "আমার মনে হয়, ভবতোষ দেখা করতে আপত্তি করবে না। বরং আদর করেই আসুন-আসুন করবে।"

বাবু বলল, "বেশ, দেখা করতে দিল। তারপর আমরা কী করব?"

"আমরা কী করব সেটা আগে থেকে ভেবে লাভ নেই। মুখোমুখি হই—তখন দেখা যাবে। তবে আমাদের বেশ বুদ্ধি খেলিয়ে কথা বলতে হবে।"

শিশির বলল, "আমাদের আর কত বুদ্ধি।"

"চলো দেখা যাক।"

আর কোনও কথাবার্তা হল না। অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘন হয়ে আসছে, আশপাশের মাঠঘাট একেবারেই ঝাপসা। ট্রেনলাইনের কিছুই চোখে পড়ছে না, শুধু ডিসন্ট্যান্ট সিগন্যালের আলো চোখে পড়ছিল। আকাশ তারায় তারায় ভরা। কুয়াশার মতন একটা ধোঁয়াটে ভাব পশ্চিমের দিকে।

শিশির বার কয়েক পেছন দিকে তাকাল। হেমবাবুরা কতটা পেছনে আছে বোঝা যাচ্ছে না। ওঁরা কি এই রাস্তা ধরেই আসছেন? জানার উপায় নেই। বংশীও জানে না।

ভবতোষের বাড়ির সামনে এসে কিছুই বোঝা গেল না। আজ ফটকের সামনে আলো জ্বলছিল।

বাবু বলল, "শিশির, ভবতোষ এবার সাবধান হয়েছে। সেদিন ফটকের কাছে আলো ছিল না, আজ আলো জ্বলছে।"

বংশী ঠাট্টা করে বলল, "আমাদের জন্যে বাবুদা। ভবতোষ ভদ্রলোক, জানে আমরা আসব। ওয়েলকাম করছে।"

শিশির কোনও কিছুই সহজ মনে নিতে পারছিল না। তার বারবার মনে হচ্ছিল, ভবতোষের সঙ্গে দেখা হবার পর কী হবে? সিংহীবাবুকে কি পাওয়া যাবে? যদি না পাওয়া যায় তা হলে কী হবে? ভবতোষকে ফাঁদে ফেলার আর তো কোনও পথ খোলা নেই।

প্রয়াগের কথাও ভাবছিল শিশির। লোকটা এখানে কবে এল? কখন এল? ভবতোষ থাকে কেন আনিয়েছে? প্রয়াগ কি এই বাড়িতেই আছে? কিছুই বোঝার উপায় নেই।

বাবুরা ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল। বংশী জোরে জোরে কথা বলছিল।

বংশীর গলার জোরের জন্যেই হোক বা অন্য কোনও কারণে বাড়ির দরোয়ান বেরিয়ে এল। দরোয়ানের মতনই চেহারা, রীতিমতন কুস্তিগির যেন।

বংশী বেশ হাসিখুশি গলায় বলল, "বাবু হ্যায় না, ভাই?"

লোকটা তিনজনকে দেখছিল। কোনও উৎসাহ দেখাল না। "জি।"

"তো থোড়া খবর ভেজো। বলো তিন বাবু..."

লোকটা কথার মাঝখানেই হাঁক মেরে কাকে যেন ডাকল। ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল বংশীরা।

সামান্য পরে যে এল, সে বোধহয় বাড়ির কর্মচারী। বংশী তার মুখ চেনে, নাম

জানে না।

"ভবতোষবাবু আছেন?" বংশী বলল হাসি-হাসি মুখ করে।

"আছেন।"

"আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

কী যেন ভাবল লোকটা। "বাবু চিঠি লিখছিলেন, আমি জিজ্ঞেস করে আসছি।" লোকটা চলে গেল।

শিশির ফিসফিস করে বলল, "বাবুর পাহারাদারের অভাব নেই।"

বংশী ফটকের এ-পাশে দাঁড়িয়ে দরোয়ানের সঙ্গে হাসিঠাট্টা জমাবার চেষ্টা করল। পারল না।

খানিকক্ষণ পরে আগের লোকটা ফিরে এল। "আপনারা আসুন।" লোকটা দরোয়ানকে ফটক খুলে দিতে বলল।

ফটক খোলা হয়ে গেলে তিনজনে ভেতরে এল।

শিশিরের হঠাৎ কেমন ভয় হল। মনে হল, সে যেন এমন কোনও জায়গায় এসে পড়েছে যেখানে সব রকম বিপদই হতে পারে। পেছন ফিরে তাকাল শিশির। হেমবাবুরা কোথায়?"

"আসুন," লোকটা ডাকল, "বাবুর চিঠি লেখা হয়ে গিয়েছে।"

বংশী শিশিরকে ডাকল। "চলো।"

শিশির খুব নিচু গলায় বলল, "হেমবাবু?"

"ভাবতে হবে না।"

শিশির প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে যেন কোনওরকম একটা অস্ত্র খুঁজছিল। পকেট ফাঁকা। কিছুই নেই।

॥ ছত্রিশ ॥

কোনও-কোনও ঘরবাড়ি আছে, পা দিলেই বাড়ির মালিককে তারিফ করতে হয়। ভবতোষের বাড়িতে পা দিয়েই মানুষটার শৌখিন মেজাজ ধরা গেল। সত্যিই সুন্দর, যাকে বলে ছিমছাম।

লোকটার পেছন-পেছন শিশিররা যখন বারান্দা দিয়ে ঘরের দিকে এগোচ্ছে কুকুরের ডাক শোনা গেল। ডাকটা ভয়ংকর নয়। তবু শিশিররা দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটার নজরে পড়েছিল। বলল, "আসুন, ভয় নেই।"

মুখের কথায় কি কুকুরকে বিশ্বাস করা যায়! কিন্তু এখন বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। শিশির বংশীর মুখের দিকে তাকাল। বংশী ইশারায় বলল, "চলো।"

ভয়ে-ভয়ে শিশিররা লোকটার সঙ্গে আরও কয়েক পা ডান দিকে এগিয়ে একটা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

ঘরে বাতি জ্বলছে। ভবতোষ ঘরেই আছেন। শিশিররা ভবতোষের দিকে তাকাল। ভবতোষও তিনজনকে দেখছিলেন। তাঁর পায়ের কাছে বিরাট এক অ্যালসেশিয়ান।

বসে আছে, দেখছে শিশিরদের। কিন্তু একেবারে শান্ত। বোঝা যায়, ভবতোষ তাঁর কুকুরটিকে শিখিয়ে-পড়িয়ে রীতিমতন বাধ্য করে তুলেছেন।

বংশীই প্রথমে কথা বলল। কথা বলার আগে ভদ্রভাবে একটা নমস্কারও জানাল ভবতোষকে। "আমার নাম বংশী। আগে একদিন আপনার কাছে এসেছিলাম।"

ভবতোষ কোনও ভণিতা করলেন না। "জানি।"

"এরা আমার বন্ধু। শিশির আর বাবুদা।"

"ও!" ভবতোষ স্বাভাবিকভাবেই বললেন, "বোসো, তোমরা।" বসার জায়গার অভাব নেই। সাজানো-গোছানো ঘর; সোফা সেট, সেন্টার টেবিল, বাহারি বুক-কেস, দেয়ালে ছবি, জানলায় পরদা। আরও কিছু টুকটাক ঘর সাজানো আসবাব রয়েছে।

বংশী আগেই বসল। বসতে বলল শিশিরদের। শিশিররা বসল।

শিশির কিছু বলার আগেই বংশী বলল, "আমরা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি।"

ভবতোষ যেন একটু মাথা নাড়লেন। কেন নাড়লেন কে জানে। শিশির খুব মনোযোগ দিয়ে ভবতোষকে দেখছিল। ভদ্রলোকের চোখে চশমা। কাচ দুটো হালকা রঙিন। চোখ স্পষ্ট করে দেখা যায় না। শিশিরের মনে পড়ল, বংশী বলেছিল—ভবতোষের এক চোখ অন্ধ। পুরো অন্ধ, নাকি আধা অন্ধ কে জানে! মানুষটার চেহারায় কোনও ভয়ংকর ভাব নেই। গোলগাল মানুষ। মুখটাও গোল ধরনের। রং ফরসা। মাথায় সামান্য চুল। বারো আনাই সাদা। পরনে পাজামা, গায়ে ফতুয়া-পাঞ্জাবি। ভবতোষকে দেখলে বেশ অভিজাত মনে হয়।

শিশির বুঝতে পারছিল, এই লোকটার কোথায় যেন এক ব্যক্তিত্বও রয়েছে—যা খানিকটা সম্ভ্রমও আদায় করে।

ভবতোষ বললেন, "আলাপ! বেশ তো...। সকালের দিকে এলেও পারতে তোমরা। রাত্তিরেই এতটা আসা—! কোথায় থাকো তোমরা?" ভবতোষ শিশিরকেই জিজ্ঞেস করলেন।

শিশির কেমন ঘাবড়ে গেল। ঢোঁক গিলে বলল, "আমি এখানে থাকি না, কলকাতায় থাকি। এখানে আমার পিসিমার বাড়ি। পিসিমা-পিসেমশাইয়ের কাছে এসেছি দিনকয়েক হল।"

"ও! আর ওই ছেলেটি...?"

"আমার বন্ধু। কলকাতায় বাড়ি। এক পাড়ার ছেলে। বাবুদা দুর্গাপুরে চাকরি করে। এখানে বেড়াতে এসেছে।"

ভবতোষ হাত বাড়িয়ে চুরুটের খাপ টেনে নিলেন। "একটু চা খাও! কফি খাবে?"

"না না, ও-সব হাঙ্গামার দরকার নেই।"

"হাঙ্গামার কিছু নেই।" ভবতোষ সামান্য গলা তুলে ডাকলেন, "বেণী!" সেই লোকটি আবার ঘরে এল। দেখল শিশির। এর নাম বেণী?

"ভেতরে গিয়ে বলো, চা দিতে। মাকে বলো।"

শিশিরও আপত্তি করতে যাচ্ছিল, তার আগেই বেণী চলে গিয়েছে।

ভবতোষ চুরুট ধরালেন ধীরে-সুস্থে। শিশিররা চুপচাপ। আড়ষ্ট। কেমন ভাবে কথা শুরু করা যাবে ভেবে পাচ্ছিল না। চুরুট ধরানো হয়ে গেলে ভবতোষ বললেন, "বর্ষাও শেষ হয়ে শরৎ পড়ল। সকাল বিকেল অন্যরকম দেখায়। কী বলো, শিশির?"

শিশির মাথা নাড়ল।

"তোমার পিসিমার বাড়ি কোন দিকে?"

"হাসপাতালের কাছে," শিশির বলল। বলে বাড়ির নিশানা বুঝিয়ে দিল।

"ওদিকে আমার তেমন আসা-যাওয়া নেই। পুকুরটা দেখেছি। তোমার পিসেমশাই কী করেন?"

"কিছু না। রিটায়ার করে বাড়ি কিনেছেন।"

"আমারও সেই দশা," ভবতোষ এবার বেশ হালকা গলায় বললেন। "আমি অবশ্য কখনওই চাকরি-বাকরি করিনি। ব্যবসাপত্র করতাম। কলকাতাতেই। নানা রকম ব্যবসা করেছি। দু-একটা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বাকিগুলো ডুবেছে। আজকালকার দিনে ব্যবসাও সহজে হয় না। তা এখন এক রকম রিটায়ার করেছি ব্যবসা থেকে। মানে, আমি নিজে বেশি জড়িয়ে নেই। আমার ছোট শালাই দেখাশোনা করে।"

ভবতোষের কথাবার্তা এত স্বাভাবিক যে শিশির মানুষটাকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাচ্ছিল না। পাকা অভিনেতা নাকি?

বংশী হঠাৎ বলল, "আপনার কী কী ব্যবসা স্যার?"

ভবতোষ বংশীর দিকে তাকালেন। "রঙের কারখানা আছে। হাওড়ায়। আর পানিহাটিতে কাচের কারখানা। এ দুটোই বড়। বাকি ছোটখাটো।"

বাবু বলল, "আপনি কি কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ার?"

"না না; আমি কিছুই নয়। বিদ্যে জিনিসটা আমার নেই।"

ভবতোষ কি ঠাট্টা করলেন? শিশিরের মনে হল, লোকটা সব দিক দিয়েই ধুরন্ধর। কেমন চমৎকার খেলছে।

বংশী বলল, "আপনি এখানে বাড়ি করলেন কেন, স্যার? জায়গাটা তো কলকাতা থেকে বেশ দূরেই।"

"দূরে আর কোথায়? মেল ট্রেনে ঘণ্টা ছয়-সাত। তা ছাড়া একবার এখানে বেড়াতে এসে জায়গাটা ভাল লেগে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ এক দিন আমার চোখে পড়ল—কাগজে—এক ভদ্রলোক প্রপার্টি বেচে দিতে চাইছেন এখানকার। খোঁজ খবর করে দেখলাম ভদ্রলোক আমার মুখচেনা। তারপর ওই আর কী, কিনে ফেললাম।"

"আগের বাড়ি এত সুন্দর ছিল না," বংশী বলল।

"তা ঠিক। সেটা অনেকটা বাংলো টাইপের বাড়ি ছিল। তবে জায়গা—গাছপালা ছিল ভালই। আমি সবই অদলবদল করে নিয়েছি।"

"আপনি একেবারে ফোর্ট বানিয়ে ফেলেছেন?" বংশী বলল।

"ফোর্ট?...ও, হ্যাঁ—তা খানিকটা," ভবতোষ হাসলেন।

কুকুরটা আচমকা দাঁড়িয়ে উঠল। বিরাট চেহারা। দেখলেই বুক হিম হয়ে যায়।

এতক্ষণ বোবা থাকার দরুন কুকুরটার যেন বিরক্তি ধরে গিয়েছিল, ক্লান্তিও। গলা তুলে ডাক দিতে যাচ্ছিল কুকুরটা, ভবতোষ হাত বাড়িয়ে তার ঘাড়ের কাছটা ধরলেন। "জিম, চেঁচাবে না। যাও, বাইরে যাও। গো...।"

সেই বাঘের মতন কুকুরটা শিশিরদের দিকে দেখল, তারপর ধীরে-ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ভবতোষ বললেন,"জিমের বয়েস চার বছর।"

বংশী বলল, "আপনি চার দিকে বেঁধে রেখেছেন।"

"বেঁধে রেখেছি! মানে?"

"এই বাড়ি, বড় বড় পাঁচিল চারপাশে, তারকাঁটা, ফটকের কাছে মাস্তুলমার্কা আলো, কুকুর, লোকজন..."

ভবতোষ বংশীকে দেখছিলেন। শিশিরের মনে হল, বংশী এতক্ষণ যেন ধাত বুঝছিল ভবতোষের, এবার সে লড়াইয়ে নামছে।

"তুমি সিকিউরিটির কথা বলছ?" ভবতোষ বললেন, "হ্যাঁ, আমি খানিকটা সাবধানী। এ সব জায়গায় সাবধানে থাকা ভাল। তা ছাড়া আমার এদিকে লোকজনের বাস নেই।"

এমন সময়ে বাড়ির ভেতর থেকে চা খাবার এল।

শিশিরদের কাছে চা আর মিষ্টির প্লেট নামিয়ে রাখল বুড়োমতন একজন কাজের লোক। তারপর চায়ের শেষ কাপটা ভবতোষের সামনে রেখে সে চলে গেল।

"নাও, চা খাও," ভবতোষ বললেন।

শিশির বাবুর দিকে তাকাল। বংশী সঙ্গে তার চোখের ইশারায় কোনও কথা হল যেন।

"চায়ের কোনও দরকার ছিল না," শিশির বলল।

ভবতোষ আতিথ্য করার গলায় বললেন, "খাও; আমার স্ত্রী পাঠিয়েছেন। মিষ্টি করার হাত ওঁর ভাল। শখও খুব। খাও।"

শিশিরের ভরসা হচ্ছিল না। ভবতোষ সোজা মানুষ নয়। চা বা মিষ্টির সঙ্গে যদি কোনও বিষ মিশিয়ে দিয়ে থাকে? বংশী তার চায়ের কাপটা তুলে নিল। আড়চোখে একবার দেখল শিশিরকে। তারপর আচমকা ভবতোষকে বলল, "শিশির বাইরের জিনিস খায় না।"

"খায় না? কেন?"

"না, মানে, ওর একটা ভয় আছে।"

"ভয়? কীসের ভয়?"

বংশী সরল গলা করে বলল, "ওকে একজন বিষ খাওয়াত।"

ভবতোষ যত না অবাক হলেন তার চেয়েও যেন মজা পেলেন বেশি। বললেন, "বিষ খাওয়াত! সে কী! কী বিষ?"

বংশী ভবতোষের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত; তারপর বলল, "আপনি জানেন না?"

ভবতোষ আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, "আমি? মানে—? কী বলছ তুমি?"

"বলছিলাম যে, আপনি জানেন—কোন বিষ ওকে খাওয়ানো হত!"

ভবতোষ দু মুহূর্ত চুপ। তারপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন,"তুমি ছোকরা নেশা-টেশা করো নাকি? কী বাজে কথা বলছ! ননসেন্স।"

শিশির বলল, "না, ও নেশা করে না। বংশী যা বলছে, ঠিক। আমায় বিষ খাওয়ানো হত। আপনি জানেন, কে আমায় বিষ খাওয়াত।"

ভবতোষ যেন ধৈর্য হারিয়ে বললেন, "তোমরা পাগল নাকি? আমার বাড়িতে এসে আমায় চড়া-চড়া কথা শোনাচ্ছ? যাও, তোমরা চলে যাও। যত্ত সব বাজে বকাটে ছোকরা কোথাকার! যাও, চলে যাও।"

বংশী বলল, "যাবার কথা পরে হবে। আগে বলুন সিংহীবাবু কোথায়?"

"সিংহীবাবু? কোন সিংহীবাবু?"

"আপনার শাগরেদ। তিনি কোথায়? এ বাড়িতে?"

॥ সাঁইত্রিশ ॥

ভবতোষ সামান্যে বিচলিত হবার মানুষ না। অন্তত বিরক্তি ছাড়া তাঁর ব্যবহারে এতক্ষণ অন্য কিছু প্রকাশও পাচ্ছিল না। কিন্তু সরাসরি বংশীদের আক্রমণের পর তাঁর যেন কেমন এক কাঠিন্য এল। সামান্য সময় চুপচাপ তিনজনকে দেখলেন। বোধহয় মনে-মনে নিজেকে তৈরি করে নিলেন।

"এ বাড়িতে কোনও সিংহী নেই?" গলার স্বর গম্ভীর, কঠিন।

শিশির বলল, "তা হলে তিনি গেলেন কোথায়?"

ভবতোষ কথাটা যেন শুনতেই পেলেন না। বললেন, "তোমরা তিন ছোকরা মিলে এখানে হইচই করতে এসেছ? চালাকি! তোমরা এই মুহূর্তে চলে যাও, নয়তো লোক ডেকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেব।"

বংশী একবার শিশিরদের দিকে তাকাল। ভবতোষের সামনে তারা নিশ্চয় শিশু। লোকটার মুখের কথাকে অবজ্ঞা করা যায় না। ওঁর হাতে লোকের অভাব নেই, ষণ্ডা-গুণ্ডাও দু-চারজন নিশ্চয় হাতে আছে। লোকেরই বা দরকার কোথায়, কুকুর লেলিয়ে দিলেই তো যথেষ্ট। মনে-মনে বংশী হেমবাবুর কথা ভাবল। তিনি যদি এখন না এসে পড়েন ভবতোষকে দমানো যাবে না। কিন্তু হেমবাবু কোথায়?

বংশী ঘাবড়ে যাচ্ছিল। অথচ এটাও বুঝতে পারছিল, এতটা এগিয়ে এসে এখন আর পিছিয়ে যাওয়া চলে না।

বংশী বলল, "সিংহীবাবুকে আপনি চেনেন না?"

"না। আমি বাঘ-সিংহী চিনি না। ননসেন্স।"

শিশির বলল, "আপনি সিংহীবাবুকে চেনেন। ভাল করেই চেনেন।"

বংশী বলল, "আমি সেদিন যখন আপনার বাড়িতে আসি, সিংহীবাবুকে দেখেছি।"

ভবতোষ ধমক দেবার গলায় বললেন, "তুমি কাকে দেখেছ আমার জানার দরকার

নেই। আমার বাড়িতে যে কোনও লোক আসতে পারে। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। তোমরা তিন মূর্তি দেখা করতে আসোনি?"

"আমরা যেমন এসেছি, সিংহীবাবু সেইভাবে এসেছিলেন কি না জানি না। কিন্তু আপনি বলছেন, সিংহীবাবুকে আপনি চেনেন না।"

"না—কে সিংহী আমি জানি না। লোকজন মাঝে মাঝে আসে—তার মধ্যে কেউ যদি সিংহী হয়, হতেই পারে।"

শিশির ভবতোষের মিথ্যে কথা বলার বহর দেখে রেগে আগুন হয়ে যাচ্ছিল। বলল, "আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। সিংহীবাবুকে আপনি চেনেন। অনেক দিন থেকেই। বেনারসে তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়।"

ভবতোষ এমন একটা ভাব করলেন যেন কত মজার কথা শুনে ফেলেছেন হঠাৎ। তাঁর হাসি পেয়ে যাচ্ছিল কথাটা শুনে। "তাই বলো, তোমরা সিংহীবাবু-সিংহীবাবু করছ কাকে! ওকে আমি পাগলা কাশী বলেই জানি। ওই তোমাদের রেলফটকের দিকে থাকত, তাই না?"

ভবতোষের ভাবভঙ্গি, হঠাৎ কথার মোড় ফেরানো দেখে শিশিররা কেমন থতমত খেয়ে গিয়েছিল।

ভবতোষ নিজেই বললেন, "পাগলা কাশী তোমাদের কাছে সিংহীবাবু হয়েছে কেমন করে বুঝব। তবে হ্যাঁ—ও সিংহী। আমারও বুঝতে একটু ভুল হয়েছিল। তা কী হয়েছে পাগলা কাশির?"

শিশির আর বংশী দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল। বাবু স্বভাবে শান্ত-শিষ্ট। হঠাৎ সে খেপে গেল। বলল, "আপনি একেবারে আকাশ থেকে পড়ার ভাব করছেন! কিছুই জানেন না! চালাকি করছেন?"

ভবতোষ চটলেন না। গম্ভীর ভাবেই বললেন, "চালাকি তোমরাই করছ। আমার বাড়িতে এসে আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলছ তোমরা। বড় সাহস তো তোমাদের।" বলে তিনি হাঁক দিয়ে কাউকে ডাকতে যাচ্ছিলেন। কী মনে করে ডাকলেন না, শিশিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "লোকের বাড়িতে এসে উৎপাত করলে ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয় তা জানো তো! আমি অনেক সয়েছি। এবার হয় তোমরা চলে যাও, নয়তো আমি দরোয়ান ডাকব।"

শিশির বংশীর দিকে তাকাল।

বংশী বলল; "ডাকুন। কিন্তু তার আগে বলুন, সিংহীবাবু কোথায়?"

"আঃ! কী বিরক্ত করছ! তোমাদের সিংহীবাবু কোথায় সে খোঁজ কি আমি রাখব! আশ্চর্য।"

শিশির বলল, "সিংহীবাবু তাঁর বাড়িতে নেই। হঠাৎ উধাও।"

"তার আমি কী করব! একজন পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের মদ্দ যদি কোথাও চলে যায় তার খোঁজ আমায় রাখতে হবে! পাগলের মতন কথা বলছ তোমরা।"

"তিনি কোথাও যাননি। ট্রেনে করে কোথাও চলে যাননি। আমরা খোঁজ নিয়েছি।"

"তা হলে বাসে করে গিয়েছে," ভবতোষ ঠাট্টা করে বললেন।

"না, বাসেও নয়," শিশির বলল। বলার পর মনে পড়ল, বাসে করে সিংহীবাবু কোথাও গিয়েছেন কি না সে-খোঁজটা অবশ্য নেওয়া হয়নি। অন্তত পাকাপাকি ভাবে।

ভবতোষ বললেন, "তা হলে আর কোথায় যাবে! বাতাসে উবে গিয়েছে।" বলে এবার ঠাট্টা গলায় হেসে উঠলেন। "হাত-পাঅলা একটা মানুষ আর কোথায় যেতে পারে! আমি তো তাকে খেয়ে ফেলতে পারি না।"

শিশির বুঝতে পারছিল, ভবতোষকে কোণঠাসা করার ক্ষমতা তাদের নেই। লোকটা শুধু চতুর নয়, বুদ্ধিমান। শিশিরদের মতন ছেলে-ছোকরাদের অনায়াসে নাজেহাল করে দিতে পারেন।

কোথায় যেন শিশিরদের একটা বোকামি হয়ে গেল। আরও একটু ঠাণ্ডা মাথায়—লোকটাকে কথার ফাঁদে ফেলে এগোনো উচিত ছিল।

শিশির বলল, "আপনি সত্যিই তা হলে সিংহীবাবুর খবর জানেন না?"

"না।"

"আমরা ভেবেছিলাম জানেন। সিংহীবাবু আমাদের বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে তাঁর...মানে আপনি তাঁকে নজরে রেখেছেন। আপনার লোকজন সিংহীবাবুর চলাফেরা নজর করছে। তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টাও করেছে।"

ভবতোষ চুপ। যেন চশমার আড়াল থেকে লক্ষ করছিলেন শিশিরদের। সামান্য পরে বললেন, "আমার লোকজন তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছিল! আজব কথা! কেন, তাকে মারবে কেন?"

"আপনার হুকুমে।"

"আমার হুকুমে! আমি! কী পাগলের মতন কথা বলছ তুমি! আমি একটা লোককে মেরে ফেলার চেষ্টা করব। কেন? কারণটা কী? একটা লোককে মেরে ফেললেই হল! সে কি আমার শত্রু?"

শিশির মাথা নাড়ল। "হ্যাঁ, সিংহীবাবু আপনার শত্রু!"

"আমার শত্রু! পাগলা কাশী আমার শত্রু!"

"উনি বলেছেন।"

"ও। তোমাদের সঙ্গে পাগলা কাশীর যেন খুব দহরম-মহরম ছিল।" ভবতোষ হাতের চুরুট নামিয়ে রাখলেন। "পাগলা কাশী তোমাদের কাছে আর কী কী কথা বলেছে আমার নামে?"

শিশির আর বংশী ইশারায় যেন কিছু কথা বলার চেষ্টা করল। তারপর ভবতোষের দিকে তাকাল শিশির। বলল, "বলেছেন অনেক। বেনারসে আপনার সঙ্গে তাঁর আলাপের পর থেকে সব ঘটনাই। সেসব আপনি জানেন। এটাও আপনি জানেন, আমাকে এক রকম বিষ খাওয়ানো হচ্ছিল আপনার কথা মতন।"

ভবতোষ মাথা নাড়লেন।

শিশির অবাক হল। "আপনি জানেন না?"

"না।"

মাথায় যেন আগুন ধরে গেল শিশিরের। ইচ্ছে হচ্ছিল, লাফ মেরে এগিয়ে গিয়ে

ভবতোষের গলার টুঁটি চেপে ধরে। কত বড় শয়তান লোকটা।

"আপনি আমাকে বিষ খাওয়াবার পরামর্শ দেননি?"

"না।'

"সিংহীবাবু বলেছেন।"

"সে সত্যি কথা বলেছে তার প্রমাণ কী?"

শিশিরের হাত-পা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

বংশী আর থাকতে পারল না, আচমকা চেঁচিয়ে বলল, "আপনি আমাদের সঙ্গে চালাকি করার চেষ্টা করছেন। এ সব চালাকি চলবে না। আমরা থানা থেকে পুলিশ নিয়ে আপনার বাড়িতে এসেছি। এই বাড়ি আমরা সার্চ করব।"

ভবতোষ কয়েক মুহূর্ত কোনও কথা বললেন না। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, "তোমরা পুলিশ এনেছ বলে আমায় ভয় পেতে হবে?"

শিশির ভবতোষের ঠাণ্ডা কথাবার্তা শুনে নিজেই কেমন ভয় পেয়ে যাচ্ছিল। দিশেহারার মতন বলল, "প্রমাণ আছে। পরে প্রমাণের কথা হবে। আপনি আমাকে চেনেন না?"

"না। হয়তো দেখেছি।"

"আমি অমৃতবাবুর ছেলে।"

"শুনেছি।"

"আমার বাবাকে আপনি চেনেন?"

" চিনি।"

"তাঁর ওপর আপনার অনেক আক্রোশ রয়েছে।"

"হ্যাঁ, রয়েছে। কিন্তু তোমার ওপর আমার আক্রোশ কেন থাকবে? এটা কি সেই কথামালার বাঘের গল্প। তুই জল খাসনি—তোর বাবা খেয়েছে।" ভবতোষ হাত বাড়িয়ে চুরুটটা তুলে নিলেন। "তুমি বোধ হয় সম্পর্কে আমার ভাইপো হও। ছেলের মতন। তোমায় আমি বিষ খাওয়াবার পরামর্শ দেব—এই গল্পটা কে তোমায় বলেছে জানি না। পাগলা কাশী যদি বলে থাকে মিথ্যে কথা বলেছে, কোনও মতলব নিয়ে বলেছে।"

হঠাৎ পায়ের শব্দ পাওয়া গেল ঘরে। হেমবাবু হাসি হাসি মুখ করে ঘরে ঢুকলেন।

॥ আটত্রিশ ॥

হেম বাবুকে দেখে ভবতোষ চমকালেন না; অবাক হবার ভাব করলেন, যেন বলতে চাইলেন, আপনি আবার কে?

শিশিররা এবার নিশ্চিন্ত হল। এতক্ষণ তাদের ভয়-ভয় করেছে। ভবতোষের লোকবল এবং বাহুবল দুইই বেশি। তার ওপর বাঘের মতন কুকুরটা। ওর জোড়াটা কোথায় কে জানে! অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি! ঘুমোচ্ছে! ভবতোষও কম ধূর্ত নয়। শিশিররা ভবতোষের সঙ্গে কথাবার্তায়, ধূর্ততায় এঁটে উঠতে পারছিল না। হেমবাবু

এসে পড়ায় তারা সাহস পেল।

ভবতোষ হেমবাবুর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। জানতে চাইছিলেন, আপনি কে?

হেমবাবু হাসি হাসি মুখ করেই ভবতোষকে নমস্কার জানালেন; তারপর পরিচয় দিলেন নিজের।

ভবতোষের মুখের ভাব এবার সামান্য বদলাল। তিনিও নমস্কার জানালেন। তারপর বললেন, "বোধ হয় আপনাকে দেখেছি। রাস্তাঘাটে। আমি অবশ্য বাড়ি থেকে বড় একটা বেরোই না। বসুন।"

হেমবাবু বসলেন। বললেন, "আপনাকেও আমি মাঝেসাজে গাড়ি করে কোথাও যেতে আসতে দেখেছি। আমি আপনাকে চিনি।"

"আমায় চেনেন?"

"মানে, নামে চিনি। এত বড় ঘরবাড়ির মালিককে কে না চেনে সান্যালসাহেব!" বলে হেমবাবু পরিহাসের হাসি হাসলেন। "পুলিশদের আবার মানী গুণী ধনী— এঁদের একটু চিনে রাখতে হয়।"

ভবতোষ বললেন, "আমি প্রথম দুটোর কোনওটাই নই। আর ঠিক ধনীও নই। যাকগে, আপনি কি এই তিন ছোকরার কথায় এখানে এসেছেন?" ভবতোষের কথাবার্তা স্পষ্ট। পুলিশের লোক দেখে ঘাবড়ে যাবার বা ভয় পাবার কোনও লক্ষণ নেই।

ঠিক এই সময় বাইরে কোথাও কুকুর ডেকে উঠল। ভবতোষের কুকুর। প্রথমে একটা ডেকেছিল, তারপর দুটো। ডাক শুনে মনে হল, কাছাকাছি নেই কুকুর দুটো। হেমবাবু ভবতোষকে দেখছিলেন। বললেন, "এদের কথায় ঠিক আসিনি। একটা অপ্রিয় কাজেও এসেছি।"

"কী কাজ?"

"কাজটা মামুলি। বলতে লজ্জাই হচ্ছে, সান্যালসাহেব," হেমবাবু বিনীতভাবে হাসলেন। "পুলিশের ভাষায় বলে সার্চ। আমি তা বলতে চাইছি না। এই—একবার আপনার বাড়িটা ঘুরে-ফিরে একটু দেখব।"

ভবতোষ বিরক্ত হলেন। "হঠাৎ আমার বাড়ি দেখার কারণ?"

"আপনার আপত্তি রয়েছে?"

"হ্যাঁ। এই রাত্তিরবেলায় আমি বাইরের লোককে বাড়িঘর দেখতে দেব না।"

"ও!...দিনেরবেলায় হলে দেবেন?"

"দিনের বেলার কথা আলাদা। ভেবে দেখব।" ভবতোষ ছাইদান থেকে চুরুটটা উঠিয়ে নিলেন, বললেন, "আমার স্ত্রী অসুস্থ। বাড়িতে হামলা করবেন না দয়া করে।"

হেমবাবু উঠলেন না। বরং আরও আরাম করে বসে একটা সিগারেট ধরালেন। বংশী কী বলতে যাচ্ছিল, হেমবাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে ভবতোষকে বললেন, "আপনি আমার সঙ্গে পুলিশ-পুলিশ ব্যবহার করবেন না, সান্যালসাহেব। আইন-কানুনের কথা দয়া করে তুলবেন না। আজ একটি বার যদি বাড়িটা দেখে যেতে পারতাম ভাল হত।

কাল সকালে এলে হয়তো তাকে পাব না।"

ভবতোষ অবাক হলেন যেন। "কী বলছেন! আপনার কথার মানে বুঝলাম না। কাকে পাবেন না?"

বংশী হঠাৎ বলল, "সিংহীবাবুকে।"

ভবতোষ একবার বংশীকে দেখলেন, তারপর হেমবাবুর দিকে তাকালেন। "আপনি ওই পাগলা কাশীর খোঁজে আমার বাড়ি এসেছেন?"

"পাগলা কাশী?"

"সিংহী। ওরা বলে সিংহী!"

হেমবাবু হেসে ফেললেন। যেন মজাই পেয়েছেন। সিগারেটে মস্ত করে টান দিলেন, বললেন, "পাগলা কাশী, বা, নামটা বেশ বার করেছেন, শুনলে পাগলা দাশুর ভাই মনে হয়...কিন্তু সান্যালসাহেব, আমি সিংহী-টিংহীর খোঁজে আসিনি; আমি এসেছি অন্য একজনকে খুঁজতে।"

ভবতোষ কিছুই বুঝতে পারলেন না; শিশিররাও অবাক হয়ে হেমবাবুর দিকে তাকাল। ভবতোষ বললেন, "আপনার কথা বুঝতে পারছি না।"

"আপনার বাড়িতে একজন নতুন লোক ঢুকেছে। দিন সাতেক হল। ঢুকেছে না?"

"নতুন লোক!...কই, না?"

"আপনি কি আপনার বাড়িতে যারা কাজকর্ম করে—সবাইকে চেনেন?"

" চিনি।"

"নতুন কেউ আসেনি?"

"না।"

"ঠিক বলছেন?"

ভবতোষ কেমন অন্যমনস্ক হলেন। হেমবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন ক-মুহূর্ত, হঠাৎ যেন তাঁর কী মনে পড়ে গেল, বললেন, "ওহো, বুঝেছি, আপনি বোধহয় ধনিয়ার কথা বলছেন। ও আমার কলকাতার বাড়িতে ছিল। দিন কয়েক হল এখানে এসেছে।...কেমন দেখতে বলুন তো?"

"রং কালো। মাথায় লম্বা। ষণ্ডাগুণ্ডা মার্কা চেহারা।"

"ধনিয়া," ভবতোষ বললেন।

শিশির চিৎকার করে বলল, "প্রয়াগ।"

হেমবাবু শিশিরের দিকে তাকালেন। "প্রয়াগ?"

"কলকাতায় আমাদের বাড়িতে কাজ করেছিল কিছুদিন। ও আমাকে বিষ খাওয়াত। প্রয়াগ আমাদের বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল। ওকে অনেক খোঁজ করে পাইনি। আজ আমি তাকে বাস স্ট্যান্ডে দেখেছি।"

শিশির ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তার হাত-পা কাঁপছিল। চোখ জ্বলছে। হেমবাবু শিশিরের কথায় তেমন কান দিলেন না। ভবতোষের দিকে তাকালেন। "ধনিয়াকে একবার ডাকুন।"

ভবতোষ যেন ভাবলেন কিছু। "ডাকছি। কিন্তু তার দোষ?"

"দোষ! তাকে থানায় নিয়ে যাব।"

"থানায়? কেন?"

"এখানে যে ডাকাতিটা হয়ে গিয়েছে, শুনেছেন নিশ্চয়, সেই দলের মধ্যে ও ছিল। না না, আমি জোর করে বলছি না; তবে সন্দেহ করছি।"

ভবতোষ বিরক্ত হলেন। "আপনি কীসের সঙ্গে কাকে জড়াতে চাইছেন! ডাকাতির কথা আমি জানি। সে তো প্রায় মাসখানেক আগের ঘটনা। ধনিয়া মাত্র ক'দিন আগে এখানে এসেছে।"

হেমবাবু সিগারেটের টুকরোটা মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে নিবিয়ে দিলেন। মনে হল, ওটা ইচ্ছাকৃত।

"সান্যালসাহেব, আপনি যত জোর করে কথাটা বলছেন ততটা জোর না করলেই পারতেন। না না, আপনাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। হতে পারে আপনার ধনিয়া দিন কয়েক আগে আপনার বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু সে যে আগেই কলকাতা থেকে আসেনি, আপনাকে কে বলল?"

ভবতোষ মাথা নাড়লেন। "আমি বলছি। ধনিয়া যদি কলকাতা থেকে আগে চলে আসত এখানেই এসে উঠত। সে আমার পুরনো লোক।"

শিশির, বংশী আর বাবু বোকার মতন পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিল। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। প্রয়াগের কথা কেমন করে জানলেন হেমবাবু? লোকটা কি সত্যিই ডাকাত দলের মধ্যে ছিল। ভবতোষ কি ডাকাত দলের পাণ্ডা!

হেমবাবু এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। "আপনি ধনিয়াকে ডাকুন।"

"কী মুশকিল! আমি আপনাকে বলছি...."

"আপনার বলা না-বলায় আমার কিছু যায়-আসে না। আমাদের লোক ওকে নজর করেছে। আমি সন্দেহ করছি।"

ভবতোষ যেন বুঝতে পারলেন হেমবাবুকে দমানো যাবে না। সামান্য অপেক্ষা করে তিনি উঠলেন।

"আপনি নিজেই উঠলেন?" হেমবাবু বললেন, "কাউকে ডাকলেই তো পারতেন।"

"না, আমিই যাব। দেখি।" ভবতোষ এগিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ হেমবাবু তাঁর পিঠের কাছে ঘেঁষে এলেন। "চলুন, আমিও যাই।"

থমকে দাঁড়ালেন ভবতোষ। "আপনি বসুন। আমি ডেকে আনছি।"

"দরকার কী! চলুন, একসঙ্গে যাই।"

"ও! আপনি আমায় অবিশ্বাস করছেন?"

হেমবাবু হাসলেন! "পুলিশে চাকরি করার দোষ।"

"বেশ, চলুন।" ভবতোষের সঙ্গে হেমবাবু ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

শিশির বংশীর দিকে তাকাল। বংশীও বোকা হয়ে তাকিয়েছিল। তিনজনেই চুপচাপ। মুখে কথা আসছিল না কারও। শেষে বাবু নিচু গলায় বলল, "শিশির, তুই

ঠিক দেখেছিস। লোকটা প্রয়াগ।"

শিশির বলল, "কিন্তু সে এখানে কতদিন এসেছে? তাকে তো কোনও দিন দেখিনি আগে। আশ্চর্য! ও আবার ডাকাতদলের সঙ্গেও ছিল!"

বংশী বলল, "কিন্তু সিংহীবাবু? তিনি কোথায়?"

॥ উনচল্লিশ ॥

সময় কাটতে চাইছিল না। ভবতোষ আর হেমবাবু ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর অনেকক্ষণ কেটে গেল। শিশিররা কৌতূহল আর উদ্বেগ নিয়ে চুপচাপই বসেছিল। দু-একটা কথাবার্তা যা বলছিল—তাও ফিসফিস করে। যত সময় যাচ্ছিল ততই ডাক বাড়ছিল কুকুরের। তবে, ডাক শুনে মনে হচ্ছিল, কাছাকাছি ওরা নেই।

ভবতোষের বাড়িতে লোকজনের অভাব নেই। অথচ, কারও গলা শোনা যাচ্ছে না। এক-আধ বার যদিও বা কোনও সাড়া পাওয়া যায়—তা এত অস্পষ্ট আর মৃদু যে কিছুই অনুমান করা চলে না। শিশির ভেতরে-ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছিল। বংশী আগাগোড়া দরজার দিকে তাকিয়ে। চোখে-মুখে উত্তেজনা। বাবু বেশির ভাগ সময় ভবতোষের ফাঁকা চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে কিছু যেন ভেবে যাচ্ছিল। কী ভাবছিল কে জানে।

আরও খানিকটা সময় কেটে গেল। আচমকা কী হল কে জানে, ডাক বন্ধ হয়ে গেল।

সামান্য পরে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

দরজার দিকে তাকাল শিশিররা।

হেমবাবু, ভবতোষ আর সেই প্রয়াগ।

শিশির দাঁড়িয়ে পড়ল উত্তেজনায়। সেই প্রয়াগ। চিনতে ভুল হল না। কলকাতার বাড়ির সেই প্রয়াগ, আজ রেলস্টেশনের বাইরে বাস স্ট্যান্ডে দেখা সেই একই মানুষ।

"প্রয়াগ!" শিশির চেঁচিয়ে উঠল।

প্রয়াগ একবার শিশিরের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

হেমবাবুকে দেখে মনে হল, তিনি বিন্দুমাত্র উত্তেজিত নন। স্বাভাবিকভাবেই ভবতোষকে বললেন, "আপনি বসুন মিস্টার সান্যাল।"

ভবতোষ কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। বসলেন নিজের চেয়ারে।

হেমবাবু একবার ভবতোষ আর একবার প্রয়াগের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রয়াগকে বললেন, " তুমি এই বাবুর বাড়িতে কত দিন কাজ করছ?"

"থোড়া বহুত দেড় সাল।"

" তুমি বাংলা জানো না?"

"জানি সাব," প্রয়াগ বলল, "বাঙালি মুলুকে, বাবুদের বাড়ি কাম করেছি।"

"বেশ, তবে বাংলায় কথা বলো, না পারলে হিন্দিতে বলো।"

"জি।"

"তোমার আসল নাম কী?"

"মাহেশ্বর প্রসাদ।"

"মাহেশ্বর!...তোমার ঘর কোথায়? দেশ?"

"জি হামার দেশ-গাঁও রামনগরের লাগিচ। বানারস।"

"বেনারস?"

শিশির চেঁচিয়ে উঠল, "মিথ্যে কথা। ও আমাদের কলকাতার বাড়িতে যখন কাজ করত তখন বলেছিল, ওর বাড়ি এদিকেই, পরেশনাথে।"

প্রয়াগ একবার তাকাল শিশিরের দিকে। কিছু বলল না।

হেমবাবুও শিশিরের কথায় কান করলেন না। প্রয়াগকেই বললেন, "তুমি এখানে কত দিন এসেছ?"

"আট-দশ রোজ।"

"ঠিক করে বলো? আট না দশ?"

প্রয়াগ হিসেব করে বলল, "ঠিক ঠিক ন'রোজ।"

হেমবাবু একবার ভবতোষের দিকে তাকালেন। ভবতোষ কোনও কথা বললেন না। কিছুই নয় তবু হেমবাবু পকেটে হাত দিলেন। এমনভাবে দিলেন যাতে সকলের সেটা নজরে আসে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, এবার চেয়ারে বসলেন। বংশীকেই বললেন, "বংশী, এই মাহেশ্বর প্রসাদকে তুমি আগে কখনও এখানে দেখেছ?"

মাথা নাড়ল বংশী। "না।"

"ভাল করে ভেবে বলছ?"

"হ্যাঁ। আমার চোখে পড়েনি।"

হেমবাবু এবার শিশিরের দিকে তাকালেন। "এই মাহেশ্বরই যে আপনাদের কলকাতার বাড়িতে প্রয়াগ নামে কাজ করেছিল, সেটা ঠিক?"

"হ্যাঁ। এই সেই প্রয়াগ।"

হেমবাবু প্রয়াগের দিকে তাকালেন। "তুমি কলকাতায় এই বাবুর বাড়িতে কাজ করেছিলে?"

"জি!"

"বাবুকে তুমি চিনতে পারছ?"

"জি!" প্রয়াগ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

ভবতোষ হঠাৎ বললেন, "আপনি কাজের কথা ছেড়ে অকাজের কথা বলছেন। আপনি আমাকে বলছিলেন, ডাকাতির কেসে আপনি ওকে সন্দেহ করছেন!"

হেমবাবু বললেন, "ব্যস্ত হবেন না সান্যালসাহেব! একসঙ্গে একশোটা কথা তো জিজ্ঞেস করা যায় না। তাতে গোলমাল হয়। এক-এক করে জিজ্ঞেস করতে দিন। ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারটাও অঙ্কের মতন। তার একটা প্রসেস আছে।" বলে হেমবাবু ভবতোষকে ভদ্রভাবে ধমকে সহজভাবে একটা সিগারেট ধরালেন।

প্রয়াগকে ভালভাবে নজর করতে করতে হেমবাবু পরিহাসের গলায় বললেন,

"বাবা মাহেশ্বর, কিছুদিন আগে, এক মাহিনা হবে—এখানে একটা ভারী ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। ডাকুদের কাছে বন্দুক ছিল। তুমি ডাকাতির কথা শুনেছ?"

"জি।"

"কার কাছে শুনেছ?"

"ইধার শুনেছি? এহি মোকামে।"

""তুমি আর কিছু শুনেছ? কোন ডাকুরা এসেছিল?"

"জি না!"

"তুমি সেই দলে ছিলে?"

"না—" মাথা নাড়ল প্রয়াগ। "কভি নেহি সাব।"

"তুমি ছিলে না?"

"হামি কলকাত্তায় ছিলাম।"

"কোথায় ছিলে কলকাতায়?"

"এহি বাবুর বাড়িতে।"

"কোথায়?"

"আমার পানিহাটির বাড়িতে," ভবতোষ বললেন।

"আপনাকে জিজ্ঞেস করছি না। ওকে বলতে দিন।...কলকাতায় কোথায় ছিলে তুমি মহেশ্বর?"

"বাবুর পানিহাটির মোকামে।"

হেমবাবু একমুখ ধোঁয়া গিলে নিয়ে দু-চার মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর বললেন, "আচ্ছা মাহেশ্বর, এমন যদি কেউ এখানে থাকে যে তোমায় ডাকাতির সময় দেখেছে, তবে?"

প্রয়াগ সঙ্গে-সঙ্গে ভীষণ মাথা নাড়ল। "না সাব, ঝুটা বাত। কোহি হামায় দেখা নেহি। ইধার হাম নেহি থা সাব।"

হেমবাবু মাথা নাড়লেন। "না, তুমি ছিলে না। আমি দেখছিলাম তুমি কী বলো।....একটা কথা বলো তো মাহেশ্বর। কলকাতা থেকে কে তোমায় আসতে বলেছিল?

প্রয়াগ চুপ। কোনও জবাব দিল না। অপেক্ষা করে হেমবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ভবতোষ বললেন, "দেখুন মশাই, একটা কথা আপনাকে আমি সোজাসুজি বলে দিই। আপনি এ বাড়িতে যাকে খুঁজতে এসেছিলেন তাকে পেয়েছেন। আপনি নিজেই বলছেন, ও ডাকাতদলের সঙ্গে ছিল না। আমি বুঝতে পারছি না, আপনি সব জেনেশুনে কেন মিথ্যে অজুহাত দিয়ে আমার বাড়িতে এসেছিলেন! যাক, আর কথা বাড়াবেন না। এবার আমাদের মুক্তি দিন। এই নাটক আমার ভাল লাগছে না। স্টপ ইট।"

হেমবাবু হাসিমুখেই বললেন, "ঠিক, ঠিক বলেছেন সান্যালসাহেব। তবে আর দু-একটা কথা হলেই আমার কাজ সারা হয়ে যায়।"

"না, একটাও নয়। আপনি আননেসেসারি আমার বাড়িতে অসময়ে ঢুকে আমায়

বিরক্ত করেছেন। পুলিশ হলেই তার সাতখুন মাফ হয় না। আপনাকে আমি আইন শেখাতে চাই না। কিন্তু দরকার হলে আমি আইনের...”

“নিশ্চয় নিশ্চয়। আপনি আইনের সাহায্য নেবেন বইকী! কিন্তু তার আগে আমি আপনাকে একটা কথা বলি। একজন ভদ্রলোককে—সিংহীবাবুকে আপনি আপনার বাড়ির মধ্যে আটকে রেখেছেন।”

ভবতোষ চুপ। সরাসরি হেমবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। চশমার আড়ালের জন্যে তাঁর চোখ দেখা যাচ্ছিল না। শিশিররা স্তব্ধ হয়ে একবার হেমবাবু, আর একবার ভবতোষকে দেখছিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। যেন দু পক্ষ পরস্পরকে ভালভাবে বুঝে নিচ্ছে।

ভবতোষই কথা বললেন প্রথমে, “আমার বাড়িতে আর কে কে আছে, মশাই? যা বলার একসঙ্গে বলুন।” ভবতোষ ব্যঙ্গ করলেন।

“সিংহীবাবু আছেন।”

“যান, খুঁজে নিন।”

হেমবাবু প্রয়াগের দিকে তাকালেন। “তোমায় কলকাতায় চিঠি লিখে কে আনিয়েছে? সত্যি কথা বলবে। আমি জানি তোমায় কে আনিয়েছে।”

প্রয়াগের চোখমুখ কেমন হয়ে গেল। ভয় পাবার মতন। সে ভবতোষের মুখের দিকে ভীত চোখে তাকাল।

হেমবাবু আবার বললেন, “তোমার এই বাবু?”

“জি।”

“এখানে এসে তুমি এই বাড়িতে গা লুকিয়ে থাকতে, কোথাও বেরোতে না?”

“জি।”

“কেন কোথাও বেরোতে না? পাছে লোকজন তোমায় দেখে, চিনে রাখে, তাই না?”

মাথা নাড়ল প্রয়াগ। ঠিক কথা।

“এই বাবু তোমায় হুকুম করেছিলেন, সিংহীবাবুকে যেমন করে হোক এখানে— এই বাড়িতে হাজির করতে। ঠিক কথা?”

“হ্যাঁ।” প্রয়াগ স্বীকার করল।

ভবতোষ হঠাৎ জোরে হেসে উঠলেন।

হেমবাবু অবাক। “হাসছেন?”

“আপনার কথার ধরন দেখে। ঠিক আছে, আপনার কথা শেষ করুন।”

হেমবাবু প্রয়াগের দিকে তাকালেন। “তুমি কেমন করে সিংহীবাবুকে তাঁর বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে এলে মাহেশ্বর?”

প্রয়াগ বলল, “সিংজি তো আপনা মরজিতে চলা আয়া। হামি কুছ জোর-জবরদস্তি নেহি কিয়া।”

হেমবাবু কেমন থতমত খেয়ে গেলেন। “তুমি ঠিক বলছ?”

“জি।”

ভবতোষ বললেন, "কথাটা যখন তুললেন স্যার, তখন মানুষটাকে হাজির করা যাক। কী বলেন?"

ভবতোষের বিদ্রূপ হেমবাবু গায়ে মাখলেন না। "তা হলে সিংহীবাবু এ-বাড়িতেই আছেন।"

"হ্যাঁ, আছেন। তাঁকে আনাই?"

"আনান।"

"প্রয়াগ, সিংজিকে নিয়ে এসো।"

প্রয়াগ চলে যাচ্ছিল, হেমবাবু বললেন, "ফটকে পুলিশ আছে। পালাবার চেষ্টা কোরো না।"

"করবে না," ভবতোষ বললেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

॥ চল্লিশ ॥

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, প্রয়াগ ফিরে এল, সঙ্গে সিংহীবাবু।

সিংহীবাবুকে দেখে শিশিররা আঁতকে উঠল। রোগা চেহারা আরও শুকনো হয়েছে, মুখময় খোঁচা-খোঁচা দাড়ি; চোখ বসে গিয়েছে, কালি পড়েছে। জামাকাপড়ও ময়লা।

শিশিররা অস্ফুট শব্দ করল।

সিংহীবাবু সকলকেই কয়েক পলক দেখলেন, কোনও কথা বললেন না।

হেমবাবু ভাল করে নজর করছিলেন সিংহীবাবুকে। শেষে বললেন, "আপনাকে আমি চিনি, দেখেছি; সামনা-সামনি আলাপ হয়নি। রেলফটকের কাছে পুকুরের দিকে বাড়িটায় থাকতেন।"

সিংহীবাবু কোনও জবাব দিলেন না কথার। সামান্য মাথা নোয়ালেন।

ভবতোষ আগ বাড়িয়ে বললেন, "সিংহী, তোমায় নাকি আমি তোমার বাড়ি থেকে ধরে এনেছি?" বলে ভবতোষ হাত বাড়িয়ে খানিকটা যেন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হেমবাবু আর শিশিরদের দেখালেন। "তুমি একটু বলে দাও এঁদের, এই ভদ্রলোকদের, আমি তোমায় ধরে আনিয়েছি, না, তুমি নিজে এসেছ? এঁদের উৎপাত আর আমার ভাল লাগছে না।"

শিশিররা সিংহীবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকল।

কোনও জবাব দিলেন না সিংহীবাবু। কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন। ভবতোষ বললেন, " তুমি বোসো, তোমার জ্বর। জ্বর গায়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে!" সিংহীবাবু বসলেন না। হেমবাবুর দিকেই তাকালেন। বললেন, "আমায় কেউ ধরে আনেনি, আমি নিজেই এসেছি।"

শিশির আর বংশী দুজনে একই সঙ্গে কেমন এক শব্দ করে উঠল; কথাটা তারা বিশ্বাস করতে পারল না।

ভবতোষ বললেন হেমবাবুকে, "সিংহীর কথা নিজের কানে আপনি শুনলেন। এর

পর আর আমায় বিরক্ত করবেন না। বাড়িতে আমার স্ত্রী অসুস্থ। মায়েরও শরীর খারাপ। আমাকে উঠতে হবে।"

শিশির উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, সিংহীবাবুকে বলল, "আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। আপনাকে ভয় দেখানো হয়েছে...।"

সিংহীবাবু শিশিরের দিকে তাকালেন। মাথা নাড়লেন। "না। আমি নিজেই এখানে এসেছি।"

বাবু রেগে উঠেছিল। বলল, "আপনার সমস্ত কথাই তা হলে মিথ্যে। বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলেছিলেন আমাদের। ছি ছি।"

ভবতোষ উঠে পড়ার ভাব করলেন। হেমবাবুকে বললেন, "এবার কি আপনি আমায় মুক্তি দেবেন?"

হেমবাবু কেমন একটু লজ্জিত হবার মুখ করে বললেন, "এ কী বলছেন, এ তো আপনার বাড়ি, কে আপনাকে আটকে রাখছে।...দু-একটা সামান্য কথা তারপর আমরা চলে যাব।"

"আবার কী কথা!"

"আপনাকে নয়, সিংহীবাবুকে।" বলে হেমবাবু সিংহীবাবুর দিকে তাকালেন। "আপনি তা হলে নিজের ইচ্ছেয় এ বাড়ি এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কেন এসেছেন সেটা যদি বলতেন! মানে, নিজের বাড়ি থাকতে হঠাৎ এই অন্যের বাড়িতে পালিয়ে আসার—না হয় ধরুন বলি—লুকিয়ে এসে ওঁর বাড়িতে থাকার কারণটা কী?"

সিংহীবাবু চুপ করে থাকলেন। হেমবাবু সামান্য অপেক্ষা করে বললেন, "আপনি বলবেন, না, আমি বলব?"

শিশির আর বংশী হেমবাবুর মুখের দিকে তাকাল।

কোনও রকম সাড়া দিলেন না সিংহীবাবু। হেমবাবু সামান্য কাত হয়ে পাশ-পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন। বললেন, "মিস্টার সান্যাল, আমার কাছে একটা চিঠি রয়েছে। এটা আমি গত কাল রাত্তিরে পেয়েছি। চিঠিটা একটু পড়ে শোনাই আপনাকে।"

"চিঠি? কীসের চিঠি?" ভবতোষ যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

হেমবাবু চিঠিটা বার করলেন। খামটা তাঁর পায়ের কাছে পড়ে গেল। চিঠির পাতাগুলো গুছিয়ে একবার দেখে নিলেন হেমবাবু। বললেন, "চিঠিটা সিংহীবাবুর। উনি আপনার এখানে আসার আগে এটি আমার কাছে থানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর এই চিঠিটা আমার হাতে যে দিয়ে এসেছিল, সে সিংহীবাবুর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।"

ভবতোষ অদ্ভুত গলায় বললেন, "প্রয়াগ?"

হেমবাবু মুচকি হাসলেন। "আপনি নিশ্চয় খুবই বুদ্ধিমান, যা করেন ভেবেচিন্তে করেন। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি, যতই আপনি আঁটঘাট বাঁধুন না কেন, কিছু ভুলচুক হয়ে

যায়। আপনি বেশ বড় রকম ভুলচুক করেছিলেন। প্রথম থেকেই। সিংহীবাবু আর আপনার প্রয়াগ যে তলায় তলায় সাঁট করে এগোচ্ছে—আপনি জানবেন কেমন করে? আপনার মশাই, জানা উচিত ছিল। প্রয়াগকে আপনি আপনার খুব বিশ্বাসী লোক ভেবেছিলেন; আসলে সে সিংহীবাবুর লোক। সিংহীবাবুই তো ওকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন। মনে আছে? দু জনেই বেনারসের লোক।"

ভবতোষ পাথরের মতন বসে থাকলেন। ভেতরে তাঁর কী হচ্ছিল বোঝার উপায় নেই।

হেমবাবু চিঠি পড়তে শুরু করলেন। শিশিররা শুনছিল। নিজের পরিচয় দিয়ে সিংহীবাবু বেনারসে মামার কথা তুলেছেন, তারপর কবিরাজ তুলসীচরণ সেনশর্মার কথা। এ সব কথা শিশিররা জানে, সিংহীবাবুর মুখেই শুনেছে।

ভবতোষ হঠাৎ বললেন, "দাঁড়ান। ওই চিঠি শুনে আমার কোনও দরকার নেই। সাত কাণ্ড রামায়ণ শোনার সময় আমার হবে না। আসল কথাটা বলুন। আমার বিরুদ্ধে সিংহীর অভিযোগ কী? আমি ওই ছেলেটিকে," বলে শিশিরের দিকে আঙুল দেখালেন, "ওকে বিষ খাইয়ে মারবার চেষ্টা করেছিলাম—এই তো?"

হেমবাবু মাথা নাড়লেন, "না, প্রথমটায় মারতে চাননি, তবে ওকে উন্মাদ করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।...পরে ওকে জখম করার চেষ্টাও করেছেন।"

"কেন?"

"শিশিরের বাবা অমৃতবাবুর সঙ্গে আপনার শত্রুতা।...তা ছাড়া আপনার কিছু স্বার্থও রয়েছে।"

"ও!...সিংহী নিশ্চয় বলেছে, মানে—ওর ওই রামায়ণে লিখেছে যে, অমৃতবাবুর সঙ্গে শত্রুতা করার জন্যে ও আমায় সাহায্য করেছে?"

"হ্যাঁ, উনি লিখেছেন।"

"কী লিখেছে?...লিখেছে যে, ও একরকম বিষাক্ত ওষুধ তৈরি করেছিল আমার জন্যে। সেই ওষুধ আমার কথা মতন প্রয়াগকে দিয়ে অমৃতবাবুর ছেলেকে খাওয়ানো হত। তাই কি?"

"মোটামুটি তাই। তবে একটা কথা আছে। আপনি খানিকটা তাড়াতাড়ি কাজ সারতে চেয়েছিলেন। আপনি চাইতেন একটু বেশি করে খাওয়ানো হোক।"

কথাটা কানে তুললেন না ভবতোষ; জেরা করার গলায় বললেন, "সিংহী আমার হয়ে বিষ দিতে গেল কেন? কেনই বা প্রয়াগকে ও-বাড়ি থেকে সরে যেতে বলল?"

হেমবাবু বললেন, "আপনাদের দুজনের মধ্যে অনেকদিন ধরে যে লেনদেন চলছিল, তার কথা আপনি জানেন। সিংহীবাবু সেটা স্বীকার করেছেন।...আর প্রয়াগ যে শিশিরদের কলকাতার বাড়ি থেকে সরে গেল, তার কারণ সিংহীবাবু চাইছিলেন না, শিশিরকে আর ওষুধটা খাওয়ানো হোক। তাতে পরিণাম খুব খারাপ হতে পারত!"

ভবতোষ যেন এইবার হাসলেন। "আপনি পুলিশ অফিসার। জানেন অনেক কিছুই। কিন্তু একটা কথা আপনার ভেবে দেখা উচিত ছিল। প্রয়াগ যদি সিংহীর কথা

শুনে আমার হুকুম অমান্য করত, আমার বাড়িতে কি ওর ঠাঁই হত? কী? কলকাতায় ও কোথায় ছিল অমৃতবাবুর বাড়ি ছেড়ে চলে আসার পর? আমার বাড়িতে ছিল না? আর ওই বা কোন সাহসে আজ এখানে আমার বাড়িতে এসে থাকবে?"

হেমবাবু বললেন, "প্রয়াগ এখানে এসেছে সিংহীবাবুর চিঠি পেয়ে; ওঁকে বাঁচাতে। আপনার কথায় আসেনি!"

" তাই নাকি? আমি জানতাম না।...কিন্তু যে আমার হুকুম মানেনি—তাকে আমি আমার বাড়িতে আশ্রয় দেব?"

হেমবাবু কোনও জবাব দিতে পারলেন না কথার।

সিংহীবাবু কথা বললেন আচমকা। "আমি বলতে পারি। প্রয়াগ আমার কথা মতন ওষুধ খাওয়াত। সে ভবতোষের কথা মতন ওষুধ খাওয়াত না। ওষুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে ভবতোষের কোনও হুকুম তার ওপর ছিল না। শিশিরদের বাড়িতে থাকার সময় প্রয়াগ শিশিরকে দেখেছে, ওষুধ খাবার পর—তার কী অবস্থা হত। প্রয়াগ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমার কথায় সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আমি ভবতোষকে বলেছিলাম, প্রয়াগ ভয় পাচ্ছে—যে কোনও দিন ধরা পড়ে যেতে পারে। সে পালিয়ে এসেছে।"

হেমবাবু বললেন, "সান্যালমশাই, একটা কথা আছে; আপনি নিশ্চয় জানেন যে পাপ করে, সে পাপীকে আশ্রয় দেয়। নিজের স্বার্থে। আপনি প্রয়াগকে বাধ্য হয়েই আশ্রয় দিতেন।...ও এখানে এসে ওঠার পর আপনি না ওকে সিংহীবাবুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে ধরে আনার কাজ দিয়েছিলেন?"

"না।"

"মিথ্যে কথা বলবেন না। প্রয়াগ এখানে আছে। আপনি বরাবর জেনে এসেছেন ও আপনার বিশ্বস্ত লোক। আজ এখন জানতে পারলেন—ও বিশ্বাসঘাতক।"

শিশির আর বংশী মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। সামান্য চুপচাপ।

হেমবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন—তার আগেই ভবতোষ বললেন, "আমি কোনও কথাই মানছি না। এ সবই সাজানো ঘটনা। মিথ্যে কথা। শিশিরকে বিষ খাওয়ানোর কথা আমি জানি না। আমি নিজের হাতে দিইনি। কী বিষ তাও আমি জানি না। শিশিরকে বিষ খাওয়ানোর কোনও ষড়যন্ত্র যদি হয়েই থাকে—সেটা সিংহী করেছে। সে জানে কী করেছে। আমি জানি না। আমার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।"

হেমবাবু স্থির ভাবে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকলেন ভবতোষের দিকে। তারপর বললেন, "আপনি কি মশাই প্রমাণ চাইছেন? সে প্রমাণও কিন্তু আছে। আপনি বসে বসে কেমন করে কলকাঠি নেড়েছেন তার খবর আমরা জানি। প্রমাণ রয়েছে।"

ভবতোষ এবার যেন রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়লেন। "কী প্রমাণ?"

"প্রমাণ এক নয়, অনেক", হেমবাবু বললেন, "আপনার কয়েকটা চিঠি সিংহীবাবুর কাছে রয়েছে।" বলে তিনি সিংহীবাবুর দিকে তাকালেন। "চিঠিগুলো আপনার বাড়িতে রয়েছে, তাই না সিংহীবাবু?"

"হ্যাঁ।"

ভবতোষ এবার চঞ্চল হলেন।

হেমবাবু তাঁর হাতের চিঠিটা ভবতোষের চোখের সামনে নাড়লেন। "সিংহীবাবু এই চিঠিতে অনেক খবর দিয়েছেন। তার দু-একটা বলি আপনাকে। যেমন ধরুন কলকাতায় কাজটা সারা গেল না দেখে আপনি মিথ্যে টেলিগ্রাম করে শিশিরকে এখানে টেনে এনেছিলেন। উহুঁ, অস্বীকার করবেন না, প্রমাণ আছে। টেলিগ্রামটা আপনার বাড়ির লোক গিয়ে করে এসেছে। আপনি শিশিরকে ভাল মতন জখম করার জন্যে লোক লাগিয়েছিলেন। যা দিয়ে জখম করে চেষ্টা করা হয়েছিল সেটা আমার থানায় সাক্ষী।...আপনার মনে সিংহীবাবু সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে, আর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না; আপনার ভয় হচ্ছিল—সব না ফাঁস হয়ে যায়। সিংহীবাবুকে আপনি মেরে ফেলার চেষ্টাও করেছেন, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের নাম দিয়ে সেটা চালাতেন। সেটাও, সান্যালসাহেব, আপনার লোক সিংহীবাবুর বাড়ির ওপর চড়াও হয়েছে, তার সাক্ষী আমি। এবার বলুন, আপনি কি এখনও বলবেন—কিছুই জানেন না আপনি?"

ভবতোষ কোনও কথা বললেন না। মাথাটা সামান্য নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হেমবাবু বললেন, "আপনার আর কিছু বলার আছে?"

ভবতোষ মাথা তুললেন, তাকালেন সিংহীবাবুর দিকে। কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। তারপর দু হাতে মুখ আড়াল করলেন। কেউ কোনও কথা বলছিল না। সকলেই চুপ।

কিছুক্ষণ পরে ভবতোষ বললেন, "আমার কপাল। যা আমি করতে চাইনি—ওই সিংহীর কথায় আমাকে তা করতে হয়েছে। সমস্তই ওর মন্ত্রণা।" বলে মুখ থেকে হাত সরিয়ে সিংহীবাবুর দিকে তাকালেন। "সিংহী, তুমি আজ পুলিশের কাছে গিয়ে বাঁচতে চাইছ। তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আর আমি হলাম চোর।...ভাল কথা। কিন্তু তুমি পার পাবে না সিংহী।...শিশিরের বাবার সঙ্গে আমার রেষারেষি থাকতে পারে। আছে। সেটা ফ্যামিলির ব্যাপার। কিন্তু এই ছেলেটাকে বিষ খাইয়ে পাগল করতে, মারতে আমি চাইনি। তুমি আমায় পরামর্শ দিয়েছিলে। কলকাতা থেকে ওকে এখানে আনানোর বুদ্ধিও ছিল তোমার।...তুমি আমায় একে-একে টেনে নামিয়েছ।...তারপর যা করার আমি করেছি।...তুমি নেমকহারাম, বিশ্বাসঘাতক, তোমার আজকের এই ভালমানুষি কোর্টে টিকবে না। আমি তোমায় দেখে নেব। শয়তান কোথাকার!"

ভবতোষ উঠে দাঁড়ালেন। টলছিলেন। সারা কপালে ঘাম। গাল-গলা ভিজে গিয়েছে। হেমবাবুর দিকে তাকালেন। "আমায় কি থানায় যেতে হবে?"

"হ্যাঁ। আপনাদের সকলকেই।"

"বাড়িতে বলতে পারব?"

"পারবেন। সঙ্গে আমি থাকব।"

"ও!...বেশ, আসুন তবে আমার সঙ্গে।"

হেমবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

ভবতোষ দু পা এগিয়ে শিশিরের দিকে তাকালেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "একটা লোক তোমার সঙ্গে মাঠে দেখা করে বলেছিল যা আছে সব খুলে রাখতে।"

"হ্যাঁ।"

"সে তোমায় ঘুরিয়ে বলতে চেয়েছিল, তোমার হাতের আংটিটা খুলে রাখতে। লোকটা আমার লোক। কেন বলেছিল জানো? প্রয়াগের ওপর আমার হুকুম ছিল, তোমার হাতের আংটি খোলা হয়ে যাবার পর আর যেন ওষুধ খাওয়ানো না হয়।"

শিশির ভীষণ অবাক হয়ে বলল, "সিসের আংটি। তার সঙ্গে ওষুধ খাওয়ানোর সম্পর্ক কী?"

"কিছুই না। শুধু একটা ইঙ্গিত।...তোমার খবর আমার কাছে আসত। আমি চাইনি—তোমার বেশি ক্ষতি হোক।"

"আংটিটা আমি এখানে পরেছিলাম। পিসিমার কাছ থেকে নিয়ে।"

"হতে পারে। ওই আংটি নিয়ে আমার মাথাব্যথা ছিল না।...ওটা শুধু একরকম সাবধান করার ইঙ্গিত হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল। প্রয়াগকে বলে দেওয়া হয়েছিল, আংটিটা খোলা হয়ে গেলে আর যেন ওষুধ না খাওয়ায়।"

শিশির বোকার মতন বাবু আর বংশীর দিকে তাকাতে লাগল। "ওষুধটা কী?"

"আমি জানি না। সিংহী জানে। প্লেগের ওষুধ খুঁজতে গিয়ে ওটা ও আবিষ্কার করে। গাছগাছড়ার ওষুধ। ওতে প্লেগ সারে না; কিন্তু মানুষের মাথা গোলমাল করে দেয়। মনে হয়, কোনও একটা মাদক গোছের ওষুধ। যাতে মানুষ ভুল দেখে। ভয়ংকর এক নেশা হয়।"

হেমবাবু খেয়াল করতে পারেননি। হঠাৎ দেখলেন, ভবতোষ যেন ঝাঁপ দিয়ে সিংহীবাবুর ওপর পড়লেন। পড়ে গলার টুঁটি চেপে ধরলেন।

প্রয়াগ আর হেমবাবু চিৎকার করে ভবতোষের হাত আলগা করার জন্যে লাফিয়ে পড়ল।

ভবতোষের দু হাত সাঁড়াশির মতন সিংহীবাবুর গলা টিপে ধরেছিল। কেমন করে এত শক্তি ভবতোষ পেলেন কে জানে!

ভবতোষের হাত আলগা হবার পর সিংহীবাবু মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

ক ল্প বি জ্ঞা ন কা হি নী

হারানো জীপের রহস্য

১

একটা ওষুধ কিনতে এসে এমন ফ্যাসাদে পড়ব ভাবিনি। আজকাল বড়-বড় ডাক্তারবাবুরা কী যে সব ওষুধ লিখে দেন, সাত দোকান ঘুরেও পাওয়া যায় না। আমার নিজের ধারণা, ডাক্তাররা যত বড় হন, তাঁদের হাতের লেখাও তত উদ্ভট হয়ে যায়, যার ফলে বেশির ভাগ দোকানেই এমন কেউ থাকে না, যে ঠিক মতন ওষুধের নামটা পড়তে পারে। আর নতুন কোনও ওষুধ হলে তো নয়ই।

ওষুধটা আমার বড়মামার। মামার বয়েস সত্তরের কাছাকাছি। হঠাৎ একটা বাড়াবাড়ি অসুখে পড়েছিলেন মামা। আমরা দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম। দিন সাতেক লড়ালড়ি করে মামা ধাক্কাটা সামলে নিলেন। কিন্তু এখনও তিনি শয্যাশায়ী। আমরা, আত্মীয়স্বজনরা রোজই কেউ-না-কেউ তাঁর খোঁজ-খবর নিতে যাই।

আজ আমি গিয়েছিলাম। শনিবার, আমার আধবেলা অফিস। অফিস থেকে বেরিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে চা-টা খেয়ে গিয়েছিলাম মামারবাড়ি টালিগঞ্জ।

মামা ভালই ছিলেন। বাড়িতে আরও অনেকে এসেছিল। কথাবার্তায়, গল্পে সন্ধে হয়ে গেল। কলকাতায় শীত পড়েছে। বাড়ি ফেরার জন্যে উঠছি, মামিমা হঠাৎ আমায় বললেন, “তুই তো বাড়ি যাবি, জগু। এই ওষুধটা এনে দিয়ে যা।”

একটা ওষুধ আনা এমন কী হাতি-ঘোড়ার ব্যাপার। যার আর আসব। বললাম, “প্রেসক্রিপশান দাও।”

মামাদের পাড়ার ওষুধের দোকান রয়েছে গোটা তিনেক। যেতে-আসতে চোখে পড়ে দোকানগুলো। যে-কোনও একটা থেকে ওষুধটা কিনে আনব।

প্রেসক্রিপশান পকেটে করে বেরিয়ে পড়লাম। দেয়াল-ঘড়িতে তখন শব্দ করে সাতটা বাজছে। কানে শব্দ শুনতে-শুনতে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রথম দোকানে ওষুধটা পেলাম না। দ্বিতীয় দোকানে বলল, ওষুধের নাম বুঝতে পারছে না। তৃতীয় দোকান স্পষ্টই বলে দিল, এ-সব বিদেশি ওষুধ তারা রাখে না।

কাছাকাছি আরও ক’টা দোকান ঘুরে আমার মনে হল, এদিকে এই ওষুধ পাওয়া যাবে না। ভাবলাম ট্রামে করে রাসবিহারীতে যাই, পেয়ে যাব। তাতে খানিকটা সময় যাবে ঠিকই, কিন্তু মামার ওষুধটা না এনে দিয়ে যাই-ই বা কী করে?

ট্রামে উঠে জায়গা পেলাম। একেবারে সামনের দিকে।

জানালার দিকে কে যে বসেছিল, আমি লক্ষ করিনি। পাশে গিয়ে বসলাম।

ট্রামের জানলা খোলা। বাইরে কলকাতার শীতের সেই ধোঁয়াশা। তেমন কিছু শীত নয়, তবু ঠাণ্ডাটা বোঝা যাচ্ছে। মনে-মনে আমি খানিকটা ব্যস্ত হয়ে

পড়েছিলাম। ওষুধ কিনে আবার ফিরতে হবে, তারপর বাড়ি যাওয়া। সেও কম দূর নয় ; আমরা থাকি মানিকতলায়, সুকিয়া স্ট্রীটে।

আমি খানিকটা অন্যমনস্ক ছিলাম।

হঠাৎ কাঁধে কার হাত পড়ায় মুখ ফেরালাম। পাশের লোকটি আমার কাঁধ ধরে নাড়ছে ধীরে ধীরে।

"জগদীশ না ?"

আমি তাকিয়ে থাকলাম। দেখছিলাম লোকটিকে। চৌকো মুখ, গালে দাড়ি, একমাথা উসকো-খুসকো চুল, গায়ে কালো পুলওভার। বেশ শক্তসমর্থ চেহারা।

আমি তাকিয়ে রয়েছি দেখে লোকটি চোখ কুঁচকে আবার বলল, "জগদীশ না ?"

সামান্য মাথা হেলিয়ে বললাম, "হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ?"

"আমায় চিনতে পারছিস না ? সুবীর, সুবীরদা...।"

সুবীরদা ? চোখের পাতা পড়ছিল না আমার, তাকিয়ে থাকলাম। বিশ্বাস হচ্ছিল না। অথচ গভীর করে লক্ষ করলে ওই দাড়িগোঁফের জঙ্গল থেকে সুবীরদার মুখের আদলটা ধরা দেয়। অন্তত চোখ দুটো। আগের মতন অত উজ্জ্বল নয়, বরং সামান্য ঘোলাটে দেখাচ্ছে, কিন্তু সেই পুরনো চোখ— বড় বড়, জোড়া ভুরু।

আমি সুবীরদাকে চিনতে পারছি না দেখে সুবীরদাও যেন সামান্য অবাক হয়ে আমায় দেখছিল।

"সুবীরদা, তুমি ?"

"চিনতে পারলি ?"

"তোমায় কিন্তু চেনা যায় না।"

সুবীরদার চোখে হাসির ঝলক উঠল। "তুই এদিকে কোথায় ?"

বড়মামার ওষুধের কথা বললাম।

"রাসবিহারীতে নামবি তাহলে ?"

"হ্যাঁ। ওষুধটা কিনে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।"

"ঠিক আছে ; চল, আমিও নামি।"

রাসবিহারীর মোড় আসতে আরও গোটা দুয়েক স্টপ ছিল। হঠাৎ আমার খেয়াল হল, কার মুখে যেন শুনেছিলাম, সুবীরদার কী একটা হয়েছিল— অ্যাকসিডেন্ট গোছের। খেয়াল হতে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার নাকি সিরিয়াস অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল ?"

সুবীরদা আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত ; তারপর বলল, "কার কাছে শুনেছিলি ?"

"তা বলতে পারব না। শুনেছিলাম।"

একটু চুপ করে থেকে সুবীরদা বলল, "অ্যাকসিডেন্ট বলতে পারিস। তবে ঠিক-ঠিক বললে অ্যাকসিডেন্ট বলা যায় না।" বলে সুবীরদা চুপ করে গেল।

রাসবিহারীর মোড়ে ট্রাম থামতে আমরা নেমে পড়লাম।

"তোমার সঙ্গে কতদিন পরে দেখা হল সুবীরদা ? বছরখানেক ?"

"তা হবে।"

"তুমি কি কলকাতায় থাকো না !"

"থাকি ; তবে আজকাল কমই থাকছি।"

"কোথায় থাকো ?"

"ঠিক নেই ; কখনও গিধনি, কখনও ঘাটশিলা।"

সামান্য এগিয়ে একটা ওষুধের দোকান পাওয়া গেল।

সুবীরদা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকল। আমি সামান্য ভয়ে-ভয়ে দোকানে ঢুকলাম, কী জানি, ওষুধটা পাব কি পাব না !

কপাল ভাল। ওষুধটা পাওয়া গেল। আসলে ওষুধটা নতুন নয়, পুরনো, তবে হালে ওষুধটা আর পুরনো নামে বাজারে চলছে না, নতুন নাম হয়েছে।

সুবীরদা নীচে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, "তুই আবার টালিগঞ্জ ফিরবি, আবার আসবি। শোন, একটা ট্যাক্সি ধর। টালিগঞ্জ চল। আবার ফিরে আসব। আমি একবার বউবাজার যাব, আমার সঙ্গে তুই আরামে বউবাজার পর্যন্ত যেতে পারবি।"

"ট্যাক্সি ? আরে সাবাস, সে তো অনেক টাকা পড়ে যাবে।"

"তোকে টাকার চিন্তা করতে হবে না। ট্যাক্সি ধর। তোর সঙ্গে কথা আছে।"

ট্রামে আসা-যাওয়ার চেয়ে ট্যাক্সি চড়া নিশ্চয় আরামের ব্যাপার। সময়ও বাঁচবে অনেকটা। সুবীরদার সঙ্গে গল্প করা যাবে। খুশিই হলাম।

কলকাতা শহরে ট্যাক্সি ধরা কঠিন। কিন্তু কোনও ট্যাক্সিঅলা যদি শোনে খাস কলকাতার মধ্যে লম্বা পাড়ি দেওয়া যাবে— সঙ্গে সঙ্গে বিগলিত হয়ে পড়ে।

ট্যাক্সিতে বসে সুবীরদা বলল, "তোকে একটা অদ্ভুত কথা বলব। বিশ্বাস করতে পারবি না। করা মুশকিল, আমারই মাঝে-মাঝে মনে হয়, আমি ভুল দেখছি, ভুল ভাবছি, হয়তো আমি বেঁচে নেই, কিংবা বেঁচে থাকলেও কেমন করে বেঁচে আছি— আমি জানি না, বুঝতে পারি না।"

আমি অবাক হয়ে সুবীরদার মুখের দিকে তাকালাম। সুবীরদার গলার স্বর অন্যরকম শোনাচ্ছিল : চাপা, গম্ভীর, বিষণ্ণ।

"তুমি বেঁচে নেই মানে ? দিব্যি বেঁচে আছ। আমার পাশে বসে রয়েছ।" আমি ঠাট্টা করে বললাম।

অল্প সময় চুপ করে থেকে সুবীরদা বলল, "তুই যে অ্যাকসিডেন্টের কথা শুনেছিলি সেটা আসলে কী জানিস ?"

"কী ?"

"আমরা চারজনে হারিয়ে গিয়েছিলাম। কেমন করে, কোথায় আমি জানি না। তিন দিন পরে আমি ফিরে আসি। কেমন করে তাও বলতে পারব না। দিন দশ পরে অনিলও ফিরে আসে, কিন্তু এমনই কপাল, আমি তাকে ধরতে যাবার আগেই সে চলন্ত ট্রেনের তলায় লাফ দিয়ে পড়ে। তার আর কিছু ছিল না। এখনও দু জন মিসিং। মৃগাঙ্ক আর আমাদের ড্রাইভার কপিল।"

সুবীরদার কথা আমার মাথায় কিছুই ঢুকল না। হারিয়ে যাওয়া বলতে কী বোঝাতে চাইছে সুবীরদা ? মানুষ আবার হারায় কেমন করে ? কাচ্চাবাচ্চারা ভিড়ে-ভাড়াক্কায় হারায়, সুবীরদারা কেন হারাবে ? কোথায় হারাবে ? মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি সুবীরদার ? কথাটা আমি তেমন করে কানে তুললাম না। অবিশ্বাসের গলায় বললাম, "তোমার কি মাথার গোলমাল হয়েছে ?"

সুবীরদা আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল। ট্যাক্সির অন্ধকারেও চোখ যেন কেমন চকচক করছে। আমার কাঁধের কাছটায় প্রায় খামচে ধরল সুবীরদা। বলল, "হতেও পারে মাথার গোলমাল। জানি না। আমি তো আগেই বললাম, আমি যে বেঁচে আছি— এটাই ভাবতে আমার কেমন যেন লাগে, বিশ্বাস হয় না।"

সুবীরদাকে আমি অনেকদিন ধরে জানি। এক সময়ে আমাদের পাড়াতেই থাকত। আমার মেজমাসির শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে কেমন এক আত্মীয়। সুবীরদা আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। তবু একটা বন্ধু-বন্ধু সম্পর্ক ছিল একসময়। তার পর আজকাল চোখের আড়ালে পড়ে গেলে মানুষ যেমন হয়ে যায়, সুবীরদারও সেইরকম হয়েছিল। হঠাৎ-হঠাৎ বাস্তাঘাটে সিনেমা হাউসে দেখা হলে গল্পগুজব হত। অবশ্য এর-ওর মারফত খবরাখবর রাখার চেষ্টা করেছি সুবীরদার। আমি শুনেছিলাম, সুবীরদার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।

ট্যাক্সি আনোয়ার শা রোডের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। আর খানিকটা পরেই মামারবাড়ি। ট্যাক্সি থেকে নেমে আমি শুধু ওষুধটা দিয়ে দেব, সুবীরদা বসেই থাকবে, ফিরে এসে আবার আমি ট্যাক্সিতে বসব। তারপর দুজনেই ফিরব বউবাজার পর্যন্ত।

সুবীরদা বলল, "তুই আমার কথা বিশ্বাস করতে পারবি না, তবু শুনবি, না শুনবি না ?"

আমি যেন কী মনে করে বললাম, "শুনব। তার আগে আমার দু-একটা কথার জবাব দাও।"

"বল ?"

"মাসিমা কোথায় ?"

"কেন ? বাড়িতে।"

"ভাল আছেন ?"

"আছে।"

"আভাদি কোথায় ?"

"তার শ্বশুরবাড়িতে, শ্রীরামপুরে।...তুই এসব কথা আমায় জিজ্ঞেস করছিস কেন ! দেখতে চাইছিস— আমার মাথার ঠিক আছে কি না ! আমি সুবীর কি না ?"

ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, তবু ওইরকম কিছু হতে পারে, আমি অত ভেবে দেখিনি। বললাম, "তোমার মাথার গোলমাল হয়নি। এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।" বলে একটু হাসলাম।

সুবীরদা বলল, "আমার মনের অবস্থা তোকে বোঝাতে পারব না। কিছুই নয়—একেবারে সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার সব, হঠাৎ কী যে ঘটে গেল, কেন ঘটল, কিছুই বুঝলাম না। ছিলাম চারজন, এখন আমি মাত্র একা। অনিলকে ফিরে পেলাম, দেখলাম, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলতে যাবার আগেই সে রেল-লাইনের ওপরে লাফিয়ে পড়ল। আমায় দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল কি না বুঝতে পারলাম না।"

"কোন অনিল ?"

"আমার বন্ধু। ব্যবসার পার্টনার।"

"দেখেছি। একটু মোটামতন, ফরসা রঙ। নাগপুর না রায়পুরের লোক।"

"নাগপুরের।"

"আর অন্য কার কথা বলছিলে ?"

"মৃগাঙ্ক। আমার আর-এক বন্ধু। বায়োকেমিস্ট। একটা ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করত, ছেড়ে দিয়ে বাইরে— মানে বিদেশ যাবার চেষ্টা করেছিল। একটা চান্সও পেয়েছিল। কিন্তু লোকটাই নেই।"

আমি বললাম, "কোথায় থাকতেন উনি ?"

"বউবাজারে। বাড়িতে দাদা-টাদা আছে। একেবারে ক্যালাস। কোনও গা নেই।"

"তুমি কি ওই বাড়িতেই যাচ্ছ ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন ?"

"খোঁজখবর করতে। আমি কলকাতায় থাকলে একবার করে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি। যদি ফিরে এসে থাকে।"

আমি অবাক হয়ে সুবীরদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আশ্চর্য মানুষ। যদি ধরে নিতে হয়— সুবীরদার কথা মতন— তার বন্ধু মৃগাঙ্ক হারিয়ে গেছে, তাহলে কেন সে এমন করে খোঁজ নিতে যায় মৃগাঙ্কর বাড়ি ? আশায়। প্রত্যাশায়। সুবীরদা নিশ্চয় আশা করে তার বন্ধু মৃগাঙ্ক ফিরে আসবে।

ভেবে দেখলাম, সুবীরদার কথা মতন যদি সবই বিশ্বাস করতে হয়, তবে সে নিজে হারিয়ে গিয়ে ফিরে এসেছে, অনিলও এসেছিল ; তা হলে মৃগাঙ্ক আর সেই ড্রাইভারই বা কেন আসবে না ?

"তোমার ড্রাইভারও কলকাতার লোক ?"

"কপিল থাকত বেহালায়। তার বাড়িতেও খোঁজ করি। সেও ফেরেনি।"

আমি বললাম, "তুমি আশা করো ওরা ফিরবে ?"

"করি। আমি যদি ফিরে এসে থাকি, ওরাও আসতে পারে। তবে কেমনভাবে আসবে আমি জানি না।"

ট্যাক্সিটাকে আমি থামতে বললাম।

২

টালিগঞ্জ থেকে ট্যাক্সিটা আবার ফিরছিল।

সুবীরদা বলল, "আমার আসল কথাটা তোকে এখনও বলিনি।"

বললাম, "এবার বলো, শুনি।"

সুবীরদা কয়েক মুহূর্ত কোনও কথা বলল না, অন্যমনস্কভাবে নিজের মাথার চুল ঘাঁটল, বাইরে তাকাল, আবার আমার দিকে চোখ ফেরাল। "আমার স্বভাব তুই জানিস। হুজুগে মানুষ। পেটের ধান্ধায় খানিকটা ঘোরাঘুরি করি, আর বাকি সময়টায় খাইদাই, বগল বাজাই। এবারে পুজোর সময়, মানে তোর পুজো ফুরোল দশই অক্টোবর, আর এগারোই অক্টোবর, একাদশীর দিন আমরা চারজনে— আমি, অনিল, মৃগাঙ্ক আর আমার ড্রাইভার কপিল বেরিয়ে পড়লাম।

এবারে দু রকম দিন ছিল পাঁজিতে, দশমী দু মতে করেছে লোকে।

আমরা এগারোই বেরিয়েছিলাম। বুধবার। আমার বেশ মনে আছে। আমাদের ডেস্টিনেশান ছিল ঘাটশিলা। ঘাটশিলায় থাকব দিন পাঁচ সাত, একটু জঙ্গলেটঙ্গলে বেড়াব, এই ছিল মতলব। আসলে আরও একটা ব্যাপার ছিল। গিধনিতে কমলেশ্বর রায় বলে এক ভদ্রলোক একটা কোল্ড স্টোরেজ করার প্ল্যান করছিলেন। আমাদের চেনাশোনা। কাজটা আমাদের দিতে চেয়েছিলেন, মানে আমার আর অনিলের যে ফার্মটা রয়েছে সেই ফার্মকে। আমরা ভেবেছিলাম, রথ দেখা কলা বেচা দুইই হবে। গিধনিতে সাইটটা দেখে নেব, সুবিধে-অসুবিধে জেনে নেব— তারপর ঘাটশিলায় গিয়ে ছুটি কাটাবার সময় কোল্ড স্টোরেজের নকশা ফকশার খসড়া একটা করে নেব।"

সুবীরদার কথা শুনতে-শুনতে আমার হঠাৎ কেমন যেন মনে হল সুবীরদার গলার স্বর আগের মতন নেই। এতক্ষণ খেয়াল করিনি, কিন্তু এখন কানে স্পষ্টই ধরা পড়ছিল। ভয় ; উত্তেজনা, অস্থিরতা থাকলে মানুষের গলার স্বর এই রকমই শোনায় অনেকটা। তা ছাড়া, নজরে পড়ল, হাতটাত তুললেই সুবীরদার হাত কেমন কাঁপছে। জোরে নয়, ধীরেই, তবু চোখে পড়ে। মানুষটা যে রীতিমত উদ্বিগ্ন, ভীত হয়ে রয়েছে তাতে আমার সন্দেহ হল না।

"সোজা কলকাতা থেকেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলে ?" আমি কথার কথা বললাম।

"হ্যাঁ। আমার সেই জীপ। তুই তো দেখেছিস। পানাগড় থেকে কিনেছিলাম লোহার দরে, তারপর সারিয়ে-সুরিয়ে একটা বডি যা বানিয়ে নিয়েছিলাম, লোকে দেখলেই বুঝতে পারত জিনিস একটা। তা সেই গাড়িতেই আমরা এগারোই অক্টোবর সকালে বেরিয়ে পড়লাম। সারিয়ে-সুরিয়ে শহরে খাওয়ার পাট চুকোলাম, তারপর আবার বেরিয়ে পড়লাম ঝাড়গ্রামের দিকে। ঝাড়গ্রামে অনিলের এক আত্মীয় থাকে— বলল, যাবার সময় দেখা করে যাবে, চা-টা খেয়ে নেবে।"

"ঝাড়গ্রাম তো কাছেই।"

"কলকাতা থেকে শ' খানেক মাইল।"

"গিয়েছি একবার। বাদলদের বাড়ি।"

"ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত বিশেষ কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু খড়্গাপুর থেকেই আকাশটা কেমন মেঘ-মেঘ করছিল। কেউ কেউ বলছিল, দিঘার দিকে আগের দিন থেকেই ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। তা ঝাড়গ্রামে পৌঁছে আমরা দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টি পেলাম। ঝড়ের মতনও লাগল। তখন বিকেল। অনিলের সেই আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়া হল। কেউ নেই। বাড়ি ফাঁকা।" সুবীরদা থামল, যেন সেদিনের বিকেলের ছবিটা তার চোখের সামনে রয়েছে, মনে-মনে দেখছিল।

ট্যাক্সিটাও দাঁড়িয়ে পড়েছিল মোড়ের মাথায়। আবার চলতে শুরু করল সামান্য পরেই।

সুবীরদা পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করল, লাইটার। এগিয়ে দিল। "খাবি ?"

"না, তুমি খাও।"

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল সুবীরদা। বার কয়েক ধোঁয়া গিলল, তারপর বলল, "আমাদের একটা ভুল হয়েছিল। সেদিন ওই অবস্থায় গিধনিতে না দাঁড়ালেই হত। গিধনিতে পৌঁছে এমন এক ঝড়বৃষ্টির পাল্লায় পড়লাম— কী বলব তোকে। যেমন ঝড় তেমনই বৃষ্টি। আর জায়গাটাও একেবারে ফাঁকা। ঘরবাড়ি কম। স্টেশনে ইলেকট্রিক বাতি আছে, বাদবাকি কোথাও আলোফালো নেই, মানে ইলেকট্রিসিটি নেই। অবশ্য কমলেশ্বরবাবু আমাদের বলেই দিয়েছিলেন, তিনি কোল্ড স্টোরেজ করলে তাঁকে মাইল দুই দূর থেকে ইলেকট্রিসিটি নিতে হবে। তা গিধনিতে পৌঁছে আমাদের এমন অবস্থা হল যে, সন্ধের আগে আর বেরোতে পারলাম না। ও রকম ঝড়বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালানোই মুশকিল।"

আমি বললাম, "রাস্তা কেমন ?"

"রাস্তা খারাপ নয়। কিন্তু তুমুল বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালানো উচিত নয়। অ্যাকসিডেন্টের চান্স থাকে। তাছাড়া ভিজে রাস্তায় স্কিড করে যেতে পারে। আমাদের গাড়ির ব্রেকের গণ্ডগোল ঘটেছে আগেই। আমি কোনও রিস্‌ক্ নিলাম না। বৃষ্টি কমল, ঝড় প্রায় থেমে এল— সন্ধের মুখে-মুখে গিধনি ছাড়লাম। দুশ্চিন্তার কোনও কারণ ছিল না। ঘাটশিলা কাছেই, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে গেলেও বেশিক্ষণ লাগবে না।"

ট্যাক্সিটা ভবানীপুর এসে পড়েছিল। বোধহয় সিনেমা ভেঙেছে, পূর্ণ সিনেমার ভিড় দেখলাম। কাছাকাছি কোথাও বিয়েবাড়ি। সানাই বাজছিল।

সুবীরদা বলল, "গিধনি থেকে বেরোবার খানিকটা পরেই দেখলাম, মেঘ কেটে যাচ্ছে, মাঝে-মাঝেই পাতলা ঘোলাটে চাঁদের আলোও উঁকি দিচ্ছিল। আবার অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল। ঝড় থামলেও বাতাস ছিল, বেশ জোরে। আমরা পুরনো রাস্তা ধরেই যাচ্ছিলাম। বম্বে রোড ধরতে হলে উজিয়ে যেতে হবে অনেকটা। কপিল গাড়ি চালাচ্ছিল, আমি তার পাশে। পেছনে অনিল আর মৃগাঙ্ক। আমরা

কথাবার্তা বলছিলাম, গল্প করছিলাম। ঘাটশিলায় আমাদের বাড়ি ঠিক করা ছিল। স্টেশনের কাছেই। সত্যি বলতে কী, কলকাতা থেকে বেরোবার পর রাস্তার মধ্যে যদিও বার দুই ফেঁসে গিয়েছি, তবু আমরা তেমন একটা বিরক্ত হইনি, আমাদের তাড়াহুড়োও ছিল না, যাক না সারাটা দিন— এমন কী ক্ষতি হয়েছে!...তখন অবশ্য জানতাম না, আমাদের ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে।" সুবীরদা আবার চুপ করে গেল। ফেলে দিল সিগারেটটা। মাথার চুল ঘাঁটল। কেমন যেন অস্থির।

নিজেই আবার বলল সুবীরদা, "ঘাটশিলায় প্রায় পৌঁছে গিয়েছি। প্রায়। নীচে নদী— একটা ছোটখাট নদী মতন। ঝরনার জল বয়ে যায়। তার ওপর লম্বা কালভার্ট। ব্রিজই বলা যায়। আমাদের গাড়িটা কালভার্টের ওপর উঠেছে— হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল। ভাবলাম, গাড়ির আলো নিভে গেছে ; ফিউজ হয়ে গেছে। কিছু দেখা যাচ্ছিল না ; ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। কপিলকে চিৎকার করে বললাম, গাড়ি থামাও। ব্রিজ— সামনে ব্রিজ।...আমার কথা কপিল শুনতে পেল কি না জানি না। তারপর আর আমি কিছু জানি না। কী হল, কেন হল, আমরা কে কোথায় গেলাম, গাড়ির কী হল— আমার কিছুই জানা নেই।" বলতে বলতে সুবীরদা থামল। তার গলা কাঁপছিল, ভাঙা ভাঙা স্বর। মনে হল সুবীরদা কাঁদছে।

ট্যাক্সিতে বসেও আমার বুঝতে দেরি হল না, সুবীরদার হাত থরথর করে কাঁপছে, হয়ত কপালে গলায় ঘামও জমেছে। আমার বড় অবাক লাগছিল। একটা গাড়ি রাস্তার মধ্যে খারাপ হতে পারে, তার আলোও আচমকা নিবে যেতে পারে কোনও যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে, কিন্তু সুবীরদা কেন বলছে যে, তারপর কী হয়েছে, কিছুই সে জানে না ?

আমি বললাম, "তোমাদের গাড়ি কি ব্রিজ থেকে নীচে পড়ে গেল ?"

মাথা নাড়ল সুবীরদা। "জানি না। কিছুই জানি না।"

"তার মানে ?"

"মানে কেমন করে বলব !...তিন দিন পরে আবার আমি সেই কালভার্টের ওপর নিজেকে ফিরে পেলাম।"

"কী বলছ তুমি পাগলের মতন ?"

"পাগলের মতনই শোনাবে। কিন্তু কথাটা সত্যি। তিনদিন পরে আমি দেখলাম— কালভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। আশেপাশে কেউ নেই। নীচে নদী।"

আমার বিশ্বাস হল না। এ হতে পারে না, অসম্ভব। বললাম, "তুমি কেমন করে বুঝলে তিনদিন পরে আবার তুমি ব্রিজের ওপর এসে দাঁড়িয়ে আছ ?"

"বুঝিনি। প্রথমে বুঝিনি—" মাথা নাড়ল সুবীরদা। "আমি কিছুই বুঝিনি— কেমন একটা বেহুঁশ অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কোনও খেয়াল আমার ছিল না। কারও কথা আমার মনে আসেনি, অনিল, মৃগাঙ্ক, কপিলের কথা একবারও মাথায় আসেনি। কেমন একটা ঘোরে ছিলাম, সম্মোহনের মধ্যে। তখন সন্ধে।

একটা গাড়ি আসছিল লাইট জ্বেলে। আমায় একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গাড়ি থামিয়ে তুলে নিল। ঘাটশিলায় পৌঁছোনোমাত্র আমার সব মনে পড়ে গেল। যেখানে ওঠার কথা সেখানে ছুটে গেলাম। বাড়ির মালী বলল, কেউ আসেনি। গত তিনদিন ধরে সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ওই বাড়িতে গিয়েই প্রথম জানলাম, তিন-তিনটে দিন আমার কোথায় হারিয়ে গেছে। আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস হল না। ক্যালেন্ডার দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম লোককে ; সেই দিনটা ছিল চোদ্দ তারিখ, শনিবার। তোকে আগেই বলেছি আমরা বুধবার এগারো তারিখে কলকাতা ছেড়েছিলাম, আর দুটো দিন মাঝে রেখে, শনিবার আমি নিজেকে ঘাটশিলায় দেখলাম। এই তিনটে দিন কোথায় গেল ? কোথায় গেল আমার বন্ধুরা, অনিল, মৃগাঙ্ক ? কোথায় গেল কপিল, আমার ড্রাইভার ছেলেটি ? গাড়িটাই বা কোথায় ?" সুবীরদা দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। মাথা নাড়তে লাগল, যেন অসহ্য এক কষ্ট হচ্ছে তার।

আমার কিছু করার ছিল না। সামান্য শিউরে উঠলাম। বিশ্বাস হচ্ছে না বিন্দুমাত্র, অথচ সুবীরদা আমার কাছে অনর্গল মিথ্যে কথা বলছে— এটাই বা বিশ্বাস করি কেমন করে ! হতে পারে, অ্যাকসিডেন্টের পর সুবীরদার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শুনেছি অনেক সময় দুর্ঘটনায় পড়ে মাথায় চোট লেগে কিংবা আচমকা মানসিক আঘাতে মানুষ তার পুরনো কথা সব ভুলে যায়। সুবীরদার কি তাই হয়েছে ? ভুলভাল বকে যাচ্ছে !

আমি বললাম, "তুমি বলছ, চোদ্দ তারিখে তুমি ঘাটশিলায় গিয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ ; সন্ধের পর।"

"তার মানে সেদিন হয় চতুর্দশী না হয় পূর্ণিমা ছিল।"

"পূর্ণিমার মতনই ছিল— চাঁদের আলো ছিল খুব।"

"তারপর তুমি কী করলে ?"

"কী করব ! সেদিন আমি কিছু করতে পারলাম না। করার বুদ্ধিও মাথায় এল না। পরের দিন সকালে আমার খানিকটা চেনাজানা এক ভদ্রলোককে ধরে চললাম সেই নদীর কাছে।"

"ভদ্রলোককে কিছু বলোনি ?"

"বলেছিলাম। বিশ্বাস করেননি।" বলে সুবীরদা রুমাল বার করে কপাল গাল গলা মুছল। বলল, "আমার ভয় হচ্ছিল, গাড়িটা কালভার্টের ওপর থেকে পড়ে কিছু হয়েছে। হয়ত নদীতে অনিলদের দেখতে পাব, অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে, গাড়িটা ভেঙেচুরে তুবড়ে পড়ে রয়েছে।"

আমার কপালেও ঘাম জমছিল এবার।

"নদীতে কিছু নেই—" সুবীরদা বলল, "কালভার্টের ওপর থেকে দেখলাম, নীচে নেমে কত খোঁজাখুঁজি করলাম, কোথাও চিহ্ন নেই, অনিল, মৃগাঙ্ক, কপিল কারও নয়। জীপগাড়িটাও চোখে পড়ল না।"

"আশ্চর্য তো !...এমন তো হতে পারে— নদীতে পড়ে ভেসে গেছে ?"

"সেরকম মনে হতেই পারে। কিন্তু অক্টোবরের নদী। জল কম। আর নদীতে জলের চেয়ে পাথর আর বালিই বেশি। তিনটে মানুষ আর গাড়ি সবই ভেসে যাবে— কোনও চিহ্নই থাকবে না— এ কেমন করে হয়?"

কথাটা ঠিকই। কোনও-না-কোনও চিহ্ন তো থাকা উচিত।

সুবীরদা বলল, "আমি দু-দুটো দিন লোকজন এনে তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি— কিছু পাইনি। একটা রুমাল পর্যন্ত নয়, গাড়ির এক টুকরো ভাঙা লোহাও নয়। পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে সব।"

ট্যাক্সি এসপ্ল্যানেড ছাড়িয়ে গেল। তাকালাম রাস্তার দিকে, এখনও রাস্তায় ভিড়, গাড়িঘোড়া যথেষ্ট।

অন্যমনস্কভাবে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি থানা-পুলিশ করোনি?"

সুবীরদা বলল, "করেছি। ঘাটশিলা পুলিশ স্টেশনে গিয়েছিলাম। আমার কথা কানেই তুলতে চায় না, ভাবে পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। আমি ওদের কোনও দোষ দেখি না। সমস্ত ব্যাপারটা ভেলকিবাজির মতন। ম্যাজিক। বাস্তবিকই এ-রকম হবার নয়, হয় না। গাড়ি সমেত চারটে লোক হাওয়া হয়ে গেল, আবার একে-একে দুজন ফিরে এল— একথা কে বিশ্বাস করবে! খুব জোর-জবরদস্তি করে একটা ডায়েরি লিখিয়ে রেখেছি ঘাটশিলা থানায়।"

"তোমার বন্ধু অনিলবাবু মারা যাবার আগে, না পরে?"

"আগে লিখিয়েছি; আবার পরেও অনিলের কথা জানিয়ে এসেছি।" বলে সুবীরদা একটু থামল, তারপর বলল, "ঘাটশিলা পুলিশ স্টেশনের চৌধুরীজি এখন আমার খুব চেনা শোনা হয়ে গিয়েছেন। প্রথমটায় তিনি আমায় পাত্তা দিতে চাননি। ভেবেছিলেন— মাথা-পাগলা মানুষ, এখন আর অতটা ভাবেন না। তিনি নিজেও লোক দিয়ে খোঁজ-খবর করিয়েছেন, কোনও লাভ হয়নি।"

আমি রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। গণেশ অ্যাভিনুর মুখে লাল আলো পেয়ে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

"তুমি এখন কলকাতায় আছ? না, ঘাটশিলা ছুটছ?"

"ওদিকেই বেশি থাকি। আট-দশ দিন অন্তর কলকাতা আসি। দু-একদিন এখানে থাকি, কাজকর্ম কোনও রকমে একটু সারি, আবার চলে যাই।"

ট্যাক্সিটা আবার চলতে শুরু করল।

সুবীরদা বলল, "তুই একদিন আমার বাড়ি আয়। আসবি? কালই চলে আয়। আমায় যেভাবে পারিস একটু সাহায্য কর, ভাই! অন্তত পরামর্শ দে— আমি কী করব!" বলতে বলতে সুবীরদা আমার হাত জড়িয়ে ধরল।

৩

সুবীরদা আমার মাথাটাই যেন গণ্ডগোল করে দিয়েছিল। ওকে আমি ভাল করেই চিনি ; ধাপ্পা বা ধোঁকা দেবার লোক সুবীরদা নয়। অথচ ওর কথা বিশ্বাস করা যায় না, কেউ করবে না। আমিও বিশ্বাস করতে রাজি নই, কিন্তু লোকটার যে-রকম অবস্থা দেখলাম তাতে তাকে এড়িয়ে যাওয়াও উচিত নয়। যদি এমনই হয়, সুবীরদার সত্যি মাথার দোষ হয়েছে, তবে একটু ভাল করে খোঁজখবর করা দরকার বইকি ! আমার খারাপ লাগছিল, কষ্টও হচ্ছিল সুবীরদার জন্যে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে তার কথা ভাবতে-ভাবতে ঘুম আসছিল না, মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল। মাঝরাতের পর ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন সুবীরদার বাড়ি গেলাম। তার বাড়ির ঠিকানা আমার জানা ছিল, আগে বার কয়েক গিয়েছি। দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি থাকে।

সুবীরদা বাড়িতেই ছিল। আমায় দেখে খুশি হল। বলল, "তুই আসবি আমি জানতাম। আমার মন বলছিল।"

বললাম, "তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে, আগে আমি মাসিমার সঙ্গে দেখা করে আসি। তুমি তোমার ঘরে যাও।"

সুবীরদা আমার দিকে দু-পলক তাকিয়ে থেকে ম্লান হাসল। "বুঝেছি। বেশ, তুই মায়ের সঙ্গে দেখা করে আমার ঘরে আয়।"

মাসিমা ছিলেন রান্নাঘরের দিকে। হাঁক দিতেই বেরিয়ে এলেন।

"ও মা তুই ? জগু ?"

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। আদর করে কাছে টেনে নিলেন। "ধন্য ছেলে বাবা তোরা, চোখের আড়াল হলাম তো আর কোনও খোঁজ-খবর নিস না। বাড়ির খবর বল। কে কেমন আছে ? তোর মা, বাবা, ছেলেমেয়েরা ?"

বাড়ির খবরাখবর দিলাম। মাসিমাকে আমি খুঁটিয়ে দেখছিলাম কথা বলতে-বলতে। গোলগাল ভরাট মুখে হাসির ভাব থাকলেও কেমন শুকনো দেখাচ্ছিল। দু চোখে যেন দুশ্চিন্তা। কপাল কুঁচকে রয়েছে। মুখ খসখসে দেখাচ্ছিল।

শেষে আমি বললাম, "সুবীরদার সঙ্গে কাল হঠাৎ ট্রামে দেখা হয়েছিল।"

"বলেছে।" বলে মাসিমা গম্ভীর বিষণ্ণ হয়ে গেলেন।

সামান্য অপেক্ষা করে আমি বললাম, "সুবীরদাকে দেখে, তার কথাবার্তা শুনে আমার কেমন লাগল। ভাবনা হল। ভয়ও হল, মাসিমা। ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করলে কিছু জানতে পারব।"

আমার কথার কোনও জবাব সঙ্গে-সঙ্গে দিলেন না উনি। কিছু যেন ভাবছিলেন। কপালের ভাঁজ আরও ঘন হল। পরে বললেন, "আমার কাছে কী জানবে, বাবা ! আমি নিজেই কিছু বুঝছি না।"

যা বলতে চাইছিলাম তা স্পষ্ট করে বলা যায় না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বললাম, "না,

মানে আমি বলতে চাইছি, হঠাৎ কোনও ধাক্কা খেয়ে এলোমেলো কিছু বলছে না তো সুবীরদা ?...এমন তো অনেক সময় হয়, মাথায় কিছু একটা ঢুকে যায়, কিছুতেই ভুলতে পারে না ।”

মাসিমা অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, ‘কী জানি !”

“এমনিতে আপনার কী মনে হয় ? মানে— মানে একটু অস্বাভাবিক... ।”

“তুমি যেমন দেখছ বাবা— আজকাল এই রকমই দেখি । এমনিতে যে পালটে গেছে তা নয়, তবে ওর মনের অবস্থাটা যা, তাতে ছটফট করবে, দৌড়ে দৌড়ে বাইরে যাবে, আমি কী আর করতে পারি !”

মাসিমাকে আর ঘাঁটিয়ে লাভ নেই । বাড়িতে সুবীরদার ব্যবহার এমন কিছু নয় যা দেখে বলা যায় তার মাথা খারাপ হয়েছে । মাসিমার চেয়ে কে আর বেশি বুঝবে তাঁর ছেলেকে !

অন্য দু-চারটে কথা বললাম মাসিমার সঙ্গে, মামুলি কথা । তারপর সুবীরদার কাছে গেলাম ।

সুবীরদা নিজের বসার ঘরে বসে-বসে সিগারেট খাচ্ছিল । তাকাল । “আয়, বোস ।”

জানলার দিকে ছোট সোফায় আমি বসলাম ।

সুবীরদা নিজেই বলল, “মায়ের সঙ্গে কথা শেষ হল ?” বলে একটু হাসল, “কী বলল মা ?”

কোনও জবাব দিলাম না, হাসলাম ।

সুবীরদা বলল, “তোর এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা ? তোর কোনও দোষ নেই জগু, আমি যাদের বলেছি কেউ বিশ্বাস করেনি ।”

আমি বললাম, “তুমি কাকে কাকে বলেছ ?”

“তুই চিনবি না । যাদেরই বলেছি— সবাই ভেবেছি, আমি ভুল বকছি, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ।”

আমি চুপচাপ থাকলাম । ঘরটর দেখতে লাগলাম অন্যমনস্কভাবে । এসেছি সকাল-সকাল । দুপুরে মামারবাড়ি চলে যেতে পারি, কিংবা বাড়িতেও ফিরতে পারি, ঠিক নেই । সুবীরদার বসার ঘরটা ছোট, জিনিসপত্র কম কিন্তু এলোমেলো করে সাজানো বলে কেমন চাপ-চাপ লাগে ।

“তুমি একজন বড় ডাক্তারের কাছে যেতে পারতে...” আমি বললাম ।

“কেন ? ?” সুবীরদা জিজ্ঞেস করল ।

“না, আমি বলছি— মানে ভাবছিলাম”, ইতস্তত করে আমি বললাম, “তুমি যা ভাবছ কিংবা বলছ— এটা সত্যি নাও হতে পারে । তোমার ধারণা ভুল ।”

“ভুল ?”

“হতে পারে না ? রাঃ, এ-রকম তো হয় । আমাদের পাড়ার সেই সুশীলের মা'র কী হয়েছিল ? মেশিনে সেলাই করতে গিয়ে ছুঁচ ভেঙে যায়, ওঁর মনে হল ভাঙা ছুঁচটা ওঁর আঙুলের মধ্যে ঢুকে গেছে । আসলে ভাঙা ছুঁচটা কোথায় হারিয়ে

গিয়েছিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। সুশীলের মা তারপর থেকে বরাবরই বলতেন, ভাঙা ছুঁচটা ওঁর শরীরের মধ্যে রক্তের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত রকম ডাক্তার দেখানো হল, কোনও লাভ হয়নি। ওঁর ধারণা কেউ ভাঙতে পারল না। মনে নেই তোমার সুশীলের মাকে ?"

সুবীরদা বলল, "তুই বলতে চাস আমি একটা ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছি ?"

"থাকতেও তো পারো।"

"না," মাথা নাড়ল সুবীরদা। "আমি অনিলকে তা হলে কেন দেখব ? কেন সে আমার চোখের সামনে রেল-লাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ?"

"তুমি কোথায় অনিলকে দেখেছিলে ?"

"ঘাটশিলা স্টেশনের প্লাটফর্মে, একেবারে শেষ প্রান্তে।"

"সে কোন ট্রেনে কাটা পড়ে ?"

"মালগাড়িতে।"

"আর কেউ দেখেছিল ?"

"নিশ্চয়। তখন অবশ্য প্লাটফর্মে লোক কমছিল। তবু একটা লোক কাটা পড়তে দেখলে কে না হইচই করে !"

আমার সন্দেহ হচ্ছিল। বললাম, "তুমি কাল বলছিলে তোমার বন্ধু অনিল এমনভাবে কাটা পড়েছিল যে তাকে চেনা যাচ্ছিল না !"

"হ্যাঁ, একেবারে থেঁতলে গিয়েছিল, একটা হাত আর পা অন্যদিকে ছিটকে পড়েছিল।"

"তুমি মুখ দেখতে পেয়েছিলে ?"

"মুখের কিছু থাকলে তো দেখব !"

"তা হলে তুমি কেমন করে বুঝলে লোকটা তোমার বন্ধু অনিল ?"

সুবীরদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, যেন এ-রকম বোকার মতন কথা সে শোনেনি, আশাও করেননি শোনার। বিরক্ত হল বোধ হয়। বলল, "আমি বলছি অনিল।"

আমি চুপ করে গেলাম।

এমন সময় চা আর খাবার এল। মাসিমা পাঠিয়েছেন।

কিছুক্ষণ আমরা প্রসঙ্গটা আর তুললাম না। ইচ্ছে করেই। খাবার খেতে লাগলাম। মনে-মনে অবশ্য যে যার মতন ভারছিলাম, দু-একটা অন্য কথাও আসছিল। সাধারণ কথা।

সুবীরদা চা নিল। সিগারেট ধরাল।

আমিও একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

সুবীরদা বলল, "এখন বল, আমি কী করি ?"

আমি বললাম, "তুমি কী করতে চাও ?"

"আমি আর কী করতে পারি ! করার মধ্যে ঘাটশিলায় তন্ন-তন্ন করে খোঁজ করেছি। এখনও করি। পুলিশ স্টেশনেও খোঁজ খবর রাখে। এখনও। আর

আমি তো দেখছিস এই অবস্থায় রয়েছি। কাজকর্ম পুরোপুরি ফেলে রাখা যায় না, অথচ ইচ্ছেও করে না। ওই কলকাতায় এসে গোঁজামিল দিয়ে ঘাটশিলায় পালিয়ে যাই।" সুবীরদা বলল হতাশ গলায়।

"তুমি যখনই কলকাতায় আসো— মৃগাঙ্ক কপিলের বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর করে যাও ?"

"হ্যাঁ।"

"তাদের বাড়ির লোককে ঘটনাটা বলনি ?"

সুবীরদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক।

ইতস্তত করে বলল, "বলেছি। তবে তোর কাছে যতটা খোলাখুলি বললাম, ঠিক এভাবে বলিনি। বললে, বিশ্বাস করত না।"

আমি বললাম, "তুমি কীভাবে বলেছ ?"

সুবীরদা বলল, "বলেছি, ওরা আমার সঙ্গে ছিল। তারপর কোথায় গেছে আমি জানি না।" বলে একটু থেমে সুবীরদা আবার বলল, "আমি লালবাজারেও গিয়েছিলাম। আমার এক দূর সম্পর্কের ভগ্নীপতি লালবাজারে কাজ করেন। অফিসার। তাঁকে সব বলেছি। তিনি আমার কথা শুনে পাগল ঠাওরালেন। যাই হোক, একটা স্টেটমেন্ট লিখে দিয়ে এসেছি।"

চা খেতে-খেতে আমি জানলার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকলাম। মাথায় কিছু আসছিল না। ব্যাপারটা এমনই হেঁয়ালি, অবিশ্বাস্য যে, সুবীরদাকে ঠিক কীভাবে সাহায্য করা যায় তাও বুঝতে পারছিলাম না।

সুবীরদা হঠাৎ বলল, "ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়িয়েছে যে, আমাকে পুলিস কেসেও ফেলা যায়।"

অবাক হয়ে তাকালাম। "কেন ?"

"কেন নয়! আমরা চারজনে একসঙ্গে কলকাতা থেকে বেরিয়েছিলাম। মাঝপথে তিনজন হাওয়া হয়ে গেল। আমি ফিরে এলাম। এই তিনজন কোথায় গেল, তাদের কী হল— আমার জানার কথা। এমন তো হতে পারে, আমি তাদের খুন করেছি, করে এসে বলছি— ওরা কোথায় হারিয়ে গেছে...।"

আমি চমকে উঠলাম। কথাটা আমার মাথায় আসেনি। অবশ্য সুবীরদা খুন করবে— এটা এমনই অবিশ্বাস্য যে, কথাটা মাথায় আসার কারণ নেই। এখন, সুবীরদার কথার পর মনে হল, কেউ যদি শয়তানি করে এটা প্রমাণ করতে চায়, সুবীরদা বন্ধুদের খুন এবং গুম করে এসে এখন ন্যাকামি করছে— তবে সুবীরদাকে নিশ্চয় ঝঞ্ঝাটে ফেলতে পারে। কিন্তু সুবীরদা খুন করবে কেন ? তার উদ্দেশ্য কী ? এক বন্ধু তার ব্যবসার পার্টনার ছিল— ব্যবসায়িক কোনও গোলমালের জন্যে কিংবা কোনও মতলবে সেই বন্ধুকে খুন করতে চেয়েছিল সুবীরদা এটা যদি কাগজ-কলমে ধরাও যায়— তবু অন্যদের খুন করার কোনও কারণ থাকতে পারে না।

নিজের মনেই মাথা নাড়লাম আমি। অসম্ভব। খুন করার কথা ওঠে না।

আইন কিংবা পুলিশ যাই বলুক, যতই সন্দেহ করুক আমি বিশ্বাস করি না সুবীরদা তার বন্ধুদের খুন করার কথা স্বপ্নেও ভেবেছে !

"তোমায় কি কেউ খুনের কথা বলেছে ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম ।

মাথা নাড়ল সুবীরদা । "না, কেউ বলেনি । তবে পাঁচ রকম কথার মধ্যে একবার আমার সেই পুলিস আত্মীয় ঠাট্টা করে বলেছিলেন কথাটা ।"

"অন্য কেউ বলেনি তো ?"

"না, এখন পর্যন্ত নয় । বলেনি, কিন্তু মানুষের মন, কত রকম সন্দেহই হতে পারে ।"

চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল আমার । বাইরের দিকে তাকিয়ে মনে হল, বেলাও হয়েছে অনেকটা । অভ্যেস মতন ঘড়ি দেখলাম । মাত্র ন'টা বেজে আঠারো মিনিট । অসম্ভব, আমি ন'টা নাগাদ বাড়ি থেকেই বেরিয়েছিলাম । ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছে ।

"ক'টা বাজল, সুবীরদা ?"

সুবীরদা তার ঘড়ি দেখল । "এগারোটা বত্রিশ মতন ।"

ঘড়িটা খুলে নিয়ে দম দিতে লাগলাম । সেকেণ্ডের কাঁটা লাফিয়ে-লাফিয়ে চলতে লাগল । আমার এই এক দোষ, সময় মতন ঘড়িতে দম দেবার খেয়াল থাকে না । প্রায়ই দেখেছি ঘড়ি বন্ধ হয়ে থাকে । মাঝে-মাঝে বেশ লজ্জায় পড়ি ।

সময় মিলিয়ে নিলাম । ঘড়িটা হাতে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল । হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ল । খুবই বোকার মতন চিন্তা ; তবু মাথায় এল আচমকা । আচ্ছা, এই যে ঘড়ি— যেটা আমার হাতে বাঁধা রয়েছে, যে ঘড়ি আজ সকাল ন'টা আঠারো মিনিট পর্যন্ত বেশ চলছিল, তারপর আমার অজান্তে কখন থেমে গেছে । দু ঘণ্টারও বেশি সময় সেটা থেমেই ছিল, সেই ন'টা আঠারো বেজে । আবার এখন আমার খেয়াল হবার পর, এগারোটা বত্রিশ থেকে চলতে শুরু করল । অবশ্য দম দেবার পর । কিন্তু দু ঘণ্টারও বেশি আমার ঘড়ি চলেনি, তার কাঁটা ঘোরেনি ; যে সময়টা চলে গেল সেটা ধরে রাখেনি । কোনও সন্দেহ নেই, ঘড়ি একটা যন্ত্র এবং দম না থাকায় সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু এমন কি হতে পারে না, মানুষের জীবনেও এ-রকম ঘটে ? হঠাৎ কোনও কারণে তার স্মৃতি, চেতনা, বোধ, অনুভূতি সমস্ত হারিয়ে যায় ?

যায় ? না যায় না ? যেতে পারে, কি পারে না ? বড়মামার অসুখের যখন খুব বাড়াবাড়ি, তখন একদিন প্রায় একটা রাত মামার কোনও হুঁশ ছিল না । আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম । মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়লেও শুনেছি তার কোনও খেয়াল থাকে না । আমাদের অফিসের এক বন্ধু— বিজন একবার স্কুটার অ্যাকসিডেণ্ট করেছিল, সঙ্গে তার ভাইঝি ছিল— বাচ্চা ভাইঝি, অ্যাকসিডেণ্টের পর বিজনকে কাছাকাছি একটা দোকানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়, হাত পা ছড়ে যাওয়া আর কপালে সামান্য কেটে যাওয়া ছাড়া তার বিশেষ কোনও চোট লাগেনি । কিন্তু বিজন অন্তত আধ ঘণ্টা কিছুই খেয়াল করতে পারেনি, তার

ভাইঝির কথাও বিজনের মনে পড়েনি। এখনও বিজন মনে করতে পারে না, কেমন করে তার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, কারা তাকে তুলে ধরেছিল, তার ভাইঝি কোথায় ছিল তখন ?

সুবীরদার কথায় আমার হুঁশ এল। তাকালাম।

"তুই এখানেই থেকে যা দুপুরটা—" সুবীরদা বলল, "স্নান-খাওয়া কর। একেবারে সন্ধেবেলা ফিরিস !"

"বাড়িতে কিছু বলে আসিনি।"

"ফোন করে দে।"

"আমি থেকেই বা কী করব !"

"থাক না। কতদিন পরে এলি। একটা কিছু পরামর্শ দে।"

"কী পরামর্শ দেব, সুবীরদা ! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সত্যি বলতে কী, সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে মিস্টিরিয়াস মনে হচ্ছে। তবে, আমি তোমার কথা আর অবিশ্বাস করতে পারছি না। কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে। হয়তো তোমারই কিছু হয়েছে। তোমার সঙ্গীদের যাই হয়ে থাকুক, তোমার খেয়াল নেই।"

সুবীরদা বলল, "কী হবে তাদের ?"

"জানি না।"

"তুই কি মনে করিস— তাদের কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে ?"

"কেমন করে বলব। তবে, আমার ধারণা, যা ঘটেছে তখন— সেদিন— তোমার কিছু মনে নেই। অনিলের ব্যাপারটা তোমার মনগড়া। অনিলকে তুমি দ্যাখোনি।"

সুবীরদা আমার দিকে স্থির চোখে চেয়ে থাকল।

৪

রবিবার সারাটা দিনই প্রায় সুবীরদার সঙ্গে কেটে গেল। ছাড়তে চায় না আমাকে। আমি তার কোনও উপকারেই আসছিলাম না, আসতে পারব বলেও মনে হচ্ছিল না, তবু আমায় আটকে রাখল সুবীরদা। আসলে তার মনের মধ্যে যত অশান্তি, ভয়, দুশ্চিন্তা— সব আমার কাছে বলে যেন খানিকটা স্বস্তি পাচ্ছিল।

বিকেলের পর আমি বললাম, "এবার উঠি। পরে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

"কোথায় যাবি এখন ?"

"ভাবছি একবার টালিগঞ্জ ঘুরে যাই।"

"মামারবাড়ি যাবি ?"

"যাই।"

কী ভেবে সুবীরদা বলল, "একটু দাঁড়া, আমিও বেরোব।"

"তুমি কোথায় যাবে ?"

"নিউ আলিপুর।"

"সেখানে কে থাকে ?"

"আমার উকিল বন্ধু। দেখা করার জন্যে খবর দিয়েছে, একবার ঘুরে আসি।"

খানিকটা পরে আমরা বেরোলাম। রাস্তায় এসে সুবীরদা বলল, "পরশু দিন আমি ঘাটশিলায় যাচ্ছি। যাবি ?"

"আমি গিয়ে কী করব !"

"চল না, ঘুরে আসবি। শনিবার ফিরে আসব।"

আমার অফিস, বড়মামাও পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। যাবার অসুবিধে ছিল। বললাম সুবীরদাকে। সুবীরদা গ্রাহ্য করল না। "দু-তিনটে দিন তুই ছুটি নিতে পারিস।"

রাজি হয়ে গেলাম। বললাম, "বেশ, যাব।" বলেই একটু হেসে ফেললাম। "আমি কিন্তু হাওয়া হয়ে যেতে রাজি নই। ট্রেনে যাব।"

সুবীরদাও ম্লান মুখে হাসল। সে নিজেও ট্রেনে যায়। তার গাড়ি তো কবেই উবে গেছে।

"কাল একবার রাত্রের দিকে আমার বাড়িতে ফোন করবি। পরশু আমরা বম্বে এক্সপ্রেসে যেতে পারি। ইস্পাত এক্সপ্রেসে যেতে চাস যদি— তাও যাওয়া যায়। তবে ভোরবেলায় গাড়ি।"

"কাল কথা বলব।"

সুবীরদা একটা ট্যাক্সি ধরল। আমায় ভবানী সিনেমার কাছে নামিয়ে দিয়ে ও নিউ আলিপুরের দিকে চলে যাবে।

মামারবাড়িতে এসে দেখি, রবিবার বলে অনেকেই এসেছে। বাড়ি ভর্তি লোক। মামাও বেশ ভালই আছেন।

আমার এক মেসোমশাই আছেন যাঁকে আমরা আড়ালে 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' বলি। কেন বলি তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। আসলে বড়রাই তাঁর এই নামটা দিয়েছিলেন— যেমন আমার মামারা। বাবাও তাঁর ভায়রাভাইকে ঠাট্টা করে 'ট্রেজার আইল্যান্ড' বলতেন। সুকুমার মেসোমশাই মানুষটি কিন্তু চমৎকার। একটু খ্যাপাটে। পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন, নানা জায়গায় ঘুরেছেন। এখন কলকাতায়। চাকরি থেকে ছুটি পেয়েছেন বছর দুয়েক।

সুকুমার মেসোমশাইয়ের কাছে কারও মুখ খোলার উপায় ছিল না। কিছু বললেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কোনও-না-কোনও অভিজ্ঞতার কথা সাল তারিখ সমেত বর্ণনা করতে শুরু করতেন। অর্থাৎ যে যাই বলুক— তার চেয়ে মজাদার, উদ্ভট কিছু তিনি না শুনিয়ে ছাড়তেন না। সংসারের যাবতীয় ব্যাপারে তাঁর এই পরম অভিজ্ঞতা অন্যদের চমৎকৃত করত। আনন্দও দিত। যে মানুষটির জীবনে এত রকম অভিজ্ঞতা রয়েছে তিনি তো কম নন। হয়ত এইসব কারণেই তাঁর একটা ঘরোয়া, মজাদার নামকরণ হয়ে গিয়েছিল 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড'। মেসোমশাই

সেটা জানতেন, শুনতেন, মজা পেতেন ; বলতেন ঠাট্টা করে, "আছে হে আছে, আমার সিন্দুকে অনেক ট্রেজার আছে ; তোমরা কলকাতার বাবু— এসব বুঝবে না।"

সুকুমার মেসোমশাইকে আমার খুব পছন্দ হত। তিনি আমাকে যেন অবাক করে দিতেন কথায় কথায়, তেমনই আবার হাসাতেও পারতেন।

আমার হঠাৎ খেয়াল হল, সুকুমার মেসোমশাইকে একবার জিজ্ঞেস করলে হয় কথাটা। তিনি তো অনেক খোঁজ-খবর রাখেন, এমন কোনও খবর রাখেন কিনা যেখানে মানুষ এবং গাড়ি বাতাসে মিলিয়ে যেতে দেখেছেন বা শুনেছেন!

সুকুমার মেসোমশাইকে একটু আলাদা করে টেনে এনে আমি বললাম, "মেসোমশাই, আমার একটা সাঙ্ঘাতিক কথা আছে। আপনাকে শুনতে হবে।"

"বলে ফেলো, শুনছি।"

"ও পাশটায় চলুন। বসি।"

দোতলার বারান্দার এক পাশে চেয়ার-টেয়ার পড়ে ছিল। আমরা বসলাম। বাতি জ্বলছিল হাত কয়েক দূরে।

মেসোমশাই সর্বক্ষণ চুরুট খান। তিনি চুরুট টানতে লাগলেন।

আমি সুবীরদার নামধাম বললাম না। বাকি প্রায় সবটাই তাঁকে শোনালাম, সুবীরদার কাছে যা শুনেছি।

মেসোমশাই মাঝে-মাঝে দু-একটা কথা বললেও অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে আমার কথা শুনছিলেন। তাঁর আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠছিল। চুরুট নিবে যাচ্ছিল বারবার।

আমার কথা শেষ হবার পর মেসোমশাই কিছুক্ষণ কোনও কথাই বললেন না। বার কয়েক বড় বড় নিশ্বাস ফেললেন। একেবারে চুপচাপ। দোহারা চেহারার মানুষ, লম্বা ছাঁদের মুখ। মাথার চুল কাঁচা-পাকা। চোখে চশমা।

মেসোমশাইকে চুপচাপ দেখে মনে হল, এইবার তিনি জব্দ হয়েছেন, আমার ওপর টেক্কা দেবার মতন কোনও গল্প তাঁর পুঁজিতে নেই।

আরও খানিকটা পরে মেসোমশাই মুখ খুললেন। বললেন, "এ-রকম ঘটনার কথা আর একটা মাত্র শুনেছি। নিজে কখনও চোখে দেখিনি। কিন্তু শুনেছি।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "শুনেছেন ?"

মেসোমশাই বললেন, "শুনেছি। আমার বড়দার মুখে। আমার বড়দা রেলের কনস্ট্রাকশানে চাকরি করতেন। সে তো অনেক কালের কথা। কর্ড লাইন কনস্ট্রাকশানের সময় কোডারমার কাছে একটা খোলা মালগাড়ি হারিয়ে যায়। তখন খোলা মালগাড়ির মাথায় তেরপল চাপিয়ে রেল লাইনে কাজ করার জন্যে কুলিদের নিয়ে যাওয়া হত। যেখানে কাজ হচ্ছে, তারই আশেপাশে বসত কুলি লাইন। ছাউনি পড়ত, কুলিটুলি থাকত, কাজকর্ম করত, থাকত ছাউনিতেই। একবার একটা খোলা মালগাড়ি হারিয়ে যায়। অবশ্য তাতে কোনও কুলি ছিল না।"

আমি বললাম, "কেমন করে হারাল কেউ বলতে পারেনি ?"

"না। রেলের লাইন থেকে অত ভারী, বেশ কয়েক টন ওজনের মালগাড়ি হারিয়ে গেল কেমন করে তার কোনও হদিশ করা যায়নি। ও-রকম একটা ঘটনার পর কুলি-ছাউনিতেও কেউ থাকতে চাইল না ভয়ে। পালাতে লাগল। রেল কোম্পানি ফাঁপরে পড়েছিল খুব।"

"ভৌতিক ব্যাপার !"

"আমার কিন্তু অন্য রকম মনে হয়।"

আমি তাকিয়ে থাকলাম।

মেসোমশাই একটু চুপ করে থেকে বার দুই টান দিলেন চুরুটে, ধোঁয়া বোধহয় মুখে এল না। উনি বললেন, "ব্যাপারটা ভৌতিক নয়, রহস্যময়। তুমি কি জানো জগদীশ, গত একশো বছরে এই পৃথিবীর নানা জায়গায় এমন সব ঘটনা ঘটেছে যার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি ! কারও খুঁজে বার করা সম্ভব হয়নি। এশিয়া এবং য়ুরোপের নানা জায়গায় কখনও-কখনও আচমকা কিছু ছিটকে এসে পড়েছে শূন্য থেকে। তার সবই উল্কাপাত নয়। আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে এমন কিছু কিছু আশ্চর্য জিনিস আচমকা কোনও জায়গায় চোখে পড়েছে যাকে আমরা ঠিক ধূমকেতুও বলতে পারি না।"

আমি অবাক হচ্ছিলাম। বললাম, "আপনি কি বলতে চাইছেন—"

হাত উঠিয়ে আমায় থামতে বলে সুকুমার মেসোমশাই বললেন, "শোনো। আমার কথাটা আগে শুনে নাও। সাল-তারিখ আমার কিছু মনে নেই, তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানদের এক মিলিটারি হাসপাতাল থেকে জনা চারেক হাত-কাটা পা-কাটা সৈন্য চুরি হয়ে যায়। এমন জায়গা থেকে চুরি হয়েছিল, যেখানে শত্রুপক্ষের লোক কোনওভাবেই ঢুকতে পারে না। জাপানের সমুদ্র থেকে গাছ ধরার জাহাজ উধাওয়ের খবরও পড়েছি কাগজে। গ্রীনল্যান্ডে একটা তেকোণা অদ্ভুত কী জিনিস এসে পড়েছিল একবার, তারপর সেটা আবার অদৃশ্য হয়ে যায়।"

"ফ্লাইং সসারস ?"

"হতে পারে, কেমন করে বলব। তবে, তুমি নিশ্চয় শুনেছ, এই যে এত জাহাজ সারা পৃথিবীতে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে— এদের মধ্যে কেউ কেউ কখনও কখনও অদ্ভুত এক সাংকেতিক বার্তা তাদের জাহাজের রেডিও-ঘরে শুনতে পেয়েছে। তারা কোনও অর্থ ধরতে পারেনি। ১৯২৫ সালে ভারত মহাসাগরে একটা ইটালিয়ান জাহাজে এরকম এক সাংকেতিক বার্তা শোনা গিয়েছিল।"

"হতে পারে", আমি বললাম, "মাঝে-মাঝে কাগজে এ রকম খবর তো পড়াই যায়।"

সুকুমার মেসোমশাই বললেন, "ব্যাপারটা নিয়ে নানা জনের নানা মত। কেউ কেউ মনে করেন, ও-সব বানানো গল্প। কেউ কেউ মনে করেন, অন্য কোনও গ্রহের জীব হাওয়া খেতে বেরিয়ে পৃথিবীর লোকের সঙ্গে একটু তামাশা করে

গেছে।"

আমি নিশ্বাস ফেলে বললাম, "গ্রহান্তরের মানুষ!" বলে হাসলাম।

মেসোমশাই বললেন, "মানুষ নয়। মানুষ বোলো না। মানুষ তো পৃথিবীর জীবন। গ্রহান্তরের প্রাণী বলতে পারো।"

"আপনি এইসব আজগুবি গল্প বিশ্বাস করেন?"

মেসোমশাই এবার চুরুটটা ধরালেন। ধোঁয়া টানলেন বার কয়েক। তারপর বললেন "আমার বিশ্বাসে কিছু আসে যায় না। কিন্তু জগদীশবাবু, তুমি আমার একটা কথার জবাব দাও তো। তুমি নিশ্চয় জানো, এখন এই পৃথিবীর মানুষ চাঁদে নেমে চাঁদের খবরাখবর জেনে আসছে, তার মাটিও নিয়ে আসছে। ঠিক তো?"

"তা ঠিক। তবে চাঁদের মাটি বলাটা ঠিক নয়।"

"ওই একই হল। সোজা বাংলা মাটিই ধরে নাও...। তা তোমরা যদি আজ চাঁদে নেমে মাটি তুলে আনতে পারো, তবে অন্য গ্রহের জীব তোমাদের এই পৃথিবী থেকে কিছু নিয়ে যেতে পারে না স্যামপল্ হিসেবে?" বলে মেশোমশাই মুচকি হাসলেন।

আমি বললাম, "অন্য গ্রহে জীব আছে এটা তো প্রমাণ হয়নি?"

"প্রমাণ এখন পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু প্রমাণ হয়নি বলে তুমি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারো না। আমরা অন্য গ্রহ সম্পর্কে কতটুক জানতে পেরেছি! কেউ জোর করে এ-কথা বলতে পারে না যে, পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনও গ্রহে জীব নেই।"

আমি বললাম, "জীবনের— মানে জীবজগৎ সৃষ্টি হবে এমন আবহাওয়া কিংবা উপাদান যদি না থাকে তাহলে কেমন করে হবে?"

মেসোমশাই বললেন, "কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। তবে আমার কথা যদি ধরো— আমি তোমার কথাটা মানতে পারব না। অনেকে বলেন, আমাদের পৃথিবীর জীব-জগৎই বলো আর প্রাণী-জগৎই বলো, সবই তার পারিপার্শ্বিক থেকে গড়ে উঠেছে। মানে— যাকে কিনা বলে এনভায়রনমেণ্ট— আমরা সেই এনভায়রনমেণ্ট থেকে গড়ে উঠেছি। আমরা মানুষ— ডাঙা ছাড়া আমাদের চলে না, মাছ হয়ে জন্মালে ডাঙাটাই আমাদের কাছে অচল হত, আমরা চাইতাম জল। ...অন্য গ্রহের জীবরা, ধরে নাও যদি থেকে থাকে, তারা আমাদের পরিবেশে নেই, নিজেদের পরিবেশের মধ্যেই রয়েছে। পরিবেশকে খাপ খাইয়েই তাদের জীবন। তাদের কাছে তাদের জগৎটাই খাশা জায়গা। কোনও অসুবিধেই বোধ করে না। তাদের বেঁচে থাকার প্রসেসটাই আলাদা।"

মেসোমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলার ধৈর্য আর আমার থাকল না। বলতে এলাম এক কথা, আর তিনি কোথায় উদ্ভট গল্পে চলে গেলেন। অবশ্য সুকুমার মেসোমশাই এই রকমই। এক জায়গায় শুরু করলে অন্য জায়গায় টেনে নিয়ে যান। তবে অন্য সময় তাঁর কথায়-বার্তায়-গল্পে একটা মজার ভাব থাকে, আজ কিন্তু সে রকম কিছু ছিল না। তিনি যেন রীতিমতো বিশ্বাসই করে নিয়েছেন যে, অন্য গ্রহেও জীব থাকতে পারে।

গুরুজন মানুষ, তা ছাড়া লোকটি বড় চমৎকার, ওঁকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। বললাম, "আপনি যা বলছেন তা বিশ্বাস করা মুশকিল। তবে একেবারে অসম্ভব হয়ত নয়। যাকগে, আমি বাড়ি ফিরব। সকালে বেরিয়েছি। আপনি আরও কিছুক্ষণ থাকবেন নাকি ?"

মেসোমশাই ঘাড় হেলিয়ে বললেন, "আমার খানিকটা দেরি হবে যেতে। তুমি বরং এসো।"

আমি উঠে পড়লাম।

মেসোমশাই বললেন, "তোমায় একটা কথা বলি জগদীশ। এটা আমার নিজের ধারণা। আমাদের জ্ঞান-ট্যান যা বলে তার চেয়েও এই জগৎ বলো পৃথিবী বলো অনেক জটিল ; রহস্যময়। পৃথিবীটা যে গোল এটাই মানুষ জানতে শিখেছে সেদিন। আমরা এখন পর্যন্ত যা জেনেছি তার চেয়েও না-জানাই বেশি রয়ে গেছে পৃথিবীতে। এই জগতের কোথায় কী ঘটছে তার খোঁজ রাখাই দায়, কেন ঘটছে তা বলা আরও মুশকিল। তুমি কি জানো, কেন প্রতি বছর একবার করে কোথাও-না-কোথাও বিরাট এক ভূমিকম্প হয় ? বছরে শ'খানেক ছোট-বড় ভূমিকম্পের মধ্যে এ হল সবচেয়ে বিরাট। কেন হয় ?"

আমি কোনও জবাব দিলাম না। দেবার কিছু ছিল না আমার। তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে নীচে নেমে এলাম।

নীচে তখন বসার ঘরে জোর আড্ডা জমেছে। মামাতো মাসতুতো ভাইবোনেরা হইহই করছিল। বাড়ির মধ্যে এতদিন যে থমথমে, অসুখ-অসুখ ভাবটা ছিল, তা কেটে যাওয়ায় সবাই খুশি, নিশ্চিন্ত।

আমার মামাতো ভাই নিখিল একটা টেপ রেকর্ডার মেশিন জুটিয়ে এনেছে কার কাছ থেকে, এর ওর গান, কথা, হাসি রেকর্ড করছিল, আর বাজিয়ে শোনাচ্ছিল। তাই নিয়ে হুল্লোড় জমেছে।

ওদের হাত এড়িয়ে আমি পালিয়ে এলাম বাইরে।

ফেরার সময় ট্রামে আমি মেসোমশাইয়ের কথাগুলোই ভাবছিলাম।

আজগুবি ধরনের গল্পটল্প আমি দু-চারটে না পড়েছি এমন নয়। সিনেমাও দেখেছি এক আধটা। কিন্তু গল্প গল্পই, সেটা বিশ্বাস করার কোনও মানে হয় না। অন্য কোনও অজানা গ্রহ থেকে মানুষ— না মানুষ নয়—কোনও প্রাণী এসে এ পৃথিবীতে নামে, এখানকার হালচাল দেখে যায়, খোঁজখবর করে যায় আমাদের, এ-সব কথা গল্প হিসেবে পড়তে ভালই লাগে, তা বলে এমন ঘটনা সত্যি কি ঘটে ?

আমার মনে হল না, ঘটে। মেসোমশাই যাই বলুন, আমি কথাটা বিশ্বাস করি না। অন্য কোনও গ্রহের জীবদের কাজ নেই, সুবীরদাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে এসেছিল ? আসবেই যদি তবে তার কোনও চিহ্ন থাকবে না ? আর ধরেও বা যদি নিয়ে যায়, তবে আবার সুবীরদাকে ফেরত দিয়ে যাবে কেন ? কেনই বা অনিলবাবু ফেরত আসবে ? গ্রহান্তরের জীবদের তামাশাটা মন্দ নয়। ছেলেধরার মতন ধরে নিয়ে যায় এই পৃথিবীর মানুষদের। আবার ভালয়-ভালয় ফেরতও দিয়ে যায়।

হয়তো মৃগাঙ্কবাবু আর কপিল ড্রাইভার—মায় গাড়ি সমেত ফেরত আসবে।
হাসি পাচ্ছিল আমার। হেসে ফেললাম।
"টিকিট ?"
ঘাড় ফিরিয়ে দেখি ট্রামের কন্ডাক্টর। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন হাসি দেখছে আমার। ভাবছে আমি বুঝি কোনও পাগল-ছাগল।
বিব্রত বোধ করে পয়সার জন্যে পকেটে হাত ঢোকালাম। পকেট ফাঁকা। মানিব্যাগ যে কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে জানি না।

৫

পরের দিন সুবীরদাকে বাড়িতে ফোন করলাম।
সুবীরদাই ফোন ধরল। "জগু ?"
"তুমি কাল যাচ্ছ তো ?"
"হ্যাঁ। কেন ?"
"এমনি জিজ্ঞেস করলাম। আমি অফিসে ছুটি নিয়েছি।"
"বেশ করেছিস। কাল বম্বে এক্সপ্রেসেই যাব। তুই সোজা হাওড়া স্টেশনে চলে আসবি।"
"কখন ?"
"একটা দেড়টা নাগাদ আয়। সকালে ইস্পাত এক্সপ্রেস ছিল। হবে না। বম্বে এক্সপ্রেসই ভাল।"
"ঠিক আছে, চলে আসব।...কিছু নিতে হবে ?"
"জামাকাপড় ছাড়া কিছু নয়।"
একটু চুপ করে থেকে হেসে বললাম, "কাল আমার পকেটমার হয়ে গিয়েছিল— বুঝলে, সুবীরদা। এই প্রথম, না। দ্বিতীয়বার বলতে পারো।"
"সে কী রে !"
"কেমন করে হল কে জানে ! অন্যমনস্ক ছিলাম খুব।"
"বাড়ি ফিরলি কেমন করে ?"
"কিছু খুচরো পকেটে ছিল ; টাকাখানেক মতন।"
সুবীরদা হাসল।
আমি বললাম, "হেসো না, তোমার জন্যে এই লোকসান। কী যে এক বিদঘুটে জিনিস মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছ !" বলে একটু থেমে হঠাৎ বললাম, "কাল আমার এক মেসোমশাই আমাকে একটা থিয়োরি শোনাল। ভেরি ইন্টারেস্টিং।"
"থিয়োরি ! কীসের থিয়োরি ?"
আমি হালকা গলায় বললাম, "তোমাদের কি অন্য কেউ ধরে নিয়ে গিয়েছিল ?"
"ধরে নিয়ে... ! কারা ?"
"অন্য কোনও গ্রহের জীবন !" বলে আমি হাসলাম। ঠাট্টার সুরে বললাম,

"মঙ্গল-টঙ্গল থেকে কোনও স্পেস-শিপ এসেছিল কিনা ভেবে দেখ।"

সুবীরদা আমার কথার কোনও জবাবই দিল না কিছুক্ষণ, তারপর বলল, "তোর মেসোমশাই এ-কথা বলেছেন! আশ্চর্য! আমারও মাঝে-মাঝে এ-রকম মনে হয়েছে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "তোমারও মনে হয়েছে! অদ্ভুত ব্যাপার!"

"না না, আমার সেভাবে কিছু মনে হয়নি। তবে কথাটা ভাবতে-ভাবতে যখন কোনও কারণই খুঁজে পাই না, তখন ওই রকম একটা অসম্ভব ব্যাপার মনে হয়, এই আর কি!...যাক গে, এসব কথা পরে হবে। আমি একজনের জন্যে বসে আছি। তাঁর আসার কথা।"

"ঠিক আছে, কাল আমি সময় মতন হাওড়া স্টেশনে হাজির হচ্ছি। এখন শীত কেমন ঘাটশিলায়?"

"বেশ শীত।"

ফোন রেখে দিলাম।

আমাদের বাড়িটা পুরনো। সংসারটাও ছোট নয়। আজকাল জায়গার টানাটানি চলছে। তেতলার উপর যে দেড়খানা ঘর, তার একটা আমার ভাগে পড়েছে। বাকি অর্ধেকটা দখল করেছে আমাদের নিত্যদা। বাবার আমলের মানুষ। বাবার ধারণা, নিত্যদা ছাড়া তাকে কেউ দেখে না। বুড়ো মানুষদের মাথায় কত যে উদ্ভট ধারণা জন্মায় আমার বাবাকে দেখেই বুঝতে পারি।

দোতলায় ফোন সেরে তেতলায় নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। আজ আর কোথাও বেরোবার নেই। কাল সকালে উঠে জামা-প্যান্ট গুছিয়ে নেব। তারপর সোজা হাওড়া স্টেশন।

বাড়িতে ঘাটশিলার কথা বলেছি। মানে, মাকে বলেছি, দিন চারেকের জন্যে ঘাটশিলায় বেড়াতে যাচ্ছি।

বিছানায় শুয়ে আরাম করে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর এ-কথা সে-কথা ভাবতে গিয়ে সুবীরদার কথাই আবার ভাবতে লাগলাম।

খুব ভাল করে ভাবলে আমার মনে হয়, সুবীরদার ব্যাপারটার সঙ্গে গ্রহে-ট্রহের কোনও সম্পর্ক নেই। গ্রহান্তরের জীবন এই পৃথিবীতে আসে এমন মনে করার কোনও কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

সমস্ত ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখলে কী দেখব? দেখব যে, মাত্র একটি কারণেই এ-রকম হতে পারে। সুবীরদা যা যা বলছে তা যদি সত্যি হয়, তবে সেদিন নিশ্চয় গাড়িটা অ্যাকসিডেন্ট করেছিল। যে-কোনও কারণেই হোক, নিতান্ত কপাল-জোরে সুবীরদা বেঁচে গেলেও তার মাথায় এমন কোনও জায়গায় চোট লেগেছে যে, সে অনেক কিছু ভুলে গিয়েছে। তার মনে পড়ছে না, গাড়িটার সমস্ত আলো হঠাৎ নিভে যাবার পর কী হয়েছিল! এ-রকম বিস্মৃতি, সাময়িক বিস্মৃতি ঘটতে পারে মানুষের। অসম্ভব নয়।

অন্যদের তা হলে কী হল ?

আমার মনে হয়, অন্যরা জীপ অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

যদি তাই হয়, তবে অন্যদের কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না। কেন ? গাড়িটাই বা কোথায় গেল ?

এ-প্রশ্নের জবাব এখন আমার মাথায় আসছে না। জায়গাটা দেখতে হবে। যদি এমন হয় আশে-পাশে অনেক ঝোপ-জঙ্গল রয়েছে, নদীতে জল রয়েছে, তোড়ও আছে— তা হলে ধরে নিতে হবে, সুবীরদার বন্ধুরা আর গাড়ি হয় ভেসে গেছে, না হয় এমন এক জায়গায় পড়ে আছে যা চোখে ধরা যাচ্ছে না।

কিন্তু সুবীরদা বলছে, তন্ন তন্ন করে সব খোঁজা হয়েছে।

আমার বিশ্বাস খোঁজা হয়নি। খুঁজতে হবে।

তা হলে অনিলের রেল-লাইনের ওপর ঝাঁপ খাওয়া ?

ওটা সুবীরদার কল্পনা। অনিলের মতন কেউ হয়তো ঝাঁপ খেয়েছিল—অনিল নয়, সুবীরদা ধরে নিচ্ছে অনিলই ঝাঁপ খেয়েছে। চোখের ভ্রম এবং মতির ভ্রম।

যদি আমার এই ধারণা মিথ্যে হয়, তা হলে বলতে হবে, সুবীরদার পুরো গল্পটাই বানানো। সে তার বন্ধুদের খুন করেছে, গাড়িটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, তারপর নিজের দোষ চাপা দেবার জন্যে মনগড়া গল্প বলছে, পাগল-পাগল ভান করে দিন কাটাচ্ছে।

কিন্তু আমি সুবীরদাকে কখনওই এত নৃশংস, হীন, শয়তান ভাবি না। কাজেই খুনটুনের কথা ওঠে না।

সিগারেট কখন শেষ হয়ে গিয়েছিল। মাথাটাও ধরা-ধরা লাগল। উদ্ভট চিন্তা আর ভাল লাগছিল না। উঠে বসে কী করব কী করব ভাবতে গিয়ে হঠাৎ আমার ট্রানজিস্টারের দিকে চোখ পড়ল।

ট্রানজিস্টারটা চালিয়ে দিয়ে বিছানায় এনে রাখলাম।

গান হচ্ছিল। শ্যামাসঙ্গীত।

ভাল লাগছিল না। বন্ধ করে দিলাম।

বন্ধ করে শুয়ে আছি, হঠাৎ আমার সাধারণ একটা কথা মনে পড়ল। তারপরই মনে পড়ে গেল কালকের টেপ রেকর্ডারের কথা।

এমন-কিছু চমকে যাবার মতন ঘটনা নয়, এখন তো সবই জল-ভাতের মতন সহজ সাধারণ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আগে কি মানুষ জানত, না বিশ্বাস করত, তার মুখের কথা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া যায় পৃথিবীর ? সে কি ভাবতে পারত, যে কথাটা বলল এখন, কিংবা যে গান গাইল— সেটা খুব সহজেই ধরে রাখা যায়— মাসের পর মাস বছরের পর বছর ! একদিন মানুষ এ-সব জানত না, বিশ্বাসও করত না। ভাবত, মুখের কথা মুখেই ফুরিয়ে যায়, হারিয়ে যায় বাতাসে। আজ আর সে কথা ভাবে না। বরং তার কাছে রেকর্ড, রেডিয়ো, টেপ রেকর্ডার— কোনওটাই আর অবাক হবার মতন জিনিস নয়, গ্রাহ্যও করে না— ভাবতেও চায় না কেমন করে এত আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে !

এই জগতে এটাই সবচেয়ে মজার। প্রথম কিছু ঘটে যখন, তখন সারা পৃথিবী তোলপাড় হয়ে যায়, তারপর মানুষ ধরে নেয়, এ আর নতুন কী, অবাক হবারই বা আছে কী তেমন ? মাত্র সেদিন মানুষ একটা কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে দিল শূন্যে, পৃথিবীর চারপাশে পাক খেতে লাগল উপগ্রহটা। তাবৎ দুনিয়া পাগল হয়ে উঠল, রই-রই লেগে গেল। এখন উপগ্রহ, রকেট, চাঁদে নামা—এসব আর মানুষকে মোটেই অবাক করে দিচ্ছে না, সবাই ভাবছে ব্যাপারটা স্বাভাবিক।

প্রথম ধাক্কাটা সয়ে গেলে সবই স্বাভাবিক। গত কালকের কোন কাগজে যেন বেরিয়েছে নিউট্রন বোমা এমনই অদ্ভুত বোমা যা মানুষ মারবে— অথচ ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট প্রায় কিছুই নষ্ট করবে না। অর্থাৎ এবার যদি কখনও যুদ্ধ লাগে, শহর-টহর ধ্বংস না করে শুধু মানুষ আর প্রাণীটানি মেরে দিব্যি দেশটেশ দখল করা যাবে। আশ্চর্য !

যদি এত রকম ঘটনা এই পৃথিবীতে ঘটতে পারে, তবে মেসোমশাই যা বলেছেন তাও না ঘটার কী আছে ? মানুষকে নিমেষে অদৃশ্য করার যন্ত্রও তো আবিষ্কার করা সম্ভব। এই পৃথিবীতে সম্ভব। আবার হতেও পারে, অন্য গ্রহ থেকে কোনও জীবটিব এসেছিল, এসে মানুষ চুরি করে পালিয়েছে।

আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল। আর ভাবতে পারলাম না।

৬

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেখি সুবীরদা বুকস্টলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার পায়ের কাছে একটা বড়সড় স্যুটকেস। আমার দিকে চোখ পড়তেই হাত তুলল।

কাছে গিয়ে বললাম, "কতক্ষণ এসেছ ?"

"মিনিট দশ।" বলে আমার কাঁধে-ঝোলানো ক্যামেরার দিকে তাকাল। "ক্যামেরাও নিয়েছিস ?"

"নিয়ে নিলাম। ভাবলাম, বেড়াতেই যাচ্ছি যখন সঙ্গে থাক। তোমার ঘাটশিলা শুনেছি ভাল জায়গা, ছবিটবি তোলা যাবে।"

সুবীরদা একটু হাসি-হাসি মুখ করল।

আমার সঙ্গে জিনিসপত্র বেশি ছিল না, ফোম লেদারের একটা ব্যাগ আর এক মিলিটারি কম্বল, গায়ে চাপালে ছাল-চামড়া উঠে আসে। নেহাত দায়ে পড়ে নিয়েছিলাম কম্বলটা। মা যা বকবক শুরু করল, না নিয়ে উপায় ছিল না।

বললাম, "টিকিট হয়েছে ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে আর দাঁড়িয়ে কেন ! চলো, প্ল্যাটফর্মে যাই।"

সুবীরদা অন্য দিকে তাকিয়ে, মানুষজন যেদিক দিয়ে আসছে। যেন কাউকে খুঁজছে। বলল, "একটু দাঁড়া, আরও একজনের আসার কথা আছে।"

বুঝতে পারলাম না। "আবার কে ?"

"তালুকদারসাহেব। বিশ্বরঞ্জন তালুকদার।"

"তিনি আবার কে ?"

"কমল— আমার সেই নিউ আলিপুরের উকিল বন্ধু— তার বড় শালা।"

ঠিক বুঝতে পারলাম না। গতকাল ফোনে যখন কথা হয়েছিল তখনও সুবীরদা বলেনি সঙ্গে অন্য লোক থাকবে। বললাম, "তালুকদারসাহেবও কি এমনি বেড়াতে যাচ্ছেন, না তুমি নিয়ে যাচ্ছ ?"

সুবীরদা সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "উনি নিজেই যাচ্ছেন। ব্যাপারটা কী হল জানিস ? কমল তার বড় শালা তালুকদারসাহেবের কাছে আমার ব্যাপারটা বলেছিল। শুনে ভদ্রলোক নিজেই নাকি যেতে চাইলেন।"

"ও।"

"না না, আমি ওঁকে বলিনি। উনি নিজেই গরজ করে যেতে চাইলেন। কাল সন্ধের পর আমার বাড়িতে এসেছিলেন। তোর ফোন পাবার পর এসেছিলেন।"

"কী করেন ভদ্রলোক ?"

"কলকাতার লোক নন। নাগপুরের দিকে থাকেন। পারিবারিক কাজে কলকাতায় এসেছিলেন। খিদিরপুরে ওঁদের বাড়ি, ভাইটাই আছে।"

আমিও তাকিয়ে থাকলাম ভিড়ের দিকে। কে যে তালুকদারসাহেব, চিনি না। তবু বড় ঘড়িটার দিক থেকে যারা আসছিল তাদের দেখতে লাগলাম।

সুবীরদা বলল, "তুই টেরাটোলজিস্ট মানে জানিস ?"

"কী ? টেরা—, কী বললে তুমি ?"

"টেরাটোলজিস্ট। তাই তো শুনলাম।"

"না। লাইফে ও-সব শুনিনি। এ-সব বিদঘুটে শব্দ তুমি কোথায় পাও ?"

"আমি কেন পাব, তালুকদারসাহেব নিজেই বললেন, তিনি টেরাটোলজিস্ট।"

বলতে যাচ্ছিলাম, "তোমার তালুকদারসাহেব নিশ্চয় ছিটোলজিস্ট", এমন সময় দেখলাম সুবীরদা হাত তুলে যেন কাকে ডাকছে।

তাকিয়ে দেখি, লম্বা দোহারা চেহারার এক ভদ্রলোক। গায়ের রঙ কালো, চোখা নাক, চোখ ছোট-ছোট, থুতনির কাছে বাহারি দাড়ি। পরনে চেককাটা টুইডের কোট, গোটা চারেক পকেট, ছাই রঙের প্যান্ট। তাঁর পেছনে একটা কুলি, স্যুটকেস বেডিং বয়ে নিয়ে আসছে।

তালুকদারসাহেবকে দেখেই আমার মনে হল, ভদ্রলোকের পোশাকই শুধু নয়, চেহারাটাও যেন বাইরের ছাঁটকাটে তৈরি।

সুবীরদা ডাকল। "এই যে—এখানে।"

তালুকদার দেখতে পেয়েছিলেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক মুছতে-মুছতে সামনে এসে দাঁড়ালেন। "আমি লেট্ করলাম। ট্যাক্সি পাওয়া একটা প্রবলেম।"

সুবীরদা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল তালুকদারসাহেবের। তারপরই বলল, "চলুন আমরা যাই। ট্রেন ইন্ করে গেছে।"

আমারও মনে হল, আর দেরি করা উচিত নয়।

গাড়িতে আমাদের বসার অসুবিধে হল না। বরং বলতে পারি, খানিকটা আরামেই বসতে পারলাম।

আমি আর সুবীরদা মুখোমুখি। সুবীরদার পাশে তালুকদারসাহেব।

গাড়ি ছাড়ল।

তালুকদারকে আমি ভাল করে লক্ষ করে দেখলাম, ভদ্রলোকের চোখ দুটি ঠিক ছোট নয় কিন্তু উনি বড় করে চোখ খুলতে পারেন না, পাতা দুটো যেন প্রায় বুজে থাকে। তা ছাড়া অনবরতই চোখে জল আসে ভদ্রলোকের। চোখে এবং নাকে। রুমালে নাক-চোখ মোছা যেন তাঁর এক মুদ্রাদোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না তালুকদারের বয়েস কত হতে পারে। আমাদের চেয়ে বয়েসে তিনি বড় ; তবে অনেক বড় বলে মনে হল না। চল্লিশের বেশি বলে মনে হয় না। মাথার চুল কোঁকড়ানো, ছোট-ছোট, কালো। গলার স্বর খানিকটা মোটা। তেমন কিছু গম্ভীর মানুষও নন।

গাড়িতে আমরা গুছিয়ে বসার পর তালুকদারই কমলালেবু খাওয়ালেন আমাদের। কমলালেবুর পর কফি। ফ্লাস্কে করে কফি এনেছিলেন তালুকদার, কাগজের গ্লাসও ছিল সঙ্গে। কফি খেতে-খেতে মজার-মজার গল্প করছিলেন।

আমাদের আশেপাশে বাঙালি যাত্রী দু-চার জন ছিলেন ; অবাঙালিই বেশি। গাড়ি ভালই ছুটছিল। আমরাও গল্পগুজব করছিলাম। সাধারণ কথাবার্তা। তালুকদার কেমন করে ট্রেন থামিয়ে একবার অগ্নিকাণ্ড থেকে বেঁচেছিলেন সেই গল্প বললেন, ঘটনাটা ঘটেছিল পারাসিয়ার দিকে, ছোট লাইনে।

আমি তালুকদারকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি বরাবর নাগপুরেই আছেন ?"

মাথা নাড়লেন তালুকদার। "না না, বরাবর থাকব কেন, বছর দুই রয়েছি। এবার বোধ হয় সাউথে কোথাও পাঠিয়ে দেবে।"

"আগে কোথায় ছিলেন ?"

"বম্বে। তার আগে সিমলা। সিমলায় আসার আগে নেপাল বর্ডারে ছিলাম কিছুদিন।"

"কলকাতা ছেড়েছেন কতকাল ?"

"ছাড়ব কেন ! কলকাতাকে কি ছাড়া যায় মশাই ? ছুটিছাটা পেলেই বাড়িতে পালিয়ে আসি। তবে সাত-আটটা বছর বাইরে-বাইরেই কাটছে বলতে পারেন।"

আমার লজ্জা করছিল। উনি আমায় বারবার আপনি করে কথা বলছেন। আগেও একবার বলেছি, আবার বললাম, "আপনি আমায় আপনি-আপনি করবেন না।"

তালুকদার হাসলেন। "বেশ।"

সুবীরদা বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, "খড়্গপুর চলে এল প্রায়।"

বাইরে বিকেল পড়ে যাচ্ছিল। শীতের শেষ দুপুর। রোদ মরে যাচ্ছে

তাড়াতাড়ি। মাঠের ওপর পাতলা ধুলোর রঙ ধরে আছে। দূরে— যেখানে আকাশ নিচু হয়ে মাঠে নেমেছে, এক আধটা ছোটখাট গ্রাম হয়ত, কিংবা জঙ্গল। দূরে তাকালে গাছপালার মধ্যে ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাব চোখে পড়ে।

তালুকদারসাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ মোটামুটি জমে গেছে ভেবে আমি এবার বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, টেরাটোলজিস্ট মানে কী ?"

তালুকদার আমার দিকে আধ-বোজা চোখে তাকালেন। বোধ হয় মজা পেলেন। তাঁর হাতে রুমাল ছিল। নাক মুছলেন, "কেন ?"

"শুনলাম আপনি টেরাটোলজিস্ট ! সুবীরদা বলছিল।"

তালুকদার সুবীরদার দিকে তাকালেন। তারপর আমার দিকে। বললেন, "টেরাটোলজিস্ট বলতে অনেক রকম মানেই বোঝাতে পারে। তবে চলতি কথায় আমরা তাদেরই টেরাটোলজিস্ট বলি, যারা ম্যালফরমেশানস ইন প্ল্যান্ট অ্যান্ড অ্যানিমাল নিয়ে কাজকর্ম করে। সোজা কথায়, মানুষ কিংবা গাছপালার বেলায় দেখবে, কখনও-কখনও স্বাভাবিক চেহারার বদলে তারা অদ্ভুত অস্বাভাবিক এক চেহারা পায়। জন্ম থেকেই। যেমন ধরো, একটা বাচ্চা জন্মাল— তার তিনটে কান, দেড়খানা নাক, কিংবা অন্য কোনও অ্যাবনরম্যাল গ্রোথ রয়েছে, বা ধরো একটা ছাগলের বাচ্চার দুটো মাথা। এই সব অস্বাভাবিকতা নিয়ে যারা গবেষণা করে, তাদের বলে টেরাটোলজিস্ট। শুধু প্রাণীর বেলায় নয়, গাছপালার ব্যাপারেও এটা চোখে পড়ে।"

মানেটা বোঝবার চেষ্টা করছিলাম। সুবীরদাও চুপ করে শুনছিল।

তালুকদার বললেন, "আমি ঠিক ওই জাতের টেরাটোলজিস্ট নই। আজকাল সব ব্যাপারেই ভাগাভাগি হয়ে গেছে জানো তো ! যে ডাক্তার চোখ দেখে সে নাক দেখে না, যে তোমার পেটের অসুখ দেখবে সে কিন্তু মাথার গোলমাল দেখবে না"—বলে তালুকদার একটু হাসলেন, মজা করার হাসি। তারপর বললেন, "আমার ব্যাপারটা গাছপালা নিয়ে। কোনও-কোনও গাছপালা তার জাত আর ধাত বদলে ফেলে। যেমন ধরো একটা বেলগাছ যদি নিমগাছের মতন হয়ে যায়, কেমন লাগে ! সেই রকম দেখা গেছে কোনও কোনও গাছ এমন একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড করে ফেলে যার কোনও মাথামুণ্ডু নেই। কখনও কখনও এদের মধ্যে জন্তু-জানোয়ারের মতন হিংস্রতাও দেখা যায়। অদ্ভুত ব্যাপার...অদ্ভুত...।"

আমি সুবীরদার দিকে তাকালাম। সুবীরদাও আমার দিকে তাকাল বোকার মতন, যেন বলল— কী বুঝছিস ?

তালুকদার বললেন, "ব্যাপারটা তোমরা ঠিক বুঝবে না।"

"আপনি কি এই ব্যাপারে রিসার্চ করেন ?"

"হাতে কলমে ঠিক নয়," তালুকদার বললেন, "আমাদের সোসাইটির নাম হল, গ্লেডস বায়োলজিকাল অবজারভেশান সোসাইটি। সুইডেনে সোসাইটির খাস অফিস। এখন পর্যন্ত আমাদের এখানে তেমন কিছু কাজকর্ম হয়নি। আমরা মাত্র জনা তিনেক আছি এখানে। বাঙালি আমি একলা।"

তালুকদারসাহেবকে আমার বেশ অদ্ভুত লাগছিল।

আর খানিকটা পরেই গাড়ি খড়্গপুর পৌঁছে গেল।

ট্রেনে চাপলে সময় যেন কাটতে চায় না আমার। বিরক্তি লাগে।

এবার কিন্তু লাগছিল না। তালুকদারসাহেব বাক্যবাগীশ নন, তবে নানা কথা বলতে পারেন। হাসি-তামাটাও জানেন। সুবীরদাও কথা বলছিল।

বিকেল ফুরিয়ে গিয়েছিল কখন। সন্ধে হয়ে এল।

ঝাড়গ্রাম স্টেশনে গাড়ি একটু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। বোধহয় কোনও গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল এঞ্জিনে।

গাড়ি ছাড়ার পর আবার গল্পগুজব চলতে লাগল।

কথায় কথায় আমি তালুকদারসাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, আপনি কি সুবীরদার ব্যাপারটা শুনেছেন ?"

মাথা হেলালেন তালুকদার। শুনেছেন।

"আপনার কী মনে হয় ?"

"এখনও কিছু মনে হচ্ছে না। জায়গাটা আগে দেখি।"

"জায়গাটায় আর কী থাকতে পারে !" আমি বললাম, "নদী পাথর, বালি...আমিও অবশ্য দেখিনি।"

"গাছপালা !"

"গাছপালা ?"

তালুকদার পকেট থেকে পাউচ বার করলেন, সিগারেটের পাতা। পাউচ থেকে তামাক বার করে হাতের তালুতে রাখলেন।

"কোনও রকম গাছপালা—" তালুকদার বললেন, "নেই তা তো হতে পারে না। আছে। সুবীর বলেছে, আছে। বড় বড় গাছ। ঘন জঙ্গলের মতো হয়ে আছে কোনও কোনও জায়গা।"

"তাতে কী ?"

"তাতে কিছু নয়। তবে মন্‌স্টার প্ল্যান্ট বলে একটা চলতি কথা আছে— আমরা বলি। আমি ভাবছি সেই রকম কোনও গাছ-পালা আছে কি না ! দে আর রিয়েল মন্‌স্টারস।"

আমি কিছুই বুঝলাম না। বোকার মতই তাকিয়ে থাকলাম।

৭

ঘাটশিলায় পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সাড়ে আটটা বাজল। বেশ শীত। কনকন করছিল। শুনলাম সকালে এক পশলা শীতের বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাত্রে অবশ্য আকাশ পরিষ্কার, তারা দেখা যাচ্ছিল।

বাড়িটা স্টেশনের কাছেই। রিকশায় মিনিট দশেকেরও কম হবে। স্কুলের কাছাকাছি।

ছোট বাংলো ধরনের বাড়ি। সামনে খানিকটা বাগান। পেছনে কুয়ো। ইলেকট্রিক রয়েছে। আর আছে করালী— বাড়ির সমস্ত কিছু দেখাশোনা করে।

সুবীরদা এই বাড়িতে আসা-যাওয়া করছে বেশ কিছুদিন। বলতে গেলে সেই পুজোর পর থেকেই, কাজেই অব্যবস্থার কিছু ছিল না।

শোবার ঘর, বসার ঘর সবই গোছগাছ করা ছিল। চিঠি লেখা ছিল করালীকে, খাবারদাবারও তৈরি ছিল আমাদের।

শোবার ঘরের একটা তালুকদারসাহেবকে দেওয়া হল। অন্য ঘরটায় সুবীরদা আর আমি।

চা খেয়ে জামাকাপড় ছেড়ে নিলাম। হাত মুখ ধুয়ে সামান্য বিশ্রাম। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে যে যার শোবার ঘরে এসে বসলাম।

সুবীরদা আর আমি সিগারেট খেতে খেতে সাধারণ কথাবার্তা বলছিলাম। এই বাড়িটার কথাই বলছিল সুবীরদা। বাড়ির যিনি মালিক তিনি মারা গেছেন বছর দুই। সুবীরদার ভগ্নীপতির দাদা বাড়িটা কিনে নিয়েছিলেন। শ্রীরামপুরে থাকেন ভদ্রলোক। নিজে এক-আধবার আসেন, বছরের বাকি সময়টা ফাঁকা পড়ে থাকে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বেশির ভাগ সময় এখানে এসে থেকে যায়। সুবীরদা আগেও এসেছে এ-বাড়িতে— বোন-ভগ্নীপতির সঙ্গে।

আমি বললাম, "তুমি তা হলে বাড়িটা এখনও নিয়ে রেখেছ ?"

"নিয়ে রাখা আর কী ! বলা আছে বিভূতিকে।" বিভূতি সুবীরদার ভগ্নীপতির নাম।

সিগারেট শেষ করে আমি শুয়ে পড়লাম। কলকাতার বাবু শীতে মানুষ, এখানকার ঠাণ্ডা গায়ে লাগছিল বেশ।

সুবীরদা এখনও শোয়নি।

গায়ে মিলিটারি কম্বল চাপিয়ে আমি বললাম, "আচ্ছা, সুবীরদা, আমি একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। তালুকদারসাহেব ব্যাপারটাকে আরও যেন গুলিয়ে দিচ্ছেন ! কী বলতে চান উনি ?"

সুবীরদা তার খাটে মশারি টাঙাচ্ছিল। বলল, "আমারও তোর মতন গুলিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি না।"

"উনি বলছেন, মন্‌স্টার প্ল্যান্ট ! মানেটা কী ? আর প্ল্যান্টের সঙ্গে সম্পর্কই বা কী তোমার ব্যাপারটার ?"

চুপ করে থেকে সুবীরদা বলল, "তালুকদারই জানেন।"

"তবু, তোমার কিছু মনে হয় না ?"

"আমার মনে হচ্ছে, উনি বলতে চাইছেন, এমন কোনও গাছগাছালি আছে যারা কোনও অঘটন ঘটিয়েছে।"

"তার মানে— তোমার বন্ধুদের গিলে খেয়েছে ! মায় গাড়িটাকেও ?" বলে আমি হেসে ফেললাম। "তালুকদারসাহেবের মাথায় এটা কোথা থেকে এল ? এ তো সেরেফ গাঁজাখুরি !"

সুবীরদার মশারি টাঙানো হয়ে গিয়েছিল। বাতি নেবাল। তারপর অন্ধকারে এসে শুয়ে পড়ল। সুবীরদার বিছানা হাত কয়েক দূরে। আমার এবং তার মশারির মধ্যে দিয়ে অন্ধকারে কিছুই দেখার কথা নয়, তবু আমি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলাম।

খানিকটা পরে সুবীরদা বলল, "মানুষ-খেকো গাছপালার কথা গল্পের বইয়ে আমি পড়েছি। তবে সে তো গল্প!"

"তা ছাড়া কী! পোকা-মাকড় কীট-পতঙ্গদের গাছপালা খায়। খেতেও পারে। তা বলে মানুষ খাবে— এ হতেই পারে না। অসম্ভব! তাও তিন-তিনটে জ্যান্ত মানুষ, তার আগে একটা জীপ! এ বাবা রাক্ষসের কর্ম নয়। তা ছাড়া, ধরলাম— রাক্ষুসে কোনও গাছ ওদের গিলে ফেলেছে। উত্তম কথা! কিন্তু তা যদি হয়, তোমার বন্ধু অনিল তা হলে আবার গাছের পেট থেকে বেরিয়ে এল কেমন করে? বলো?"

সুবীরদা কোনও জবাব দিল না। বলার কিছু নেই।

আমি বললাম, "তালুকদারমশাই লোক ভাল, বুঝলে সুবীরদা! তবে তাঁর থিয়োরি অচল। অসম্ভব।"

"উনি এখন পর্যন্ত কোনও থিয়োরি দেননি," সুবীরদা বলল।

"তা ঠিক। তবে ওঁর থিয়োরি আমরা অনুমান করতে পারছি। এর বেশি উনি কী বলবেন?"

জবাব নেই সুবীরদার।

আমিও চুপচাপ।

কিছুক্ষণ এই ভাবে কেটে গেল। কোনও সাড়া নেই, শব্দ নেই। আমরা যে যার বিছানায় শুয়ে, যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

শেষে আমি বললাম, "এর চেয়ে আমার মেসোমশাইয়ের থিয়োরিটা অনেক বিশ্বাসযোগ্য। আমি বরং মানতে রাজি আছি, গ্রহান্তরের কোনও জীবটিব এসে চিলের মতন ছোঁ মেরে তোমাদের নিয়ে গিয়েছিল! কিন্তু তালুকদারসাহেবের মন্‌স্টার প্ল্যান্ট থিয়োরি মানতে বাপু আমি রাজি নই।"

সুবীরদা মৃদু গলায় বলল, "কোনওটাই মানা যায় না, বিশ্বাসও করা যায় না। কিন্তু যা ঘটেছে তার কোনও ব্যাখ্যাও তো পাচ্ছি না। আমি ভাই ব্যাখ্যাও চাই না। শুধু চাই ওরা ফিরে আসুক। ভগবান ওদের ফেরত দিলেই আমি খুশি। তবে অনিলের মতন যেন না হয়।"

আমার মনে হল, সুবীরদা যা বলেছে সেটাই ঠিক। যারা হারিয়ে গেছে তাদের ফিরে পাওয়াই বড় কথা। ব্যাখ্যা নিয়ে কে মাথা ঘামাতে চায়! ব্যাখ্যা না পেলেও সুবীরদার চলে যাবে, কিন্তু তার বন্ধুরা, ড্রাইভার, ওরা যদি না আসে তবে সুবীরদা নিশ্চয় পাগল হয়ে যাবে একদিন। বেচারি সুবীরদা!

ঘুম পাচ্ছিল। কম্বলটা প্রায় নাক পর্যন্ত টেনে নিতে নিতে আমি বললাম, "সুবীরদা, আমার বিশ্বাস তুমি একটা ব্যাপার ভুল করছ আগাগোড়া।"

"কী ?"

"তোমার বন্ধু অনিলকে সত্যিই তুমি দ্যাখোনি।"

"কে বলল! আমি দেখেছি!"

"তুমি নিশ্চয় ভুল দেখেছ! তোমার এখন মাথার ঠিক নেই। তুমি পেছন থেকে অনিলের মতন কাউকে দেখেছ! ভেবেছ, অনিল। অনিল রেল-লাইনে কাটা পড়ার পর তুমি তার মুখও দেখোনি। তুমি বলছ দেখার মতন অবস্থা ছিল না মুখের। তা হলে কেন তুমি বলছ, অনিলকে দেখেছ। ওটা তোমার দৃষ্টিবিভ্রম।"

সুবীরদা কথা বলল না প্রথমে, পরে চাপা গলায় বলল, "তাই যেন হয়।" বলে বড় করে নিশ্বাস ফেলল।

পরের দিন সকালে আমরা বাইরে বসে চা জলখাবার খাচ্ছিলাম। রাত্রে ঠিক বোঝা যায়নি, সকালে জায়গাটা বড় সুন্দর লাগছিল। সামনে পিচ বাঁধানো রাস্তা, ওই রাস্তা দিয়ে নাকি টাটানগর যাওয়া যায়। সামান্য দূরে একটা সাজানো-গোছানো ছোট পাহাড় আছে। ফুলডুংরি। রোদ উঠে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। আকাশও যেন ঘুম ভেঙে উঠে চোখমুখ পরিষ্কার করে মাথার ওপর বসে আছে। পাখিটাখি উড়ে যাচ্ছিল। বাড়ির বাগানে সামান্য কিছু শীতের ফুল। একরাশ বড়-বড় গাঁদা ফুটে আছে একপাশে।

তালুকদারই প্রথমে উঠলেন, বললেন, "আর দেরি করে লাভ নেই, চলো বেরিয়ে পড়া যাক।"

আমরাও মোটামুটি তৈরি ছিলাম।

সামান্য পরে তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। তালুকদার একটা ব্যাগ নিলেন—এয়ার-ব্যাগ। সুবীরদার কাঁধে ফ্লাস্ক, চা আর জলের। আমি ক্যামেরাটা গলায় ঝুলিয়ে নিলাম।

হেঁটে এলাম খানিকটা। রেল লাইনের ক্রসিং ছাড়াবার আগেই চোখে পড়ল, ঘাটশিলায় চেঞ্জারবাবু বড় কম আসেনি। সবই বোধহয় কলকাতার লোক। সাজপোশাকে সেই রকম শহুরে দেখাচ্ছিল। বুড়োবুড়ি, ছেলেমেয়ে, সবরকম লোকই আছে।

স্টেশনের কাছাকাছি এসে রিকশা নেওয়া হল।

তালুকদার বললেন, "রিকশাগুলো আটকে রেখে লাভ হবে না, সুবীর। ওদের বরং আমরা ছেড়ে দেব।"

আমাদের কেউ লক্ষ করল কিনা জানি না। যদি করেও থাকে কলকাতার লোক বলেই ভেবেছে; ভেবেছে আমরা হাওয়া খেতে এসেছি।

স্টেশনের পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা। আমি লক্ষ করে দেখেছি, মফস্বলের কোনও ছোটখাট শহরই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। বিশেষ করে শহরের পুরনো রাস্তা। দু পাশে ছোটখাট দোকান, মামুলি ঘরবাড়ি, নোংরা, ধুলো, এক-আধটা মন্দির গোছের, কিছু ভাঙা রিকশা, একপাল কুকুর—এইসব।

রাস্তাটা আমার ভাল লাগছিল না। ধুলো আর ময়লার জন্যে আরও খারাপ

লাগছিল বোধহয়।

পথ কম নয়। শেষে খানিকটা ফাঁকায় আসা গেল।

তালুকদার রিকশা থামিয়ে নামলেন। আমরাও নেমে পড়লাম।

রিকশাঅলাদের তিনিই পয়সা মিটিয়ে দিলেন। বকশিস করলেন। তারপর ঘড়ি দেখে বললেন ঘণ্টা তিনেক পরে এখানে আবার ফিরে আসতে। দু তরফের ভাড়াই না হয় দেওয়া যাবে।

রিকশাঅলারা চলে গেল। তালুকদারসাহেবের চেহারা, সাজপোশাক দেখে তাদের কী মনে হয়েছিল জানি না। হয়তো শাঁসালো মক্কেল ভেবেছিল।

আমরা তিনজনে হাঁটতে লাগলাম।

সুবীরদা হাত উঠিয়ে একটা দিক দেখাল। বলল, "রাজবাড়ি ওই দিকটায়।"

আমরা তাকালাম।

তালুকদার বললেন, "রাজবাড়ি পরে দেখা যাবে। আগে আসল জায়গায় চলো।"

রোদটা চমৎকার লাগছিল। এমন শীতে এই রোদ কেনই বা ভাল লাগবে না! ঘিঞ্জি নোংরা ভাবটাও আর নেই। রাস্তা চওড়া নয়, কিন্তু ভালই। আশেপাশে জনবসতি ফাঁকা হয়ে এসেছে। এক আধটা খোলার ঘর, ভাঙাচোরা চালা। তালুকদারসাহেব চারদিকে তাকাতে তাকাতে পথ হাঁটছিলেন। হঠাৎ একটা সিগারেট চেয়ে বসলেন আমার কাছে। প্যাকেটের সিগারেট তিনি তেমন পছন্দ করেন না ; তবু কী মনে করে চাইলেন।

আমি সিগারেট দিলাম। ধরিয়ে নিলেন তালুকদার। একটা বেয়াড়া লরি আসছিল। বোধহয় কাঠ-চালানের লরি। গাছের গুঁড়ি চাপানো রয়েছে।

লরিটা চলে যাবার পর তালুকদার বললেন, "এখানে কোনও গাড়িটাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না ?"

সুবীরদা বলল, "না।"

"ধরলে-করলেও নয় ?"

"দু-একজন কনট্রাকটার আছেন। তাঁদের বললে যদি দেন।"

"একবার চেষ্টা করে দ্যাখো।"

আমি বললাম, "গাড়ি নিয়ে আপনি কী করবেন ?"

"কেন! তুমি কি ভাবছ, একবার এসে চোখের দেখা দেখে গেলেই সব বুঝে যাবে! জায়গাটা ভাল করে দেখতে হলে বার কয়েক আসতে হবে, ভাই।"

আমাকে বোধহয় ঠাট্টাই করলেন তালুকদার।

আমরা হাঁটতে লাগলাম।

গাছপালা ঘন হয়ে আসছিল। বড় বড় গাছ। বট, নিম, অশ্বত্থ। আরও কিছু কিছু চোখে পড়ছিল যার নাম আমি জানি না। চিনিও না।

মিনিট পনেরো কুড়ি হাঁটলাম। রাস্তাটা যেন চড়াইয়ে উঠছে। এবার কিছুটা দূরে নদীর মতন দেখা যাচ্ছিল। অবশ্য নদী নয়।

আমি সুবীরদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ওই জায়গা ?"

মাথা নাড়ল সুবীরদা।

তালুকদার কোনও কথা বলছিলেন না। অথচ চারদিকে তাঁর নজর রয়েছে। পকেট থেকে গগলস্ বার করে পরে নিলেন।

রোদ প্রখর। হাওয়া রয়েছে। জঙ্গলের দিক থেকে মাঝে মাঝে দমকা আসছিল বাতাসের। আশেপাশে লোকজন নেই। নির্জন, নিরিবিলি।

শেষে ব্রিজটা দেখা গেল। ওটাকে ঠিক ব্রিজ বলা যায় না, লম্বা কালভার্ট। পাশে লোহার রেলিং। নীচে একটা পাহাড়ি নদীর মতন। পাথরে পাথরে ভর্তি। চওড়া তেমন কিছু নয়। কিন্তু কালভার্ট থেকে অনেকটা নীচে সেই জলধারা।

তালুকদার আরও খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, "আমরা কালভার্টটার ওপারে যাব, তাই না ?"

"হ্যাঁ," সুবীরদা বলল, "আমরা আসবার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল। ঠিক কালভার্টের মুখে।"

আমার মনে হল, কালভার্টটা বড্ড উঁচু আর তার রেলিং এতই নিচু আর পলকা যে, কোনও গাড়ি যদি কালভার্টের মুখে এসে কোনও কারণে রাস্তার পাশে চলে যায়—তবে তার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব।

রুমালে মুখ মুছে তালুকদার হাঁটতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'সুবীর, তুমি নিজে গাড়ি চালাচ্ছিলে ?"

"না, আমার ড্রাইভার।"

"তুমি নিজে একবারও চালাওনি ?"

"আমি ? সারা রাস্তায় বার দুই চালিয়েছি।"

"গাড়ি ঠিক ছিল ? কোনও ডিফেক্ট ?"

"খড়্গপুরে ব্রেক গণ্ডগোল করেছে। সারিয়ে নিয়েছিলাম।"

তালুকদার সুবীরদার দিকে তাকালেন একবার। কিছু বললেন না।

আমরা কালভার্টের ওপর দিয়ে হাঁটছিলাম। কত যে নিচু হবে জলের ধারাটা বুঝতে পারছিলাম না। চারতলা সমান হবে হয়ত— উঁচুতে আমরা হাঁটছি। নীচে শুধু পাথর আর পাথর। কোথাও কোথাও বালি। জল চোখে পড়ছে না।

কালভার্টের এপারে এলাম।

সুবীরদা বলল, "এইখানেই ঘটনাটা ঘটেছে।"

আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম।

তালুকদার গগলস্ খুললেন। কপাল, নাক, চোখ মুছলেন। তাকালেন চারপাশে।

আমার বড় অবাক লাগছিল। চারদিক শান্ত। আকাশ পরিষ্কার। রোদ যেন তার সমস্ত তাত দিয়ে জায়গাটা ভরে রেখেছে। নীচে পাথর, বালি। বেশ কিছু গাছপালা এপাশে। বড় বড় গাছ ছাড়াও ঝোপঝাড় অনেক রয়েছে।

এতক্ষণ একটানা রোদে হাঁটার পর গরম লাগছিল। ঘামও হচ্ছিল কপালে।

আমি বললাম, "এই জায়গাটা দেখে কে বিশ্বাস করবে সত্যিই এত বড় একটা অদ্ভুত ঘটনা এখানে ঘটে গেছে ?"

তালুকদার বললেন, "তোমরা দাঁড়াও, আমি একবার নীচে যাব ।"

কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে তালুকদার ধীরে ধীরে নামতে লাগলেন নীচে। পথের পাশে গাছের ছায়ায় আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে থাকলাম ।

কয়েকটা পাখি উড়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে। একটা গাড়ি আসছিল। কালভার্ট পার হয়ে চলে গেল । জঙ্গলের বাতাস এল দমকা ।

সত্যি বলতে কী, আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না এখানে কোনওদিনই কিছু ঘটেছে। হয়তো সবই সুবীরদার কল্পনা।

সিগারেট ধরিয়ে রাস্তার পাশে ছায়ায় বসলাম ।

সুবীরদাও বসল । তার মুখেও সিগারেট ।

তালুকদার নীচে নেমে গিয়েছেন । গাছগাছালির দিকে । আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম ।

আমি বললাম, "সুবীরদা, এখানে একমাত্র গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট ছাড়া কিছু হতে পারে না ।"

সুবীরদা আমার দিকে তাকাল । "গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট হয়নি । আমি হাজারবার বলছি, গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট হয়নি । অ্যাকসিডেন্ট হলে আমি বাঁচতাম না ।"

"তা ঠিক । তবে, রাখে হরি মারে কে ? মানুষ যেমন সহজে মরে— সেই রকম কত অদ্ভুত ভাবে বেঁচে যায় । হয়ত তুমি বেঁচে গেছ কোনওভাবে ।"

সুবীরদা হঠাৎ বিরক্ত হয়ে উঠল। বলল, "বেশ, আমি কোনওভাবে বেঁচে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই তিনটে দিন কোথায় ছিলাম ? কোথায় ? কেমন করে বেঁচে থাকলাম ? কে আমায় বাঁচিয়ে রাখল ?" বলতে বলতে সুবীরদার গলা যেন উত্তেজনায় কেমন কর্কশ হয়ে এল ।

বাড়ি ফিরতে বেলা হয়ে গেল অনেকটা ।

সকালের দিকে শীতের রোদে ঘুরে বেড়াতে আরাম লেগেছিল। কিন্তু ঘণ্টা তিনেক ওই রোদে ঘোরাফেরা করার পর আর তেমন আরাম লাগছিল না। বরং আমরা খানিকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। রোদে-ধুলোয় চোখ-মুখ রুক্ষ হয়ে উঠেছিল । তালুকদারের নাকের ডগা রুমালের ঘষায় লাল, চোখ ছলছল করছে ।

একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, আমি আর সুবীরদা যেন নিতান্তই তালুকদার-সাহেবের সঙ্গী ছিলাম। ভদ্রলোক কিন্তু কম পরিশ্রম করেননি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু দেখছিলেন । অবশ্য গাছপালা ।

কালভার্টের গা বেয়ে নীচে পর্যন্ত গাছপালা কম ছিল না। বড় গাছ দু-একটা, বাকি ছোট ছোট গাছ ; আর অজস্র ঝোপঝাড়। তালুকদার তাঁর ব্যাগ থেকে একটা জিনিস বার করলেন— যা দেখতে অনেকটা গুপ্তির মতন— তবে ছোট। দূরবীন গোছের কী একটা তাঁর গলায় ঝুলছিল। সব চেয়ে যেটা অবাক ব্যাপার— তিনি খুব ছোট একটা যন্ত্র বার করলেন যা দেখতে অনেকটা পকেট ট্রানজিস্টারের

মতন। কিন্তু সেটা ট্রানজিস্টার নয়। যন্ত্রটার একপাশে লম্বা একটা ছুঁচ, সেলাই মেশিনের ছুঁচের মতন লম্বা। বোতাম টিপলেই সেটা একপাশে ওঠানামা করে। যন্ত্রটার গায়ে ছোট বড় দু-তিন রকমের কাটা দাগ। কী সব অঙ্কও লেখা রয়েছে।

মানুষের খ্যাপামির শেষ থাকে না। তালুকদার যতই পরিশ্রম করুন, আমি কিছু তেমন দেখছিলাম না, যাকে আমার রাক্ষুসে গাছ বলে মনে হল। একটা সাধারণ শিমুল, গোটা দুয়েক গাছ— যার পাতা খানিকটা জাম গাছের মতন দেখতে— এই সব মামুলি গাছ ছাড়া অন্য যা সবই তো ঝোপঝাড়।

আমার কোনও কাজ ছিল না। কয়েকটা ছবি তুললাম শুধু।

গাছপালার কাজ শেষ হলে আমরা কিছুক্ষণ পাথর-টাথর, বালি, নালার মতন বয়ে-যাওয়া একটু জল— সবই দেখলাম। কোথাও কিছু নেই। কোনও চিহ্নই নেই অত বড় ঘটনার।

বাড়ি ফেরার সময় তালুকদারকে হতাশ, ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কথাবার্তাও বলছিলেন না বেশি।

বাড়ির কাছাকাছি এসে একবার শুধু তালুকদার বললেন, "সুবীর, একটা গাড়ি জোটাতে পারো না কোনওভাবে ? একটু সুবিধে হয়।"

সুবীরদা বলল, "দেখি। চেষ্টা করব।"

স্নান খাওয়া-দাওয়ার পর গা গড়িয়ে নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দুজনেই। ঘুম ভাঙল যখন— তখন আর বিকেলের বিশেষ কিছু নেই, ফিকে রোদ শীত পড়ার আগেই যেন পালিয়ে যাচ্ছে।

হাই তুলতে তুলতে উঠে চোখ-মুখ ধুয়ে এসে শুনলাম, তালুকদার সাহেব শেষ দুপুরেই কোথায় বেরিয়ে গিয়েছেন। করালীকে বলে গেছেন, বিকেল নাগাদ ফিরবেন।

আমি সুবীরদাকে বললাম, "কোথায় গেলেন উনি বলো তো !"

"কী জানি ! আবার কি সেই জায়গায় গেলেন ?"

"তুমি আচ্ছা এক পাগল জুটিয়ে এনেছ !"

সুবীরদা ম্লান হাসল। বলল, "আমি নিজেই পাগল হয়ে যাচ্ছি। কী আর করব বল !"

আমরা চা খেয়ে বাইরে সামান্য পায়চারি করতে-না-করতেই আলো মরে গেল। মাথার ওপর পাতলা অন্ধকার, পাখি-টাখি উড়ে চলেছে, উত্তরের বাতাস শনশন করে উঠল, শীত আর অন্ধকার যেন আকাশ থেকে পা বাড়িয়ে রয়েছে, একটু পরেই নেমে পড়বে।

সুবীরদা বলল, "তুই কি বেরোবি ?"

"একটু ঘোরাফেরা করা দরকার। যাই বলো, সকালের ধাক্কাতেই গা-গতর ব্যথা হয়ে গেছে।"

"তা হলে চল। রেল লাইনের ওপারে আমার জানাশোনা এক ভদ্রলোক আছেন। পবিত্রবাবু। তাঁকে গিয়ে ধরি। যদি একটা গাড়ি জোগাড় করে দেন।

তালুকদার যখন বলছেন—”

“বেশ তো, চলো।”

ঘরে এসে আমরা জামাটামা পালটে নিলাম।

করালী এসেছিল রাত্রের খাওয়াদাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করতে। সুবীরদা তাকে বলল, “আমরা একটু বেরোচ্ছি। সন্ধের আগেই ফিরব। সাহেব এলে চা-টা দিয়ো।”

আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

ফিরে এসে দেখি, বাতি জ্বলছে তালুকদারের ঘরে। তিনি ফিরে এসেছেন।

সন্ধে হয়ে গিয়েছিল আগেই। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে।

তালুকদার তাঁর ঘরেই ছিলেন। পরনে পাজামা, গায়ে এক বিরাট জোব্বা, মাথায় উলের টুপি। বসে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন।

আমরা ফিরতেই বললেন, “এসো, কোথায় গিয়েছিলে ?”

সুবীরদা বলল, “গাড়ি জোগাড় করতে ; আপনি বলেছিলেন।”

“পেয়েছ ?”

“ব্যবস্থা হয়েছে। কাল সকালে লোক আসবে। কখন গাড়ি চাই বলে দিতে হবে তাকে।”

“ভেরি গুড।”

“আপনি দুপুরে কোথায় গিয়েছিলেন ?”

তালুকদার নাক টানলেন। তাঁর সর্দি হয়েছে। গলাও ভারী। একটু চুপচাপ থেকে বললেন, “একটা পয়েন্ট আমার মনে পড়ল। আবার চলে গেলাম।”

“কোথায় ? সেই কালভার্টের কাছে ?”

মাথা হেলালেন তালুকদার।

আমার এখন সন্দেহ হল, মানুষটি নিশ্চয় পাগল। সকালে একদফা ঘুরে এসে আবার দুপুরে ছোটেন ! দূর তো কিছু কম নয়।

তালুকদার বেতের গোল চেয়ারে বসে ছিলেন। বসতে বললেন আমাদের।

সুবীরদা কাঠের চেয়ারে বসল। আমি বিছানায়।

সাধারণ কয়েকটা কথাবার্তার পর সুবীরদা বলল, “গাড়ি কাল কখন লাগবে ?”

“বিকেলে।”

“সকালে নয় ?”

“না। সকালে নয়।”

“কোথায় যাবেন ?”

“যাবার জায়গা একটাই। যেখানে গিয়েছিলাম আজ, সেখানেই যাব।”

আমি অবাক হয়ে বললাম, “আজ তো দু-দুবার গেলেন ? কোনও লাভ হল ?”

মাথা নাড়লেন তালুকদার, “হল না।”

“তা হলে ?” সুবীরদা বলল।

"আর একবার অন্তত যেতে চাই। সূর্য অস্ত যাবার পর, যখন আলো রোদ কিছুই থাকবে না।"

আমার কৌতূহল হচ্ছিল। বললাম, "কেন ? আলো ছাড়া যেতে চান কেন ? অন্ধকারে কি গাছপালা পালটে যায় ?"

তালুকদার বললেন, "কোনও-কোনও গাছপালার সঙ্গে আলোর সম্পর্ক আছে বইকি ! তুমি সূর্যমুখী ফুল দ্যাখোনি ? স্থলপদ্ম ফুটতে দেখেছ ? সকালে তার রঙ কেমন থাকে ? দুপুরে কেমন হয় ? এ সব তো সাধারণ কথা। অন্য ব্যাপারও আছে। ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিস্টার হাইডের গল্প জানো তো ? সকালে সাদামাটা নিরীহ মানুষ, রাত্রে দানব। ঠিক সেই রকম এক-একটা গাছ চোখে পড়ছে, রেয়ার গাছ, মোস্টলি সাউথ আমেরিকায়, আফ্রিকাতেও দেখা গেছে যারা রাত্তিরে মিস্টার হাইডের মতন ব্যবহার করে। এরা এক ধরনের ক্রিপার, লতানো গাছ। এই ধরনের গাছের নাম দেওয়া হয়েছে 'নাইট মন্স্টারস'।"

আমি অবাক চোখে সুবীরদার দিকে তাকালাম। সুবীরদা আমার দিকে। তারপর দুজনেই তালুকদারের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। চোখের পাতা পড়ছিল না আমাদের।

করালী এসেছিল। চায়ের কথা জিজ্ঞেস করল।

তালুকদার চা আনতে বললেন।

আমি বললাম, "আপনি তো বলছেন, ওখানে কিছু খুঁজে পাননি। পেয়েছেন ?"

"পাইনি। পাব বলেও আশা করছি না। তবু একবার রাত্তিরে দেখতে চাই।"

"সাউথ আমেরিকার গাছ ঘাটশিলায় কেমন করে আসবে ?"

"আমি কি তোমায় বলেছি শুধু সাউথ আমেরিকায় দেখা যায় ? আমি বলেছি ওদিকেই বেশি। আফ্রিকাতেও চোখে পড়ে। য়ুরোপেও দু-দশটা কাছাকাছি গাছ কারও কারও নজরে এসেছে।"

"আমাদের দেশে সেই গাছ কেমন করে আসবে ?"

তালুকদার একটু হাসলেন, "সেটা ভগবান জানেন। আমি বলতে পারব না।...তবে কী জানো, জগদীশ—এই দেশে হিমালয় থেকে শুরু করে আসামের জঙ্গল, আর তোমার নীলগিরি পাহাড় থেকে বিন্ধ্য পর্যন্ত কত রকমের গাছ-পালা আছে তার সঠিক হিসেব কেউ রাখে না। আমি কিন্তু তোমায় বলছি না—আমাদের দেশে নাইট মন্স্টারস আছে। আমি বলছি, থাকতেও পারে। কে বলতে পারে, নেই ?"

আমি যেন থতমত খেয়ে চুপ করে গেলাম।

সুবীরদা বলল, "আপনি কি কোনও লতানো গাছ দেখেছেন ওখানে ?"

মাথা দুলিয়ে তালুকদার বললেন, "লতানো গাছ ঝোপ-ঝাড় কোথায় না থাকে ? নীচে ফণিমনসার ঝোপ, তার পাশে বুনো লতা। ঝোপ একেবারে ঢেকে ফেলেছে। আমার কিন্তু মনে হল না, ওই বুনো লতার মধ্যে কিছু আছে।

একেবারে নিরীহ লতা, যা যে-কোনও বন-জঙ্গলে দেখা যায়। তবে ঝোপঝাড় যেভাবে ঢেকে ফেলেছে লতায়, ভেতরের কিছু দেখা যায় না।"

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, "ওটা তাহলে মনস্টার নয় ?"

"মনে হচ্ছে না মনস্টার। তবু একবার রাত্তিরে দেখতে চাই।"

আমরা সবাই চুপচাপ। যে যার মতন কল্পনা করছিলাম। ভাবছিলাম। শেষে আমিই আবার তালুকদারকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা ধরুন যদি এমনই হয়— ওই বুনো লতা রাত্তিরে মনস্টার হয়ে ওঠে, তাহলে আপনি কি মনে করেন— ওই রাক্ষুসে লতা সুবীরদার বন্ধুদের খেয়ে ফেলেছে ?"

আমার কথা বলার ঢঙ থেকেই বোঝা গেল, পুরো ব্যাপারটাকেই আমি অবিশ্বাস্য, হাস্যকর মনে করছি। সত্যি বলতে কী আমি যেন জোর করেই অবিশ্বাসের ভান করলাম। আসলে আমার মাথারই কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

তালুকদার বললেন, "হু টোল্ড ইউ দ্যাট ? আমি তো বলিনি মনস্টার ক্রিপার মানুষ খায় ! বলেছি?"

আমরা হতভম্ব। মানুষ যদি না খায়—তবে সেই বুনো লতা দানব হোক, রাক্ষস হোক—কী যায় আসে আমাদের ! ওই গাছ নিয়ে মাথা ঘামিয়েই বা কী লাভ ! করালী চা নিয়ে এল। কাঠের ছোট ট্রে, বড় একটা টি-পট, তিনটে কাপ।

করালী চা ঢেলে দিল। আমরা যে যার চা নিলাম। চলে গেল করালী।

সুবীরদা বলল, "আমার বন্ধুদের সঙ্গে ওই গাছের কীসের সম্পর্ক তা হলে ?"

তালুকদার চায়ে চুমুক দিলেন। তাকালেন সুবীরদার দিকে। বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ। কিসের সম্পর্ক ? সম্পর্কটা এমনিতে বোঝা যাবে না। তবে ধরো যদি এমন হয়, ওই ঝোপের অনেক তলায় তোমার বন্ধুরা মরে পড়ে আছে, আর তার ওপর রোজ কয়েক প্রস্থ করে ওই লতা ছড়িয়ে যাচ্ছে— তা হলে কেমন হয় ?"

সুবীরদা কিছু বুঝল না। বোকার মতন বলল, "মানে ?"

"মানে— মানে— ব্যাপারটা হল, মাটি কিংবা বালি খুঁড়ে কাউকে কবর দিলে যেমন হয় প্রায় সেই রকম।" তালুকদার সিগারেট পাকাতে পাকাতে বললেন, "ওই লতাগাছ তোমার বন্ধুটন্ধুদের এমন করে ঢেকে ফেলেছে যে বলতে পারো, ওই লতার তলায় তারা ডুবে গেছে।"

আমি সুবীরদার দিকে তাকালাম। তারপর তালুকদারের দিকে। বললাম, "সেটা কি সম্ভব ?"

তালুকদার বললেন, "যদি এমন হয় ওই বুনো লতার মধ্যে মনস্টার ক্রিপারের ক্যারেকটার থাকে— তা হলে সেটাই সম্ভব। এটা অবশ্য খুবই অদ্ভুত, বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু ওই জাতের লতাগাছের চরিত্র হল— যে কোনও প্রাণী তার খপ্পরে পড়লে প্রতি ঘণ্টায় তার বাড় সাধারণ বাড়ের প্রায় তিরিশ চল্লিশ গুণ বেড়ে যায়। তার যতগুলো লিকলিকে ডালপালা আছে—দেখতে দেখতে বাড়তে থাকে,

পাতাগুলোও বড় হয়ে যায়, আর শিকারটাকে চারপাশ থেকে জড়িয়ে ক্রমেই সেটাকে একেবারে ঢেকে ফেলে। কিন্তু এরা প্রাণীখেকো নয়।"

সুবীরদা চা খাচ্ছিল। আমার দিকে তাকাল। আমিও চায়ে চুমুক দিলাম। আরাম লাগল।

সুবীরদাই কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তালুকদার বললেন, "এই জাতের লতার নামে গল্পও আছে। গল্পটা আমার ঠিক মনে নেই, তবে মোটামুটি বলতে গেলে— একটি দেবশিশুকে বাঁচাবার জন্যে জলের ধারের শ্যাওলাকে দেবদেবীরা আদেশ করেছিলেন। দেবতাদের আশীর্বাদে সেই শ্যাওলা বিরাট লতার চেহারা নেয়, এবং বংশধরটিকে ঢেকে রাখে। দেবদেবীর কৃপায় সেই গাছ নাকি তখন থেকেই মায়াবী।" বলে তালুকদার হাসলেন। "দেবদেবীর কৃপা পেয়েই হোক আর না হোক— কিছু অদ্ভুত লতাপাতা গাছ কিন্তু পৃথিবীর কোনও আদিমকাল থেকে রয়ে গেছে। অনেক গাছ হারিয়ে গেছে, শেষ পর্যন্ত আর এই পৃথিবীতে টিকতে পারেনি। আবার কোনও গাছ স্বভাবচরিত্র পালটাতে-পালটাতে এখনও টিকে আছে। হয়ত দু-পাঁচ শো বছর পরে আর থাকবে না।"

চা নামিয়ে রেখে আমি বললাম, "আপনার ধারণা যদি সত্যি হয়, মানে ধরে নেওয়া যাক— আপনি যা বলছেন তাই ঘটেছে, তাহলে এবার আপনি বলুন— একমাত্র সুবীরদাকে ছেড়ে দিয়ে কেন এই রাক্ষুসে গাছ অন্যদের ঢেকে ফেলবে?"

তালুকদার সিগারেট ধরালেন। বললেন, "কথাটা ভেবেছি। এর একটি মাত্র জবাব হতে পারে। জীপ অ্যাকসিডেন্টের পর যখন গাড়িটা গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল তখন সুবীর কোনওভাবে ছিটকে বেরিয়ে যায়। সে ওই ঝোপের মধ্যে পড়েনি। কাজেই বেঁচে গেছে।"

মাথা নাড়ল সুবীরদা। জোরে জোরে। বলল, "আমার কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়নি। অ্যাকসিডেন্ট হলে তিন দিন আমি কোথায় পড়ে থাকলাম?"

তালুকদার বললেন, "জানি না। হয়ত কাছাকাছি কোথাও অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে!"

সুবীরদা স্বীকার করল না।

আমি বললাম, "আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে। যদি সুবীরদার বন্ধুদের ওই রকম দশাই হয়ে থাকে, তা হলে তারা কবেই মারা গেছে। কুকুর-বেড়াল মরে পড়ে থাকলে দুর্গন্ধ বেরোয়, আর দু-তিনটে মানুষ মরে পড়ে থাকলে পচা গন্ধ বেরোবে না?"

"রাইট", তালুকদার বললেন, "তুমি ঠিক বলেছ। ওটা বড় পয়েন্ট। আমি ভেবেছি।" বলে উনি আবার একটু চা খেলেন, টান দিলেন সিগারেটে। সুবীরদার দিকে তাকিয়ে বললেন, "যদি আমরা ধরে নিই— সুবীরের বন্ধুদের ওই দশা— মানে যে-দশার কথা বলছি তা-ই হয়েছে— তবে আমার ধারণা, দিন দুই-তিনের পর থেকে পচা গন্ধ বেরোনো উচিত ছিল। আমি ধরে নিচ্ছি ডেড বডিগুলো এমনভাবে লতায়-পাতায় জড়ানো ছিল যাতে রোদ আলো তাপ খুব কম পেয়েছে,

পচতেও দেরি হয়েছে। তবু দু-তিন দিন যথেষ্ট...। নয় কি ?”

সুবীরদা অধৈর্য হয়ে বলল, “আমি তো আপনাকে বলেছি আমরা লোক লাগিয়ে যথাসাধ্য খুঁজেছি ওখানে। কাউকে পাইনি। কিছু পাইনি। কোনও দুর্গন্ধই নাকে আসেনি।”

তালুকদার গলা পরিষ্কারের শব্দ করলেন। বললেন, “আমি জানি তুমি পাওনি। পেলে তখনই ব্যাপারটা ধরা পড়ত। কাজেই আমার সন্দেহ কিংবা ধারণা টিকছে না। তবে সেটাও টিকতে পারে, যদি জানা যায়, ওই রাক্ষুসে লতার নিজেরই এমন কোনও উগ্র গন্ধ আছে যাতে পচা জিনিসের গন্ধ চাপা পড়ে!”

“এ-রকম আছে নাকি ?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“আমি জানি না”, তালুকদার মাথা নাড়লেন। “আমি কিছু জানি না। এরকম গাছপালা আমি জীবনে দেখিনি, শুধু আমাদের রিসার্চ রিপোর্টে পড়েছি। তবে একটা কথা আমি বলতে পারি, যদি এমন কোনও লতাপাতা এখানে থেকে থাকে, তাহলে এতদিনে তার যা গ্রোথ হয়েছে, সেই বিশাল জঙ্গল থেকে কাউকে খুঁজে বার করা বোধহয় সম্ভব নয়।”

সুবীরদা আমার দিকে অসহায়ের মতন তাকাল।

আমি তালুকদারসাহেবের কথা বিশ্বাস করলাম না। এমন হতে পারে বলে মনে হল না আমার। কালভার্টের নীচে ঝোপ-জঙ্গল যথেষ্টই রয়েছে, তবে নিশ্চয় এমন ঘন ঝোপ-জঙ্গল নেই যা দু-তিনটে মানুষ এবং একটা গাড়িকে পুরোপুরি লুকিয়ে ফেলতে পারে।

চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল আমাদের। তিন জনেই চুপচাপ।

খানিকটা পরে আমি তালুকদারকে বললাম, “আচ্ছা, একটা কথা বলব ?”

বলো।

“আমার এক মেসোমশাই একটা কথা বলেছিলেন। মানে অনুমান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অন্য কোনও গ্রহ থেকে কোনও জীবটিব এসে যদি ওইভাবে ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়ে থাকে সুবীরদাদের ? আপনি কি মনে করেন, এ-রকম কিছু হওয়া সম্ভব ?”

আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তালুকদার। তাঁর চোখের পাতা ফুলে রয়েছে সামান্য। ছলছল করছে চোখ। রুমালে নাক-চোখ মুছলেন।

উনি কোনও কথাই বলছিলেন না।

আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে বসেছিলাম।

অনেকক্ষণ পরে তালুকদার বললেন, “ও-ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। তোমার মেসোমশাই যা বলেছেন তা মানতে হলে আমার বিশ্বাস করতে হবে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনও গ্রহে জীব আর জীবন আছে। শুধু থাকলেই চলবে না, তারা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে বেশি না হোক কম উন্নত নয় বিজ্ঞানের দিক থেকে। আজকাল বিজ্ঞান বড় জটিল, ভীষণ জটিল হয়ে এসেছে। আরও হবে। পৃথিবীর বাইরের কোনও জীব এত উন্নতি করেছে কি না কে বলবে! তবে আমি নিজে ওটা

বিশ্বাস করি না।”

আমরা চুপচাপ হয়ে পড়লাম আবার।

শেষে সুবীরদা উঠল। বলল, “আজ সন্ধেবেলায় তা হলে গাড়ি নেবেন ?”

“নিশ্চয়। সবই যখন হল— ওটা আর বাকি থাকে কেন। একবার যাই, দেখে আসি। মনে হয় না কিছু পাব। তবু...।”

৮

পরের দিন সন্ধেবেলায় একটা জীপ গাড়ি পাওয়া গেল কিন্তু ড্রাইভারকে ধরা গেল না। সুবীরদা নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এল বাড়িতে।

তালুকদারসাহেব মোটামুটি তৈরি ছিলেন। তাঁর কাঁধে মামুলি ঝোলা, হাতে টর্চ। মাথায় নেপালি টুপি। বোধহয় ঠাণ্ডাটা আর লাগাতে চান না মাথায়। ওঁর শরীরও তেমন ভাল ছিল না। আমরা তো বারণই করেছিলাম, বলেছিলাম— থাক না আজ। উনি শুনলেন না।

সন্ধের সামান্য পরেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

জীপ গাড়িটারও মাথার ক্যানভাস ছেঁড়াফাটা, বসার সিট কাঠের মতন শক্ত, ধুলোয় ময়লায় ভর্তি। কনট্রাকটারের জীপ বোধহয় এই রকমই হয়। কিংবা এমনও হতে পারে, নেহাতই যেন দায়ে পড়ে ভদ্রলোক গাড়িটা সুবীরদাকে দিয়েছেন।

গাড়িতে ওঠার সময় তালুকদার বললেন, “তেলটেল আছে তো ? দেখে নিয়েছ ?”

তেল আমরা আগেই নিয়েছিলাম।

গাড়ি চলতে শুধু করল। রাস্তায় লোকজন কম। শীতের দিনে কে আর অকারণে ঠাণ্ডা লাগিয়ে ঘুরে বেড়াবে ! দোকানটোকানে কিছু ভিড় অবশ্য রয়েছে। স্টেশনের কাছে মিষ্টির দোকানে রেডিয়ো বাজছিল। আলো-টালো জ্বলছে।

স্টেশন ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে আসতেই আবার চুপচাপ ভাব, ছিটেফোঁটা আলো, সামান্য কিছু লোকজন।

তালুকদারসাহেব যে অকারণে যাচ্ছেন তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। তিনি নিজেই বলেছেন, এমন কোনও গাছপালা তাঁর নজরে পড়েনি যাতে মনে করা যায় কালভার্টের নীচে কোনও রাক্ষুসে গাছপালার অস্তিত্ব আছে। তবু তিনি ব্যাপারটা ছেড়ে দিতে চান না। আরও একটু দেখতে চান। কোথা থেকে এই ‘নাইট মনস্টার’ হাজির করেছেন, তারই খোঁজে চললেন এখন। ভদ্রলোক যে জেদি, একগুঁয়ে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু বদ্ধ উন্মাদ। উন্মাদ না হলে মানুষের মাথায় এ-সব উদ্ভট জিনিস কেমন করে আসে !

তালুকদারের কথাবার্তা আমার বিশ্বাস হয়নি। বরং বিশ্বাস যদি করতেই হয়, সুকুমার মেসোমশাইয়ের কথা আমি বিশ্বাস করতে রাজি। গ্রহান্তরের জীবদের তবু

হয়ত বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু নিরীহ গাছপালার এ-রকম আসুরিক কাণ্ডকারখানা বিশ্বাস করতে আমার রুচি হচ্ছিল না।

তালুকদার গলায় মাফলার বেশ ঘন করে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, "সুবীর, তুমি বরং আমাকে দাও, আমি চালাই।"

সুবীরদা থতমত খেয়ে বলল, "কেন?"

"দাও না আমাকে। তুমি বোধহয় নার্ভাস হয়ে পড়ছ!"

"নার্ভাস?"

"তোমার হয়ত সেদিনের কথাই মনে পড়ছে বেশি। মন অস্থির হয়ে পড়ছে। আমায় দাও। আমি খুব একটা খারাপ গাড়ি চালাই না।"

সুবীরদা গাড়ি থামাল!

আমরা পাশাপাশি তিনজনে বসে ছিলাম। সুবীরদা, তালুকদার, আমি। গাড়ি থামিয়ে সুবীরদা নীচে নামল। তালুকদার সরে গেলেন ড্রাইভারের সিটে। সুবীরদা ঘুরে এসে আমার পাশে বসল। আমি তালুকদারের দিকে সরে গেলাম।

আগে আমি কিছু বুঝতে পারিনি। সুবীরদা আমার পাশে এসে বসার পর তার চোখমুখ দেখে আমার মনে হল, সত্যিই সুবীরদাকে কেমন নার্ভাস দেখাচ্ছে।

তালুকদার গাড়ি চালাতে লাগলেন।

সুবীরদা হঠাৎ একটা সিগারেট চাইল আমার কাছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে তালুকদার বললেন, "তুমি না বলছিলে সুবীর, সেদিন রাস্তায় তোমরা ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এসেছিলে?"

"হ্যাঁ। তবে গিধনির পর আর বৃষ্টি পাইনি।"

"আকাশে মেঘ ছিল?"

"তা ছিল।"

"রাস্তাও নিশ্চয় ভিজে ছিল?"

"এদিকেও তো ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল।"

"জোরে আসছিল?"

"না।"

সামান্য চুপ করে থেকে তালুকদার বললেন, "কালভার্টের মুখে যেখানে তোমাদের গাড়ি থেমে গিয়েছিল বলছ, সেখানে একটা বাঁক আছে। মানে একটা কার্ভ শেষ হয়েছে ওই মুখটায়। তোমাদের গাড়ি রাস্তায়, কার্ভের ওই পয়েন্টটায় যদি স্কিড করে— সাংঘাতিক একটা অ্যাকসিডেন্ট হওয়া সম্ভব।"

সুবীরদা অসন্তুষ্ট হল। বলল, অ্যাকসিডেন্ট হয়নি।"

তালুকদার চুপ করে গেলেন।

আমরা অনেক দূর চলে এসেছিলাম। আর কোথাও জনবসতি নেই। একেবারে নির্জন। এক ফোঁটা আলোও চোখে পড়ছে না। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। দু' পাশের গাছপালা যেন আমাদের গায়ে এসে পড়ছে। দিনের বেলায় এই জায়গাটা যেমন দেখাচ্ছিল এখন আর সেরকম দেখাচ্ছে না। এখন বড়

নির্জন, স্তব্ধ, ছমছমে দেখাচ্ছিল। গাড়ির হেড্‌লাইট যদি জ্বালা না থাকত, আমি অন্তত এই অন্ধকারে ভয় পেয়ে যেতাম।

আর একটু পরেই সেই কালভার্ট।

তালুকদার গাড়ির গতি একেবারে কমিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে, প্রায় গড়াতে গড়াতে গাড়িটা এপারে এল। এপারে এসে থামল।

কয়েক মুহূর্ত পরে তালুকদার বাতি নিবিয়ে দিলেন। সমস্ত বাতি। সঙ্গে-সঙ্গে যেন চারদিক থেকে অন্ধকার ছুটে এল, বন্যার জলের মতন, আমাদের ডুবিয়ে দিল। চারপাশে কী আছে না আছে চোখে পড়ে না ; শুধু কালো আর কালো।

চোখ একটু সয়ে গেল। আমরা রাস্তায়। গাড়ির মধ্যে বসে। সামনে, পেছনে, পাশে থমথম করছে অন্ধকার। বাতাস দিচ্ছে শনশন করে। শীত।

তালুকদার নামলেন।

আমার যে কী হল, হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল, কিছুদিন আগে এখানে যা ঘটেছে, আবার যদি সেই রকম ঘটে ! ঘটতেও তো পারে। সবই সেই রকম। সেই জীপ গাড়ি, সেই কালভার্টের মুখের জায়গাটা, আর আমরা তিনজন। যদি এই অবস্থায় আমি আর তালুকদার হারিয়ে যাই, যদি সুবীরদাও হারিয়ে যায় ! তবে ?

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। হাত-পা কাঁপল।

সুবীরদাও দেখলাম খুব অস্থির হয়ে উঠেছে।

তালুকদার কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

আমি বললাম, "গাড়ির বাতিটা জ্বেলে রাখলে হয় না ?"

তালুকদার বললেন, "না। বাতি জ্বালবে না।...তোমরা গাড়িতে বসে থাকতে পারো। আমি একবার নীচেটা ঘুরে আসব।"

ভদ্রলোক বলেন কী! এই অন্ধকারে গাছপালা পাথরের মধ্যে দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে নীচে নামবেন ! যদি পা হড়কে পড়েন তবে তো মরবেন।

আমি বললাম, "নামবেন কেমন করে ?"

তালুকদার বললেন, "পারব। দু-চারবার ওঠানামা করেছি তো। রাস্তা দেখে রেখেছি।"

আমার ভয় হচ্ছিল। এভাবে কালভার্টের পাশ দিয়ে ঝোপঝাড় গাছপালা পাথর ডিঙিয়ে নামা ওঁর উচিত নয়। আমি আবার বললাম, "এই অন্ধকারে নামবেন ?"

তালুকদার কথা শুনলেন না। নামার জন্যে এগিয়ে গেলেন। টর্চ জ্বাললেন। বললেন, "আমি টর্চ জ্বেলেই নামছি। তোমরা কিছু বাতিটাতি জ্বেলো না।" একটু থেমে আবার বললেন শান্তভাবেই, "আলো ছাড়া নামার উপায় নেই, আলো আমায় জ্বালতেই হচ্ছে। তবে আমার মনে হয়, অন্ধকার থাকলেই ভাল হত। আমি জানি না, টর্চের আলোতেও ওরা রিঅ্যাক্ট করবে কিনা।"

সুবীরদা রাস্তায় নেমে পড়ল, আমিও নামলাম। একজন এতটা ঝুঁকি নিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছেন, আমরা কেমন করে বসে থাকি !

সুবীরদা বলল, "আপনি এত রিস্ক নিচ্ছেন কেন ! যদি কিছুই না দেখতে পান—"

"তোমরা ভেবো না। একবার ঘুরে আসি", তালুকদার বললেন, "না পেলে না পাব— তবু একবার যাই।"

কথা শোনার মানুষ তালুকদার নন। তিনি রাস্তার পাশ দিয়ে নামতে লাগলেন ধীরে ধীরে।

আমরা দুজন রাস্তায়। মাথার ওপর ঝাপসা নক্ষত্র। বোধহয় হিম-কুয়াশার জন্যে ঝাপসা দেখাচ্ছিল। আমাদের চতুর্দিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার, আর গাছপালা। বুনো গন্ধ বাতাসে। শীতের হাওয়ায় গা হাত কাঁপছিল। আমার মাফলার ছিল সঙ্গে। কান মাথা জড়িয়ে নিলাম।

তালুকদার নেমে যাচ্ছেন। তাঁর হাতের টর্চের আলো কখনও সামনে কখনও দূরে ছড়িয়ে পড়ছিল।

সিগারেটের প্যাকেট বার করলাম। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

সুবীরদাকে সিগারেট দিলাম। "নাও, গরম হয়ে নাও।"

সিগারেট ধরানো হয়ে গেল।

"তোমার তালুকদার কিন্তু ম্যাড—" আমি বললাম, "আজকের এই দুর্ভোগ কিন্তু ওঁর জন্যে।"

সুবীরদা বলল, "কী করব ! উনি কথাই শুনলেন না।"

"আমার তো ভয়ই করেছে। একবার যদি পা পিছলে পড়েন—"

তালুকদারকে দেখা যাচ্ছে না, তাঁর টর্চের আলো নীচে নেমে যাচ্ছিল। এঁকেবেঁকে তিনি নামছেন। মাঝে-মাঝে আলো আড়াল পড়ে যাচ্ছিল। নীচে জোনাকি উড়ছে।

আমরা তখনও নীচে। বাতাসের শব্দ ছাড়া কোনও শব্দ নেই। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে ভয়ই হয়।

"সুবীরদা ?"

"বল।"

"তুমি তালুকদারের কথা বিশ্বাস করো ?"

"না। করি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কিছু নেই আর। সবই বিশ্বাস্য আবার কোনওটাই বিশ্বাস করা যায় না।"

কথা বললাম না। সত্যি, সুবীরদার বেলায় যা ঘটেছে তা কি বিশ্বাস্য ? তবে ?

ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছিল না। নাক গাল মুখ কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। আমি নীচের দিকে সরে এলাম।

আর ভাল লাগছিল না। এখানে এইভাবে আসা, দাঁড়িয়ে থাকা অর্থহীন। কোনও মানে নেই এই নির্বোধের মতন অভিযানের।

কতক্ষণ সময় যে কেটে গেল জানি না, হঠাৎ সুবীরদা বলল, "জগু, তুই আলো দেখতে পাচ্ছিস নাকি ? আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

নীচের দিকে তাকালাম। তালুকদারের টর্চের আলো দেখা যাচ্ছে না। তাকিয়ে থাকলাম। জোনাকির আলো ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। কোথায় তালুকদার ? বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। পড়ে-টড়ে গেলেন নাকি পা পিছলে ? তা হলে তো গড়িয়ে-গড়িয়ে কোথায় চলে যাবেন কে জানে !

"আমিও তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না, সুবীরদা ?"

"গেলেন কোথায় ?"

"পড়ে যাননি তো ?"

"আমরা বাতিটা জ্বালব ? হেডলাইট ?"

গাড়িটাকে তা হলে হয় পিছিয়ে কালভার্টের মাঝখানে নিয়ে যেতে হবে, না হয় মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়। কিন্তু হেডলাইটের আলো তো সোজা হয়ে পড়বে ! অত নিচুতে কেমন করে পৌঁছবে !"

কথাটা ঠিক। আলো জ্বাললে কিছুটা ছড়িয়ে পড়বে ঠিকই কিন্তু অত নীচে নামবে না। তা ছাড়া তালুকদার আলো জ্বালতে বারণও করেছেন। তা হলে কি তিনি নিজেও টর্চের আলো নিবিয়ে কোনও রাক্ষুসে লতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ?

কথাটা মনে হতেই আমার গা শিউরে উঠল।

"সুবীরদা, তালুকদার কি নাইট মন্‌স্টার দেখতে পেলেন ?"

সুবীরদা কেমন যেন শব্দ করে উঠল, আঁতকে ওঠার। "সর্বনাশ ! তা হলে—তা হলে তো ওঁকেই ওই গাছ শেষ করে ফেলবে !"

আমি আরও ভয় পেয়ে গেলাম। কী সর্বনাশ ! সত্যিই কি তালুকদার সেই রাক্ষুসে লতা দেখতে পেয়েছেন ! নাকি তিনি দেখবার বোঝবার আগেই দানব-গাছ তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে ! হয়ত শিকারীর মতন ওত পেতে বসেছিল গাছটা, খুব সহজেই তালুকদারকে ধরে ফেলেছে।

ভয় মানুষকে দিশেহারা করে ফেলে। আমরা এমনই দিশেহারা বোধ করলাম যে, সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে চেঁচাতে লাগলাম, চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম তালুকদারকে। ভয়ে গলা উঠছিল না, ভাঙা শোনাচ্ছিল। তার ওপর জঙ্গলের শনশনে বাতাস এসে আমাদের গলার স্বর কোথায় যে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কে জানে !

এ বড় অদ্ভুত অবস্থা। চারদিকে গাছপালা বনজঙ্গল, মাথার ওপর আকাশ, ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, আমরা নিঃসাড় এক জগতের মধ্যে যেন বন্দী হয়ে গিয়েছি। আমাদের করার কিছু ছিল না ; কিংবা যা ছিল সবই ভুলে গিয়ে শুধু পাগলের মতন তালুকদারকে ডাকতে লাগলাম।

কোথাও কোনও সাড়া নেই। জোনাকির আলো ছাড়া এক ফোঁটা আলোও নেই।

সুবীরদা কেঁদে ফেলল।

আমার মনে হল, তালুকদারও বুঝি হারিয়ে গেলেন, আর তাঁকে আমরা খুঁজে পাব না। হঠাৎ সুবীরদার কী মাথায় এল কয়েক পা ছুটে গিয়ে জীপের হর্ন

বাজাতে লাগল। একটানা। আমি পাথরের মতন দাঁড়িয়ে থাকলাম।

আচমকা, একেবারে আচমকা— নীচে থেকে আলোর সাড়া এল, আলোটা জ্বলল, ওপরে এসে কালভার্টের গায়ে পড়ল।

সুবীরদা হাত উঠিয়ে নিল হর্ন থেকে।

আমার বুক তখনও কাঁপছে, হাত-পা ঠাণ্ডা। তবু নিশ্বাস ফেলতে পারলাম স্বস্তির। তালুকদার বেঁচে আছেন।

সুবীরদা যেন মাইলখানেক পথ ছুটে এসেছে— হাঁপাতে লাগল, নিশ্বাস নিচ্ছিল শব্দ করে।

তালুকদার উঠে আসছেন। তাঁর টর্চের আলো চোখে পড়ছিল আমাদের।

আমরা তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলাম।

সময় যেন আর কাটতে চায় না। তালুকদারকে যেন একবার দেখতে পেলে বেঁচে যাই। তালুকদার প্রায় উঠে এসেছেন, আর সামান্য মাত্র, হঠাৎ গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। চমকে উঠে আমরা আমাদের জীপের দিকে তাকালাম। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। শব্দটা তা হলে কোথায়?

মনে হল কোনও গাড়ি উলটো দিক থেকে এগিয়ে আসছে। সোজা এসে আমাদের গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কা লেগে যেতে পারে। অবশ্য লাগবে না। তালুকদার আমাদের জীপটাকে যতটা পারেন রাস্তার পাশ করে রেখেছেন।

খুবই আশ্চর্য। একটা গাড়ি আসছে অথচ তার কোনও আলো নেই। এই অন্ধকারে কেমন করে আসছে গাড়িটা?

তালুকদার ততক্ষণে উঠে এসেছেন।

"তোমরা এত চেঁচামেচি করছিলে কেন?" তালুকদার বললেন।

সুবীরদা সে-কথার কোনও জবাব দিল না, বলল, "শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন?"

তালুকদার কান পাতলেন। "গাড়ির শব্দ।"

"কোথায়? কোন দিক থেকে আসছে?"

তালুকদার টর্চের আলো দিয়ে উলটো দিকটা দেখালেন, আমরাও ওই দিকটার কথা ভেবেছিলাম।

আমি বললাম, "গাড়িটা কেমন করে আসছে? এই অন্ধকারে? আলো কই?"

তালুকদার বললেন, 'বোধহয় আলো খারাপ হয়ে গেছে।"

সুবীরদা বলল, "হতে পারে। তাই ধীরে-ধীরে আসছে।"

গাড়িটা যেন আরও কাছে এগিয়ে এল। শব্দ স্পষ্ট।

সুবীরদা বলল, "জীপ! শব্দ শুনে মনে হচ্ছে।"

বাঁকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল গাড়িটা।

তালুকদার আলো ফেললেন টর্চের।

একটা জীপ গাড়ি ক্রমে কাছে এল। হর্ন দিল। তারপর আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে সোজা কালভার্টে উঠে গেল।

সুবীরদা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। "আমার জীপ।"

কথাটা আমার কানে গেলেও ভাল করে বুঝতে পারলাম না। "তোমার জীপ মানে ?"

"আমার গাড়ি ! অবিকল আমার গাড়ির হর্ন।"

তালুকদার বললেন, "কী বলছ তুমি ?"

সুবীরদা তালুকদারের হাত চেপে ধরল। "আমার ভুল হতে পারে না। আমি বলছি, আমার জীপ। সেই এঞ্জিনের শব্দ, সেই হর্ন।"

আমি হতভম্ব। সুবীরদার জীপ আজ এতদিন পরে এভাবে কেন আসবে ? কে নিয়ে আসবে ?

সুবীরদা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। বলল, "আমার গাড়ি আমি চিনি। ও গাড়ি আমার ছাড়া কারও নয়।"

তালুকদার বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন, "তা হলে দেরি করে লাভ নেই। চলো, গাড়িটাকে ফলো করি।"

আমরা তিনজনে গাড়িতে এসে উঠলাম। তালুকদারই স্টিয়ারিং ধরলেন। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে আমরা আবার ঘাটশিলার দিকে ফিরতে লাগলাম। হেডলাইট জ্বলছিল।

তালুকদার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বললাম, "আপনি কিছু পেলেন নীচে ?"

"না।"

"তা হলে ?"

"কিছুই না। আমার যেটুকু সন্দেহ ছিল তা ভুল।"

সুবীরদা বলল, তার গলা কাঁপছিল, "কিন্তু আমার জীপটা এতদিন পরে কেমন করে ফিরে এল ?"

তালুকদার কোনও জবাব দিলেন না।

আমি বললাম, "গাড়িতে লোক ছিল দেখেছি।"

তালুকদার বললেন, "আমিও দেখেছি। গাড়িটা যখন পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল টর্চের আলো ফেলেছিলাম। লোক ছিল।"

সুবীরদা থরথর করে কাঁপছিল। "ক'জন দেখেছেন ?"

"ঠিক লক্ষ করতে পারিনি।"

আমার হাত চেপে ধরল সুবীরদা, হাতের তালু বরফের মতন ঠাণ্ডা। "তুই ক'জনকে দেখেছিস ?"

আমিও তেমন করে লক্ষ করিনি। তবে লোক ছিল। বললাম, "পেছনে তো দুজন ছিলই।"

সুবীরদা আমার হাত প্রাণপণে চেপে ধরল।

তালুকদার একটু জোরেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। সামনের গাড়িটাকে ধরতে চান।

অন্যভাবে তালুকদার বললেন, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, সুবীর। যদি

বিশ্বাস করে নিতে হয়, কোনও অদ্ভুত কারণে, কী কারণ আমি জানি না, তোমার গাড়ি, তোমার বন্ধু-বান্ধব—সেদিন হঠাৎ যদি অন্য কোনও ডাইমেনশানে চলে গিয়ে থাকে— তবেই এই আশ্চর্য অদ্ভুত জিনিস হয়তো সম্ভব।”

“অন্য ডাইমেনশান— ?” আমি অবাক হয়ে বললাম।

তালুকদার বললেন, “ব্যাপারটা আমি বুঝি না। তবে ফোর্থ ডাইমেনশান নিয়ে আজকাল আকছার কথাবার্তা হয়।” বলে নিজের মনেই বিড়বিড় করলেন, “ভগবান জানেন, কেন কেমন করে ও-সব হতে পারে...”

আমি বললাম, “আপনি কি বলতে চান, সেই ডাইমেনশান থেকে আবার লোকজন, গাড়ি ফিরে এসেছে ?”

“জানি না। হতে পারে।”

“কেমন করে সম্ভব ! গাড়িটা ছিল কোথায়, লোকজনরা বেঁচেই বা থাকবে কেমন করে ?”

“আমায় জিজ্ঞেস কোরো না। আমি কিছু জানি না। বোধহয় কেউই এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না।”

সুবীরদা যেন বেহুঁশ হয়ে বসে ছিল। বলল, “আমি কোনও জবাব চাই না, কিছু জানতে চাই না। শুধু অনিল, মৃগাঙ্ক আর কপিলকে ফেরত চাই।”

তালুকদার গাড়ি আরও জোর করলেন। বললেন, “চলো দেখি, পেতেও পারো। ওরা হয়তো একই বাড়িতে যাচ্ছে।”

“কেমন করে যাবে ?”

“কেন ? যে-সময়টা এর মধ্যে চলে গেছে সেটা আমাদের কাছে বাস্তব। ওদের কাছে বোধহয় নয়।”

আমার মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। এ-সবই যেন ভৌতিক।

সুবীরদা হঠাৎ বলল, “ওরা তো বাড়ি চেনে না। অনিল নয়, মৃগাঙ্ক নয়। কপিলও জানে না। বাড়ি শুধু আমিই চিনতাম। আমাকে বাদ দিয়ে ওরা কেমন করে বাড়ি ফিরবে ?”

তালুকদার চুপ।

আমি ব্যাকুল হয়ে থাকলাম। তালুকদার কিছু একটা বলুন।

কী যে হল বুঝলাম না, তালুকদার হঠাৎ গাড়িটাকে যেন লাফ মেরে এগিয়ে দিলেন। হাওয়ার মতন ছুটতে লাগল গাড়ি।

তালুকদার বললেন, “ওই গাড়ি যদি ফিরে এসে থাকে, তা হলে তোমার বন্ধু অনিল, মৃগাঙ্ক, তোমার ড্রাইভার কপিল সকলেই ফিরে এসেছে। এমন কী, আমি আর আশ্চর্য হব না যদি...” বলতে বলতে থেমে গেলেন তালুকদার।

আমি বুঝতে পারলাম তালুকদার কী বলতে চান। তিনি হয়তো বলতে চান, সুবীরদাও আবার ফিরে এসেছে।

আমার মাথা গোলমাল হয়ে গেল। এ কখনও হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। আমার পাশে যে সুবীরদা বসে আছে তার সবটাই আসল। আমি জানি। অন্য

কোনও সুবীরদা আসতে পারে না। অসম্ভব।

সুবীরদার বন্ধুরা ফিরে আসুক। অনিল, মৃগাঙ্ক, কপিল—সবাই আসুক। কিন্তু অন্য সুবীরদা যেন না আসে।

আমার কিছু করার ছিল না, উত্তেজনায় ভয়ে সমস্ত শরীর কাঁপছিল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলুম— সামনের গাড়িটাকে যেন আমরা রাস্তার মধ্যে ধরে ফেলতে পারি।

কল্পবিজ্ঞান কাহিনী

কিশোর ফিরে এসেছিল

পরপর তিনদিন একই ঘটনা ঘটার পর কৃপানাথ ব্যাপারটাকে আর তামাশা বলে উড়িয়ে দিতে পারল না।

অফিসে, দুপুরের দিকে, কোনওদিন একটা নাগাদ, কোনওদিন দেড় কি দুটোর সময়, পরপর তিনদিনই ফোন এল।

প্রথম দিন ফোন ধরে সাড়া দিতেই ওপাশ থেকে সামান্যক্ষণ কোনও জবাব নেই। একেবারে চুপচাপ। শুধু কেমন এক শব্দ হচ্ছিল, যেন কেউ জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। কৃপানাথ অপেক্ষা করে আবার সাড়া দিল। "হ্যালো?"

এবার ও প্রান্তে গলা শোনা গেল। প্রথমে কাশির শব্দ। তারপর ভাঙা গলায় কে যেন বলল, "কৃপানাথ?"

"কথা বলছি।"

আবার একটু চুপচাপ। শেষে ও প্রান্তের মানুষটি বলল, "আমি কিশোর।"

কিশোর? কৃপানাথ কেমন থতমত খেয়ে গেল। কিশোর! মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছিল না।

"আমি কিশোর।" ও পাশ থেকে ভাঙা গলায় আবার কেউ বলল। "আমি বেঁচে আছি। আমি কিশোর।" তারপর ফোনের লাইন কেটে গেল।

কৃপানাথ কয়েক মুহূর্ত ফোন হাতে দাঁড়িয়ে থাকল। ও পাশে আর কোনও সাড়াশব্দ নেই, ফোন নামিয়ে রেখেছে।

হাতের ফোনটাকে কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখল কৃপানাথ, তারপর নামিয়ে রাখল। কেউ ঠাট্টা-তামাশা করল। কোনও বন্ধু। প্রফুল্ল হতে পারে। প্রফুল্ল মাঝে মাঝে এইরকম তামাশা করে। একেবারে ছেলেমানুষি স্বভাব। বয়স যত বাড়ছে তত মাথায় বদ বুদ্ধি খেলছে। মানুষকে ভড়কে দেওয়া, হকচকিয়ে দেওয়া তার এক ধরনের মজার খেলা। বারণ করলে শোনে না। বলে, কেমন বোকা বানালুম বল।

কৃপানাথের সন্দেহ হল, এটা প্রফুল্লরই কাজ। চার-পাঁচরকম গলা এবং অভিনয়—দুইই সে করতে পারে। কোন এক গ্রুপ থিয়েটারে সে ছোটখাটো পার্টও তো করে। তারই ফাজলামি।

তা ফাজলামি হলেও কিশোরের নাম নিয়ে এরকম তামাশা করা উচিত হয়নি। সব জিনিসেরই মাত্রা আছে। আজ মাস চার-পাঁচ কিশোর বেপাত্তা। সে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে বলে সবাই জানে। যে মারা গিয়েছে, তার নাম করে রঙ্গ করা ভব্যতা নয়। প্রফুল্লকে ধমকাতে হবে দেখা হলে।

কৃপানাথ সামান্য বিরক্ত হলেও ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামাল না প্রথম দিন।

দ্বিতীয় দিনে আবার। সেই একই রকম গলা। একই কথা, "আমি কিশোর। কিশোর। আমি বেঁচে আছি।"

কৃপানাথ খানিকটা রাগ করেই বলেছিল, "কী হচ্ছে কী! তামাশা হচ্ছে?"

ওদিক থেকে আর কোনও সাড়া-শব্দ নেই। ফোন রেখে দিল বোধহয়।

দ্বিতীয় দিনে সত্যিই বিরক্ত হয়েছিল কৃপানাথ। এ কোন ধরনের মজা? যে মানুষটা নেই, তাকে নিয়ে রসিকতা। ছি!

তৃতীয় দিনে আবার যখন ফোন এল, কৃপানাথের কেমন মনে হল, আবার সেই লোকটাই হবে। বিরক্ত এবং রুক্ষ হয়েই ফোন ধরল কৃপানাথ।

যা ভেবেছিল কৃপানাথ ঠিক তাই। সেই একই লোক, একই গলা।

কৃপানাথ রুক্ষভাবে বলল, "বড় বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আর বাড়াবাড়ি করলে বিপদে পড়তে হবে।"

ও পাশ থেকে জবাব এল, "আমি সত্যিই কিশোর।"

" কিশোর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে আজ চার-পাঁচ মাস।"

"না। আমি বেঁচে আছি।"

"বেঁচে থাকলে আসছ না কেন?"

"পারছি না।"

"কোথায় আছ তুমি? তোমার বাড়িতে?"

"না না। অন্য জায়গায়।"

"কোথায়?"

"শুনে তোমার লাভ হবে না। একদিন তোমার সঙ্গে কোথাও দেখা করা যায় না?"

"তুমি আমার মেসে আসতে পারো।"

"না। অন্য কোথাও।"

"কোথায়?"

"দেখি।...পরে বলব।"

তৃতীয় দিনের পর কৃপানাথের কেমন ধোঁকা লেগে গেল। ব্যাপারটা অদ্ভুত নয় শুধু, একেবারেই অবিশ্বাস্য। একটা মরা লোক বেঁচে উঠতে পারে না। তা হলে কি কিশোর মারা যায়নি? তাই বা কেমন করে হবে। সবাই জানে কিশোর মারা গিয়েছে। কিশোরের আত্মীয়-স্বজনরা কি মিথ্যে কথা বলবে! অথচ একটা লোক রোজ ফোন করে কৃপানাথকে জানাচ্ছে, সে কিশোর, বেঁচে আছে সে। আশ্চর্য! লোকটাকে নিশ্চয় অবিশ্বাস করা যায়। কিন্তু অকারণে কেন একটা লোক এই তামাশা করবে!

ব্যাপারটা কৃপানাথের মাথায় আসছিল না। কিশোর বেঁচে আছে—এ কথা সে বিশ্বাস করে না; আবার যে-লোকটা ফোন করছে রোজ—তাকে একেবারে উড়িয়ে দিতেও খটকা লাগছে। সবই রহস্যময়। না, এভাবে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, অনন্তর সঙ্গে কথা বলা দরকার। অনন্ত চালাক চতুর, বুদ্ধিমান। কিশোরের আত্মীয়-স্বজনকে সে ভাল করে চেনে।

কৃপানাথ দেরি করল না। সন্ধের দিকেই অনন্তর বাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

বাড়িতেই ছিল অনন্ত।

অনন্ত খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে আসতেই কৃপানাথের নজরে পড়ল, তার বাঁ পায়ে ব্যান্ডেজ জড়ানো।

"কী রে, পায়ে কী হল?"

"এম টি পি।"

"মানে?"

"গর্তে পড়েছি। দিন চারেক হয়ে গেল। মাথার ওপর লোডশেডিং; পায়ের নীচে মেট্রো রেলের গর্ত। জোর বেঁচে গিয়েছি। পা ভেঙে যেত। অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছে। গোড়ালি মচকে গিয়েছে। তারপর তোর খবর কী? এক হপ্তা ধরে বেপাত্তা! আজকেও ভাবছিলাম, তুই আসবি।"

"খবর অনেক," কৃপানাথ হাসল।

"তা তো হবেই। তোরা খবরের কাগজের অফিসের লোক। ঝুড়ি-ভরতি খবর মাথায় করে ঘুরে বেড়াস।"

"না রে, না," কৃপানাথ হাসিমুখেই বলল, "আমি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করি; ভাউচার লিখি। আমার হল টাকাপয়সার ব্যাপার, খবরের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নেই।...কিন্তু আজ তোকে একটা খবর দিতেই এসেছি। অদ্ভুত খবর।"

অনন্ত ততক্ষণে গদিঅলা সেকেলে চেয়ারে বসে পড়েছে। বসে পড়ে চোটলাগা পায়ে হাত বুলোল। "কী খবর?"

কৃপানাথ সরাসরি অনন্তর দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ তিন দিন—পরপর তিন দিন—দুপুরে একজন আমায় ফোন করছে অফিসে। বলছে সে কিশোর।"

অনন্ত সোজা হয়ে বসল । তাকাল। "কিশোর! যাঃ!"

"তিন দিন পরপর ফোন করল। একই সময় প্রায়। প্রথম দিন আমি ভেবেছিলাম, কেউ ইয়ার্কি মারছে। প্রফুল্লর কাজ। তার পরেও দু দিন ফোন করল। আজ দু-চারটে কথাও হয়েছে।"

অনন্ত বিন্দুমাত্র কানে তুলল না কথাটা। "তোর মাথা খারাপ হয়েছে। কানের দোষ হয়েছে, কৃপা। কী শুনতে কী শুনেছিস! যা যা, কানটা দেখিয়ে আয়।"

কৃপানাথ এবার ঝুঁকে পড়ল, গলার জোর বাড়াল। "না রে, বিশ্বাস কর; আমি বাজে কথা বলছি না। বিলিভ মি!"

"বিলিভ? তোর কথা বিলিভ করার আছে কী! একজন মরা মানুষ তোর সঙ্গে ফোনে কথা বলবে! ভূতের গল্পকেও হার মানালি!"

কৃপানাথ মাথা নাড়তে লাগল। "সত্যিই ভূতের গল্পকে হার মানানোর মতন ব্যাপার। আমি নিজেও বিশ্বাস করছি না। কিন্তু...!"

" কীসের কিন্তু?"

"লোকটা যেই হোক, সে রোজ আমায় ফোন করবে কেন? কীসের স্বার্থ তার?

আমি একেবারে সামান্য মানুষ, হেঁজি পেঁজি ক্লাসের; আমার কাছে ধনদৌলত নেই, কিশোর আমাদের বন্ধু ছিল, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তার সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতাও ছিল না। কাজেই আমার কাছ থেকে কিশোরের নাম করে ভড়কি দিয়ে কারও কোনও লাভ হবে না, লোকসানও হবে না।"

এমন সময় চা এল। অনন্তর বউদি পাঠিয়েছেন। চায়ের সঙ্গে ডালপুরি। অনন্তর বউদিকে আমরা বন্ধুরা সকলেই ছোট বউদি বলি। এমন চমৎকার মানুষ শয়ে একজনও পাওয়া যায় না।

দাশরথি চা দিয়ে চলে গেল।

অনন্ত বলল, "নে, খা।"

"তুই?"

"খাব। তুই নে।" বলে অনন্ত যেন কিছু ভাবল। তারপর বলল, "কেউ বদমাইসি করছে।"

ডালপুরি তুলে নিয়ে কৃপানাথ বলল, "আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু কে করবে? কেন করবে? আর সবাইকে ছেড়ে আমাকেই বা ধরল কেন?"

অনন্ত এবার আর কথা বলল না। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে কপাল ঘষতে লাগল । এটা ওর মুদ্রাদোষ, কিছু ভাবতে বসলেই কপাল রগড়ায়।

কৃপানাথ ডালপুরি মুখে দিল।

খানিকক্ষণ পরে অনন্ত বলল, "গলা শুনে কী মনে হল? কিশোরের গলা?"

"না। গলা কিশোরের মতন নয়। ভাঙা ভাঙা গলা।।"

"তা হলে?"

"কথা বলার ঢঙ কিন্তু কিশোরের মতন। তুই লক্ষ করে থাকবি, কিশোর আমাকে কৃপানাথ বলত না, বলত কৃপা না-থ।·মানে, টেনে টেনে নাথ বলত। অবিকল সেভাবে কৃপানাথ বলল।"

অনন্ত হাত বাড়িয়ে একটা ডালপুরি তুলে নিয়ে মুখের সামনে দোলাতে লাগল। "তুই বলছিস—লোকটা কিশোর হতে পারে।"

"আমি কিছুই বলছি না। ব্যাপারটা কেমন যেন। বুঝতে পারছি না। তাই তোকে বলতে এলাম।"

"আমিও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"তোকেও তো ফোন করতে পারত। তোদের বাড়িতে ফোন আছে।"

"আমাদের ফোন খারাপ। দিন দশেক হল ডেড। বলে বলে হয়রান হয়ে গিয়েছি। কলকাতার টেলিফোন, ঘরে সাজিয়ে রাখা ছাড়া কাজে আসে না।" অনন্ত ডালপুরি মুখে পুরল। "হয়তো চেষ্টা করেছিল, পায়নি।"

"তাই হবে। আমায় কিন্তু কিছু বলেনি।...তোর সঙ্গে কিশোরের বন্ধুত্ব কম নয়। তুই ওদের বাড়ির ভেতরের খবর জানিস। আমিও তাই অবাক হয়ে ভাবছি, কেন তোকে ফোন করল না?"

অনন্ত কোনও কথা বলল না।

দুজনেই চুপচাপ।

ঘরের পাখাটা জোরেই চলছিল। শব্দ হচ্ছে। অনন্তদের নীচের তলার বসার ঘরের একপাশে গলি, অন্যপাশে একফালি পোড়ো জমি। গলি দিয়ে অনবরত রিকশা যাচ্ছে। কুলপিমালাইঅলার হাঁক ভেসে এল। আষাঢ় মাস চলছে। সেই কবে দু পশলা বৃষ্টি হয়েছিল—তারপর আকাশ থেকে মেঘ উধাও। গরম চলছে খুব।

অনন্ত বলল, "মরা মানুষ ফোন করতে পারে না, কৃপা। সামথিং ইজ রং। অন্য কেউ ফোন করছে।"

"কেন?"

"কী জানি!"

"কিশোরের মৃত্যু সম্পর্কে তুই সিওর?"

অনন্ত সন্দেহের চোখে কৃপানাথের দিকে তাকাল। "কী বলতে চাস?"

"কিশোর মারা গেছে আমরা জানি। কিন্তু তার ডেডবডি আমরা দেখিনি।"

"তুই কি কিশোরের মারা যাওয়া নিয়ে সন্দেহ করছিস?"

"না, আমি জানতে চাইছি।"

আর-একটা ডালপুরি শেষ করে কৃপানাথ চায়ের কাপ টেনে নিল।

অনন্ত বলল, "কিশোর মারা গিয়েছে এই খবরটা ওদের বাড়ির লোক জেনেছে দিন তিন-চার পর। জানার পর ওরা মতিহারির দিকে বালুয়াসরাই না কোথায় যেন ছুটে যায়। ফিরে আসে দিন দুই পরে। কিশোরের যে রকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, তাতে কেউ বাঁচে না। তার চেহারার যা বর্ণনা শুনেছি—তুই জানিস—।"

"আমি তোর মুখেই শুনেছি।"

"আমি শুনেছি কিশোরের দাদার কাছে। ওর দাদা বলেছেন, দলা পাকানো একটা মাংসের তাল। চোখ মুখ চেনা যায় না। হাত পা আলাদা করে ধরার উপায় নেই। তার ওপর শেয়ালে শকুনিতে চারদিকে খাবলে রেখেছে। কিশোর যেখানে পড়ে ছিল সেখান থেকে ওকে সরানোর উপায় ছিল না। জঙ্গলের কাঠ আর কেরোসিন তেল ঢেলে সেখানেই সৎকার করা হয়েছে।"

সবই শুনেছে কৃপানাথ অনন্তর মুখে। কিশোরদের বাড়িতে সেই সময় তার যাওয়া হয়নি। কলকাতায় ছিল না। মায়ের অসুখের খবর পেয়ে আসানসোল গিয়েছিল। পরে কলকাতায় ফিরে কিশোরের কথা শুনেছিল। তাদের বাড়িতেও গিয়েছিল। কিশোরের দাদা খুঁটিনাটি কিছু বলেননি কৃপানাথকে। দুঃখই করছিলেন। সবিস্তারে কিছু শুনতে চায়নি কৃপানাথ; অনন্তর কাছে যা শুনেছে সেটাই যথেষ্ট, তাতেই তার গা শিউরে উঠেছিল; আরও বেশি শুনে কী লাভ!

চা খেতে খেতে অনন্ত বলল, "তুই তো ভাবিয়ে তুললি, কৃপা।...লোকটাকে একবার চোখে দেখতে পারলে হত।"

"আমারও তাই মনে হয়।...লোকটা নিজেই দেখা করতে চাইছে।"

অনন্ত অবাক চোখে তাকাল। "বলিস কী?"

"আজ ও নিজেই প্রথমে দেখা করার কথা বলল।"

"কোথায়?"

"সেটা বলল না। পরে জানাবে।"

"তোকে ঠিক ঠিক কী বলেছে শুনি?"

"আমি ওকে আমার মেসে এসে দেখা করতে বলেছিলাম। বলল, অন্য কোথাও দেখা করতে চায়। কোথায় তা বলেনি। পরে জানাবে বলেছে।"

অনন্ত কোনও কথা বলল না আর। চুপচাপ চা খেতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে অনন্ত বলল, "তোর কী মনে হচ্ছে? দেখা করবি?"

"কী করব তুই বল? তোর কাছে জানতে এসেছি।"

"আমার তো মনে হয়, দেখা করা ভাল। লোকটাকে চোখে দেখলে তবু সত্যি-মিথ্যের একটা ধারণা করা যায়!"

"আমারও তাই ইচ্ছে। কোথাও একটা রহস্য রয়েছে, তাই না?"

"রীতিমতো রহস্য। মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে কথা বলছে এর চেয়ে বড় রহস্য আর কী থাকতে পারে রে," অনন্ত হাসল। একটু পরেই গম্ভীর হয়ে বলল, "দুটো জিনিস হতে পারে। এক, কিশোরের নাম করে কোনও জোচ্চোর কিছু মতলব ফেঁদেছে, আর না হয়— কিশোর মারা যায়নি। তবে শেষেরটা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ কিশোরের বাড়ির লোক যখন বলছে সে মারা গেছে, তাকে পুড়িয়ে আসা হয়েছে— তখন অন্য কথা ভাবাই যায় না। কোনও জোচ্চোর কিছু মতলব এঁটে ফোন করছে বলেই মনে হয়। কলকাতা শহরে চোর জোচ্চোরের অভাব নেই। তুই দেখা কর।"

"আমি একা যাব না। তোকেও যেতে হবে।"

"আলবাত যাব। কিন্তু তোর কিশোর যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে না চায়?"

"কিশোর হলে নিশ্চয় চাইবে। কিশোর না হলে চাইবে না।"

"বেশ। আমি রাজি।...দেখা করার দিন ঠিক হলে আমায় জানাবি।"

২

মেসে ফিরে কৃপানাথ শুনল, তার রুমমেট বনবিহারীদা তাঁর অফিসের কোনও বন্ধুর সঙ্গে মুরশিদাবাদ গিয়েছেন। কেন গিয়েছেন বলে যাননি, শুধু জানিয়ে গিয়েছেন, পরশু দিন ফিরবেন। বনবিহারীদা খানিকটা পাগলা গোছের মানুষ। এল আই.সি. অফিসে কাজ করেন। পেশা চাকরি। নেশা, কোষ্ঠী বিচার আর মাছ ধরা। চমৎকার গল্প করতে পারেন। তবে মাঝে মাঝে যখন ভাবাবেগে শ্যামাসঙ্গীত ধরেন তখন কানে তুলো গুঁজতে হয়। তাঁর গলাকে সবাই বলে ডিজেল ইঞ্জিন। বনবিহারীদা কারও কথার তোয়াক্কা করেন না।

বনবিহারীদা নেই। ঘরে কৃপানাথ একা।

স্নান সেরে এসে কৃপানাথ দেখল, সাড়ে আটটা বেজেছে। খাওয়া দাওয়ার দেরি রয়েছে এখনও। একবার মনে হল, ছাদে গিয়ে বসে, একটু হাওয়া খাওয়া যেতে পারে। পরে মনে হল, ছাদে গিয়ে লাভ নেই। মেসের দশ আনা মানুষই এখন ছাদে;

গুলতানি, গলাবাজি, রাজ্যের রাজনীতির খোশগল্প করছে। ভাল লাগে না তার ওসব।

বাতিটা নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল কৃপানাথ। দুটো ভাঙাচোরা জানলা দিয়ে কখনও সখনও এক-আধ ঝলক পথ ভুল-করা হাওয়া আসছিল।

শুয়ে পড়ার পরই আবার তার কিশোরের কথা মনে পড়ল।

কিশোর তার বন্ধু। ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অনন্তর মতনই। কৃপানাথ, কিশোর, অনন্ত, জগন্নাথ সব একসঙ্গে কলেজে পড়াশুনা করত। আরও অনেক বন্ধু ছিল। তারা একে একে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে, কে কোথায় চলে গিয়েছে তার খোঁজও রাখতে পারেনি কৃপানাথ। তারা তিন-চারজনই শুধু কাছাকাছি ছিল। গত বছর জগন্নাথও দিল্লি চলে গেল চাকরি নিয়ে। পড়ে থাকল কৃপানাথ অনন্ত আর কিশোর। সেই কিশোরও গত চার-পাঁচ মাস আগে মারা গেল দুর্ঘটনায়।

দুঃখই হোক আর আঘাতই হোক মানুষ ধীরে ধীরে সহ্য করে নেয়। কিশোর নেই এ-কথা জানার পর তাকে হারাবার দুঃখও সয়ে নিয়েছিল কৃপানাথরা আজ ক'মাসে। কিন্তু যে কোনও একজনের—সে কে কৃপানাথ জানে না, তার ফোন পাবার পর মনটা আবার কেমন হয়ে গেল কৃপানাথের।

কিশোরের কথা এখানে কিছুটা বলতে হয়।

কিশোরদের বাড়ি বাদুড়বাগানে। পুরনো বাড়ি। তার ঠাকুরদার আমলের। এককালে বাড়িটা নাকি বিশাল ছিল। পাঁচ শরিকে ভাগাভাগি হতে হতে কিশোরদের ভাগে যেটুকু পড়েছিল, তাও একেবারে সামান্য নয়। পাঁচ-ছ'টা ঘর, বারান্দা, উঠোন—এসব মিলিয়ে ছোটখাটো দোতলা বাড়ির সমান। কিশোরের মা নেই। বাবা আগেই গিয়েছেন। তার দাদা এবং এক দিদি। ঠিক নিজের নয়, বৈমাত্র ভাইবোন। বড় মা আগেই মারা যান। কিশোরের মা মারা যান স্বামীর মৃত্যুর পর।

কিশোরের মা বেঁচে থাকার সময় সংসারের সব দায়-দায়িত্ব ছিল তাঁর। মা মারা যাবার পর দাদার কর্তৃত্ব শুরু হয়। দাদা এবং দিদির সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ ছিল না কিশোরের। ভালও নয়। মোটামুটি। কিশোর বাড়ির কথা স্পষ্ট করে কখনও বলত না। মুখ ফসকে দু-একবার অবশ্য বেরিয়ে যেত।

কিশোরের হয়তো মনে মনে কোনও দুঃখ ছিল। সে দু-একবার দুঃখ করে বলেছে, 'বাইরে যদি একটা চাকরি পাই চলে যাব। এখানে আর ভাল লাগে না।'

কেন লাগে না তা বলত না।

কিশোর যখন বেকার, কাগজ ঘেঁটে, বাইরের চাকরির জন্যে দরখাস্ত পাঠাত।

শেষ পর্যন্ত সে একটা চাকরি পেয়ে গেল। কিন্তু পুরোপুরি বাইরের নয়। কলকাতায় থাকতে হত কিছুদিন, বাকিটা বাইরে ঘুরতে হত।

চাকরিটা ভাল। একটা আধা-বিদেশি কোম্পানি দিল্লির দিকে রেডিয়ো তৈরির বড় কারখানা খুলেছিল। কলকাতায় তাদের ইস্টার্ন জোনের অফিস। কিশোরকে এই কলকাতার অফিসে চাকরি দেওয়া হল। তার কাজ ছিল, গাদাগুচ্ছের ছাপানো কাগজ, রংচঙে ক্যাটালগ নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো। সোজা কথা, রেডিয়ো

বিক্রির এজেন্ট আর দোকান খুঁজে বেড়াত কিশোর।

কিশোর চাকরিটা পছন্দ করে নিয়েছিল। মাইনেপত্র, বাইরে ঘোরার খাই-খরচা ভাল ছিল। বেড়াতেও পারত নানান জায়গায়।

কিশোর কোনও কালেই চটপটে স্বভাবের নয়। খানিকটা লাজুক, নিরীহ স্বভাবের। কিন্তু তার চেহারা ছিল ছিমছাম। ভাল লাগত দেখতে। ধীরে ধীরে কথা বলত। চোখ দুটো বড় বড়। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বললে, কেমন একটা মায়া পড়ে যেত।

কৃপানাথরা প্রথমে ভেবেছিল কিশোর যা লাজুক, নিরীহ ছেলে, ওর দ্বারা রেডিয়ো বিক্রির দালালি হবে না। ধারণা পালটে গেল। কিশোর তার কাজকর্ম ভালই করছিল।

মাস চার-পাঁচ আগে—ঠিক ঠিক হিসেবে সাড়ে পাঁচ মাস, মানে তখন বসন্তকাল হলেও পড়ন্ত শীত চলছে—ফেব্রুয়ারি প্রায় শেষ, কিশোর কলকাতা ছেড়ে তার কাজে বেরিয়ে গেল। এবার তার বিহারের দিকে যাবার কথা। প্রথমে পাটনা যাবে। সেখানে কাজ সেরে বেরিয়ে পড়বে অন্য অন্য জায়গায়।

পাটনা থেকে কিশোর জানুয়ারির শেষ দিনে বেরিয়ে পড়ে। বাড়িতে সে শেষ চিঠি লেখে পাটনা থেকে। তারপর আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ফেব্রুয়ারির দশ-বারো তারিখে কিশোরের দাদার কাছে খবর আসে, কিশোর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে। তার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে বালুয়াসরাই বা ওই রকম এক জায়গায়।

কিশোরের দাদা কাকে যেন সঙ্গে করে সেইদিনই কলকাতা ছাড়েন।

ভাইকে দাহ করে ফিরে আসার পর কিশোরের দাদা যা বলেছেন, অনন্তই ভাল করে জানে। কৃপানাথ জানে না।

কৃপানাথ শুনেছে, একটা ভাড়া করা জিপে কিশোর আরও তিন-চার জনের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিল। মাইল দশ-বারোর রাস্তা। সন্ধের পর বেরিয়েছিল; রাত হবার আগেই রেল স্টেশনে পৌঁছে যাবার কথা। সেদিন শীত ছিল বেশ; কুয়াশাও। রাস্তাও ভাল নয়। মাঝে এক জায়গায় দু'জন যাত্রী নেমে যায়। জিপে ওরা তিনজন ছিল: কিশোর, এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোক আর গাড়ির ড্রাইভার। মাইল দুই এগিয়ে জিপটা কোনও কিছুর সঙ্গে ধাক্কা মেরেছিল। কীসের সঙ্গে কেউ জানে না। রাস্তার পাশে কোনও বড় গাছ ছিল না। দুপাশে ফাঁকা মাঠ। ধাক্কা লাগার পর জিপটা মাঠে নেমে এসে একেবারে উলটে যায়। তিনজনের কে কোথায় ছিটকে পড়েছিল কে জানে! জিপে আগুন ধরে গিয়েছিল। কিন্তু রাস্তাটা এমনই নির্জন যে, আগুন লাগার ঘটনাটা কারুর নজরে পড়েনি।

পরের দিন আগুনে পোড়া জিপ আর ড্রাইভারকে মাঠে পাওয়া যায়। পাঞ্জাবি ভদ্রলোককেও পাওয়া গিয়েছিল। কিশোরকে কাছাকাছি পাওয়া যায়নি। কিশোরকে পাওয়া গিয়েছিল পরের দিন। মাঠের মধ্যে এক গর্তের মধ্যে পড়ে আছে।

কৃপানাথ মোটামুটি এই রকম শুনেছে। এর বেশি সে জানে না। শোনা কথা, নিজের চোখে দেখা নয়, কাজেই এর কতটা সত্যি কতটা সত্যি নয়—সে কেমন করে

বলবে!

সব ঘটনারই বিবরণে কিছু হেরফের ঘটে যায়; একজন যা বলে অন্যজনে তার থেকে উনিশ-বিশ আলাদা বলে। তবে যে যেমনই বলুক, কিশোর যে মারা গিয়েছে, তাকে দাহ করে আসা হয়েছে—এটা তো ঠিকই। কিশোরের দাদাকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।

তা হলে কিশোর কোথা থেকে আসে? তা ছাড়া এটাও খুব আশ্চর্যের যে, এই রকম লুকোচুরি করে কেন সে যোগাযোগ করছে। কিশোর যদি বেঁচেই থাকে সে কেন নিজের বাড়িতে যায়নি? কেন সে বলছে না, কোথায় আছে সে?

কৃপানাথ কোনও প্রশ্নেরই সদুত্তর পাচ্ছিল না।

আচমকা কে যেন ডাকল কৃপানাথকে।

চমকে উঠেছিল কৃপানাথ। "কে?"

"আমি, দত্ত। অন্ধকারে শুয়ে কী করছেন?"

"এই, শুয়ে আছি।"

"একটা কথা বলার ছিল। 'নিউ বোর্ডিং'-এ কথা বলেছি। মালিকের সঙ্গে। গোটা তিনেক ঘর রয়েছে তেতলায়। ঘরগুলো আমি দেখেছি। চলে যায়। বাথরুম একটা। খরচ-খরচা ধরুন এখানকার থেকে টাকা পঞ্চাশ বেশি। যাবেন নাকি?"

কৃপানাথ উঠে বসতে বসতে বলল, "আপনি যাচ্ছেন?"

"যাব ভাবছি। এই মেসবাড়িটায় আর থাকা যায় না। থার্ড ক্লাস।"

"যান আপনি। আমার পক্ষে এখন সম্ভব হবে না।"

"খরচের কথা ভাবছেন?"

"খানিকটা। তা ছাড়া পুরনো সঙ্গী তো! ছাড়তে মায়া লাগে।" কৃপানাথ হাসল।

দত্ত আর দাঁড়াল না, চলে গেল।

৩

দিন দুই চুপচাপ। আর কোনও ফোন আসছিল না।

কৃপানাথ আবার যেন বোকা হয়ে গেল। সে আশা করেছিল, ও-তরফ থেকে ফোন আসবে। দুপুরে, অফিসে, চঞ্চল হয়ে থাকত; ফোনের আশায় আশায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত। দ্বিতীয় দিনেও যখন ফোন এল না, কৃপানাথের আবার সেই পুরনো সন্দেহ ফিরে এল। তা হলে কি তামাশা? কৃপানাথকে নিয়ে কেউ মজা করছে?

তিন দিনের দিন আবার ফোন।

সাড়া দিয়ে কৃপানাথ বলল, "দু দিন চুপ কেন?" এমনভাবে বলল, যেন ঠাট্টা করছে। ও-পক্ষ যেমনই হোক, কিশোর অথবা অন্য কেউ—কৃপানাথের কৌতূহল, উৎকণ্ঠা বুঝতে না পারে।

"পারিনি," ও পাশ থেকে জবাব এল। "অসুবিধেয় পড়েছিলাম।"

"ও !...তা এখন কী করতে চাও?"

"দেখা করতে চাই তোমার সঙ্গে।"

কৃপানাথ দু মুহূর্ত ভাবল। বলল, "তোমায় দুটো কথা বলতে চাই, খোলাখুলি।...তুমি যে কিশোর এ কথা আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। মরা মানুষ বেঁচে ওঠে না। যাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে, সে কেমন করে বেঁচে উঠবে?"

ও পাশের ফোন সামান্য সময় নিঃসাড় থাকল, তারপর গলা পরিষ্কারের শব্দ। "আমি বেঁচে আছি, কৃপানাথ। কেমন করে বেঁচে আছি, দেখা করে বলব।"

"তুমি নিজের বাড়িতে যাওনি কেন?"

"উপায় নেই।"

"বাড়িতে কিছু জানিয়েছ?"

"না।"

"কেন?"

"অ-নেক কথা, অনেক কথা। ফোনে বলা যাবে না। দেখা হলে বলব।"

"তুমি অনন্তকে ফোন করোনি?"

"করেছি। ফোন পাচ্ছি না। একদিন একবারের জন্যে কে যেন হ্যালো বলেছিল। ছোট বউদির গলা বলে মনে হল।"

কৃপানাথ বলল, "করেছিলে তা হলে?" অনন্তদের ফোন যে অচল তা আর বলল না। "তা তুমি আছ কোথায়?"

"পরে বলব।"

"সত্যিই তুমি দেখা করতে চাও?"

"হ্যাঁ। না হলে তোমায় বলছি কেন!"

কৃপানাথ দু'মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, "আমি অনন্তকে তোমার কথা বলেছি। তুমি যদি দেখা করতে চাও, আমরা—আমি আর অনন্ত—একসঙ্গে যাব। আপত্তি আছে তোমার?"

"না। তোমাদের দু'জনকেই আমার দরকার। নন্তুকে আমি পাচ্ছিলাম না।"

অনন্তর ডাকনাম নন্তু। নামটা বন্ধুরা সকলেই জানে, কিন্তু কিশোর ছাড়া অন্য কোনও বন্ধু তাকে ডাকনামে ডাকে না। কৃপানাথ ফোনে কথা বলতে বলতে কয়েকটা জিনিস লক্ষ করছিল। কিশোর যে নকল কেউ নয়, সে তার প্রমাণ দিচ্ছে। প্রথমত অনন্তকে ফোন করার কথা। যদি কিশোর ফোন না করত, লাইন না-পাবার কথা বলত না। সে ছোট বউদির কথাও বলল। অনন্তদের বাড়ির কথা না জানলে ছোট বউদির কথা বলতে পারত না। তারপর এখন অনন্তর ডাকনাম, যে নামে কিশোর ডাকত অনন্তকে, সেটাও বলল। একটা জিনিস শুধু মিলছে না। কিশোরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল তুইতোকারির। কিশোর একবারও 'তুই' বলল না। কেন?

"কোথায় দেখা হবে?" কৃপানাথ জিজ্ঞেস করল।

সঙ্গে সঙ্গে কোনও জবাব দিল না কিশোর। সামান্য পরে বলল, "আউট্রাম ঘাটে। না হয় আর-এক জায়গায় হতে পারে। মনুমেন্টের তলায়।"

কৃপানাথ ভাবল। "তোমার সুবিধে কোথায়?"

"গঙ্গার দিকটাই ভাল।"

"বেশ। কবে দেখা করতে চাও?"

"কাল, পরশু। পরশুই ভাল।"

"পরশু শনিবার।"

"পারবে না?"

"পারব মনে হচ্ছে। আমার অসুবিধে নেই, অনন্তকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে।"

"কাল আমি ফোন করব?"

"কোরো।"

"তা হলে এখন ছাড়ছি।"

কৃপানাথও তার হাতের ফোন নামিয়ে রাখল।

সন্ধের মুখে আবার অনন্তর বাড়ি।

অনন্তর পা মোটামুটি সেরে গিয়েছে, তবু একটা ক্রেপ ব্যান্ডেজ জড়িয়ে রেখেছে গোড়ালিতে।

"খবর বল।" অনন্ত বলল প্রথমেই।

কৃপানাথ বলল, "খবর বলতেই এলাম। তোর পা অলরাইট?"

"হাঁটতে পারছি। ব্যথা আছে এখনও।"

"গোড়ালির চোট সহজে যায় না।...যাক, তোকে যা বলতে এলাম—।"

"বল।" অনন্ত বসল কাছাকাছি।

"সেই কিশোর আজ আবার ফোন করেছিল। দিন দুই বাদে।"

অনন্ত রীতিমতো কৌতূহল বোধ করে ঝুঁকে পড়ল। "একই লোক? সেম ভয়েস?"

"হ্যাঁ। গলার স্বর এক। কথা বলার ধরন একই রকম।"

"কী বলল?"

"দেখা করতে চায়।...আমি তোর কথা বললাম। বলল, চেষ্টা করেও তোকে ফোনে পায়নি। একবার ছোট বউদি ধরেছিল। লাইন কেটে যাওয়ায় কোনও কথাই বলতে পারেনি।"

মাথা নাড়ল অনন্ত। "ঠিকই বলেছে। আমাদের ফোন সারাদিনে হয়তো এক-আধবার ক্রিরিং...রিং করে উঠল, ফোন তুলতে-না-তুলতেই ডেড্। এ পাড়ায় অনেক ফোন গোলমাল করছে।...তা ও কী বলল? যেতে বলল আমাকেও?"

"হ্যাঁ। আমি বললাম, একলা আমি যাব না, সঙ্গে তুই থাকবি। বলল, নিশ্চয়, তোকে নিয়ে যেতে হবে।"

অনন্ত খুশি হল। "দারুণ!..কবে যেতে হবে? কোথায়?"

"আউট্রামে। পরশু, মানে শনিবার বিকেলে।"

অনন্ত ভাবল ক'মুহূর্ত; বলল, "শনিবার বিকেলে একবার ছোড়দির বাড়িতে যাবার কথা ছিল। সে ম্যানেজ করে নেব।"

কৃপানাথ বলল, "আমি একেবারে ফাইন্যাল করিনি। বলেছি তোর সঙ্গে কথা বলব। কাল ও আর একবার ফোন করে ব্যাপারটা পাকা করে নেবে।"

"ওইটেই পাকা। শনিবার বিকেলে।"

দু'জনেই অল্পক্ষণ চুপচাপ থাকল। শেষে কৃপানাথ বলল, "তুই কিছু ভেবেছিলি?"

মাথা হেলাল অনন্ত। বলল, "না ভেবে উপায় আছে? তুই অ্যায়সা এক ভাবনা মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেলি। আজ ক'দিনই ভাবছি।"

"কী বুঝছিস?"

"কিচ্ছু না। সেদিন ছোট বউদিকে বলছিলাম। বউদি তো হেসে উড়িয়ে দিল। তারপর বলল, কোনও পাগলের কাজ। হয় পাগল, না হয় জোচ্চোর।"

কৃপানাথ দরজার দিকে তাকাল। ছোট বউদি শরবত পাঠিয়েছেন।

একটা বাচ্চামতন ছেলে শরবত এনেছিল। দিয়ে চলে গেল।

লস্যি ধরনের শরবত। চুমুক দিয়েই আরাম লাগল কৃপানাথের। গরমটা আর কিছুতেই যেন যাবে না। কোথায় যে পালাল বৃষ্টি!

অনন্ত বলল, "দেখ কৃপা, লোকটা যদি কিশোর হয়, মানে জাল না হয়ে রিয়েল কিশোর হয়, তা হলে সে কয়েকটা ঘটনার কথা নিশ্চয় বলতে পারবে। তোর মনে আছে, একবার আমরা দিঘায় গিয়ে কিশোরকে নিয়ে নৌকোর ওপর বসে সবাই মিলে একটা ছবি তুলেছিলাম। ফোটোটা আমার কাছে আছে। কে তুলেছিল ফোটোটা, মনে আছে তোর? ক্যামেরা আমাদের, কিন্তু কে তুলেছিল?"

কৃপানাথের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল। বলল, "বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার অবিনাশ চন্দ।"

"রাইট!" মাথা নাড়ল অনন্ত। "অবিনাশদা বেড়াতে এসেছিলেন। আমরা তাঁকে ছেঁকে ধরলাম। তিনি আমাদের ক্যামেরায় একটা ছবি তুলে দিয়েছিলেন। আমরা বেজায় খুশি হয়েছিলাম।"

কৃপানাথের মনে হল, ঘটনাটা মনে থাকার মতন। কিশোরের নিশ্চয় মনে থাকবে, অবশ্য সে যদি বাস্তবিকই কিশোর হয়। "তোর কাছে কিশোরের আরও ফোটো আছে?"

"তিন-চারটে আছে।"

"বেশ। ভাল।"

"আরও একটা কথা ভেবেছি। একবার কিশোর আর আমি মেট্রো সিনেমায় গিয়েছিলাম। শো ভাঙার পর বেরিয়ে এসে দেখি, কলকাতা হাবুডুবু খাচ্ছে। আমরা একটা রিকশা জোটালাম কোনও রকমে। বউবাজারের মোড়ের কাছে সেই রিকশা ভেঙে পড়ল। কিশোরের হাতে লেগেছিল। দারুণ চোট। কেটেকুটে যাচ্ছেতাই অবস্থা। ওকে নিয়ে মেডিকেল কলেজে যেতে হল। কিশোরের এটাও নিশ্চয় মনে থাকার কথা।"

মাথা নাড়ল কৃপানাথ।

"কিশোরকে প্রমাণ দিতে হবে, সে জাল-ভেজাল নয়।"

কৃপানাথ বলল, "এখন পর্যন্ত যা শুনলাম ওর কাছে, তাতে তো জাল বলে মনে হচ্ছে না।"

"আরও বড় প্রমাণ দিতে হবে।"

ভাবল কৃপানাথ। "যদি দিতে পারে?"

অনন্ত বলল, "তা হলে ও রিয়েল কিশোর।"

"মরে যাবার পর আসল কিশোর কেমন করে আসে?"

"আমি ভেবেছি। ও যদি আমাদের কিশোর হয়—বুঝতে হবে ওর দাদা ভুল করেছেন। কিশোর মারা যায়নি।"

"মারা না গেলে কেউ বলতে পারে অমুক মারা গিয়েছে। মারা গিয়েছে জেনেই না পুড়িয়ে এসেছে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু কার মড়াকে কিশোর বলে আইডেনটিফাই করে পোড়ানো হয়েছে—কে বলবে। এটা ইচ্ছাকৃতও হতে পারে।"

কৃপানাথ চমকে উঠল। "ইচ্ছাকৃত? বলিস কী!"

অনন্ত বলল, "তা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে! আগেরটা সত্যি হলে পরেরটাও সত্যি।"

কথাটা উড়িয়ে দিতে পারল না কৃপানাথ। তার মনের মধ্যে একই কাঁটা খচখচ করছে। মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে অল্পক্ষণ বসে থাকল সে। পরে বলল, "তুই যা বলছিস তেমন একটা সন্দেহ আমারও হয়। কিন্তু আমি কিশোরদের বাড়ির ব্যাপার ভাল জানি না। ওর দাদা কেন এমন কাজ করবেন? বাড়িতে কি ওর গণ্ডগোল হচ্ছিল?"

অনন্ত কোনও জবাব দিল না।

কৃপানাথ আবার বলল, "জমি জায়গা সম্পত্তি নিয়ে অনেক সময় ভাইয়ে ভাইয়ে গণ্ডগোল হয়। এ আবার সৎ ভাই। তবু, এমন কীসের রাজা-রাজড়ার সম্পত্তি ছিল ওদের যে, ভাইয়ে ভাইয়ে গণ্ডগোল হবে?"

অনন্ত বলল, "আমি জানি না। একটা জিনিস শুধু জানি, কিশোর বাড়িতে সুখী ছিল না।"

"কেন?"

"তা জানি না।"

"এইজন্যেই ও বাইরে বাইরে চাকরি খুঁজে বেড়াত? দূরে গিয়ে থাকতে চাইত?"

"হ্যাঁ।"

"একটা জিনিস আমি লক্ষ করছি।...কিশোর তাদের বাড়িতে ফিরতে চাইছে না। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলল—যাওয়া সম্ভব নয়। ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়? কেউ যদি না মারা গিয়ে থাকে—অথচ গুজব রটে যায় মারা গিয়েছে, সে তো ফিরে এসে প্রথমেই তার বাড়িতে যাবে। তাই না?"

মাথা নাড়ল অনন্ত। হ্যাঁ।

কৃপানাথ বলল , "ও বাড়ি যেতে চাইছে না, বেশ না যাক। কিন্তু ও তো তোর বাড়িতে আসছে না, আমার মেসে যেতে রাজি হচ্ছে না। কেন? এ সবও তো অদ্ভুত।"

অনন্ত অন্যমনস্ক হয়ে থাকল।

আরও খানিকটা বসে কৃপানাথ উঠল। "কাল তা হলে পরশু দিনের ব্যাপারটা ফাইন্যাল করে নিই?"

"হ্যাঁ, নে।"

"তুই কি আমার ওদিকে আসবি? তুই এলে দু'জনে বেরিয়ে পড়ব।"

"অফিসে তোর ছুটি হয়ে যাবে। আমি মোড়ের চায়ের দোকানে থাকব।"

"ঠিক আছে। চলি তা হলে...!"

রাস্তায় এসে কৃপানাথের হঠাৎ মনে হল, তারা দু'জনে একেবারেই খালি হাতে কিশোর নামের লোকটার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? কলকাতা শহরে কত রকম ঠগ, জোচ্চোর, গুণ্ডা বদমাশ থাকে। যদি কোনও বিপদে পড়ে—কী করবে তখন?

কিছুই করার থাকবে না। শুধু চেঁচাতে পারবে। আউট্রামের দিকে লোকজন কিছু থাকে—তারাই ভরসা।

৪

সময় ছিল সাড়ে পাঁচ। জায়গা নির্দিষ্ট করা ছিল ঝুরি-নামা বড় গাছটার কাছাকাছি। সামনেই গঙ্গা।

কৃপানাথরা একটু আগেই এসেছিল। আজ সারাদিন মেঘলা মেঘলা গিয়েছে। বিকেলের দিকে ঝড়ের মতন হাওয়া উঠেছিল। এখনও তার দমকা রয়েছে। হয়তো আজ বৃষ্টি হবে। আকাশ দেখে সেইরকম মনে হচ্ছিল। মেঘ জমেছে। বাতাসটাও ঠাণ্ডা। দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে।

আউট্রাম আজকাল আর ফাঁকা নিরিবিলি থাকে না। কত লোক যে বেড়াতে, হাওয়া খেতে আসে। গাড়িরও শেষ নেই।

তবু ওরই মধ্যে দক্ষিণের দিকে সরে যেতে পারলে খানিকটা ফাঁকা।

কৃপানাথরা সেই গাছ খুঁজে খুঁজে যেখানে এসে দাঁড়াল সেদিকটা মোটামুটি নিরিবিলি। কাছাকাছি এক জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। দু-তিনটে নৌকো ঘাটের কাছে দুলছিল।

অন্যদিন এ সময় আলো থাকে। সূর্যাস্ত হয়। আজ মেঘের কালোয় আলো ফুরিয়ে গিয়ে ঝাপসা হয়ে আসছিল চারপাশ। ঘড়ির কাঁটা সাড়ে পাঁচ শেষ করে ছয়ের ঘরে ঢুকল। অনন্ত আর কৃপানাথ অধৈর্য হয়ে উঠছিল। কিশোর নামের লোকটা বলে দিয়েছিল, সামান্য দেরি হতেও পারে, কৃপানাথরা যেন চলে না যায়।

ঘড়ি দেখল অনন্ত। ছ'টা বেজে গিয়েছে। বিরক্ত হয়ে বলল, "আর বসবি?"

কৃপানাথ আশপাশ লক্ষ করছিল। মানুষজন রয়েছে এ দিকে। কেউ বেড়াচ্ছে, কেউ বা বসে আছে উদাস ভাবে। উঠে পড়ছে কেউ কেউ। আকাশের অবস্থা ভাল নয়।

"আর একটু দেখি," কৃপানাথ বলল।

"দেখতে দেখতে বৃষ্টি চলে আসবে। দেখছিস না পালাচ্ছে সব। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।"

"আর দশ মিনিট।"

অনন্ত একটা সিগারেট ধরাল। বলল, "ব্যাপারটা ব্লাফ। কেউ রগড় করেছে।"

কৃপানাথেরও সন্দেহ হচ্ছিল। কেউ তামাশাই করেছে।

আরও খানিকটা অন্ধকার হয়ে এল। গঙ্গার বাতাস বইতে লাগল হু হু করে। লোকজন আরও কমে গেল, চলে যাচ্ছে সবাই।

অনন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠি উঠি করছে, এমন সময় নজরে পড়ল, কে যেন তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটাকে দেখতে দেখতে অনন্ত কৃপানাথের হাত ধরে টানল। "দ্যাখ।"

ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যেই লোকটা অনন্তদের সামনে এসে দাঁড়াল। কাঁপছে। অপলকে দেখছিল দু'জনকে।

হঠাৎ কৃপানাথ বলল, "কিশোর?"

লোকটা কাঁপতে লাগল। তার হাত থরথর করে কাঁপছে। "হ্যাঁ।"

অনন্ত একদৃষ্টে দেখছিল। কথা বলল না।

কৃপানাথের গলা কেমন শুকিয়ে আসছিল। "চেনা যাচ্ছে না।"

ঘড়ঘড়ে গলায় লোকটা বলল, "আমি কিশোর। তুমি কৃপা, ও নন্তু।"

অনন্ত বলল, "আমি নন্তু কে বলল?"

"তুমি নন্তু। তোমার ডান হাতের কনুই বেঁকা। ভেঙে গিয়েছিল। সেট্ হয়নি ভাল করে।"

অনন্ত নিজের অজান্তে ডান হাতের কনুইয়ে হাত দিল।

সামান্য চুপচাপ। লোকটা বলল, "আমায় চিনতে পারছ না?"

মাথা নাড়ল অনন্ত। "তোমার সমস্ত চুল সাদা। কপালে দাগের মতন দেখাচ্ছে। তোমার মুখের একটা পাশ বেঁকা মতন। কিশোরের এসব ছিল না।"

লোকটা কেমন থতমত খেয়ে গেল। এগিয়ে এল আরও কাছে। বলল, "আমায় ভাল করে দ্যাখো। এখানে অন্ধকার। কোথাও যদি আলো থাকে একটু চলো। দ্যাখো আমাকে। আমি কিশোর। তোমার ছেলেবেলার বন্ধু নন্তু। আমরা একসঙ্গে হেয়ার স্কুলে পড়তাম।"

কৃপানাথ তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা আদল খুঁজে পাচ্ছিল পুরনো কিশোরের। মুখের ছাঁদটা ঠিকই রয়েছে। বলল, "তোমার মুখের একটা পাশ, চুল এ সব এমন করে বদলাল কেমন করে?"

"সে অনেক কথা।"

"কী কথা!"

অনন্ত বাধা দিল। বলল, "দাঁড়াও। তুমি যে কিশোর তার আরও প্রমাণ দিতে হবে।...আচ্ছা, স্কুলে আমাদের ফার্স্ট বয় কে ছিল?"

"দশরথ।"

"অঙ্কের মাস্টারমশাই কে ছিলেন, ক্লাস নাইনে।"

"পরিমলস্যার।"

"পিনু কেমন করে মারা গিয়েছিল?"

"জলে ডুবে।"

অনন্ত থ' হয়ে গেল। একেবারে ঠিক ঠিক বলছে লোকটা। মাথা চুলকোতে লাগল অনন্ত। তারপর দিঘার কথা জিজ্ঞেস করল। ফোটো তোলার কথা। লোকটা ঠিকঠাক বলে দিল। অনন্ত বলল, "একদিন আমরা সিনেমায় গিয়ে শো ভাঙার পর বেরিয়ে এসে দেখি কলকাতা জলে ভাসছে। তখন আমরা কী করেছিলাম, কী হয়েছিল—তোমার মনে আছে?"

"হ্যাঁ।...আমরা রিকশা করে ফিরছিলাম। রাস্তাঘাট জলে ভরতি। বউবাজারের মোড়ে রিকশা ভেঙে পড়ল। ট্রামলাইনের লোহায় লেগে আমার হাত কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল ভীষণ। তুমি আমাকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে। চার-পাঁচটা স্টিচ পড়ল।"

অনন্ত স্তম্ভিত। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে, তারপর কৃপানাথের দিকে মুখ ফেরাল। যেন এরপর তার আর কিছু বলার নেই।

বাতাসের দমক বাড়তে বাড়তে ঝড়ের মতন হয়ে উঠেছিল। আরও ঘোলাটে কালচে হয়ে গেল চতুর্দিক। গঙ্গার জল ছলছল শব্দ করছিল; জোয়ার আসছে বোধ হয়। নৌকোগুলো দুলছিল।

আর বসে থাকা যায় না। বৃষ্টি আসতে পারে যে কোনও সময়ে।

কৃপানাথ বলল, "বৃষ্টি আসছে। ভিজতে হবে।"

অনন্ত উঠে পড়ল। "শেলটার দরকার। উঠে পড়।"

কৃপানাথ আর অনন্ত উঠে দাঁড়াতেই লোকটা বলল, "রাস্তায় একটা বাস খারাপ হয়ে পড়ে আছে। যাবে?"

"চলো," অনন্ত বলল।

বাসের ড্রাইভার কাছাকাছি কোথাও গিয়েছে। একজন কন্ডাক্টার বাসের মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে শুয়েছিল। ভেতরটা অন্ধকার। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আচমকা জোর হয়ে উঠল।

কন্ডাক্টারকে জিজ্ঞেস করেই ওরা তিনজন বাসের পেছন দিকে বসল। তেড়ে বৃষ্টি এলেও তার ঘটা নেই। বোধ হয় বেশিক্ষণ চলবে না। পরে আবার এলেও আসতে পারে, রাত্রে।

বসে থাকতে থাকতে কৃপানাথ বলল, "তুমি কোথায় আছ?"

"খিদিরপুরে।"

"কোথায়?"

"মাঝেরহাট ব্রিজের দিকে যেতে ডান দিকে।"

"সেখানে কে থাকে?"

"জর্জ বলে একটা লোক। আমাকে আশ্রয় দিয়েছে।"

"তুমি কবে কলকাতায় এসেছ?" কৃপানাথই কথা বলছিল।

"প্রায় একমাস।"

"এতদিন কী করছিলে?"

"কী করছিলাম!" লোকটা বলল, বলে চুপ করে গেল। সামান্য থেমে আবার বলল, "ভাবছিলাম কী করা যায়! সাহস হচ্ছিল না তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার। তোমরা হয়তো আমায় বিশ্বাস করবে না।...ভাল কথা, আমাকে তোমরা বিশ্বাস করেছ?"

কৃপানাথ এবং অনন্ত চুপ। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর অনন্ত বলল, "আমার আর-একটা কথা আছে। তুমি যদি ঠিকঠাক জবাব দিতে পারো, আমি বিশ্বাস করে নেব।"

"বলো?"

" তুমি কলকাতা ছাড়ার আগের দিন আমাদের বাড়িতে এসে কিছু কি ফেলে গিয়েছিলে?"

"তোমার বাড়িতে?...না, আমি মনে করতে পারছি না।...দাঁড়াও, আমার পেলিক্যান কলমটা আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে পাইনি। ভেবেছিলাম কোথাও হারিয়ে ফেলেছি। কালো রঙের কলম।"

অনন্ত কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকল। তারপর বলল, "তুমিই ঠিকই বলেছ! কলম। কলমটা তুমি আমার ঘরে ফেলে গিয়েছিলে।" বলে অনন্ত থেমে গেল। আবার বলল হঠাৎ, "আমি ভীষণ অবাক হয়ে যাচ্ছি। তুমি যা যা বলেছ, সব ঠিক। একমাত্র কিশোর ছাড়া এত খুঁটিনাটি কথা কেউ জানতে পারে না! তুমি কি সত্যিই তা হলে কিশোর?"

"হ্যাঁ। আমি কিশোর। তোমার ছেলেবেলার বন্ধু, নন্তু।" বলে লোকটা কৃপানাথের দিকে মুখ ফেরাল। "তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না, কৃপা?"

কৃপানাথ বলল, "হচ্ছে, আবার সব কেমন হেঁয়ালি মনে হচ্ছে।"

"আমার কাছেও ব্যাপারটা হেঁয়ালি! আমিও বুঝতে পারি না আমার কী হয়েছিল? কে আমায় বাঁচিয়ে তুলল? কেমন করে আমি বেঁচে গেলাম!"

তিনজনেই চুপ। জোর বৃষ্টি নেমে গিয়েছে। আকাশে মেঘ ডাকছিল। বাসের সামনের দিকে কন্ডাক্টর ছেলেটি একটা বিড়ি ধরাল। কিছু বলল কৃপানাথদের।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর কৃপানাথ বলল, "আমরা তোমায় কিশোর বলেই মেনে নিলাম। কিন্তু এই ধাঁধার জবাব তোমায় দিতে হবে।"

কিশোর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। পরে বলল, "সব জবাব আমি দিতে পারব

না। কেননা আমি নিজেই জানি না, বুঝতেও পারি না।”

“যতটা পারো তার জবাব দাও।...অ্যাক্সিডেন্টের কথা কি মিথ্যে?”

“না,” মাথা নাড়ল কিশোর, “সত্যি।”

“তা হলে?”

“তুমি জানতে চাইছ, তারপর কী হয়েছিল?” কিশোর তার ডান হাত তুলে নিজের গলার কাছে রাখল। কেন রাখল কে জানে। “কী হয়েছিল আমি জানি না।”

কৃপানাথরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। অনন্ত বলল, “আমরা শুনেছি গাড়ি উলটে গিয়েছিল। আগুন ধরে গিয়েছিল জিপে। তোমরা সবাই মারা গিয়েছিলে।”

কিশোর আবার কাঁপতে লাগল। “আমি জানি না।”

“আশ্চর্য! তুমি বলছ তুমি কিছু জানো না? যদি তুমি না জানো, তা হলে কেন তুমি এখানে এসেছ? কেন নিজের বাড়িতে যাওনি? কেন বলছ, তুমি মরোনি, বেঁচে আছ!”

“আমি তোমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলছি না। অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে যাচ্ছে। এই পর্যন্ত আমি জানি। তারপর জানি না।”

কিশোরের দিকে তাকিয়ে থাকল কৃপানাথ। বলল, “বাঃ, তারপর কিছু না জানলে তুমি যে কিশোর তাই বা কেমন করে জানলে?”

অনন্ত বলল, “তোমার এই ধাঁধাটা আমাদের একটু গুছিয়ে বলো। আমরা কিন্তু যে তিমিরে পড়েছিলাম সেই তিমিরেই পড়ে আছি।”

কিশোর হাত বাড়িয়ে বাইরের দিকটা দেখাল। বলল, “বৃষ্টি কমছে। ধরে যাক, রাস্তায় নেমে বলব। তবে কী জানো, সব কথা বলতেও পারব না, আমি নিজেই জানি না।”

বৃষ্টি ধরল আরও কিছুক্ষণ পরে।

রাস্তায় নামল তিন জনে। জোলো বাতাস বইছে। গঙ্গার হাওয়া। গা শিরশির করে। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি যেন এখনও বাতাসে ভেসে ভেসে গায়ে এসে পড়ছে।

কিশোর বলল, “তোমরা যা শুনেছ অ্যাক্সিডেন্টের কথা, সেটা ঠিকই। কিন্তু ভুলও কিছু শুনে থাকতে পারো। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমরা ছ'-সাত জন একটা ভাড়াটে জিপে চাপি। জিপগাড়িটার চেহারা দেখলে তোমরা চড়তে সাহস পেতে না। কলকাতার মল্লিকবাজারে ভাঙা চোরা গাড়ির যেমন চেহারা দ্যাখো, সেই রকম। কিন্তু ওসব দেহাতি জায়গায় ওইগুলোই চলে; দু-একটা বরাতজোরে জুটেও যায়। আমরা সন্ধের মুখে মেহেরা বলে একটা জায়গা থেকে গাড়িতে চেপেছিলাম। তখনও শীত চলছে। সেদিন কুয়াশাও জমেছিল খুব। জিপ ছাড়ার আগেই একজন গাড়ি থেকে নেমে গেল। তার উলটি আসছিল, মানে বমি পাচ্ছিল। মাইল তিন-চার এগিয়ে একটা গড় মতন জায়গায় আরও দু'জন নেমে গেল। আমরা চার জন ছিলাম। ড্রাইভার সমেত চার জন।”

কৃপানাথ বলল, “তিনজন না?”

“না, চারজন। ড্রাইভার, এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোক, আমারই বয়েসি একটি ছেলে,

আর আমি। পাঞ্জাবি ভদ্রলোক কাপড়ের ব্যবসা করেন, আর আমার বয়েসি ছেলেটি দ্বারভাঙার দিকের লোক, ঠিক কোথায় তার ঘরবাড়ি জানি না। সে ছোটখাটো কন্ট্রাক্টারির কাজ করে। পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের সঙ্গেই কথাবার্তা তার বেশি হচ্ছিল। আমি চুপচাপ শুনছিলাম।"

"তোমরা কোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলে? মানে রাস্তার পাশে কি বড় বড় গাছ ছিল?" অনন্ত জিজ্ঞেস করল।

"মাঝে মাঝে ছিল; মাঝে মাঝে ছিল না। তবে রাস্তাটা কাঁচা। উঁচু-নিচু। এত কুয়াশা যে, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না একরকম। তার ওপর গাড়ির ধুলো। মাঠের মতন এক জায়গার ওপর দিয়ে যখন জিপ যাচ্ছে, আশেপাশে তাকালে ঘন অন্ধকারে আর কুয়াশায় মনে হচ্ছিল আমরা কোনও সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। যেতে যেতে আমাদের ড্রাইভার কেমন চিৎকার করে উঠল হঠাৎ। বিরাট চিৎকার। তারপর বুঝলাম গাড়িটা একেবারে ঘুরে গেল। কোন দিকে ঘুরল, কেন ঘুরল কিছুই বুঝলাম না। এরপর আমার আর কিছু মনে নেই।"

কিশোর চুপ করে গেল। অনন্তরাও চুপচাপ।

হাঁটতে হাঁটতে বাবুঘাটের কাছাকাছি এসে পড়েছিল ওরা। বৃষ্টি নেই। আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। ভিজে রাস্তা দিয়ে বাস, গাড়ি, লরি যাচ্ছিল। শব্দ উঠছিল চাকার।

কিশোর নিজেই বলল, "অ্যাক্সিডেন্টের পর আমার কী হয়েছিল আমি জানি না। পরে আমি যা শুনেছি তা আরও অদ্ভুত।"

অনন্তরা কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর পথ হাঁটতে লাগল।

কিশোর বলল, "আমি শুনেছি—আমাকে এক বড় গর্ত—মানে মাটির ফাটলের মধ্যে একদল সাধু দেখতে পায়। তারা ভেবেছিল আমি মারা গিয়েছি। পরে বুঝতে পারে আমি বেঁচে আছি। আমাকে ওরা গোরুর গাড়ি জোগাড় করে তাতে চাপিয়ে কাছাকাছি এক মহারাজের আখড়ায় রেখে চলে যায়। ভেবেছিল আমি সুস্থ হয়ে নিজের জায়গায় চলে যাব।"

অনন্ত ফস করে বলল, "আরে এ যে সেই ভাওয়াল মামলা...!"

কৃপানাথ বলল, "জাল প্রতাপচাঁদেরও ওই রকম ব্যাপার না?"

কিশোর বলল, "মহারাজের নাম মধু মহারাজ। তাঁর ছোট্ট একটু আশ্রম। জনা দুই চেলা। মহারাজ সাধন-ভজন করেন। গাছগাছড়ার ওযুধপত্রও জানতেন। তিনি আমার চিকিৎসা করতেন, সেবা করতেন। আমি প্রথম দিকে কথা বলতেও পারতাম না। আমার নাম কী, কোথায় বাড়ি, কোথায় যাচ্ছিলাম—কিছুই খেয়াল করতে পারতাম না। এইভাবে মাস দুই কাটল। এমনিতে সুস্থ হলাম, কিন্তু নিজের পরিচয় কিছুতেই মনে আসত না।"

কৃপানাথ বলল, "স্মৃতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ।...শেষে একদিন এক ঘটনা ঘটল। মহারাজের কাছে এক ভক্ত এল। মাঝবয়েসি। মহারাজের জন্যে ফল মিঠাই আর কাগজে মোড়া এক জোড়া গামছা

এনেছিল। সেই কাগজের টুকরোটা কেমন করে যেন আমার চোখে পড়ে যায়। পাটনার কাগজ। ইংরিজি। তাতে একটা খবর ছিল। সেই খবর পড়ে বুঝলাম, অমুক দিন অমুক সময়ে বালুয়াসরাই বলে একটা জায়গায় এক জিপ গাড়ি সম্ভবত এক পাগলা হাতির সামনে গিয়ে পড়ে। গাড়ি বাঁচাতে গেলে পুরো জিপটাই রাস্তা থেকে ছিটকে মাঠে গিয়ে পড়েছিল। আগুন ধরে যায় জিপে। আরোহীরা সবাই মারা যায়।"

অনন্ত একটা শব্দ করে উঠল আতঙ্কের।

কিশোর সামান্য চুপচাপ থাকার পর বলল, "ওই খবরটা পড়ার পর আমার সব মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল আমি কে, কী আমার পরিচয়। পাগলের মতন লাফালাফি শুরু করলাম। মধু মহারাজ বললেন, ব্যাপারটা যদি সত্যি তেমনই হয়, তবে আমি যেন আগে খানিকটা খোঁজখবর করে নিই। যেখান থেকে জিপে চড়ে এসেছিলাম সেখানে পাত্তা লাগাই। তিনি নিজেই পাত্তা আনার ব্যবস্থা করতে পারেন। আমি নিজেই গেলাম পাত্তা করতে। আমায় কেউ চিনল না। বলল, যে বাঙালি ছোকরা তখন এসেছিল, সে মারা গিয়েছে। তাকে পোড়ানো হয়ে গিয়েছে। আমার অফিসে চিঠি লিখলাম, কেউ জবাব দিল না। কলকাতায় বাড়িতে চিঠি লিখলাম, মধু মহারাজের নামে। মহারাজই পরামর্শ দিয়েছিলেন। জবাবই পাই না। শেষে দাদা দু লাইনের জবাব দিল। আমার ভাই মারা গিয়েছে। তাকে সৎকার করা হয়েছে যথাসময়ে। ব্যস, আর কিছু নয়।"

কৃপানাথ বলল, "বলো কী! অন্য কোনও খোঁজ নয়, কোনও..."

"কিচ্ছু নয়।...মহারাজ নিজেই আমার কথাবার্তায় কেমন সন্দেহ করতে লাগলেন। মানে, আমি যা বলছি তা আদপেই ঠিক কি না তা তিনি বুঝতে পারলেন না। শেষে আমায় বললেন, বেটা, তুম দুসরা আদমি।"

অনন্ত পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করল। রীতিমতো উত্তেজিত।

কৃপানাথকে সিগারেট দিল অনন্ত। কিশোরকেও।

সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে কিশোর বলল, "শেষপর্যন্ত একদিন মহারাজকে ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। পকেটে পয়সা নেই, খাওয়া দাওয়া জোটে না। চোরের মতন বিনি টিকিটে গাড়ি চেপে, এর-ওর পায়ে ধরে, গালমন্দ শুনতে শুনতে শেষে কলকাতায়।"

"কবে?"

"বললাম না, মাসখানেক হতে চলল।"

"ও হ্যাঁ, বলেছ বটে। তা খিদিরপুরে গেলে কেমন করে?"

"কলকাতায় আসার পথে, একজনের সঙ্গে আলাপ হল। লোকটাকে মন্দ লাগল না। আগে বুঝিনি; পরে বুঝলাম লোকটা চোরাই ব্যবসা করে। নেপাল বর্ডার থেকে হরেক রকম মাল আসে তার কাছে। খিদিরপুর ডকেও তার আসা-যাওয়া আছে। লোকটার আবার ছোট ছোট এজেন্ট আছে। তারা মাল নিয়ে গিয়ে চৌরঙ্গিতে দেয়। লোকটার নাম জর্জ। বাঙালি নয়। বেহারি ক্রিশ্চান। তবে বাংলা বলতে পারে আমাদের মতন।"

"লোকটা তোমায় দিয়ে কোনও কাজ করায়?" কৃপানাথ বলল।

"এখনও করায়নি। তবে তার মতলব ভাল নয়।"

"কেন?"

"দেখেশুনে মনে হচ্ছে আমাকেও হয়তো তার কাজে লাগাবে।"

"সর্বনাশ। না না, ওসব কাজে ফেঁসো না।"

"ফাঁসব না। কিন্তু আগে আমায় একটা থাকার জায়গা করে দাও। আমার ভাই পয়সাকড়ি নেই।"

অনন্ত আর কৃপানাথ চুপ। ভাবছিল।

হঠাৎ কৃপানাথ বলল, "তুমি আবার কবে আসতে পারবে?"

"কবে আসতে হবে?"

"পরশু! না, তরশু এসো।...এখানে নয়। কার্জন পার্কে। পারবে?"

"পারব।"

"তুমি এসো। দেখি আমরা কী করতে পারি।"

৫

এবার আর দেরি করল না কিশোর, ঠিক সময়ে হাজির হল।

অনন্ত বলল, "আয়।" বলে একটু হেসে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে, "ওল্ড ফ্রেন্ডস, নো তুমি টুমি।"

কিশোর অনন্তর হাতে হাত রাখল। "সেদিন রাত্তিরে আমার ঘুম হয়নি।"

"কেন?"

"এই প্রথম আমাকে কেউ বিশ্বাস করল।...সত্যি বলতে কী, আমি ভেবেছিলাম তোরাও আমাকে বিশ্বাস করবি না। না করলে আমাকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে হত। আর তা না হলে অন্য মানুষ হয়ে জর্জের শাকরেদি করতে হত।"

কৃপানাথ বলল, "চল, ওদিকে ফাঁকায় গিয়ে বসি।"

রাজভবনের দিকে এগিয়ে গিয়ে খানিকটা ফাঁকায় বসল তিনজনে। মাটি ভিজে। গতকাল জোর বৃষ্টি হয়েছে। যে যার পায়ের চটি খুলে যথাসম্ভব প্যান্ট বাঁচিয়ে বসল।

কৃপানাথ বলল, "তোর জন্যে একটা জায়গা ঠিক করেছি। আমার মেসের কাছাকাছি। একজন আমাকে একটা হোটেলের কথা বলেছিল। তাকেই ধরলাম।"

"হোটেল? খরচার ব্যাপার হবে যে!"

"না, তেমন হোটেল নয়; তোর পক্ষে ভালই হবে। আমি দেখে এসেছি। তেতলার শেষের দিকে একটা ছোট ঘর।"

কিশোর বলল, "আমি টাকা কোথায় পাব?"

অনন্ত বলল , 'টাকার ব্যাপারটা পরে হবে। আমরা ভাবছি। তোর টাকা পয়সা যা ছিল সামান্য—জমিয়েছিলি, তা তো আর পাবি না।"

"না," মাথা নাড়ল কিশোর, "মরা মানুষের আবার টাকা কী! ব্যাঙ্কে আমার হাজার

আড়াই টাকা ছিল। জলে গেল।"

কৃপানাথ বলল, "টাকার কথা তোকে এই মুহূর্তে ভাবতে হবে না। আমরা কোনও রকমে এক দু-মাস ম্যানেজ করে দেব। কিন্তু তোকে একটা কিছু জুটিয়ে নিতে হবে। সে পরের ব্যাপার। তুই কবে আসতে পারবি?"

"যে কোনও দিন। কাল বললে কালই।"

"তোর জর্জ কিছু বলবে না?"

"জানিয়ে আসব না।"

"ও যদি স্মাগলার হয়, তুই পালিয়ে এলে সন্দেহ করবে। ভাববে, পুলিশের কাছে গিয়েছিস।"

"ভাবতে পারে।" বলে কিশোর একটু চুপ করে থাকল, ভাবছিল। সামান্য পরে বলল, "আমি ওর ব্যাপার কিছুই ধরতে পারি না। লোকটা স্মাগলার, কিন্তু নানান ধরনের বুড়োবুড়ি ওর কাছে টাকাপয়সা চাইতে আসে। ও দয়া-দাক্ষিণ্য দেখিয়ে দিয়েও দেয় দশ-বিশ টাকা।"

অনন্ত বলল, "আবার দেখবি এরাই ওর লোক। চোরাই মাল পৌঁছে দেয়। যাক গে, জর্জকে নিয়ে ভেবে লাভ নেই। তুই সেরেফ কেটে পড়বি। ও আর কী করবে। এত বড় কলকাতা শহরে তোকে খুঁজবে কোথায়?"

কিশোর মাথা নাড়ল। পালিয়ে আসবে সে। বলল, "আমার সঙ্গে কিন্তু জিনিসপত্র কিছু নেই। একটা কিট্ ব্যাগ বড়জোর। প্যান্ট জামাও দু-তিনটে। তাও জর্জের কৃপায়।"

কৃপানাথ বলল, "ব্যবস্থা একটা করতে হবে। তুই ভাবিস না। এর ওর বাড়ি থেকে জুটিয়ে তোর বেডিং বেঁধে ফেলব।" বলে হাসল।

তিন জনে আরও কিছুক্ষণ হালকা ভাবে কথা বলার পর অনন্ত বলল, "এবার কাজের কথায় আসা যাক।" কৃপানাথের দিকেই তাকাল অনন্ত, "কিশোরকে এনে হোটেলে বসানো গেল। তারপর?"

কৃপানাথ আগেই অনন্তর সঙ্গে কথা বলেছে। আলোচনা করেছে দু'জনে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে কৃপানাথ বলল, "তুই যে কিশোর, তুই বেঁচে আছিস, মারা যাসনি—এটা এস্টাব্লিশ করতে হবে। তাই না?"

কিশোর চুপ করে থাকল। মুখ বিষণ্ণ।

অনন্ত বলল, "আমি কৃপাকে বলছিলাম ওদের কাগজে একটা খবর ছাপুক। পুরো ব্যাপারটা দিয়ে। দারুণ হবে। শোরগোল পড়ে যাবে। বিক্রি বেড়ে যাবে কাগজের। দলে দলে লোক আসবে, রিপোর্টার ছুটবে, ছবি উঠবে কিশোরের। কী বল কিশোর?" অনন্ত বলল ঠাট্টার গলায়।

কৃপানাথ বলল, "কাজের কথা বল।"

অনন্ত বলল, "একেবারে অকাজের কথা বলিনি। তুই বল কিশোর, ব্যাপারটা যদি পাঁচ জনকে জানতে না দেওয়া হয়—খোঁজখবর হবে কেমন করে?"

কিশোর বলল, "খোঁজ খবর করলেই কি যা সত্যি সেটা ধরা পড়বে। আমার মনে

হয় না। আমার দাদা, আমার অফিস বলবে, আমি মারা গিয়েছি। আমাকে পোড়ানো হয়ে গিয়েছে। মধু মহারাজ বলবেন, একটি লোককে তিনি নিজের কাছে রেখে সারিয়ে তুলেছেন—কিন্তু সে যে কে—তিনি জানেন না, মানে তার পরিচয় জানেন না। তখন? লোকে আমাকে জাল কিশোর ভাববে...না, হুট করে কাগজে কিছু বার করা বোকামি হবে।"

অনন্ত বলল, "তা হলে?"

কিশোর, কৃপানাথ—কেউ কথা বলল না; চুপ করে থাকল।

"তুই একটা আলাদা মানুষ হয়ে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বেঁচে থাকতেও তো পারবি না, কিশোর," অনন্ত বলল। "তোর কিশোর নাম পালটে যদু মধু একটা নাম দিলে নামটা বাজারে চলে যাবে—কিন্তু তুই মানুষটা কেমন করে বাঁচবি। শুধু নাম, দু-বেলা দুটি খাওয়া-পরা কি মানুষকে বাঁচায়? বল তুই? যদি তাই হত—তুই এমন করে হন্যে হয়ে আমার খোঁজ করতিস না।"

কিশোর মাথা দুলিয়ে সায় জানাল।

"তুই যে কিশোর, তুই মরিসনি এটাই আমাদের প্রমাণ করতে হবে," অনন্ত বলল, বলে কৃপানাথের দিকে তাকাল। "ঠিক কি না, কৃপা?"

"হ্যাঁ।" মাথা নাড়ল কৃপানাথ।

অনন্ত বলল, "এটা প্রমাণ করার দুটো রাস্তা খোলা রয়েছে। এক, তোর বাড়ি। তোর দাদা দিদি আত্মীয় স্বজনকে বলতে হবে, তুই কিশোর। তারা ভুল শুনেছিল, ভুল করেছিল।"

কৃপানাথ বলল, "যে অবস্থায় ভুল করেছিল সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অ্যাক্সিডেন্ট হবার দিন দুই পরে খবর পেয়েছে তোর বাড়িতে। সেই খবর শুনে ছুটে গেছে অত দূরে। তারপর যে ডেডবডি তারা পেয়েছে তা পচা গলা, মুখ নেই, পা নেই, ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শেয়াল শকুনিতে খাবলানো। এই অবস্থায় ভুল হওয়া স্বাভাবিক।"

কিশোর নীরব থাকল।

অনন্ত বলল, "দু নম্বর রাস্তা হচ্ছে, যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে সেখানে গিয়ে খুঁটিনাটি সবরকম খোঁজ করে, সাক্ষী প্রমাণ জোগাড় করে দেখানো যে, তুই সেদিন মারা যাসনি। এটা কিন্তু ডিফিকাল্ট ব্যাপার। অসম্ভব। তুই না পাবি সাক্ষী, না প্রমাণ।'

কিশোর অন্যমনস্ক, অর্থহীন চোখে অনন্তর দিকে তাকিয়ে থাকল। অনেকক্ষণ পরে বলল, "ওই তেপান্তরে কোথায় আর সাক্ষী পাওয়া যাবে! যারা আমায় তুলে নিয়ে মধু মহারাজের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল—তাদেরই বা কোথায় পাব!"

"তবে?...তা ছাড়া আমাদের পক্ষে অচেনা অজানা জায়গায় গিয়ে অত রকম খোঁজ করা কি সম্ভব। বরং কলকাতায় তোদের বাড়ি গিয়ে কথা বলা যেতে পারে।"

কিশোর বলল, "তোরা যেতে পারিস, কিন্তু লাভ হবে না।"

"কেন?"

"আমার চেহারা পালটে গিয়েছে।"

"চার-ছ আনা পালটেছে, ষোলো আনা নয়," কৃপানাথ বলল।

"তোরাও আমাকে চিনতে পারিসনি।"

"না পারার প্রথম কারণ, আমরা জানতাম তুই মারা গিয়েছিস। কেউ মারা গিয়েছে জানলে তাকে আমরা একভাবে ভেবে নিই। কিন্তু যদি শুনতাম তোর বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ছ' মাস-এক বছর হাসপাতালে থেকে তুই ছাড়া পেয়েছিস, তা হলে তোর চেহারার পরিবর্তন দেখে তুই যে কিশোর নোস, এটা চট করে বলতে পারতাম না। তেমন তেমন অ্যাক্সিডেন্টে মানুষের চেহারা আরও পালটে যায়। যায় না? অনিলদার কথা ভেবে দ্যাখ। আগুনে পুড়ে মরতে মরতে অনিলদা বেঁচে গেল। কিন্তু অনিলদার আগের চেহারা দেখে কে বলবে পরের চেহারাটাও অনিলদার! আসলে বড় ধোঁকাটা ওইখানে। মারা যাবার খবর। ওটাই সব গোলমাল করে দেয়।"

কিশোর কোনও কথা বলল না। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে থাকল।

বৃষ্টি বাদলার দিন, তবু কার্জন পার্কে বিস্তর লোক। ভিজে মাঠেই বসে আছে কত জন, কেউ কেউ আবার কাগজ বিছিয়ে আরাম করে শুয়ে আছে। গাড়িঘোড়ার শব্দ, ট্রামের শব্দ, সেই সঙ্গে শহিদ মিনারের দিক থেকে কোনও তেজালো বক্তার গলার স্বর মাইকের মধ্যে দিয়ে ভেসে আসছিল।

অনন্ত বলল, "আমার প্ল্যান, আমি তোদের বাড়িতে যাব, কিশোর। তোর দাদার সঙ্গে কথা বলব। প্রথমে একা যাব। তারপর কৃপাকে নিয়ে যাব।"

কিশোর বলল, "লাভ হবে না।"

"কেন?"

"আমার মনে হচ্ছে।"

"মনে হলেই হবে না; কেন হচ্ছে বল?"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিয়ে কিশোর সামান্য অপেক্ষা করল, তারপর বলল, "তোরা একটা কথা ভেবে দ্যাখ। দাদা যখন মধু মহারাজের চিঠি পেল—তখন ব্যাপারটা বিশ্বাস করুক আর না করুক, একটু খোঁজ তো করবে। না, আমি দাদাকে যেতে বলছি না, চিঠিপত্রেও তো জানতে চাইতে পারত—ব্যাপারটা কী হয়েছে! কিচ্ছু জানতে চাইল না।"

কৃপানাথ বলল, "তুই নিজেই চিঠি লিখলে পারতিস। না হয় চলেই আসতিস কলকাতায়।"

"ভেবেছিলাম। আসতেও চেয়েছিলাম। মধু মহারাজ বারণ করলেন। বললেন, আগে জানো তুমি যা বলছ তা ঠিক কি না! হুট করে তুমি সামনে গিয়ে পড়লে ওরা তোমায় জাল-জুয়াচোর ভাবতে পারে। তোমাকে তাড়িয়ে দিতেও পারে।" কিশোর থেমে গিয়ে ঘাড় চুলকোতে লাগল। চুল টানল মাথার। আবার বলল, "আমার মনে হয়, মধু মহারাজ আমার কথা বিশ্বাস করেননি। ভেবেছিলেন, আমি পাগলামি করছি। ঝট করে একটা কিছু করার চেয়ে তিনি ভাবছিলেন, সত্যি-মিথ্যে জেনে নিয়ে এগোনোই ভাল।"

কৃপানাথ বলল, "তবু, তুই নিজে চিঠি লিখলে পারতিস। তোর হাতের লেখা

দেখলেও তো বাড়িতে চিনতে পারত।”

“চিঠিটা আমিই লিখেছিলাম। আমার ডান হাতের দুটো আঙুলেই জোর কমে গিয়েছে। বুড়ো আঙুল বেঁকাতে পারি না। পাশের আঙুলটারও একই অবস্থা। আমার হাতের লেখা বদলে গিয়েছে খানিকটা।...তবু সেটা হয়তো চেনা যেত। দাদা চিনতে চায়নি।”

অনন্ত আর কৃপানাথ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

“দাদার স্বার্থ কোথায়?” অনন্ত বলল।

কিশোর কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল। তারপর বলল, “দাদা জানে।”

“তুই জানিস না?”

মাথা নাড়ল কিশোর। “আমি বুঝতে পারি না।...নে ওঠ। চা খেতে ইচ্ছে করছে।”

৬

অনন্ত ভেবেছিল, কিশোরদের বাড়িতে একলাই যাবে প্রথমে, তারপর অবস্থা বুঝে কৃপানাথকেও নিয়ে যাবে। পরে দুই বন্ধু আলোচনা করে দেখল, দু' জনেই যাওয়া ভাল। ক্ষতি কীসের দু' জনে একসঙ্গে গেলে।

কিশোরদের বাড়ি এমন কিছু দূরেও নয়। দুই বন্ধু বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় কিশোরদের বাড়িতে গিয়ে হাজির। একে বৃষ্টি, তায় আলো নেই, সদর দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে দরজা খোলানো গেল।

“নগেনদা বাড়ি আছেন?”

দরজা খুলতে এসেছিল পল্টু। কিশোরের ভাগ্নে। কিশোরের দিদি বোধহয় ভাইয়ের বাড়িতে এসেছেন। তিনি না এলেও পল্টু আসতে পারে, বড়সড় ছেলে সে।

পল্টু অনন্তদের চেনে। বলল, “বড়মামা রয়েছে। তোমরা ভেতরে এসো নন্তুমামা।”

ছাতা গুটিয়ে অনন্ত বলল, “ তুই কি আছিস এখানে? না, বেড়াতে এসেছিস?”

“আমরা আজ এসেছি। কাল যাব।”

পল্টুর সঙ্গে ভেতরে ঢুকে ডান দিকে পা বাড়াল অনন্তরা।

পল্টু বলল, “দাঁড়াও, দরজা খুলে দিই ভেতর থেকে।”

“তোদের এখানে কখন থেকে চলছে? আমাদের সারা দুপুর পাখা চলেনি।”

“এখানেও বিকেল থেকে চলছে।”

পল্টু ভেতরে গিয়ে দরজা খুলে দিল। তার হাতে লণ্ঠন ছিল। রেখে দিয়ে বলল, “বোসো তোমরা, মামাকে ডেকে দিচ্ছি।”

অনন্তরা বসল। সাবেকি বৈঠকখানা। চেয়ার গোটা চারেক, একটা তক্তপোশের ওপর ফরাস পাতা। কোনার দিকে আর্মচেয়ার একটা। গোটা দুই কাঠের আলমারি।

কিশোরের দাদা নগেন্দ্রনাথ ব্যবসাপত্র করেন। জল তোলার পাম্প, মোটর, ডিজেল সেট—এই সবের কারবার। ওয়েলিংটনের কাছে দোকান। মোটামুটি বছর

পঁয়তাল্লিশ বয়েস। কিশোরের চেয়ে অনেকটাই বড়।

অনন্ত আর কৃপানাথ বসে বসে নিচু গলায় কথা বলতে লাগল।

খানিকটা পরে নগেন এলেন। পরনে পাট করা ধুতি লুঙ্গির মতন করে পরা, গায়ে গেঞ্জি। ডান হাতে এক তাবিজ। চোখে চশমা। গোলগাল নধর চেহারা। মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটা।

"কী খবর নন্তু?...আরে কৃপা যে! দু'জনেই একসঙ্গে! বোসো বোসো। তোমাদের আজকাল আর দেখাই পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে আসতে পারো তো! কিশোর নেই, আমরা তো আছি। তোমাদের দেখলে মনটা তবু ভাল লাগে।" নগেন একটা চেয়ারে বসলেন। তাঁর হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার। "কী বিচ্ছিরি অবস্থা বলো তো! একে এই প্যানপেনে বৃষ্টি, তার ওপর লোডশেডিং। কলকাতায় থাকা যায় না। বলো কী খবর? হঠাৎ দু'জনে?"

অনন্ত বলল, "না, এমনি। আমরা দু'জনে এদিকেই এসেছিলাম, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই।"

"ভালই করেছ।...আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। আজকেও তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি দোকান থেকে।...মন টন বড় ভেঙে গেছে, ভাই। কোথথেকে যে কী হয়ে গেল!"

অনন্ত একবার কৃপানাথের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল।

"তোমাদের বাড়ির খবর সব ভাল, নন্তু!"

"হ্যাঁ।"

"তোমার খবর কী কৃপা? তুমি তো কাগজের অফিসে চাকরি করো। আচ্ছা, কী ব্যাপার বলো তো—তোমরা সবাই মিলে কাগজের দাম বাড়িয়ে যাচ্ছ বছরে বছরে..., মানুষকে আর কাগজ পড়তে দেবে না হে?"

কৃপানাথ হাসল। অমায়িক হাসি।

অনন্ত হঠাৎ কৃপানাথকে খোঁচা মারল। "দাদাকে বলো না?"

কৃপানাথ হকচকিয়ে গেল। অনন্তর দিকে তাকাল বোকার মতন।

নগেন কিছুই ধরতে পারলেন না। "কী?"

"দাদাকে বলো না ব্যাপারটা," অনন্ত বলল। বলে নগেনের দিকে তাকাল। "একটা মজার খবর দাদা। কত রকম পাগলই যে জগতে থাকে।"

কৃপানাথ এবার যেন অনুমান করতে পারল। অনন্ত কি সোজা পথ ধরল? কিন্তু সে রকম কথা ছিল না।

নগেন হাসলেন। "যা বলেছ, পাগলের শেষ নেই। সেদিন এক পাগল এসে বাড়িতে যা উৎপাত করে গেল। বলে কিনা, তাকে কাজ দিয়ে রাখতেই হবে, না রাখলে সে সদরে বসে কুকুরের ডাক ডাকবে। বেটাকে তাড়াতে পারি না। ছিনে জোঁক। তা তোমাদের আবার কোন পাগলে ধরল।"

ততক্ষণে অনন্ত একটা মতলব এঁটে ফেলেছে। বলল, "কৃপাদের কাগজের অফিসে একটা লোক মজার এক চিঠি লিখেছে। কোত্থেকে রে কৃপা? মতিহারি না

মধুবনী থেকে?"

"মধুবনী থেকে?" নগেন অবাক। "কীসের চিঠি?"

"লিখেছে, আমি এখানে একটি বাঙালি ছেলেকে...ইয়ে মানে—আমার বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর করে রেখেছি। তার বাড়ি কলকাতায়। নাম কিশোর মিত্র।..."

অনন্তকে কথা শেষ করতে দিলেন না নগেন, ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কিশোর! আমাদের ছোটকু! কী বলছ তুমি?"

কৃপানাথ এতক্ষণে অনন্তর চালটা ধরতে পারল। অনন্ত ভাল দাবা খেলে। সে যেন মোক্ষম এক দাবার চালের মতন একটা চাল চালছে। সামলাতে পারবে তো?

অনন্ত বলল, "পাগলের কাণ্ড। লিখেছে, ছেলেটির নাম কিশোর মিত্র। সে বলছে, তার নাকি এক অ্যাক্সিডেন্ট হয়। লোকে ভুল খবর দিয়ে তাকে মেরে ফেলেছে। এমনকী, পাটনার কাগজেও ভুল খবর ছাপা হয়েছে। ছেলেটি নানা জায়গায় চিঠিপত্র লিখেছে, কেউ তাকে পাত্তা দিতে চাইছে না।" বলে অনন্ত এমন এক মুখের ভাব করল—যেন এই মজাদার গল্পটা শুনিয়ে সে নিজেও মজা পাচ্ছে।

এমন সময় ভেতর থেকে পল্টু চা নিয়ে এল। দু' কাপ। কৃপানাথ আর অনন্তকে দিল।

নগেন তখনও অনন্তদের দিকে তাকিয়ে। খানিকটা অবাক তিনি। খানিকটা অবিশ্বাসের ভাব রয়েছে তাঁর মুখে চোখে। বোধ হয় মনোযোগ দিয়ে নজরও করছেন কৃপানাথদের।

পল্টুর সামনেই নগেন বললেন, "লোকটার নাম কী?"

ঝট করে কোনও নাম অনন্তর মুখে এল না। নাম ভাবার সময় নিতে সে কথাটা এড়িয়ে গেল; নগেনকে বলল, "আপনি চা খাবেন না?"

"না। একটু আগেই খেলাম। তোমরা খাও।"

পল্টু দাঁড়িয়ে থাকল না, চলে গেল।

"নামটা মনে নেই তোমাদের?" নগেনই আবার জিজ্ঞেস করলেন।

অনন্ত কৃপানাথের দিকে তাকাল। "কী নাম রে, কৃপা?"

কৃপানাথ সামান্য থতমত খেয়ে গেল। সামলে নিয়ে বলল, "কী জানি! নাম টাম আমার মনে নেই। গোবিন্দদা—মানে যিনি আমাদের কাগজের চিঠিপত্র দ্যাখেন—তিনি আমায় বলছিলেন।"

"তোকে তো বলবেনই," অনন্ত ওপরচালাকি করে বলল, "তুই কিশোরের বন্ধু। উনি নিশ্চয় জানেন। তাই বলছিলেন।"

কৃপানাথ আরও বেসামাল হয়ে যাচ্ছিল। অনন্ত তাকে আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেলে দিচ্ছে তো! চট করে একবার নগেনের মুখটা দেখে নিয়ে কৃপানাথ বলল, "কিশোর মাঝে মাঝে আমাদের অফিসে আমাকে ডাকতে যেত। গোবিন্দদা ওকে দেখেছে।"

নগেন একটা সিগারেট ধরালেন। "তুমি কবেকার কথা বলছ, কৃপা?...কবে এসেছে চিঠিটা?"

"তা...তা ধরুন সপ্তাহ খানেক হবে। আগেও আসতে পারে। আমি দিন সাতেক

আগে শুনেছি।

সিগারেটের ধোঁয়া গিললেন নগেন। অন্যমনস্ক। বললেন, "চিঠিটা কোথ্‌থেকে এসেছে বললে?"

"আমার ঠিক মনে পড়ছে না। বোধ হয় মধুবনী থেকে। ওদিকে মতিহারী, মধুবনী, মুঙ্গের, মজফ্‌ফরপুর—এত 'ম'-এর ছড়াছড়ি..."

"তা ঠিক। তবে মতিহারী আর মধুবনীর মধ্যে অনেকটা তফাত। কত মাইল তা বলতে পারব না, ওদিক তো আসা-যাওয়া নেই। তবু আমার মনে হয় একশো-সওয়াশো কিলোমিটারের কম তো নয়ই। বেশি হতে পারে। মজফ্‌ফরপুর হয়ে মতিহারী; আর তোমার সমস্তিপুর দ্বারভাঙা হয়ে বোধ হয় মধুবনী। মতিহারী প্রায় ইউপি-র কাছাকাছি গিয়ে পড়ল।...তা যাক গে ওসব কথা। ছোটকুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল মতিহারীর দিকে।"

কৃপানাথ আড়চোখে অনন্তর দিকে তাকাল। অর্থাৎ বলতে চাইল, নে—এবার সামলা!

অনন্ত চতুর ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে বলল, "চিঠিটা দেখতে পারলে হত। তুই নিজের চোখে দেখেছিস, কৃপা?"

কৃপানাথ সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল। "না।"

অনন্ত বলল, "একবার দেখলেই পারতিস নিজের চোখে। পাগলামির বহরটা বুঝতিস। তবে—" বলে নগেনের দিকে তাকাল, "বুঝলেন দাদা, এমনি কথার কথা বলছি। অ্যাক্সিডেন্ট যেখানেই হোক, কিশোর যদি বেঁচেই থাকে, ঘুরতে ঘুরতে দু-চার শো মাইল তফাতে চলে যেতেও পারে।"

নগেন মাথা নাড়লেন। অবিশ্বাসের গলায় বললেন, "আরে দু-চার শো কেন—আরও বেশি চলে যেতে পারে। সেটা কোনও কথা নয়। ছোটকু বেঁচে থাকলে তার বাড়িতেই তো আসতে পারত। নয় কি? ও সব কাগজের গপ্প আমি বিশ্বাস করি না। আমি নিজে তার ডেডবডি পুড়িয়ে এসেছি।" বলে নগেন হঠাৎ চুপ করে গেলেন। গা কাঁপিয়ে চোখ বন্ধ করে শিউরে ওঠার মতন ভাব করলেন, তারপর বললেন, "সে কী দৃশ্য নন্তু! তাকানো যায় না। তোমার সারা গা গুলিয়ে উঠবে, বমি করবে, কাছে দাঁড়াতে পারবে না—এমন দুর্গন্ধ। পুরো বডি তালগোল পাকানো একটা মাংসের ডেলা। মাথা মুখের বারো আনাই নেই। কোথায় যে হাত পা বোঝা যায় না। তার ওপর শেয়ালে-শকুনিতে খুবলে ছিঁড়ে একাকার করেছে। এমন জঘন্য দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি।...সত্যি বলতে কী জানো, ছোটকুর ওই অবস্থা দেখে আসার পর—আমার খাওয়া ঘুম গেল। খেতে বসলে বমি আসত, ঘুমোতে পারতাম না। শরীরটা আমারও তখন থেকে ভেঙে গেল।" থামলেন নগেন। উদাস চোখে ছাদের দিকে তাকালেন। নিচু গলায় বললেন, "একেই কপাল বলে। কতবার ওকে বলেছি, তুই চাকরি চাকরি করে ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন? তোর খাওয়া-পরার অভাব! বেশ তো, দোকানে গিয়ে বোস। ফ্যামিলির ব্যবসা। শুনল না—চাকরি চাকরি করে নাচতে লাগল। কী বলব, বলো?"

কৃপানাথের মনে হল, নগেন যেন আফসোসই করছেন। চালাকি বলে মনে হচ্ছে না।

চা শেষ করে অনন্ত পায়ের কাছে কাপটা নামিয়ে রাখছে—এমন সময় আলো চলে এল।

আলো এলেই সবাই যেমন স্বস্তির ডাক ছাড়ে, সেইভাবে ভেতরে কারা ডাক ছাড়ল। নগেন নিজেই উঠলেন। বাতি জ্বালালেন, পাখা চালালেন। নিবিয়ে দিলেন লণ্ঠনটা।

"চিঠিটা একবার আমায় দেখাতে পারো?" নগেন বললেন।

কৃপানাথ চোরা চোখে অনন্তকে দেখে নিল। "খোঁজ করতে হবে। গোবিন্দদা চিঠিটা রেখে দিয়েছেন, না, ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়েছেন—জানি না।"

"একটু খোঁজ কোরো তো!"

"করব।"

"আমায় জানিয়ে দেবে কেমন করে? তোমার অফিসে ফোন করব? নাকি তোমাদের কাগজের অফিসে যাব আমি?"

"না না, আপনাকে যেতে হবে না। আমিই বরং এসে জানিয়ে যাব।"

"খুব ভাল হয়।...চিঠিটা কোথা থেকে এসেছে, কে লিখেছে, তার নাম ঠিকানা—সব জেনে আসবে? পারলে একবার চিঠিটাই নিয়ে এসো। দেখব।"

"অফিসের চিঠি বাইরে নিয়ে যেতে দেবে না, দাদা।"

"ও! তাও তো ঠিক।...কপি টপি করিয়ে নিতে পারো?"

"দেখব।"

কী ভেবে নগেন বললেন, "ছোটকুর বেঁচে থাকার কথাই ওঠে না।...কিন্তু হঠাৎ এ কথা উঠবেই বা কেন? একটা খোঁজ নেওয়া দরকার।"

অনন্ত উঠে পড়ল। বলল, "ব্যাপারটা একেবারেই সিরিয়াস নয়, দাদা। কীসের খোঁজ নেবেন! পাগলের কাণ্ড। আর খবরের কাগজে কত অদ্ভুত চিঠি আসে।...আমরা আজকের মতন যাই। পরে একদিন আসব।"

"এসো। যখন খুশি এসো।...তা কৃপা, তুমি আমাকে একটা খবর দিচ্ছ!"

মাথা হেলিয়ে কৃপানাথ জানাল, খবর দেবে।

বাইরে এসে কৃপানাথ বলল, "তুই তো আচ্ছা ঝামেলা করলি?"

অনন্ত হাসল। বলল, "মাথায় একটা বুদ্ধির ঢেউ খেলে গেল। অন্ধকার ঝোপে-ঝাড়ে একটা ঢিল ছুড়লাম, বুঝলি?"

"তা বুঝলাম। কিন্তু আমায় প্যাঁচে ফেললি। আমি এখন কোত্থেকে মধুবনীর চিঠি জোগাড় করি?"

"দূর! চিঠির আবার ভাবনা। লিখিয়ে দেব।...ফল্‌স ঠিকানা থাকবে। তুই তো আর চিঠি দেখাচ্ছিস না! ঘাবড়াও মাত।"

কৃপানাথ ভরসা পেল না। "তুই যে কোথায় একটা ঝঞ্ঝাট পাকাবি, কে জানে!"

"কিস্যু হবে না। বরং প্যাঁচটা দারুণ হয়েছে, বুঝলি কৃপা!...একটা জিনিস তুই নজর করলি না? নগেনদা রীতিমতন ডিসটার্বড। মানে, ওষুধ একটু ধরেছে।...আরও একটা জিনিস তুই লক্ষ করিসনি। নগেনদা একবারও বললেন না যে, তিনি নিজেই আগে একবার একটা চিঠি পেয়েছিলেন, মধু মহারাজের চিঠি। কেন বললেন না? চেপে গেলেন কেন?"

কৃপানাথ এ-ব্যাপারটা খেয়াল করেনি। অনন্তর কথায় সে অবাক হয়ে বলল, "সত্যি তো! সেই চিঠিটার কথা উনি চেপে গেলেন কেন?"

কিশোরের জায়গা হয়েছিল নিউ বোর্ডিংয়ের তেতলার একটা ছোট ঘরে। ঘরের সামনে একফালি ফাঁকা জায়গা, তার একপাশে বোর্ডিংয়ের রাজ্যের ফেলে দেওয়া কাঠকুটো, প্যাকিং বাক্স, ঝুড়ি, ভাঙা শিশি-বোতল স্তূপ করে রাখা আছে।

তেতলার তিনটে ঘরের মধ্যে দুটো ভরতি হয়েছে, ফাঁকা পড়ে আছে অন্যটা। কৃপানাথের মেসের দত্ত এখনও বোর্ডিংয়ে আসেনি; আসবে। সে এলে বাকি ঘরটাও আর খালি পড়ে থাকবে না।

কৃপানাথ আর অনন্ত কিশোরের জন্যে যতটা পারে জুটিয়ে এনে তাকে বোর্ডিংয়ে থিতু করে দিয়েছে। বিছানা জুটেছে, একটা পুরনো সুটকেস, খানকতক মোটা মোটা বইপত্রও। বোর্ডিংয়ের ম্যানেজারকে বলা হয়েছে, কিশোর রীতিমতন পণ্ডিত ব্যক্তি, হুগলি নদীর তীরে কেমন করে জনবসতি গড়ে উঠল ধীরে ধীরে তার গবেষণা করছে।

কিশোরের চেহারা আর মাথার চুল দেখে ম্যানেজারবাবুরও ধারণা হয়েছে, মিত্তিরবাবু বিদ্বান লোক, তাঁকে ঘাঁটানো উচিত নয়।

কিশোর একরকম ভালই আছে আজ দিন সাতেক। তাকে কেউ বিরক্ত করে না। পাশের ঘরের ভদ্রলোক যাত্রা থিয়েটারে ছোটখাটো পার্ট করেন, তাঁকে বড় একটা দেখাই যায় না।

সেদিন সন্ধে নাগাদ কৃপানাথ এসে বলল, "তোর দাদা আজ আবার লোক পাঠিয়েছিলেন।"

কিশোর জানে, কৃপানাথরা কোন পথ দিয়ে এগোচ্ছে। সে সবই শুনেছে। তা ছাড়া বিকেলের দিকে হয় অনন্ত আসে, না হয় একটু দেরি করে আসে কৃপানাথ—তিন বন্ধু মিলে নানান রকম পরিকল্পনা হয়, কথা হয়। এখন পর্যন্ত অবশ্য কাজের কাজ কিছু হয়নি।

বাইরে ছাদে ভাঙাচোরা কাঠের চেয়ার টেনে দু বন্ধু বসল। আজ আবহাওয়া ভাল। গরমটাও কম। বাতাস রয়েছে।

কিশোর বলল, "তোরা বোধ হয় ধরাই পড়ে যাবি!"

কৃপানাথ মাথা নেড়ে বলল, "চান্স কম।...আমি গোবিন্দদাকে ম্যানেজ করেছি। গোবিন্দদা ছুতো করে পাশ কাটাচ্ছে। বলছে, কাগজে যেসব চিঠিপত্র এডিটারের নামে আসে, সেগুলো কাউকে দেখানো যায় না। আইনবিরুদ্ধ কাজ। চিঠি ছাপা হলে

লোক জানতে পারে, তার আগে কিছু জানানো সম্ভব নয়।”

কিশোর অন্যমনস্কভাবে বলল, “এভাবে কতদিন ধাপ্পা মারবি?”

“দেখি। অনন্ত অন্য মতলবও করছে।”

“কী মতলব?”

“ও আসুক, ওর মুখেই শুনবি।”

অনন্তর আসতে খানিকটা দেরিই হল। এসেই বলল, “ব্রাদারস্, আমি দারুণ একটা জায়গা থেকে আসছি। রাসেল স্ট্রিট। আমাকে আগে জল খাওয়াও। তারপর চা।” বলে কৃপানাথকে ঠেলে চেয়ার থেকে উঠিয়ে দিল।

কিশোরের ঘরে জলের কুঁজো আছে। জল আনতে উঠল।

কৃপানাথ বলল, “ব্যাপারটা কী? কোন গভর্নরের বাড়ি থেকে এলি তুই যে, অত মেজাজ দেখাচ্ছিস!”

অনন্ত হাঁটুতে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে মুরুব্বির ঢঙে বলল, “ওয়েট অ্যান্ড সি। বিগ সারপ্রাইজ এনেছি, ভাই, শুনলে নৃত্য করবে।”

কৃপানাথ ঠাট্টা করে বলল, “তোর সারপ্রাইজ মানে তো পকেটমারের গপ্প!”

মাথা নেড়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল অনন্ত।

কিশোর জল আনল।

জলের গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে এক চুমুকে জল শেষ করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল অনন্ত। বলল, “তোদের বামাচরণকে চায়ের জন্যে হাঁক মেরে আয়! দারুণ খবর।”

কিশোর জলের গ্লাস তুলে নিয়ে ঘরে গেল। আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল দোতলায় বামাচরণকে চায়ের কথা বলতে।

ফিরে এসে দেখল, অনন্ত একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা লম্বা টান মারছে।

কৃপানাথ বলল,“তোর সারপ্রাইজটা শুনি? রাসেল স্ট্রিটে কেন গিয়েছিলি?”

অনন্ত বলল, “রাসেল স্ট্রিটে এক ভদ্রলোক আছেন, নাম—ইন্দ্রমোহন ঠাকুর। লোকে তাঁকে ইন্দার মোহন বলে। একসময়ে পুলিশের নানান কাজে সাহায্য করতেন। ভদ্রলোক পুলিশে কাজ করেননি, তবে আর্মিতে ছিলেন। ইনটেলিজেন্স-এ। চোট পেয়ে একটা হাত গিয়েছে। রিটায়ার করে বাড়িতে বসে আছেন বেশ ক-বছর। তাঁর নানা রকম এক্সপেরিয়েন্স আছে। জানেন শোনেন অনেক কিছু।”

বিরক্ত হয়ে কৃপানাথ বলল, “তাতে আমাদের কী? মরছি নিজেদের জ্বালায়, তুই কোত্থেকে ইন্দার মোহন ধরে আনলি! সত্যি অনন্ত...”

“তোরা এত অধৈর্য হোস কেন বল তো!” অনন্ত বলল, “বাচ্চাদেরও অধম। সব কথা না শুনে আগে থেকেই বাগড়া মারার অভ্যেসটা ছাড়। বলি বয়েস হচ্ছে, না খোকা হচ্ছিস?”

কৃপানাথ বিরক্ত হয়ে চুপ করে গেল।

অনন্ত বলল, “শোন, গোড়া থেকে বলি সব শোন। কিশোরের ব্যাপারটা নিয়ে রোজই কথা বলি আমরা, ভাবি, কিন্তু কাজের কাজ হচ্ছে না কিছু। সেদিন মেজদির বাড়িতে একটা কাজে গিয়েছিলাম, সেখানে মেজো জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বলতে

বলতে হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে কিশোরের কথাটা বেরিয়ে গেল। মেজো জামাইবাবু উকিল মানুষ, ক্রিমিন্যাল কেস পেলে জিভ দিয়ে জল গড়ায়। কিন্তু ভাই অদ্ভুত ব্যাপার, ক্রিমিন্যাল কেসের প্র্যাকটিস করেও আখের গুছোতে পারেননি। এই নিয়ে সবাই কত ঠাট্টা করে।" বলে অনন্ত একটু দম নিল। "মেজো জামাইবাবু আমাকে বললেন, ইন্দার মোহনের সঙ্গে একবার দেখা করতে। দু জনে ভাবসাব আছে। তা আমি আজ রাসেল স্ট্রিটে মোহনসাহেবের বাড়ি চলে গেলাম।"

কৃপানাথ কাছাকাছি পাঁচিলে গিয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

কিশোর বলল, "তুই ব্যাপারটা চাউর করে বেড়াচ্ছিস, নন্ত।"

"বেশ করছি। চাউর না করলে চলবে কেমন করে।...যাকগে, শোন। ইন্দার মোহনকে প্রায় সবই বললাম। মোহনসাহেব সঙ্গে সঙ্গে একটা ম্যাপ জোগাড় করে ফেললেন। কোত্থেকে হাজির করলেন একটা বেয়াড়া বই। রেফারেন্স বই নিশ্চয়। তারপর বললেন, আমি খোঁজ নিচ্ছি।"

কৃপানাথ এতক্ষণ কৌতূহল নিয়ে শুনছিল। অনন্তর কথা শেষ হলে চটে গিয়ে বলল, "এই তোর সারপ্রাইজ! কে এক মোহনসাহেবকে হাজির করলি! একেই বলে পর্বতের মূষিক প্রসব। সাবাশ!"

অনন্ত বলল, "আজ্ঞে না, মূষিক নয়। তুমি কি জানো স্যার, মোহনসাহেব একটা ব্যাপার করছেন! যেখানে ঘটনাটা ঘটেছিল তার আশপাশে এমন কেউ যদি থাকে যে সেদিনের কথা শুনেছে কিংবা দেখেছে—তার খোঁজ লাগাচ্ছেন!"

"কেমন করে?"

"তাঁর লোক আছে ওদিকে।"

"বেশ, খোঁজ করছেন ভালই করছেন।...তারপর?"

"তারপর বেঁকা রাস্তা।"

"সেটা আবার কী?"

"কাগজে খবরটা ছাপানো।

কৃপানাথ অবাক হয়ে গেল। "কাগজে ছাপানো! কে ছাপবে?"

"তোরা ছাপবি। ছাপা উচিত। এত বড় একটা খবর—।"

"তুই বললি আর কাগজে ছেপে দেবে। মামার বাড়ি!"

"বেশ, তোরা না ছাপিস—পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন করে ছাপা হবে। নজরে পড়বে লোকের। মেজো জামাইবাবু কিশোরের পক্ষে মামলা লড়বেন।"

কিশোর কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় হাতে কেটলি ঝুলিয়ে বামাচরণ হাজির।

ছোট ছোট কাপে তিনজনকে চা দিয়ে বামাচরণ চলে যেতেই অনন্ত বলল, "শোনো হে কৃপানাথ, ঘটনাটা যেখানে ঘটেছে—ঠিক সেখানে কী আছে মোহনসাহেব জানেন না; তবে তিনি একটা অদ্ভুত কথা বলছেন।"

"কী কথা?" কৃপানাথ বলল।

অনন্ত চায়ে চুমুক মেরে বলল, "মোহনসাহেব বলছেন নর্থ বিহারের দু-চারটে জায়গা আছে যেখানে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।"

কিশোর বা কৃপানাথ কেউ কিছু বুঝল না। অনন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অনন্ত বলল, "ঘটনাগুলো অদ্ভুত। শুনলে মনে হবে গাঁজাখুরি গল্প। কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে মনে হতে পারে, কোথাও কিছু একটা রহস্য আছে।"

কৃপানাথ বলল, "কীসের রহস্য? ভূতের?" ঠাট্টা করেই বলল সে।

"হ্যাঁ; ভূতেরই। আষাঢ়ে গল্প যেমন হয়।"

"শুনি।"

"মোহনসাহেবের ধারণা, তিনি যা শুনেছেন, নর্থ বিহারের দু-চারটে জায়গায় একটা ভৌতিক ব্যাপার আছে। তিনি বলছেন, জায়গাগুলোকে এক ধরনের শূন্য স্থান বলা যেতে পারে।"

কিশোর বলল, "শূন্য স্থান? তার মানে?"

"মানেটা ভাই আমিও ঠিক বুঝলাম না। মোটামুটি যা বুঝলাম তা হল, সব কিছুর মধ্যে কোথাও একটা শূন্যতা রয়েছে। গ্যাপ। সেখানে কোনও কিছুই কাজ করে না, করতে পারে না, প্রকৃতি নয়, জীব নয়, কোনও প্রাণী নয়।"

কৃপানাথ বিরক্ত হয়ে বলল, "কিছু কাজ করতে পারে না, শুধু তোর মোহনসাহেবের মাথা কাজ করে! রাবিশ।"

অনন্ত একটু দমে গেল। বলল, "তুই আগে থেকেই চেঁচাচ্ছিস কেন! সবটা শোন। হতে পারে মোহনসাহেব যা বলছেন তা আষাঢ়ে গপ্প। কিন্তু তিনি তো বলছেন না গল্পটা বিশ্বাস করতে। তাঁর কথাটা শুনতে আপত্তি কোথায়?"

কৃপানাথ কোনও জবাব দিল না।

অনন্ত বলল, "কিশোরের যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়—তখনকার কথাটা ভেবে দেখতে হবে। কিশোর বলছে তার যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখন ড্রাইভার সমেত তারা চারজন গাড়িতে ছিল। তাই না কিশোর?"

মাথা হেলাল কিশোর। বলল , "হ্যাঁ, চারজন! ড্রাইভার, এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোক, একটি বিহারি ছেলে আমার বয়েসি, আর আমি।"

"ঠিক তো?"

"একেবারে ঠিক।"

"অ্যাক্সিডেন্টের পর তিনজনকে পাওয়া গেল। মাঠে। তিনজনই মারা গিয়েছে, তাদের ডেডবডি—সে যেমন অবস্থাতেই হোক—এদিক-ওদিক ছড়ানো। কিন্তু কিশোরের বডি পাওয়া যায়নি। কোথায় গেল সে? হাওয়া হয়ে গেল? সেটা সম্ভব? নাও, বলো আমাকে?"

অনন্ত এমনভাবে বলল যেন কৃপানাথকেই চ্যালেঞ্জ করল।

কৃপানাথ সামান্য চুপ করে থেকে বলল, " কিশোরকে খানিকটা তফাতে একটা গর্ত বা ফাটলের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। কিশোর নিজেই বলেছে।"

অনন্ত মুচকি হাসল। "পাওয়া গিয়েছে বললেই কি হয়! এবার স্যার যুক্তিতে এসো। একটা জিপ গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের পর যদি ছিটকে যায়—গাড়ির প্যাসেঞ্জাদের বডি কতদূর ছিটকে যেতে পারে? পাঁচ হাত, দশ হাত। তোমার জন্যে আরও দশ

হাত বাড়ালাম, তা হলে হল বিশ হাত। এবার বলো, অন্য বডিগুলো লোকের চোখে পড়ল, কিশোরেরটা পড়ল না কেন? তুমি ধরে নিতে পারো, পরে খবর পেয়ে যখন লোকজন পুলিশ আসে তখন নিশ্চয় তারা চারপাশ দেখেছিল। বিশ হাতের মধ্যে একটা গর্তে আরও একটা বডি পড়ে থাকলে তাদের চোখে পড়ত না? তারা অন্ধ?"

কৃপানাথ বলল, "অন্ধ ছাড়া আর কী! তারা দায়িত্বজ্ঞানহীন।...তারা দায়সারা কাজ সেরে পালিয়েছে। আমার বিশ্বাস পুলিশও আসেনি। খোঁজখবর করেনি। বা এলেও রাস্তা থেকে জায়গাটা দেখে পালিয়ে গিয়েছে। নয়তো ডেডবডিগুলো মাঠে পড়ে থাকবে কেন?"

মাথা নেড়ে অনন্ত বলল, "মানছি তারা দায়িত্বজ্ঞানহীন। তবে বডিগুলো কি নিয়ে যাবার উপায় ছিল? প্রথমত খবর পেয়েছে অনেক দেরিতে, তার ওপর হয় পোড়া, না হয় কাটা-ছেঁড়া বডি। কোথায় নিয়ে যাবে তারা? এ কি কলকাতা পেয়েছ? কলকাতার আশেপাশে মরা পচা ডেডবডি দু-তিন দিন পরে উদ্ধার করেছে পুলিশ—এ-খবর তুমি কাগজে পড়ো না?"

কিশোর দু জনের তর্কে বাধা দিয়ে বলল, "ওসব জায়গায় ঝট করে কিছু হয় না। খবর পৌঁছতেই মাস কাবার; কিছু করতে হলে বছর ফুরোবে। কোনও অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই। একেবারেই গাঁ-গ্রাম জায়গা, দেহাত।"

কৃপানাথ পকেট হাতড়ে সিগারেট বার করল। ধরাল। বলল, "বেশ। তা মোহনসাহেব কী বলছেন? তাঁর কথাটা শুনি?"

"তিনি জোর করে কিছু বলছেন না," অনন্ত বলল, "তাঁর একটা সন্দেহ হচ্ছে।"

"কীসের সন্দেহ?"

"ওই যে বললাম, গ্যাপ। যদি ধরে নেওয়া যায় ওখানে কোথাও একটা গ্যাপ ছিল—কিশোর তার মধ্যে গিয়ে পড়েছিল..."

কৃপানাথ পুরোপুরি উপেক্ষা-অবজ্ঞার একটা শব্দ করল। "মোহনসাহেবের মাথায় ছিট আছে। কালারফুল ছিট।"

অনন্ত চটে গেল। "আমি তা হলে চুপ করলাম।"

কৃপানাথ বলল, "তোকে চুপ করতে কেউ বলছে না। আমি বলছি, তোর মোহনসাহেব আলতুফালতু কথা বলছেন।"

"কেমন করে বুঝলি তুই? কথাটা তুই ভাল করে শুনলি না পর্যন্ত...!"

"যা শুনলাম তাতেই আমার মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে। বেশ তো বল তুই—শুনব।"

"না, আমি বলব না। তুই একটা গাধা। তোর মাথায় এসব ঢুকবে না।"

এবার কৃপানাথ হোহো করে হেসে উঠল। বেজায় চটেছে অনন্ত। কৃপানাথকে গালমন্দ শুরু করবে: বাঁদর, ছাগল, ইডিয়েট—যা মুখে আসে বলবে।

কৃপানাথ বলল, হাসতে হাসতেই, "আমি গাধা বলেই তো বলছি। ব্যাপারটা তুই বুঝিয়ে দে। ধর, আমরা তিনজন একটা মাঠ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি—হঠাৎ কিছু একটা হল, ডাকাতে গুলি ছুড়তে শুরু করল, বাঘ-সিংহ তেড়ে এল, নয়তো ঝড় উঠল

সাংঘাতিক—, তিন জনে তিন দিকে ছুটলাম। সব যখন শান্ত হল, তিন জনকে আশেপাশে নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাবে। একজন হারিয়ে যাবে কেমন করে? কোন যুক্তিতে?"

অনন্ত বলল, "সাধারণ যুক্তির কথা বলছিস তুই। কিন্তু এমন অনেক যুক্তি আছে যা আমাদের জানা নেই।"

"সেটা কী?"

"প্রকৃতির খেয়ালিপনা।"

"তা এখানে প্রকৃতির খেয়ালিপনাটা কেমন? মানে কোন ধরনের?"

অনন্ত একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "আমি সব গুছিয়ে বলতে পারব না। যা শুনেছি তার সামারি বলছি। আমাদের জন্মের অনেক আগে বিহারে একবার সাংঘাতিক ভূমিকম্প হয়। থারটিফোর না থারটিফাইভ—কোন একটা সালের কথা বললেন মোহনসাহেব। নর্থ বিহারের অনেক শহর নষ্ট হয়, অজস্র লোকজন মারা যায়, মাঠঘাটের চেহারাই অন্যরকম হয়ে যায়। সোজা কথায় নর্থ বিহারকে তছনছ করে দিয়েছিল সেই ভূমিকম্প।" বলে অনন্ত থামল, দম নিল একটু, বলল, "এই ভূমিকম্পের পর এমন কিছু একটা ঘটেছে, যা সাধারণ ব্যাপার নয়। লোকে তা জানে না, বোঝে না। কিন্তু মোহনসাহেবদের ধারণা, একটা বিশেষ লাইন বরাবর কতকগুলো মিস্টিরিয়াস পয়েন্ট তৈরি হয়েছে, যেখানে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। কিশোরের আগেও ঘটেছে। এই পয়েন্টগুলোতে কিছু একটা হয়, যাতে কোনও বস্তুই—প্রাণী হলেও—তা আর নজরে পড়ে না। নেচারস্ ম্যাজিক।"

"আবার ফিরে আসে না?"

"আসে। কিশোর যেমন এসেছে।...আসলে জায়গাটা তো উবে যাচ্ছে না, সেটা থাকছে, কিন্তু কী যেন আড়াল করে দেয় জায়গাটাকে। যেমন ধর, ঘন কুয়াশা হলে আমরা কাছের জিনিসও দেখি না—সেই রকম।"

কৃপানাথ হাসল না, অনন্ত চটে যাবে। বলল, "কুয়াশা আমরা দেখেছি। এই কলকাতাতেই এক একদিন শীতকালে এমন কুয়াশা হয় যে, দশ হাত দূরের জিনিসও চোখে পড়ে না। কিন্তু এখানে কোন জিনিস আড়াল করবে?"

অনন্ত চুপ। সে কিছু যেন বোঝাতে চায়, বোঝাতে পারছে না। বলল, "আমিও সেটা বুঝতে পারলাম না। তবে মোহনসাহেব বলছিলেন, ওই মাঠঘাট, গাছপালা, ফাঁকা জায়গার কোথাও কোথাও একটা ভ্যাকুয়াম পয়েন্ট আছে, সেখানে কেমন করে যেন একটা ম্যাগনেটিক্ ফিল্ড তৈরি হয়ে যায়—নিজের থেকে। আবার চলে যায়।"

কিশোর বোকার মতন শুনছিল। বলল, "মাথায় ঢুকছে না।"

"আমার মাথাতেও ঢোকেনি," অনন্ত বলল, "গোলমেলে ব্যাপার। তবে ব্যাপারটা মোটামুটি কেমন হল জানিস? ধর, নদীতে জোয়ার এল। জোয়ার এলে কী হয়। পাড়ের দিকে কোনও কোনও জায়গা, হয়তো একটা নালার মতন হয়ে আছে, কিংবা ডোবার মতন, ভাটার সময় শুকনো, কিন্তু জোয়ার এলে জল ঢুকে পড়ে। আবার সরে যায় ভাটার সময়। সেই রকম একটা ব্যাপার। যদি ধরে নেওয়া যায়, কিশোর যেখানে

ছিটকে পড়েছিল সেখানে একটা ভ্যাকুয়াম পয়েন্ট রয়েছে, আর লোকজন যখন ডেডবডিগুলো খোঁজাখুঁজি করছিল তখন সামহাউ ওই বিশেষ জায়গায় ম্যাগনেটিক্ ফিল্ড কাজ করছিল—তা হলে এ রকম একটা অদ্ভুত কাণ্ড হতে পারে।"

কৃপানাথ মন দিয়ে সব শুনছিল। অনন্তর কথা শেষ হবার পর সে সোজা এগিয়ে এসে হাত ধরল বন্ধুর। বলল, "চল, যথেষ্ট হয়েছে। নীচে চল, পানের দোকান থেকে এক কিলো বরফ কিনে তোর মাথায় দিতে হবে। রাঁচির কেস।"

অনন্ত অপ্রস্তুত। কিশোর হেসে ফেলল।

কৃপানাথ অনন্তকে টানতে লাগল।

অনন্ত বলল, "কী, হচ্ছে কী?"

"তোর ব্রেনের কোথাও ভ্যাকুয়াম হয়েছে। নে, ওঠ। রাত হচ্ছে, মেসে ফিরব।"

বাধ্য হয়েই অনন্ত উঠল। কিশোরকে বলল, "তোরা আমাকে নিয়ে রগড় করছিস। কিন্তু ব্যাপারটা ওই রকম কিছু না হলে তুই কখনওই হারিয়ে যেতে পারতিস না। অন্যদের চোখে পড়তিস। ওখানে একটা চোরা কুঠরির মতন কিছু ছিল, চোরা জায়গা। তুই জানিস না।"

কৃপানাথ বলল, "হ্যাঁ ছিল। নে চল। তোর মাথায় বরফ না চাপালে পাগলা হয়ে যাবি।"

অনন্ত কৃপানাথকে টানতে টানতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

৭

আট-দশটা দিন অনন্ত মোহনসাহেব মোহনসাহেব করে নেচে বেড়াল। তার কাজই হল, একবার করে মোহনসাহেবের বাড়ি যাওয়া আর কিশোরের হোটেলে এসে নানা রকম অদ্ভুত গল্প শোনানো। একদিন একটা বই নিয়ে এল হাতে করে মোহনসাহেবের বাড়ি থেকে, বলল—তোরা তো আমার কথা বিশ্বাস করিস না, ভাবিস গুলগাপ্পা ঝাড়ছি। রিড ইট্। হুঁহুঁ বাবা, এ একেবারে খাস আমেরিকান বই। বইয়ের মধ্যে চ্যালেঞ্জ আছে। নে পড়ে দ্যাখ।"

কিশোর বলল, "পড়ব। কিন্তু ওদিকে দাদা যে কৃপাকে অস্থির করে মারছে।"

"কৃপা আসবে না আজ?"

"ও এসেছে। এসে একবার বেরিয়েছে। একটা ফোন করতে গিয়েছে। এখনি আসবে।"

কয়েকদিন ধরেই ভাল বৃষ্টি হচ্ছে কলকাতায়। গরম কমে গিয়েছে। আজ সকালেও বৃষ্টি হয়েছে কয়েক পশলা, তার মধ্যে ভোরের দিকে জোর বৃষ্টি হয়েছিল। বিকেলে আর বৃষ্টি নেই, আকাশ অনেকটা পরিষ্কার।

ছাদে বসে কথা বলতে বলতে অনন্ত বলল, "আচ্ছা কিশোর, তুই একটা কথা মনে করার চেষ্টা কর তো। অ্যাক্সিডেন্ট যখন হতে যাচ্ছে, তখন কী কী হয়েছিল? ডিটেলে মনে কর।"

কিশোর বলল, "আমার যা মনে আছে সবই বলেছি তোদের। ক'বারই বলেছি। নতুন করে আর কী বলব?"

"তবু—বল। মাঝে মাঝে আমরা পয়েন্ট মিস করে যাই।...আচ্ছা আমি জিজ্ঞেস করছি—তুই জবাব দে।...ঘটনাটা ঠিক কখন ঘটেছিল? সময়?"

"ঘড়ি দেখিনি।"

"তবু আন্দাজে?"

"রাত আটটার পরেই হবে।" কিশোর একটু ভাবল। বলল, "আমরা মেহেরা বলে একটা জায়গা থেকে যখন জিপে উঠি তখন আর কত হবে—সাত বড় জোর।"

"আগাগোড়া কুয়াশা ছিল পথে?"

"ছিল। তবে ওই বালুয়াসরাইয়ের দিকে খুব বেশি। কিছু চোখে পড়ছিল না।"

"অ্যাক্সিডেন্টের আগে তুই কী করছিলি?"

"বসে ছিলাম চুপ করে। সেই পাঞ্জাবি ভদ্রলোক আর বেহারি ছোকরা কথা বলছিল।"

"তুই বলছিলি, অ্যাকসিডেন্টের আগে ড্রাইভার ভীষণ একটা চিৎকার করে উঠেছিল।"

"হ্যাঁ। বিরাট চিৎকার। সামনে কিছু দেখেছিল। কী দেখেছিল জানি না। পরে কাগজপত্রে বেরিয়েছে পাগলা হাতি।"

"পাগলা হাতি ওখানে আসবে কেন?"

কিশোর হাসল। বলল, "বড়লোকদের যেমন গাড়ি, বিহারি জমিদারদের সেই রকম হাতি। খুদেদেরও এক-আধটা থাকে। নয়তো ঘোড়া। সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িতেও তো একটা স্ট্যাটাস থাকে। এই রকম হাতি ঘোড়া বিহারের ওসব দিকে দেখা যায়। তবে পকেটে টান পড়লে সবই কমে। হাতি ঘোড়া পোষার শখও কমে গেছে। দু-একটা রয়েছে এখনও। সেই রকম কোনও হাতি হয়তো। পাগলা হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।"

অনন্ত বলল, "হাতির ডাক শুনেছিলি?"

"না।"

"তা হলে হাতি নাও হতে পারে।"

"তা—তা হতে পারে। তবে হাতি যে সব সময় ডাকবে, তেমন কথা নেই।"

অনন্ত পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। কিশোরকে দিল, নিজেও নিল। সিগারেট ধরিয়ে অনন্ত বলল, "তুই অ্যাক্সিডেন্টের পর যেখানেই পড়ে থাকিস—কত দিন ছিলি?"

"জানি না।"

"একেবারে মনে নেই?"

"না।"

"আমি এই কথাটাই ভাবি, কিশোর! দু-তিন দিন একটা মানুষের পক্ষে মাঠে পড়ে থাকা সম্ভব নয় ওই ভাবে। রোদ আছে, শীত আছে, খিদে তেষ্টা আছে। শরীরের

পক্ষে...”

বাধা দিয়ে কিশোর বলল, “সবই জানি। আমার একটা ব্যাপার সন্দেহ হয়। আমাকে যারা সেই মাটির ফাটলের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল—তারা হয়তো আগেই দেখেছিল। মানে সকালের দিকে। বেঁচে আছি দেখে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। অন্যরা মরে পড়ে আছে দেখে ছোঁয়নি।”

“অসম্ভব। সেই সাধুর দল তোকে তুলে নিয়ে গেল গোরুর গাড়ি জোগাড় করে—আর বাকি লোকগুলোর কথা আশেপাশের গাঁ গ্রামে বলল না—তা কেমন করে হয়। অন্তত তোকে যেখানে নিয়ে গিয়েছিল সেই মহারাজের কাছে তো বলতই।”

অনন্তর দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকল কিশোর। পরে বলল, “হয়তো বলেছে মধু মহারাজকে। আমি তখন অজ্ঞান। সেই জ্ঞান যখন ফিরেছে, ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছি—তখন আর মহারাজ আমায় কিছু বলেননি। সাধুর দলই বলতে পারে কী হয়েছিল। কিন্তু কে তাদের খুঁজে বার করবে?”

জোরে জোরে বার কয়েক সিগারেটে টান দিয়ে অনন্ত বলল, “আমার থিওরি হল, তুই এমন এক জায়গায় পড়েছিলি ক'দিন, যেখানে কারও চোখ পড়ে না। কোনও একটা আড়ালের মধ্যে ছিলি। মানুষের চোখ সে আড়াল ধরতে পারে না। তা ছাড়া ওই বিশেষ জায়গায় প্রকৃতির আইন-কানুন কাজ করেনি, করতে পারেনি। কোনও ধরনের অদ্ভুত একটা ফিল্ড তৈরি হয়েছিল পারটিকুলার জায়গাটায়। হয়তো ম্যাগনেটিক ফিল্ডেরই কোনও ব্যাপার...।”

পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে। কৃপানাথ আসছে।

অনন্ত বলল, “ওই যে, আসছে।”

ছাদে এসে অনন্তকে দেখামাত্রই কৃপানাথ যেন রাগে ফেটে পড়ল। “এই যে! শোন, কাল থেকে তুই তোর বাড়িতে আমার জন্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করবি। আমি আর মেসে থাকব না। চাকরিটাও ছাড়তে হবে। ওরাই আমায় ছাড়িয়ে দেবে।”

“কেন?” অনন্ত বলল।

“কেন মানে! তুই আমায় কী ফ্যাসাদে ফেলেছিস, তোর ক্ষমতা নেই বোঝার। নগেনদা নিজে এখন আমার অফিসে মেসে গিয়ে হাজির হচ্ছেন।”

অনন্ত ঘাবড়াল না। বলল, “কবে গিয়েছিলেন?”

“কাল রাত্তিরে মেসে ফিরে দেখি উনি বসে আছেন। কোনও রকমে কাটালাম। আজ অফিসে আবার।”

অনন্ত কিশোরের দিকে তাকাল একবার। “তোর দাদা জোর ঘাবড়ে গিয়েছে রে!”

কৃপানাথ বলল, “তুই নিজে মোহনসাহেব মোহনসাহেব করে নেচে বেড়াচ্ছিস, আর আমায় রোজ কিশোরের দাদার পাঠানো লোকজনকে সামলাতে হচ্ছে। এখন আবার নগেনদা নিজেই আসতে শুরু করেছেন। আমি আর ম্যানেজ করতে পারছি না। তুই উলটো-পালটা বলে কী অবস্থা করলি আমার, জানিস না।”

অনন্ত মাথা চুলকোল, মুখ মুছল রুমালে, তারপর বলল, “বোস আগে। সব শুনছি।”

বসার জায়গা ছিল না, মাটিতেই বসে পড়ল কৃপানাথ।

অনন্ত বলল, "নগেনদার মূল উদ্দেশ্যটা কী? উনি সেই মতিহারির চিঠি দেখতে চাইছেন, না কি তোর কাছ থেকে জানতে চাইছেন—কিশোরের সঙ্গে আমাদের কোনও রকম একটা যোগাযোগ হয়েছে?"

"উদ্দেশ্য জানি না। সোজা কথা, চিঠি যদি এসেই থাকে, দেখাও চিঠি, নাম-ঠিকানা দাও লোকটার যে চিঠি লিখেছে। আর, যদি চিঠির কথাটা মিথ্যে হয়, তোমরা কী মতলবে আমার বাড়ি বয়ে গিয়ে আমাকে মিথ্যে কথাটা বলে এলে?" কৃপানাথ একটু দম নিল। "অফিসে আমি ক'টা লোককে ম্যানেজ করব! গোবিন্দদা ছুটিতে রয়েছেন বলে তিন-চারটে দিন পার পেলাম। এরপর কী হবে? তা ছাড়া নগেনদা অন্য কাউকে ধরে কয়ে আসল ব্যাপারটা জেনে নিতে পারেন। তখন ভাই, আমার চাকরিটা যাবে।"

অনন্ত উপেক্ষার গলায় বলল, "অত সস্তা! চাকরি গেলেই হল।"

"আমার খুব বাজে লাগছে," কৃপানাথ বলল, "এ এক ফ্যাসাদে পড়া গেল।"

"কোনও ফ্যাসাদ নয়," অনন্ত বলল, "শিকার জালে পড়েছে, ভাই। এবার খেলিয়ে তুলে নিতে হবে।"

"তুমি তোলো, আমি পারব না।"

কিশোর বলল, "নন্তু, ব্যাপারটা সহজ নয়।"

অনন্ত বলল, "কঠিনই বা কেন হবে! নগেনদার ঘুম বন্ধ হয়ে যাবার কারণ কী? একটা উড়ো খবরে কারুর ঘুম বন্ধ হয়! তাও খবরটা তাঁর দিক থেকে বিশ্বাস করার কথাই নয়—যদি সত্যিই তিনি নিজের চোখে কিশোরের ডেডবডি দেখে থাকেন, নিজের চোখের সামনে পুড়িয়ে এসে থাকেন। আমি বলছি, নগেনদা পাকা লোক, যা করেছেন জেনে-শুনে সুযোগ বুঝে করেছেন। তিনি আজ কাগজের অফিসে চিঠির খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু একটা চিঠি তো নগেনদা মধু মহারাজের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। সে-কথা আমাদের কাছে চেপে গেলেন কেন? তাঁর মতলব কী?"

কৃপানাথ কোনও জবাব দিল না। কিশোরও চুপ।

অনন্তই বলল, "খবরের কাগজেই এটা ছাপতে হবে।"

"কেমন করে?"

"আমরা কিশোরকে কাগজের অফিসে নিয়ে যাব। বলব, সব। আমরা সাক্ষী হব। ফোটো তোলাব কিশোরের, তারপর যা হবার হবে।"

কিশোর মাথা নাড়ল। "না, না, নেভার।"

কৃপানাথ বলল, "কাগজে যদি না ছাপে?"

"ছাপবে!...আর তোরা না ছাপিস অন্য কাগজ আছে। সে ব্যবস্থা করা যাবে।"

"তারপর?"

"তারপর মামলা। কিশোর ভার্সাস নগেন। মেজো জামাইবাবু কিশোরের পক্ষে লড়বে। আমরা হব কিশোরের পক্ষে সাক্ষী। আরও বন্ধু-বান্ধব জোটাব। মধু মহারাজকে ধরে আনব। তোর সেই মেহেরা না কোথাকার যেন পুলিশ স্টেশনের বাবুদের বারোটা বাজাব।...দারুণ জমে যাবে। কাগজে কাগজে খবর বেরোবে

মামলার।”

কৃপানাথ বলল, “গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।”

“হ্যাঁ,” অনন্ত বলল, “তাই। তবে যা বলছি ভাই, ঠিক সেই রকম হবে। শুধু ওই এক জায়গাতেই আমরা মার খাব।”

“কোন জায়গায়?”

“অ্যাক্সিডেন্টের পর, মানে পরের দিন, কেন কিশোরের বডি খুঁজে পাওয়া যায়নি! কোথায় ছিল কিশোর? কী হয়েছিল তার? কত দিন সে পড়ে ছিল গর্তটায়। কেমন করে বেঁচে ছিল? আর কবেই বা মধু মহারাজের কাছে গিয়ে উঠল।...এইটেই হল আসল কথা। ও কোথায় ছিল, কেমন করে অদৃশ্য থাকল, বেঁচে থাকল কী ভাবে! একবার যদি এর আন্সার পাওয়া যায়, বাকিটা কিছু নয়, নাথিং।”

বাড়ি ফেরার সময় কৃপানাথ বলল, “তোকে একটা কথা বলি।”

অনন্ত বলল, “জানি, কী বলবি তুই।...কিশোরের দাদা তোকে শুধু বিরক্ত করছে না—পেছনে লোক লাগিয়েছে, এই তো?”

অবাক হল কৃপানাথ, “কী করে জানলি তুই?”

“জানি,” অনন্ত হাসল। “আজ সকালে আমার বাড়িতে ফোন এসেছিল। নগেনদার ফোন। খানিকটা ধানাই পানাই করে শেষে বললেন, তোমরা দুই বন্ধু আমার সঙ্গে মজা করবার চেষ্টা করছ, নন্তু। আমাকে আপসেট করার চেষ্টা করছ। কেন? আমিও খোঁজখবর করছি ছোটকুর। তোমরা আমাকে ধোঁকা দিয়ে পার পাবে না।”

কৃপানাথ চুপ। পাশাপাশি হাঁটছে দু'জনে।

গলিতে ঢুকে কৃপানাথ বলল, “আমার মেসে নগেনদা কাল যখন আসেন, সঙ্গে একটা লোক ছিল। অবশ্য কথা বলার সময় সে ছিল না। নগেনদা তাকে নীচে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। লোকটাকে আমার ভাল লাগেনি।”

“বোধ হয় সন্দেহ করছেন—কিশোরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে।”

“আমারও তাই মনে হয়।...আমি ভাবছি, নগেনদার লোক যদি আমাদের ফলো করে কিশোরকে ট্রেস করতে পারে, কিশোরের কী হবে?”

“ঠিক। আমিও সে কথা ভেবেছি।”

“উপায়?”

“বুঝতে পারছি না। আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওঠাব যে, তার উপায় নেই। কিশোর যাবে না। তা ছাড়া আমার বাড়িতে একটা হইচই লেগে যাবে।”

অনন্তর কথা শেষ হল কি হল না—অন্ধকার হয়ে গেল সব। লোডশেডিং।

অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে অনন্ত বলল, “শুধু একটা ব্যাপারে সব আটকে যাচ্ছে, কৃপা। অ্যাক্সিডেন্টের পর কেন কিশোরকে পাওয়া যায়নি। সে কোথায় ছিল? দু দিন হোক—তিন দিন হোক—কোথায় সে পড়ে থাকল? কেমন করে বেঁচে থাকল? এই একটা মাত্র প্রবলেম সল্‌ভ করতে পারলে বাকি সব কিছু হয়। পরের ব্যাপার তো

জানাই যায়। মধু মহারাজ রয়েছেন।"

কৃপানাথ বলল, "তুই কি সত্যিই বিশ্বাস করিস মোহনসাহেব যা বলছেন, তা হয়, হতে পারে?"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অনন্ত বলল, "সত্যি বলতে কী, বিশ্বাস আমার হয় না। কেননা ব্যাপারটা জানি না, বুঝি না। তবে জগতে কী না হয় ভাই! কতটুকু আমরা জানি! মোহনসাহেবের ধারণা যদি সত্যি হয়, তবেই কিশোরের অদ্ভুতভাবে অদৃশ্য হওয়া, আবার তাকে খুঁজে পাওয়ার একটা অর্থ করা যায়, নয়তো যায় না।"

৮

বিকেলের দিকে কৃপানাথ হাতের কাজ সেরে আয়েস করে চা খাচ্ছিল, বেয়ারা এসে খবর দিল গোবিন্দবাবু ডাকছেন।

চা শেষ করে কৃপানাথ গোবিন্দবাবুর কাছে গেল। বড় একটা হলঘরের একেবারে কোনার দিকে গোবিন্দবাবুর টেবিল। মাথার দিকে জানলা। হলঘরের চারদিকে টেবিল চেয়ার ছড়ানো। কাজ করছে কেউ কেউ, কেউ বা গল্প করছে। সুযশ কোমরে হাত রেখে বেজায় তর্ক বাধিয়েছে নিত্যানন্দর সঙ্গে। এক দিকে রাখা টেলিপ্রিন্টার খটখট করে বেজে চলেছে।

"এই যে, এসো কৃপানাথ," গোবিন্দবাবু ডাকলেন।

"দু-তিন দিন অফিসে আসেননি। কী হয়েছিল গোবিন্দদা?"

"জ্বর হয়েছিল। সর্দিজ্বর। বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিলাম একদিন। তার জের। বোসো।"

কৃপানাথ সামনের চেয়ারে বসল। "এখন ভাল আছেন?"

"মোটামুটি।...যার জন্যে তোমায় ডাকলাম। হ্যাঁ হে, তোমার সেই বন্ধু—কী যেন নামটা—"

"কিশোর।"

"হ্যাঁ, কিশোর।...তার বাড়ি থেকে একজন আমার বাড়ি গিয়ে হাজির।"

কৃপানাথ অবাক হল না। তারও সন্দেহ ছিল, এমন ঘটনা ঘটতে পারে। বলল, "কে গিয়েছিল? কিশোরের দাদা?"

"না, দাদা তো বলল না। ফরসা মতন মাঝবয়েসি এক ভদ্রলোক।"

কৃপানাথ বুঝতে পারল না কে হতে পারে। "আপনার বাড়ির ঠিকানা পেল কোথায়?"

"অফিস থেকে জেনেছে।"

"কী বলল?"

"চিঠির কথা।...তুমি তো আমায় ফ্যাসাদে ফেললে। ছিনে জোঁকের মতন লেগে থাকল ভদ্রলোক, তাড়াতে পারি না।"

"আপনি কিছু বলেননি তো?"

"মাথা খারাপ? তুমি বলে রেখেছ, আর আমি ফাঁস করে দেব? বলিনি কিছু। কিন্তু লোকটা বড় চালাক। বদ। আমায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলল, কিছু দিতে পারে, যদি..." গোবিন্দবাবু হাসলেন।

কৃপানাথ বুঝতে পারল। চিঠির জন্যে কিশোরের দাদা পাগল হয়ে গেছেন। অনন্ত এই চালটা ভাল চেলেছে।

গোবিন্দবাবু বললেন, "লোকে এত নির্বোধ হয়, তাও জানতাম না। আরে, খবরের কাগজের অফিস কি চিঠি জমিয়ে রেখে দেয়! এতদিন ধরে। হয় ছাপে, না হয় ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেয়।...তা ওদের বোকামি দেখে আমি আর-এক ওপরচাল দিলাম।" গোবিন্দবাবু হাসলেন।

কৃপানাথ কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকল।

গোবিন্দবাবু বললেন, "আমি কী বললাম জানো?...বললাম, আমাদের পাটনার করেসপনডেন্টকে ব্যাপারটা জানানো হয়েছে। তাকে খোঁজখবর করতে বলেছি আমরা। তার কাছ থেকে ব্যাপারটা জানলে তারপর যা করার করা হবে।"

কৃপানাথ হেসে ফেলল। "দারুণ দিয়েছেন গোবিন্দদা।"

টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিলেন গোবিন্দবাবু। সিগারেট ধরালেন, "একটা কথা তোমায় বলি কৃপানাথ। ধোঁকা দিয়ে বেশি দিন চালানো যায় না। তোমরা যখন ওভারশিওর তোমাদের বন্ধু বেঁচে রয়েছে, মারা যায়নি, তখন কাগজে একটা নিউজ করে দাও না! ভেরি ইন্টারেস্টিং নিউজ হবে। সতীশবাবুকে বলো। ছেলেরা কেউ তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে ছবি টবি দিয়ে একটা নিউজ করে দিক। পাবলিক নেবে।" শেষের কথাটা ঠাট্টার গলায় বললেন গোবিন্দবাবু।

কৃপানাথ সামান্য সময় চুপ করে থাকল। অন্যমনস্ক। তারপর বলল, "আমরাও তাই ভাবছিলাম গোবিন্দদা। কিন্তু কিশোর রাজি হচ্ছে না।"

"কেন?"

"ও ভয় পাচ্ছে। এখন এক রকম লুকিয়ে আছে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে তার বিপদ ঘটতে পারে। তা ছাড়া, বুঝতেই তো পারছেন, এ-সব নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হবে, কত দিন চলবে, তাও কেউ বলতে পারে না। তার ওপর আইনের চোখে কিশোরকে এস্‌টাব্লিশ করতে হবে, সত্যই কিশোর। সেটাও তো সহজ নয়।"

গোবিন্দবাবু চুপচাপ আধখানা সিগারেট শেষ করে ফেললেন। বললেন, "কিছু তো একটা করবে তোমরা। বসে থাকলে কী লাভ?"

"দেখি।"

"কী দেখবে?"

" কিশোরকে বুঝিয়ে বলি।"

"হ্যাঁ, বুঝিয়ে বলো।...তোমার বন্ধুর দাদার কোনও একটা কেরামতি আছে। নয়তো এত ছটফট করছে কেন?"

কৃপানাথ অন্য দু'-একটা কথা বলে উঠে পড়ল।

তার অন্য একটা কাজ আছে শোভাবাজারে। এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। দেশের বাড়িতে মা আর থাকতে চাইছেন না। কিন্তু কলকাতায় এনে মা'কে রাখবে কোথায়? থাকতেও পারবেন না মা।

রাস্তায় নেমে কৃপানাথ হাঁটতে লাগল। শোভাবাজার ঘুরে কিশোরের কাছে যাবে।

শোভাবাজার থেকে ঘুরে কিশোরের হোটেলে আসতে খানিকটা দেরিই হয়ে গেল কৃপানাথের। এসে দেখল, কিশোর নেই, দরজায় তালা ঝুলছে।

শুধু অবাক নয়, খানিকটা ভয়ও কৃপানাথ পেল। কিশোর তার হোটেলের ঘর ছেড়ে কোথাও বড় একটা যায় না। গেলেও কাছাকাছি পার্কে যায়, কিংবা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, হয়তো কোনও চায়ের দোকানে ঢুকে এক কাপ চা খায়। তাও সন্ধের পর সে কোথাও বেরোয় না।

অনন্তও নেই। এসে ফিরে গিয়েছে, নাকি এখনও আসেনি, বোঝা যাচ্ছে না। তবে সন্ধে হয়ে গিয়েছে, অনন্ত এতক্ষণে চলে আসে।

নীচে গিয়ে কৃপানাথ খোঁজ করল। যারা কাজকর্ম করে, তারা বিশেষ কিছু বলতে পারল না। একজন বলে, খানিকটা আগে দেখেছে কিশোরবাবুকে; আর-একজন বলে, বিকেলে থেকে দেখেনি।

শেষপর্যন্ত তারক বলে একজনকে পাওয়া গেল। সে বলল, ঘণ্টা দেড়েক আগে কিশোরবাবু বেরিয়ে গেছেন। যাবার সময় বলছিলেন, তাঁর মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। কিশোরবাবু চলে যাবার আধ-ঘণ্টাখানেক পর সেই বাবু এসেছিলেন, ফরসামতন। যিনি রোজই আসেন। তিনি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেছেন।

কিশোর বুঝতে পারল, অনন্ত এসেছিল। এসে চলে গিয়েছে।

অদ্ভুত ব্যাপার। কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কিশোর? অনন্তই বা কোথায় গেল?

কী করবে কৃপানাথ বুঝতে পারল না। অপেক্ষা করবে, না চলে যাবে?

হোটেলের নীচে এসে কৃপানাথ দাঁড়াল কিছুক্ষণ। রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল। কোথায় যেতে পারে কিশোর? যদি মাথাই ধরে থাকে, ওষুধ কিনে এনে খেয়ে ঘরে শুয়ে থাকবে—বাইরে কোথায় ঘুরবে সে! পার্কে গিয়ে বসে আছে? যা অবস্থা পার্কের, তাতে কেউ মাথা-ধরা ছাড়াতে পার্কে যায় না। বরং পার্কে গেলে মাথা আরও ধরে যাবে।

আচ্ছা, অনন্ত কি কিশোরকে হোটেলে না পেয়ে পার্কে খোঁজ করতে গিয়েছিল! সেখানে কিশোরকে পেয়ে গিয়ে দু'জনে বসে আড্ডা মারছে? বা রে বা, তা কেমন করে হয়? ওরা তো জানে কৃপানাথ আসবে। তা হলে?

ঘড়ি দেখল কৃপানাথ, পৌনে আট।

দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। একবার পার্কটা ঘুরে মেসেই ফিরে যাবে, করার তো কিছু নেই তার।

কৃপানাথ পার্কের দিকে এগিয়ে চলল, লোকজনের ওপর চোখ রেখে।

পার্কে পৌঁছবার আগেই বাতি চলে গেল। বাতি চলে যাবার সামান্য পরে বোঝা গেল, আলো রয়েছে চাঁদের।

কৃপানাথের ভয় হচ্ছিল। কিশোরকে কি কেউ ধরে নিয়ে গেল? তা-ই বা কেমন করে যাবে? হোটেলে এসে একজন সাবালককে কি কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারে? তা ছাড়া, কিশোর তো একলাই বেরিয়ে গিয়েছিল হোটেল থেকে। সেই রকমই সে শুনল। তা হলে কি বুঝতে হবে, কিশোর যখন মাথা ধরার ওষুধ কিনে ফিরছে, তখন কেউ তাকে ধরেছে? সেটা অসম্ভব ব্যাপার? কলকাতার এই রাস্তায় হুট করে একজন এসে রাস্তা থেকে কিশোরকে ধরে নিয়ে যাবে, এমন হয় না। কিশোরের দাদার অত সাহস হবে না।

কৃপানাথের উদ্বেগ বাড়ছিল। পার্কেও কাউকে দেখা গেল না।

উদ্বেগ আর আতঙ্ক নিয়ে কৃপানাথ মেসে ফিরতেই অনন্তকে দেখতে পেল।

"কী রে, তুই এতক্ষণ কী করছিলি?...কিশোর কোথায়?" অনন্ত উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল।

বুকের মধ্যের ভয়টা যেন গলার কাছে উঠে এল কৃপানাথের। "আমিও তো তোকে একই কথা জিজ্ঞেস করছি।"

অনন্ত অপলকে কৃপানাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "সে কী! আমি কিশোরের হোটেলে গিয়ে ওকে দেখতে পেলাম না। না পেয়ে একবার তুলসীর বাড়িতে গেলাম। সেখানে একটু দেরি হয়ে গেল। আবার হোটেলে গেলাম। শুনলাম তুই গিয়েছিলি। কিশোরকে পাসনি। আবার আমি হোটেল থেকে তোর মেসে আসছি।"

কৃপানাথ বসে পড়ল। ক্লান্তি লাগছিল তার। অনেক ঘুরেছে। বলল, "কিশোরকে আমি দেখিনি। পার্কেও গিয়ে ছিলাম।"

আতঙ্কের গলায় অনন্ত বলল, "কোথায় গেল ও?"

"কী জানি!"

"আশ্চর্য!"

দু'জনেই চুপচাপ। কৃপানাথের মনে হল গোবিন্দদার কথাটা বলে নেওয়া দরকার। বলল কথাটা।

অনন্ত মন দিয়ে শুনল সব। তারপর বলল, "কিশোরকে ট্রেস করে ধরে ফেলেছিল ওরা! তুলে নিয়ে গেছে বলছিস?"

"তা কেমন করে হবে! একটা জোয়ান ছেলেকে হোটেল থেকে কেউ তুলে নিয়ে যেতে পারে!"

"তা হলে?"

"জানি না। ভাল লাগছে না।"

অনন্ত মাথার চুল ঘাঁটতে লাগল, যেন বুদ্ধিটা চুলের তলায় লুকিয়ে আছে। খানিকক্ষণ পরে আপন মনে বলার মতন করে বলল, "যাবে কোথায়? যাবার জায়গাও তো নেই।...আচ্ছা, কৃপা, কিশোর সেই জর্জ—খিদিরপুরে যার কাছে থাকত—স্মাগলার—তার কাছে চলে যায়নি তো?"

কৃপানাথ বলল, "জর্জের কাছে কেন যাবে?"

"যাবার কথা নয়। তবে ধর, জর্জের লোকজন কেউ যদি তাকে দেখে ফেলে থাকে—" অনন্ত বলল, তার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না এরকম হতে পারে। কোথায় খিদিরপুর আর জর্জ, আর কোথায় বা কিশোর।

কৃপানাথ হতাশ, বিভ্রান্ত। বলল, "জানি না। যদি গিয়ে থাকে যাক—আমরা তো আর জর্জকে খুঁজে পাব না। জানিও না সে কোন বাড়িতে থাকত, ঠিক কোন জায়গায়।"

অনন্ত চুপ করে থাকল।

সামান্য বসে থেকে কৃপানাথ বলল, "তুই একটু বসবি? সারাদিন টোটো করছি। টায়ার্ড। আমি একটু স্নান করে আসি।"

মাথা হেলাল অনন্ত। "আয়।"

কৃপানাথ আরও দু'দণ্ড বসে নীচে গেল স্নান করতে।

অনন্ত বসে থাকল। বসে বসে সিগারেট শেষ করল। আকাশ-পাতাল, সম্ভব-অসম্ভব ভাবল। কোনও কিছুই ধরতে পারছিল না। কিশোরদের বাড়ি থেকে—মানে তার দাদার কোনও লোকজন এসে যদি কিশোরকে জোর করে ধরে নিয়ে না যায়, তা হলে ওর যাবার অন্য কোনও জায়গা নেই। কিন্তু নগেনদা এতটা করতে সাহস করবে? তা ছাড়া একটা ব্যাপার আছে। কিশোর যতদিন ছিল ততদিন নগেনদার কী অসুবিধে হচ্ছিল? আর কিশোর না থাকলে কী সুবিধে হবে নগেনদার, তাও তো অনন্তরা জানে না। কিশোরও বলেনি কিছু। নগেনদার উদ্দেশ্য কী?

কৃপানাথ ফিরে এল।

অনন্ত বলল, "আজ আর কিছু করার নেই। কাল একবার কিশোরদের বাড়ি গেলে হয়।"

"গিয়ে?"

"নগেনদাকে ধরব।"

"লাভ হবে?"

"আচ্ছা, থানায় একটা ডায়রি করিয়ে এলে হয় না?"

"করানো যায়।"

হঠাৎ অনন্তর কী যেন মনে পড়ে গেল, চমকে উঠে বলল, "হ্যাঁরে কৃপা, কিশোর আবার কোনও অ্যাক্সিডেন্ট করেনি তো? হাসপাতালে খোঁজ করা উচিত ছিল।"

কৃপানাথ কথাটা আগেই ভেবেছিল। বলল, "আজকের রাতটা যাক, কাল দেখা যাবে।"

৯

অফিসে ভাল লাগছিল না। কাজকর্মে মন পাচ্ছিল না কৃপানাথ। সকালে আবার একবার কিশোরের হোটেলে খোঁজ নিতে গিয়েছিল সে। না, ফেরেনি কিশোর। ম্যানেজারবাবু বলছিলেন, হাসপাতালে খোঁজ করতে। তিনিও ব্যস্ত হয়েছেন। একজন

বোর্ডার বেপাত্তা! কী হল তার? আজকাল কিছুই বিশ্বাস করা চলে না।

কৃপানাথ পাশ কাটাল। হ্যাঁ, হাসপাতালে খোঁজ নেওয়া দরকার। সে খোঁজ নেবে।

খোঁজ যে অনন্ত করবে, কৃপানাথ জানত।

দুপুরের দিকে ফোন এল কৃপানাথের। নিশ্চয় অনন্ত। ফোন ধরতে উঠল কৃপানাথ।

"হ্যালো।"

"আমি কিশোর।"

চমকে উঠল কৃপানাথ। বুকের মধ্যে ধকধক করতে লাগল। "কী রে, তুই কোথায়? কাল কোথায় চলে গিয়েছিলি? কী হয়েছে তোর? আমরা ভেবে ভেবে মরছি।"

দু-মুহূর্ত কোনও জবাব নেই। একেবারে নিস্তব্ধ সব। তারপর কিশোর বলল, "তোদের বড় জ্বালালাম কৃপা। অনেক কষ্ট দিলাম। আমায় ক্ষমা করিস। আর একবার কষ্ট দেব।"

কৃপানাথ কিছু বুঝতে পারল না। কিশোরের গলার স্বর কেমন যেন চাপা, বেদনাভরা শোনাচ্ছে।

"কী বলছিস তুই?" কৃপানাথ বলল।

কিশোর দু মুহূর্ত চুপ। তারপর বলল, "আজ তুই বিকেলের পর আয়। না, হোটেলে নয়, হোটেলে আমি ফিরিনি। ফিরতে পারব না। তুই আউট্রামে আয়, সেদিন যেমন এসেছিলি!"

বিভ্রান্ত বোধ করল কৃপানাথ। "তার মানে? তোর হয়েছে কী?"

"স-ব বলব, ভাই। তুই আজ আয়। প্লিজ। যদি না আসিস—পরে দুঃখ পাবি।"

"কিশোর!" কৃপানাথ এবার একটু শক্ত গলায় বলল, "পাগলামি করিস না। কোথায় আছিস তুই?"

"বললাম তো, বলব সব। তুই নিশ্চয় আসবি।...নন্তকে আমি ফোন করেছি। কথা বলেছি। সে আসবে। তুই আসবি, ভাই।"

কৃপানাথ আর কিছু বলতে পারল না, লাইন কেটে গেল।

সারাটা দুপুর কেমন এক ভয়, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তায় কাটল কৃপানাথের। অনন্তও ফোন করেছিল। ফোন পেয়েছে কিশোরের। আসবে অনন্ত। কৃপানাথকে অপেক্ষা করতে বলেছে।

অনেক ভেবেও কৃপানাথ যখন কিছুই অনুমান করতে পারল না, হতাশ হয়ে অন্য কিছুতে মন বসাবার চেষ্টা করল। পারল না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল কখন। কৃপানাথ উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। ভীষণ চোখ জ্বালা করছিল। জল দেবে চোখে মুখে।

বৃষ্টি আসার মতন লক্ষণ নেই, তবে আকাশে মেঘ জমছে। এই মেঘ জমতে

জমতে সন্ধেও হয়ে যেতে পারে। গঙ্গার দিকে বাতাস রয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস। লোকজন ঘোরাফেরা করছিল। এক দল বাচ্চা ছুটোছুটি করছে।

অনন্ত আর কৃপানাথ সেই আগের জায়গায় গিয়ে বসল।

অনন্ত বলল, "দ্যাখ কৃপা, কিশোর বলুক আর না বলুক, আমার মনে হচ্ছে, ও নিজের বাড়িতে গিয়েছে। ইচ্ছেয় যাক আর অনিচ্ছেয় যাক—নিশ্চয় গিয়েছে।"

কৃপানাথ কোনও জবাব দিল না। কিশোর বৃথা তাদের ভোগাচ্ছে। এমনকী কথা তার, যা সে এতদিন বলতে পারল না? আর কেনই বা আজ ফোনে কথাগুলোর আভাস দিল না। আশ্চর্য!

অনন্ত নিজের মনেই কিছু বলছিল, থেমে যাচ্ছিল, আবার বলছিল। সে ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

আরও খানিকটা পরে কিশোরকে দেখা গেল। ততক্ষণে আরও কিছুটা মেঘ জমেছে আকাশে।

কিশোর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। হাসবার মতন মুখ করবার চেষ্টা করল, পারল না। তার মুখ শুকনো, ম্লান দেখাচ্ছিল।

"কতক্ষণ এসেছিস তোরা?" কিশোর বলল বসতে বসতে।

"অনেকক্ষণ।"

"আমার আসতে দেরি হয়ে গেল। জ্যামে পড়েছিলাম।"

কথাটায় কান দিল না অনন্ত। সরাসরি কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই কাল কোথায় গিয়েছিলি? কেন গিয়েছিলি? কোথায় আছিস তুই?"

কিশোর জবাব দিল না কথার। প্রথমে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর চোখ তুলে গাছ আর আকাশ দেখল।

অনন্ত বলল, "কাল থেকে তুই আমাদের খাওয়া ঘুম বন্ধ করে দিয়েছিস। আজ সকালে আমি দুটো হাসপাতালে খোঁজ করেছি। তোর ব্যাপার কী? এত দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলে তুই!...যাক, ওসব বাজে কথা থাক। তোর কী বলার আছে বল।"

কিশোর মুখ নিচু করল। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "কাল দুপুরে আমার শরীরটা খারাপ লাগছিল খুব। বিকেলে ভীষণ মাথার যন্ত্রণা হতে শুরু করল। অসহ্য যন্ত্রণা। আমি দুটো ট্যাবলেট কেনার জন্যে নীচে নেমে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার কেমন যেন হল মাথার মধ্যে। তোদের বোঝাতে পারব না। কেমন একটা অজ্ঞান হয়ে যাবার ভাব। মনে হল, আমার মাথাটাই আর কাজ করবে না। আমি মারা যাব। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলাম।"

কিশোর সামান্য চুপ করে থাকল। আবার বলল, "ট্রাম লাইনের কাছে যে ছোট দোকানটা রয়েছে ওষুধের, সেখানে একটা বুড়োমতন লোক বসে ছিল। তার কাছে দুটো ট্যাবলেট চাইলাম। বুড়ো আমায় দুটো ট্যাবলেট দিল। জল চাইলাম এক গ্লাস। জলও দিল। ওষুধ দুটো খেয়ে ফেললাম। বুড়ো বলল, একটু বসে যান, ওষুধ খেয়ে দু-দণ্ড জিরিয়ে নেওয়া ভাল। দোকানের এক পাশে চেয়ার ছিল। বসে পড়লাম। মাথা

ফেটে যাচ্ছে। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সমস্ত মাথাটা যেন কেউ ভেঙে দিচ্ছে টুকরো টুকরো করে। কীসের এক ওলোট-পালট ঘটে যাচ্ছে। অথচ ওই যন্ত্রণার মধ্যে কেমন এক বেহুঁশ অবস্থা হচ্ছিল। ...হঠাৎ আমার কী হল, ভীষণ অস্থির হয়ে উঠলাম। কেন কে জানে! বুড়ো আমায় কিছু বলল। শুনতে পেলাম না। সোজা রাস্তায় নেমে একটা রিকশা নিলাম। বাড়ি যাব।"

কৃপানাথ আর অনন্ত বন্ধুর মুখ দেখছিল, কথা শুনছিল কান খাড়া করে। হুহু করে গঙ্গার দমকা বাতাস বয়ে গেল। শব্দ হল গাছের পাতায়।

"তুই তোর বাড়িতে গেলি?" অনন্ত বলল।

"হ্যাঁ, বাড়িতে," কিশোর বলল, "আমার বাড়িতে। কী অবস্থায় গিয়েছিলাম আমি জানি না। আমার মধ্যে আমি যেন আর ছিলাম না। অন্য মানুষ। রাগে, জ্বালায়, ঘৃণায়—কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, আমি নিশ্চয়ই মারা যাব এবার। যদি মরতে হয় রাস্তায় কেন, এবার নিজের বাড়িতে মরব, আমার মা যেখানে মারা গিয়েছে, বাবা গিয়েছে। দাদার সঙ্গে আমার কথাও আছে। সে জানুক, আমি মরিনি, বেঁচে ছিলাম।"

কৃপানাথ লক্ষ করল, কিশোরের হাত উত্তেজনায় কাঁপছে, মুখ শক্ত হয়ে গিয়েছে, চোখের দৃষ্টি পাগলের মতন। সে আস্তে করে কিশোরের গায়ে হাত দিল। যেন বোঝাতে চাইল, অত উত্তেজনা ভাল নয়।

কিশোর বলল, "বাড়িতে দাদা ছিল না তখন। বউদি ছিল। আশু ছিল, গোপালের মা ছিল। মানু আর টুবলুও ছিল। কেউ আমায় চিনতে পারল না। আমি বারবার বললাম, আমি কিশোর। ওরা আমায় বাড়ির ভেতর ঢুকতে দিল না। পাড়ার লোকজনকে ডাকতে লাগল। হয়তো আমায় থানায় দিত, মারধোর করত। এমন সময় দাদা এসে পড়ল।"

অনন্ত কেমন যেন আঁতকে ওঠার শব্দ করল।

কিশোর চুপ। মাথার চুল টানছে দু হাতে। ছটফট করতে লাগল।

"সিগারেট খাবি?"

"দে।"

অনন্ত সিগারেট দিল।

হাত কাঁপছিল কিশোরের। কেশে উঠল জোরে।

"দাদা আমাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল।" কিশোর বলল।

"আমি যে ঘরে থাকতাম সেই ঘরটা একেবারে জঞ্জাল করে রেখেছে। দাদা আমায় ঘরে বসিয়ে চলে গেল। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। আমি বসেই থাকলাম। বুঝতে পারলাম না, দাদা পুলিশে ফোন করতে গেল কি না!"

কিশোর হাতের সিগারেটটা ফেলে দিল ছুড়ে। বলল, "আমি বসেই থাকলাম। মাথা আর সোজা রাখতে পারছিলাম না। এমন সময় দাদা আবার এল। দাদার সঙ্গে আমাদের বাড়ির বুড়ো কুকুর বাঘা। কুকুরটা আমায় দেখে একেবারেই চিনল না, রাগে গরগর করতে লাগল। আমি অবাক হয়ে গেলুম। কুকুরটার তো চেনা উচিত ছিল।

ওরা তো গন্ধে মানুষ চেনে লোকে বলে! তবে চিনল না কেন? আশ্চর্য! দাদা কুকুরটাকে বাইরে রেখে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।”

থামল কিশোর। মাথার চুল টানতে দু-হাতে। ঘাড় উঁচু করল। আকাশ দেখলু দু পলক। তারপর বলল, “দাদাকে আমি সব বললাম। বললাম, আমি মরিনি, কোনও ভাবে বেঁচে গিয়েছি। আমি জাল কিশোর নই। দাদা বিশ্বাস করল না। তখন আমি দাদাকে একটা কথা বললাম, আগে যা কোনওদিন বলিনি। বললাম, এই ঘরে একটা জিনিস আছে লুকোনো, আমি ছাড়া কেউ জানে না। যদি সেটা বার করে দিতে পারি তা হলে কি দাদা বিশ্বাস করবে আমাকে?”

“কী জিনিস?” অনন্ত জিজ্ঞেস করল।

“আমার মা মারা যাবার আগে আমায় কিছু দামি পাথর দিয়েছিল। আমার দাদামশাই—মানে দাদুর ছিল জুয়েলারি ব্যবসা। দোকানে কর্মচারীরা গোলমাল করত বলে দাদু মাঝে মাঝে মায়ের কাছে দামি পাথর টাথর রেখে যেত। দাদু হঠাৎ মারা যায়। মায়ের কাছে কিছু পাথর থেকে গিয়েছিল। তার দাম কম করেও আজকের দিনে লাখ টাকার বেশিই হবে।...মা মারা যাবার আগে আমাকে পাথরগুলো দিয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল দুঃখকষ্টে পড়লে এগুলো আমার কাজে লাগবে। আমি মায়ের সামনে পাথরগুলো লুকিয়ে রেখেছিলাম। ”

“কোথায়?”

“বলছি।...আমার ঘরের মেঝে লাল। লাল সিমেন্টের। তোরা দেখেছিস। ঘরের পশ্চিম দিকের একটা কোনায় আমি নিজের হাতে সিমেন্ট-বালি খুঁড়ে একটা গর্তমতন করি। গর্তটা খানিকটা লম্বা মতন। পাথরগুলো নেকড়া আর চামড়ায় মুড়ে গর্তে রেখে তার ওপর আবার বালি-সিমেন্ট রং দিয়ে ভরাট করে দিয়েছিলাম। চোখে পড়ার মতন নয়।”

কৃপানাথ বিস্ময়ের শব্দ করল।

কিশোর বলল, “দাদাকে একটা লোহার কিছু এনে দিতে বললাম, যাতে সিমেন্ট খোঁড়া যায়। দাদা এনে দিল। ছেনির মতন একটা লোহার জিনিস। জায়গাটা খুঁড়তে গিয়ে আমার কেমন সন্দেহ হল। নতুন নতুন লাগল সিমেন্ট। তবু খুঁড়লাম। কিছু নেই। ফাঁকা বুঝতে পারলাম—দাদা কথাটা জানত। কেমন করে জেনেছিল বলতে পারব না। পাথরগুলো সে বার করে নিয়েছে। রাগে দুঃখে ঘেন্নায় আমার কেমন যেন হয়ে গেল। মাথার ঠিক থাকল না। দাদাকে আমি ছেনি দিয়ে মেরে বসলাম। দাদা চিৎকার করে উঠল। লোকজন ছুটে এল। সবাই এখন হকচকিয়ে গিয়েছে। আমি আর দাঁড়ালাম না। পালালাম। আমার পেছন তাড়া করবার আগেই আমি রাস্তায়।”

কৃপানাথ আর অনন্ত একসঙ্গে আঁতকে উঠল।

কিশোর দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, “সারা রাত আমি রাস্তার কুকুরের মতন ঘুরে বেড়িয়েছি, শেয়ালদা স্টেশনের বাইরে গিয়ে বসে ছিলাম সকাল পর্যন্ত। কী করব কোথায় যাব, বুঝতে পারছিলাম না। দাদার কী হয়েছে শেষ পর্যন্ত তাও জানি না। হয়তো দাদার তেমন কিছু হয়নি। কিন্তু পুলিশ

তো আমায় ছাড়বে না। এ আমি কী করলাম, নন্তু! আমার পুরনো পরিচয় না হয় না থাকত, নতুন পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকতে পারতাম। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল।"

তিন জনেই চুপ। সন্ধে হয়ে গিয়েছে কখন। আকাশ আরও কালো হয়ে এসেছিল। এখন গঙ্গার দিক থেকে জোর বাতাস আসছে। স্টিমারের ভোঁ বাজল ঘন ঘন।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর অনন্ত বলল, "তুই কেন বাড়িতে ঢুকতে গেলি? আমরা যেভাবে এগোচ্ছিলাম, ধীরে ধীরে সেইভাবে এগোতাম। কাগজে বার করতাম, মামলা লড়তাম। যা হয় দেখা যেত পরে।"

কিশোর চোখ মুছল। বলল, "না নন্তু কিছু হত না। আমি আর কিশোর হতে পারতাম না।"

"কেন?"

"বলব?"

"বল।"

"বিশ্বাস করবি?"

"বল তুই।"

"সেই অ্যাক্সিডেন্টের সময়, গাড়িটা যখন ছিটকে যাচ্ছিল আমি কেমন করে যেন লাফ মারি। আমার তখন কোথায় কোথায় জখম হয়েছিল, আমি জানি না। পায়ে অন্তত হয়নি। ভয়ে আমি ছুটতে শুরু করেছিলাম। আর জিপটায় যখন আগুন লেগে দাউদাউ করে পুড়ছে তখন আমি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলাম। ঠিক যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। মাটি ফাটছে, সব দুলছে, ঝড়ের মতন শব্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কেউ আমায় তাড়া করছে। ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। মনে হয়, পরের দিন আমার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। আমি আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। সেখানেই পড়ে ছিলাম। সাধুর দল আমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে। কিন্তু জিপ অ্যাক্সিডেন্ট যেখানে হয়, সেখানে থেকে বেশ খানিকটা দূরে, মাইলটাক হতে পারে। আমি যে জিপে ছিলাম—কেউ তা আন্দাজ করতে পারেনি। আমার নিজেরও কিছু মনে পড়েনি।"

অনন্ত বলল, "তার মানে তুই এতটা দূরে চলে গিয়েছিলি অ্যাক্সিডেন্টের জায়গা থেকে যে কেউ বুঝতে পারেনি তুই জিপের একজন প্যাসেঞ্জার ছিলি।"

"তাই মনে হয়।"

আবার তিনজনেই চুপ করে গেল।

অনেকক্ষণ পরে কিশোর বলল, "নন্তু, কৃপা! আমার পক্ষে আর পুরনো কিশোর হয়ে ফিরে আসা সম্ভব নয়। কেউ মানবে না, বিশ্বাস করবে না। আমি আইনের কাছেও যেতে পারব না। আমার অতীত শেষ হয়ে গিয়েছে।"

কিশোর উঠে দাঁড়াল। "তোরা আমার জন্যে অনেক করেছিস। আর নয়। কিছু হবে না, ভাই। আমি যদি বেঁচে থাকি—অন্য ভাবে বাঁচব।...নে, হাত মেলা...।"

কৃপানাথ আর অনন্ত চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিশোর হাত মেলাল বন্ধুদের সঙ্গে। বলল, "চলি।"

"কোথায়?"

"জানি না।"

" কিশোর!"

"আর আমায় কিশোর বলিস না! আমি সত্যিই কিশোর কি না জানি না। চলি...।"

কিশোর আর দাঁড়াল না, হনহন করে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

ভয় পেয়ে কৃপানাথ বলল, "কী রে, ও কি গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে?"

অনন্ত ছুটল।

কৃপানাথ পাথরের মতন দাঁড়িয়ে থাকল।

খানিকক্ষণ পরে ফিরে এল অনন্ত। হাঁপাচ্ছিল। বলল, "না, খুঁজে পেলাম না। বেপাত্তা হয়ে গিয়েছে। আশ্চর্য।"

কৃপানাথ কোনও কথা বলল না।

ক ল্প বি জ্ঞা ন কা হি নী

মন্দারগড়ের রহস্যময় জ্যোৎস্না

আমার বড়দার নাম শিবনাথ।

নামের সঙ্গে মানুষের স্বভাবের মিল বড় একটা থাকে না। বড়দার বেলায় ছিল। 'ছিল' বলছি এইজন্য যে, বড়দা এখনও বেঁচে আছে কিনা আমরা জানি না। জানলে হয়তো মনটাকে সইয়ে নেওয়া যেত।

দু' বছর আগে একদিন বড়দা হঠাৎ আমাদের লয়লাপুরের বাড়ি থেকে চলে যায়। কাউকে কিছু না জানিয়ে। নিরুদ্দেশ বলতে যা বোঝায় সেইরকম আর কী! অন্তর্ধানও বলা যায়।

মেজদা আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে খবরটা জানাতে ভোলেনি। চিঠি পেতেই যা দু-তিনদিন দেরি হয়েছিল। তবে মেজদা লিখেছিল : "বড়দার কাণ্ডকারখানা তো তুই জানিস, এ তো নতুন নয় ; দশ-পনেরোদিন পর আবার ফিরে আসবে বলে মনে হয় দাদা। তবু আমি জানাশোনা জায়গায় খবর নিচ্ছি। তুই ভাবিস না।"

বড়দার জন্য প্রথম দু-এক হপ্তা আমরা অতটা ভয়-ভাবনা করিনি। কেননা, আমাদের বড়দা আগেও দু'-চারবার এরকম কাণ্ড করেছে। হঠাৎ উধাও, আবার দশ-বিশদিনের মধ্যে বাড়িতে ফিরে আসা।

এবার কিন্তু তা হল না। দু-এক হপ্তা থেকে দু-এক মাস, তারপর চার-ছ' মাস। শেষে বছর। বছর গড়িয়ে আবার বছর। দু' বছরেও বড়দার কোনও খবর পাওয়া যায়নি। আমরা সবরকম চেষ্টা করেও খোঁজ পেলাম না দাদার।

একেবারে হালে, বড়দার অন্তর্ধানের ঠিক ছাব্বিশ মাস পরে আমার নামে একটা রেজিস্ট্রি-করা প্যাকেট এল। খুলে দেখি, একটা সাধারণ চটিমতন ডায়েরি-খাতা আর একটি চিঠি।

চিঠিটি লিখেছেন মুকুলমনোহর ত্রিবেদী বলে এক ভদ্রলোক। চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে, তাঁদের ওদিককার এক ধর্মশালার পাঁড়েজি এই খাতাটা তাঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন। খাতায় যা-যা লেখা আছে তার বারোআনাই তিনি বোঝেননি। তাঁর কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে। যাই হোক, ডায়েরি-খাতার একপাশে আমার নাম-ঠিকানা দেখতে পেয়ে তিনি খাতাটা আমায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এই খাতার মালিক কি লেখক যে কে—তা উনি আন্দাজ করতে পারছেন না, তাঁকে কখনও দেখেছেন কিনা তাও বলতে পারবেন না। নিজে তিনি বাস সার্ভিসের ডিপো ম্যানেজার। কত লোক আসে-যায় রোজ, কত লোককেই তো তিনি দেখেন। তার মধ্যে কে যে এই ডায়েরির মালিক, কে জানে! আরও অবাক কথা, ডায়েরি-খাতায় নিজের নামের একটা ছোট সই থাকলেও পুরো নাম আর বাড়ির ঠিকানা লেখা নেই। নাম-ঠিকানা যা পাওয়া গেছে তা শেষের দিকের পাতার

এককোণে, পেনসিলে লেখা। ওটা খাতার মালিকের হতে পারত—যদি ডায়েরির গোড়ার পাতায় ছোট করে লেখা সই আর শেষের দিকের লেখা নামের আদ্যক্ষর এক হত। দুটোই আলাদা। কাজেই তিনি যে নাম-ঠিকানা পেয়েছেন তার ওপর ভরসা করেই খাতাটা পাঠাচ্ছেন।

ত্রিবেদীজির অনুমান ঠিকই। বড়দার নাম শিবনাথ গুহমজুমদার। আমার নাম কৃপানাথ। মেজদার নাম বিশ্বনাথ। বড়দার সই ছিল এস. জি. এম. বলে। 'এস' অক্ষর আর 'কে' অক্ষরে অনেক তফাত।

ডায়েরি-খাতাটা পেয়ে আমি যত অবাক, ভেতরের এলোমেলো আধখাপচা টুকরোটাকরা লেখা পড়ে তার চেয়েও বেশি হতভম্ব, বিহ্বল। ভয় ধরে গেল।

বড়দা কি তবে সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে গিয়েছিল? মাথার গোলমাল হয়েছিল দাদার? নয়তো এসব কী লিখেছে?

আমার বড়দার কথা এখানে একটু বলতে হয়। না বললে বুঝতে ভুল হতে পারে।

আমাদের বড়দা ছিল সরল সাদাসিধে মানুষ। একেবারে যেন ভোলানাথ। আত্মভোলা তো বটেই, বেশ খামখেয়ালিও। বড়দাকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে, মানুষটা একসময় এঞ্জিনিয়ারিংও পাস করেছিল। বাবার মনে যাই থাকুক, বড়দাকে কখনও চাকরিবাকরি করাতে পারেননি। আমাদের মা নেই। কবেই চলে গিয়েছেন। বাবাও চলে গেলেন একদিন। বড়দাই থাকল মাথার ওপর। লয়লাপুরের যে-জায়গাটায় আমরা থাকতাম তার নাম ছিল রোসলপুর। ঘরবাড়ি, সামান্য জমিজায়গা, ফলমূলের ছোটখাটো বাগান আমাদের ছিল। বড়দা রোসলপুরের বাজারে একটা মনিহারি দোকান দিয়ে বসে থাকল। দোকানে সাধারণ ওষুধপত্রও পাওয়া যেত। ওই দোকান আর বাড়ি নিয়েই দিন কেটে যেত দাদার। নিজে বিয়ে-থা করেনি। মেজদার বিয়ে-থা দিয়ে তাকে সংসারী করে বসিয়ে দিয়েছিল দাদা। মেজদা ডাক্তার। প্যাথোলজিস্ট। কাছাকাছি এক ছোট হাসপাতালে চাকরি করে। বড়দা, মেজদা বাড়িতে। আমিই শুধু বাইরে। কলকাতায় থাকি। চাকরি করি ওষুধ কোম্পানিতে। ঘুরে বেড়াবার কাজই বেশি।

বড়দার সম্বন্ধে আরও দু-একটা কথা বলা দরকার। আমি বরাবরই দেখেছি, ভুতুড়ে, অলৌকিক, অদ্ভুত ব্যাপার-ট্যাপার সম্পর্কে দাদার খুব ঝোঁক। মানে, এইসব বিচিত্র ঘটনার ওপর ওর ভীষণ টান ছিল। বাড়িতে বড়দার ঘরে হরেকরকম বই, কাগজপত্র, খবরের কাগজের কাটিং, ধুলোভরা উইয়ে-কাটা পুঁথিপত্রের মতন ছেঁড়াখোঁড়া পুরনো বই যে কত—তার হিসেব কে করবে! দু-একটা বইয়ের নাম আমার মনে পড়ছে। যেমন, 'এ স্টেপ ইন দ্য ডার্ক', 'দ্য সিক্স্থ সেন্স', 'আওয়ার হ্যন্টেড প্ল্যানেট'। নামগুলো মনে পড়ছে—কেননা আমি দু-চারবার এইসব বই নাড়াচাড়া করার চেষ্টা করেছি। একবর্ণও বুঝিনি। বইগুলো সবই বিদেশি; বিখ্যাত প্রকাশকদের ছাপা। কেউ যদি লেখক-প্রকাশকের

নাম-ঠিকানা জানতে চায়—জানিয়ে দিতে পারি।

বড়দার কাছে এই বইগুলো যেন তার প্রাণ। মেজদা বলে, দাদার যত পাগলামি! যত্ত ভূত আর অদ্ভুত নিয়ে মাথা ঘামানো!

পাগলামি কিনা আমি জানি না। জগতে কতরকম কী ঘটে, আমরা তার এককণাও জানি কি! না জেনে কোনও কথা কেমন করে উড়িয়ে দেওয়া যায়!

তবে হ্যাঁ, বড়দার মধ্যে যে একটু-আধটু পাগলামি আছে—তা আমিও জানি। মানুষটা দোকান, বাড়ি, মেজদার ছেলেকে নিয়ে দিব্যি আছে। হঠাৎ একসময় উধাও। বাড়িতে বউদিকেও কিছু বলে যায় না। সাতদিন, দশদিন, বড়জোর পনেরোদিন—তারপর আবার ফিরে আসে। বড়দা না থাকলে দোকান সামলায় কচিদা, যার ভাল নাম কাঞ্চন। কর্মচারীও আছে—একটা ছেলে, লাটুয়া।

বড়দার বয়েসের কথাটাও বলতে হয়। তা প্রায় পঞ্চাশ হল। পাকা শরীর-স্বাস্থ্য, মাথায় লম্বা, গায়ের রং ফরসা। মুখে দাড়িগোঁফ। মোটা খদ্দর ছাড়া অন্য কিছু পরে না। একেবারে ষোলোআনা নিরামিশাষী। দুধ খেতে খুব ভালবাসে। আর জিলিপি। পঁচিশ-তিরিশটা গরম 'জিলাবি' বড়দা দশ মিনিটে শেষ করে দিতে পারে।

আমার এই বড়দার হঠাৎ অন্তর্ধান, দু' বছর একেবারে নিখোঁজ, তারপর একদিন আচমকা তার একটা ডায়েরি—যা কিনা এলোমেলো অস্পষ্ট কিছু লেখা বই কিছু নয়—আমার ঠিকানায় এসে পৌঁছনো নিয়েই এই কাহিনী।

বড়দার ডায়েরি পড়ে আমি একেবারে হতভম্ব। আমার মাথায় কিছু ঢুকছিল না।

পাতা উলটে-উলটে বার কয়েক লেখাগুলো পড়লাম। বুঝতে পারলাম না। খাপছাড়া বিক্ষিপ্ত কিছু 'নোট্‌স'।

যেটুকু বুঝলাম তা থেকে মনে হল : মন্দারগড় বলে একটা জায়গায় এমন এক আলো দেখা যায়—মাঝে-মাঝে—যা একেবারে জ্যোৎস্নার মতন। কৃষ্ণপক্ষেও দেখা যায়। শুক্লপক্ষেও। শুক্লপক্ষে চাঁদের আলো দেখা যাবে এটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু শুক্লপক্ষের সব দিন তো ত্রয়োদশী, চতুর্দশী বা পূর্ণিমা নয় যে, সন্ধে না ঘনাতেই জ্যোৎস্না এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বিশ্বচরাচর।

বড়দা যে জ্যোৎস্না বা আলোর কথা লিখেছে তা কিন্তু পক্ষ মানে না, তিথি মানে না ; নিজের মরজি মতন সে দেখা দেয়—আবার মিলিয়েও যায়।

ব্যাপারটা বিচিত্র বইকি !

দুটো দিন ওই ডায়েরি নিয়ে আমার কাটল। মেজদাকে একটা জরুরি চিঠি লিখে দিলাম যে, আমি দু-একদিনের মধ্যে বাড়িতে আসছি। বড়দার খোঁজ পাওয়া যায়নি, তবে আচমকা তার লেখা একটা ডায়েরি এসে পড়েছে হাতে। বাড়িতে গিয়ে কথা হবে।

বাড়ি যাওয়ার আগের দিন আমার বন্ধু আনন্দকে তার বাড়িতে গিয়ে ধরলাম।

আনন্দ বলল, "আয়। তোকে ক'দিন দেখতে পাচ্ছি না।"

"ঝামেলায় ছিলাম। শোন, তোর সঙ্গে কথা আছে।"

"বোস। চা খা। বলে আসি।"

আনন্দ বাড়ির ভেতরে গেল। ফিরে এল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে।

"তোর কী মনে হচ্ছে রে, কৃপা ? বৃষ্টি আরও চলবে, না, বন্ধ হল ?" আনন্দ বলল।

"চলবে।" আমি বললাম।

"এখনও চলবে ! বলিস কী ! এবারে তো ভাসিয়ে দিল !"

"তা দিক। আশ্বিন মাসে বৃষ্টি বিদায় নেয় না। আরও একটা মাস ধরে রাখ।"

"অ্যানাদার মান্থ ! উঃ !"

"বৃষ্টির কথা রাখ। তোর সঙ্গে জরুরি কথা আছে।"

"বল ?"

"মন্দারগড় বলে কোনও জায়গার নাম শুনেছিস ?"

"মন্দারগড়— ! মন্দার—গড় ! কই, না। কেন ?"

"তুই তো নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াস। ঘুরে বেড়ানো তোর নেশা। স্বভাব। তাই জিজ্ঞেস করছি।"

আনন্দ মাথা নাড়ল। তবু ভাবছিল। বলল, "না ভাই ; ওরকম নাম শুনিনি। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে গড় মান্দারণের কথা পড়েছি। সেটা তো শুনি পুরনো বিষ্ণুপুর জাহানারাদ—ওসব এরিয়ার কোথাও একটা গড়টড় ছিল ! বলতে পারছি না। বানানো নামও হতে পারে। কেন ?"

"না-না, সে গড় নয়। এ একেবারে অন্য।"

"কোথায় ?"

"সেটাই তো তোকে জিজ্ঞেস করছি।"

"বলতে পারব না।"

"উড়িষ্যা, এম-পি আর বিহারের বর্ডারের গায়ে বলে আমার মনে হচ্ছে।"

"কে বলল ?"

"ডায়েরির নোট পড়ে তাই মনে হচ্ছে।"

"ডায়েরি ! কার ডায়েরি ?"

"বড়দার।"

আনন্দ ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। আমার বড়দা যে আজ দু' বছর ধরে নিরুদ্দেশ—এ-কথা সে জানে। ভাল করেই জানে। তার সঙ্গে বড়দার ব্যাপার নিয়ে আমার কত কথাই হয়েছে কতবার। নতুন করে বলার কিছু ছিল না, শুধু এই দিন-দুই আগে যা ঘটেছে সেটা ছাড়া।

আনন্দ অবাক গলায় বলল, "তোর বড়দার ডায়েরি ! কই, আগে তো শুনিনি !"

"কেমন করে শুনবি ! আমি নিজে কি জানতাম ! গত বুধবার হঠাৎ এক রেজিস্ট্রি প্যাকেট এল আমার নামে। এক ভদ্রলোক পাঠিয়েছেন। খুলে দেখি তার মধ্যে বড়দার একটা পাতলা ডায়েরি-খাতা। তাতে কিছু এলোমেলো লেখা। নোট্স গোছের।"

"কে পাঠিয়েছেন ? ভদ্রলোকের নামধাম... ?"

"ভদ্রলোকের নাম মুকুলমনোহর ত্রিবেদী।"

"দারুণ নাম তো ! মুকুলমনোহর !...তা কোথা থেকে পাঠিয়েছেন ?"

"মধ্যপ্রদেশের কাটোরাঘাট বলে একটা জায়গা থেকে।"

"কোথায় জায়গাটা ?"

"বলছি। আগে ডায়েরির কথাটা শোন।"

আমি যতটা পারি সংক্ষেপ করে আনন্দকে ডায়েরি পাওয়া এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত বলছিলাম, এমন সময় চা এল।

চা রেখে বাড়ির কাজের ছেলেটি চলে যাওয়ার পর চা খেতে-খেতে কথাগুলো সেরে ফেললাম।

আনন্দ খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনছিল। মাঝে-মাঝে দু-একটা প্রশ্ন করছিল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল—আমার কথা সে যতটা অবাক হয়ে শুনছে, ততটা বিশ্বাস করতে পারছে না। বরং তার যেন অবিশ্বাসই বেশি।

আমি থামলাম।

আনন্দ বলল, "ডায়েরি-খাতাটা এনেছিস ?"

"না। আমার কাছেই আছে। বাড়িতে।"

"আনলে পারতিস। পড়ে দেখতাম। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। সারা বছর একটা জায়গায় কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ সবসময় জ্যোৎস্নার আলোর মতন আলো দেখা যাবে—এ কেমন করে হয় !"

"রোজই দেখা যায়, তা অবশ্য নয়। মাঝে-মাঝে যায় না। আবার দেখা যায়।"

"বড়দা কী লিখেছেন বল দিকি ?"

"বড়দার ডায়েরি থেকে আমার মনে হল, এইরকম আলো নাকি আগে আরও দু'বার দেখা গিয়েছিল। একবার সেই উনিশশো চল্লিশ সালের আগে। তারপর উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে। আর এখন আবার দেখা যাচ্ছে।"

"একই জায়গায় দেখা যাচ্ছে ?"

"মোটামুটি জায়গাটা এক। এক-আধ মাইল তফাত হচ্ছে।"

"বড়দা কি এই আলো দেখতেই ওখানে—মানে—কী গড় বললি—সেখানে গিয়েছিলেন ?"

"মন্দারগড় ! আমার মনে হয় বড়দা কোনও সূত্রে খবরটা শুনে ওখানে গিয়েছিল। দেখতে।"

"দু' বছর ধরে তিনি ওখানে বসে-বসে আলো দেখেছেন ? তাই হয় নাকি ?"

"কী জানি ! ডায়েরিতে কোথাও তারিখ নেই যে বুঝব, কবে গিয়েছিল, কতদিন ছিল বড়দা !...আরও একটা-দুটো অদ্ভুত জিনিস লেখা আছে মন্দারগড় নিয়ে। লেখা আছে, ওই আলো যখন দেখা দেয় তখন চারপাশ থেকে ঝিঁঝির ডাকের মতন এক শব্দ শোনা যায়। সে নাকি এমন শব্দ যে, খানিকক্ষণ পরে ঝিম ধরে যায় মাথায়। আর আলোর মধ্যে গড়ের মাথার ওপর একটা অদ্ভুত জিনিস—দেখতে অনেকটা সাবমেরিনের মতন—ছোট্ট 'ভেসেল' ঘুরে বেড়ায়।"

"আন্‌আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট নাকি ? যাকে বলে ইউ-এফ-ও ?"

"কী জানি !...আরও দু-চারটে অবাক ব্যাপার আছে। ডায়েরি পড়লে বুঝতে পারবি।"

"তা তুই কী করবি ?"

"আমি একবার বাড়ি যাব দু-একদিনের মধ্যে। মেজদার সঙ্গে কথা বলব। ফিরে আসব আবার। তারপর খোঁজখবর করে মন্দারগড়ে যাব।...তুইও যাবি আমার সঙ্গে। পারবি না ? তোর অফিস থেকে ছুটি ম্যানেজ করতে পারবি না দিন আট-দশ ?"

আনন্দ হাসল। "পুজোর মুখে ছুটি ম্যানেজ করা মুশকিল। তবু যাব। তুই ভাবিস না।"

দুই

মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন ধরলে মোটামুটি একটা রাত কাটাতে পারলেই আমাদের লয়লাপুরে পৌঁছনো যায়। শনিবার সন্ধের মুখে হাওড়া স্টেশন এসে গাড়ি ধরলাম।

ট্রেনে এক চেনাজানা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি কলকাতার লোক। নিজের ছোটখাটো ব্যবসা রয়েছে। রাবার কারখানা।

ভদ্রলোক ব্যবসার কাজে কোথাও যাচ্ছিলেন। বললেন, "কোথায় ?"

"বাড়ি যাব।"

"সে কী ! এত তাড়াতাড়ি ! পুজোর তো এখনও দেরি মশাই।" বলে হাসলেন।

আমি হেসে বললাম, "না, দরকার আছে।"

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথায়-কথায় খানিকটা সময় কাটানো গেল। ভালই হল। আসলে আমার মনে ক'দিন ধরেই নানান দুর্ভাবনা। দিনে, রাতে কোনও সময়েই সুস্থির হতে পারছি না। কতরকম কী ভাবছি ! কখনও বড়দার কথা, কখনও মন্দারগড়ের কথা, সেই জ্যোৎস্নার কথা, এমনকী বিচিত্র সেই বায়ুযানটির কথা—যেটি গড়ের মাথার ওপর মাঝে-মাঝে ভেসে বেড়ায় জ্যোৎস্নার মধ্যে। এইরকম আরও কত কী মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনবরত।

তবে সবচেয়ে বেশি ভাবছিলাম বড়দাকে নিয়ে। বড়দা যে কবে মন্দারগড়ে

গিয়েছিল তা কোথাও লেখা নেই। মানে একটা তারিখও লেখা নেই ডায়েরির কোথাও। থাকার মধ্যে গরমকালের কথা লেখা আছে দু-এক জায়গায়। সেটা কোন গরমকাল ? এ-বছরের ? না, গত বছরের ? এ-বছরের গরমকাল হলে, দাদার খোঁজখবর পাওয়ার খানিকটা আশা করা যায়। তার আগে হলে ভরসা করে লাভ কী ! বড়দা যে বেঁচে আছে তাও তো আর মনে হয় না !

কোথায় গেল মানুষটা ? আর কেমন করেই বা গেল ?

এইসব ভাবতে-ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কে জানে ! ভোরে ঘুম ভাঙল যখন— তখন চেনাশোনা ভদ্রলোককে আর দেখতে পেলাম না। তিনি অনেক আগেই নেমে গিয়েছেন।

বাড়িতে সন্ধেবেলায় মেজদা, বউদি আর আমি— তিনজনে বসে দাদার ডায়েরি নিয়েই কথাবার্তা বলছিলাম।

মেজদা বলল, "তারিখ-টারিখ, সময় কিছুই নেই, কেমন করে বুঝব লেখাগুলো কবেকার !"

আমি বললাম, "গরমকালের কথা আছে !"

"কোন গরম ? এ-বছর, না, গত বছর ? না, তার আগের বছর ?"

বউদি বলল, "এ তো সোজা হিসেব। গত বছর বা এ-বছর। দাদা গত বছরের আগের বছর শ্রাবণ মাসে চলে গিয়েছিলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে। রাখিপূর্ণিমার আগের দিন।"

"মানে, এইট্টি নাইন-এ... ! ইংরিজি কী মাস ?"

"জুলাই হবে," মেজদা বলল।

"এইট্টি নাইন জুলাই থেকে নাইনটি জুলাই, এক বছর। নাইনটি জুলাই থেকে নাইনটি ওয়ান জুলাই দু' বছর। এখন নাইনটি ওয়ান সেপ্টেম্বর। ওই ছাব্বিশ মাসই হল।"

মেজদা বলল, "এইট্টি নাইন বাদ। জুলাই মাসে চলে গিয়েছে দাদা। তখন বর্ষাকাল। কাজেই ওই বছরের গরমের কথা ওঠে না। গত বছর হতে পারে, বা এ-বছর।"

বউদি বলল, "ডায়েরিটা কিন্তু পুরনো। উননব্বই সালের।"

ঠিকই বলেছে বউদি। ডায়েরিটা পুরনো। বাহারি বড়সড় ডায়েরি-খাতা নয়, একেবারে মামুলি খাতা। কোনও এক অগ্রওয়াল কোম্পানির। উননব্বই সালেরই। বড়দাকে কেউ দিয়েছিল। এরকম ডায়েরি-খাতা বড়দার ঘরে আরও আছে। পুরনো খাতা পড়ে রয়েছে। ডায়েরি লেখার অভ্যেস বড়দার ছিল না। ক'জনারই বা থাকে ! আমরা কে আর নতুন বছরে এক-আধটা ডায়েরি-খাতা না পাই। কিন্তু পাই বলেই যে ডায়েরি লিখি, তা তো নয়। বড়দাও নিয়মিত কিছু লিখত বলে জানি না। তবে হ্যাঁ, অনেক ডায়েরির পাতায় দু-একটা টুকরো লেখা যেমন লেখা থাকত— তেমনই হিসেবপত্রও থাকত কিছু-কিছু। বড়দা লিখত।

দোকানের হিসেব, বা বাড়িতে মিস্ত্রি-মজুর খাটলে তার হিসেব। আবার ডায়েরি-বইয়ের পাতা ছিঁড়ে টুকটাক ফর্দ বা চিঠিও লিখত বড়দা। মেয়েরা তো এমন ডায়েরিতে মুদি, ধোপা, দুধের হিসেবও লেখে।

বউদির কথা মেনে নিয়ে আমি বললাম, "গত বছর গরম বা এ-বছরের গরম যে, তা ঠিকই। তবে কোন বছর ? গত বছর হলে, বড়দার খোঁজখবর আর পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। পনেরো-ষোলো মাস হয়ে গেল। এ-বছর হলে একটা আশা আছে। মানে, তবু একটু আশা করতে পারি।"

মেজদা চুপ করে থাকল। তারপর বড় করে নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি কী বলব ! আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। গড়, জ্যোৎস্না, একটা নৌকো না কী ভেসে বেড়ায় বলছিস— কেমন করে এসব সম্ভব ! গল্পটল্প হলে না-হয় বুঝতাম বানানো ব্যাপার। কিন্তু দাদা তো গল্প লেখার লোক নয়।"

আমি বললাম, "আরও দু-চারটে ব্যাপার আছে।"

"কী ?"

"মন দিয়ে পড়োনি লেখাগুলো ?"

"পড়েছি। এমন ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল যে, সব মনে রাখতে পারিনি।"

"গড়ের আশেপাশে এক-আধটা ছোট গ্রাম ছিল আগে। এখন আর নেই। গ্রামের লোকরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে গ্রাম ছেড়ে।"

"পড়েছি। কেন পালিয়েছে, মনে পড়ছে না এখন !"

"গ্রামের দু-তিনজন লোক হাওয়া হয়ে গিয়েছে অদ্ভুতভাবে। তাদের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।"

"কেমন করে গেল !... ও হ্যাঁ, মনে পড়ছে ! দাদা লিখেছে, গ্রামের লোক বলে— হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠে লোকগুলোকে কোথাও টেনে নিয়ে গিয়েছে। উড়িয়ে ফেলে দিয়েছে কোনও খানাখন্দে। কিংবা তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে নৌকোয়।"

"তাদের তাই ধারণা। সত্যি-মিথ্যে বলা মুশকিল।... আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার দাদা লিখেছে। লিখেছে, গড়ের আশেপাশের অনেক গাছপালা যেন বাজ পড়ে ঝলসে শুকনো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডালপালা শুকনো, মরা, একটা পাতাও আর চোখে পড়ে না। গাছের কঙ্কাল যেন !"

বউদি বলল, "সবই ভুতুড়ে ব্যাপার !"

মেজদা বলল, "তুই এখন কী করবি ঠিক করছিস ?"

"আমি একবার মন্দারগড় যাব।"

"তুই ? একলা ?"

"একলা নয়। আমার এক বন্ধুও সঙ্গে যাবে।"

"আমিও যেতে পারি।"

"না। তোমার গিয়ে লাভ নেই। তুমি বাড়িতে থাকো। আমি ওখানে গিয়ে তোমাদের চিঠি লিখে সব জানাব। নিজের চোখে না দেখলে আমার কিছুই বিশ্বাস

হচ্ছে না।"

"দেখতে গিয়ে বিপদে পড়লে কী করবি? দাদাও তো দেখতে গিয়েছিল বলে মনে হচ্ছে।... কৃপা, তোকে সত্যি কথা বলছি। দাদা আজ দু' বছরের বেশি নেই। তবু আমার মনে হত, দাদা কোথাও আছে হয়তো। খেয়ালি মানুষ। হয়তো সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে বসে আছে কোথাও। এই ডায়েরি পড়ে আমার মনে হচ্ছে, দাদা আর হয়তো নেই।" বলতে-বলতে মেজদা কেঁদে ফেলল।

বউদির চোখেও জল। দাদা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আমাদের সবেধন ভাইপোটিকে নিয়ে বিস্তর ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হয়েছে বউদি আর মেজদাকে। তাকে সামলানো যেত না। অসুখ-বিসুখও করেছে। পরে ক্রমে-ক্রমে তাকে সামলানো গিয়েছে। ছেলেটাকে মিথ্যে করে কত কী বলা হয়েছে। মেজদা, বউদির ভয় আমি বুঝতে পারি।

আমি বললাম, "মেজদা, আমি বড়দার মতন বোকামি করব না। বড়দা যেচে যদি বিপদে পড়ে থাকে— তবে সেটা তার বোকামি। আমি বিপদের বাইরে থাকব। সঙ্গে আমার বন্ধু থাকবে।... তা ছাড়া, কথা কী জানো? বড়দার একটা খোঁজ পাওয়া দরকার। সে আছে কি নেই— সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু মানুষটা গেল কোথায়? কী হয়েছিল তার? গড়ের জ্যোৎস্না আমার কাছে বড় কথা নয়। আমার কাছে, নিজের দাদার কী হল জানাটাই আসল কথা। তোমরা আপত্তি কোরো না। প্লিজ।"

মেজদা ফোঁপাতে লাগল।

বউদি আর বসল না। বসতে পারছিল না। মুখ লুকিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বছরে দু-তিনবার আমি বাড়িতে আসি বরাবরই। কখনও-কখনও ফাঁকফোকর পেলে বাড়তি এক-আধবারও হয়ে যায়। পুজোর সময় তো বরাবরই আসি। আর শীতের শেষে, মোটামুটি দোলের সময়। আমাদের এখানে ওই সময়টা বড় চমৎকার।

যখনই বাড়িতে আসি, বড়দার ঘরে মাঝেসাঝে উঁকি দেওয়া আমার স্বভাব। বিশেষ কোনও কারণে নয়, এমনি। খানিকটা সাধারণ কৌতূহল। বড়দার ঘরে নতুন কী জমল, দেখার আগ্রহ হয় হয়তো।

বড়দা আজ দু' বছর নিরুদ্দেশ। এই দু' বছরে আমি পাঁচ-সাতবার বাড়ি এসেছি। বড়দার ঘরও দেখেছি বই কী! ভেবেছি, যদি একটা এমন কিছু পাওয়া যায়— কোনও সূত্র— যা থেকে অন্তত দাদার হঠাৎ নিরুদ্দেশের কারণটা জানা যায়, তা হলে মনে হয়তো স্বস্তি পাব।

ঘরের জিনিসপত্র ঘেঁটেছি। কাগজপত্র উলটেছি, আলমারি খুলে দেখেছি ইতিউতি— কিছুই খুঁজে পাইনি।

এবারও বড়দার ঘরে আমার একটা বেলা কেটে গেল।

অন্যবারের তুলনায় এবারে খোঁজাখুঁজি বেশি করলাম। আগে তো জানতাম না

কিছুই, আন্দাজও করতে পারিনি— কাজেই যা খুঁজেছি সবই ওপর-ওপর। এবার তো তা নয়।

মেজদা বলল, "পেলি কিছু ?"

"না।"

"তা হলে ?"

"আমি ভাবছি, বড়দা কি কোথাও মন্দারগড়ের কথা পড়েছিল ? কিংবা শুনেছিল ? আর তখনই মাথায় খেয়াল চাপল মন্দারগড় যাওয়ার ? পুরনো কাগজপত্র যা পড়ে আছে, দেখলাম। মন্দারগড়ের কথা কোথাও নেই।"

মেজদা বলল, "না-না, মন্দারগড় তখন কোথায়। দাদা তো জুলাই মাস নাগাদ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। গড়ের ভূত মাথায় চাপলে— তখন-তখনই সেখানে ছুটত। কিন্তু ডায়েরির লেখা থেকে যা মনে হল, বাড়ি ছাড়ার পরের বছর গরমকালে দাদা মন্দারগড়ে গিয়েছিল। বা এ-বছর। ...না না, বাড়ি ছাড়ার সময় দাদার মাথায় মন্দারগড় ছিল না।"

"আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে যাবেই বা কেন ?"

"ও তো বড়দার স্বভাব।"

"এখানে বড়দার বিশেষ বন্ধু হরিদা। ভাবছি আজ একবার হরিদার কাছে যাব।"

"আগেও গিয়েছিলি তুই। আমি গোড়া থেকে কতবার জিজ্ঞেস করেছি— হরিদা কিছু জানেন কি না ! দাদা তাঁকে কোনও কথা বলেছিল কিনা ! হরিদা বলেন, দাদা একটা কথাও তাঁকে বলেনি।"

"এবারের ব্যাপারটা অন্যরকম, মেজদা। একটা খোঁজ তো আমরা পেয়েছি। হরিদাকে জানানো দরকার। আর কথায়-কথায় যদি কিছু মনে পড়ে যায় হরিদার— বলতে পারবেন।"

"তা অবশ্য ঠিক।"

সামান্য চুপ করে থেকে আমি বললাম, "বড়দার ঘর থেকে দু-একটা বই আমি নিয়ে যাব।"

"বই ?"

"পড়ে দেখব। কী আছে ওই বইগুলোয়— ওই ইউ-এফ-ও ব্যাপারটা কী, একটু পড়ে না দেখলে বুঝতে পারছি না দাদা কী বলতে চেয়েছে ডায়েরিতে।"

"বেশ তো, নিয়ে যা। তা ছাড়া দাদা চলে যাওয়ার পর থেকে তার বইপত্রে শুধু ধুলো জমছে। আমি ওসব বুঝি না। আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই।"

হরিদা থাকেন কোতোয়ালির কাছে।

সন্ধেবেলায় হরিদার কাছে গেলাম। বাড়িতেই ছিলেন হরিদা। উনি এখানকার স্কুলের অ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার।

"আরে কৃপা যে ! কবে এলি তুই ?" হরিদা আমায় হাত বাড়িয়ে ডেকে

নিলেন।

"কাল এসেছি।"

"পুজোর আগে এলি যে বড়? পুজোয় আসবি না?"

"বলতে পারছি না, দাদা। আমি একটা জরুরি কাজে এসেছি।"

"জরুরি কাজে— !"

"আপনার সঙ্গে ক'টা কথা আছে।"

"ভেতরে চল।"

বাবার ঘরে বসলাম দু'জনে।

"কী কথা, বল?"

বড়দার ডায়েরির কথা বললাম হরিদাকে। অবাক হয়ে শুনলেন হরিদা। মাঝে-মাঝে কথাও বলছিলেন।

আমার কথা শেষ হওয়ার পর, হরিদা মাথা নাড়তে লাগলেন।

আমি তাঁকে দেখছিলাম।

মাথা নাড়তে-নাড়তে হরিদা বললেন, "শিবু আমায় গড়ের কথা একবারও বলেনি। তবে— তবে একদিন কথায়-কথায় বলেছিল, কোথায় যেন একটা পাহাড়ি ছোট নদীর ওপর কাঠের তক্তা পাতা সাঁকোর কাছে নৌকোর মতন একটা জিনিস শূন্যে ভেসে বেড়াতে দেখেছে লোকে। জায়গার নামটাম তো আমার মনে নেই, কৃপা। আমি ভাল করে শুনিওনি সব। তবে জায়গাটা কাছাকাছি নয়। শিবু যা পাগল, হঠাৎ সেই নদী খুঁজতে চলে গিয়েছিল কিনা কে জানে!"

"জায়গাটা কোন দিকে, মানে কোন স্টেটে হতে পারে বলে আপনার মনে পড়ে?"

"না।"

"এম পি— মধ্যপ্রদেশ?"

"বলতে পারছি না। হতে পারে। আমাদের এদিকে কোথাও নয়।"

"দাদা আর কিছু বলেছিল?"

"না।"

"সেখানে যাবে বলেছিল?"

"কই, না! তাও তো বলেনি।"

আমি সামান্য চুপচাপ বসে থেকে বললাম, "হরিদা, আমি একবার মন্দারগড়ে যাচ্ছি। দেখি, যদি কোনও খোঁজ পাই!"

হরিদা আমায় দেখছিলেন।

তিন

কলকাতায় ফিরে এসে দেখি আনন্দ মোটামুটি সব ব্যবস্থা সেরে রেখেছে। তার অফিস নিয়ে একটু ভাবনা ছিল, ছুটি পায় কি পায় না! পুজোর মুখে মুখে ছুটি বলেই ঝামেলা। তা আনন্দ চালাক-চতুর ছেলে, তার খানিকটা খাতিরও আছে অফিসে। বছর দুই আগেও সে অফিসের ফুটবল খেলোয়াড় ছিল। ক্যাপ্টেন হয়েছিল বারতিনেক। একেবারে হালে খেলা ছেড়ে দিয়েছে, তবে মাতব্বরি ছাড়েনি। হাঁটুর চোট তাকে না ভোগালে হয়তো সে আরও এক-আধ বছর খেলতে পারত। খেলা ছাড়াও ঘোরাঘুরির নেশা ছিল আনন্দর। তার অফিসের দু-একজন আর বাইরের দু-তিনজন বন্ধু মিলে একটা দল করেছিল বাইরে ঘুরে বেড়াবার। একে খেলোয়াড় তার ওপর ভ্রমণ-বিশারদ বলে অফিসের অনেকেই তাকে পছন্দ করত। কাজেই ছুটি বাগিয়ে নিতে আনন্দর তেমন কোনও অসুবিধে হয়নি।

আমার কথা আলাদা। মাসের মধ্যে দশ-পনেরোটা দিন প্রায়ই আমায় কলকাতার বাইরে কাটাতে হয়। অফিস থেকে ব্যবস্থা করে নিলাম।

আনন্দ ঠিক করেছিল আমরা সাউথ ইস্টার্ন লাইন ধরে যাব। হাওড়া স্টেশন থেকে উঠব, আর রুরকেল্লা হয়ে রায়গড় পর্যন্ত চলে যাব। তারপর দেখা যাবে। যদি দরকার হয় আগেও নেমে পড়তে পারি। ট্রেন বদলাতে বা বাস পেলে বাস ধরতেও পারি। মুকুলমনোহর ত্রিবেদীর চিঠিতে পথের কোনও নিশানা দেওয়া ছিল না। তিনি নিশ্চয় অনুমানও করেননি যে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কটোরাঘাট পর্যন্ত যাব। কটোরাঘাটেই তিনি থাকেন।

হাওড়া স্টেশনে এসে সব গোলমাল হয়ে গেল। যে ট্রেনে যাব—সেটা ঘণ্টাতিনেক পরে ছাড়ল। আমাদের রেলবাবুদের দয়ায় ট্রেন যে কখন আসে আর কখন যায় বলা মুশকিল। ঠিক-ঠিকানা নেই। তারপর যেহেতু বর্ষা এখনও বিদায় নেয়নি, কোথায় বন্যা হচ্ছে, কোথায় রেল লাইন ডুবে আছে কে বলতে পারে। দেরি তো হবেই।

ট্রেনে উঠে আনন্দ বলল, "নে, প্রথম থেকেই বাধা। এই গাড়ি যে কখন রুরকেল্লা পৌঁছবে তা জানি না। তারপর রায়গড়! রাস্তায় আরও দশ-পনেরো ঘণ্টা লেট হতে পারে।"

"আমাদের কপাল!"

"এখন তো হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ো। পরে যা হয় হবে।"

হাত-পা ছড়াবার মতন জায়গা অবশ্য আমরা পাইনি। তার ওপর দু-একটা লটবহর বাড়তি হয়ে গিয়েছে। আনন্দ ঘোরাফেরা করে বলে সে জানে, বাইরে গিয়ে অনেক সময় সাধারণ কয়েকটা জিনিসের জন্যেও অসুবিধেয় পড়তে হয় ভীষণ। একটা মামুলি টর্চ, দু-পাঁচ হাত দড়ি, অল্পস্বল্প তুলো, একটু আয়োডিন, মাথা ধরার দু-চারটে বড়িও পাওয়া যায় না দরকারে। এইরকম কত কী! কাজেই

আনন্দ নানান ব্যবস্থা করে নিয়েই যাচ্ছে। তা ছাড়া আমরা যে কোথায় যাচ্ছি, কী হতে পারে ভবিষ্যতে এসব চিন্তাও সে করেছে। ফলে আরও পাঁচ-সাতটা জিনিস ভরে ফেলেছে। একটা লম্বা ধরনের ব্যাগও নিয়েছে আনন্দ। এই ব্যাগের চেহারাটা দেখতে গল্‌ফ স্টিক রাখা ব্যাগের মতন। ওর মধ্যে কী আছে আনন্দ আমায় স্পষ্ট করে বলেনি। শুধু চোখ টিপে হেসে বলেছে, "কাজে লাগতে পারে ব্রাদার। খালি হাতে অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়া যায় না।"

"এটা অ্যাডভেঞ্চার ?"

"খানিকটা তো নিশ্চয়। কোথায় যাচ্ছি জানি না ! কী দেখতে পাব জানি না ! কোন অবস্থায় গিয়ে পড়ব—কে বলতে পারে !"

কথাটা ঠিকই। তবু আমি বললাম, "আনন্দ, তোর কী মনে হয় ?"

"কীসের ?"

"বড়দা— ! মানে বড়দাকে কি ... !"

"আই ডাউট ! দু' বছরের বেশি যে-মানুষ নিখোঁজ, পাত্তা নেই—তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমার ভাই বিশ্বাস হয় না। বড়দা ছেলেমানুষ নন যে হারিয়ে যেতে পারেন। তিনি বয়স্ক মানুষ, বুদ্ধিবিবেচনা রয়েছে, চোখে দেখতে পান—কথা বলতে পারেন—কোন যুক্তিতে বলব যে, তিনি বেঁচে আছেন—অথচ বাড়ি ফিরতে পারেননি !"

আমি মাথা নেড়ে তার কথা স্বীকার করলাম। তারপর বললাম, "সবই ঠিক রে। আমারও মনে হয়, বড়দা আর নেই। কিন্তু কী এমন ঘটল যে দাদা চলে গেল ! কী হয়েছিল ? অসুখ-বিসুখে মারা গেলেও একটা খবর জোগাড় করা যেতে পারে ! কী বলিস ?"

"তা পারে।"

"কিংবা ধর, ওই মন্দারগড়ের জ্যোৎস্নার রহস্য জানতে গিয়ে যদি কোনও বিপদ হয়ে থাকে, মারা যায় দাদা..."

আনন্দ বলল, "এখন আর অযথা ভাবিস না। আমরা তো যাচ্ছি। কী হয়েছে সেখানে গিয়েই খোঁজ করব। তুই এক কাজ কর। ডায়েরিটা আমায় দে, বসে-বসে ভাল করে পড়ি। তুইও পড়তে পারিস কিছু।"

বড়দার ডায়েরি-খাতাটা আমার সুটকেসে ছিল। সুটকেস খুলে খাতাটা বার করে দিলাম আনন্দকে।

আর আমি আমার কিট ব্যাগ থেকে বড়দারই একটা বই, বাড়ি থেকে যা নিয়ে এসেছি, 'এ স্টেপ ইন দ্য ডার্ক' বার করে নিলাম।

ট্রেন তখন খানিকটা পথ এগিয়ে এসেছে। রাত হয়ে আসছিল।

কী করে যে কটোরাঘাট এসে পৌঁছলাম সে বৃত্তান্ত দিয়ে লাভ নেই। ট্রেন বদলে বাস ধরে, এখানে ওখানে হাঁ করে বসে থেকে, খোঁজ নিয়ে নিয়ে পরের দিন সন্ধেবেলায় এসে পৌঁছনো গেল কটোরাঘাটে। বৃষ্টির মধ্যে।

মুকুলমনোহর ত্রিবেদী-মশাইকে পেতে কিন্তু কোনও অসুবিধে হল না। তিনি বাস সার্ভিসের ম্যানেজার। তাঁর অফিস আর বাড়ি গায়ে-গায়ে।

কটোরঘাট পর্যন্ত কোনও সরাসরি রেললাইন নেই। কাছাকাছি কোনও রেলের লাইন আছে বলেও শুনলাম না। আশেপাশে যেদিকেই নামো, রেল স্টেশনে নামার পর—ট্রেকার আর বাস ধরেই এসব জায়গায় আসতে হয়। পাহাড়তলি বলতে যা বোঝায়—প্রায় তাই যেন এলাকাটা। সমতলভূমি বড় চোখে পড়ে না, উঁচু-নিচু জায়গা, চারপাশে জঙ্গল, কত রকম গাছপালা, ছোট-ছোট পাহাড়ের ঢেউ, আঁকাবাঁকা বাস রাস্তা। এদিকে তখনও বর্ষা চলছিল।

আমরা দুই বাঙালি ছেলে বাসস্ট্যান্ডে নেমে ত্রিবেদীজির খোঁজ করতেই একজন তাঁর বাড়ি দেখিয়ে দিল।

চল্লিশ-পঞ্চাশ পা হাঁটতেই মুকুলমনোহরের বাড়ি পাওয়া গেল।

একতলা বাড়ি। ছোট। মাথার ছাদ খাপরার। ইটের চেয়ে কাঠকুটোই যেন বেশি বাড়িটায়। দেয়ালের দশ আনাই দেখি কাঠের।

ত্রিবেদীজি তখন বাড়িতেই ছিলেন।

আমাদের ডাকাডাকিতে বেরিয়ে এলেন ভদ্রলোক।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই আমরা বাস থেকে নেমেছিলাম। গায়ে হালকা বর্ষাতি আমাদের, মাথায় বর্ষা-টুপি। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টি-বাদলার জন্যে আরও আঁধার দেখাচ্ছিল চার পাশ।

মুকুলমনোহর আমাদের মতন দুই আগন্তুককে দেখে প্রথমটায় কেমন যেন ধাঁধায় পড়ে গেলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন।

নমস্কার জানিয়ে আমি নিজের পরিচয় দিলাম।

ত্রিবেদীজি হয়তো এতটা আশা করেননি, ভাবেনওনি। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার পর তিনি আমাদের নমস্কার জানালেন। "আসুন। ভেতরে আসুন।"

বারান্দার কোণের দিকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন আমাদের। আলো আনতে বললেন কাকে যেন।

ঘরটায় আসবাবপত্র যৎসামান্য। কাঠের চেয়ার, একটা বেঞ্চি, গোল মতন টেবিল একটা, কিছু খাতাপত্র, কয়েকটা মোবিলের টিন, একটা নতুন টায়ার, বাস বা লরির।

"বসুন বাবুজি, বসুন," ত্রিবেদীজি বসতে বললেন চেয়ারে, "রেইনকোট খুলে রাখুন। আমায় দিন।"

আমরা বর্ষাতি খুলে ফেললাম। নিজেদের লটবহর রেখে দিলাম একপাশে।

"আপনারা সোজা কলকাত্তা থেকে আসছেন ?"

"জি।"

"আসতে বহুত তকলিফ হল ?"

"তা হয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে আসতে হল। ট্রেন, ট্রেকার, বাস...।"

"মাফ করবেন বাবুজি। আগর আমি জানতাম আপনারা ইধার আসবেন তো চিঠ্‌টিতে ডিরেকশান দিয়ে দিতাম। আপনি কিরপানাথবাবু ?"

"হ্যাঁ, আমি কৃপানাথ। এ আমার বন্ধু আনন্দ। ... আপনি আমার ঠিকানাতেই ডায়েরিটা পাঠিয়েছিলেন।"

কথাটা আগেই বলেছি, আবার বললাম ত্রিবেদীজিকে।

আলো এল। লণ্ঠন। আমরা যে ধরনের লণ্ঠন দেখি তার চেয়ে বড়। আলোও মোটামুটি মন্দ নয়।

আলো রেখে লোকটা চলে যাচ্ছিল, ত্রিবেদীজি তাকে বললেন, "আরে ছেলিয়া, চা বানাও।"

লোকটা চলে গেল। ওর নাম কি ছেলিয়া !

ত্রিবেদীজি বললেন, "বাবুজি, ওই খাতা আমার কাছে দো-তিন মাস পড়ে থাকল। বাদে আমি পাঠালাম।"

আমি বললাম, "আপনি তো বাংলা বলতে পারেন, পড়তেও পারেন ?"

"পারি ; থোড়া বহুত পারি। আমি বাংলা মুলুকে ছিলাম। রানিগঞ্জে। রেলওয়েতে কাম করতাম। যখন বিলুয়া স্টেশনে কাম করতাম, এম-পি'তে ছোটা স্টেশন—তখন আমার মাস্টারসাহেব ছিলেন দাদাজি। বাঙালিবাবু। দাদাজির কাছেও আমি বাংলা শিখেছি।"

"বাংলা মুলুকে কোথায় ছিলেন ?" আনন্দ জিজ্ঞেস করল।

"রানিগঞ্জ, অণ্ডাল।"

"আচ্ছা ! আপনি আগে রেলে চাকরি করতেন ?"

"দশ-বারো সাল করেছি। ছেড়ে দিলাম। বাদ মে কনট্রাকটারি করতাম। ছেড়ে দিলাম। আজ পাঁচ-সাত সাল বাস-সারভিসে। আমার চাচাজির বাস সারভিস আছে। চাচাজি আমায় বাস সারভিসে নিয়ে নিল।"

"আপনি তো ডায়েরিটা পড়েছেন ত্রিবেদীজি !"

"জরুর। বাংলা লেখা পড়তে পারি বাবুজি। মাগর, হ্যান্ড রাইটিং পড়তে অসুবিধা হয়। ঠোটে ঠোটে পড়েছি।"

"মানে, ধীরে-ধীরে, থেমে-থেমে ?"

"জি।"

"আপনি তো কিছু বুঝতে পারেননি ?"

"একদম না। আমার দেমাকে এল না।"

আনন্দ বলল, "আমাদেরও মাথায় আসছে না ত্রিবেদীজি ! বোকা বনে আছি। মন্দারগড় কোথায় আপনি জানেন ?"

মুকুলমনোহর মাথা নাড়লেন। বললেন, "না। আমার খেয়াল আসে না। মাগর বাত কী জানেন বাবুজি, ইধার বহুত গড় আছে। ভীমাগড়, কাচরিগড়, ফুলিয়াগড় ... দশ-বারো গড়। দু-চারটে গড় আমি জানি। বাকি জানি না।"

"মন্দারগড় কোথায় হতে পারে ?"

মাথা নাড়লেন ত্রিবেদীজি। তিনি জানেন না। পরে বললেন, খোঁজখবর করে যা জেনেছেন তাতে মনে হয় এখান থেকে পঁচিশ-তিরিশ মাইল দূরে বিহার বর্ডারের কাছে এরকম একটা গড় থাকতে পারে। লোকে বলে, মানিদাগড়। ওই গড় এখন জঙ্গল। জনবসতি বলে কিছু নেই ওখানে। পাহাড়ি জায়গা। বিরাট-বিরাট গাছপালা আর পাথর আর খানাখন্দে ভর্তি।

আমি বললাম, "ত্রিবেদীজি, আপনি লিখেছেন—ধর্মশালার এক পাঁড়ে এসে ডায়েরি-খাতাটা আপনাকে গচ্ছিত করে দেয়। সেই ধর্মশালাটা কোথায় ?"

ত্রিবেদী একটু ভেবে বললেন, "মালুম কাথগড়মে।"

"সেটা কোথায় ?"

"আট-দশ মাইল হবে।"

"এখান থেকে আট-দশ মাইল ? সেই পাঁড়েকে আপনি চেনেন ?"

"জি, না। দু-একবার দেখেছি। এই বাস জংশনে নেমে দুসরা বাসে দেশগাঁওতে যায়।"

"পাঁড়ের নাম ?"

"জানি না। পাঁড়েজি বলি।"

এবার চা এল। অ্যালুমিনিয়ামের গোল থালায় করে চা এনেছে ছেলিয়া। বড়-বড় দুই কাচের গ্লাস। চায়ের রং একেবারে সাদা। দুধ-চা যেন! একটা বাটিতে কয়েকটা বড় বড় লাড্ডু।

ত্রিবেদীজি আমাদের চা খেতে বললেন।

চায়ের তেষ্টা আমাদের খুবই পেয়েছিল। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে চা জল কিছুই খাওয়া হয়নি। ভীষণ ক্লান্ত আমরা। বৃষ্টিতেও ভিজেছি সামান্য।

চা খেতে-খেতে আমি বললাম, "ত্রিবেদীজি, এখানে রাত কাটাবার মতন কোনও জায়গা নেই ?"

উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। "জরুর আছে। আপলোক এই গরিবের বাড়িতে থাকবেন ?"

আনন্দ আর আমি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। "সে কী! আপনার অসুবিধে হবে।"

"না বাবুজি! কুছ অসুবিধা হবে না। আমি একলা থাকি, আর ওই ছেলিয়া। আপলোক মজাসে ইধার থাকতে পারেন।"

ভদ্রলোককে দেখলাম। বয়েস হয়তো পঞ্চাশের কাছাকাছি। ভাল স্বাস্থ্য। গায়ের রং ফরসা। মাথায় চুল কম। চোখমুখের ভাব মোলায়েম। পরনে ধুতি, গায়ে ফতুয়া ধরনের জামা।

আমরা চা খাচ্ছি, ত্রিবেদীজি হঠাৎ বললেন, "আপলোক কেন এসেছেন ?" বলে একটু থেমে নিজেই আবার বললেন, "আগর ওহি বাবুজিকে খুঁজতে এসেছেন—তো ভুল করেছেন। বাহারসে যদি উসলোক আসে—দেবযান সে তব

বিনা কামে আসে না। সে কি জিন্দা আর থাকে বাবুজি !"

আমরা কিছু বললাম না।

চার

সকালে বৃষ্টি ছিল না। রোদও উঠেছে। তবু তেমন তেজ নেই রোদ্দুরের। দেখে মনে হচ্ছিল, ভেজা আকাশ এখনও যেন ভাল করে শুকিয়ে যায়নি, রোদও তাই ভেজা-ভেজা।

আমি আর আনন্দ সকালে ঘুম থেকে উঠে ত্রিবেদীজির বাড়ির বাইরে পায়চারি করতে-করতে জায়গাটা দেখছিলাম। দেখে বুঝতে পারলাম, কাল সন্ধের গোড়ায় বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে এখানে নেমে কটোরাঘাট সম্পর্কে অস্পষ্ট যে ধারণা হয়েছিল তা ঠিক নয়। এই জায়গাটা একেবারে লোকালয়হীন নয়, একপ্রান্তে পড়ে থাকা নিছক জংলি গাঁ-গ্রামও নয়। বরং অনেকটা গঞ্জের মতন।

ত্রিবেদীজির বাড়ির গজ পঞ্চাশের মধ্যে বাস অফিস ছাড়াও একটা ডিপোর মতন আছে। বাস ডিপো। মাথায় টিনের শেড। দুটো বাসও দাঁড়িয়ে আছে। একটা টকটকে লাল রঙের, অন্যটা নীল আর সাদার ডোরা-কাটা। একটা বাসের ধোয়ামোছা চলছে। অন্যটার চাকা-খোলা। বোধ হয় টায়ার পালটানো হবে, বা অন্য কিছু গোলমাল হয়েছে বলে সারাই হবে। বাসের দু-একজন লোক দেখা যাচ্ছিল। পাজামা, গামছা, জামাটামা ঝুলছে একপাশে।

বাস ডিপোর খানিকটা তফাতে ছোট বাজার। দোকানপত্র দশ-পনেরোটা। আশেপাশে বাড়িও চোখে পড়ে। পাকা বাড়ি দুটো কি তিনটে। একতলা। বাকি সব খাপরা-ছাওয়া দেহাতি বাড়ি। লোকজন দেখা যায়।

আনন্দ বলল, "ছোট-ছোট রেল জংশনের মতন এটা একটা বাস জংশন। বুঝলি কৃপা। এদিকে বাস সার্ভিসই ভরসা। লম্বা-লম্বা রুট।"

আমারও তাই মনে হচ্ছিল।

গাছপালার মধ্যে সেগুন গাছ এ-দিকটায় বেশি। গতকালও সেটা নজরে এসেছিল। বাস ডিপোর কাছে অবশ্য সেগুন একটা কি দুটো চোখে পড়ল। বাকি নিম আর অশ্বত্থ। অন্য গাছও আছে। চিনতে পারলাম না। তবে আম-জাম আর না চেনে কে !

ছেলিয়া এসে আমাদের ডাকল। চা-পানি তৈরি।

বাইরের বারান্দায় একটা গোল বেতের টেবিল পেতে ছেলিয়া আমাদের চা দিয়েছে খেতে। চায়ের সঙ্গে দেহাতি নিমকি বিস্কিট। গোল-গোল দেখতে। একেবারে খয়েরি রং।

কাঠের চেয়ার আর টুলে বসে আমরা চা খেতে লাগলাম। মুকুলমনোহর ত্রিবেদী আমাদের সামনে বসে। তিনিও চা-পানি খাচ্ছিলেন। একটু ইতস্তত করে জানালেন, সামান্য পরে ছেলিয়া আমাদের জন্য পরোটা আর ভাজি বানিয়ে দেবে।

আমরা হেসে বললাম, অত ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। আমরা তো খেতে

আসিনি।

তারপর আবার সেই মন্দারগড়ের কথা উঠল।

ত্রিবেদীজি বললেন, "বাবুজি, আজকের দিনটা আমায় খবর নিতে দিন। সাচ বাত এই, ওহি বাঙালিবাবুর খাতা পড়ে আমি বুঝতে পারিনি। তব্‌ভি, থোড়া পাতা লাগিয়েছিলাম। কোই কুছ বলতে পারল না।"

"আপনি যে একটা গড়ের কথা বলছিলেন কাল!"

"মানিদাগড়!"

"হ্যাঁ, মানিদাগড়!"

"ঠিক-ঠিক পাতা মিলে যাবে, বাবুজি। বিহার বর্ডারের নাগিচ বলে শুনেছি।"

"আর সেই পাঁড়েজি!"

"কাথগড়মে। আট-দশ মাইল দূর।"

"আমরা সেখানে যেতে পারি না?"

"জরুর পারেন।"

"কীভাবে যাব ত্রিবেদীজি?"

ত্রিবেদীজি একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, "আমার বাস এই টাইমে কাথগড় যায় না। দো-তিন মাইল তফাতসে চলে যায়। আপলোগ আগর যেতে চান তো পায়দল যেতে হবে। বাস আপনাদের নামিয়ে দেবে। বাদ পায়দল।"

আমি আনন্দর দিকে তাকালাম। দু-তিন মাইল হাঁটা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। কলকাতার মতন শহুরে জায়গাতেও আমরা ট্রাম-বাসে ঝুলতে না পেরে কতদিন অফিসপাড়া থেকে বন্ধুবান্ধব মিলে পায়ে হেঁটে গল্প করতে-করতে বাড়ি ফিরি।

আনন্দ বলল, "ত্রিবেদীজি, কাথগড়ের ধর্মশালায় গিয়ে আমরা তো উঠতে পারি?"

ত্রিবেদীজি মাথা নাড়লেন। এমনভাবে নাড়লেন যে, উনি হ্যাঁ বা না বললেন বুঝতে পারলাম না।

পরে তিনি বললেন, "এই টাইমে পারবেন কী না আমি জানি না। ধরমশালা বন্‌ধ থাকতে পারে।"

"সে কী!"

"গরমে ধরমশালা খুলা থাকে। এপ্রিল-মে। আউর ডিসেম্বর মাহিনা থেকে দো-আড়াই মাস। সারা বছর তো খুলা থাকে না, বাবুজি।"

আমরা দু'জনেই কথাটার মানে বুঝলাম না। গরম আর শীতে খোলা থাকে— এ কেমন ধর্মশালা! ত্রিবেদীজির দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

ত্রিবেদীজি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। বললেন যে, ওদিকে গরমের সময় একটা মেলা বসে। মহাদেবজির মন্দির আছে পুরানা। দু-আড়াইশো বছরের। সেই মন্দিরে পুজো হয়। মেলাও বসে বড় মতন। তখন ধরমশালা খোলা থাকে। মাসখানেক ধরে মেলা চলে, তারপরও যাওয়া-আসা থাকে লোকের।

ধরমশালা খুলে রাখতে হয়। আর শীতে মাঘ মাসে ভবানীমায়ের পুজো হয় খানিকটা তফাতে। বিরাট মেলা বসে। সেও দেড়-দু' মাস ধরে চলে। তখন ধরমশালা খোলা থাকে। বাত এই যে বাবুজি, বিশ-পঁচিশটা গাঁ, আশপাশ থেকে লোকজন মন্দিরে পুজো দিতে যায়, মেলায় যায়। কেনাকাটা করে। সাওদা হয়। রোজগার হয় পেটের। এদিককার গাঁ-গ্রামের এই নিয়ম। ওই সময়ে আমরা বাসও ওদিককার পথ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাই। তখন আপনি টাঙা পাবেন, ভ্যান পাবেন। বয়েল গাড়িও পাবেন। এখন কিছু পাবেন না।

ত্রিবেদীজির কথায় আমরা খানিকটা হতাশ হয়ে পড়লাম। ধর্মশালায় পৌঁছনো আমাদের কাছে খুবই জরুরি ব্যাপার। ওই ধর্মশালাতেই বড়দার ডায়েরি পাওয়া গিয়েছে। বড়দা নিশ্চয় ওখানে গিয়েছিল। হয়তো ছিল কিছুদিন। ধর্মশালার পাঁড়েজি নিশ্চয় বড়দাকে দেখেছে। সেই একমাত্র লোক, যে কিছু বলতে পারে।

কিন্তু ধর্মশালা যদি বন্ধ থাকে, পাঁড়েজি না থাকে— তবে আমরা কিছুই তো জানতে পারব না! আর এতদূর এসে কলকাতায় ফিরে যাব, আবার শীতকালে আসব, তাই কি সম্ভব!

আনন্দ বলল, "ত্রিবেদীজি, আপনি কি ঠিক-ঠিক জানেন, পাঁড়েজি এখন নেই?"

ত্রিবেদীজি বললেন, "ধরমশালা বন্‌ধ থাকলে পাঁড়েজি থাকে না। নিজের দেশগাঁয়ে চলে যায়।"

"একটু খোঁজ করা যায় না?"

ত্রিবেদীজি ভেবেচিন্তে বললেন, "যায়।"

"কেমন করে?"

"বাস সার্ভিসের লোকদের—"

ত্রিবেদীজির কথা শেষ হওয়ার আগেই বাধা দিয়ে আমি বললাম, "আমরাই তো যেতে পারি ত্রিবেদীজি! আপনি যদি বাসের ব্যবস্থা করে দেন, আমরা জায়গা মতন নেমে হেঁটে গিয়ে খোঁজ করে আসতে পারি।"

ত্রিবেদীজি মাথা নাড়লেন। বললেন, সেটা মন্দ কথা নয়। যাওয়ার সময় একটা বাস আমাদের নামিয়ে দিয়ে যাবে জায়গা মতন; আবার বিকেলে যে-বাস আসবে— আমাদের তুলে নেবে। ত্রিবেদীজি বাসঅলাদের বলে ব্যবস্থা করে রাখবেন। তবে সে তো আর আজকে হবে না। আগামীকাল হতে পারে।

আমরা তা হলে আজ কী করব? বসে থাকব চুপচাপ! সময় নষ্ট করব!

ত্রিবেদীজি পরামর্শ দিলেন, আজ আমরা না হয় বিশ্রাম নিলাম। বেশি ধকল নিয়ে দরকার কী! তা ছাড়া, বৃষ্টি আজ থামলেও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না আবার বৃষ্টি আসবে কি না! যদি বৃষ্টি হয় তবে আমাদের পক্ষে অচেনা, অজানা জায়গায় গাছপালা-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ খুঁজে ধর্মশালায় পৌঁছনো সম্ভব নাও হতে পারে! আবার অন্য বিপদও আছে। হয়তো পৌঁছলাম, কিন্তু সময় মতন বাসের জায়গায় ফিরে আসতে পারলাম না। বাস তো বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবে না।

তখন আমরা কী করব ? কোথায় থাকব বনজঙ্গলের মধ্যে ? রাত কাটাব কেমন করে ?

"নেহি বাবুজি ! বুঝেসুঝে কাম করা ভাল। আজ আমি দো-চারজনকে ডাকি ; বাতচিত বলি। আপলোগ কাল যান।"

আমি বললাম, "আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমাদের হাতে সময় কম ত্রিবেদীজি ! অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি। তাড়াতাড়ি করতে পারলেই ভাল।"

"হড়বড়িয়ে কাম হয় না। ...আপলোগ এক কাম করুন।"

"কী ?"

"আমার বাস অফিসে আসুন। অফিসে আমার ম্যাপ আছে। রুট ম্যাপ। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাপ। ওহি ম্যাপ দেখুন। আইডিয়া হবে। আন্ধার মতন ঘুরে কুছ হবে না।"

আনন্দ আমার দিকে তাকাল। বলল, "কথাটা মন্দ নয়, কৃপা। আমরা তো এখানকার কিছুই জানি না। একটা আইডিয়া করতে পারলে ভাল হত।"

"তবে তাই হোক। উপায় কী !"

খানিকটা বেলায় আমরা বাস অফিসে গেলাম।

একটা জিনিস ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি। এদিককার সব কিছুই নির্ভর করে বাস আর লরির ওপর। মানুষজন তারই মুখ চেয়ে বসে থাকে। বাসই যেন প্রধান। লোকজনের আসা-যাওয়া ছাড়াও বাসের মাথায় চেপে জিনিসপত্র টুকরি গাঁঠরি আসে। যেখানে নামার, নামে। লরিতেও বিশাল-বিশাল বস্তা আর ঝুড়ি চাপানো। ব্যবসায়ীদের মালপত্র : ডালের বস্তা, আলু-পেঁয়াজের বস্তা, আরও পাঁচরকম জিনিসের চালান চলে।

ম্যাপ জিনিসটা আমার তেমন মগজে ঢোকে না। আনন্দর অভ্যেস আছে ম্যাপ দেখার।

ম্যাপ দেখতে-দেখতে আনন্দ বলল, "ত্রিবেদীজি, এদিকে দেখছি অনেক গড়।"

ত্রিবেদীজি কাজ করতে-করতে বললেন, "জি !"

আনন্দ আমায় আঙুল দিয়ে কতকগুলো জায়গা দেখাল। "এই দেখ।"

দেখলাম জায়গাগুলো। সারনগড়, নয়ানগড়, জগদীশগড়— এইরকম সব নাম। পাহাড়ি জায়গা, নদীও কম নয়, তবে ম্যাপের ছবিতে নদীগুলোকে বড়সড় মনে হল না। পাহাড়ি নদী। বোধ হয় ছোট-ছোট নদীই হবে।

ত্রিবেদীজি বললেন, "গড় এখানে বহুত পাবেন। ম্যাপে আর ক'টার নাম আছে, বাবুজি !"

"এত গড় কেন ?"

"পুরানা গড়। দো-তিনশো বছরের পুরানা। টুটেমুটে মিট্টি হয়ে গেছে,

জাংগল হয়ে গেছে। তখন ছোটা-ছোটা রাজা ছিল, জায়গিরদার ছিল। লড়াই হত হরবখত। মোগল, মারাঠি ইধার-উধার থেকে ঢুকে পড়ত। গড় না হলে সেফ্‌টি ছিল না।"

আনন্দ ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ বলল, "ত্রিবেদীজি, আমার মনে হয়, এই যে একটা গড়ের রেঞ্জ দেখছি— এখানেই কোথাও মন্দারগড় আছে। ম্যাপে নাম না থাক— আমার অনুমান, আমরা এই পাহাড় আর নদীর কাছে কোথাও মন্দারগড় পেয়ে যাব।"

ত্রিবেদীজি মুখ তুললেন। তাকালেন। হঠাৎ বললেন, "পেয়ে যান তো আচ্ছি বাত। আপলোগ মোটরবাইক চালাতে জানেন ?"

আনন্দ জানত। কিন্তু আজকাল সে বাইক চালায় না পায়ে জখমের জন্য।

আমি সে-কথা বললাম ত্রিবেদীজিকে।

ত্রিবেদীজি বললেন, মোটরবাইক চালাতে পারলে তিনি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন ঘোরাফেরার জন্য। অন্য কোনও উপায় তিনি দেখছেন না। যাই হোক, আজকের দিনটা খোঁজখবর করা যাক— কাল আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

পাঁচ

পরের দিন ত্রিবেদীজি আমাদের বাসে উঠিয়ে দিলেন। তখন সকাল আট, সওয়া আট। ওঁর কী মনে হয়েছিল কে জানে, বাসের মাথায় দুটো সাইকেলও চাপিয়ে দিয়ে বললেন, বাস থেকে নেমে আমরা যেন সাইকেল করে কাথগড়ের দিকে যাই। পায়ে হাঁটার চেয়ে সাইকেলে যাওয়াই সুবিধের হবে। ফেরার সময় দেরি হয়ে গেলেও সাইকেল থাকলে সময়মতন বাস ধরার জায়গায় পৌঁছতে পারব।

"বাবুজি, টাইম খেয়াল রাখবেন। চার সোয়া চার। বাস পাঁচ-দশ মিনিট খাড়া থাকবে আপলোগকো উঠাবার জন্যে। দেরি হলে বাস আর খাড়া থাকবে না। আগর বাস ছুটে যায় তো আপলোগ আর ফিরতে পারবেন না।"

আমরা মাথা হেলিয়ে বললাম, বুঝেছি। ফিরতে না পারলে বিপদ। রাত কাটাবার জায়গা পাব না। বনে-জঙ্গলে গাছতলায় পড়ে থাকতে হবে। বাঘ-সিংহ না থাক, বুনো শেয়াল-কুকুর, সাপখোপ তো থাকবেই। বিশেষ করে সাপ। এখনও এদিকে বর্ষা ফুরোয়নি। সাপখোপের দল মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়তো।

বাস ছেড়ে দিল।

আজ আর বাদলার কোনও চিহ্ন নেই। আকাশ পরিষ্কার। টুকরো টুকরো সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে ; শরৎকালের মেঘ যেমন হয় সেইরকমই। তবে আমাদের বাংলাদেশের শরৎ এখানে কোথায় দেখতে পাব ! এ যে একেবারে পাহাড়ি জায়গা, গাছপালার দেশ। গাছগুলোও কী বিরাট, যেন কতকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে মাথা

ছড়িয়ে। পাথুরে পথ। বাসরাস্তা অবশ্য পিচের। গর্তটর্ত বেশি নেই মনে হয়—কেননা ঝাঁকুনি লাগছিল না।

সকালে স্নান সেরে, রুটি, ভাজি, দুধ-চা খেয়ে আমরা বেরিয়েছি। দুপুরের আগে খিদে পাওয়ার কথা নয়। ত্রিবেদীজি দুপুরের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। টিফিন কেরিয়ারের বাটিতে পরোটা আর আলুর তরকারি। পুদিনার চাটনিও খানিকটা। শালপাতায় মোড়া কয়েকটা লাড্ডু। জলের ফ্লাস্ক তো আমাদের আছেই।

আনন্দর কথামতন আমরা খানিকটা সেজেগুজেই বেরিয়েছি। মানে, বর্ষাতি নিতে ভুলিনি ; কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে টুকিটাকি অনেক কিছুই আছে : টর্চ, ছুরি, ব্যাণ্ডেজ, তুলো, একটা মামুলি বায়নাকুলার, ক্যামেরা। ক্যামেরাটা আনন্দর। সে ভাল ফোটো তুলতে পারে। আমাদের সাজগোজও টুরিস্টদের মতন। জিন্‌সের প্যান্ট, গায়ে জ্যাকেট। পায়ে ক্যাম্বিসের বুটজুতো।

বাসের যাত্রীরা আমাদের দেখছিল। ওদের মধ্যে বেশিরভাগই সাধারণ মানুষ, দেহাতি ধরনের। পাঁচ-সাতজন বোধ হয় আধা-শহুরে। তাদের চোখমুখ, বেশবাস, মুখ ভরতি পান-জরদা আর কথাবার্তা থেকে তাই মনে হয়।

আমরা দুটি বাঙালি ছোকরা হাল ফ্যাশানের সাজগোজ করে কোথায় চলেছি জানার জন্য তাদের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক।

মুশকিল হল, ওদের চলতি হিন্দি আর মুখের বুলি আমরা সব বুঝতে পারছিলাম না। নিজেদের কথাও বোঝাতে পারছিলাম না। তবু কথাবার্তা হচ্ছিল মাঝে-মাঝেই।

এক ভদ্রলোক, ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিলেন নিজের, নাম বললেন, শিবলাল, বেশ আলাপী।

তাঁর সঙ্গে কথায়-কথায় জানতে পারলাম, মন্দারগড় বলে কোনও জায়গা এদিকে নেই। তিনি অন্তত জানেন না। কাথগড় অবশ্য আছে। আছে আরও অনেক গড়। তবে নামেই গড়, পুরনো গড়ের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। দু-একটা গড় ভাঙাচোরা অবস্থায় এখনও পড়ে আছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে মানুষজন থাকে না।

ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, আমরা কোথায় যাচ্ছি ? কী-বা উদ্দেশ্য আমাদের।

আনন্দ চালাক ছেলে। চটপট বলল, "আমরা কলকাতায় একটা সার্ভে অফিসে কাজ করি। অফিসের কাজে যাচ্ছি। কিছু খোঁজখবর নিয়ে ফিরে যাব।"

শিবলালজি বিশ্বাস করে নিলেন কথাটা। বললেন, পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে এদিকে একবার ভূমিকম্প হয়। সেই ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি তেমন বেশি না হলেও একটা জায়গা একেবারে ধসে পাতালে চলে গিয়েছিল। প্রায় সিকি মাইল মতন হবে সেই পাহাড়ি জায়গাটা। লোকে বলাবলি করত, কামান দাগার মতন ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা গিয়েছিল গোটা একটা দিন ওই জায়গাটা থেকে।"

আমরা কথাটা শুনলাম ; তেমন কান করলাম না। কবে পঁচিশ-ত্রিশ বছর

আগে এদিকে ভূমিকম্প হয়েছিল সে-গল্প শুনে লাভ কীসের!

একটা জায়গায় এসে বাস থামল।

আমাদের দু'জনকে নামতে হবে। এখানে নেমেই যেতে হবে কাথগড়ে। বাসের দুই কণ্ডাক্টর, একজন প্রায় ভীমের মতন মোটাসোটা, অন্যজন রোগা পাতলা—আমাদের সাইকেল নামিয়ে দিল বাসের মাথা থেকে।

সাইকেল নামিয়ে দিয়ে মোটা বলল, চারটের মধ্যে যেন ফিরে এসে এখানে দাঁড়াই।

বাস চলে গেল।

সে-জায়গাটায় আমরা নামলাম তার কাছাকাছি কোনও লোকবসতি নেই। দেখতে তো পেলাম না। তবে রাস্তার পাশে একটা ছাউনি মতন আছে। কয়েকটা কাঠের খুঁটি, মাথার ওপর পাতার ছাউনি। রোদে-জলে পাতাগুলো পচে গিয়েছে। ওরই হাত কয়েক তফাতে একটা পাথর, মাটির মধ্যে পোঁতা। পাথরের গায়ে আলকাতরা দিয়ে একটা চিহ্ন আঁকা। বোঝা গেল, কাথগড়ে যাওয়ার নিশানা এটা।

আনন্দ ঘড়ি দেখল। বলল, "ন'টা বাজল। তোর ঘড়ির সঙ্গে একবার মিলিয়ে নে। টাইমের গোলমাল হয়ে গেলে চারটের মধ্যে ফিরতে পারব না।"

আমি আমার হাত-ঘড়ি দেখলাম। সময় ঠিকই আছে।

"নে, তা হলে সাইকেলে উঠে পড়।"

"আগে খানিকটা হাঁটা যাক। পা ছাড়িয়ে নিই। পরে সাইকেলে উঠব।"

"বেশ, চল।"

আমরা সাইকেল ঠেলতে-ঠেলতে হাঁটতে লাগলাম।

কাথগড়ের রাস্তা পাকা নয়। তবে এদিককার মাটি শক্ত, রুক্ষ আর পাথুরে বলে কাঁচা রাস্তাও পাকার মতন মনে হয়। ত্রিবেদীজি বলেছেন, মেলার সময় বাস, ট্রেকার, বয়েলগাড়ি, মায় জিপ পর্যন্ত এই রাস্তা ধরে কাথগড় পর্যন্ত যায়। যায় যে, বুঝতে আমাদের কষ্ট হল না। খুব চওড়া না হলেও গাড়ি যাওয়ার মতন চওড়া তো বটেই রাস্তাটা।

গাছ আর গাছ, দু' পাশে শুধু গাছ। মাঝে-মাঝে ফাঁকা। আশেপাশে তাকালে উঁচু-নিচু পাথরছড়ানো মাঠ চোখে পড়ে। মাঠের মধ্যে ঝোপ। এখানে শালগাছও চোখে পড়েছিল। মহানিম আর কাঁঠালগাছও। বাকি গাছটাছ চিনতে পারছিলাম না। পাখিও ডাকছিল। রোদ চড়ে উঠল ক্রমশ।

আরও একটু এগিয়ে আমরা সাইকেলে উঠলাম।

আনন্দর একটা হাঁটুতে চোট ছিল, আগেই বলেছি। তাতে অবশ্য তার সাইকেল চালাতে অসুবিধে হচ্ছিল না।

যেতে-যেতে আনন্দ বলল, "কৃপা, ধর্মশালাটা যদি খোলা পাই, দারুণ হবে!"

আমি বললাম, "যদি পাই—! পাওয়ার তো আশা নেই।"

"বাই চান্স যদি পেয়ে যাই।"

"পেলে ভাল।"

"পাঁড়েজিকে পেয়ে যাব।"

"ত্রিবেদীজি তো বললেন, পাঁড়েজি এ-সময় থাকে না। ধর্মশালাও বন্ধ থাকে।"

আনন্দ মজা করে বলল, "পাইলেও পাইতে পারি পাঁড়েজি রতন। লাক্‌! কৃপা, জাস্ট লাক্‌।"

রাস্তার বেশিরভাগটাই চড়াই। সাইকেল নিয়ে চড়াই উঠতে খানিকটা কষ্টই হচ্ছিল। অভ্যেস তো নেই। তার ওপর আশপাশ দেখতে-দেখতে এগোচ্ছিলাম। সময় নষ্ট হচ্ছিল। তা হোক। সারা দুপুর পড়ে রয়েছে, কত আর সময় নষ্ট হবে! আনন্দ দু-চারটে ফোটো তুলল।

একটা জিনিস লক্ষ করলাম। জায়গাটা যদিও পাহাড়তলি, গাছপালায় ভরতি, মাঝে-মাঝে ফাঁকা জমি, মাঠ, তবু ওরই মধ্যে কোথাও-কোথাও এমন এক-একটা গভীর ঝোপজঙ্গল চোখে পড়ে যে, মনে হয়—ওই ঝোপের মধ্যে আলোও ঢোকে না। অন্ধকার ছাড়া সেখানে কিছু নেই।

শেষপর্যন্ত ধর্মশালাটা পাওয়া গেল।

কাছে গিয়ে সাইকেল থেকে নামলাম। ঘড়িতে তখন এগারোটা বাজে। রোদ খুব চড়া। জঙ্গলের বাতাসও দিচ্ছিল।

ধর্মশালার বাড়িটা দেখতে কালো। পাথরের বাড়ি। মাথার ওপর টিনের ছাদ। চারপাশে ভাঙাচোরা পাঁচিল। সদরের মুখেই কুয়া। সদর খোলা ছিল। পাঁচিলের গায়ে বুনো গাছ, আতা ঝোপ, করবীফুলের ঝাড়।

সদর খোলা দেখে আনন্দ অবাক হয়ে বলল, "কৃপা, দেখছিস! সদর দরজা খোলা।"

আমরা সাইকেল দুটো সদরের পাশে দাঁড় করিয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম। পাথর-বিছানো চাতাল। তিনদিক ঘিরে ছোট-ছোট কয়েকটা ঘর। ঘরের গা-লাগানো বারান্দা। সরু।

আনন্দ হাঁক দিল, "কোই হ্যায় জি?"

বার-দুই হাঁক দেওয়ার পর কে একজন গুহার মতন এক ঘর থেকে বেরিয়ে এল। খালি গা, পরনে খাটো আধময়লা ধুতি, মোটা এক পইতে ঝুলছে গলায়।

লোকটা কাছে এসে আমাদের দেখল। রীতিমতন অবাক হয়েছে।

আনন্দ বলল, "আপহি মালুম পাঁড়েজি!"

লোকটা ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, সে পাঁড়েজি!

আমরাও কি কম অবাক! পাঁড়েজির তো এ-সময় থাকার কথা নয়। ধর্মশালা বন্ধ। তবু সে কোথা থেকে হাজির হল!

আনন্দ আলাপী ছেলে। চট করে লোকের মন ভোলাতে পারে। হাসি-হাসি

মুখ করে বলল, "আমরা ত্রিবেদীজির কাছ থেকে আসছি। ত্রিবেদী বলেছিলেন, ধর্মশালা এখন বন্ধ থাকে, পাঁড়েজিকে বোধ হয় পাব না। তা আমাদের ভাগ্য ভাল, পাঁড়েজিকে পেয়ে গেলাম।"

পাঁড়েজি বলল, ত্রিবেদীজি ঠিকই বলেছেন, এ-সময় সে থাকে না। তবে আজ দু-তিনদিন হল পাঁড়েজি এখানে এসেছে। সঙ্গে এক সাথী। নাম লালা। এই ধরমশালাতেই কাজ করে। ধরমশালার মালিক তাকে পাঠিয়েছে। থোড়া বহুত কাম আছে এখানে। সারাইওরাই হবে। দু-একদিনের মধ্যে মিস্ত্রি মজুর আসবে মালিকের কাছ থেকে, মালপত্র আসবে লরি করে। বিশ-বাইশ দিন কাম হবে এখানে। পাঁড়েজিকে আসতেই হল।

আনন্দ হাসিমুখে বলল, "ত্রিবেদীজি তো জানতে পারলেন না ? পাঁড়েজির সঙ্গে দেখা হয়নি ?"

দেখা হওয়ার কথা নয়। পাঁড়েজি তো কটোরাঘাট হয়ে আসেনি এবার। উলটো পথে এসেছে, মাধোপুর দিয়ে।

"আপলোগ কোন মুলুক থেকে এসেছেন, বাবু ? বাংলা ?"

"বাংলা।"

"মন্দির দেখতে এসেছেন ?"

"না।"

"তব্ ?"

আমি বললাম, "জরুরি কামে এসেছি, পাঁড়েজি। আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। ত্রিবেদীজি আমাদের পাঠিয়েছেন। একটা খাতা আপনি ত্রিবেদীজিকে দিয়েছিলেন। খাতাটা আমার বড়দাদার। আমি..."

পাঁড়েজি কী বুঝল কে জানে ! মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে। পরে বাতচিত হবে।" এখন পাঁড়েজি স্নানে যাচ্ছে। আমরা আপাতত খানিকটা জিরিয়ে নিই।

পাঁড়েজি একটা দড়ির খাটিয়া বার করে আনল কোথা থেকে। ছায়ায় রাখল। বসতে বলল। লালাকে দেখতে পেলাম না। তবে একটা নেকড়ে বাঘের মতন কুকুরকে দেখতে পেলাম। ধর্মশালার পোষা কুকুর হয়তো।

একপক্ষে ভালই হল। আমরা সামান্য ক্লান্ত বোধ করছিলাম। খানিকটা জিরিয়ে নেওয়াই ভাল।

আনন্দ তার ঝোলা থেকে টিফিন কেরিয়ারের বাটি, শালপাতায় মোড়া খাবারদাবার বার করল।

"নে, খেয়ে নে। আগে জল দে। ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে।"

জলের ফ্ল্যাস্ক বার করলাম আমি।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে বাইরে গেলাম।

কুয়াতলায় দড়ি-বালতি পড়ে ছিল। জল তুলে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। চমৎকার জল।

আনন্দ সিগারেটের প্যাকেট বার করল।
আমরা আবার ভেতরে এসে দড়ির খাটিয়ায় বসলাম।

পাঁড়েজি এল ঘণ্টাখানেক পরে। স্নান-খাওয়া সেরে এসেছে।
খাতার কথাটাই তুললাম প্রথমে। কেমন করে খাতাটা আমার কাছে গেল, আর কেনই-বা আমরা এখানে এসেছি, বললাম পাঁড়েজিকে।
সব শুনে পাঁড়েজি বলল, "এই ধর্মশালায় এক বাঙালিবাবু কিছুদিন ছিলেন। দেড়-দু' হপ্তা। তারপর একদিন উধাও হয়ে যান, আর ফেরেননি।"
"কতদিন আগে তিনি ছিলেন এখানে ?"
"পিছলা সালমে।"
"কেমন দেখতে ছিলেন ?"
পাঁড়েজি বর্ণনা দিল বাঙালিবাবুর।
বড়দার চেহারার সঙ্গে মিলে গেল বর্ণনা। দাড়িগোঁফ রেখেছিল বড়দা—সেটা অনুমান করা যায়।
আনন্দ বলল, "পাঁড়েজি, বাঙালিবাবু কিছু বলতেন ? মন্দারগড় বলে কোনও জায়গার কথা ?"
পাঁড়েজি কী যেন ভাবল, তারপর বলল, "জি ! আপনা খেয়ালে বলতেন। বাবু বলতেন, আট-দশ মাইল দূর মে একটা আজব জায়গা আছে। আমরা বাবু জানি কোই গড়ওড় নেহি উধার। মাগর, বহুত ভারী জঙ্গল আছে। এক তালাও ভি আছে।"
আনন্দ বলল, "জায়গাটার নাম কি মন্দারগড় !"
"মাহিনদাগড়। আমি উধার যাইনি বাবু। কোই যায় না।"
"কেন ?"
"বহুত খারাপ জায়গা। যো যায় ও আর ফেরে না।"

ছয়

পাঁড়েজি মানুষটি সাদামাঠা। গিরিলাল ধর্মশালার দেখাশোনা করছে বছর পাঁচেক। তার আগে নিজের দেশ-গাঁয়ে থাকত। ছোটখাটো ক্ষেতির কাজকর্ম দেখত, আর মাঝেসাঝে বদ্রীবাবু বলে এক ভদ্রলোকের দলের সঙ্গে তীর্থ করে বেড়াত। এখানের ধর্মশালায় তার কাজকর্ম বেশি নয়, তবে বছরে যে দু'বার লোকজন আসে—তার সামান্য আগে থেকে পাঁড়েজিকে আসতে হয়। ধর্মশালা ফাঁকা হওয়ার পরও থাকতে হয় আট-দশদিন। লালা তার বরাবরের সঙ্গী। কাছাকাছি গ্রামের মানুষ তারা।
পাঁড়েজি যা বলল তার থেকে মনে হল, এক বাঙালিবাবু এখানে এসেছিলেন। এবং ছিলেন কিছুদিন। ধর্মশালা তখন প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। পাঁড়েজিও ফিরে

যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। ওই সময়ে একদিন বাঙালিবাবু কোথায় যে বেরিয়ে যান, আর ফিরে আসেননি। পাঁড়েজি দিন-দুই অপেক্ষা করেছে বাবুর জন্য। লালাকে সঙ্গে করে কাছেপিঠে খোঁজখবরও করেছে। বাঙালিবাবুর কোনও খোঁজ পায়নি।

এখানে কাছাকাছি কোনও পুলিশ চৌকি নেই, কোতোয়ালিও নেই যে, ঘটনাটা জানিয়ে যাবে। পাঁড়েজি কিছুই জানাতে পারেনি। তবে বাঙালিবাবুর ঘরে খাটিয়ার পাশে একটা খাতা পড়ে ছিল। পাঁড়েজি সেটি তুলে রেখে দেয়। অনেক পরে একসময় ত্রিবেদীজিকে দিয়ে আসে। খাতাটা বাবুজির, কিন্তু তাতে কী লেখা আছে সে জানে না। মামুলি হিন্দি পড়াশোনা আর হিসাব রাখার কাজ ছাড়া পাঁড়েজি আর কিছু করতে পারে না।

আনন্দ বলল, "বাবু কোথায় ঘুরতে যেতেন কিছু বলেননি ?"

"না।"

"যেদিন চলে যান—আর ফিরে এলেন না—সেদিন কিছু বলে যাননি ?"

"কুছ না।"

"সঙ্গে কিছু ছিল ?"

পাঁড়েজি মনে করল, বলল, "একটা লাঠি ছিল হাতে, আর জলের বোতল।"

কথাবার্তা আর বেশি কিছু হল না। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের ফিরতে হবে। ফেরার আগে আশপাশে চোখ বুলিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে। তবে যাই করি, ঘড়ি ধরে করতে হবে—নয়তো বাস ধরার জন্য জায়গামতন পৌঁছতে পারব না।

আনন্দ বলল, "চল, আজ উঠি। একটা কাজ তো হল।"

আমি বললাম, "দাঁড়া। একটু কথা বলে নিই পাঁড়েজির সঙ্গে।.... আমরা যদি এখানে এসে এই ধর্মশালায় উঠি, থাকি দু-চারদিন—, এখান থেকে মানিদারগড় মন্দারগড় যাই হোক—তার একটা খোঁজ করতে পারব। কী বলিস তুই ?"

আনন্দ বলল, "বলার কী আছে ! এখানেই থাকতে হবে।"

"পাঁড়েজিকে জিজ্ঞেস করে নিই।"

পাঁড়েজিকে কথাটা বলতেই সে রাজি হয়ে গেল। ধর্মশালা তো ফাঁকাই পড়ে আছে। মিস্ত্রিমজুর এলে কাজকর্ম শুরু হবে। আমরা যদি থাকতে চাই অনায়াসে থাকতে পারি।

আর দেরি করার কারণ ছিল না। আমরা আবার সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কাছাকাছি ঘোরাফেরা করার সময় মনে হল না, ঠিক এই জায়গাটায় অঘটন ঘটার কোনও কারণ থাকতে পারে। পাহাড়ি জায়গা ঠিকই—তবে মোটামুটি সমতল। ঘন জঙ্গলও কাছাকাছি দেখা যায় না। দূরে অবশ্য পাহাড়ের ঢল চোখে পড়ে, এখন রোদে কেমন কালচে হয়ে আছে পাহাড়ের মাথা।

আনন্দ বলল, "কৃপা, এত শান্ত সুন্দর জায়গা—কে বলবে এরই কোথাও মানুষ হারিয়ে যেতে পারে।"

আমি মাথা নেড়ে ওর কথায় সায় জানালাম।
আরও একটু পরে আমরা ফিরতে লাগলাম বাস ধরার জন্য।

সন্ধেবেলায় ত্রিবেদীজির সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছিল।
আমরা সময়মতন বাস ধরে কটোরাঘাট ফিরে আসায় ত্রিবেদীজি যেন অনেকটা হালকা হয়ে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক সামান্যতেই দুশ্চিন্তা করেন বেশি। তাঁর হয়তো ভয় ছিল, আমরা দুই কলকাতার ছেলে-ছোকরা ধর্মশালা খুঁজতে গিয়ে বনে-জঙ্গলে হারিয়ে না যাই! কিংবা একটা ঝঞ্ঝাট না বাধিয়ে বসি। সেসব কিছু হল না; আমরা সময়মতন বাস ধরে ফিরতে পেরেছি—এতেই তিনি খুশি।
পাঁড়েজির দেখা আমরা পেয়েছি শুনে ত্রিবেদীজি বললেন, "আপনাদের লাক ভাল, বাবুজি! গুড লাক।"
পাঁড়েজির সঙ্গে কেমন করে দেখা হয়ে গেল, কেন যে সে এখন ধর্মশালায় এসেছে, একজন লোকও রয়েছে সঙ্গে, দু-একদিনের মধ্যেই মিস্ত্রিমজুর, মালপত্র এসে যাবে ধর্মশালার সারাইয়ের কাজে—সব বৃত্তান্তই দিলাম ত্রিবেদীজিকে।
ত্রিবেদীজি শুনলেন।
বড়দা যে ওই ধর্মশালায় ছিল তাও ঠিক। পাঁড়েজির বর্ণনার সঙ্গে বড়দার চেহারার বর্ণনা মিলে যায়। সেদিক থেকে আর কোনও সন্দেহের কারণ নেই।
কিন্তু, মুশকিল হল, বড়দা যে কেন একদিন ধর্মশালা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, পাঁড়েজি জানে না।
ত্রিবেদীজি কী ভেবে বললেন, "সে তো সালভরের বেশি হল?"
"হ্যাঁ, তা হয়েছে। হিসেবের আন্দাজ ধরলে তাই হয়!"
"তো এখন ওহি বাবুকে কোথায় খুঁজে পাবেন?"
খুঁজে পাওয়ার আশা আমরাও করছিলাম না। তবু বললাম, "খুঁজে না পাই—কী হয়েছে জানতে পারলে স্বস্তি পাই, ত্রিবেদীজি।"
আনন্দ বলল, "ত্রিবেদীজি, জায়গাটা যা দেখলাম আর শুনলাম তাতে যদি এমন হয় যে কোনও বুনো পশুর হাতে দাদার প্রাণ গিয়েছে জানতে পারি—তবু বুঝব তাঁর অদৃশ্য হওয়ার কারণ আছে। কিন্তু ওই জ্যোৎস্নার কথা আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। তা ছাড়া এটাও তো অদ্ভুত ব্যাপার যে, জ্যোৎস্নাই শুধু নয়—একটা নৌকো ধরনের জিনিস ওই জ্যোৎস্নার মধ্যে মাঝে-মাঝে বাতাসে শূন্যে ভেসে বেড়ায়। এটা কেমন করে সম্ভব!"
ত্রিবেদীজি কিছুই বললেন না।
আমি বললাম, "ত্রিবেদীজি, আমরা ওই ধর্মশালায় গিয়ে দিন কয়েক থাকব। পাঁড়েজির সঙ্গে কথাবার্তা বলে এসেছি।"
ত্রিবেদীজি বললেন, "যাবেন। জরুর যাবেন।" বলে তিনি যেন একটু ঠাট্টার গলায় বললেন, "ধরমশালায় আউর কুছ মিলবে বাবুজি?"
"ধর্মশালা থেকে আমরা মানিদাগড় যাব।"

"আউর ?"

"আশপাশের ভাঙা গড় দেখব। খুঁজব।"

"ঠিক। মাগর ক্যায়সে দেখবেন, টুঁড়বেন ? পায়দল ! পঁচিশ-তিরিশ মাইল পাহাড়ি জায়গা আপলোগ পায়দল টুঁড়ে বেড়াবেন !

আনন্দ বলল, "উপায় কী !"

ত্রিবেদীজি যেন আমাদের ছেলেমানুষি দেখে অখুশি হয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন। পরে বললেন, "ঠিক-ঠিক পাতা লাগাতে চান তো বুঝসুঝ কাম করতে হবে।"

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু অন্য কোনও উপায় যখন নেই তখন পায়ে হেঁটে বা ত্রিবেদীজির দেওয়া সাইকেল নিয়ে ঘোরাফেরা করা ছাড়া আমরা আর কী করতে পারি !

আনন্দ আর আমি ভাবনা-চিন্তা কম করিনি। আমাদের মনে হয়েছে, পাঁড়েজির গিরিলাল ধর্মশালা থেকে জায়গাটা খুব বেশি দূরে হওয়ার কথা নয়। কেন না, বড়দা যদি মন্দারগড় বলে কোনও জায়গার খোঁজে গিয়ে থাকে—তা হলে সে কাছাকাছি আস্তানা বলতে তো ওই ধর্মশালাই বেছে নিয়েছিল। সেখান থেকেই খোঁজখবর করত। মন্দারগড় বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে হলে বড়দা নিশ্চয় অতটা পথ পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াত না। সেটা সম্ভব নয়। কাজেই মন্দারগড় বলে যদি কোনও জায়গা থেকে থাকে তবে সেটা ধর্মশালা থেকে অনেক দূরে হওয়ার কথা নয়।

কথাটা ত্রিবেদীজিকে আমরা বললাম।

তিনি বললেন, "ধর্মশালার দু-এক মাইলের মধ্যে এমন অদ্ভুত কোনও জায়গা থাকলে সেটা এখানকার লোকের কানে আসত। ধর্মশালার পাঁড়েজি জানত।"

আমি বললাম, "পাঁড়েজি বলেছে মাহিনদাগড় বলে একটা জায়গা আছে ওদিকে। আট-দশ মাইল তফাতে। জায়গাটায় কেউ যায় না। সেখানে ঘন জঙ্গল আর একটা তালাও আছে। অভিশপ্ত জায়গা। কেউ গেলে আর ফিরে আসে না।"

ত্রিবেদীজি বোধ হয় অন্য কথা ভাবছিলেন। অন্যমনস্কভাবে বললেন, "আপলোগ কো এক গাড়ি চাই। জিপ। জিপ চালাতে জানেন ?"

আমি মাথা নাড়লাম, জানি না। আনন্দ মোটরবাইক চালাতে জানত, আজকাল আর চালায় না। জিপগাড়ি সে চালাতে জানে কি না আমি জানি না।

আনন্দ বলল, শখ করে দু-একবার জিপ চালাবার চেষ্টা করেছে বটে—তবে তার অভ্যেস নেই।

ত্রিবেদীজি বললেন, "ড্রাইভার মিলে যাবে। বাহাদুর। নেপালি। আমার চেনা আদমি। মগন সিংয়ের জিপটার এঞ্জিন সারাই করার কাম ছিল। ওহি জিপ আগর মিলে যায় তো আচ্ছা, না মিললে—" বলতে বলতে থেমে গেলেন ত্রিবেদীজি। হঠাৎ তাঁর কী যেন মনে পড়ে গেল। বললেন, "ট্রেকার ?"

"ট্রেকার।" আমরা অবাক। এখানে ট্রেকার কোথায় পাব ?

আনন্দ বলল, "আপনি যে কী বলেন ত্রিবেদীজি! ট্রেকার কোথায় পাব ? যদি-বা জোটে—ট্রেকার নিয়ে ঘুরে বেড়াবার মতন টাকা আমাদের কোথায় ?"

ত্রিবেদীজি যেন মস্ত একটা ধাঁধার জবাব পেয়ে গিয়েছেন। নিশ্চিন্ত মুখ করে বললেন, "কুমারসাহেব।"

"কুমারসাহেব! তিনি কে ?"

"আমার চাচাজির দোস্ত। কুমারসাহেবের বাড়ি ছিল জব্বলপুর। ঘরবাড়ি আছে; সাহেবরা থাকেন না। কুমারসাহেব উহিয়াপুরে কোঠি বানিয়েছেন। সাহেবের ফার্ম আছে, বাগিচা আছে। বড়া শিকারি। লেখাপড়া-জানা আদমি। বহুত কুছ জানেন।"

"তা না হয় হল—কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী !"

"কুমারসাহেব কাল আমার কাছে আসবেন। খবর ভেজেছেন। সাহেবের ট্রেকার আছে।"

আনন্দ আর আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। কে কুমারসাহেব জানি না, তিনি হয়তো ধনী লোক, তাঁর ট্রেকারও থাকতে পারে—তা বলে আমরা সেই ট্রেকার পাব কেন ? তিনিই বা দেবেন কেন ?

ত্রিবেদীজিকে কথাটা বোঝাবার আগেই তিনি আমাদের ভরসা দিয়ে বললেন যে, কুমারসাহেবের ভাবনা তাঁর।

তখনকার মতন আমাদের বৈঠক শেষ হল।

পরের দিন দুপুর নাগাদ কুমারসাহেব এলেন। ট্রেকার নিয়েই। সঙ্গে তাঁর ড্রাইভার আর বেয়ারা বা কাজের লোক।

ভদ্রলোকের চেহারাটি দেখাব মতন। মাথায় লম্বা, ছিপছিপে গড়ন, টকটকে ফরসা রং। বছর ষাট বয়েস। বয়েসের ছাপ তেমন চোখে পড়ে না। মাথার চুল অবশ্য সব সাদা। দাড়ি রয়েছে কুমারসাহেবের। দাড়ি অতটা সাদা হয়ে ওঠেনি। ওঁকে দেখলে যথেষ্ট অভিজাত বলেই মনে হয়। হাসিখুশি মুখ।

কুমারসাহেবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন ত্রিবেদীজি। আমরা কেন এখানে এসেছি—তাও মোটামুটি বুঝিয়ে বললেন। কুমারসাহেবের যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না কথাগুলো। অথচ কৌতূহল বোধ করছিলেন। সব শুনে বললেন যে, ওই মাহিনদাগড় বা মানিনদাগড় এরিয়াটা উনি জানেন। কিন্তু ওখানে তো কেউ যায় না, যাওয়ার হুকুম নেই।

"কেন ?"

"প্রোটেকটেড এরিয়া।"

আমরা কিছুই বুঝলাম না।

কুমারসাহেব বললেন, কেন যে ওখানে কাউকে যেতে দেওয়া হয় না— তা তিনিও জানেন না। তবে একটা কথা শোনা যায়। ব্যাপারটাব সত্যি-মিথ্যে

বলতে পারবেন না তিনি।

তারপর ঘটনাটার কথা বললেন। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ওই পাহাড়ি জঙ্গল এলাকায় ব্রিটিশ মিলিটারিদের একটা গোপন অ্যামুনিশান স্টোর ছিল। শোনা যায়, হাই এক্সপ্লোসিভ বোমাটোমা মজুত থাকত। আন্ডারগ্রাউন্ড শেড ছিল। ফাইটার প্লেনও ওঠানামা করত মাঝে-মাঝে। যুদ্ধের শেষে একদিন অ্যামুনিশান স্টোরে দুর্ঘটনা ঘটে। আগুন লেগে যায়। ভীষণ অবস্থা হয়েছিল। যত আওয়াজ, তত আগুন। ভূমিকম্পের মতন নড়ে উঠেছিল পুরো এলাকাটা। তারপর থেকেই বোধ হয় ওটা প্রোটেকটেড এরিয়া হয়ে যায়। ... অনেকের সন্দেহ, আন্ডারগ্রাউন্ডে এখনও কিছু এক্সপ্লোসিভ থাকতে পারে।

কুমারসাহেব এই ঘটনার কথা তাঁর বাবা, মামার কাছেও শুনেছেন। তখন তো তিনি বালক ছিলেন। থাকতেন জব্বলপুরে।

আনন্দ আর আমি কুমারসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। যেন জানতে চাইছিলাম, তা হলে এখন কী করা যায় ?

কুমারসাহেব নিজেই হঠাৎ বললেন, "ও-কে। আমরা ওই জায়গাটায় যাব, তোমাদের আমি নিয়ে যাব, গাইড না করলে তোমরা যেতে পারবে না।"

কুমারসাহেবের কথাবার্তা শুনে আমাদের প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল—উনি খুব ভাল বাংলা জানেন।

আনন্দ কথাটা জিজ্ঞেস করতেই কুমারসাহেব হাসতে-হাসতে বললেন, "কলকাতায় আমাদের বাড়ি আছে। ভবানীপুরে। ব্যবসা আছে। ফ্যামিলি বিজনেস। আমি ব্যবসা দেখি না। তবে কলকাতায় যাই। সেখানে আমার অনেক বন্ধু আছে হে ইয়ংম্যান। আমি মেডিকেল পড়েছি কলকাতায়। কোর্সটা কমপ্লিট করতে পারিনি, সার্জারিতে ফেল করতাম বারবার।"

কুমারসাহেব হো হো করে হাসতে লাগলেন।

সাত

কুমারসাহেব হলেন প্রবীণ লোক, আমাদের মতন ছেলে-ছোকরার হঠকারিতা তাঁর নেই। তবে উৎসাহ আছে ; প্রবল উৎসাহ।

সেদিন সন্ধেবেলা কুমারসাহেবকে ঘিরে আমাদের আলোচনা হল অনেকক্ষণ। প্রথমেই যা দেখলাম, কুমারসাহেব এমন একটা ব্যবস্থা করছেন যেন আমরা কোনও শিকারের ক্যাম্প বসাতে যাচ্ছি কোথাও। গাড়ির তেল-মোবিলের ব্যবস্থা থেকে নিজেদের থাকা-খাওয়ার সবরকম ব্যবস্থা তিনি করে ফেললেন। একটাই অসুবিধে হল, কুমারসাহেব তো তাঁবুর ব্যবস্থা করে আসেননি— কাজেই বনে-জঙ্গলে তাঁবু ফেলে থাকতে পারবেন না, পাঁড়েজির ধর্মশালাতেই থাকতে হবে।

ব্যবস্থা পাকা করে কুমারসাহেব বললেন, "ডায়েরিতে কী লেখা আছে একবার পড়ো। ভাল করে শুনি।"

ডায়েরি-খাতাটা আমার কাছে-কাছে থাকে। পড়লাম, যা লেখা ছিল।

মন দিয়ে শুনলেন কুমারসাহেব ; তারপর বললেন, "স্ট্রেঞ্জ ! আমি এতকাল আছি এদিকে— এত ঘোরাফেরা করেছি— কিন্তু তোমাদের ওই জ্যোৎস্নার কথা তো শুনিনি। প্রোটেক্‌টেড এরিয়ার কথা যা শুনেছি, বলেছি তোমাদের।"

আমি যেন একটু আহত হয়ে বললাম, "কথাটা কি মিথ্যে বলছেন ?"

কুমারসাহেব মাথা নাড়লেন। "না, তা বলছি না। তবে এরকম একটা ঘটনার কথা এখানে কেউ জানবে না, এ কেমন করে হয় !"

"যদি না হয় তবে দাদা খবরটা পাবেন কোথা থেকে ?"

কুমারসাহেব মাথা নাড়লেন, তা ঠিকই। তারপর বললেন, "গুজব নয় তো ! চোখের ভুলে কতরকম গুজব রটে। আবার গুজব নিয়ে বইপত্রও লেখা হয়। দ্যাখো, আমি নিজে একটু-আধটু ইউ. এফ. ও. নিয়ে বইপত্র দেখেছি। আমার ইন্টারেস্টও আছে। কিন্তু দেখলাম— ওই যে গ্রহান্তর থেকে মাঝে-মাঝে এটা-সেটা আমাদের পৃথিবীতে নেমে আসে বলে শোনা যায়, তার বেশিরভাগটাই গল্প।"

"আমরা—" আমি বললাম, "আমরাও ওসব বিশ্বাস করতে পারি না কুমারসাহেব, কিন্তু একেবারে গল্প বলে উড়িয়ে দিতেও পারি না এটা। বিশেষ করে এই ঘটনার পর। আমার বড়দা মিথ্যে কথা লেখার মানুষ নয়।"

"না, না— তা নয়। তুমি হয়তো অবাক-অবাক ঘটনার কথা অনেক পড়েছ। আমি সামান্য পড়েছি। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় একসময়— সালটা বোধ হয় সিক্সটি সিক্স কি, সিক্সটি সেভেন হবে, ঝাঁকে-ঝাঁকে অদ্ভুত জিনিস দেখা যেত। হিউজ ফিগার— সাত ফুট মতন লম্বা, রেড আইজ, জাইগেনটিক উইংস—ফোল্ডেড। তা এসব দৃশ্য দেখার পর গবেষণাও অনেক হয়েছিল— কিছুই ধরা পড়েনি। আগুনে গোলা, নীল মতন দেখতে, ছাতার মতন একরকম ইউ. এফ. ও., সসার— এরকম কত কীসের কথা শোনা যায়। প্রমাণ কিছু হয়নি। তার মানে আমি বলছি না, তোমার দাদা মিথ্যে-মিথ্যে কথাগুলো লিখেছেন। আমি বলছি, তাঁর শোনার ভুল হতে পারে। চোখের ভুলও।"

"চোখের ভুল ?"

কুমারসাহেব হাসলেন, "হ্যাঁ, চোখের ভুলটাই বেশিরভাগ সময় হয়। নেচার মিসলিড্‌স আস।"

"তা কেমন করে হবে ?"

"হয়।... তোমাদের বয়েস কম— এখন বুঝবে না ; পরে দেখবে— চোখ অনেক সময় ভুল করে, মনও ভুল করে। কিছু রিড্‌ল থেকে যায় ভাই। মিরার বা আয়নার কথাই ধরো। আয়নায় আমরা রিভার্স দেখি। কিন্তু মাথা বা পায়ের বেলায় তো সেটা উলটে যায় না। মাথা ওপরেই থাকে। পা নিচে। যাক গে, কাল আমরা ওই জায়গাটায় যাব। ওটা মন্দারগড় হোক, বা মানিদাগড় যাই হোক, যাব। দেখব সেখানে কী রহস্য আছে !"

পরের দিন বিকেলের গোড়ায় গিরিলালের ধর্মশালায় পৌঁছে গেল কুমারসাহেবের ট্রেকার।

গাড়িতে আমরা চারজন। কুমারসাহেব, তাঁর ড্রাইভার, আনন্দ আর আমি।

পাঁড়েজি ট্রেকার গাড়ি দেখে কেমন থতমত খেয়ে গেল।

কুমারসাহেব দু-তিনটে ঘরের ব্যবস্থা করে নিলেন পাঁড়েজির সঙ্গে।

পাঁড়েজির লোক লালা ঘরদোর পরিষ্কার করে দড়ির খাটিয়া বিছিয়ে দিল।

বিকেলে আমাদের চা খাওয়া হল— কুমারসাহেবের ব্যবস্থা।

সন্ধে হয়নি তখনও।

কুমারসাহেব বললেন, "চলো।"

সারাদিন পরে বিকেল থেকে সামান্য মেঘলা হয়েছিল। বৃষ্টি হবে বলে অবশ্য মনে হয়নি।

ট্রেকারের মধ্যে আমাদের নানান সরঞ্জাম। কুমারসাহেবের ব্যবস্থা সব। খাবার-দাবার থেকে বিশ্রাম নেওয়ার গদি বালিশ। বড়-বড় টর্চ। মায় একটা স্পট লাইট। নেহাত আগেভাগে জানতেন না কুমারসাহেব, নয়তো তিনি তাঁর বন্দুকটাও নিয়ে নিতেন। সেটা তো আর সঙ্গে আনেননি কটোরাঘাট আসার সময়। অবশ্য আমাদের আনন্দের কাছে একটা পাহাড়ি গুপ্তি আছে।

ট্রেকার চলতে শুরু করল।

কুমারসাহেব পথ বলে দিচ্ছিলেন।

পাহাড়-জঙ্গল জায়গা, এখানে পথ বলে কিছু নেই, আন্দাজে এগিয়ে চলা। যেতে-যেতে অন্ধকার হয়ে এল।

অন্ধকারের মধ্যেও চোখে পড়ছিল— দূরে কোথাও যেন কালো মেঘের মতন ভাঙাচোরা কী দেখা যাচ্ছে। কুমারসাহেব টর্চ ফেলে বললেন, "ওগুলো ভাঙা গড়, পাথরের। কতকাল ধরে পড়ে আছে।"

ঘন জঙ্গলের এক গন্ধ আছে। সামনে গিয়ে না দাঁড়ালে বোঝা যায় না— অনুভব করাও যায় না। তবু এই গন্ধ যেন গাছলতাপাতা আর অন্ধকারের এক বন্য গন্ধ। একটু ভয়-ভয়ও হয়।

ট্রেকার যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। একই পথে বারকয়েক ঘোরাও হয়ে গেল। ঘড়িতে রাত সাড়ে আটটা প্রায়। বৃষ্টিও শুরু হল হঠাৎ।

আচমকা আমাদের ট্রেকার দাঁড়িয়ে গেল।

কুমারসাহেব টর্চ ফেললেন। দেখলেন। বললেন, "ওই দ্যাখো।"

দেখলাম— লোহার বড়-বড় অ্যাঙ্গেলের মধ্য দিয়ে তারকাঁটা ঢুকিয়ে সামনে এক বিরাট বাধা দাঁড় করানো আছে। সোজা কথায়—তারকাঁটার ফেন্সিং।

কুমারসাহেব গাড়ির জোরালো স্পট লাইট জ্বেলে দিলেন।

বোঝা গেল, ফেন্সিংয়ের ওপারে যাওয়া চলবে না, ওটা প্রোটেক্টেড এরিয়া।

কুমারসাহেব বৃষ্টির মধ্যেই আলো ফেলে-ফেলে দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন, "এ দেখছি ভয়ঙ্কর অবস্থা। প্রথমে কাঁটাতার, তারপর কংক্রিটের থাম,

তারপর খাদ— ডিচ— শেষে ওয়াচ টাওয়ার। তারপর যে কী, দেখতে পাচ্ছি না। এখানে এরকম একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মতন জায়গা আছে জানতাম না তো ! আশ্চর্য ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ :”

আট

আমাদের ট্রেকার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। ঘন জঙ্গল, বড়-বড় গাছ। লতাপাতায় সামনের দিকটা আড়াল পড়ে গিয়েছে। আশপাশেরও একই অবস্থা। বৃষ্টিও পড়ে যাচ্ছিল সমানে। সমস্ত পরিবেশটাই কেমন ভীতিকর।

গাড়ির হেডলাইট মাঝে-মাঝে জ্বালানো হচ্ছিল। আবার নিভিয়ে ফেলাও হচ্ছে ; অকারণে ব্যাটারি নষ্ট করে লাভ কী ?

খানিকক্ষণ পর কুমারসাহেবের কথা মতন আমাদের গাড়ি আরও তিরিশ-চল্লিশ গজ এগিয়ে গেল। গড়িয়ে গেলও বলা যায়— কেননা সামনের দিকটায় ঢাল রয়েছে।

আর যাওয়া গেল না। বিশ-পঁচিশ হাত তফাত থেকে খাদ নেমেছে যেন। ড্রাইভার বলল, গড়াই।

তারকাঁটার গা ধরে-ধরে পাশ দিয়ে এতক্ষণ আমাদের গাড়ি এগিয়েছে। আর উপায় নেই এগোবার। তারকাঁটার সেই বিশাল ফেন্সিং কিন্তু ওই খাদের মধ্যে কেমন নেমে গিয়েছে।

দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই। গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বললেন কুমারসাহেব। “আজ আর ঘোরাঘুরির চেষ্টা করে লাভ নেই। চলো, ফিরে যাই। কাল দিনের বেলায় আসা যাবে।”

“দিনের বেলায় ?” আমি বললাম।

“দিন ছাড়া উপায় কী ? এই প্রোটেক্টেড এরিয়ার খোঁজখবর তো আগে নিতে হবে ; তারপর অন্য কথা।”

গাড়ি ফিরে চলল।

আমি বললাম, “কুমারসাহেব, আমার খুব অবাক লাগছে। বড়দা তার লেখার মধ্যে কোথাও এই প্রোটেক্টেড এরিয়ার কথা লেখেনি।”

আনন্দ বলল, “আমিও তাই ভাবছি।”

কুমারসাহেব মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ— তিনিও সেটা ভাবছেন। পরে বললেন, “জায়গার গোলমাল হয়েছে, বলছ ? আমরা অন্য জায়গায় এসে পড়েছি ?”

“কী জানি !”

“না, অন্য জায়গায় এলেও কাছাকাছি, আশেপাশে এসেছি যে তা ঠিকই।”

“কেমন করে বুঝলেন ?”

“এই জঙ্গলের মধ্যে এগোবার আর কোনও রাস্তা দেখিনি।”

আনন্দ বলল, “তাও ঠিক।”

সামান্য চুপচাপ থাকার পর কুমারসাহেব বললেন, "আমি ওই প্রোটেকটেড এরিয়ার কথা ভাবছি। এ-রকম তিন দফা বেরিয়ার আর কোথাও দেখিনি বাবা।...হ্যাঁ, দেখেছি যুদ্ধের ছবিতে। আমাদের কলেজ লাইফে খুব যুদ্ধের ছবি আসত। কলকাতার কথা বলছি। যুদ্ধ শেষ কিন্তু বিদেশের বাজারে তখন বহুত ওয়ার-পিকচার্স জমে গিয়েছিল। বেশির ভাগই প্রোপাগ্যাণ্ডা পিকচার্স। পয়সা কামাতে তার কিছু-কিছু পাঠিয়ে দিত এখানে। সেই ছবিতে হিটলারের নাজীদের তৈরি কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্পের চেহারা দেখেছি। ভয়ঙ্কর জিনিস !"

বৃষ্টির ছাট আসছিল। জোরেই বৃষ্টি হচ্ছে। গাড়ির এঞ্জিনের শব্দও যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বৃষ্টির শব্দে।

আনন্দ বলল, "এখানে তো সেরকম কিছু থাকার কথা নয়।"

"না, কথা নয়। তবে আমাদের এখানে গত যুদ্ধের সময় বেশ কয়েকটা প্রিজনারস্ ক্যাম্প ছিল। মানে 'প্রিজনারস্ অব ওয়ার'-দের রাখা হয়েছে।"

"যুদ্ধবন্দী শিবির !"

"হ্যাঁ।...এদিকেও একটা ছিল। জায়গাটার নাম মনে পড়ছে না— লেট মি থিংক। বেণীপাহাড়, বিঠলগাঁও ? না, না। রোহিতগড়, হাতড়া ! না। তা নয়। মান-মানজি-মানডি। মনে পড়েছে— নামটা বোধ হয় মানডিগড় ছিল। ইন ফ্যাক্ট জায়গাটা একেবারে বিহার বর্ডারের গায়ে।"

"ক্যাম্প ছিল এখানে ?"

"ইয়েস। ছিল।"

"তবে যে বলছিলেন এখানে ব্রিটিশ আর্মির লুকনো অ্যামিউনিশান ডিপো ছিল একটা।"

"দুটোই ঠিক। দুটোই হতে পারে।"

"মানে ?"

"মানে এখানকার পুরো এরিয়াটা কত— আমরা জানি না। এখানকার ন্যাচারাল অ্যাড্ভানটেজ কী কী তাও জানি না। মানে জঙ্গল, পাহাড়, নদী— কোথায় কী রকম তার কোনও আইডিয়াই আমাদের নেই। আমার মনে হয়, গোটা এলাকার একটা দিকে ছিল বন্দিশিবির, অন্য দিকে অ্যামিউনিশানের ছোট কোনও ডিপো।"

আনন্দ হঠাৎ বলল, "কুমারসাহেব, এমন তো হতে পারে আসলে এটা বন্দিশিবির ছিল, সেটা যাতে বাইরে জানাজানি না হয় তার জন্যে বানিয়ে বলা হত অ্যামিউনিশান ডিপো !"

কুমারসাহেব মাথা নাড়লেন।

আমি বললাম, "আপনি কখনও যুদ্ধবন্দি দেখেছেন ?"

"না," মাথা নাড়লেন কুমারসাহেব। পরে বললেন, "তবে একবার গয়া স্টেশনে আমাদের ট্রেন আটকে একটা স্পেশ্যাল ট্রেন পাস করাতে দেখেছি। একেবারে মিলিটারি পাহারায়। শুনেছিলাম ওই গাড়িতে পি ও ডবলু নিয়ে যাওয়া

হচ্ছে।”

“এখানে কাদের রাখা হত ?”

“ইতালিয়ান আর জার্মানি। ইতালিয়ান বেশি।...আফ্রিকার যুদ্ধে ব্রিটিশ তো প্রথমে গোহারা হারছিল। রুমেল তখন যুদ্ধ চালাচ্ছে আফ্রিকায়। তারপর দিন পালটাল। এরা আস্তে আস্তে জিততে লাগল। তখন অনেক ইতালিয়ান ধরা পড়ল। বন্দি হল। তাদের কিছু ধরে এনে এ দেশের ক্যাম্পে রাখা হল। সঙ্গে কিছু জার্মানিও।...অবশ্য এ সব তো শোনা কথা, চোখে কোনও ক্যাম্প আমি দেখিনি।”

আমাদের ড্রাইভার পাকা লোক। রাস্তা চিনতে তার ভুল হল না। ধর্মশালার কাছাকাছি এসে পড়লাম আমরা।

কুমারসাহেব হঠাৎ বললেন, “আরে, আরে— একটা কথা তো মাথায় আসেনি !”

“কী কথা ?”

“পরে বলছি, আগে ধর্মশালায় ফিরি।”

আমি বললাম, “সে যাই হোক, একটা কথা আপনি আমায় বলুন ! যুদ্ধ কবে শেষ হয়ে গিয়েছে—পঞ্চাশ বছর হতে চলল। কবেকার সেই ক্যাম্প এখন মিনিংলেস। আমরা স্বাধীন দেশ। পঞ্চাশ বছর আগেকার সেই ক্যাম্প এখনও থাকবে কেন ? আমরা তো যুদ্ধবন্দি ভরে রাখি না।”

কুমারসাহেব বললেন, “না, সেই প্রিজনার্স ক্যাম্প নেই, কেনই বা থাকবে ! তবে সে অবস্থায় ওটা হাতে পাওয়া গিয়েছিল— আমাদের সরকার বা মিলিটারি সেখানে নতুন করে কিছু করছে কি না— তা তো আমরা জানি না। হতে পারে সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে ওখানে কিছু করা হয়। হয়তো তাই জায়গাটা প্রোটেকটেড এরিয়া।”

ধর্মশালায় ফিরে এলাম আমরা।

বৃষ্টি তখনও পড়ছে।

মাথা বাঁচিয়ে যে যার ঘরের দিকে ছুটলাম।

তিনটে ঘর আমাদের। কুমারসাহেব একটা ঘর নিয়েছেন। একটা ঘরে আমি আর আনন্দ। অন্য ঘরে কুমারসাহেবের ড্রাইভার আর বেয়ারা।

মোমবাতির আলো জ্বলছিল আমাদের ঘরে। পোশাক-টোশাক বদলানো হয়ে গিয়েছিল আমাদের।

কুমারসাহেব এলেন। মুখে পাইপ।

এসে আমাদের খাটিয়ায় বসলেন। বললেন, “মাথায় একটা কথা চক্কর দিচ্ছিল। বলতে এলাম।”

“বলুন।”

“প্রিজনার্স ক্যাম্প আর অ্যামিউনিশান ডিপো— যত ছোটই হোক, পাশাপাশি থাকতে পারে কি না— সেটাই প্রশ্ন ! মনে হচ্ছে পারে। কেন পারে জানো ?”

"কেন ?"

"তুমি যদি যুদ্ধের সময় বন্দি হয়ে শত্রুপক্ষের হাতে গিয়ে পড়ো— তবে ওরা তোমায় দিয়ে খাটিয়ে নিতে পারে। পারে মানে যা খুশি করাতে পারে না, আইন মাফিক যা করানো যায় করাতে পারে।...কিন্তু একটা বইয়ে পড়েছিলাম— জার্মানরা যুদ্ধবন্দিদের দিয়ে জোর করে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কাজকর্ম করাত। এমন কাজ যাতে তোমার পক্ষে বেঁচে থাকার আশা কম। একে বলত ডেনজারাস মিশন। সোজা কথায়— তুমি মরো ক্ষতি নেই, আমি আমার কাজটি উদ্ধারের চেষ্টা করব।"

"এ তো একরকম হত্যাই।..."

"হ্যাঁ।"

"তা এখানে—"

"এখানেও যদি এমন হয়— ! কে বলতে পারে ব্রিটিশরা যাদের বন্দি করে রেখেছিল তাদের কাউকে-কাউকে গোলাবারুদের সঙ্গে কোনও ঝুঁকির কাজে পাঠিয়ে দিত কিনা !

আনন্দ চুপ করে থাকল।

আমি বললাম, "কিন্তু এর সঙ্গে বড়দার সেই অদ্ভুত রহস্যময় জ্যোৎস্না..."

"কোনও সম্পর্ক নেই। আবার থাকতেও পারে কোনও সম্পর্ক। এখন কিছুই বলা যায় না।"

নয়

কুমারসাহেব মানুষটি আমাদের চেয়েও যেন বেশি উদ্যোগী। সকাল হতে না হতেই সাজো-সাজো রব তুললেন। আমরাও তৈরি হতে লাগলাম।

গিরিলাল ধর্মশালার পাঁড়েজিও আমাদের উদ্যোগ আয়োজন দেখে খানিকটা ঘাবড়ে গেল। ট্রেকার গাড়ি, কুমারসাহেব, ড্রাইভার, বেয়ারা— তার ওপর আমরা দুই বাঙালি ছোকরা — এতরকম যোগাযোগ দেখে তার ঘাবড়ে যাওয়ারই কথা। সে বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা কী হচ্ছে।

সকালে আর বৃষ্টি নেই। রোদও উঠে গিয়েছিল। মাঠ, মাটি অবশ্য ভিজে ছিল তখনও।

কুমারসাহেব বললেন, "চলো। বেলা করলে অসুবিধে হবে।"

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে খাবারদাবার বলতে অল্প হালকা খাবার, আর পানীয় জল। দুপুরের মধ্যে ফিরে আসব আমরা ধর্মশালায়। তারপর ভাত-রুটি-সবজির ব্যবস্থা। আবার বিকেলে বেরোব।

যাওয়ার সময় এ-কথা সে-কথার মধ্যে কুমারসাহেব বললেন, "কাল আমি বহুত ভেবেছি। ভেবে-ভেবে ঘুম হল না, ফার্স্ট নাইটে। লেট নাইটে আমি টায়ার্ড হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।"

"কী ভাবলেন ?" আনন্দ বলল।

"সাম মিস্ত্রি ইজ দেয়ার....ওই মানডিগ্গড়ে। ইয়েস, জায়গাটার নাম মানডিগড়। লোকাল নাম যাই হোক, ইট ইজ মানডিগড়। আমার মনে পড়ল, আমি যখন কলকাতা যাওয়ার আগে একবার নাগপুরে টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়েছিলাম—হকি টুর্নামেন্ট—তখন আমি জাস্ট ইয়াং। সেই সময় এই জায়গায় কোথাও একটা মিটিওরাইট পড়েছিল। কী বলে বাংলায়— ?"

"উল্কাপিণ্ড।"

"পেপারে খবরটা ছাপা হয়েছিল বড়-বড় করে। শুনেছিলাম— মিটিওরাইটটা হেভি ছিল। অত বড় আর হেভি মিটিওরাইট এদিকে কোথাও কোনওদিন পড়েনি। পেপারে খবর ছাপা হতে লাগল। দু-পাঁচদিন পরে, কেউ বলল ওটা মিটিওর, নট মিটিওরাইট। আরে বাবা, ওই নিয়ে পেপারে ঝগড়া লাগিয়েছিল। ডিফারেন্সটা কী ? নো ডিফারেন্স। ওয়ান ইজ বিগার, দি আদার ইজ পার্ট অব এ মিটিওর। আমি তো তার বেশি বুঝি না।"

আমি বললাম, "আমরাও বুঝি না কুমারসাহেব, বইয়েতেই পড়েছি— উল্কাপাত।"

আনন্দ বলল, "আমি একটা ছবিতে দেখেছি—আমেরিকায় আরিজোনার কাছে এক জায়গায় বিরাট একটা উল্কাপাত হয়েছিল হাজার-হাজার বছর আগে।"

"ছোটখাটো উল্কা পৃথিবীর সব জায়গাতেই পড়েছে"—আমি বললাম, "এ আর নতুন কথা কী ?"

কুমারসাহেব বললেন, "নতুন কথা ছিল। পেপারে লিখল, মিটিওরটা পড়বার সময় আগুনের গোলার মতন জ্বলছিল, আর শব্দ হচ্ছিল মেঘ ডাকার মতন।"

আমরা কিছু বললাম না। হতেই পারে শব্দ, দাউদাউ করে জ্বলতেও পারে। অত আমরা জানি না।

কুমারসাহেব নিজেই আবার বললেন, "পেপারে তখন জবর হল্লা চলছিল মিটিওর নিয়ে। কেউ-কেউ তখন অন্য থিয়োরি পেশ করতে লাগল। বলল, মিটিওর-টিটিওর নয়, আলাদা কোনও প্ল্যানেট থেকে একটা গোল ডিব্বা— মানে কোনও রাউন্ড অব্জেক্ট এসে পড়েছে। ফ্লাইং অব্জেক্ট।"

আমরা অবাক হয়ে কুমারসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। অন্য গ্রহ থেকে একটা গোল স্পেসশিপ এসে পড়েছিল নাকি ! আশ্চর্য !

আনন্দ বলল, "মানে, সেই উড়ন্ত চাকি বা লাট্টু।"

"আরে বাবা, চাকি, লাট্টু, বেলুন, টর্পেডো-টাইপ বা যাই হোক—কেউ তো চোখে দেখেনি। যার যা খুশি বলতে লাগল।"

"তারপর ?"

"তারপর দু-চার মাস পরে সব চুপচাপ। গপ্‌সপ্‌ খতম। তবে একটা কথা ঠিক—গভর্নমেন্ট জায়গাটা ঘিরে রাখল।"

"এটা কখন হয়েছিল ?" আমি বললাম।

"আমি তখন ইয়াং। কলেজে বি. এস-সি. পড়ি। তারপর কলকাতায় মেডিকেল পড়তে চলে গেলাম। স্টেট কোটা ছিল তখন।"

"আপনার বয়েস তখন কুড়ি-বাইশ ?"

"অফকোর্স টুয়েনটি টু।"

"যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে ?"

"আগেই।"

"আচ্ছা সার", আনন্দ বলল, "এমন তো হতে পারে—মিটিওর স্পেসশিপ—কিছুই নয়, একটা এরোপ্লেনে আগুন লেগে গিয়েছিল—সেটাই ওখানে ভেঙে পড়েছিল।"

কুমারসাহেব মাথা নাড়লেন। "না, এরোপ্লেন ভেঙে পড়লে তার খবর থাকত।"

কথায়-কথায় আমরা অনেকটা পথই চলে এসেছি। দিনের আলোয় গাড়ি চালাতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না ড্রাইভারসাহেবের। দারুণ চালায় লোকটা।

কাল রাত্রে এই বনজঙ্গলের পথ বৃষ্টির মধ্যে একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। চারপাশে ঘন অন্ধকার যেন কোনও গুহার মতন আমাদের ঘিরে রেখেছিল, গাড়ির হেডলাইটের জোরালো আলো অনবরত লাফাচ্ছিল, বৃষ্টি পড়ছিল, শব্দ হচ্ছিল, গাছ-পাতায় হাওয়া লেগে কেঁপে উঠছিল। ভয় পাওয়ার মতন পরিবেশই। কোথায় যে চলেছি —তাও যেন জানা ছিল না!

আজ সেইরকম অবস্থা নয়। জঙ্গলের পথে কোথাও রোদ, কোথাও ছায়া। গাছপালা কত নরম দেখাচ্ছে। এখনও বৃষ্টির জল শুকিয়ে যায়নি গাছের ডালপালা থেকে। বুনো পাখিও ডাকছিল মাঝে-মাঝে।

আমি চুপচাপ ছিলাম। অন্যমনস্ক। হঠাৎ মাথায় কেমন অদ্ভুত চিন্তাটা এল। আচ্ছা, এমন যদি হয়—কুমারসাহেব উল্কাপিণ্ডর যে কাহিনী শোনালেন তা যদি না হয়ে সত্যি-সত্যি সে-সময় একটা উড়ন্ত চাকি এসেই থাকে মহাশূন্য থেকে! পারে না ? এত যে কথা আমরা শুনি ইউ. এফ. ও.-এর, তার সবই কি গল্প ? যদি গল্পই হবে তবে এ নিয়ে এত মাথাব্যথা, গবেষণা কেন ? বিদেশে কত বই লেখা হয়ে গিয়েছে এই বিষয় নিয়েই। সবই কি ফাঁকিবাজি! বড়দা নিজে সরল সাদামাঠা মানুষ ছিল ঠিকই, তবে দাদার মতিভ্রম হয়নি। নির্বোধ মানুষ দাদা নয়। আমি আগেই বলেছি, দাদা শিক্ষিত ছিল। এঞ্জিনিয়ারিং পাশ-করা লোক। বোকার মতন যে যা বলবে বিশ্বাস করার পাত্র নয়। তবু সেই দাদাই কেন এইসব উদ্ভট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে, কেনই-বা বিশ্বাস করবে অদ্ভুত-অদ্ভুত ব্যাপারগুলো, তা অবশ্য আমি জানি না। গ্রহান্তরের বস্তু সম্পর্কে বড়দার বিশ্বাস যদি নাই-বা বলি—বলতে পারি কৌতূহল।

আনন্দ আমার গায়ে ঠেলা দিল।

তাকালাম।

"কী ভাবছিস ?"

যা ভাবছিলাম বলতে কেমন দ্বিধা হল। সামান্য পরে বললাম, "আচ্ছা, একটা উড়ন্ত কিছু তো আসতেই পারে। পারে না ?"

"কী বলিস যে !"

আমি কুমারসাহেবের দিকে তাকালাম। বললাম, "কুমারসাহেব, সেটা কোন সময়ের কথা হবে ?"

"কোনটা ?"

"পেপারে যখন এই খবর বেরিয়েছিল, আলোচনা হয়েছিল।"

"সালের কথা বলছ ! আমি একেবারে ঠিক-ঠিক বলতে পারব না। তবে নিয়ার্‌লি ফরটি ইয়ার্স ব্যাক। চল্লিশ....তা চল্লিশ বছর হবে। ব্রিটিশ জমানায় নয়।"

খানিকটা ইতস্তত করে আমি বললাম, "ধরুন এমন যদি হয়—তখন কোনও গ্রহান্তরের একটা সসার বা গোল ধরনের জাহাজ সত্যিই ওখানে এসে পড়েছিল ছিটকে !"

কুমারসাহেব কিছু বলার আগে আনন্দ হেসে বলল, "তোর মাথায় হঠাৎ এই চিন্তাটা এল কেমন করে !"

"না, বলছি।"

"হঠাৎ এসে পড়বে কেন ?"

"কেন পড়বে না ! এমন কোনও যন্ত্র কি আছে যা বিগড়োয় না ! সে-দিন আমেরিকায় কী হল ? এই তো পঁচাশি-ছিয়াশি সালের কথা। কী নাম যেন শাট্‌লটার ! চ্যালেঞ্জার কী ! একটা অত বড় স্পেস শাট্‌ল— অমন নিখুঁত করে তৈরি, মহাশূন্য যার কাছে জলভাত, আকাশে উঠতে-না-উঠতেই ছাই। এখনকার দিনেও এরকম হয়।"

কুমারসাহেব আমাদের কথা শুনছিলেন। বললেন, "যুক্তি হিসেবে এটা ঠিকই, তবে কী হয়েছিল তা তো আমরা জানি না।...ওই দ্যাখো, আমরা এসে পড়েছি।"

তাকিয়ে দেখি গতকালের সেই জায়গায় পৌঁছে গিয়েছি প্রায়। কিন্তু কাল রাত্রে অন্ধকার আর বৃষ্টির মধ্যে যা দেখেছিলাম—তা যেন খুবই ঝাপসা।

গাড়ি আরও এগিয়ে গেল।

কুমারসাহেব একজায়গায় গাড়ি থামাতে বললেন। গাড়ি থামল। আমরা নেমে পড়লাম।

কাল আমরা ভুল দেখিনি। তবে এমন স্পষ্ট করে দেখতেও পারিনি। আজ দেখলাম, তারকাঁটার যে বেড়া সোজা চলে গিয়েছে, গিয়ে ক্রমশ পাতাল-প্রবেশের মতন নিচু হয়ে নেমেছে— সেই তারকাঁটার বেড়ার ধরনটা আলাদা। মাথায় যে বেশ উঁচু, তাতে সন্দেহ নেই। বেড়া দেখে প্রথমেই মনে হয়েছিল লোহার খুঁটির বেড়া। এখন বোঝা গেল— খুঁটিগুলো লোহার, রং-করা, আর খুঁটির গায়ে-গায়ে শালগাছের খোঁটা। চট করে দেখলে বোঝা যায় না যে লোহার খুঁটির গায়ে-গায়ে শালখুঁটিও আছে। কেন ? বেশি পাকাপোক্ত করার জন্য ? না, চোখের ভুল ঘটিয়ে

দেওয়ার জন্য ? খুঁটির পর খানিকটা জমি—জঙ্গুলে জমি—পাথর, ঝোপঝাড়ে ভরতি। তারপর কংক্রিটের থাম। গতকাল যা মামুলি থাম বলে মনে হয়েছিল—এখন দেখা গেল সেগুলো নেহাত কংক্রিট পিলার বা থাম নয়। প্রথমত, একটা থামের সঙ্গে আরেকটা থামের দূরত্ব প্রায় বিশ-পঁচিশ ফুট হলেও থামের তলার দিকটায় মাটি ছুঁয়ে টানা পাঁচিল চলে গিয়েছে অন্য থাম পর্যন্ত। পাঁচিলটা ফুট তিনেকের বেশি উঁচু মনে হয় না, কিন্তু ঢেউখেলানো পাঁচিল। কেন, কে জানে ! এর পর আরও খানিকটা তফাতে ডিচ—মানে বড় নালার মতন খাল। খাল কতটা চওড়া, বোঝা যায় না। তিরিশ-চল্লিশ গজ হতে পারে। খালের ওপারে ওয়াচ-টাওয়ার।

আনন্দ কলকাতা থেকে আসার সময় বায়নাকুলার এনেছিল। সঙ্গেই ছিল আজ।

আমি বায়নাকুলার হাতে নিয়ে আরও একটু দেখার চেষ্টা করলাম। তারপর আনন্দ নিল। দেখল।

শেষে কুমারসাহেব।

কুমারসাহেবের শিকারি চোখ, তা ছাড়া বন-জঙ্গল তাঁর চেনা। তিনি একটু উঁচু জায়গায় গিয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলেন খানিকটা সময়।

তারপর কাছে এসে অবাক গলায় বললেন, "মাই গড....। তোমরা কিছু দ্যাখোনি ?"

"কী ?"

"আরে, ওদিকে যে হাফ্-রাউন্ড শেপের ক'টা ব্যারাক আছে। ব্যারাকগুলো ক্যামাফ্লয়েজ করা, একেবারে মিলিটারি কায়দায়। গ্রিন আর খাকি রঙে লেপটে রেখেছে। তার পাশে-পাশে আবার দু-একটা করে বড়-বড় গাছ। নিমটিম হতে পারে।"

আমরা সত্যিই অতটা খেয়াল করিনি। কিংবা বুঝিনি।

কুমারসাহেব আনন্দর দিকে তাকালেন। বললেন, "আনন্দ, এখানে কোনও মিলিটারি ব্যারাক আছে। শিওর।"

"মানে ?"

"মিলিটারি ! আবার মানে কী— !"

"মিলিটারি দেখলেন ?"

"না। বায়নাকুলার হাতে দাঁড়িয়ে থাকলে শিওর দেখা যাবে।"

আমরা বললাম, "তা হলে ?"

"চলো, আরও একটু এগিয়ে যাই।"

গাড়ি নিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে দেখা গেল— সামনে গাড়ি যাওয়ার পথ নেই। একেবারে খাদের মতন নিচু হয়ে নেমে গিয়েছে ঘন জঙ্গল। ওই জঙ্গলের মধ্যেও ফেন্সিংয়ের কিছু দেখা যায়—বাকি দেখা যায় না, আড়াল পড়ে গিয়েছে। তার ওপারে পাহাড়ের মাথা। একটানা। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। পাহাড়ের

মাথায় আকাশ নেমেছে যেন।

কুমারসাহেব নিজের মনেই মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, "এই দিক দিয়ে ভেতরে যাওয়ার কোনও উপায়ই নেই।"

"তা হলে ?"

"অন্য দিক দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ওই পাহাড়ের দিক দিয়ে। নিশ্চয় পথ আছে।" বলে কী ভাবলেন যেন, বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, আমরা ভুল রাস্তায় এসেছি। এখান দিয়ে মান্‌ডিগড়ে যাওয়া যায় না। অন্য রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে। একেবারে উলটো দিক থেকে।"

হঠাৎ আমার মনে হল, বড়দাকে কি মিলিটারিরা ধরে ফেলে গুলি করে মেরে ফেলেছে ? কিন্তু কেন ?

কথাটা কেন মনে হল, কে জানে !

দশ

বিকেল ফুরোতেই আবার তোড়জোড় শুরু হল।

কুমারসাহেবের ড্রাইভার পাকা লোক। আমরা নজর করে দেখেছি, গাড়ি নিয়ে বেরোবার অনেক আগে থেকেই ড্রাইভারজি গাড়িটার তদারকি সেরে নেয় ভাল করে। এঞ্জিন দেখে, তেলকালি মুছে নেয়, ব্যাটারি পরখ করে, দেখে রেডিয়েটরের জল। তেল তো অবশ্যই দেখা দরকার। চাকার হাওয়া ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নেয়।

ড্রাইভারজি হল ছত্রিশগড়ের লোক। দেখতে গাঁট্টাগোট্টা। মুখের আদল অনেকটা বর্মিদের মতন। কেমন যেন চ্যাপটা-চ্যাপটা। ভাঙা বসা নাক, চোখ দুটি গোল-গোল। ওর নাম, আখলা।

আখলা বলল, গাড়ির তেল কম রয়েছে। বিশ-পঁচিশ মাইলের বেশি ঘোরাফেরা করা যাবে না। বড় ক্যান করে যে তেল আনা হয়েছিল তা শেষ। আবার তেল আসবে ক্যানে, আসবে বাসে— ত্রিবেদীজি পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন— বাসস্টপে গিয়ে সেই তেল নামিয়ে আনতে হবে। এসব আগামীকালের কথা, আজ যতটা তেল আছে তাতেই কাজ চালাতে হবে।

কুমারসাহেব বললেন, "অলরাইট, আমরা আজ দশ-বারো মাইলের মধ্যেই রাউন্ড মারব। রাস্তা একই। খুব নজর করে দেখব— কোনও শর্ট ওয়ে আছে কি না !"

"মানে ?"

"জঙ্গলের গাছ, ঝোপঝাড় অনেক সময় অন্য রাস্তা আড়াল করে রাখে, তাই না কুমারসাহেব ?" আনন্দ বলল।

মাথা নাড়লেন কুমারসাহেব, হেসে বললেন, "জঙ্গল বড় ভুলভুলাইয়া জায়গা !" বলেই অন্য কথায় চলে গেলেন। কাল, তেলের নতুন ক্যান আসার পর গাড়িতে

তেল ভরে তিনি একেবারে পুরো চক্কর মেরে পাহাড়ের ওপাশ দিয়ে মিলিটারি-মার্কা ওই ছাউনির দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। তাঁর ধারণা, এইদিক দিয়ে— মানে পুবের দিক দিয়ে ওই ক্যাম্পে যাওয়া যাবে না। পশ্চিম দিয়ে যাওয়া যাবে। আর যাই হোক, ক্যাম্পের লোকদের জন্য আসা-যাওয়ার রাস্তা তো নিশ্চয় আছে। এমন তো হতে পারে না যে, ওখানকার লোকগুলোকে একেবারে আইসোলেট করে রাখা হয়েছে। অসম্ভব !

আমি বললাম, "কিন্তু এমন যদি হয়— স্থলপথে কোনও যোগাযোগ রাখা হয়নি।"

কুমারসাহেব হেসে উঠলেন, "হয় না, তা হয় না। ওটা কোনও দ্বীপ নয়।"

আমাদের বেরোতে-বেরোতে বিকেল শেষ হয়ে এল। তবে আলো তখনও ফুরিয়ে যায়নি। আজ কোনও তাড়াহুড়ো নেই। বেশি দূর তো আমরা যাব না। উপায় নেই। তবে আমার মনে হল, যে-কাজের জন্য আমরা যাচ্ছি, অন্ধকার হয়ে গেলে সে-কাজ হবে কেমন করে ! বনজঙ্গলের ভেতরটাকে কুমারসাহেব বলেছেন ভুলভুলাইয়া। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু ওই বনজঙ্গলের মধ্যে— গাছপালা, ঝোপঝাড়ে আড়ালে যদি কোনও চোরা পথ বা শর্টকাট রাস্তা থেকেই থাকে— তবে আমরা অন্ধকার হয়ে গেলে দেখতে পাব কেমন করে ? হ্যাঁ, আমাদের কাছে জোরালো টর্চ আছে, আছে গাড়িতে স্পট লাইট। তা থাকুক, দিন-দুপুরের আলোয় গাড়িতে যেতে-যেতে যেভাবে চারপাশ নজর করা সম্ভব, অন্ধকার হয়ে গেলে সেটা সম্ভব নয়। কুমারসাহেব যে এসব বোঝেন না তা নয়, তবু তিনি যখন বলছেন— বেরোনো গেল।

অন্যদিকে গাড়ি যে-পথে যায় সেই পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে— সিকি মাইল কি আধ মাইল— গাড়ি থেমে গেল। কুমারসাহেব থামাতে বললেন। তখনও ফিকে আলো ছিল।

গাড়িতে বসেই সামনে বাঁ দিকে তাকালেন কুমারসাহেব। পাঁচ-সাতটা বড়-বড় গাছ গায়ে-গায়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে ঝোপ। গাছগুলোর মধ্যে নিম আর অশ্বত্থগাছ আমি চিনতে পারলাম— বাকি পারলাম না।

কুমারসাহেব কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে ড্রাইভার আখলাকে নেমে গিয়ে দেখতে বললেন কী যেন।

আখলা নেমে গেল।

আনন্দ জিজ্ঞেস করল, "কী দেখতে পাঠালেন, সার ?"

কুমারসাহেব বললেন, "কাপড়া পড়ে আছে ওখানে ! কীসের কাপড়া ?"

আখলা ঘোরাফেরা করে ফিরে এল। বলল, "ছেঁড়া গামছার একটা টুকরো পড়ে আছে। মিট্টি লাগানো।"

কুমারসাহেব নিজে নেমে গেলেন। একটা কাঠি কুড়িয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেন জিনিসটা। ফিরে এসে বললেন, "গামছার টুকরোই। লাল রঙের। মাটিতে জলে রোদ্দুরে বোঝার উপায় নেই আর রং। কোনও দেহাতি লোকের গামছা হবে।

এই পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করেছে কখনও।"

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল।

চলতে-চলতে একজায়গায় বড়-বড় পাথর চোখে পড়ল। বিরাট-বিরাট পাথরের চাঁই। পাথরগুলো এলোমেলো পড়ে আছে। যেন এখানে একটা পুচকে পাহাড় তৈরি হয়ে উঠছিল কোনও সময়ে। পাথরগুলো এমনভাবে সাজানো যে, একটার পাশ দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়— গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না।

কুমারসাহেব আমাদের নামতে বললেন।

নামলাম আমরা।

পাথরগুলোর কাছাকাছি গিয়ে আনন্দ বলল, "এগুলো কী পাথর? এত কালো?"

কুমারসাহেব বললেন, "বর্ষাকালে জলে ধুয়ে-ধুয়ে ওই রকম দেখাচ্ছে। ধুলোময়লা নেই। সাফসুফ।"

দুটো বড়-বড় পাথরের তলা দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম সামান্য। পায়ের তলায় ছোট-ছোট পাথর, পাথর টপকে-টপকে এগোতে হচ্ছিল। কোথাও-কোথাও ঘাস গজিয়েছে, কোথাও বা কাঁটাঝোপ। বড় দুই পাথরের মাঝপথ দিয়ে এপারে এসে দেখি সামনে যেন বিশাল মাঠ। অবশ্য পাথরে-পাথরে ভরতি। পাহাড়ের নীচে যেমন হয়, অনেকটা সেইরকম। ওরই মধ্যে চোখে পড়ল, একটা মাথাভাঙা গম্বুজ মতন কী দাঁড়িয়ে আছে।

মন্দির নাকি!

আনন্দ নানা জায়গায় ঘোরাফেরা করেছে, দেখেছে অনেক কিছু। সে বলল, "মন্দির নয়, ভাঙা রথ।"

"রথ!"

"নীচে দুটো চাকা দেখছিস না!"

"পাথরের চাকা। এখানে কোনও সময়ে নিশ্চয় কোনও যুদ্ধটুদ্ধ হয়েছিল।"

"এই পাথুরে জায়গায় যুদ্ধ!"

"রথ দেখে তাই মনে হচ্ছে। কোন বইয়ে যেন পড়েছি, আগেকার দিনে কোনও-কোনও রাজারাজড়া যুদ্ধে জিতলেই একটা রথ বানিয়ে রেখে যেতেন। যুদ্ধজয়ের চিহ্ন। বিজয়রথ রে ভাই!" বলে আনন্দ হাসল।

কুমারসাহেব বললেন, "না, না, আনন্দ। যুদ্ধ নাও হতে পারে। দু-তিনশো বছর আগেকার কোনও মঠ-মন্দির হতে পারে। পাহাড়ের তলায় পাথর জোটানো সহজ, কাজেই পাথরের তৈরি মঠ-মন্দির গড়ে উঠত।"

আমরা আরও একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। প্রায় যেন চোখের পলকে আলো মরে গেল। অন্ধকার।

দূরে পাহাড়ের ঢাল চলে গিয়েছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। ওধারে অন্ধকার।

কুমারসাহেব বললেন, "চলো, ফেরা যাক।"

টর্চ আমাদের সঙ্গেই ছিল। ফিরে এলাম সাবধানে।

গাড়ির কাছে পৌঁছে দেখি, কখন যে সন্ধে নেমে গেছে বুঝতেই পারিনি। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে।

গাড়ি নিয়ে ফেরাই উচিত ছিল। কুমারসাহেবের খেয়াল হল, আরও একটু এগিয়ে তবে ফিরবেন।

এই সময় বাতাস উঠল। ঝোড়ো বাতাস নয়, আমাদের বাংলাদেশে শরৎকালের সন্ধের বাতাসও নয়। এই বাতাস কেমন গা শিরশির করানো। অনেকটা হেমন্তকালের মতন। হেমন্তকালের মতনই হালকা কুয়াশাও যেন গাছপালার ডালে-পাতায় ঝোপে-ঝাড়ে জমে উঠছিল।

আমরা ফিরেই আসছিলাম, হঠাৎ এক শব্দ কানে গেল।

আনন্দই প্রথমে খেয়াল করেছিল। "কীসের শব্দ না ?"

আমরা কান পাতলাম।

সত্যিই একটা শব্দ। মাটিতে নয়, আশেপাশে নয়, আকাশে।

আকাশের কোনও কোণ থেকে শব্দটা আসছিল।

"এরোপ্লেন ?"

"কই, কোথায় ?"

প্লেন হলে কি অনেক দূরে আছে ? এত মৃদু শব্দ !

আকাশে তারা ফুটে উঠতে শুরু করেছিল।

কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, "প্লেনের তলায় তো দুটো আলো থাকে দেখেছি, লাল আর সবুজ, মিটমিট করে জ্বলে, তারার মতন। আলো কই ?"

আলোর কোনও চিহ্ন নেই। শুধু তারাই চোখে পড়ে আকাশে।

শব্দটা সামান্য জোর হল। হলেও প্লেনের মতন নয়। ওই শব্দ শুনলে মনে হবে মাথার ওপর ভোমরা উড়ছে যেন।

আশ্চর্য !

কুমারসাহেব তাকিয়ে থাকলেন আকাশের দিকে। আনন্দ বোকার মতন টর্চ ফেলল শূন্যে।

আমার যে কী মনে হচ্ছিল কে জানে !

আনন্দ বলল, "কৃপা, এখন কৃষ্ণপক্ষ না ?"

"হ্যাঁ !" আমি বললাম। কৃষ্ণপক্ষের মধ্যেই আমরা কলকাতা ছেড়ে বেরিয়েছিলাম। পাঁজিপুঁথি পরে আর দেখিনি।

আমার হিসেবে এখন হয় চতুর্দশী বা অমাবস্যা। ত্রয়োদশী হতে পারে। চতুর্দশী বলেই মনে হল।

কুমারসাহেব আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বললেন, "শব্দটা পাহাড়ের দিকে।"

"মানডিগড়ের দিকে ?"

"হ্যাঁ, ওইদিকেই।"

"কীসের শব্দ ?"

"প্লেনের। শুনেছি যুদ্ধের সময় এইরকম চুপচাপ জাপানি প্লেন আসত বহুত উঁচু দিয়ে আমাদের বর্ডার এরিয়ায়।"

"এ তো আর জাপানি প্লেন নয় !"

"না।"

"তবে ?"

কুমারসাহেব সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "আমাদের প্লেন। মাস্ট বী আওয়ার প্লেন। ওই মিলিটারি বেস্‌টায় আসছে।"

"মানডিগড়ে !"

"শিওর।"

"আলো নেই কেন ?"

"কী জানি !"

"এ যেন সার, লুকিয়ে চুপিচুপি আসা !"

"হ্যাঁ।"

"নামবে কেমন করে ?"

"নীচে— মাটিতে কোনও আলো দেওয়া আছে নামার জন্যে। আমরা দেখতে পাচ্ছি না।"

কথাবার্তার মধ্যেই আচমকা আমাদের চোখে পড়ল— মিহি একটা আলো— আবছা জ্যোৎস্নার মতন পাহাড়ের ওপাশে যেন ফুটে উঠল। ওই আলো দেখলে মনে হবে, বৃষ্টির জলকণায় ভেজা একেবারে নরম ধোয়া-ধোয়া চাঁদের আলো।

আমার কেমন গা ছমছম করে উঠছিল। উত্তেজনাও বোধ করছিলাম হয়তো।

শব্দটা ক্রমশ কমে আসতে লাগল।

আমরা উৎকর্ণ হয়ে থাকলাম।

এক সময় সবই নিস্তব্ধ। শুধু ঝিঁঝি ডাকছিল গাছপালার আড়ালে।

এগারো

পরের দিন খানিকটা বেলায় একটা লরি এসে থামল ধর্মশালায়। পাঁড়েজি হাঁকডাক শুরু করল লরি দেখে। ধর্মশালা মেরামতির মালপত্র এসেছে এক খেপ। মিস্ত্রি-মজুর আসেনি। পরে আসবে। অন্য লরিতে আরও মাল আসার সময়।

লরিঅলার সঙ্গে লোক ছিল একজন, খালাসির মতন। পাঁড়েজি, লালা, ড্রাইভার আর খালাসি মিলে মালপত্র নামাতে লাগল। দেখলাম, অ্যাসবেসটাস শিট নামল গোটা দশেক, লোহার অ্যাংগল গোটা পাঁচেক, কাঠকুটো সামান্য, ফেন্সিংয়ের মামুলি তার, কয়েক বস্তা সিমেন্ট।

আমাদের অবশ্য লরি নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও দরকার ছিল না।

কুমারসাহেব আজ সকাল থেকেই বড় অস্থির হয়ে পড়েছেন। কালকের ঘটনার পর থেকেই তিনি উত্তেজিত। আজ যেন তিনি আরও উত্তেজিত, অস্থির।

আখলা গেল গাড়ি নিয়ে সেই বাস রাস্তার মোড়ে, তেলের বড় ক্যান আনতে। একটা ক্যানের তেল সে গাড়িতে ঢেলে নিয়ে ফাঁকা ক্যানটা আবার বাসে চাপিয়ে দেবে। ছোট একটা ক্যান গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে ফিরে আসবে। বলা যায় না, কখন পথেঘাটে তেল ফুরিয়ে যায়! কুমারসাহেব এসব ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানী। ব্যবস্থা পাকা করেই এসেছেন আগে।

হঠাৎ দেখি কুমারসাহেব লরি ড্রাইভারের সঙ্গে গাছতলায় দাঁড়িয়ে কী কথাবার্তা বলছেন!

আনন্দ আর আমি— আমরাও কালকের ঘটনার পর রীতিমতন চঞ্চল হয়ে পড়েছি। কী যে ঘটল কাল, যা দেখলাম তা সত্যি, না, চোখের ভুল, না কি আমাদেরই ভ্রম— তা যেন সারা রাতই ভেবেছি। চোখের ভুল যে নয়— তা তো ঠিকই। একজনের ভুল হতে পারে— বাকিদের হয় কেমন করে!

আনন্দ এই ক'দিন হাসিঠাট্টা করে বলত, "দ্যাখ কৃপা— ওই মহাশূন্য থেকে দু-চারটে চাকতি উড়তে-উড়তে পৃথিবীতে চলে এল— এই গ্যাঞ্জাসটা ওদেশেই প্রথম আমদানি হয়েছে। আমরা বাবা ওতে ছিলাম না।"

আনন্দ ঠাট্টা করে গাঁজাখুরিকে 'গ্যাঞ্জাস' বলত। খুবই অবাক ব্যাপার, কালকের ঘটনার পর সে আর হাসি-তামাশা করছে না। কেমন যেন জব্দ হয়ে গিয়েছে।

কুমারসাহেবও বলতে পারছেন না, কালকের ঘটনাটা কী হতে পারে! অনুমান করছেন, রহস্য নিশ্চয় কিছু আছে। সেই রহস্য বড়দার কথামতন কতটা যথার্থ, তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

বেলা বাড়তে লাগল।

আখলা ড্রাইভার সময় মতন চলে গিয়েছিল তেলের ক্যান আনতে। ফিরেও এল।

কুমারসাহেব বললেন, "আমরা বিকেলের গোড়াতেই বেরিয়ে পড়ব। আজ আমাদের অন্য পথে যেতে হবে।"

লরি ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে কুমারসাহেব এদিকের পথঘাটের খবরও কিছু নিয়ে নিয়েছিলেন।

বিকেলের শুরুতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

আজ আমরা নানান ব্যবস্থা করে বেরিয়েছি। ধরেই নিয়েছি, অনেকটা রাস্তা যেতে হবে, ঘুরতে হবে, সন্ধে তো হয়ে যাবেই, রাতও হতে পারে, আবার বলা যায় না, মাঝরাত পর্যন্ত হয়তো আমাদের বনে-জঙ্গলে কাটাতে হল।

পোশাক-আশাক যেমনই হোক, অন্য ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই। খাবার-দাবার, জল, আলো, নেহাত বিপদে পড়লে ব্যবহার করা যায় এমন দু-একটি লাঠি, আনন্দর

সেই গুপ্তি-ছড়ি, খানিকটা দড়িদড়া— যা হাতের কাছে জুটেছে জড়ো করে বেরিয়ে পড়েছি আমরা।

ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে এবারে একেবারে উলটো রাস্তা।

আসলে কুমারসাহেব বুঝে নিয়েছেন, ঘুরপথে না গেলে ওই জায়গাটিতে আমরা পৌঁছতে পারব না। মানে, যেসব বাধা আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে— তা সরাসরি পথে কিছুতেই ডিঙনো যাবে না। ঘুরপথে, পাহাড়ের ওপাশ থেকেই একমাত্র যাওয়া যেতে পারে।

গাড়ি প্রথমে বাস রাস্তায় এল। তারপর বাস রাস্তা ধরে উত্তরের দিকে এগোতে লাগল।

কুমারসাহেব বললেন, "মাইল সাতেক রাস্তা পেরিয়ে একটা ছোট গাঁ দেখা যাবে। সেই গাঁ ছাড়িয়ে দেড়-দু' মাইল এগিয়ে গেলে বাঁ হাতি পথ। পাহাড়ি রাস্তা। সেই পথই ঘুরতে-ঘুরতে কখন এক সময় ওপাশে চলে গিয়েছে পাহাড়ের। সেই পথ ধরেই এগোতে হবে।"

আনন্দ বলল, "লরিঅলা কি কিছু পথের হদিস দিয়ে গিয়েছে নাকি !"

কুমারসাহেব বললেন, "খানিকটা।"

আমাদের ট্রেকার গাড়ি চমৎকার ছুটছিল। আজকের আবহাওয়া পরিষ্কার। আকাশে মেঘ নেই। পড়ন্ত বিকেল ফুরিয়ে আসছিল ক্রমশ। আলো ছিল তখনও। হাওয়া দিচ্ছিল এলোমেলো। আশপাশের মাঠ, জঙ্গল, গাছপালা দেখতে-দেখতে ঝাপসা হয়ে আসছে।

কুমারসাহেব নজর করে রাস্তা দেখছিলেন। ড্রাইভারকে বলছিলেন, কোথায় কখন মোড় নিতে হবে।

একসময় আমরা পাহাড়ি পথের খানিকটা বেড় দিয়ে সত্যি-সত্যি ওপাশে পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের। এক পাহাড়ি নদীও চোখে পড়ল। চওড়া বেশি নয়, পাথরে ভর্তি, কিন্তু বর্ষার জল পেয়ে বয়ে চলেছে।

গোধূলি নেমে গেল।

দেখার মতন দৃশ্য। আকাশের একপ্রান্ত রাঙিয়ে সূর্য ডুবছে। কী বিশাল দেখাচ্ছিল সূর্যটাকে। আর কী গাঢ় লাল।

মনে অন্য চিন্তা, গোধূলির শোভা দেখার সময় তখন নয়।

যেতে-যেতে ঝাপসা অন্ধকার নেমে এল।

আরও খানিকটা এগিয়ে গাড়ির আলো জ্বালল ড্রাইভার।

দু'দিকে ঢাল। ঝোপঝাড়, জঙ্গল, মাঠ, পাথরের বড়-বড় চাঁই।

আধ মাইলও নয়, খানিকটা এগোতেই আচমকা শব্দ। গুলির শব্দ যেন।

গাড়ি থেমে গেল।

টায়ার ফেটে গেল নাকি ! ফাঁকা জায়গায় শব্দটা কানে লেগেছিল বিকট হয়ে।

আখলা ট্রেকার থেকে নেমে পড়ে চাকা দেখতে লাগল। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।

টর্চ চাইল আখলা।

টর্চের আলোয় চাকাগুলো দেখল ভাল করে। বলল, "টায়ার ঠিকই আছে।"

আবার উঠে বসল আখলা নিজের জায়গায়।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে হেড লাইট জ্বেলে গজ পঞ্চাশ এগিয়েছে কি আবার সেই বিকট শব্দ।

গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল।

কুমারসাহেব বললেন, "মাই গড, গোলি চালাচ্ছে।"

গুলি চালাচ্ছে! কে? কেন?

আমরা কিছু বলার আগেই কুমারসাহেব বললেন, "গেট ডাউন। মাথা বাঁচাও। গাড়ির পাশে বসে পড়ো।"

আমরা লাফিয়ে নেমে পড়লাম। হতভম্ব। ভয়ে বুক কাঁপছে। বুঝতেই পারছি না, হঠাৎ এখানে কে বা কারা গুলি চালাবে! কেনই বা! এদিকে কি ডাকাত-টাকাত আছে!

কুমারসাহেবও নেমে পড়েছিলেন। ড্রাইভারও।

আমরা গাড়ির আড়ালে গা-মাথা লুকিয়ে বসে থাকলাম।

আনন্দ বলল, "কুমারসাহেব! কারা গুলি চালাচ্ছে?"

কুমারসাহেব নিজেই বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। বললেন, "বুঝতে পারছি না। আমাদের কাছে বন্দুকও নেই যে জবাব দেব।"

আমি বললাম, "ডাকাত নাকি?"

"ডাকু! এখানে! না ...!"

আচমকা কিছু ঘটলে এমনিতেই মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে যায়। এ তো আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা। একেবারে নির্জন নিস্তব্ধ পাহাড়তলির পাথুরে রাস্তায় আমাদের মাথার ওপর দিয়ে যদি গুলি উড়ে যায় আমাদের বুদ্ধি যে লোপ পাবে তাতে আর সন্দেহ কী!

কুমারসাহেব কী ভেবে ফিসফিস করে ড্রাইভারকে বললেন যে, ও কি চুপি-চুপি গাড়িতে উঠে বসতে পারবে! যদি পারে, গাড়িটাকে হয়তো পিছিয়ে আনা যায়। দশ-বিশ গজ যতটা সম্ভব।

আনন্দ বলল, "তাতে লাভ কী?"

কুমারসাহেব বললেন, "লাভ, আমরা পিছু হটার চেষ্টা করতে পারব।"

"গাড়ি স্টার্ট করলেই শব্দ হবে, কুমারসাহেব।"

আমাদের কোন দিকে, কতটা দূরে, রাস্তার পাশে ঢালুতে বন্দুকবাজরা আছে কে জানে! অন্ধকারও ঘন হয়ে এসেছে। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী বা অমাবস্যা আজ। গতকালই সঠিক করে বুঝতে পারিনি কোন তিথি। আজ মনে হচ্ছে, গতকাল চতুর্দশীই ছিল। আজ অমাবস্যা। অন্ধকারে আশপাশ ভাল করে ঠাওর করাই যাচ্ছে না এখন।

আখলা গুঁড়ি মেরে-মেরে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

কুমারসাহেব বললেন, “সরে যাও, গাড়ি ব্যাক করবে।”

আমরা সরে গেলাম হামাগুড়ি মেরে।

গাড়িতে স্টার্ট দিল আখলা। শব্দ হল। এই শব্দ কি চাপা দেওয়া যায় এই ফাঁকায়!

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে আবার গুলির শব্দ। মাটিতে শুয়ে পড়লাম আমরা। আখলা ভয় পেয়ে নিজের থেকেই গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিল।

মড়ার মতন পড়ে আছি আমরা মাটিতে। হঠাৎ শুনি পায়ের শব্দ। কে যেন কড়া গলায় বলল, “স্টপ। ডোন্ট মুভ।”

মুখ তুলে দেখি, কোন আড়াল থেকে দুই মূর্তিমান যমদূত যেন হাজির হয়ে গিয়েছে। হাতে রাইফেল। একেবারে মিলিটারি মার্কা ইউনিফর্ম।

আমাদের ওরা দাঁড়াতে বলল রুক্ষ গলায়।

হুকুম মতন উঠে দাঁড়ালাম। ভয়ে হাত-পা কাঁপছে।

ওদের মধ্যে একজন আকাশের দিকে রাইফেলের নল তুলে ফায়ার করল। ভয় দেখাল আমাদের। মনে হল, আগেও যেন ওরা একই ভাবে ফায়ার করেছিল, আমাদের গাড়িটাকে দাঁড় করাতে।

ওদের কাছে টর্চ ছিল। জোরালো আলো। আলো জ্বেলে মুখ দেখল আমাদের। গাড়ি দেখল।

একজন অন্যজনকে বলল, গাড়িটা একবার দেখে নিতে।

যাকে বলল, সে তার টর্চ জ্বেলে আমাদের ট্রেকারের ভেতরটা দেখতে লাগল।

“হু আর ইউ?”

কুমারসাহেব বললেন, “আমরা নিরীহ সাধারণ মানুষ, এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম।”

“কাঁহা? কীধার?”

আমরা কোথায় যাচ্ছিলাম দু-চার কথায় কী বোঝাবেন কুমারসাহেব! তবু বললেন; সব কথা ভাঙলেন না।

আমাদের সামনে যে দাঁড়িয়ে ছিল, কথা বলছিল, সে বলল, এই রাস্তাটা পাবলিকের জন্যে নয়। আমরা কি অন্ধ? রাস্তার শুরুতেই যে বোর্ড দেওয়া আছে, লেখা আছে বড়-বড় হরফে— সেগুলো কি আমরা নজর করিনি?

সত্যি আমরা নজর করিনি। কেন করিনি কে জানে! এত বড় ভুল কেমন করে হল?

আমাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না ওর।

গাড়ির কাছ থেকে অন্য মিলিটারি ফিরে এল। দু'জনে কী কথা হল কে জানে!

তারপর যা ঘটল— আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।

আমাদের গাড়িতে গিয়ে বসতে বলল লোকটি।

হিন্দিতে বলল, তোমরা গাড়িতে গিয়ে বসো। মুখ নিচু করে বসবে। ঘাড়

তুলবে না ; আশপাশে তাকাবার চেষ্টা করবে না। করলে তোমাদের ওপর বাধ্য হয়ে গুলি চালাতে হবে। যাও, গাড়িতে উঠে বসো। তোমাদের ড্রাইভারও বসে থাকবে, গাড়ি চালাবে না। গাড়ি আমরা চালাব।

হুকুম মতন আমরা গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। ঘাড়-মাথা নিচু করে না বসে উপায় কী ! মুখের সামনে রাইফেল হাতে মিলিটারি। অন্যজন গাড়ির স্টিয়ারিং ধরল।

কী যে ঘটছে আমরা যেন অনুভবই করতে পারছিলাম না। বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। ভয়ে গলা কাঠ। বুক কাঁপছিল। ধকধক শব্দটাও শুনতে পাচ্ছিলাম।

কুমারসাহেব যা অনুমান করেছিলেন— সেটাই তবে ঠিক। এদিকে মিলিটারিদের কোনও ব্যাপার আছে তা হলে ! কী— তা অবশ্য অনুমান করা সম্ভব নয়।

হেড লাইট জ্বালিয়ে ট্রেকারটা ছুটছিল তা তো বোঝাই যায়। কিন্তু কোথায় চলেছে কে জানে !

কুমারসাহেব কিছু যেন বলবার চেষ্টা করলেন একবার। ধমক খেলেন সঙ্গে-সঙ্গে, "বাত মাত বোলো।"

আনন্দ পা ঘষছিল গাড়ির মেঝেতে, ধমক শুনে তার পা স্থির হয়ে গেল।

ঠিক কতক্ষণ গাড়ি চলল বলতে পারব না। বিশ-তিরিশ মিনিট হতে পারে। বেশিও হতে পারে। তারপর আমরা যেন অন্য কোনও অজানা অচেনা জায়গায় এসে পড়লাম।

আলো জ্বলছে, কিন্তু অনুজ্জ্বল। একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিল। মনে হয় বড় কোনও ডায়নামো চলছে কোথাও।

ফটকে গাড়ি দাঁড়াল বোধ হয়। কী কথা হল গার্ডদের সঙ্গে। গাড়ি এগিয়ে গেল আবার। সামান্য এগিয়েই থেমে গেল।

হুকুম হল, গেট ডাউন।

আমরা নেমে এলাম।

বারো

একটা ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল।

ঘরটা ছোট। দুটি জানলা। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র নেই। শুধু কয়েকটা ক্যাম্প খাট পড়ে রয়েছে। আর কাঠের একটা চেয়ার।

লোক দুটো আমাদের কিছুই বলল না। কেন আমাদের ধরে আনা হল, এই জায়গাটাই বা কোন জায়গা, কতক্ষণ আমাদের থাকতে হবে এখানে, কারও সঙ্গে দেখা করতে হবে কিনা—কিছুই জানাল না। শুধু হুকুম করল, এখানে অপেক্ষা করো। হুকুম দিয়ে তারা বাইরে চলে গেল, বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজা।

আমরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। যদিও ধারণা করতে পারছিলাম না ব্যাপারটা

কী, তবু অনুমান করছিলাম, আমাদের সন্দেহ করে গ্রেফতার করা হয়েছে। থানা আমি দেখেছি, থানার লকআপও আমার বাইরে থেকে দেখা। এটা থানা নয়, লকআপ কুঠরির চেহারাও এই ঘরের নয়, তা সত্ত্বেও বোঝা যায়—আমরা এখন নজরবন্দি।

সমস্ত ঘটনাটাই এমন আকস্মিক যে, আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে বোঝার চেষ্টা করব, কী ঘটল—তার সুযোগও পাইনি। কেমন করে পাব ! গাড়িতে মাথা হেঁট করে বসে থাকতে হয়েছে, কথা বলতে দেওয়া হয়নি। মিলিটারি-মার্কা যমদূতের রাইফেলের গুলি খেতে কার সাধ যায় !

ঘরে আসার পর কিছুক্ষণ আমরা কথাও বললাম না ভয়ে-ভয়ে। বাইরে তো গার্ড আছে। পায়ের শব্দ পাচ্ছিলাম। গলাও শোনা যাচ্ছিল।

কুমারসাহেব তাঁর হাতঘড়ি দেখলেন। মাথা চুলকে খাটো গলায় বললেন, "পাস্ট সিক্স থার্টি। আমাদের কতক্ষণ ওয়েট করাবে ?"

আনন্দ মাথা নাড়ল। হতাশ গলায় বলল, "জানি না।"

ঘরে বাতি জ্বলছিল। ইলেকট্রিক আলো। তবে কমজোরি। মেটে হলুদ রং আলোর।

আমি বললাম, "কুমারসাহেব, আমরা তো অ্যারেস্ট হয়ে গেলাম।"

"হ্যাঁ।"

"কী হবে এখন ?"

"দেখা যাক... !"

আনন্দ বলল, "পুলিশের হাতে পড়লেও কথা ছিল, এ একেবারে মিলিটারি ! ছেড়ে কথা বলবে না।"

কুমারসাহেব বললেন, "এরা মিলিটারি, না, প্যারা মিলিটারি ?"

"ওই একই হল !" আনন্দ বলল, "ওরা যাই হোক, আমাদের কী হবে ?"

আখলাকেও আমাদের সঙ্গে একই ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে বোকার মতন একপাশে মাটিতে বসে ছিল।

আমি বললাম, "কুমারসাহেব, আমরা কোনও অন্যায় করিনি। দোষ বলতে শুধু ওই প্রোটেক্টেড রাস্তায় এসে পড়েছিলাম। ভুল করে। তার জন্যে এই ঝঞ্ঝাট !"

কুমারসাহেব কিছু বললেন না, জানলার কাছে সরে গিয়ে বাইরের দিকটা দেখার চেষ্টা করছিলেন। জানলাগুলো ছোট। ব্যারাকবাড়ির জানলার মতন দেখতে। কাচের শার্সি আঁটা। কোনও গরাদে শিক নেই জানলার। তা বলে জানলা টপকে আমরা যে পালাব—তার কোনও উপায় নেই। পালাবার আগেই গুলি খেয়ে মরতে হবে।

দেখতে-দেখতে সাতটা, সাড়ে সাতটা বেজে গেল। কেউ আমাদের ডাকতে এল না, কথা বলতেও নয়।

সময় যত যাচ্ছিল ততই আমাদের ভয়, উদ্বেগ বাড়ছিল। গলা শুকিয়ে কাঠ। এইভাবেই কি আমাদের রাত কাটাতে হবে ? বাইরের কাউকে কি ডাকা যাবে না ?

জিজ্ঞেস করা যাবে না কিছু ? অন্তত ওরা তো আমাদের জলের বোতলগুলো এনে দিতে পারে !

কুমারসাহেবকে বললাম, "সার, একটু জলের ব্যবস্থা না হলে মরে যাব। বুক ফেটে যাচ্ছে !"

আনন্দরও তেষ্টা পেয়েছিল।

কুমারসাহেব কী ভেবে দরজার কাছে গিয়ে ধাক্কা মারলেন দরজায়। জোরে অবশ্য নয়।

দরজা খুলে গেল। বাইরের লোকটির মুখ আমরা দেখতে পেলাম না।

গলা বাড়িয়ে কুমারসাহেব জলের কথা বললেন।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সামান্য পরে একজন স্টিলের জগ আর কাচের দুটো গ্লাস এনে দিল আমাদের। বেঁটেখাটো চেহারা, পরনে খাকি রঙের পাজামা, গায়ে ঢলঢলে গেঞ্জি। তাকে দেখলে ক্যান্টিন বয় বলে মনে হয়। সে একা আসেনি। সঙ্গে এক গার্ড।

ওরা চলে গেল।

আমরা জলের জগটা প্রায় শেষ করে ফেললাম।

আটটাও বেজে গেল।

না, আজ আর ছাড়া পাওয়ার উপায় নেই। কেউ আসছে না, কিছু জানতেও পারছি না। আমরা কি এইভাবে পড়ে থাকব !

সওয়া আটটা নাগাদ একজন এলেন। দোহারা চেহারা। মিলিটারি পোশাক চড়ানো নেই। পরনে প্যান্ট, গায়ে বুশ শার্ট, পায়ে চটি। বয়েস চল্লিশের বেশিই মনে হল।

কুমারসাহেব নিজেই কী বলতে গেলেন। ভদ্রলোক মন দিয়ে শুনলেন না। বললেন, আজ আমাদের এখানে এইভাবেই থাকতে হবে। কাল সকালের আগে অফিসার কথা বলতে পারবেন না।

"কিন্তু আমরা কোন অপরাধে এই শাস্তি পাচ্ছি ? কী দোষ করেছি যদি বলেন !"

উনি আমাদের কোনও কথাই শুনবেন না। হাসি-হাসি মুখ করে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যেন, বললেন, "ইউ উইল গেট ইওর ফুড হিয়ার। নাউ ডোন্ট আস্ক মি এনি কোশ্চেন।"

ভদ্রলোক চলে গেলেন। অর্থাৎ, তোমরা বাপু আর চেঁচামেচি কোরো না। এখানে খেতে পাবে ; খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো।

কুমারসাহেব রেগে গিয়েছিলেন। গজগজ করতে লাগলেন।

কে আর আমাদের রাগের কথা শুনছে !

আনন্দ বলল, "কৃপা, এমন জানলে কে এদিকে আসত ! জানি না—কাল কী হবে !"

কুমারসাহেব বললেন, "আমাদেরই বোকামি ! এদের রাস্তায় ঢোকার আগে কেন

যে ওয়ার্নিংটা দেখলাম না। একেবারে নজর এড়িয়ে গেল! এখন আর আফসোস করে লাভ নেই। যা হওয়ার হবে।"

আমার মনে হল, রাস্তার মুখে যদি কিছু নজরে আসত—তবু যে আমরা গাড়ি ঘুরিয়ে নিতাম—তা হয়তো নয়। কৌতূহল মানুষকে চুম্বকের মতন টানে। আমরা কি আরও খানিকটা না এগিয়ে এসে থেমে যেতাম! বোধ হয় নয়।

খানিকটা পরেই খাবার এল। রুটি, ডাল, ভাজি, ডিমের কারি।

যারাই আমাদের ধরে এনে থাকুক তারা যে বোধবুদ্ধিহীন নয়, তা বোঝা গেল। রাতের খাবার এভাবে পাওয়া যাবে আমরা ভাবিনি। কিন্তু একরাত উপোসে মানুষ মরে না, আমরা ভেতরে-ভেতরে দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছিলাম।

রাত কাটল।

পরের দিন সকালে হাত-মুখ ধোওয়ার পর এক গ্লাস করে গরম চা পাওয়া গেল। চায়ের সঙ্গে একটা করে গোল বিস্কিট। সুজির বিস্কিটের মতন খেতে।

এরই মধ্যে বাইরে বেরিয়ে হাত-মুখ ধোওয়ার সময় আমরা আশেপাশে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছি, জায়গাটা চারদিক দিয়ে আড়াল করা। গাছপালা কম নেই, ব্যারাক বাড়িও নজরে পড়ে। জলের ট্যাঙ্ক আছে, যদিও মাথায় উঁচু নয়, সরু-সরু রাস্তা, পাথর-নুড়ি ছড়ানো; একটা জিপগাড়িও চোখে পড়ল, পাশেই মোটরবাইক—মিলিটারি বাইক যেমন দেখতে হয়—সেইরকম।

অপেক্ষা করে আছি কখন আমাদের ডাক পড়বে।

সওয়া আটটা নাগাদ ডাক পড়ল আমাদের। একজন গার্ড এসে নিয়ে চলল অফিসারের ঘরে।

অফিসারের ঘর বলতে দেখি, ছোট একটা ঘর। মাথায় কাঠের সিলিং। দেয়ালেও কাঠের প্যানেল। গায়ে রং করা। মেঝে মামুলি। পাখা, আলো, চেয়ার আর বড় একটা টেবিল ছাড়া সে-ঘরে আর কোনও আসবাব নেই।

অফিসার আমাদের দেখলেন।

ভদ্রলোককে দেখতে সুন্দর। বয়েস হয়েছে। পঞ্চাশ হবে। পরনে সাদা প্যান্ট। গায়ে সাদা বুশ শার্ট। মিলিটারির কোনও নামগন্ধ নেই পোশাকে।

ওঁর মুখ দেখে মনে হয় বড় সাদাসিধে সরল মানুষ। হাসি-মাখা দৃষ্টি।

নিজের পরিচয় দিয়ে অফিসার বললেন, তাঁর নাম এন. কাওলা। মেজর কাওলা।

কথাবার্তা শুরু হওয়ার আগে একজন আরদালি গোছের লোক একটা যন্ত্র এনে টেবিলের ওপর রাখল। যন্ত্রটা দেখতে অনেকটা টাইপ রাইটার মেশিনের মতন। কিন্তু টাইপ মেশিন নয়। চারদিক ঢাকা, হয় কাচে, না হয় ফাইবার গ্লাসে। মেশিনটা ঝকঝক করছিল। মেশিনের প্লাগের সঙ্গে টেবিলের আড়ালে রাখা ইলেকট্রিক পয়েন্টের কানেকশান করে দিয়ে সে চলে গেল।

কাওলাসাহেব মেশিনের বোতাম টিপে কী যেন দেখে নিলেন।

ওটা কীসের যন্ত্র আমরা বুঝতে পারছিলাম না। লাই ডিটেকটার, টেপ রেকর্ডার, না আরও জটিল কিছু!

একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম। কাওলাসাহেবের দিকে যন্ত্রটার মুখ। সেখানে নিশ্চয় কোনও আলো জ্বলার ব্যবস্থা আছে। নয়তো যন্ত্রটা চালু করার সঙ্গে-সঙ্গে সবুজ একটা হালকা আভা কেন ছড়িয়ে পড়বে, আর কাওলাসাহেবের ধবধবে সাদা জামার ওপর তার ফিকে রংই বা কেন দেখা যাবে!

কথাবার্তা শুরু হল।

প্রথমেই কুমারসাহেব। তিনি নিজের পরিচয় ও কাজকর্মের কথা জানিয়ে—আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার বৃত্তান্ত জানালেন। তারপর আমরা কেন, কবে থেকে এই মানডিগড়ের আশেপাশে ট্রেকার নিয়ে ঘোরাফেরা শুরু করেছি—তাও বললেন। কোনও কথাই লুকোলেন না। শেষে বললেন, কাল ভুল করে এই প্রোটেক্টেড রাস্তায় চলে এসেছিলেন।

কাওলাসাহেব একটিও কথা বলছিলেন না। মেশিনের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন, কদাচিৎ চোখ তুলে কুমারসাহেবকে দেখছিলেন।

কুমারসাহেবের পর আমার পালা।

নিজের পরিচয় ও ঠিকানা জানিয়ে কাজকর্মের কথা বললাম। তারপর বড়দার ডায়েরির কথা। কেন আমি আমার বন্ধু আনন্দকে নিয়ে এতদূরে ছুটে এলাম—এখানে এসে যা-যা ঘটেছে, কোনও কথাই বাদ দিলাম না।

আমার পরে আনন্দ।

শেষে আখলা।

আখলা গাড়ির ড্রাইভার, কুমারসাহেবের গাড়ি চালায়। মনিব তাকে যেখানে যেতে বলেন সে যায়। তার বেশি তার আর বলার কী থাকতে পারে! আমাদের সঙ্গেই এই ক'টা দিন সে ঘুরছে।

আমাদের কথা শেষ হল।

আখলাকে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বললেন কাওলাসাহেব।

সে চলে গেল।

সামান্য সময় চুপচাপ থাকার পর কাওলাসাহেব বললেন, আমরা যা বলেছি তা চেক না করে আমাদের ছাড়া যাবে না।

কুমারসাহেব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "মেজর, উই আর নট লায়ার্স।"

"মে বি! লেট আস চেক ইট। হোয়ার ইজ দ্য ডায়েরি?"

ডায়েরি কি আমি সঙ্গে করে এনেছি! সে তো ধর্মশালায় আমার ব্যাগের মধ্যে পড়ে আছে। বললাম সে-কথা।

ইংরিজি-হিন্দি মিশিয়ে আমরা কথা বলতে লাগলাম। বাংলা করলে সেগুলো এইরকম দাঁড়ায়:

"একটা ডায়েরিতে কী লেখা আছে সেটা সত্যি-মিথ্যে যাচাই করতে আপনারা

এখানে এসেছেন ?”

“না সার, যাচাই করতে আসিনি। আমার দাদার কী হয়েছে জানতে এসেছি।”

“এতদিন পরে ?”

“আমি ডায়েরিটা সবে পেয়েছি কলকাতায়।”

“তখন কি আপনার মনে হয়নি, এতদিন যার খোঁজ পাওয়া যায়নি, সে হয়তো মারা গিয়েছে !”

“মনে হয়েছে।”

“তা হলে কেন এসেছেন ?”

“সার, সঠিক করে জানতে এসেছি—আমার দাদার কী হল ?”

“এভাবে জানা যায় না। ....আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু ডায়েরি দেখতে চাই। মুখের কথায় আমরা বিশ্বাস করি না।”

“নিশ্চয় দেখতে পারেন। কিন্তু সার, ওটা বাংলায় লেখা।”

“আমাদের এখানে বাঙালি অফিসার আছেন। ডক্টর সান্যাল। তিনি ডায়েরি দেখবেন।”

“ইয়েস সার।”

“একটা কথা আপনাদের মনে করিয়ে দিই। আমাদের পেট্রল পুলিশ আছে। মিলিটারি পুলিশের মতন। তারা রাস্তাঘাট টহল দেয়। কাল দু'জন পেট্রল পুলিশ টহল দিতে বেরিয়েছিল। তাদের মোটরবাইক রাস্তায় বিগড়ে যায়। ওরা সেটা মেরামতের চেষ্টা করছিল—এমন সময় আপনাদের গাড়ির শব্দ পায়। তারপর দেখে একটা ট্রেকার আসছে।”

কুমারসাহেব আমার দিকে তাকালেন। পেট্রল পুলিশের মোটরবাইক আমরা কাল দেখতে পাইনি। বোধ হয় রাস্তার পাশে গাছের আড়ালে ছিল, বা ঢালের নিচে। দেখলে নিশ্চয় গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিতাম।

“আপনারা যে আমাদের এই মোস্ট সিক্রেট জোনের ওপারে ক'দিন ধরে ঘোরাফেরা করছেন—আমরা জানি। ওয়াচ টাওয়ার থেকে সেনট্রিরা দেখেছে। রিপোর্ট করেছে। আপনাদের সম্পর্কে আমরা খোঁজখবর না করে ছেড়ে দিতে পারি না।”

“আমাদের আপনি সন্দেহ করেন ? কীসের সন্দেহ ?”

“সরি, এখন আর কিছু বলা যাবে না। আমাদের লোক ওই ধর্মশালায় যাবে। আপনাদের মালপত্র নিয়ে আসবে সেখান থেকে। আপনারা কেউ যেতে পারবেন না।”

“সার, আমরা না গেলে পাঁড়েজি মালপত্র দেবে কেন ?”

“ওটা আমাদের দেখার ব্যাপার।” কাওলাসাহেব হাসলেন, “যান, আপনারা নিজেদের ঘরে যান। ...না, না, ঘাবড়াবেন না, এখানে আপনাদের থাকা-খাওয়ার জন্যে ভাল ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেন্টেলমেন, আপনারা আমাদের অতিথি। আশা করি, ভালই লাগবে জায়গাটা।” উনি হাসলেন।

তেরো

কাওলাসাহেব যে আমাদের সঙ্গে তামাশা করেননি, খানিকটা পরে সেটা বোঝা গেল।

রাত্রে যে-কুঠরিতে আমরা ছিলাম সেখান থেকে আমাদের অন্য এক ঘরে বদলি করা হল। এই ঘরটাকে কুঠরি বলা যাবে না। তিনটে লোহার খাট পাতা, তার ওপর বিছানা। বিছানা অবশ্য মামুলি। লোহার গোটা দুয়েক চেয়ার। দেয়ালে ব্র্যাকেট, জামাটামা ঝুলিয়ে রাখার জন্য। একটা আয়নাও ঝোলানো রয়েছে। এই ঘরের জানলাগুলো সামান্য বড়। জানলায় নেট লাগানো।

ঘরের লাগোয়া স্নানের ব্যবস্থা। কল আছে। এমনকি শাওয়ারও।

আখলাকেও আমাদের পাশাপাশি এক লম্বাটে খুপরিতে থাকতে দেওয়া হল।

থাকার ব্যবস্থা তো ভাল। খাট বিছানা পেতে এভাবে কে থাকতে দেবে এই বনেজঙ্গলে।

দুপুরে খাওয়ার আয়োজনটাও খারাপ দেখলাম না। ভাত, রুটি, ডাল, সবজির ঘ্যাঁট, ছোট-ছোট বাটিতে মাংসের টুকরো, কাঁচা পেঁয়াজ! কুমারসাহেব মাংস খান না। তিনি তাঁর ভাগটা আমাদের বিলিয়ে দিলেন।

কী জানি কেন, কাল যেরকম ভয় পেয়েছিলাম, দুর্ভাবনায় মরে যাচ্ছিলাম—আজ সকালের পর তা সামান্য কমে গিয়েছিল। কাওলাসাহেবের ঘর থেকে ফিরে আসার পর যেরকম আদর আপ্যায়নের ঘটা দেখছিলাম এদের—তাতে মনে হল, আর যাই হোক এরা মানুষ খারাপ নয়। অতিথি-সেবা তো ভালই হচ্ছে। এখন বাকি ঝামেলাটুকু ভালয়-ভালয় মিটে গেলে আমরা বাঁচি! কাওলাসাহেবের কথা থেকে মনে হয়েছে, আমরা কোনও মন্দ অভিসন্ধি নিয়ে ঘোরাফেরা করিনি—এটা জানতে পারলে তিনি আমাদের ছেড়ে দেবেন।

এইসব কারণেই মন খানিকটা হালকা লাগছিল। আমরা ধরেই নিচ্ছিলাম, আজ বিকেল বা বড়জোর কাল সকালে ছাড়া পেয়ে যাব।

দুপুরের পর একজন আরদালি এল। এসে একটা কাগজ দিল। বলল, সই করতে। কাগজটা অফিস-মেমোর মতন দেখতে। তাতে আমাদের নামধাম লেখা। গতকাল যে আমাদের ধরে আনা হয়েছে তাও লেখা রয়েছে দেখলাম। সই করে দিলাম আমরা। আরদালি চলে গেল।

আনন্দ বলল, "বাইরে একটু ঘুরতে পারলে হত! যতই খাতির দেখাক, বেটারা আমাদের নজরবন্দি করে রেখেছে।"

কুমারসাহেব বললেন, "বাইরে ঘুরতে দেবে কেন? তুমি সব দেখেশুনে যাবে? এদের পুরো ব্যাপারটাই কত সিক্রেট, দেখছ না!"

"তা তো দেখছি। কিন্তু কীসের সিক্রেট তা বুঝতে পারছি না।"

"সেটা তোমার-আমার বোঝার ব্যাপার নয়।"

আমি বললাম, "কুমারসাহেব, এরা কি ধর্মশালায় গিয়েছে? লোক পাঠিয়েছে?"

"কেমন করে বলব !"

"আমাদের মালপত্রগুলো এলে বেঁচে যাই ! দাদার ডায়েরিটা দেখলে এরা আমাদের কথা বিশ্বাস করবে।"

"করারই কথা। তবে ওদের খেয়াল !"

আনন্দ হঠাৎ বলল, "সার, আমরা বড় ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেলাম। অফিস থেকে মাত্র সাতদিনের ছুটি নিয়ে বেরিয়েছিলাম। সেটা ফুরিয়ে গেল। এখন যদি আরও ক'দিন আটকে থাকতে হয়, আমার চাকরিটা যাবে। কৃপার কোনও ঝামেলা হবে না। ও প্রায় বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়ায়। একটা টুর দেখিয়ে দেবে।"

অফিসের দুশ্চিন্তা আমারও ছিল। কিন্তু কী করব ! আগে কি বুঝেছিলাম, এতরকম ঘটনা ঘটতে পারে !

দেখতে-দেখতে বিকেল হল।

বিকেল আর আজকাল কতটুকু ! শরতের শেষের দিক। হতে না হতেই বিকেল ফুরোয়।

কুমারসাহেব অনেকক্ষণ ধরে কী ভাবছিলেন। হঠাৎ বললেন, "আনন্দ, এরা যদি কাল সকালের মধ্যে আমাদের না ছাড়ে, অন্য ব্যবস্থা করতে হবে !"

"অন্য ব্যবস্থা ?" আমরা অবাক !

"পালাবার উপায় খুঁজতে হবে।"

আমরা আরও অবাক ! "এখান থেকে পালানো ! বলছেন কী, সার ? এখান থেকে মাছি গলতে পারে না, আমরা পালাব ! সেন্‌ট্রি সিকিওরিটি, পেট্রল পুলিশ, বড় ফটক— ! অসম্ভব ! এরা কি এতই আলগা যে, চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে পারব !"

কুমারসাহেব মাথা দোলালেন। "আমি সব জানি। কিন্তু যখন আর কোনও উপায় থাকবে না তখন শেষ চেষ্টা করতেই হবে। প্রিজ্‌ন ক্যাম্প থেকে যুদ্ধবন্দিরা পালাত না ? নাজীদের বন্দিশিবির থেকে জু-রা পালায়নি অনেকে ? অসম্ভব নয় আনন্দ। সম্ভব ! তবে রিস্ক আছে। প্রাণের ঝুঁকি ! তোমরা সে-ঝুঁকি নেবে না হয়তো, নেওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ। আমি জানি, আমরা জেনেশুনে কোনও অন্যায় করিনি। যা বলার সবই বলেছি এদের। এর পরও যদি না ছেড়ে দেয়, তখন আমি একবার ঝুঁকি নেব। যদি মরতে হয়—মরব। উপায় কী ? তা বলে দিনের পর দিন এভাবে পড়ে থাকতে পারব না।"

কুমারসাহেব কথা বলতে-বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। হয়তো হতাশ হয়েই বললেন কথাগুলো।

আমি বললাম, "না কুমারসাহেব, এমন কাজ আপনি করবেন না। আপনি যদি পালাবার চেষ্টা করেন, ওরা আমাদের আরও বেশি সন্দেহ করবে।"

মাথা নাড়লেন কুমারসাহেব। "হাঁ, ও তো ঠিক বাত।"

"দেখি না শেষপর্যন্ত কী হয় ! ধর্মশালা থেকে এদের লোক ফিরে আসুক।"

"ঠিক আছে। ওয়েট অ্যাণ্ড সী।"

সন্ধেবেলায় আমাদের তলব পড়ল।

এবার যে-ঘরটিতে গেলাম সেটি কাওলাসাহেবের ঘর নয়। অন্য ঘর। ঘরের আসবাবপত্র কম। তবে আলমারির সংখ্যা তিন-চার।

যে-ভদ্রলোক টেবিলের ওপাশে বসে ছিলেন তিনি ডক্টর সান্যাল। নিজেই পরিচয় দিলেন। "বসুন।"

আমরা সান্যালসাহেবকে দেখছিলাম। গোলগাল চেহারা, মাথায় চুল কম, চোখে মোটা কাচের চশমা। গোঁফ আছে, দাড়ি নেই।

সান্যালসাহেবের সামনে টেবিলে বড়দার ডায়েরি খাতা পড়ে রয়েছে। তার মানে, ওখান থেকে লোক গিয়ে ধর্মশালা থেকে আমাদের মালপত্র উঠিয়ে এনেছে। কখন—তা অবশ্য আমরা জানি না।

সান্যালসাহেব আমাদের দেখলেন অল্পক্ষণ। হাসিমুখেই বললেন, "কৃপাময় কে ? আপনি ?"

"কৃপাময় না সার, কৃপানাথ। আমি কৃপানাথ।"

"ও ! সরি ! আপনি কৃপানাথ— ! আর এঁরা..."

"আনন্দ, আমার বন্ধু। উনি কুমারসাহেব। এখানে এসে পরিচয় হয়েছে।"

"ওঁকে আমি আগে কোথাও দেখেছি।"

কুমারসাহেব তাকিয়ে থাকলেন। মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। পারলেন না। "ভেরি মাচ সরি, সার। ইয়াদ হচ্ছে না।"

"মে বি, আই অ্যাম রং।...পরে ভেবে দেখব।" বলে সান্যালসাহেব আমার দিকে তাকালেন। "কৃপাময়বাবু—"

"কৃপানাথ, সার।"

"ও, ইয়েস ! কৃপানাথবাবু ! আপনার এই ডায়েরি আমি পড়েছি।"

"ধন্যবাদ সার।"

"আমার অনেক সময় লাগল পড়তে।... ভীষণ হেজি। হ্যাণ্ড রাইটিং, ছোট-ছোট। পড়া যায় না। এর মধ্যে কিছু নোট্স রয়েছে। এটা ডায়েরি নয়।"

"হ্যাঁ, খুচরো নোট...।"

"আপনার দাদার কথা বলুন।"

বললাম বড়দার কথা। বাড়ির কথা। কেমন করে ডায়েরিটা আমার হাতে এল, কেনই-বা আমি আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিবেদীজির কাছে এলাম, সেখানে কুমারসাহেবের সঙ্গে পরিচয়, তিনি আমাদের সাহায্য করতে চাইলেন, তাঁকে নিয়ে আমরা পাঁড়েজির ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়েছি।

আমার কথা শুনতে-শুনতে সান্যালসাহেব চুরুট ধরালেন। কুমারসাহেবকেও এগিয়ে দিলেন চুরুটের বাক্স।

"আপনি তা হলে দাদাকে খুঁজতে এসেছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"এতদিন পর ?"

"আমি তো সবেই জানলাম, দাদা এদিকেই এসেছিল।"

সামান্য চুপচাপ থাকার পর সান্যালসাহেব বললেন, "আই অ্যাম ভেরি মাচ সরি, কৃপানাথবাবু! আপনার পক্ষে খবরটা খুব শকিং হবে। আপনার দাদা কিনা তা আমি জানি না। তবে একটি লোক—ভদ্রলোক—আমাদের ওয়াচ টাওয়ারের সেন্ট্রিদের চোখে পড়ে যায়। ভদ্রলোক সাম্ হাউ, ফেন্সিং টপকে ডিচের কাছে চলে এসেছিলেন। সেন্ট্রিরা গুলি চালায়। ডিচের মধ্যেই তিনি পড়ে যান। শট ডেড।"

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম। মাথা কেমন ফাঁকা লাগল। শ্বাস আটকে গেল গলায়।

"আরদালি?"

সঙ্গে-সঙ্গে লোক ঢুকল ঘরে। সান্যালসাহেব ইশারায় খাবার জল দিতে বললেন।

আরদালি চলে গেল।

আনন্দ আমার পিঠে হাত রাখল। সান্ত্বনা জানাচ্ছিল।

কুমারসাহেব বললেন, "শট ডেড। আর ইউ শিওর?"

"হ্যাঁ। ডেডবডি আমাকেই দেখতে হয়েছে। আমি মেডিক্যাল ম্যান। ডাক্তার। এখানকার চার্জে আছি।"

জল এনে সামনে রাখল আরদালি।

"খেয়ে নে", আনন্দ বলল নিচু গলায়।

জল খেতে-খেতে কী হল কে জানে, গলা আটকে গেল। গ্লাসটা নামিয়ে রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

দাদাকে দেখতে পাব—এমন বিশ্বাস আমার ছিল না। তবু কী জানি কোন ক্ষীণ আশায় ছিলাম—যদি বড়দা বেঁচে থাকে! যদি!...না, এখন আর যদির কিছু নেই। বড়দা এদের গুলি খেয়ে মারা গিয়েছে। লোকগুলোর ওপর ঘৃণা হচ্ছিল, রাগ হচ্ছিল প্রচণ্ড। নিরপরাধ, অসহায়, নিরীহ একটা মানুষকে এরা গুলি করে মেরে ফেলল!

কুমারসাহেব আমাকে সান্ত্বনা দিতে-দিতে বললেন, "কৃপানাথ, তোমার দাদার দুর্ভাগ্য! শান্ত হও।"

সান্যালসাহেব বললেন, "ভদ্রলোক ভুল করেছিলেন। এদের কোনও দোষ নেই। আমাদের এখানে এরকম ঘটনা আরও দু-তিনটে ঘটেছে। টু টেল ইউ ফ্র্যাংকলি—এই জায়গাটা একেবারেই নিষিদ্ধ এলাকা। এখানে কেউ আসতে পারে না। হুকুম নেই।"

"কেন?" কুমারসাহেব বললেন।

"দ্যাট্স সিক্রেট..."

"এটা কি মিলিটারি জোন?"

"না, টেকনিক্যালি তা নয়। তবে প্যারা মিলিটারির কিছু লোককে স্পেশ্যালি

ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। তারাই এখানকার সিকিউরিটির চার্জে।"

"এখানে কী হয়?"

"সরি।"

"এটা কি কোনও ডেঞ্জার জোন?"

"অফকোর্স।...বাট নো মোর কোশ্চেন্স, সার। প্লিজ!"

"ডক্টর সান্যাল, আমরা সাধারণ মানুষ। এখানকার কোনও কথাই জানি না। কেন এখানে এসেছিলাম আপনি সবই শুনেছেন। এর পর..."

"আমি বুঝতে পারছি আপনারা ইনোসেন্ট। কেন ঘোরাঘুরি করছিলেন—তাও বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমার ক্ষমতা নেই আপনাদের ছেড়ে দেওয়ার। ছেড়ে দেওয়ার যিনি মালিক তাঁকে আমার রিপোর্ট দেব। তারপর তিনি যা করার করবেন।"

আমার কান্নার দমক থেমে গিয়েছিল। চোখ মুছলাম। করার কিছু নেই। বড়দার ভাগ্যে এমন মৃত্যু লেখা ছিল, কে জানত! বিদেশ-বিভুঁয়ে গুলি খেয়ে মারা গেল মানুষটা! কী দরকার ছিল তার রহস্যময় জ্যোৎস্না দেখতে আসার!

কুমারসাহেব অধৈর্য হয়ে বললেন, "ছেড়ে দেওয়ার মালিক কে, সার?"

"কেন?"

"কাওলাসাহেব?"

"না। আমরা কেউ নই। মিস্টার পারেখ। কাল তাঁর কাছে আমি আমার রিপোর্ট জমা দেব। তারপর তিনি আপনাদের তলব করতে পারেন। নাও পারেন। তাঁর মরজি।"

"আমরা ছাড়া পাব না?"

"আশা করি, পাবেন।"

আমরা বুঝলাম এবার আমাদের উঠতে হবে।

তিনজনেই উঠে পড়েছি, হঠাৎ সান্যালসাহেব আমাকে বললেন, "আপনারা যান। আপনারা দু'জন। উনি পরে যাবেন। ওঁর সঙ্গে আমার কথা আছে।" বলে কুমারসাহেবকে দেখালেন ইশারায়।

কুমারসাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন।

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বাইরে আসতেই দেখি গার্ড দাঁড়িয়ে আছে।

চোদ্দো

আচমকা আঘাত ও শোক পেলে মানুষ যতটা ভেঙে পড়ে আমি আর ততটা ভেঙে পড়লাম না। বড়দাকে দেখতে পাব— এমন বিশ্বাস নিয়ে আসিনি, কৌতূহল নিয়েই এসেছিলাম এখানে। জানতে এসেছিলাম, বড়দার ঠিক কী হয়েছিল, বা হতে পারে!

সেদিক থেকে জানার আর কিছু বাকি রইল না। দাদা নেই।

আমাদের ঘরে এসে মনমরা হয়ে বসে থাকলাম অনেকক্ষণ। আনন্দ আমায় সান্ত্বনা দিল নানাভাবে।

আখলাকে আমাদের পাশেই কোথাও রেখেছে। জানি না। বিকেলের পর তার সঙ্গে দেখাও হয়নি।

কুমারসাহেব আর ফিরছিলেন না। ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল।

আমাদের দু'জনকে বিদায় দিয়ে কুমারসাহেবকে কেন যে ডাক্তার সান্যাল আলাদাভাবে আটকে রাখলেন— তাও আমরা আন্দাজ করতে পারছিলাম না।

আনন্দ বলল, "তখন শুনলি না? ডাক্তার সান্যাল কুমারসাহেবকে দেখে বললেন, আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি!"

"কোথায় দেখবেন!"

"তা কি আর আমরা জানি। আমরা থাকি কলকাতায়, কুমারসাহেব থাকেন এদিকে! কেমন করে জানব!"

"দূর, আমার বিশ্বাস হয় না। ওই একটা কিছু বলে আটকে রাখল।"

"কেন?"

"হয়তো চেষ্টা করছেন— ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কোনও কথা আদায় করার।"

"আমাদের কোনও কথাই নেই তো আদায় করবে!"

আরও খানিকটা সময় কেটে গেল। আমরা ক্রমশই অস্থির হয়ে উঠছিলাম। উদ্বেগ হচ্ছিল! কুমারসাহেবের ওপর কোনও অত্যাচার হচ্ছে না তো! ভয় হতে লাগল।

এই জায়গাটাই বা এত শান্ত কেন! মানুষজন তো আছে— তবু গলা পাওয়াই যায় না। কদাচিৎ একটা-দুটো কথা ভেসে আসে। গাছপালায় বাতাসের দমকা লাগলে তার মৃদু শব্দও কানে আসে। আর সারাক্ষণ একটা আওয়াজ— ডায়নামো চলার মতন। তবে অত জোর শব্দ নয়, অনেক মৃদু। এখানে নিশ্চয় কোনও ছোট পাওয়ার হাউস আছে। শব্দটা সেখান থেকেই আসছে। পাওয়ার হাউস না থাকলে এই বাতিটাতি জ্বলত না, পাখা চলত না। আমি ছেলেবেলায় এরকম ছোট পাওয়ার হাউস দেখেছি।

শেষপর্যন্ত কুমারসাহেব ফিরলেন।

মানুষটি যেন এই সওয়া-ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টার মধ্যে কেমন বদলে গিয়েছেন। বয়েস হলেও উনি স্বভাবে খানিকটা চঞ্চল ছিলেন, সবসময় নড়াচড়া, হাঁটাচলা করছেন, কথা বলছেন। হাসিখুশি মুখ। হাসাতেও কম যান না। সেই কুমারসাহেবকে দেখলাম, মুখ শুকনো, কপালে ভাঁজ পড়েছে, ঘাম লেপটে গিয়েছে মুখে, গলায়। মনে হল, উনি ভীষণ বিহ্বল হয়ে পড়েছেন।

জল খেতে চাইলেন।

জগে জল ছিল। জল খেলেন। একেবারে চুপ। বসে থাকতে নিশ্বাস ফেললেন বড় করে। তারপর পাশের বাথরুমে চলে গেলেন।

ফিরে এলেন সামান্য পরে। সারা মুখ-ঘাড় ভিজে। মাথার চুলেও জল

ছিটিয়েছেন।

"কী ব্যাপার কুমারসাহেব ?"

"দাঁড়াও !"

কুমারসাহেব পাইপ বের করে তামাক ঠাসলেন। এখনও তাঁর কাছে — পাউচে খানিকটা তামাক আছে।

পাইপ ধরিয়ে ধোঁয়া গিললেন বার কয়েক। শেষে বললেন, "কাল বোধ হয় আমাদের ছেড়ে দেবে।"

আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

"তোমরা কাল চলে যাও। ধরমশালায় নয়, সোজা ত্রিবেদীর কাছে। সেখান থেকে যে-কোনও বাসে নিয়ারেস্ট রেলওয়ে স্টেশন। কলকাতায় চলে যাও।"

আমরা অবাক ! কথাটা যেন বুঝতে পারলাম না। বললাম, "আমরা চলে যাব মানে ! আপনি ?"

"আমার এখন যাওয়া হবে না।"

"তার মানে ?"

"সে তোমরা বুঝবে না। যা বলছি করবে। আমার ট্রেকার নিয়ে তোমরা চলে যাবে। আখলা থাকবে সঙ্গে। ত্রিবেদীর কাছে গাড়ি আর আখলাকে রেখে তোমরা প্রথম বাস ধরেই পালাবে।"

"কেন ?"

"কেন !... এরা যেমন চায়— তেমন না করলেই তোমরা এখানে আটকে পড়বে। এখান থেকে আবার কোন জায়গায় নজরবন্দি করে রাখতে পাঠিয়ে দেবে কে জানে ! স্পেশ্যাল জেলও হতে পারে।"

"বলেন কী ! কেন ?"

"স্পাইয়িং এজেন্ট হবার অফেন্স—"

কুমারসাহেবের কথা শেষ হওয়ার আগেই আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, "স্পাইয়িং করার অফেন্স ! মাই গড্ !"

"অফেন্সটা ওই ক্যাটাগরিতেই পড়ছে এদের কাছে। তবু ভাল, তোমাদের ধরে বেঁধে রাখবে না, বা ট্রায়াল করবে না। তোমরা ছেলেমানুষ, ডায়েরির লেখাটাও জেনুইন, যদিও ওতে কিছু ভুল আছে—"

"কী ভুল ?"

"দেখার ভুল, ভাবার ভুল। তবু জেনুইন ডায়েরি। তা ছাড়া সত্যি-সত্যি এক ভদ্রলোককে ওই সময়ে এখানে গুলি করে মেরে ফেলা হয়।"

এই সময়ে মিলিটারি থালায়— বা ট্রে-তে আমাদের খাবার এসে গেল। চারটে ট্রে পরপর সাজানো।

আমাদের খাবার দিয়ে লোকটা চলে গেল আখলাকে খাবার দিতে।

"নাও, খেয়ে নাও। আনন্দ, পানি লাগাও।"

খিদে খুবই পেয়েছিল, কিন্তু যেসব কথা শুনলাম তাতে আর খাবার ইচ্ছে থাকে

না। তবু মুখে কিছু দিতেই হয়। আনন্দ জলের জগ নিয়ে এল। আমরা কোলের ওপর ট্রে সাজিয়ে নিয়ে খেতে শুরু করলাম।

খেতে-খেতে আনন্দ বলল, "আমাদের ছেড়ে দেবে, আপনাকে দেবে না ? এর যুক্তিটা কোথায় ?"

কুমারসাহেব বললেন, "তোমাদের ছেড়ে দিলেও এদের লোক তোমাদের ফলো করবে। তোমরা জানতেও পারবে না। কলকাতায় ফিরে গিয়েও ভেবো না, তোমরা সেফ্। দে হ্যাভ দেয়ার এজেন্টস। কিছুদিন তো নজর রাখবে।"

"কেন ?"

"এটা এদের নিয়ম।"

"আমরা—"

"শোনো আনন্দ। এই জায়গাটায় কী হয় না-হয় আমরা জানি না। ইট ইজ টপ সিক্রেট। তবে তুমি ধরে নিতে পারো— এমন কোনও সিক্রেট কাজ হয়, হয়তো এক্সপেরিমেন্ট হয়— যা বাইরের কাউকে জানতে দেওয়া যায় না।"

"মিলিটারি ডিফেন্স..."

"আ, ওসব কথা কেন ! এখন থেকে লুজ টক করবে না। এখানে এসেছিলে কখনও, তাও ভুলে যাও।"

আমি বললাম, "আপনাকে ছাড়ছে না কেন ?"

"তা জেনে কী হবে !"

"আপনাকে কি আমাদের জামিন হিসেবে আটকে রাখছে ?"

"না। আমাকেও ছেড়ে দিত।"

"তা হলে ?"

"আমি নিজেই এখন এখান থেকে যেতে চাই না।"

আমরা আর কত অবাক হব ! কুমারসাহেব নিজেই যেতে চান না !

"আপনি এখানে থাকবেন ?"

"হ্যাঁ।"

"কতদিন ?"

"বলতে পারছি না। দু-চার দিন হতে পারে, আবার ওয়ান উইক।"

"এরা আপনাকে থাকতে দেবে ?"

"সে-ব্যবস্থা সান্যালসাহেব করবে।"

আনন্দ বলল, "কুমারসাহেব, ডক্টর সান্যাল কি আপনার চেনা ?"

কুমারসাহেব খেতে-খেতে বললেন, "সান্যাল আমায় দেখেছে। বছর পাঁচ-ছয় আগে কোয়ানা রেঞ্জে আমি একবার বেড়াতে যাই। ফরেস্ট অফিসে আমার এক দোস্ত ছিল। সেখানের আশেপাশের গাঁয়ে সাডান্‌লি প্লেগ দেখা দেয়। আমরা রিলিফ ওয়ার্ক শুরু করি— সে-সময় কাছাকাছি এক জায়গায় মিলিটারি ক্যাম্প বসেছিল। তারাও রিলিফের কাজে এসে পড়ে। তখন সান্যাল আমায় দেখেছিল। মুখের আলাপও হয়। ও আমার জুনিয়ার। কলকাতার মেডিক্যাল

কলেজের ছেলে। আমি বেলগাছিয়ার।"

"ও! তা উনি তবে মিলিটারিতে আছেন?"

"হ্যাঁ, কর্নেল সান্যাল। এখন সান্যালকে এদের সঙ্গে থাকতে হচ্ছে। বছর তিনেক আছে। ওর ইউনিট যে-কোনও সময়ে ফেরত নিতে পারে।"

"ও।"

আমাদের খাওয়া প্রায় শেষ।

জল খাওয়া হয়ে গেলে আনন্দ বলল, "কুমারসাহেব, আপনি এখানে থাকতে চাইছেন কেন?"

কুমারসাহেব কথার জবাব না দিয়ে মুখ-হাত ধুতে বাথরুমে চলে গেলেন।

আনন্দ বলল, "কৃপা, এটা ঠিক হচ্ছে না।"

"কী?"

"কুমারসাহেবকে একা রেখে যাওয়া।"

"ঠিক তো হচ্ছেই না। উনি আমাদের সঙ্গে ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছেন। স্বেচ্ছায়। আমাদের হয়ে না করেছেন কী! ওঁকে ফেলে যেতে আমারও মন চাইছে না।"

"আমার ভাই বিবেকে লাগছে। প্রেস্টিজ। এমনিতেই তো বাঙালি বলে কত দুর্নাম আমাদের নামে! যে-লোকটি যেচে এসে আমাদের সাহায্য করছিলেন—তাঁকে ফেলে আমরা পালাতে পারি না।"

"কিন্তু উনি যে নিজেই থাকতে চাইছেন।"

"উনি থাকলে আমরাও থাকব।"

"আরও পাঁচ-সাতদিন! আমাদের অফিস?"

"গুলি মারো অফিসে। পার্মানেন্ট চাকরি। তাড়াতে পারবে না। ছুটি মঞ্জুর না করে 'উইদাউট পে' করবে! আবার কী!"

"বেশ। তবে ভাই, আমাদের যদি আর থাকতে না দেয় এরা!"

"দেবে।"

"কেমন করে?"

আনন্দ হাসল। বলল, "ম্যানেজ করার চেষ্টা করব। সিক হয়ে পড়ব! বমি, ফুডপয়জনিং, ডায়েরিয়া, কত কী আছে!"

আমি মাথা নাড়লাম, "চালাকি করতে যাস না। এ তোর অফিস কামাইয়ের অজুহাত নয়।"

"তুই দ্যাখ, আমি যাব না।"

কুমারসাহেব ফিরে এলেন।

আনন্দ বলল, "কুমারসাহেব, আমরা ডিসিশান নিয়ে নিয়েছি।"

"কীসের?"

"আমরা আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছি না। হয় আপনি আমাদের সঙ্গেই যাবেন, না হয় আপনার পাশমে পাশমে আমরা থেকে যাব।" আনন্দ বলল, একটু মজাও

করল।

কুমারসাহেব আনন্দকে নজর করে দেখলেন। বললেন, "তোমাকে অ্যালাউ করলে থাকবে ! তবে থাকলে লাইফ রিস্ক হবে।"

"কেন ?"

"যা দেখবে, বেটার লেট মি সে, যা দেখতে পারো— তা তোমার নার্ভে সহ্য হবে না।"

"আপনি কী বলছেন, সার !"

"সাফ কথা বলছি।..."

"আপনি পারবেন ?"

"আমি বহুত দেখেছি, আনন্দ। আমার লাইফের এক্সপিরিয়েন্স অনেক বেশি।"

আনন্দ বলল, "সার, আপনার কথা আমরা মানছি। কিন্তু আমরা কাওয়ার্ড হতে পারব না। আপনাকে একলা ফেলে রেখে যাব না আমরা।"

কুমারসাহেব কোনও জবাব দিলেন না।

পনেরো

পরের দিন অনেকটা বেলায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হল মিস্টার পারেখের অফিসে। তাঁর দুটো অফিস— পাশাপাশি। একটা অফিসে কোনও অফিসারও ঢুকতে পারেন না পারেখসাহেবের বিশেষ অনুমতি ছাড়া। মানে সেই ঘরে এমন সব জরুরি গোপন কাগজপত্র, কোনও-কোনও জিনিসও আছে যা খুবই সতর্ক হয়ে সাবধানে রেখে দিতে হয়েছে। পুরো দায়িত্ব পারেখসাহেবের। তিনিই এই জায়গার সর্বময় কর্তা।

আমরা যে সেখানে যেতে পারব তা ভাবাই ভুল। পাশের অন্য ঘরে বড়সাহেবের দু' নম্বর অফিসে তলব পেলাম। সান্যালসাহেব আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনিই এক নম্বর দু' নম্বর অফিসের কথা বললেন, নয়তো আমরা জানব কেমন করে !

মিস্টার পারেখ আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন কিনা জানি না ! ঘরে ঢুকে দেখি, তাঁর টেবিলের দু' পাশে নানান উদ্ভট জিনিসপত্র। ফোন তো আছেই গোটা তিনেক, তা ছাড়া ছোট টিভির মতন এক পদার্থ, গোল-গোল দু-তিনটে বিভিন্ন রঙের কাচের বল, ছোট-ছোট ; মাইকের মাউথ পিসের মতন একটা জিনিস, কাগজ, ফাইল— এইসব।

মানুষটি কিন্তু বেঁটেখাটো, গোল। মাথায় একটিও চুল নেই, নেড়া। চোখে মোটা কাচের চশমা। পুরু গোঁফ। দাড়ি নেই। রং না-ফরসা না-ময়লা। চট করে দেখলে সম্ভ্রম হয়, ভয়ও হয়। পরনের পোশাক মিলিটারি নয়, সাধারণ।

সান্যালসাহেব আমাদের হাজির করিয়ে দিয়ে সামান্য সরে গেলেন। দাঁড়িয়ে

থাকলেন। বসলেন না।

আমরাও দাঁড়িয়ে থাকলাম।

উনি আমাদের দেখলেন কিছুক্ষণ, একটা ফাইলের পাতা ওলটালেন। তারপর সান্যালসাহেবকে টেবিলের বাঁ পাশে রাখা চেয়ারে বসতে বললেন ইশারায়।

সান্যালসাহেব বসলেন।

আমাদেরও বসার হুকুম হল, মুখোমুখি বসার।

পারেখসাহেবের গলার স্বর শুনে আমরা অবাক! ওইরকম যাঁর চেহারা, অত ব্যক্তিত্বপূর্ণ, তাঁর গলার স্বর একেবারে মিহি, মেয়েলি। উনি সান্যালসাহেবের সঙ্গে কথা বললেন। কথা ইংরিজিতে হলেও এত 'গোপন শব্দ'— যাকে আমরা 'সাঁট' বলি সাধারণত— ছিল যে, আমরা কিছুই বুঝলাম না। শুধু বুঝতে পারলাম, উনি আমাদের ছেড়ে দিচ্ছেন।

"আপনারা ছাড়া পেলেন," সান্যালসাহেব বললেন, "সার আপনাদের বয়ান শুনে নিয়েছেন, রিপোর্ট পড়েছেন। ভুল আপনারা করেছেন। তবু সার বলছেন, না-জেনে ভুল করেছেন আপনারা। যাই হোক, এখন যেতে পারেন।"

"যেতে পারি?"

"পারেন। পাস ওয়ার্ড জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সিকিউরিটিকে। তাদের পোস্ট থেকে বলে দিয়েছে ফটকে। আপনারা ফ্রি। চলে যেতে পারেন।"

বাঁচা গেল! গলা থেকে যেন শক্ত জিনিসটা নেমে গেল। দমবন্ধ হয়ে ছিল এতক্ষণ।

আমি কুমারসাহেবের দিকে তাকালাম।

"উনি?"

"পরে যাবেন!"

"কেন?"

সান্যালসাহেব চোখের ইশারায় আমাদের সতর্ক করে দিলেন। বুঝলাম, পারেখসাহেব বাংলা বোঝেন না বলে এ-ধরনের প্রশ্ন করে পার পেয়ে গেলাম।

আনন্দ হঠাৎ বলল, "সার, আমরা চারজন একসঙ্গে এসেছিলাম। কোনও খারাপ মোটিভ আমাদের ছিল না। আপনারাও সেটা মেনে নিয়েছেন। তা হলে বয়স্ক কুমারসাহেবকে আটকে রাখছেন কেন? উনি কোনও দোষ করেননি।"

সান্যালসাহেব কিছু বলার আগেই মিস্টার পারেখ সান্যালের কাছে জানতে চাইলেন, আমরা কী বলছি?

সান্যালসাহেব আমতা-আমতা করে কী বলতে গেলেন, পারেখসাহেব মাথা নাড়লেন। বললেন, "না না—তোমাদের সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।"

আমরা সান্যালসাহেবের দিকে তাকালাম।

তিনি কুমারসাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

পারেখসাহেব আর অপেক্ষা করবেন না। নীল মতন একটা মোটা কাগজে সই করে সেটা ঠেলে দিলেন সান্যালসাহেবের দিকে। তারপর উঠে পড়লেন।

আমরা উঠে পড়লাম। ধন্যবাদ জানালাম পারেখসাহেবকে।

"চলুন," সান্যালসাহেব বললেন।

আমরা বাইরে আসতেই সান্যালসাহেব অসন্তুষ্ট হয়ে কুমারসাহেবকে বললেন, "আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম, ভেবেচিন্তে কথা বলুন। আপনি তখন একরকম বললেন। আমি রাজি হলাম। এখন সাহেবের কাছে আমায় অপদস্থ করলেন। আপনার বয়েস হয়েছে, দু' রকম কথা বলবেন না। যান— নিজেদের ডেরায় যান। গার্ড আপনাদের সময় মতন রিলিজ করে দেবে। দুপুর নাগাদ। ও.কে.। গুড বাই।"

আমরা কিছুই বুঝলাম না। বোকা।

কুমারসাহেব অপ্রস্তুত।

"কী ব্যাপার কুমারসাহেব ?"

"চলো, ঘরে চলো, বলছি।"

"সান্যালসাহেব এত চটে গেলেন !"

"চলো, ঘরে চলো।"

ঘরে এসে কুমারসাহেব আমাদের ওপরেই খেপে গেলেন। "তোমাদের কী দরকার ছিল বাহাদুরি করার ?"

"মানে ?"

"আমার কথা তোমরা বলতে গেলে কেন ?"

"বাঃ, আমরা তো আগেই বলেছিলাম— আপনাকে ফেলে রেখে আমরা যাব না।"

"তোমরা আমার সমস্ত প্ল্যান বরবাদ করে দিলে। তোমরা বোকা ! আমি সান্যালকে বলেছিলাম— যে করে হোক, আমায় দু-তিনদিন আটকে রাখার ব্যবস্থা করতে। সান্যাল রাজি হয়েছিল।"

"কী করে আটকে রাখত !"

"আমি সিক হয়ে পড়তাম।"

"সিক ?" আমি অবাক !

"ফ্লাই ফিভার। উলটি হত বার কয়েক, বমি। মাথাধরা। চোখ লাল।"

কুমারসাহেব পাগলের মতন কী বলছেন আমরা বুঝতে পারলাম না।

"আপনার ফিভার। কেন ? ফ্লাই ফিভার আবার কী !"

"এখানে একরকম খারাপ মাছি আছে। তার মধ্যে কিছু মাছি কামড়ালে জ্বর হয়। ডেঙ্গু টাইপের।"

"আপনাকে তো মাছি কামড়ায়নি।"

"না।"

"তবে ?"

"ত—বে ! তব্‌ ! আরে ভাই, সান্যালকে আমি ম্যানেজ করেছিলাম। ফ্লাই

ফিভারের কথা সান্যালই বলেছিল। ও আমায় আজ সিক করে দিত। আমি নিজেই উলটিমুলটি খেতাম, থোড়া চুনা চোখে লাগিয়ে লাল করে নিতাম। সান্যাল আমায় আনফিট করে দু-তিনদিন রেখে দিত। সে পাওয়ার ওর আছে।”

“আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না। নকলি সিক হতেন ?”

“ইয়েস।”

“কেন ?”

“দুটো কারণে। দু-একদিনের মধ্যে আবার ওই সিনটা দেখা যাবে। সান্যাল বলেছিল।”

“কোন সিন ?”

“মিস্টিরিয়াস মুনলাইট অ্যান্ড দ্য ভেসেল।”

আমরা বোকার মতন কুমারসাহেবকে দেখছিলাম।

কুমারসাহেব বললেন, “আরও একটা দেখার জিনিস ছিল। কিরপার দাদাকে যেখানে শুট করা হয়েছিল সেই স্পটটা।”

আনন্দ আমার দিকে তাকাল। তারপর কুমারসাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, “কৃপার দাদার যেখানে মৃত্যু হয়েছে— মানে গুলি খেয়েছেন দাদা— এতকাল পরে সেই জায়গাটা দেখে আপনার কী হবে !”

কুমারসাহেব বললেন, “ধরো সেন্টিমেন্ট।”

“তাই কি !”

“আরও কারণ আছে। টাওয়ারের গার্ডরা তাঁকে গুলি করেছিল— না কি যেটা নেমে আসে— সেই বোট টাইপের নৌকোর মতন যন্ত্রটা থেকে তাঁকে কেউ ফ্ল্যাশ টার্গেট করেছিল !”

“মানে ! ফ্ল্যাশ টার্গেট কী ?”

“আমি জানি না। তবে সান্যাল বলল, আলোর একটা ঝলক— তিরের মতন এসে হিট করে।”

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। পরে বললাম, “দাদা মারা গেছে এটাই সত্য। কী করে মারা গেল তা জেনে আর লাভ কী !”

আনন্দ বলল, “সার, তবে যে সান্যালসাহেব আমাদের বলেছিলেন, ওয়াচ গার্ডরা গুলি করেছে। তিনি নিজে ডেডবডি দেখেছেন।”

“সান্যাল দেখেছে। সেটা ঠিক বাত। তবে সে বলতে পারছে না— গুলি, না ফ্ল্যাশ হিটে মারা গেছে। অফিসিয়ালি তাকে যা বলতে হবে— তাই লিখেছিল। উপায় ছিল না।”

আমরা আর কী বলব ! এখানকার সবই অদ্ভুত ! কীসের জ্যোৎস্না, কীসের ওই শব্দ, কেমন করেই বা একটা নৌকোর মতন জিনিস আলোয় নেমে আসে নীচে, কেমন করে জানব !

কুমারসাহেব বললেন, “তোমরা একটা চান্স নষ্ট করলে। আমি থাকলে, আর যদি ওই অদ্ভুত ঘটনা দু-একদিনের মধ্যে ঘটত— দেখে নিতে পারতাম। আর হল

না !"

"আপনাকে দেখতে দিত ?"

"সামনাসামনি দিত না। তবে লুকিয়ে হয়তো দেখা যেত।"

"ওটা কী ?"

"ইউ-এফ-ও নয়।"

"কী তবে ?"

"তা ওরা বলবে না।"

"সান্যালসাহেবও বলেননি ?"

"না।"

আনন্দ বলল, "আমি জানি না সার আপনি কেমন করে দেখতেন ? বোধ হয় দেখতে পেতেন না। ... যাক গে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এখন ছাড়া পেলেই আমরা পালাব।"

কুমারসাহেব মাথা নাড়ালেন হতাশায়। বললেন, ডাক্তার সান্যালকে ভজিয়ে-ভাজিয়ে তিনি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা আর হল না। ভাগ্যই মন্দ !

দুপুরের পর আমাদের ছেড়ে দেওয়া হল।

নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে ট্রেকার গাড়ি করে আমরা ফিরে চললাম পুরনো আস্তানায়।

আখলা গাড়ি চালাচ্ছিল। আমরা চুপচাপ।

অনেকটা পথ এগিয়ে এসে কুমারসাহেব বললেন, "আনন্দ, দো-তিনদিন আমরা ধরমশালায় ওয়েট করতে পারি।"

আনন্দ আর আমি তাকালাম।

কুমারসাহেব বললেন, "ওয়েট করলে— ওই সিন আবার দেখতে পাব। এভরি চান্স।"

"কেমন করে ?"

"ফেন্সিংয়ের বাইরে থেকে।"

"তাতে লাভ ?"

"আমাদের জানতে হবে ব্যাপারটা কী !"

"এভাবে কি জানা যায় সার ?"

আমি বললাম, "কুমারসাহেব, আপনি বলেছেন, আমাদের ছেড়ে দিলেও ওরা আমাদের ওয়াচ করবে। তাই যদি হয়, কালই ধর্মশালা না ছাড়লে ওরা এসে আবার ধরবে।"

মাথা নাড়লেন কুমারসাহেব। "সব ঠিক। তবে একবার রিস্ক নিলে যদি ..."

কথা শেষ হওয়ার আগেই এক বিকট শব্দ। আবার গুলি নাকি !

আখলা গাড়ি থামিয়ে দিল। তারপর নীচে নামল। চাকা দেখতে-দেখতে

বলল, "টায়ার ফেটে গিয়েছে।"

আমরা নেমে পড়লাম। চাকা পালটাতে হবে।

ষোলো

গাড়ির চাকা পালটে ধর্মশালা।

পাঁড়েজি আমাদের দেখে চোখমুখের যা ভাব করল, যেন ভূত দেখছে। সেটাই স্বাভাবিক। কেননা, আগের দিন দুটো সেপাই এসে তাকে কম ভয় দেখায়নি। আমাদের খোঁজখবর করেছে, কবে থেকে আমরা এই ধর্মশালায় ছিলাম, কোথায় যেতাম, কী করতাম—এসব জানতে চেয়েছে। তারপর আমাদের যা মালপত্র ছিল উঠিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে। খুব বাঁচোয়া যে, পাঁড়েজিদের ধরে নিয়ে যায়নি। কুমারসাহেবের বাবুর্চিকেও নয়।

আমার যেন আর ধর্মশালায় না থাকি, বাবুজি।

ধর্মশালায় আমরা অবশ্য থাকতাম না। এখানে ওদের নজর পড়বে।

পাঁড়েজিকে নিরস্ত করে বললাম, "কোনও ভাবনা নেই। আমরা চলে যাচ্ছি।"

ধর্মশালা থেকে সটান ত্রিবেদীজির কাছে। তখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে।

ত্রিবেদীজির বাড়িতে আমাদের বৈঠক বসল। উনিও সব কথা শুনলেন। শুনে একেবারে হতভম্ব!

কুমারসাহেব বললেন, আমরা যদি চলে যাই তবে তো কথাই নেই। "মাগর ভাগেগা নেহি।"

তা হলে?

কুমারসাহেবের ধারণা, এত তাড়াতাড়ি ওই ক্যাম্প থেকে কেউ আমাদের খোঁজ নিতে আসবে না। দু-একদিন পরে আসতে পারে। তার আগে আমরা অন্য কোনও শেল্‌টার খুঁজে নেব। নিতেই হবে। ওরা যদি আসে মনোহর বলবে, আমরা চলে গিয়েছি।

আনন্দ বলল, "এখানে শেল্‌টার নেওয়ার মতন জায়গা কোথায় কুমারসাহেব? আর এখান থেকে ক্যাম্পও তো অনেক দূর।"

কুমারসাহেব মাথা নাড়লেন। ঠিকই। তারপর বললেন, "আজকের রাতটা তো কাটাও, কাল দেখা যাবে।"

গত দিন দুই যে ধাক্কা গিয়েছে তাতে আমরা ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে কুমারসাহেবের সঙ্গে যেতে হল ত্রিবেদীজির বাস অফিসে। আগেই বলেছি, বাস অফিসে এই অঞ্চলের একটা ম্যাপ টাঙানো থাকত। সেটা সাধারণভাবে রুট ম্যাপ হলেও তাতে কাজচলা গোছের নানান জ্ঞাতব্য জানা

যেত। জায়গার নাম, পাহাড়, পর্বত, নদী, জঙ্গল—তারও একটা নামধাম পাওয়া যেত।

কুমারসাহেব সেই ম্যাপ নিয়ে বসলেন।

ত্রিবেদীজির হাতে তখন অনেক কাজ। তিনি কাজ নিয়ে ব্যস্ত। বাস এল একটা। যাত্রীরা নেমে জিরিয়ে নিচ্ছে। চা, পান, সিগারেট খুঁজে বেড়াচ্ছে কেউ-কেউ। সকালটা একেবারে খটখটে। যেমন উজ্জ্বল রোদ, তেমনই আকাশ।

আমার তো বাড়ির কথা মনে পড়ছিল। মেজদা হাঁ করে বসে আছে—আমি কবে ফিরব সেই অপেক্ষায়। অন্তত একটা চিঠির আশায় সে বসে থাকবে। ভাবছিলাম, এই অবস্থায় আমি কেমন করে জানাব বড়দার দুঃসংবাদটা। কেমন করে লিখব, বড়দাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। কী নৃশংস ঘটনা!

আনন্দও বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত। মাত্র ক'দিনের কথা বলে অফিস ছেড়ে পালিয়ে এসেবে। সামনে পুজো। এইভাবে আর ক'দিন বসে থাকা যায় এখানে! করারও তো কিছু নেই আমাদের!

ঘণ্টাখানেক পরে কুমারসাহেব ডাকলেন আমাদের।

"বলুন, সার?"

"একটা জায়গা পাওয়া গেছে।"

"কোথায়?"

"মানডিগড়ের কাছেই।" বলে তিনি ম্যাপ দেখাতে লাগলেন। "এই যে ফরেস্ট দেখছ, এর নাম বুন্দিয়া ফরেস্ট। এর আশেপাশে ভিলেজ আছে। ওরা কী করে আমি জানি না। মালুম, খেতিউতি করে, কাঠ কুড়োয়, আর মরা জন্তু-জানোয়ারের চামড়া জুটিয়ে বেড়ায়, দেহাতি ট্যানারি করে। জায়গাটা সেফ। কেন সেফ বলছি জানো? এখানে দ্যাখো—।" বলে কুমারসাহেব একটা কাগজ চেয়ে নিয়ে ম্যাপ আঁকতে বসলেন বুন্দিয়া ফরেস্টের। "এখানে ফরেস্ট, ওখানে বুশ, এই হল ভিলেজ, আর এই যে সরু মতন জায়গাটা পড়ে থাকল—এটা পাথুরে জায়গা। এর কাছেই পুরনো কেভ—মানে গুহা আছে। ওপারে নদী। মানডিগড়। আমরা একেবারে চুপচাপ বুন্দিয়া ফরেস্টে গিয়ে হাজির হব।"

আমি বললাম, "কেমন করে?"

কুমারসাহেব বললেন, "এখান থেকে ট্রেকার নিয়ে সরে পড়লে আমাদের আর ওরা ট্রেস করতে পারবে না। মনোহর বলবে, আমরা চলে গিয়েছি।"

আনন্দ বলল, "বেশ। তারপর যদি ওরা লোক লাগিয়ে এদিক-ওদিক খোঁজ করে?"

"করুক। কোনও পাত্তা পাবে না। এইসব এরিয়ায় জলদি-জলদি কুছ হয় না, আনন্দ। দুটো-তিনটে দিন আমরা লুকিয়ে থাকতে পারব।"

কুমারসাহেব যে এতটা উৎসাহী হতে পারেন, আমরা আগে বুঝিনি। সত্যি বলতে কী, বড়দা আর নেই—এটা জানার পর মন্দারগড় সম্পর্কে আমাদের

কৌতূহল বিশেষ ছিল না। আর থেকেই বা কোন লাভ হবে! এ তো সাধারণ রহস্য নয়, এমন এক জটিল রহস্য—যেখানে আধা-মিলিটারি ব্যাপারট্যাপার রয়েছে, রয়েছে আশ্চর্য কোনও গোপনতা। আমাদের ওসবে কী দরকার! একবার ধরা পড়ে যে শিক্ষা হয়েছে—তাতে আর ফ্যাসাদে পড়তে চাই না।

কুমারসাহেব আমাদের মনের কথাটা যে আন্দাজ করতে পারছিলেন না—তা নয়, তবু তিনি কেমন নাছোড়বান্দা। জেদ ধরে গেছে। বারবার বলছিলেন, "আর একবার শুধু ওই দৃশ্যটা দেখব, তারপর ফিরে যাব। আমি বলছি, এর মধ্যে কোনও বাইরে থেকে আসা অবজেক্টের ব্যাপার নেই। দিস ইজ্ সাম শট অব এক্সপেরিমেন্ট। হয়তো মিলিটারিদের কোনও উইং করাচ্ছে, বা ডিফেন্সের আন্ডারে কোনও প্রজেক্ট...। একবার শুধু দেখে নিয়ে পালিয়ে যাব।"

আমরা আর না করতে পারলাম না।

সেদিন বিকেলেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পুরোপুরি তৈরি হয়ে। কুমারসাহেব কোনও খুঁত রাখলেন না। খাবারদাবার, জল, আলো, দড়াদড়ি, মায় একটা স্টোভ, ছোটখাটো তেরপল—আরও কত কী যে জড়ো করলেন, কে জানে! শুধু তাঁর বন্দুকটাই নিতে পারলেন না, কেননা সেটা তো সঙ্গে নিয়ে বেরোননি, বাড়িতে পড়ে আছে।

আগেরবার আমরা যে-পথে মন্দারগড়ের খোঁজে গিয়েছিলাম ধর্মশালা পর্যন্ত—এটা সে-পথ নয়। একেবারে অন্য পথ। আগে গিয়েছিলাম পুব দিক ধরে, এটা দক্ষিণ ধরে যেতে হয়। আগেরবার আমাদের লক্ষ্য ছিল পাঁড়েজির ধর্মশালা। এবার বুন্দিয়ার জঙ্গল।

কুমারসাহেব বলেই দিয়েছিলেন, "ট্রেকার গাড়িটা আমরা জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে রাখব। চেষ্টা করব—গাঁ-গ্রামে না ঢুকে—নির্জন অথচ আড়ালমতন জায়গা খুঁজে নেওয়ার। আমাদের চেষ্টা হবে গুহার কাছে যাওয়ার। সাধারণত দেখা যায়, একজায়গায় কোনও গুহা দেখা গেলে তার আশেপাশে আরও দু-একটা ছোট-বড় গুহা চোখে পড়ে। এটা কেন হয়েছে কে জানে! পৃথিবীতে নাকি এমন জায়গাও আছে যেখানে এত গুহা যে, তাকে ল্যান্ড অব কেভ্‌স বলা হয়।"

আমরা সন্ধের মুখেই জঙ্গলের কাছে পৌঁছে গেলাম। আশেপাশে কোথায় গ্রাম আছে জানা যাচ্ছিল না। কোথাও একফোঁটা আলো দেখা যায় না, শুধু গাছগাছালি, ঝোপ আর দু-চারটে বুনো পশু!

ট্রেকার গাড়িটা এখানেই রাখা হল।

কুমারসাহেব বললেন, "আজ এই গাড়ির মধ্যেই আমাদের রাত কাটাতে হবে।"

আমরা সেটা জানতাম। তবু আনন্দ ঠাট্টা করে বলল, "জেগে-জেগে বসে থাকতে হবে বলুন?"

"না জেগে থাকলে কাল দেখবে একটা বুনো কুকুর বা শেয়াল তোমায়

টানতে-টানতে বিশ-পঞ্চাশ গজ নিয়ে গিয়েছে।"

"না সার, বুনো কুকুরের হাতে প্রাণ দিতে রাজি নই।"

"তবে জেগে থাকো।"

আমি বললাম, "জেগে থাকতে আপত্তি নেই, কিন্তু কাল সকালে যদি কারও চোখে পড়ে যাই! গাঁয়ের মানুষজন, কাঠুরে, বা অন্য কেউ?"

"এদিকে কোনও গাঁ নেই। ম্যাপ দেখে যা বুঝেছি—এটা কাঁকুরে জমির পথ। খেতি করার জমি এখানে নেই, জল পাওয়া যায় না, ইঁদারা খোঁড়াও সহজ নয়।"

"কাল আমরা কোথায় যাব?"

"সকাল হলেই পালাব। গুহার কাছে যাব। গাড়িটা এখানে কোথাও আড়ালে লুকনো থাকবে।"

আনন্দ বলল, "কুমারজি, সান্যালসাহেবের কথামতন কাল বা পরশু মন্দারগড়ে সেই মিস্টিরিয়াস জিনিসটি আবার আসবে। তাই তো?"

"হ্যাঁ। দো-তিন দিনের কথা বলেছিল সান্যাল।"

"যদি আর না আসে?"

"হোয়াই?"

"না আসতেও পারে। দেরি করতে পারে। তা হলে, আমরা কিন্তু আর বসে থাকব না। ফিরে যাব। আমাদের ফিরে যেতেই হবে।"

আমি বললাম, "কুমারসাহেব, আমার কাছে পাঁজি নেই—, তবু মনে-মনে হিসেব মিলিয়ে দেখেছি, কৃষ্ণপক্ষ গতকালই বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছে। আজ থেকে শুক্লপক্ষ পড়ল। আমার মনে হয়, চাঁদের আলো মোটামুটি ফুটে উঠবে যখন থেকে, তখন আর ওই জিনিসটিকে দেখা যাবে না।"

কুমারসাহেব বললেন, "তোমাদের কথাই মেনে নিলাম। আর দুটো দিন, তারপর আর এখানে থাকব না। মাথাও ঘামাব না মানডিগড় নিয়ে।"

পরের দিন সকাল থেকেই আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। গাড়িটাকে সরিয়ে আড়ালে রাখা গেল। তারপর যত রাজ্যের জিনিস নিজেরা হাতে-হাতে বয়ে চললাম গুহার দিকে।

প্রায় আড়াই কি তিনশো গজ দূরে একটা গুহা পাওয়া গেল। সেটার ডান দিকে দেখি রীতিমতন বড়সড় এক গুহা। গুহাটার কাছাকাছি যেতে মনে হল ভেতর থেকে কেমন এক শব্দ আসছে। কীসের শব্দ?

কুমারসাহেব ভেতরে চলে গেলেন। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে। এখানেই কোথাও দিন দুয়েকের আস্তানা পাততে হবে। বেলার দিকে জায়গাটা ভালই লাগছিল। হালকা জঙ্গল, রুক্ষ মাঠ, পাথর ছড়ানো প্রান্তর, বালিয়াড়ির মতন পাহাড়ের এক ঢল, আর এই গুহা।

কুমারসাহেব ফিরে এলেন অনেকক্ষণ পরে। তাঁর হাতের টর্চ নিভে গিয়েছে, হাতের লাঠিটা ভিজে।

আমরা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

উনি বেশ হাঁফাচ্ছিলেন। জল খেলেন ফ্লাস্ক থেকে। তারপর বললেন, "এই গুহাটা একেবারে নদীর মুখে গিয়ে পড়েছে। সবে বর্ষা শেষ। নদী এখন ভরা। নদীর জল ঢুকে আছে গুহার মধ্যে। তবে হাঁটুর বেশি জল নেই। ওই জলটুকু ঠেলে নদীর মুখে গিয়ে পড়লেই মানডিগড়ের সেই ক্যাম্প দেখা যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার, নদীর দিকে ক্যাম্পের কোনও সিকিউরিটি রাখা হয়নি। অন্তত চোখে কিছুই দেখা গেল না।" তিনি যদি আগে বুঝতেন বায়ানোকুলারটা নিয়ে যেতেন। তা তিনি কেমন করে বুঝবেন—এই গুহার মুখ দিয়ে নদীতে যাওয়া যায়!

আনন্দ বলল, "আপনি বলছেন—এই গুহাটা টানেলের মতন সোজা গিয়ে নদীতে পড়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"নদীর দিকে ওদের কোনও পাহারা নেই?"

"দেখতে পেলাম না।"

"ওয়াচ টাওয়ার দেখেছেন ক্যাম্পের?"

"সে অনেক দূরে দেখেছি।"

"নদীর দিকে ওরা লোকজন রাখেনি কেন?"

"সেটাই আশ্চর্যের! হয়তো ভেবেছে নদী দিয়ে কে আর আসতে যাবে! এলে নৌকো করে বা সাঁতার কেটে আসতে হবে। হয়তো তাই এল। তারপর যখন ক্যাম্পের কাছে যাবে—তখন তো ওয়াচ গার্ডরা দেখে ফেলবে।"

আমি বললাম, "আমাদের তা হলে এই গুহার মুখ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে নদীর ধারে উঠতে হবে?"

"হ্যাঁ। তবে এখন নয়। এখন গিয়ে কোনও লাভ নেই। আমরা বিকেলবেলায় যাব। এখন এসো, পেট ভরাবার ব্যবস্থা করা যাক।"

আনন্দ বলল, "সার, আজ যদি বরাতজোরে ব্যাপারটা মিটে যায়— ।"

"যাবে," কুমারসাহেব বললেন, "সান্যাল যদি আমাকে মিথ্যে না বলে থাকে—আজ কিংবা কাল আমরা ওই জিনিস দেখতে পাব। আর আমার মনে হয় না সান্যাল মিথ্যে কথা বলেছে।"

আখলা স্টোভটা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। শব্দ হচ্ছিল। এই নিস্তব্ধ জায়গায় শব্দটা কিন্তু অন্যরকম লাগছিল। হয়তো ফাঁকা বলে—শব্দটা ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

কুমারসাহেব বললেন, "আমরা যদি প্রথমেই এদিককার রাস্তাটা জানতে পারতাম—অকারণ ওদের পাল্লায় পড়তে হত না।"

সতেরো

বিকেলবেলায় আমরা গুহার অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে নদীর কাছে এলাম।

গুহার মধ্যেটা অন্ধকার হলেও নোংরা নয়। নদীর জল যা ঢুকে পড়েছিল তা অবশ্য কাদাটে রঙের। আমাদের হাতের আলোয় গুহাপথটাকে ভাল করে দেখে নেওয়ার পর মনে হল, জল যেটুকু দাঁড়িয়ে আছে— যদি না থাকত— এখানেই দিব্যি বসে-বসে রাত কাটানো যেত।

আমাদের লটবহর বেশি নয়। তবু ওরই মধ্যে খাওয়া-বসার ব্যবস্থা করতেই হয়েছিল। কিছু জিনিস ট্রেকারের মধ্যেও পড়ে থাকল। উপায় নেই। তখন তো জানতাম না, এমন একটা গুহা পাওয়া যাবে!

বিকেলে আমরা নদীর ধারে। নদী থেকে উত্তর দিকে তাকালে সেই ক্যাম্প দেখা যায়। সাধারণের চোখে হয়তো তা ধরা পড়বে না চট করে, গাছগাছালি দেখে বুঝতে পারবে না, নদীর ওপারে গাছগাছালির আড়ালে এই অদ্ভুত রহস্য লুকিয়ে আছে।

তা গুহামুখের আশেপাশে অজস্র বড়-বড় পাথর। নদীর জলে কোনওটা আধ-ডোবা, কোনওটা শুকনো। দিনের বেলায় এখানে সময় কাটানোর অসুবিধে কিছু নেই, রাত্রে আছে। মাথার ওপর কোনও আচ্ছাদন তো নেই।

ক'দিনের ধাক্কায়, উদ্বেগে আমরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এর পর যদি আরও দু'দিন এখানে রাত কাটাতে হয়, মরে যাব।

আমি যেন সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি। ভাল লাগছে না আর।

আনন্দও কেমন নির্বিকার হয়ে গিয়েছে। যা হচ্ছে হোক গোছের মনোভাব তার।

উৎসাহ শুধু কুমারসাহেবের। এই বয়েসে একটা মানুষ কেমন করে এত চাপ সহ্য করতে পারে কে জানে! হয়তো এইজন্যে যে, কুমারসাহেব এদিককার জলহাওয়ায় মানুষ, কোথায়-কোথায় চক্কর মেরে বেড়ান ট্রেকারে করে, তায় আবার শিকারি। আমাদের মতন কলকাতা শহরের মানুষ তো নয়। জীবনীশক্তি তাঁর বুঝি অনেক বেশি।

কুমারসাহেবের কথামতন আমরা একটা পছন্দসই জায়গা খুঁজে নিলাম। রাত কাটাতে হবে তো!

বড়-বড় কয়েকটা পাথরের আড়ালে জায়গা করা হল। শুকনো জায়গা। আমাদের কেউ দেখতে পাবে না। এই ক্যাম্পের ওয়াচ টাওয়ার থেকেও যদি কেউ দূরবিন লাগিয়ে তাকিয়ে থাকে তবুও দেখতে পাবে না।

দেখতে-দেখতে বিকেল শেষ।

স্টোভ জ্বালাল আখলা। স্টোভে ধোঁয়া উঠবে না। দূর থেকে কেউ বুঝতেও পারবে না এখানে আমরা আছি। অবশ্য স্টোভের শব্দ তো চাপা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সে-শব্দ নদী পেরিয়ে— অত দূরে ক্যাম্পে পৌঁছনো সম্ভব নয়।

আখলা চা করল। বড়-বড় মগে আমরা চা নিলাম, আর আটার রুটি, আলুর তরকারি।

খেয়েদেয়ে এবার তৈরি।

সিনেমায় দেখা অ্যাডভেঞ্চার-ছবির নায়কদের মতন লাগছিল আমাদের।

চাঁদ উঠল। ডুবেও গেল। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ। কতক্ষণ আর থাকবে।

এর পর আর আলো নেই। ধীরে-ধীরে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এখানে কোনও জনমানুষ থাকে না যে শব্দ হবে, পশুপাখিও ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন কী নদীর জলেও যেন শব্দ নেই।

কুমারসাহেব পাইপ খেতে-খেতে বললেন, "আমি সান্যালের কথা ভাবছি।"

"কেন ?"

"তার কথা যেন সত্যি হয়। সান্যালের ইনফরমেশন মতন আজ বা কাল ওই জিনিসটা আবার আসবে।"

"আজ যদি না আসে— !"

"আসবে। মনে-মনে চাইছি— আজই আসুক।"

"আপনি চাইলেই কী হয় !"

"লেট আস হোপ !"

"আপনার কী মনে হয়, সার ! আপনি তো বলছেন, বাইরের কোনও জিনিস নয়।"

"নয়। নেভার। যদি বাইরের জিনিসই বিশ্বাস করো— তবে জেনে রাখো, কোনও ইউ-এফ-ও ওভাবে ঘন-ঘন একই জায়গায় আসে না। আসা সম্ভব নয়। সাডান্‌লি আসে হয়তো, চলে যায় আবার। এই জিনিসটা বারবার একই জায়গায় আসবে কেন ? মোর ওভার, ওই জিনিসটার জন্যে এদের এমন সাজিয়ে-গুছিয়ে সিক্রেটলি বসে থাকা কেন ?"

"সেটা আমরাও এখন বুঝতে পারছি।"

"আমি বলছি, এটা কোনও মিলিটারি সিক্রেটের ব্যাপার।"

"আমাদেরও তাই ধারণা। তবে মিলিটারি হলে ওরা তো অন্য কোনও আরও দুর্গম গোপন জায়গা বেছে নিতে পারত, সার !"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমার মনে হয়, যা দেখলাম সান্যালদের ওখানে— পুরো ব্যাপারটাই এখন রিহার্সাল স্টেজের। মানে বুঝলে ?"

"মানে, মহড়া দেওয়ার স্টেজে।"

"আই থিংক সো। ...মিলিটারির ডিরেক্ট আন্ডারে নয়— মাগর ডিফেন্স প্রজেক্টে গোপনে অনেক কাজ হয়। সব দেশই করে। গত যুদ্ধের সময়, জার্মানরা করেছিল। ব্রিটিশরা করেছিল। অ্যালায়েড আর্মি করেছিল। ... জানো, আমি তখন একটা সিনেমা দেখেছিলাম। জার্মানদের একটা বিরাট ব্যারাজকে রাতারাতি গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্যে নানান পরিকল্পনা করছে ব্রিটিশ মিলিটারি। কোনও

পরিকল্পনাই মনোমতন হচ্ছে না। দু-চারটে বোমা ফেললেও কাজ হবে না। ডিরেক্ট হিট অনেক সময় টার্গেট মিস করে। আর জার্মানদের ব্যারাজটাও এমনভাবে তৈরি— ডিরেক্ট হিট করা খুব মুশকিল। তখন ওরা ডিফেন্সের আন্ডারে ঠিক নয়— অথচ লিংক আছে— এমন কয়েকজন বিজ্ঞানীকে গিয়ে ধরল। বলল, ব্যবস্থা করে দাও একটা চটপট, কেমন করে রাতারাতি ব্যারাজ গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়, অথচ ডিরেক্ট হিট হবে না। বিজ্ঞানীরা অনেক ভেবে সে-ব্যবস্থা করে দিল।"

"কেমন করে?"

"ইনডিরেক্ট হিট। টেনিস কোর্টে দেখেছ তো, একজন সার্ভ করছে, বলটা একজায়গায় পড়ে ছিটকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। ঠিক সেই রকম— প্রিন্সিপ্‌ল্। একই সঙ্গে অজস্র প্লেন এসে ব্যারাজের কিছুটা আগে, একেবারে অঙ্কের হিসেব মতন বোমা ফেলতে লাগল। জলের বিশাল ঝাপটা উঠে ব্যারাজের নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত হিট করতে লাগল। প্রায় আগাগোড়া। একসঙ্গে প্রায়। ব্যারাজ ভেঙে গেল।"

"সিনেমার গল্প?"

"না। এর মধ্যে সবটা গল্প নয়। সত্যিও আছে।"

কখন সন্ধে উতরে গেল। তারপর রাত।

এ এক অদ্ভুত অবস্থা চারপাশে। ঘন অন্ধকারে চারপাশ ডুবে আছে। নদী বয়ে চলেছে আপন মনে। তার তো দিনরাত্রি নেই, আলো-অন্ধকার নেই। গাছ, নদী, বন— যেন এইরকমই, তাদের দিন নেই রাত নেই।

আমরা পাথরের গায়ে মাথা হেলিয়ে বসে আছি। ঘুম পাচ্ছে— তবু ঘুমোতে পারছি না। এভাবে কি ঘুমোনো যায়! কোথায় কখন সাপখোপ, বিষাক্ত পোকামাকড় বেরিয়ে পড়বে!

কুমারসাহেব টর্চ জ্বেলে-জ্বেলে চারপাশ একবার দেখে নিচ্ছিলেন। তাঁরও ঘুম এসে গিয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছিল সন্ধে থেকেই। এখন আরও ঠাণ্ডা। শীত করতে শুরু করেছিল।

আরও রাত বাড়ল।

আমরা হাই তুলতে শুরু করেছিলাম।

এমন সময় আচমকা যেন কুমারসাহেবের কানে গেল শব্দটা। তিনি চমকে উঠে পিঠ সোজা করলেন। কান পেতে থাকলেন কিছুক্ষণ।

"আনন্দ, কিরপা? শুনতে পাচ্ছ?"

"একটা শব্দ!"

কত দূর থেকে শব্দটা ভেসে আসছিল। কান পেতে মন দিয়ে না শুনলে শোনা যায় না।

"সেই শব্দ! চলো পাথরের ওপারে যাই।"

আমরা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। শব্দ স্পষ্ট হচ্ছে। হতে-হতে ঠিক

ঝিঁঝির ডাকের মতন শব্দ।

অথচ অন্ধকার আকাশে কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু তারাভরা আকাশ।

"কুমারসাহেব সেই জ্যোৎস্না কোথায়?"

"ওয়েট। দেখো কী হয়!"

ক্যাম্পের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। অন্ধকারে সব ঢাকা। বোঝাই যায় না ওখানে কোনও ক্যাম্প আছে।

খানিকটা পরে আমরা একেবারে অবাক। হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম।

অন্ধকারের তলায় ক্রমশ একজায়গায় আলো দেখা দিল। কুয়াশাভরা জ্যোৎস্নার আলো যেমন হয়।

দেখতে-দেখতে আলো বাড়ল। জ্যোৎস্না যেন। কী একটা এগিয়ে আসছে। নদীর প্রায় ওপরেই। আলো আরও ছড়িয়ে পড়ল। শব্দ সেই ঝিঁঝির ডাকের মতন। ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে গেল জিনিসটা।

কুমারসাহেব আমাদের ডেকে নিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেন।

দেখতে-দেখতে মনে হল, ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে গিয়ে আলো আরও স্পষ্ট হল। অথচ ঝকঝকে নয়, শীতকালের জ্যোৎস্নার মতন।

হঠাৎ নজরে পড়ল, নৌকোর মতন বা ডোঙার মতন একটা জিনিস যেন কেউ আকাশ থেকে নামিয়ে দিল। সেটা ভাসতে লাগল।

কুমারসাহেব বললেন, "এয়ার ক্রাফ্‌ট। এরোপ্লেন।"

"কোনটা?"

"ওপরেরটা। ওটা এরোপ্লেন। কেরিয়ার প্লেন।"

"নীচেরটা?"

"বুঝতে পারছি না।"

"প্লেনের গায়ে আলো জ্বলছে। সারা গায়ে?"

"না, না। মনে হয় না।"

"তবে?"

"অন্য কোনও প্রসেস। বোধ হয় এমন কোনও ব্যবস্থা করা আছে যাতে প্লেনটার সারা গা দরকার মতন জ্বলজ্বল করে ওঠে।"

"ওই দেখুন!"

নৌকো বা ডোঙার মতন জিনিসটা এবার প্লেন থেকে আলাদা হয়ে গেল। হয়ে নীচে নামতে লাগল ভাসতে-ভাসতে।

কুমারসাহেব কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, "গ্লাইডার। ওটা গ্লাইডার।"

"সেটা কী, সার?"

"গত যুদ্ধের সময় এরকম গ্লাইডার চালু হয়েছিল। শত্রুপক্ষের সীমানার মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হত। ভেতরে সৈন্য থাকত। টাফ্‌ সোল্‌জার্‌স। তাদের সঙ্গে সমস্ত রকম আর্ম্‌স। যেখানে গিয়ে নামত গ্লাইডার সেখান থেকে লুকনো সৈন্যরা বেরিয়ে পড়ত। গ্লাইডার প্লেন নয়। চারপাশ ঢাকা মাকুর মতন। ওর নিজের

কোনও মেশিনারি নেই, ওড়ার। ভাসতে ভাসতে নীচে মাটিতে নেমে আসে। পুরনোকালে তাই ছিল। এখনকার কথা বলতে পারব না।"

গ্লাইডার যদি হয়— তবে সেটা নেমে এল। মনে হলে ক্যাম্পের মাথায়। ক্যাম্পের মধ্যে নীচে যদি কোথাও চাপা আলোর ব্যবস্থা থাকে ল্যান্ডিংয়ের, জানি না। দেখতে পাচ্ছিলাম না।

দেখার মতন দৃশ্য।

আমরা অবাক হয়ে দেখছিলাম।

এমন সময় হঠাৎ যেন কী হল ? গ্লাইডার নামতে-নামতে আচমকা নদীর ওপর চলে গেল।

তারপর দেখি, আলোর একরকম তির যেন কেউ ছুড়ে দিচ্ছে গ্লাইডার থেকে।

কুমারসাহেব প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও, চিৎকার করে বললেন, "পালাও, পালাও। শেল্টার নাও। পাথরের আড়ালে। জলদি। হারি আপ !"

আমরা ছুটতে শুরু করলাম।

নদীর বালি, জল, গর্ত— কত জোরে দৌড়ব আর ! তবু প্রাণপণে দৌড় মারলাম।

কপাল ভাল, বড়-বড় পাথর জুটে গেল।

পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ফেললাম নিজেদের।

দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় ! জিভ বেরিয়ে আসছে। হাঁপাতে লাগলাম।

কুমারসাহেব প্রায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আখলা বলল, সাহেবকে জল খাওয়াতে পারলে হত !

কিন্তু কোথায় জল ? আমাদের জলের ফ্লাস্ক তো আগের পাথরগুলোর পাশে যেখানে বসে ছিলাম সেখানে পড়ে আছে। কে এখন ফ্লাস্ক আনতে যাবে !

তবু আখলা গেল। আমরা তাকে আরও একটু অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। শুনল না।

কুমারসাহেব শুয়ে থাকতে-থাকতে একটু স্বাভাবিক হলেন।

"আমরা সবাই সেফ ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু ওটা কী ? তিরের ফলার মতন আলোর ফলা !"

"ফ্লাশ। রে গান বলে মনে হয়। ম্যাগনেটিক রে গান। তোমার দাদা বোধ হয় ওই ফ্ল্যাশ হিটে মারা গেছেন।"

"কী সর্বনাশ ! আখলা যে আপনার জন্যে জলের ফ্লাস্ক আনতে গেছে।"

"আখলা ! ও মাই গড ! তোমরা ওকে ছাড়লে কেন ?"

"আমরা ছাড়িনি। নিজেই ও চলে গেল !"

"জল আনতে গেল ! ফিরবে তো ? হায় ভগবান !"

আঠারো

আখলা গেল তো গেল, আর ফিরছিল না।

কুমারসাহেবের গলা শুকিয়ে কাঠ হলেও ক্রমশ তিনি নিজেকে খানিকটা সামলে নিলেন। ছটফট করতে লাগলেন আখলার জন্য!

আমরা কী করব! আখলা কি আমাদের জিজ্ঞেস করে গিয়েছে? ও তো নিজেই ছুটে বেরিয়ে গেল। তবু নিজেদের কেমন অপরাধী মনে হচ্ছিল।

পাথরের আড়ালে আমরা বসে আছি। ওপাশে কী ঘটছে বোঝার উপায় নেই। গুলি-গোলার শব্দ থাকে বোঝা যায়, কিন্তু ওই বিচিত্র ফ্লাশগান— বা রে গান যে-নামই হোক বস্তুটার, তার কোনও শব্দ থাকে না। শুধু আলোর ফলা, কিংবা তির। ব্যাপারটা বোঝানো মুশকিল। তবু বলি, এমন যদি হয়— আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক মারল তীব্রভাবে অথচ তারপর আর মেঘের ডাক শোনা গেল না— তা হলে যেমন হবে, এও অনেকটা সেইরকম। কোনও শব্দ নেই এই মারণ-অস্ত্রের, শুধু এক অতি-উজ্জ্বল নীলচে আলোর তির ছুটে আসে।

কুমারসাহেব বললেন, "এখন আমি কী করি! আখলাবেটা ইডিয়েট ফুল্ বুদ্ধু একটা। এ-সময় কেউ বাইরে যায়! ওর যদি কিছু হয়— কী হবে!"

"দেখুন না আর-একটু।"

"ও মারা গেলেও আমরা এখান থেকে জানতে পারব না।"

"মারা যাওয়ার কথা আগে থেকে ভাবছেন কেন—!" আনন্দ বলল। কিন্তু আমরা কেউই জোর করে কি কিছু বলতে পারি!

সময় যে কেমন করে কাটছে— কত দীর্ঘ হয়ে— তা শুধু আমরাই অনুভব করতে পারছিলাম।

আখলার জন্য উদ্বেগ আর ভয় আমাদের কেমন পাগল করে তুলছিল।

এমন সময় গলা পাওয়া গেল আখলার।

আমরা চমকে উঠলাম।

"এদিকে! আখলা এদিকে।"

আখলা এল। জলও নিয়ে এসেছে।

বাঁচলাম আমরা।

কুমারসাহেব প্রথমে খানিকটা গালমন্দ করলেন আখলাকে। একেবারে দেহাতি ভাষায়, কেন সে জল আনতে গিয়েছিল। যদি মরত, কী হত!

আখলা গা করল না। গালমন্দগুলো যেন তার এ-কান দিয়ে ঢুকে ও-কান দিয়ে বেরিয়ে গেল।

জলটল খাওয়া হলে আমরা বুকভরে শ্বাস নিতে পারলাম।

শেষে কুমারসাহেব আখলাকেই বললেন, সে নদীতে কিছু দেখেছে?

আখলা বলল, "হ্যাঁ— দেখেছে।"

"কী দেখেছিস? ওই নৌকোটা?"

"জি।"

"এখনও আছে ? কোথায় আছে ওটা ?"

আখলা যা বলল, তাতে মনে হল গ্লাইডারটা জলে ভাসছে। তবে বিজলি মারছে না।

কুমারসাহেব বললেন, "আনন্দ ! দিস ইজ ভেরি মিস্টিরিয়াস ! নদীমে ভাসছে, ব্যস ! মতলব ?"

আনন্দ মাথা নাড়ল। সে আর কী বলবে ?

কুমারসাহেব বললেন, "আমাদের পক্ষে এখন বাইরে বেরোনোও রিস্কি। ওই গ্লাইডারটা কেন ওভাবে নদীর জলে ভাসছে কে জানে ! ওরা আমাদের ওয়াচ করছে কিনা তাও জানি না।"

"তা হলে কি সারারাত এভাবে লুকিয়ে থাকতে হবে ?"

"উপায় নেই।"

"কিন্তু সার, এভাবে না থেকে যদি আমরা গুহার কাছে যাই ?"

"কেমন করে ?"

"পাথরের আড়ালে-আড়ালে বুকে হেঁটে।"

আমি বললাম, "গুহার মধ্যে জল ! সারারাত জলের মধ্যে বসে থাকব ! অসম্ভব !"

কুমারসাহেবেরও মনে হল, গুহার জলের মধ্যে বসে না থেকে এই পাথরের আড়াল অনেক ভাল।

আমার মনে হল, চুলোয় যাক গ্লাইডার। এর চেয়ে অনেক ভাল যদি আমরা গুহার মধ্যে ফিরে যাই। বেশ, জলে না হয় না বসে থাকলাম। আমাদের সঙ্গে দু-তিনটে জোরালো টর্চ আছে। জল ঠেলে গুহার ওপারে গিয়ে পৌঁছতে পারলে আমরা নিরাপদ।

কুমারসাহেব ভেবেচিন্তে বললেন, "আরও খানিকটা দেখা যাক। আমি ওই ফ্লাশ হিটকে ভয় পাচ্ছি। ও তোমার রাইফেল মেশিনগানের গুলির চেয়েও ভয়ঙ্কর। তোমাকে সাবধান হওয়ার সুযোগ দেবে না।"

"তা মানলাম। কিন্তু আমরা ওদের টার্গেট কিনা তাও জানি না।"

"কেন ?"

"আমার মনে হল, ওখান থেকে এলোপাথাড়ি আলোর তির ছুটে আসছে। আর শুধু এপাশেই নয়, ওপাশেও। মানে নদীর দু'ধারেই আলোর তির— বা ফ্ল্যাশ ছুটে গিয়েছে। কাজেই, আমরাই যে টার্গেট এমন মনে করার কারণ নেই।"

কুমারসাহেব মন দিয়ে শুনলেন আমার কথা। আসলে আমরা সবাই রহস্যময় দৃশ্যটি দেখার ঝোঁকে যখন তন্ময়, ঘোরের মধ্যে আছি— তার সামান্য পর-পরই ওই আলোর ঝিলিক ছুটে আসার মারাত্মক ঘটনাটি ঘটল—। তখন যে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ছুটছি। ভাল করে কিছু দেখার সময় কোথায় তখন ! কে কী দেখেছি, বা দেখিনি— তা যেন এখন আর মনেই পড়ে না, তালগোল পাকিয়ে

গিয়েছে।

কুমারসাহেব তবু রাজি না। তিনি কারও প্রাণের ঝুঁকি নিতে রাজি নন। বললেন, "ওয়েট ফর অ্যানাদার ওয়ান আওয়ার। এখন তিনটে বাজে। চারটে নাগাদ খানিকটা ফরসা হবে। তখন—"

"তখন তো আমরা আরও ওপ্‌ন হয়ে যাব, সার। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে হেঁটে যেতে গেলেই ওরা দেখতে পাবে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমরাও ওই গ্লাইডারটাকে দেখতে পাব।"

"তাতে লাভ ?"

"গ্লাইডারের মধ্যে যারা আছে তারা বেরিয়ে আসবে।"

"টাফ সোলজার্‌স ! ওরে বাব্বা !"

"আর একটা ঘণ্টা কাটতে দাও। তারপর আমাদের ভাগ্য ! আমি বড় ভুল করেছি, কির্‌পা ! তোমাদের নিয়ে আসা উচিত হয়নি। আমারও আসা উচিত হয়নি। আমি ভাবতেও পারিনি এরকম হবে।"

কুমারসাহেবের দোষ নেই। আমরাও কি কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম, একটা মাথা-ঢাকা ছোট নৌকো— তা গ্লাইডার হোক বা যাই হোক এভাবে নদীতে এসে নামবে ! না, নামার সময় আলোর তির ছুড়বে ?

যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এখন কোনওরকমে প্রাণটুকু নিয়ে পালাতে পারলেই বাঁচি !

সামান্য ফরসা ভাব হয়ে এল। ভোর নয়, আবার রাতও নয়। রাত কেটে খুব হালকা ফরসা ভাব হল।

কুমারসাহেব পাথরের আড়াল থেকে এগিয়ে সাবধানে মুখ বাড়ালেন। দাঁড়ালেন না। কোমর নিচু করে লুকিয়ে-লুকিয়ে বাইরেটা দেখতে লাগলেন।

বেশ খানিকক্ষণ নজর করার পর আমাদের ডাকলেন।

"দেখছ ?"

দেখতে পাচ্ছিলাম। যদিও স্পষ্টভাবে নয়। খুবই আশ্চর্যের কথা, ওই দূরে যেটা ভাসছে নদীর বুকে, তার বাইরে কোনও আলোর চকচকে ভাব নেই। গতকাল ছিল। এখন ওটাকে সাধারণ অ্যালুমিনিয়ামের মতন রঙের দেখাচ্ছে।

আনন্দ বলল, "কুমারসাহেব, এ কী ! সেই ব্রাইটনেস কোথায় গেল ?"

"তাই ভাবছি।"

"কোনও লোকও তো দেখছি না !"

"না।"

"ওটা প্রায় ক্যাম্পের কাছে। শ'দুই-তিন গজ দূরে !"

আমরা বেশিক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়ালাম না। "গুহার দিকে হেঁটে চললাম। আরও খানিকটা ফরসা হয়ে এল।

গুহার কাছে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকলাম দূরে। এই জায়গাটা অনেক নিরাপদ।

"সার !"

"বলো !"

"তা হলে এবার গুডবাই করে যাওয়া যেতে পারে।"

"চলো।... আমি অবাক হয়ে ভাবছি, গ্লাইডারটা এমন ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেল কেমন করে ? ওর ওপরে যে লুমিনাস ভাব ছিল— কোথায় গেল ! দুটো জিনিস হতে পারে। এক, ভেতর থেকে সুইচ অফ করে বাইরের আলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"

"কেন ?"

"শত্রুপক্ষের এলাকার আশেপাশে গিয়ে যখন গ্লাইডারটা নামে— তখন যাতে চট করে চোখে না পড়ে— এটা একটা কারণ হতে পারে। ঝকঝক করলে সহজেই চোখে পড়ে যাবে। হয়তো তাই কোনও সিস্টেম আছে, যাতে মাটিতে নামার পর সুইচ অফ হয়ে যায়।"

"অটোমেটিক ?"

"হতে পারে !"

"আর-একটা কারণ কী হতে পারে ?"

"ওই গ্লাইডারের কোনও মেকানিকাল ফল্ট হয়েছে।"

"তাই কি নদীতে পড়েছে ?"

"এভরি চান্স।"

আমি বললাম, "ওর মধ্যে যারা ছিল !"

"বলতে পারি না।"

আমরা আর দাঁড়ালাম না।

খানিকটা জল ঠেলে গুহার পথ দিয়ে এপাশে এলাম।

সকাল হয়েছে।

এপাশে এসে মনে হল, এ অন্য জগৎ। ফরসা হয়েছে চারপাশ। আলো ফুটেছে। সূর্যও উঠে এল প্রায়। গাছপালা, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। গতকালের ব্যাপারটা যেন এক দুঃস্বপ্ন !

আমাদের ট্রেকার গাড়ি খানিকটা আড়ালে রাখা ছিল।

গাড়ির কাছাকাছি যেতেই চমকে উঠলাম।

সান্যালসাহেব, তাঁর দুই গার্ড, আর একটা জিপ।

আমরা এত চমকে গিয়েছিলাম যে, বিশ্বাসই হচ্ছিল না এ-সময় সান্যালসাহেব এখানে হাজির থাকতে পারেন।

"আপনি এখানে ?"

সান্যালসাহেব আমাদের দেখলেন। তারপর বললেন, "আপনাদেরও কি এখানে থাকার কথা ?"

"না।"

"তবে কেন এসেছেন ? ছেড়ে দেওয়ার সময় আপনাদের বারবার বলা হয়েছিল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই এরিয়া ছেড়ে চলে যাবেন।"

কুমারসাহেব বিনয় করে বললেন, "চলেই যাচ্ছিলাম।"

"যাননি কেন ?"

"প্লিজ, আমরা..."

"আপনারা বেশি চালাক, না, বুদ্ধিমান ?"

"ভুল হয়ে গেছে। এবার সত্যিই চলে যাচ্ছি।"

"যদি বলি, আর যাওয়া হবে না !"

"কেন ?"

"আপনাদের আমরা ধরে নিয়ে যাব।"

আমরা আঁতকে উঠলাম। "কোথায় ? আবার সেই ক্যাম্পে ?"

"হ্যাঁ। এখন ক্যাম্পে। তারপর এমন জায়গায়, যেখান থেকে সহজে বেরোতে পারবেন না। ট্রায়ালে দাঁড়াতে হবে।"

কুমারসাহেবও ঘাবড়ে গেলেন। মিনতি করে বললেন, "না, না, সান্যাল ; প্লিজ ! আমরা এবার সত্যি চলে যাচ্ছি। আমাদের বড় ভুল হয়েছিল। মাফি চাইছি, প্লিজ !"

সান্যালসাহেব বললেন, "আপনারা যত চালাক, আমরা তার চেয়েও বেশি ওয়াচফুল।"

"সান্যাল," কুমারসাহেব বললেন, "আপনি আমাকে কিছু দেখাবেন বলেছিলেন। আমায় ক্যাম্পে দু-একদিন থাকতেও বলেছিলেন। এই দুই ইয়াং ফ্রেন্ডের জন্য আমি থাকতে পারিনি। ...না, আমাদের দোষ আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু আপনি আমায় যে-কথা দিয়েছিলেন তার..."

"চলুন।"

"কোথায় ?"

"ক্যাম্পে !"

"সান্যাল, প্লিজ !"

সান্যালসাহেব এবার যেন একটু সদয় হলেন, বললেন, "আমার ওপর হুকুম আছে, আপনাদের কোনও রেল স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিতে।"

আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম যেন।

"আপনারা আমার জিপে আসুন। আমার গার্ড আর আপনাদের ড্রাইভার ট্রেকারে যাক। আসুন।"

উনিশ

সান্যাল নিজে ড্রাইভারের সিটে বসলেন। তিনিই জিপ চালাবেন। কুমারসাহেব বসলেন সান্যালের পাশে। আমরা গাড়ির পেছন দিকে। অবশ্য যতটা পারা যায় সান্যালসাহেবের পিঠ-ঘেঁষে। গাড়ি খানিকটা এগোতে না এগোতে এক মজা হল। কুমারসাহেব হোহো করে হেসে উঠলেন হঠাৎ। হাসতে-হাসতে বললেন, "সান্যাল, আমি বুঝতে পেরেছি।"

"কী বুঝেছেন ?"

"আমাদের পেছনে আপনাদের লোক ছিল। ওয়াচ করছিল। নয়তো আপনারা কেমন করে জানবেন আমরা কোথায় ? মনোহর নিশ্চয় আপনাদের বলেনি।"

সান্যাল বললেন, "বলাবার কায়দা আমরা জানি। মনোহর জানে রাইফেলের কিংবা পিস্তলের একটা গুলি হেলাফেলা করার ব্যাপার নয়। তবে আপনি ওঁকে দোষ দিচ্ছেন কেন। বাস-অফিসে আপনি একটা ড্রয়িং ফেলে এসেছিলেন। অফিসে ঝোলানো ম্যাপ দেখে-দেখে এখানে আসার একটা নিশানা তৈরি করে নিয়েছিলেন মিস্টার কুমার। কাঁচা ড্রয়িং সেই কাগজটা বাস-অফিসেই পড়ে ছিল। তারপর মনোহরবাবুকে দুটো ধমক দিতেই— ।"

কুমারসাহেব হতভম্ব ! সত্যি তো, কাগজে আঁকা সেই ড্রয়িংটা তো তিনি ফেলেই এসেছিলেন। তাঁর মনেও হয়নি— এটা জরুরি। যা জানার ভাল করে বোঝার পর কে আর কাগজটার কথা ভাবে !

কুমারসাহেব ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দেখলেন একবার। "মিস্টেক হয়ে গেছে, কিরপা। ব্লান্ডার।"

আমরা আর কী বলব ! কথায় বলে, চালাকেরও বাবা আছে। আমরা হলাম অ্যামেচার, আর সান্যালসাহেবেরা হলেন পেশাদার। ওঁদের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়।

কুমারসাহেব নিজেকে সামলে নিয়ে হাসিমুখেই বললেন, "সান্যাল, বোকাদের সাত খুন মাপ। আমরা খুবই দুঃখিত।"

"হুঁ !"

"তা এবার আসল কথাটা বলুন না ? আমরা যা দেখলাম— এর রহস্যটা কী ?"

"বলা যাবে না।"

"প্লিজ !"

"এগুলো গোপন রাখাই আমাদের কাজ। কাউকে বলতে পারি না।"

"তা হলে আমি আমার ধারণার কথা বলি ?"

"আপনার কথা আপনি বলতে পারেন। সে অধিকার আপনার— আপনাদের আছে। আমি আপনাদের কথা শুনতে পারি।"

কুমারসাহেব পাইপ ধরাতে গিয়ে দেখলেন তামাক নেই। ফুরিয়ে গিয়েছে।

বিরক্ত হলেন। "একটা সিগারেট খাওয়াবেন সান্যাল ?"

"পকেটে আছে ; নিতে পারেন। তবে খুব সাবধান। এই পকেটেই আমার রিভলভার আছে, সার্ভিস রিভলবার......"

কুমারসাহেব থতমত খেয়ে বললেন, "তবে থাক।"

সান্যাল নিজেই এবার হেসে উঠলেন।

জিপ দাঁড় করালেন সান্যাল। পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে আমাদের সিগারেট দিলেন। সিগারেট কেসটা কেমন যেন। ভেতরে একটা ঘড়ির মতন কী আছে। গোল, দাগ কাটা-কাটা। কেসের ওপরের দিকে লাগানো।

লাইটারও জ্বালিয়ে দিলেন সান্যাল।

তারপর নিজেই হেসে-হেসে বললেন, "মিস্টার কুমার, বী কেয়ারফুল। আপনি, আপনারা যা বলবেন, বা আমি বলব, সবই এই খুদে যন্ত্রটুকু দিয়ে জিপের মধ্যে লুকনো রেকর্ডারে টেপ্ হয়ে যাবে।"

আমরা চমকে উঠলাম।

সান্যাল হাসতে লাগলেন। "বলুন মিস্টার কুমার— কী বলতে চান ?"

কুমারসাহেব বার কয়েক ঢোঁক গিলে বললেন, "ওটা অফ করা যায় না ? আই মিন্— এ তো আপনার সঙ্গে আমাদের পার্সোন্যাল কথা।"

"অফ করতে বলছেন ? বেশ, করে দিচ্ছি।" সান্যাল যে কী কর্ম করলেন, কে জানে ! পরে বললেন, "বলুন !"

গলা পরিষ্কার করে কুমারসাহেব বললেন, "আমরা যা দেখেছি— সেটা একটা প্লেন। স্পেশ্যালি ডিজাইন্ড। ওটার গায়ে কী আছে আমি জানি না। যে-কোনও সময়ে প্লেনটাকে ব্রাইট করা যায়, মানে ইলিউমিনেট করা যায়। প্লেনের বাইরেটা একেবারে ঝকমক করে উঠবে। জ্যোৎস্নার আলোর মতন। মুন্লাইট। বাট মিস্টি। সামথিং লাইক মিস্ট মেশানো আছে যেন। সান্যাল— আই, থিংক, দেওয়ালিতে বাচ্চারা ইলেকট্রিক তার— ম্যাগনেশিয়াম ওয়ার পোড়ালে যেমন আলো হয় রঙের— অল মোস্ট দ্যাট কাইন্ড অব লাইট। অ্যাম আই রাইট, সার ?"

"মোটামুটি।"

"তবে আলো ব্রাইট হলেও তার চাপা ভাব আছে।"

আনন্দ হঠাৎ বলল, "সান্যালসাহেব, আমার মনে হয়, প্লেনটা সবসময় ওই আলো গায়ে জ্বালিয়ে যায় না। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে লুকিয়ে আসে। যখন তার ডেসটিনেশান বা স্পটে পৌঁছে যায় তখন আলো জ্বালিয়ে দেয়। কারেক্ট, সার ?"

"বলে যান...."

এবার কুমারসাহেব বললেন, "নিজের জায়গায়— স্পটে পৌঁছবার পর বারকয়েক চক্কর মারে। তারপর একটা গ্লাইডার নামিয়ে দেয়।"

"গ্লাইডার আপনি দেখেছেন ?"

"ছবিতে দেখেছি। লাস্ট ওয়ারের সময়, পরে অনেক ইংরেজি সিনেমা আসত এদেশে যুদ্ধের। সেই সিনেমায় দেখেছি।"

"কী দেখেছেন ?"

"দেখেছি, শত্রুপক্ষের অক্যুপায়েড জোনে, নির্জন জায়গা বুঝে গ্লাইডারগুলোকে ফেলে দেওয়া হত। তার মধ্যে থাকত সোলজার্স, দশ-পনেরোজন। ভেরি টাফ। গ্লাইডার যেখানে নেমে পড়ল, সেখান থেকে সোলজারগুলো বেরিয়ে এসে খুঁজে-খুঁজে পজিশন নিত। ধরা পড়লেই শেষ।"

সান্যালসাহেব বললেন, "তাতে অনেক রিস্ক ছিল। গ্লাইডার অনেক সময় বনে-জঙ্গলে-নদীতে গিয়ে পড়ত। মানুষজনের মধ্যে। মারা গিয়েছে অনেকে। ধরা পড়ে বন্দি হয়েছে।"

"ওই নৌকো বা মাকুর মতন জিনিসটা গ্লাইডার। ঠিক কিনা বলুন ?"

সান্যাল কোনও কথা বললেন না।

আমি বললাম, "আপনাদের এখানে ওই গ্লাইডার নামানো নিয়ে কোনওরকম এক্সপেরিমেন্ট হত।"

সান্যালসাহেব বললেন, "গত পঞ্চাশ বছরে অনেক জিনিসই পালটে গিয়েছে। যেগুলো সাধারণ জিনিস ছিল তখন— এখন সেগুলো আরও জটিল হয়েছে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও তা দেখতে পান। পান না ?

"পাই।"

"মিলিটারিতে কতরকম নতুন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, রকেট, মিসাইল এসে গিয়েছে জানেন ?"

"না।"

"আপনাদের জানার দরকার নেই।"

সান্যালসাহেব দিব্যি জিপ চালাচ্ছিলেন। পাকা হাত। আমাদের সামনে কুমারসাহেবের ট্রেকার। হাত দশেক দূরে। আমরা গার্ড দুটোকে দেখতেও পাচ্ছিলাম।

কুমারসাহেব বললেন, "সান্যাল, কালকের ব্যাপারটা কিন্তু বুঝলাম না।"

"কী ব্যাপার ?"

"গ্লাইডার নদীতে পড়ল কেন ? ওটা তো আপনাদের ক্যাম্পে নামার কথা। টার্গেট মিস করেছিল ?"

"না।"

"তবে ?"

"কাল একটা মহড়া ছিল।"

"মহড়া ?.... মানে কী বলে যেন— ! এক্সারসাইজ !"

"হ্যাঁ। নদীতে নামারই কথা ছিল। ওটা একরকম ডামি।"

"ডামি ? নকল ?"

"কুমারসাহেব, আপনি বহুত কিছু জানেন। এটা বোধ হয় জানেন না। গত

ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় আকাশ থেকে— মানে প্লেন থেকে ডামি প্যারাট্রুপার্স নামানো হয়েছিল ঝাঁকে-ঝাঁকে, শত্রুপক্ষকে ভাঁওতা দিয়ে অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে। ... কালকের ওটাও এক জাতের ডামি গ্লাইডার। ওর মধ্যে কোনও লোক ছিল না।"

"লোক ছিল না ! আশ্চর্য ! তা হলে ওই যে আলোর তিরের মতন—"

"অটোমেটিক।"

"অটোমেটিক ?"

"হ্যাঁ। গ্রাউন্ড লেভেল থেকে পনেরো-বিশ ফুট উঁচুতে থাকতেই অটোমেটিক ফায়ারিং হবে।"

"এরকম ব্যবস্থা করার কারণ ?"

"আমাদের একটি লোকও মরবে না। ধরাও পড়বে না। লোক না থাকলে— শত্রুপক্ষের সীমানায় যেখানেই পড়ুক, ভয়টা কিসের ! সোজা কথায়, যে-ক্ষতি আমরা করতে চাই শত্রুপক্ষের সেটা ঠিকই হবে, অথচ আমাদের কোনও ক্ষতি হবে না।"

আমরা বুঝি না-বুঝি চুপ করে থাকলাম।

অনেকক্ষণ পরে সান্যালসাহেব বললেন, "তা হলে তো বলতে হবে এলোপাতাড়ি ফায়ারিং হল ?"

"এমনিতেও তাই হয়। স্টেনগান, মেশিনগান থেকে যখন গুলি চালানো হয়— তখন টার্গেট দেখে-দেখে গুলি চালাতে আপনি কমই দেখবেন। মিলিটারিতে একটা কথা আছে, কোন ঝোপে মুরগি লুকিয়ে আছে খুঁজতে যেয়ো না, শুট ; মুরগি থাকলে হয় মরবে না হয় ভয়ে উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।"

"ও ! আচ্ছা !"

সান্যালসাহেব বাঁকা পথ ধরলেন। আমরা ভাল রাস্তায় এসে পড়লাম।

কুমারসাহেব চারপাশ দেখতে-দেখতে বললেন, "ওই যে আলোর তিরের মতন জিনিসগুলো, ওগুলো কী, সার ?"

"ফ্ল্যাশ হিট। চলতি কথায় তাই বলে।"

"ওগুলো খুব মারাত্মক।"

"হ্যাঁ। গুলি খেয়েও লোকে বেঁচে যায়, ফ্ল্যাশ হিটে সারভাইভ করার কোনও সুযোগ নেই।"

আনন্দ বলল, "কৃপার বড়দা তবে ওতেই মারা গিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"টাওয়ার গার্ডদের গুলিতে নয় ?"

"না।"

"কিন্তু আপনি প্রথমে গুলির কথা বলেছিলেন।"

"আমাকে বলতে হয়। অফিশিয়ালি আমরা অন্য কিছু বলতে পারি না।"

"কেন ?"

"দিস ইজ অল সিক্রেট। খাতায়পত্রে কোনও রেকর্ড রাখার নিয়ম নেই।"

"আপনাদের এই ক্যাম্প কি মিলিটারির আওতায় ?"

"সরাসরি নয়। আমরা গত তিন বছর এখানে একটা প্রোজেক্ট নিয়ে কাজ করছিলাম। সেটা এখন শেষ হয়েছে। ওই ক্যাম্প ভেঙে ফেলা হবে। আমরা কেউ থাকব না। ক্যাম্পের কোনও চিহ্নও থাকবে না। একেবারে মিশিয়ে দেওয়া হবে মাটির সঙ্গে। তিন-চার মাস পরে যদি আপনারা আসেন এখানে, ক্যাম্পের কিছুই পাবেন না, ভাঙা ইট-পাথর ছাড়া.... ।"

কুমারসাহেব বললেন, "তার মানে মন্দারগড়ের রহস্য আর থাকবে না ?"

"না। আমরা পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাব।"

আমরা সবাই চুপ। বন-জঙ্গল পার হয়েছি আগেই, পিচের রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম। দু'পাশে অজস্র গাছ। মাঠ। লোকালয় তেমন চোখে পড়ছে না। একটা বাস আসছিল। আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল সামান্য পরে।

কুমারসাহেব হঠাৎ বললেন, "সান্যাল, আপনি কিছু বলবেন না বলেছিলেন, অথচ পরে অনেক কথা বলে ফেললেন।"

"আপনাদের কৌতূহল মিটিয়ে দিলাম। কিন্তু আমি যা বলেছি তা শুধু আপনারা কানেই শুনলেন। এর কোনও প্রমাণ দিতে পারবেন না। এটা গল্প হয়েই থাকবে, ফ্যাক্ট হিসেবে থাকবে না।" সান্যালসাহেব হাসলেন। পরে বললেন, "আপনারা ভাগ্যবান। কাল যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটত, কেউ আপনাদের বাঁচাতে পারত না। ..... যাক, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান।"

প্রায় আধ ঘণ্টার ওপর জিপ চালিয়ে এসে সান্যালসাহেব একটা রেল স্টেশনে এলেন।

গাড়ি দাঁড়াল।

আমরা নামলাম।

সান্যালসাহেব বললেন, "আপনাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে আমার ছুটি।"

কুমারসাহেব বললেন, "আমার ট্রেকার ?"

"আপাতত ওটা আমরা মনোহরবাবুর জিম্মায় রেখে চলে যাব। পরে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন। এখন নয়। সোজা ট্রেনে উঠে পড়বেন আপনারা। ভাববেন না। আপনাদের মালপত্র আমার লোক ট্রেনে তুলে দেবে অবশ্য।"

গাড়ি এল ঘণ্টা-দেড়েক পরে।

সান্যালসাহেব আমাদের সঙ্গে হাত মেলালেন। "গুড বাই। আপনাদের কাছে টিকিট নেই, না ? টাকা আছে ?"

"আছে।"

"আমার লোক গার্ডসাহেবকে বলে দিচ্ছে। পরে যে যার টিকিট করে নেবেন। গুড বাই।"

আমাদের বিদায় জানিয়ে সান্যালসাহেব চলে গেলেন।

ট্রেনও ছেড়ে দিল সামান্য পরে।

গো য়ে ন্দা - র হ স্য কা হি নী

হারানো ডায়েরির খোঁজে
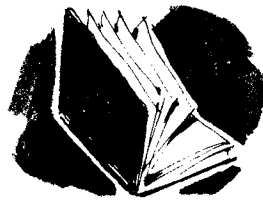
নোটন এসে বলল, "দাদা, ইশকাপনের টেক্কা এসেছে।"

নাকের ফুটোয় সর্দি-পেনসিল গুঁজে ভিক্টর জোরে জোরে টানছিল। সবেই বর্ষা নেমেছে কলকাতায়। একটানা তিনমাস গা জ্বালানো গরমের পর নতুন বর্ষার জল শহর কলকাতাকে একটু নরম করে তুলেছে ঠিকই, কিন্তু ভিক্টর বেচারির কাঁচা সর্দি লেগে গিয়েছে। সকালে একদফা, সন্ধেবেলা একদফা কাকভেজা ভিজে গেলে সর্দি লাগবে এ আর নতুন কথা কী!

ভিক্টরের নাক বোজা, গলা চুলকোচ্ছে, চোখ জ্বালা করছে। আজ সকাল থেকেই সামান্য জ্বর জ্বর ভাব। তবু সে তার অফিসে এসেছিল। কাজ থাক, না থাক, অফিসে না এলে ভাল লাগে না। গোটাদুয়েক বড়ি খেয়ে মাথাধরা এখন একটু কম ভিক্টরের। মাঝে মাঝে ঘামও হচ্ছিল। বিকেল প্রায় শেষ। আর খানিকটা পরে সে উঠে পড়বে। সোজা বাড়ি যাবে।

এমন সময় নোটন এসে বলল, "দাদা, ইশকাপনের টেক্কা এসেছে।"

ভিক্টর নাক থেকে সর্দি-পেনসিল নামিয়ে অবাক হয়ে বলল, "ইশকাপনের টেক্কা! সেটা আবার কে?"

নোটন হেসে বলল, "মুখটা দেখলেই বুঝতে পারবে!"

লিগে আজ মোহনবাগানের খেলা নেই, কাজেই মাঠে যাবার টান নেই নোটনের। ইস্টবেঙ্গলও নিশ্চয় আজ খেলছে না, নয়তো নোটন কানে ট্রানজিস্টর লাগিয়ে বসে থাকত। ইস্টবেঙ্গল পয়েন্ট হারালে নোটনের ফুর্তি বাড়ে। আজ নিশ্চয় এলেবেলে খেলা চলছে মাঠে, আর নোটনও টেক্কা-গোলাম-সাহেব নিয়ে মত্ত।

ভিক্টর বলল, "কী চায়?"

"দেখা করতে চায় তোমার সঙ্গে।"

"কে পাঠিয়েছে?"

"তা কিছু বলল না।"

"দরকার?"

"তাও বলল না। বলল, দেখা করতে চায়।"

"ডাক, দেখি কে?"

নোটন চলে গেল।

ভিক্টর হাত-পা এলিয়ে অলসভাবে বসে ছিল এতক্ষণ, এবার খানিকটা সোজা হয়ে বসল। মক্কেল হলেও হতে পারে। ঘরে ঢুকে মক্কেল যদি দ্যাখে গোয়েন্দাসাহেব, ওরফে প্রাইভেট ইনভেসটিগেটর ভিক্টর ঘোষ বা সিকিউরিটি

কনসালট্যান্ট ঘোষসাহেব—বেকার ছোকরার মতন পার্কের বেঞ্চিতে হাওয়া খাওয়ার মুখ করে শুয়ে আছে, সঙ্গে সঙ্গে ভিক্টরের সম্পর্কে ধারণা খারাপ হয়ে যাবে মক্কেলের। ভাববে, লোকটা গোয়েন্দা, না, ফুটপাথের জ্যোতিষী! সব জিনিসেরই রীতিনীতি আছে।

নোটন এক ভদ্রলোককে সঙ্গে করে ঘরে এল।

ভদ্রলোককে দেখে ভিক্টর বুঝতে পারল, নোটন কেন এই মানুষটিকে ইশকাপনের টেক্কা বলেছে। ওঁর গায়ের রংটি কুচকুচে কালো, একেবারে গোল ধরনের চেহারা, মাথায় টাক, টাকের পাশে সামান্য চুল, গায়ে ছাপছোপ মারা পুশ কোট, পরনের প্যান্টটা কালচে রঙের। গোল মুখ, মোটা মোটা হাত, গলায় বুঝি একটা সোনার ফিনফিনে হার। হাতে ছাতা।

ভদ্রলোক নমস্কার করে বললেন, "আমার নাম বলাই শাসমল।"

ভিক্টরও হাত তুলে নমস্কার জানাল, "বসুন।"

বলাই শাসমল এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বসলেন। নোটন চলে গেল।

চেয়ারে বসে শাসমল পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে এগিয়ে দিলেন। বললেন, "আমি আমার মালিকের তরফে আপনার কাছে এসেছি।"

ভিক্টর কার্ড দেখছিল। বলল, "আপনাকে কেউ পাঠিয়েছে? না, নিজেই এসেছেন?"

"পালসাহেব রেফার করলেন।"

"ও! উনি একসময়ে আমার সিনিয়র ছিলেন।"

"পালসাহেব আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন।"

ভিক্টর বার-দুই হেঁচে ফেলল জোরে জোরে। রুমাল দিয়ে নাক মুখ মুছল। বলল, "বৃষ্টিতে ভিজে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে।...তা বলুন আমি কী করতে পারি?"

শাসমল বললেন, "আমি এসেছি আপনার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে। আমার মালিক মিস্টার সুনন্দন সিনহা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। বাড়িতে।"

"কার বাড়িতে?"

"মিস্টার সিনহার কাশীপুরের বাড়িতে।"

ভিক্টর বলল, "তাঁর বাড়িতে গিয়ে কেন? আমি ডাক্তার নই যে 'কল' দিলে রোগী দেখতে পেশেন্টের বাড়িতে যাব!"

বলাই শাসমল সামান্য থতমত খেয়ে গেলেন। সামলে নিয়ে বললেন, "না, সেজন্যে নয়। মিস্টার সিনহা অসুস্থ। ওঁর একটা চোখে অপারেশান হয়েছে। বিছানায় শুয়ে আছেন। ওঁর পক্ষে এখন বাইরে বেরোনো সম্ভব নয়।"

ভিক্টর যেন অপ্রস্তুত বোধ করল। "ও! সিক। কী হয়েছে চোখে?"

"কাচের গুঁড়ো ঢুকে গিয়েছে।"

"সে কী!...তা এখন?"

"ভাল আছেন।"

ভিক্টর টেবিল থেকে সর্দি-পেনসিল তুলে নাকে গুঁজল। টান মারল। "তা হলেও ব্যাপারটা আমার আন্দাজ করা দরকার। আপনার মালিক ঠিক কী জন্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান?"

শাসমল বললেন, "সেটা উনিই বলবেন। আমি শুধু বলতে পারি, আপনাকে একটা ডায়েরি-খাতা খুঁজে দিতে হবে।"

ভিক্টর অবাক। শাসমল কি পাগল? না, তাঁর মালিক পাগল? একটা ডায়েরি-খাতা খুঁজতে কেউ গোয়েন্দার কাছে আসে?

ভিক্টর বলল, "ডায়েরি-খাতা খুঁজে দেবার জন্যে আমায় নিয়ে যেতে চান? এরকম কথা তো আমি কখনও শুনিনি মশাই।"

বলাই শাসমলের একটা মুদ্রাদোষ আছে, মাঝে মাঝেই তাঁর যেন চোয়াল আটকে যায়। সেটা আলগা করে নেবার জন্যে হাঁ করেন। বার দুই হাঁ করে শাসমল বললেন, "এটা সাধারণ ডায়েরি নয়। ওই একটা ডায়েরির অনেক দাম। টাকাপয়সার হিসেবে তার দাম ধরবেন না। ওটার অন্য মূল্য।"

ভিক্টর একদৃষ্টে শাসমল বা ইশকাপনের টেক্কাকে দেখতে লাগল। ভদ্রলোক দেখতে হয়তো খানিকটা রগুড়ে মনে হয়। কিন্তু পাগলাটে বলে তো মনে হয় না। ওপরচালাক, চতুর, ছটফটে স্বভাবের মানুষও শাসমল নন। শান্ত ধরনের কথাবার্তা।

ভিক্টর কৌতূহল বোধ করল। বলল, "আপনার কার্ড দেখে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন। আপনি, মানে আপনারা কী করেন? কী ধরনের ব্যবসা আপনাদের?"

বলাই শাসমল বললেন, "আমরা অর্ডার সাপ্লায়ার। সার্কাসে জন্তু জানোয়ার সাপ্লাই করি।"

ভিক্টর থ মেরে গেল। তারপর বলল, "বলেন কী! সার্কাসের আবার অর্ডার সাপ্লায়ার থাকে না কি!"

"আমরা তো রয়েছি", বলে শাসমল একটু হাসলেন। "আমাদের কোম্পানির বয়স তিরিশ বছর হয়ে গেল।"

"সিলভার জুবিলি শেষ!"

"বলতে পারেন। এক সময় ছোটখাটো রাজারাজড়ারা, জমিদারগোছের লোকেরা আমাদের কাছ থেকে বাড়ির চিড়িয়াখানার জন্যে পাখি, ময়ূর, হাতি পর্যন্ত কিনতেন। এখন ওসব নেই। সার্কাসের মালিকরাই যা কেনেটেনে।"

"এই ধরনের ব্যবসা চলে?"

"চলছে। তবে আগের মতন চলে না।"

"ব্যবসাটা কে শুরু করেছিল?"

"সুনন্দনবাবুর বাবা। ভাল শিকারি ছিলেন। নিজে একটা সার্কাসপার্টিও খুলেছিলেন। 'দি গ্রেট নিউ বেঙ্গল সার্কাস'। সার্কাসটা বেশি দিন চালাতে পারেননি। জন্তু জানোয়ার সাপ্লাইয়ের ব্যবসাটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমি অবশ্য তখন ছিলাম না। পরে এসেছি।"

ভিক্টর নোটনকে ডাকল কলিং বেল বাজিয়ে। ডেকে দু'কাপ চা দিতে বলল।

"আপনারা বাঘটাঘ সাপ্লাই করেন নাকি?" ভিক্টর হেসে বলল।

"আগে হয়েছে। এখন হয় না।"

"সিংহ?"

"না। এখন যা হয় তার মধ্যে হাতি-ঘোড়া-বাঁদর ছাড়া আছে পাখি-সাপ-ময়ূর-কুকুর...।"

"সার্কাসে ময়ূর দেখিনি তো?"

"না, ময়ূর আর পাখি এমনি অনেকে কেনে। মাঝেসাঝে সিনেমার লোক আসে ভাড়া নিতে। রেয়ার। সেদিন একটা সিনেমাপার্টির একজোড়া ময়ূর দরকার হয়েছিল। পাঠিয়ে দেওয়া হল। ফেরতও আনলাম। তারপর কী ঝামেলা। টাকা আদায় হয় না। ঝগড়াঝাঁটি থেকে হাতাহাতি। সিনেমাপার্টি মানেই বজ্জাতের দল।"

ভিক্টর হেসে ফেলল।

শাসমল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন। লাইটার। "আসুন", বলে প্যাকেট এগিয়ে দিলেন।

"পরে। সর্দিতে গলা খসখস করছে। আপনি খান", বলে ভিক্টর এবার বন্ধু বন্ধু গলায় বলল, "শাসমলবাবু, এবার আপনি আমায় ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট করে বলুন তো? ডায়েরি হারানোর ব্যাপারটা ঠিক কী?"

শাসমল একটা সিগারেট ধরালেন। অল্প চুপ করে থেকে বললেন, "আপনাকে আমি সব কথা বলতে পারব না। আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি, গার্ডনার বলে এক খ্যাপা সাহেব ছিলেন। লোকে তাঁকে গানাসাহেব বলত। তিনি ছিলেন মিশনারি। বনে-জঙ্গলে পাহাড়তলির ছোট ছোট গ্রামে কাঠুরে, গরিব মানুষের কুঁড়েতে ঘুরে বেড়াতেন। এই সাহেব একটা ডায়েরি লিখেছেন। তাতে এক জায়গায় আছে, তিনি বামনের মতন একজোড়া মানুষ দেখেছেন যাদের গায়ের রং একেবারে নীল। মাথার চুল সাদা ধবধবে। তারা মানুষের মতন কথা বলতে পারে না, কিন্তু নানাধরনের শব্দ করতে পারে, ইশারা করতে জানে। এরা গাছের ছাল, জন্তুর চামড়া দিয়ে তৈরি জামা পরে।"

ভিক্টর অবাক হয়ে শাসমলের কথা শুনছিল। নীল মানুষ। সেটা আবার কী! সাদা, কালো, বাদামি—এমনকী পীত বা হলুদ-ঘেঁষা রঙের মানুষ আছে। সেভাবে ধরলে, সোনালি রং-অলা মানুষও চোখে পড়ে। কিন্তু নীল মানুষ কোথাও আছে বলে ভিক্টর শোনেনি। অবশ্য এই পৃথিবী এত বড়, এত দেশ, এতরকম মানুষ যে, কোথায় কী আছে আর কী নেই বলা মুশকিল।

ভিক্টর ঠাট্টার গলায় বলল, "নীল গাইয়ের কথা শুনেছি শাসমলসাহেব, নীল মানুষের তো কথা শুনিনি।"

শাসমল বললেন, "ব্যাপারটা অদ্ভুত। ভাবলাম, আপনি ডিটেকটিভ মানুষ..."

শাসমলকে থামিয়ে ভিক্টর বলল, "গোয়েন্দা হলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু তার নখদর্পণে থাকবে এমন একটা ধারণা রাইটাররা চালু করে দিয়েছে। গোয়ালে গোরু

আছে, আধ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে কোনও কোনও গোয়েন্দা বলে দিতে পারে, গোয়ালে ক-টা গোরু আছে, কী ধরনের গোরু, এক একটা গোরু কত দুধ দিতে পারে...। না মশাই, আমি অত বড় গোয়েন্দা নই।" বলে ভিক্টর হেসে উঠল।

শাসমলও হাসলেন। মনে হল, কথাটা তাঁর পছন্দ হয়েছে। বললেন, "যা বলছিলাম। গানাসাহেবের এই ডায়েরিটা খুবই মূল্যবান আমার মালিকের কাছে। তিনি সেটা উদ্ধার করতে চান।"

নোটন চা নিয়ে এসেছিল। টেবিলে নামিয়ে রাখল। রেখে ভিক্টরের দিকে একটু চোখের ইশারা করল মুচকি হেসে। যেন বলল, ইশকাপনের টেক্কা কি না বলো?

চলে গেল নোটন।

ভিক্টর বলল, "একজোড়া নীল বামনের কথা ডায়েরিটাতে আছে, এইজন্যেই কি আপনার মালিক ডায়েরিটাকে মহামূল্য মনে করেন?"

"একরকম তাই। তবে অন্য অনেক কিছু ওর সঙ্গে থাকতে পারে।"

"আপনি জানেন না?"

"সামান্যই জানি। যা জানি তা শুনে আপনার লাভ হবে না। আমারও বলা উচিত নয়, কারণ, মালিক আমায় এ সব কথা আলোচনা করতে বলেননি। তিনি শুধু আপনার সাহায্য চান, এটাই জানাতে বলেছেন।"

ভিক্টর দু মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। খুবই বিশ্বস্ত ম্যানেজার শাসমল। বলল, "নিন, চা খান।...তা সেই সাহেব কোথায়?"

" তিনি অনেক দিন মারা গেছেন।"

"তাঁর ডায়েরি আপনার মালিকের হাতে এল কেমন করে?"

"সুনন্দনবাবুর বাবার সঙ্গে গানাসাহেবের খুব বন্ধুত্ব ছিল। মারা যাবার সময় সাহেব নিজেই সুনন্দনবাবুর বাবাকে দিয়ে যান।" শাসমল চায়ের কাপ উঠিয়ে নিলেন।

ভিক্টর নিজের চায়ের কাপে চুমুক দিল। অন্যমনস্ক হয়ে থাকল সামান্য। পরে বলল, "সুনন্দনবাবুর বাবা?"

"গত হয়েছেন।"

"কত দিন আগে?"

"বছর ছ-সাত।"

"মারা যাবার সময় কত বয়েস হয়েছিল?"

"বেশি নয়। তেষট্টি-চৌষট্টি। স্ট্রোক হয়েছিল। সেরিব্রাল।" ধীরে ধীরে চায়ে চুমুক দিলেন শাসমল। "দুর্ধর্ষ মানুষ ছিলেন মহানন্দন। পাথরের মতন চেহারা। লম্বা-চওড়ায় সমান। এক একটা হাত যেন বাঘের থাবা। খেতে ভালবাসতেন। ডাক্তারদের কথা শুনতেন না। মারাও গেলেন খাবার টেবিলে।...মানুষটিকে না দেখলে তাঁর সম্পর্কে বোঝা যায় না। কিন্তু তিনি তো আর নেই।"

ভিক্টর বলল, "মহানন্দন-সুনন্দন, এরকম নামও তো বড় শোনা যায় না।"

"নন্দনটা ওঁদের পারিবারিক ব্যাপার। সুনন্দনবাবুর ছোট ভাইয়ের নাম বিশ্বনন্দন।"

"সুনন্দনবাবুর বয়স কত?"

"চল্লিশের কম। বছর ছত্রিশ।"

"মহানন্দন যখন মারা যান, সুনন্দনের বয়েস ছিল মোটামুটি তিরিশের মতন।...আপনি কি বলতে পারেন সেই মিশনারিসাহেব কখন মহানন্দনবাবুকে তাঁর ডায়েরিটা দেন?"

মাথা নাড়লেন শাসমল, "না। আমি জানি না।"

ভিক্টর একটু চুপ করে থেকে বলল, "আপনি নিজের চোখে ডায়েরিটা দেখেছেন?"

"দেখেছি।"

"কত দিন আগে ডায়েরিটা খোয়া গেছে?"

"ধরা পড়েছে হপ্তা-দুই আগে। কবে খোয়া গেছে সঠিক করে বলা মুশকিল। তবে মাসখানেকের মধ্যেই।"

ভিক্টর চা খেতে খেতে একটা সিগারেট তুলে নিল। মনে মনে যেন হিসেব করছিল। বলল, "সুনন্দনবাবু কাউকে সন্দেহ করেন?"

"আপনি কথা বলে দেখবেন।...ডায়েরি চুরির ঘটনা যেদিন সুনন্দনবাবুর চোখে ধরা পড়ল, তার দিন দুই-তিন পরে ওঁর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হল। কপালে হাতে চোট লাগল। তবে মারাত্মক যা হল সেটা ওঁর চোখে কাচ ঢুকে যাওয়া। ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন, নেহাত ছোট এক-আধটা টুকরো কাচের কুচি ঢুকেছিল, নয়তো চোখটা নষ্টই হয়ে যেত।"

ভিক্টর যেন অবাকই হল। ডায়েরি চুরির সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্টের সম্পর্ক আছে নাকি? না, নিতান্তই দুটি ঘটনা পরপর ঘটে গিয়েছে।

"অ্যাক্সিডেন্ট হল কেমনভাবে?" ভিক্টর বলল।

"সেটাও অদ্ভুত", বলাই শাসমল বললেন, "গ্যারাজ থেকে জিপগাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছিলেন সুনন্দন। হঠাৎ একটা লোহার তেকোনা রড, মানে অ্যাঙ্গেল, জিপের সামনের কাচের ওপর পড়ে গেল। এত আচমকা ঘটনাটা ঘটে যে, উনি ব্রেক করতে একটু সময় লাগে। কাচটা চুরমার। জিপের মাথার দিকটাও সামান্য তেবড়ে গিয়েছে।"

"লোহার অ্যাঙ্গেল কেমন করে এল?"

"বলতে পারব না। আপনি যখন যাবেন সবই দেখবেন।"

ভিক্টর ভাবল কিছুক্ষণ। বলল, "ঠিক আছে। যাব।"

"কবে? আজ?"

"না। আজ আমার শরীরটা ভাল নেই। কাল যাব। সন্ধের আগেই। ঠিকানা রেখে যান।"

"কার্ডেই আছে।"

ভিক্টর কার্ডটা দেখল, "আপনি কি একই বাড়িতে থাকেন?"

"না", শাসমল মাথা নাড়লেন। "আমি কাছেই থাকি, গ্যালিফ স্ট্রিটে। আমার ঠিকানাটা আমাদের অফিসের, 'লিটল জু'।...আপনি যদি বলেন, আমি এসে নিয়ে

যেতে পারি।"

"কোনও দরকার নেই। আমি যাব। জায়গাটা একটু বলে দিন।"

শাসমল জায়গাটা বুঝিয়ে দিলেন। রেল ইয়ার্ডের প্রায় গায়ে।

চা শেষ করে শাসমল বললেন, "আপনার সঙ্গে ফিজ, মানে টাকাপয়সার ব্যাপারে কোনও কথা হল না...?"

ভিক্টর বলল, "আগে আমি যাই, সুনন্দনবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলি। তারপর দেখা যাবে।"

"তবু?"

"ছোটখাটো কাজ হলে দেড়-দু হাজারের বেশি লাগার কথা নয়। আর যদি লেগে থাকতে হয়, আমরা আপনাদের নামে বিল করব। বিল হিসেবে পেমেন্ট।"

শাসমল বললেন, "আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের তরফ থেকে..."

"সে কাল দেখা যাবে।"

"তা হলে আজ আমি উঠি?"

"হ্যাঁ, আসুন। একটা কথা, আপনি কি বরাবরই এঁদের কাজকর্মের সঙ্গে আছেন?"

শাসমল উঠে পড়েছিলেন। বললেন, "না। আমি এঁদের সঙ্গে বছর-আষ্টেক রয়েছি। মহানন্দনবাবুর আমলেই এসেছিলাম। ওঁর জীবনের শেষের দিকে।"

"তার আগে?"

শাসমল কয়েক পলক তাকিয়ে থাকলেন, তারপর বললেন, "আমি সার্কাসে খেলা দেখাতাম। ড্যাগার থ্রোয়ার। চোখ বাঁধা অবস্থায় ছোরা ছুড়তাম।"

ভিক্টর অবাক হয়ে শাসমলকে দেখতে লাগল।

লিটল জু

পরের দিন বিকেলে এক পশলা বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার থাকলেও আর জলভরা ঘন মেঘ চোখে পড়ছিল না। বৃষ্টি হওয়ার কথা বলা যায় না, তবে তার আশা কম।

ভিক্টর তার অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। নোটনকে বলল, "তুই অফিস বন্ধ করে চলে যাস।"

নীচে নেমে স্কুটার নেবার সময় ভিক্টর দেখল, কোনও হতচ্ছাড়া ছেলে স্কুটারের সিটের ওপর একপাটি ছেঁড়া কাদা মাখা হাওয়াই চটি রেখে পালিয়ে গিয়েছে। এখানে হরদম এইরকম হয়। রাজ্যের গাড়ি, স্কুটার, মোটরবাইক পড়ে থাকে নীচে, কে কার খবর রাখে!

সিটটা মুছে নিয়ে ভিক্টর স্কুটারের চাকা দেখে নিল। হাওয়া ঠিক আছে।

এখনও বিকেল ফুরিয়ে যায়নি। ঘড়ির কাঁটায় অবশ্য এখন আর বিকেল নয়। কিন্তু আকাশ মেঘলা থাকা সত্ত্বেও আলো রয়েছে। আষাঢ় মাসের বিকেল। আলো মরতে দেরি হবে।

ভিক্টর বেরিয়ে পড়ল। ভিড়ভাড়াক্কা ঠেলে টালা পর্যন্ত যেতে কম করেও পঁয়তাল্লিশ, জ্যামে পড়লে ঘণ্টা দেড়েক।

ভিক্টর ঠিক করে নিয়েছিল, টালার ব্রিজ পর্যন্ত গিয়ে বাঁ-হাতি রাস্তা নেবে। কাশীপুর তার চেনা জায়গা নয়। দেখেছে, এইমাত্র।

কাল মাঝে মাঝেই সে লিটল জু, সুনন্দন, শাসমলবাবুকে নিয়ে ভেবেছে। কিছুই আন্দাজ করতে পারেনি। মানুষের কত রকম পেশাই না হয় । সত্যি, ভিক্টর কোনওদিন শোনেনি, সার্কাসওলাদের পশুপাখি জুগিয়ে দেবার জন্যে কেউ কোম্পানি খোলে! আজব ব্যাপার! জন্তু জানোয়ার বিক্রি হয় এটা ঠিক, তা বলে ব্যবসা হিসেবে ব্যাপারটা নেওয়া রীতিমতো ঝামেলার কাজ।

কেউ যদি এই ঝামেলার কাজ নেয় নিক, কী-বা করা যাবে! পেশা পেশাই। সুনন্দনের পেশা নিয়ে ভিক্টর মাথা ঘামাতে চায় না। তার অন্য কাজ। একটা পুরনো ডায়েরি খুঁজে বার করা। হতে পারে ডায়েরিটা হারিয়ে গিয়েছে। বা চুরি গিয়েছে। শাসমলের কথাবার্তা থেকে মনে হল, তাদের সন্দেহ চুরি গিয়েছে।

কিন্তু চুরি যাবে কেন? একজোড়া বামন, যাদের গায়ের রং নীল, তাদের ব্যাপারে কৌতূহল থাকতে পারে মানুষের। কৌতূহল থাকলেই কি চুরি করতে হবে? কেন করবে? দরকার কী? তা হলে কি বুঝতে হবে—নীল বামন যত না অদ্ভুত তার চেয়েও বেশি কোনও রহস্য রয়েছে ওদের ঘিরে। বা ওরা কিছু নয়, চুরি যাওয়া ডায়েরির মধ্যে অন্য কিছু আছে?

ভিক্টর কোনও কিছুই আন্দাজ করতে পারছে না আগেভাগে। দেখা যাক সুনন্দন কী বলে?

বাড়ি খুঁজে পেতে তেমন অসুবিধে হল না ভিক্টরের। রেল ইয়ার্ডের গায়ে গায়েই একরকম। বাঁ দিকে কাশীপুর ব্রিজ। খালের দুর্গন্ধ।

ভিক্টর স্কুটার থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল বাড়িটাকে। অনেক পুরনো। অন্ধকার হয়ে আসায় বাড়িটাকে যেন আরও পুরনো দেখাচ্ছে। ভাঙা ফটক। ফটকের একপাশে একটা ময়লা সাইনবোর্ড 'লিটল জু'।

ফটকের সামনে দরোয়ানের ঘর। দরোয়ান যে কে বোঝা যায় না। জনা তিনেক হিন্দুস্তানি মিলে উনুন ধরাচ্ছে, কয়লার ধোঁয়া উঠেছে, নিজেদের মনেই গল্প করছিল।

ভিক্টরকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না । স্কুটার নিয়ে ঢুকে পড়ল সে।

ভেতরে এসে ভিক্টরের মনে হল, এ যেন সেই কোম্পানির আমলের বাড়ি। ভাঙাচোরা, ইটখসা, আগাছায় ভর্তি। একটু নজর করতেই বোঝা গেল, বাড়ির সামনের দিকটা গুদোম হিসেবে ভাড়া দেওয়া। ভাঙা টেম্পো পড়ে আছে গোটা তিনেক, ছোট মাপের লরি। গন্ধ উঠছিল বিচিত্র।

আরও খানিকটা এগিয়ে আসতেই ভিক্টর শুনল, কে যেন তাকে ডাকছে।

বলাই শাসমল।

"এদিকে।" বলাই শাসমল এগিয়ে এসে ডাকলেন, "আসুন।"

ভিক্টর বলল, "আপনি আছেন?"

"আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। এদিকে আসুন। বাড়ির সামনের দিকটা রেশন দোকান, গোডাউন, প্লাস্টিক কারখানা। বাড়ির কেউ এদিকে থাকে না। পেছন দিকে থাকে। আসুন।"

শাসমল পথ দেখিয়ে বাড়ির পেছনের দিকটায় নিয়ে গেলেন। ভিক্টর দেখল, এপাশটা অন্যরকম। পুরনো, ভাঙাচোরা চেহারা হলেও অনেক পরিষ্কার। মানুষজন থাকে বলেই মনে হয়। সামনের বড় বারান্দায় কাঠের জাফরি, আলো জ্বলছে। মাঠের মতন জায়গাটায় কিছু ফুলগাছের ঝোপ। অনেকটা তফাতে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা গোলমতন একটা জায়গা।

ভিক্টর বলল, "ওটা কী?"

"ওটা! ওটা আমাদের জন্তু জানোয়ার রাখার জায়গা । রাত্তিরে ভাল বুঝতে পারবেন না। দিনের বেলায় দেখবেন। দেখার মতন এখন কিছু পাবেন না। গোটা চারেক হরিণ, আধ ডজন বাঁদর, কিছু পাখি, দু জোড়া ময়ূর, আর একটা ভাল্লুক আছে। ভাল্লুকটা বুড়ো। মরার সময় হয়েছে। হাতি আর নেই। বছর-দুই আগে একটা উট জোটানো গিয়েছিল। বিক্রি হয়ে গিয়েছে।"

ভিক্টর স্কুটার রাখল একপাশে।

বাড়িটা দোতলা। পুরনো আমলের বলে ছাদ এত উঁচু যে, মনে হয়, তিনতলার সমান বাড়ি।

শাসমল ভিক্টরকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে কাঠের জাফরি-ঘেরা বারান্দা টপকাল।

বারান্দার মধ্যেই বসার জায়গা। বাতি জ্বলছিল। বেতের সোফাসেটি, পায়ের তলায় বিয়ে বাড়ির শতরঞ্চির মতন এক বড় শতরঞ্চি। পাতাবাহারের গোটা দুয়েক টব। দেয়ালে এক জোড়া হরিণের শিং ঝুলছে।

শাসমল বললেন, "বসুন। আমি সুনন্দনকে ডেকে আনি।"

ভিক্টর লক্ষ করল, তার অফিসে বসে মালিককে আপনি আজ্ঞে করলেও বাড়িতে সেই সৌজন্য দেখাবার দরকার পড়ে না শাসমলের।

ভিক্টর এপাশ-ওপাশ লক্ষ করছিল । নীচে যেখানে সে বসে আছে, তার ডানপাশে একটা দেয়াল। পুরো নয়, আধাআধি। মাথার দিকের গড়নটা তোরণের মতন। ওপাশে ঘরদোর। এখান থেকে দেখা যায় না। বাঁ দিকে কাঠের সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলায়। সিঁড়ির মুখে একটা ঘর। খড়খড়ি দেওয়া দরজা। দরজা বন্ধ ছিল।

ভিক্টর একটা সিগারেট ধরাল। আজ তার সর্দির ভাব অনেকটা কমে গিয়েছে। মাঝে মাঝে নাক ভারী হয়ে উঠছে ঠিকই তবে মাথায় কপালে যন্ত্রণা কম।

সামান্য পরেই পায়ের শব্দ শুনল ভিক্টর। সিঁড়ির দিকে তাকাল। সুনন্দন নেমে আসছে রেলিং ধরে। তার পাশে বলাই শাসমল।

সুনন্দন নীচে নেমে এল। পরনে পাজামা, গায়ে পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির একটা কি দুটো বোতাম লাগানো, বাকিগুলো খোলা।

সুনন্দন কাছে আসতেই ভিক্টর তাকে নজর করে দেখল। দেখতে সুশ্রী। মাঝারি

স্বাস্থ্য। মাথার চুল কোঁকড়ানো। চোখে গগলস্ ধরনের চশমা। একটা চোখের ওপর পাতলা প্যাড লাগানো আছে এখনও। লিউকোপ্লাস্ট দিয়ে প্যাড আটকানো।

বলাই শাসমল কিছু বলার আগেই সুনন্দন হাত তুলে নমস্কার করল।

ভিক্টরও নমস্কার জানাল।

শাসমল বললেন, "সুনন্দন, তুমি বোসো, আমি একটু চায়ের কথা বলে আসি।"

সুনন্দন বসল। বলল, "চা না কফি?"

ভিক্টর বলল, "যা হোক, আমার আপত্তি নেই।"

শাসমল আবার সিঁড়ির দিকে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর সুনন্দন বলল, "আমরা মিস্টার টি. কে. পালের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ করেছিলাম। উনি অসুস্থ। আপনার সঙ্গে কথা বলতে বললেন।"

ভিক্টর বলল, "মিস্টার পাল আমার সিনিয়ার ছিলেন। উনি অসুস্থ? কী হয়েছে?"

"বললেন, হার্টের একটু গোলমাল। সিরিয়াস নয়। বিশ্রাম নিচ্ছেন।"

ভিক্টর কিছু বলল না। একদিন পালসাহেবের খবর নিয়ে আসতে হবে। তবে ভিক্টরের মনে হল, 'স্টার সিকিউরিটি সার্ভিস' থেকে বেরিয়ে এসে পালসাহেব নতুন যে ফার্ম খুলেছিলেন, সেটা পাঁচহাতে পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় উনি বেজায় ধাক্কা পেয়েছেন। অনর্থক অনেক টাকাও নষ্ট হয়েছে ওঁর।

সুনন্দন বলল, "আপনার সঙ্গে বলাইদার কথাবার্তা হয়েছে, শুনেছেন তো সব?"

ভিক্টর তাকাল। মাথা নাড়ল। বলল, "না। আমি বারো আনা কথাই শুনিনি। শুধু শুনলাম, আপনার কাছে এক সাহেবের একটা ডায়েরি-খাতা ছিল । সেটা মহামূল্যবান। ডায়েরিটা খোয়া গিয়েছে। খুঁজে দিতে হবে।"

সুনন্দন বলল, "হ্যাঁ। ডায়েরিটা নানাদিক দিয়েই মূল্যবান।"

ভিক্টর বলল, "ডায়েরির কথা বলুন। শুনলাম, গার্ডনার বলে এক সাহেবের লেখা..."

"হ্যাঁ! গার্ডনার ছিলেন এক মিশনারি পাদরি। তিনি ক্যাথলিক ছিলেন। এক সময় রাঁচির দিকে মিশনারি স্কুলে পড়াতেন। পরে মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে আদিবাসীদের মধ্যে কাজকর্ম করে বেড়াতেন। মানুষটি বড় ভাল ছিলেন। খ্যাপা-গোছেরও ছিলেন। আমি তাঁকে দেখেছি। আমার বাবার সঙ্গে পাদরিসাহেবের বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। কখনও কখনও তিনি বাবার কাছে এসে থাকতেন দশ-পনেরো দিন।"

"এখানে? কলকাতায়?"

"না। আমাদের একটা ছোট বাড়ি ছিল। কাঠের বাংলো বাড়ি। ঢালপাহাড়ি বলে একটা জায়গায়।"

"জায়গাটা কোথায়?"

"পঞ্চকোট পাহাড়ের কাছে। আপনি আদ্রা দিয়ে যেতে পারেন। আবার আসানসোল দিয়েও যেতে পারেন।"

"বাড়িটা কি শখের জন্যে করা হয়েছিল?"

"অনেকটা তাই। তবে বাবা জঙ্গল পশুপাখি ভালবাসতেন। আমাদের ব্যবসাও

ছিল জন্তু জানোয়ার বিক্রির। বাড়িটা বাবার কাজেও আসত।"

"সেই বাড়ি এখনও আছে?"

"না। বিক্রি হয়ে গেছে।"

"ডায়েরিতে সাহেবের নিজের কথা ছিল, না, আরও কিছু ছিল?"

সুনন্দন চশমায় হাত দিল। তার রঙিন চশমার ভেতর দিয়ে চোখ দেখা যাচ্ছে না। প্যাড পরানো চোখটার, কপাল আর গালের দিকে লিউকোপ্লাস্ট লাগানো। সুনন্দন বলল, "নিজের কথা বলতে যা দেখতেন টেখতেন তার কথা, গাছপালার কথা, প্রকৃতির কথা, মানুষের কথা। মাঝে মাঝে বাইবেলের কোনও কথার ব্যাখ্যা, নিজে যা মনে করেছেন।"

ভিক্টর বলল, "তা হলে এই ডায়েরি এত মূল্যবান কেন?"

সুনন্দন বলল, "ওই ডায়েরির মধ্যে দু-চারটে কথা আছে..."

"যেমন, নীল রঙের মানুষের কথা?"

সুনন্দন ঘাড় নাড়ল। বলল, "দুজনের কথা। ওদের গায়ের রং নীল। মাথায় বামন। মানুষের ভাষায় কথা বলতে জানে না। স্বভাব খানিকটা বনমানুষের মতন।"

ভিক্টর আরাম করে বসল। পা ছড়িয়ে দিল সামনের দিকে। সুনন্দনকে লক্ষ করছিল। বলল, "এই দুজন নীল বামনের জন্যেই কি ডায়েরিটা অত মূল্যবান?"

সুনন্দন কিছু বলতে যাচ্ছিল, সিঁড়িতে শব্দ শোনা গেল পায়ের । শাসমল আসছেন। সঙ্গে বাড়ির বুড়ো মতন এক কাজের লোক। হাতে ট্রে।

শাসমলরা নীচে এলেন।

সামনের গোলমতন বেতের সেন্টার টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখল বুড়ো লোকটি। রেখে চলে গেল।

ভিক্টর দেখল, তিন পেয়ালা কফি। একটা গোল ডিশে বড় বড় কিছু শিঙাড়া।

শাসমল বললেন, "নিন। ঘরে ভাজা শিঙাড়া। বর্ষার দিন, ভালই লাগবে।" বলে ডিশটা টেবিল থেকে তুলে ভিক্টরের দিকে এগিয়ে দিলেন।

ভিক্টর হেসে বলল, "পরে নিচ্ছি। বেশি গরমে জিভ পুড়ে যাবে।"

শাসমলের দিকে তাকাল সুনন্দন। বলল, "আপনি বসুন, বলাইদা।"

বলাই শাসমল বসলেন।

ভিক্টর সুনন্দনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি যেন কী বলছিলেন? নীল বামনের কথা?"

সুনন্দন বলল, "এই অদ্ভুত দুই জীব, মানুষই বলুন বা বনমানুষ বলুন, এখনও বেঁচে আছে কি না আমি জানি না। কিছুদিন আগে, মাস-দুই আগে আমি একটা চিঠি পাই। 'প্যান্থার সার্কাস' নামে এক সার্কাস আমাদের চিঠি লিখে জানায়, তারা শুনেছে যে, আমাদের কাছে ব্লু ডোয়ার্ফ নামের এক জন্তু আছে, মানুষের মতন দেখতে। ওরা ওদের সার্কাসের জন্যে ব্লু ডোয়ার্ফ কিনতে চায়। ভাল দাম দেবে।"

ভিক্টর বলল, "প্যান্থার সার্কাস! নাম শুনিনি।" বলে হাত বাড়িয়ে একটা শিঙাড়া নিল ডিশ থেকে।

সুনন্দন বলল, "বাইরের সার্কাস। সিঙ্গাপুরে ওদের অফিস!"

"বাইরের সার্কাস! দেশের বাইরেও আপনারা জীবজন্তু চালান দেন?"

"আগে দেওয়া হত। বাবার জানাশোনা ছিল অনেক। আমাদের কোম্পানির নামও লোকে জানত। আমি দিই না। দেবার ক্ষমতাও নেই। বাবাও শেষের দিকে বাইরের সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।"

শাসমল বললেন, "গভর্নমেন্ট আজকাল বড় কড়া। হরেক রকম ফ্যাকড়া বার করেছে। আমাদের পোষায় না।"

সুনন্দন কফির পেয়ালা তুলে নিল। "আছেই বা কী আমাদের! কোনও রকমে চালিয়ে যাচ্ছি।"

ভিক্টর বলল, "প্যান্থার সার্কাস আপনাদের কেন চিঠি লিখল? জানলই বা কেমন করে যে, আপনারা ব্লু ডোয়ার্ফ-এর খোঁজ রাখেন?"

"কী জানি!" সুনন্দন বলল, "সেটাই রহস্য।"

"প্যান্থার সার্কাসের চিঠির জবাব দেননি আপনি?"

" দিয়েছি। জবাবটা স্পষ্ট নয়।"

"কেন?"

"ভাবলাম, একবার খোঁজখবর করে দেখা যাক। যদি সত্যি নীল বামন ধরা যায়, চালান দিই আর না দিই, দেশের মধ্যেও হুলুস্থূল পড়ে যাবে। আমাদের নাম ছড়াবে। টাকাপয়সার দিক থেকেও সুবিধে হতে পারে। ...আর যদি বাইরে চালান দেওয়া সম্ভব হয়, মোটা টাকা পেতে পারি।"

শাসমল বললেন, "টাকার ব্যাপারটা পরে ভিক্টরসাহেব, প্রথম যা আমাদের মাথায় আসে তা হল, এইরকম অদ্ভুত প্রাণী পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে কেউ জানে না। যদি ওদের ধরা যায়, বিরাট ব্যাপার হবে। পণ্ডিতরা হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কত রকম রিসার্চ হবে! এক একজন এক একরকম বলবে।" শাসমল যেন হালকাভাবেই বললেন শেষের কথাগুলো।

ভিক্টর মাথা নাড়ল। বলল, "তা ঠিক।...আচ্ছা, নীল বামনের বা মানুষের কথা আপনারা আগে কোথাও শুনেছেন বা পড়েছেন?"

সুনন্দন বলল, "বলাইদা পড়েছেন।"

ভিক্টর শাসমলের দিকে তাকাল।

শাসমল সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আমার একটু আজেবাজে বই পড়ার অভ্যেস আছে, সার। মানে, আনন্যাচারাল ব্যাপার ট্যাপার সম্পর্কে...কী বলব, ওই একটা কৌতূহল। আমি একটা বইয়ে 'ব্লু বয়' সম্পর্কে পড়েছি। এটা গ্রেট ব্রিটেনে। আর একজনের কথা পড়েছি, গ্রিস দেশে তাকে দেখা গিয়েছিল, তার নাম হয়েছিল 'ব্লু রিবন্'। সে ছিল মেয়ে।...আমাদের দেশে নীল রঙের মানুষ দেখা না গেলেও এককালে হিমালয়ের দিকে দু-একজন নীলচে রঙের মানুষ দেখা গিয়েছে।"

ভিক্টর কফির পেয়ালা টেনে নিল। বলল, "এরা নীলবর্ণ হল কেন?"

"একদল বলে, প্রকৃতির খেয়াল। আর একদল বলে, অন্য জগতের জীব।"

ভিক্টর হাসল। সুনন্দনের দিকে তাকাল। "আপনারা কি প্যান্থার সার্কাসের চিঠি পেয়ে বামনদের খোঁজ করতে শুরু করেন?"

মাথা নাড়ল সুনন্দন। বলল, "আমি আর বলাইদা সাহেবের ডায়েরি থেকে জায়গাটা আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম। তারপর খোঁজখবর করে মোটামুটি যখন ঠিক করেছি দুজনে একবার সরেজমিনে দেখতে যাব, তখনই ডায়েরিটা চুরি গেল।"

ভিক্টর কফি খেতে খেতে বলল, "কোথায় থাকত ডায়েরিটা?"

"আমার ঘরে। আলমারিতে।"

"আলমারি খোলা থাকত, না, চাবি দেওয়া থাকত?"

"চাবি দেওয়া থাকত।"

"ডায়েরির কথা কে কে জানত?"

"তা সকলেই।...আসলে, গার্ডনারসাহেবের ডায়েরি বলেই ওটা পড়ে ছিল। ও নিয়ে আলাদা করে কেউ মাথা ঘামাতে যায়নি। আমি কখনও কখনও নেহাতই সময় কাটাতে পাতা উলটেছি। বর্ণনাগুলো পড়েছি। বেশ লাগত। গাছপালা ফুল পাখি জন্তু জানোয়ারের কথা পড়তেও ভাল লাগত। মাঝে মাঝে থাকত আদিবাসীদের কথা, তাদের আচার-আচরণের কথা। ধর্ম সম্পর্কেও সাহেব তাঁর মনের ভাবনা লিখে রাখতেন।...একজন সরল, সুন্দর মানুষের নানা ব্যাপারে দেখাশোনা, অভিজ্ঞতার কথা পড়তে ভাল লাগত এই মাত্র। অন্য কোনও মূল্য তার বুঝিনি।"

"ব্লু ডোয়ার্ফের কথায় বুঝলেন?"

"হ্যাঁ। জিনিসটা আমি পড়েছিলাম আগেই। একবার নয়, অনেকবার। ঠিক বিশ্বাস হয়নি। তেমন কৌতূহলও হত না। ভাবতাম, খ্যাপা সাহেবের চোখে দেখতে ভুল হয়েছে। প্যান্থার সার্কাসের চিঠি পেয়েই আমার চমক লাগল।"

ভিক্টর হেসে বলল, "তখন থেকেই ডায়েরিটা মহামূল্য হয়ে গেল?"

"তা বলতে পারেন।"

ভিক্টর কফি খেতে খেতে কিছু ভাবছিল। পরে বলল, "কতদিন আগে ডায়েরিটা চুরি গিয়েছে?"

"মাসখানেকের মধ্যেই। আমার ধারণা, দু-তিন হপ্তার মধ্যে।"

"আপনি কাউকে সন্দেহ করেন?"

সুনন্দন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। পরে বলল, "কাকে করব! বাইরের লোক বলতে আমার এক মামাতো ভাই আছে, আর মহাদেব বলে এক বন্ধু। এরা দুজন ছাড়া প্যান্থার সার্কাসের চিঠির কথা অন্য কেউ জানত না। তাও ওরা ভাসাভাসা জানত। আমি আর বলাইদাই পুরো ব্যাপারটা জানতাম।"

ভিক্টর বলল, "ডায়েরি চুরি যাবার পরই আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হয়?"

"হ্যাঁ।"

"ডায়েরি চুরি আর অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে?" ভিক্টর বলল। বলে একদৃষ্টে সুনন্দনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সুনন্দন বলল, "আমারও কেমন সন্দেহ হয়।"

"বিশেষ কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?"

মাথার চুল ঘাঁটতে ঘাঁটতে সুনন্দন বলল, "এত আচমকা ব্যাপারটা ঘটেছিল যে, আমি কিছু বুঝতেই পারিনি। চোখ তখন বন্ধ করে ফেলেছি।"

শাসমল বললেন, "আমি সন্দেহ করি।"

"কাকে?"

"অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটানো হয়েছে বলে সন্দেহ করি। কে যে ছক করে কাণ্ডটা ঘটিয়েছিল তা এখন বলতে পারব না। কেউ না কেউ করেছে।"

সুনন্দন বলল, "আমি মারা যেতে পারতাম। কিংবা আরও ভয়ংকরভাবে আহত হতে পারতাম।"

ভিক্টর বলল, "আজ আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। অন্য একটা কাজ আছে বাড়িতে।" বলে কফির পেয়ালা রেখে দিল। "কাল বা পরশু আপনাদের কখন সময় হবে বলুন। আমি বেলাবেলি আসতে চাই। আপনাদের লিটল জু আমাকে দেখতে হবে। গ্যারাজটাও। যদি পারেন, আপনাদের বাড়ির ঘরদোরও আমায় দেখিয়ে দেবেন।"

শাসমল বললেন, "আপনি কালই আসুন। আমি থাকব।"

ভিক্টর বলল, "আসব।...ডায়েরির ব্যাপারে আমার আরও কিছু জানা দরকার। আমার মনে হয় সুনন্দনবাবু, একটা কাগজে পয়েন্টগুলো নোট করে রাখলে ভাল হয়।"

"কীসের পয়েন্ট?"

"যেগুলো আপনার কাছে জানানো দরকার বলে মনে হবে। আপনি সময় নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন। ভেবে দেখুন, কোনগুলো জানানো দরকার। কাল আমি আপনার কথা শুনব। আজ উঠি।"

ভিক্টর উঠে দাঁড়াল।

মোহিনীমোহন ও পাতা ছেঁড়া ডায়েরি

গা এলিয়ে বসে ভিক্টর 'ট্রু ডিটেকটিভ'-এর পাতা ওলটাচ্ছিল। পত্রিকাটা তার যে খুব পছন্দ তা নয়, তবু অনেক সময় মালমশলা খুঁজে পাওয়া যায়।

দুপুর প্রায় শেষ। আলস্য লাগছিল ভিক্টরের, হাই উঠছিল। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে ছাদের দিকে তাকাচ্ছিল, মাথায় ঘুরছিল 'লিটল জু'-এর কথা।

এমন সময় কল্যাণ চাটুজ্যে এসে হাজির। ভিক্টরের বন্ধু। খবরের কাগজে কাজ করে। ফোটোগ্রাফার।

কল্যাণের কাঁধে সব সময় একটা ব্যাগ ঝোলে। তার মধ্যে তার ক্যামেরা আর টুকিটাকি। ব্যাগ নামিয়ে রাখতে রাখতে কল্যাণ বলল, "কী রে ভিকু, আজকাল খুব লায়েক হয়ে গিয়েছিস। ডাকলেও সাড়া দিস না।"

ভিক্টর বলল, "ডাকলি কখন?"

"কাল সন্ধের মুখে যাচ্ছিলি কোথায়? গ্যালিফ স্ট্রিটের মুখে তোকে দেখলাম। স্কুটার হাঁকিয়ে যাচ্ছিস।"

পত্রিকাটি রেখে দিল ভিক্টর। হেসে বলল, "একটা কাজে যাচ্ছিলাম।"

"কাজ! তোর আবার কাজ!...জুটেছে কিছু?"

"জুটব জুটব করছে। তোর খবর কী বল? কাল তুই আমায় দেখলি কেমন করে?"

"একটা ছবি নিতে গিয়েছিলাম। লরি ভার্সেস স্টেটবাসের গুঁতোগুঁতি। দুটোই ষাঁড়ের মতন মুখোমুখি লড়ে গিয়েছে। ফেরার পথে তোকে দেখলাম।"

"তাই বল।...তা এখন কোথায়?"

"এদিকেই একটা কাজে যাচ্ছি। দেরি আছে। ভাবলাম তোর সঙ্গে বসে আড্ডা মেরে যাই। চা বল।"

"বলতে হবে না। নোটন তোকে দেখেছে। চা চলে আসবে।"

কল্যাণ নস্যিখোর। পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করে আঙুলের ডগায় নস্যি তুলতে তুলতে বলল, "বাড়ির খবর কী? দিদি কেমন আছে?"

"বাড়ির খবর বাড়িতে গিয়ে নিবি।"

"যাব। দিদিকে বলবি বর্ষা পড়েছে। এবার একদিন গিয়ে খিচুড়ি খেয়ে আসব। উইথ্ ইলিশ মাছ ভাজা।"

"মাছটা তুই নিয়ে যাবি।" ভিক্টর হেসে বলল, "বাগবাজারের ইলিশ।"

কল্যাণ নস্যির টিপ নাকের কাছে এনে গম্ভীরভাবে বলল, "সরষের তেলটাও নিয়ে যাব নাকি?"

ভিক্টর জোরে হেসে উঠল। কল্যাণও।

হাসি থামলে ভিক্টরের হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল। বলল, "হ্যাঁ রে কলু, তুই না বাগবাজারে থাকিস?"

"বাগবাজার নয়, শ্যামবাজার। রাস্তার এপারে। কেন?"

ভিক্টর একটু ভাবল, "লিটল জু-এর নাম শুনেছিস?"

"লিটল জু!" কল্যাণ অবাক। এমনভাবে তাকিয়ে থাকল যেন এ ধরনের কোনও নাম ভূভারতে আছে বলে সে জানে না।

"শুনিসনি?"

"না। কোথায় সেটা?"

ভিক্টর জায়গাটার বিবরণ দিল। বলল, " কাশীপুর ব্রিজ..."

"ওটা চিৎপুর ব্রিজ। কেউ কেউ কাশীপুর বলে। তা চুলোয় যাক। না ভাই, আমি লিটল জু-এর নাম শুনিনি। কী আছে সেখানে?"

ভিক্টর বুঝিয়ে দিল লিটল জু-এর ব্যাপারটা। বলল, "ওর মালিকের একটা কেস হাতে নিচ্ছি।"

"কী কেস?"

"ডায়েরি চুরি।"

কল্যাণ বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, "ডায়েরি চুরি কী রে?

ডায়েরি চুরির আবার কেস হয় নাকি? এ কি গোয়েবলস গোয়েরিং-এর ডায়েরি?”

ভিক্টর মাথা নাড়ল। বলল, “না। কিন্তু অদ্ভুত লোকের।”

নোটন চা নিয়ে এল দু কাপ।

কল্যাণ বলল, “খালি পেটে শুধু চা খাওয়াবি? তোর সেই দাঁতভাঙা খোট্টা বিস্কিট নেই?”

মাথা নাড়ল নোটন। বলল, “শশা আছে? খাবে?”

“ধুত, শশার সঙ্গে চা খায়! তুই কোথাকার লোক! স্যাট করে দুটো লেড়ো বিস্কুট নিয়ে আয়। যাবি আর আসবি। আমার গ্যাস্ট্রিক হয়েছে। ডাক্তার বলেছে দু ঘণ্টা অন্তর পেটে কিছু দিতে।”

নোটন হাসতে হাসতে চলে গেল।

ভিক্টর বলল, “তোর শুধু খাওয়া! খেয়ে খেয়েই মরবি।”

“যে খাটে, সে খায়। তোর মতন টেবিলে পা তুলে বসে আমাদের দিন কাটে না, ভাই। সারাদিন চরকি মারতে হয়। নো রোদ, নো ঝড়বৃষ্টি, নো শীত।...যাক গে, তোর কেসটা বল, শুনি। কার ডায়েরি? কীসের ডায়েরি? লিটল জু-ই বা কেন?”

চা খেতে খেতে ভিক্টর ছোট করে সুনন্দনের কথা, ডায়েরি হারানোর বৃত্তান্ত বলল। এমনকী সুনন্দনের অ্যাক্সিডেন্টের কথাও।

কল্যাণ সবই শুনল। এরই মধ্যে নোটন দুটো গজামার্কা বিস্কিট এনে দিল কল্যাণকে।

চা বিস্কিট খেতে খেতে কল্যাণ বলল, “আজব ব্যাপার!...নীল রঙের মানুষ হয় বলে আমি জানি না। তবে কোনও কারণে যদি গায়ের রং পালটে গিয়ে থাকে...কে জানে!”

ভিক্টর বলল, “প্রকৃতির খেয়াল হলেও হতে পারে। আবার অন্য কিছুও থাকতে পারে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, বাইরে থেকে একটা সার্কাসপার্টির চিঠি আসার পরেই ডায়েরি কেন চুরি যাবে? আর ডায়েরি চুরির পর সুনন্দনের ওরকম অ্যাক্সিডেন্টই বা হবে কেন? ও তো আরও বিশ্রীভাবে চোট পেতে পারত? মাথায় তেমনভাবে লাগলে মরেই যেত।”

কল্যাণ মাথা হেলাল। বলল, “সুনন্দনকে কেউ মারার চেষ্টা করেছিল?”

“সন্দেহ হয়।”

“কেন?”

“নিজেদের স্বার্থে।”

“...তা তুই আমায় কিছু করতে বলিস?”

ভিক্টর বলল, “আমার মনে হয়, তুই একটু খোঁজ করলে লিটল জু সম্পর্কে খবরাখবর আনতে পারবি। তোর তো ওদিকে অনেক বন্ধু।”

কল্যাণ বলল, “ঠিক আছে। পাত্তা লাগাচ্ছি।”

“আর একটা কাজ করবি? আমাকে একটা ছবি তুলে দিবি লিটল জু-এর?”

কল্যাণ বলল, “ছবি তোলা কোনও প্রবলেম নয়। কিন্তু তুলব কেমন করে?

লোকের বাড়ি বয়ে গিয়ে হুট করে ছবি তোলা যায় না। পারমিশান নিতে হয়।"

ভিক্টর বলল, "চেষ্টা করে দ্যাখ। না হলে আমি আছি।"

মাথা নাড়ল কল্যাণ।

আরও খানিকটা গল্পগুজব করে চা খেয়ে উঠে পড়ল কল্যাণ। বলল, "চলি। আমি পাত্তা লাগাচ্ছি। তোকে জানাব।"

কল্যাণ চলে যাবার পর ভিক্টর একটা সিগারেট ধরিয়ে গা এলিয়ে বসে ভাবতে লাগল। ডায়েরি চুরির সঙ্গে বাইরের সার্কাস কোম্পানির চিঠির একটা সম্পর্ক রয়েছে যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কথা হল, বাইরের সার্কাস কোম্পানি নীল বামনের কথা জানল কেমন করে? কে তাদের জানাল? রাম-শ্যাম যে মানুষটিই জানিয়ে থাকুক তার সঙ্গে সার্কাস কোম্পানির কীসের সম্পর্ক? ভেতরে ভেতরে কি কোনও লেনদেন চলছিল? যদি চলে থাকে, টাকার পরিমাণ কত? আর যদি ধরেই নেওয়া যায়—ভেতরে ভেতরে লেনদেন চলছিল তা হলে সুনন্দনকে চিঠি লেখার কারণ কী? তার অজান্তেই তো সব হতে পারত! তার ওপর সুনন্দনের অ্যাক্সিডেন্ট। কেন?

ব্যাপারটা জটিল। গোলমেলে।

ভিক্টরের আরও গোলমাল লাগছে নীল বামনের কথা ভেবে। সত্যিই কি নীল বামন ছিল, এখনও রয়েছে? না, ওটা কোনও ধাঁধা? এমন কোনও গোপন সংকেত যা সাধারণের ধরার উপায় নেই? তবে, তা যদি হবে—গানাসাহেবের মতন মানুষ, যাঁর অত দেখাশোনা পরিচয় রয়েছে বন-জঙ্গলের সঙ্গে, সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে, তিনি কেন তা ধরতে পারলেন না?

ভিক্টর মাথার চুল ঘাঁটতে লাগল। কিছুই ধরা যাচ্ছে না।

এখন সাড়ে তিন কি পৌনে চার। ভিক্টর আজ আগে আগেই বেরিয়ে পড়বে। সুনন্দনের বাড়িতে যাবে। লিটল জু দেখবে। সেই সঙ্গে গ্যারাজটাও।

বসে থাকতে থাকতে আচমকা কী মনে পড়ে গেল ভিক্টরের। টেবিলের নীচে ড্রয়ারে টেলিফোন গাইড রাখে সে। গাইড তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটা নম্বর খুঁজে কাগজে লিখে নিল।

বিশ্বাসদাকে এখন পাওয়া যাবে কি না কে জানে!

টেলিফোনেরও যা অবস্থা আজকাল। ভিক্টর বারকয়েক চেষ্টা করল, পারল না। লাইনই লাগছে না। বিরক্ত হয়ে উঠছিল ভিক্টর।

হঠাৎ তার ফোনই বেজে উঠল। রিসিভার তুলল ভিক্টর, "হ্যালো?"

"ঘোষসাহেব?" ও পাশের গলা।

"শাসমলসাহেব নাকি?"

শাসমল কী বলতে লাগলেন।

ভিক্টর মন দিয়ে শুনছিল। শেষে বলল, "আমি আসছি।...না না, ছ'টার আগেই পৌঁছব। ভদ্রলোককে বসিয়ে রাখুন।...কী? অতক্ষণ বসবেন বলে মনে হয় না? আরে মশাই, চেষ্টা করে দেখুন না। একান্তই যদি বসতে না চান ঠিকানাপত্র নিয়ে রাখুন।

আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাব।”

ফোন রেখে দিল ভিক্টর।

ফোন রেখেই আবার তুলল। নম্বরটা তার দরকার।

এবার বিশ্বাসকে পাওয়া গেল।

ভিক্টর বলল, “বিশ্বাসদা, আমি ভিক্টর।...না না, বেঁচেবর্তেই আছি।...গালাগাল দেবে দাও, কী করব বলো, ভাবি, তোমার বাড়িতে চলে যাব, হয়ে ওঠে না। বাড়িও করেছ বাবা, বঁড়শে বেহালা ছাড়িয়ে।” ভিক্টর ওপার থেকে কোনও কথা শুনে হাসতে লাগল। তারপর বলল, “শোনো, একটা দরকারে ফোন করছি। তোমার কাজকর্ম এখন কেমন? ডাল্ পিরিয়ড। তা আমাকে একটা লোক দাও। নজর রাখতে হবে। কী? না না, নর্থ ক্যালকাটায় আসতে হবে। টালার দিকে। কাশীপুর...। ব্রিজটার কাছেই। একটা কেস হাতে নিয়েছি। হপ্তাখানেক চোখ রাখলেই হবে।...কী বলছ? না, চব্বিশ ঘণ্টা দরকার নেই। সকাল থেকে সন্ধে।...তুমি কালকেই আমার অফিসে পাঠিয়ে দিয়ো। টাকাপয়সার ব্যাপারটা তুমিই ঠিক করো। ...একদিন চলে এসো। সেই কবে মাস ছয়েক আগে এসেছিলে? তা হলে ছাড়ছি। কালই লোক পাঠাবে। ও. কে.।”

ফোন রেখে দিল ভিক্টর। “নোটন?”

নোটন এসে হাজির হবার আগেই ভিক্টর উঠে পড়েছে। বলল, “আমি বেরোচ্ছি। তুই অফিস বন্ধ করে বাড়ি চলে যাস।”

নোটন হাত বাড়াল, “গোটা কুড়ি টাকা দিয়ে যাও। দু-একটা জিনিস কিনে নিয়ে যেতে হবে।”

ভিক্টর টাকা দিল নোটনকে। দিয়ে তার হালকা ওয়াটারপ্রুফ তুলে নিয়ে চলে গেল।

এখনও আলো ফুরোয়নি। রোদ পালিয়েছে। আকাশে হালকা মেঘ। বৃষ্টি হবার মতন মেঘ জমেনি কোথাও। ভিক্টর লিটল জু-এ এসে হাজির।

সুনন্দন আর শাসমল অপেক্ষা করছিল। কাল যেখানে বসেছিল ভিক্টর, তার বিশ-পঁচিশ গজ দূরে লিটল জু-এর অফিস। সাধারণ ঘর। মামুলি অফিস। টেবিল চেয়ার ছাড়া যা তা সামান্যই। কাঠের পুরনো আলমারি, একটা টেলিফোন, দেয়ালে টাঙানো কিছু ছবি—এই মাত্র।

ভিক্টর বলল, “সেই ভদ্রলোক কোথায়?”

সুনন্দন বলল, “চলে গেলেন। বসানো গেল না।”

“ব্যাপারটা শুনি—।”

সুনন্দনই বলল, “ভদ্রলোকের নাম মোহিনীমোহন পাল। বয়স বোধহয় পঞ্চাশের ওপর। উনি থাকেন বেলেঘাটার দিকে। সি আই টি রোড। ভদ্রলোকের একটা ট্রাভেলিং এজেন্সি আছে। মানে, ট্যুরিং কোম্পানি। বাসে ঘোরাঘুরির ব্যবস্থা করেন।”

“কী নাম এজেন্সির?”

শাসমল একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন।

ভিক্টর কার্ড দেখল। 'ধরিত্রী ট্রাভেল্‌স'। অফিস ধর্মতলা স্ট্রিটে।

সুনন্দনই বলল, "ভদ্রলোকের এক আত্মীয় অসুস্থ। হাসপাতালে রয়েছে। আত্মীয়কে দেখতে যেতেন ভদ্রলোক। গতকাল তিনি যখন আত্মীয়কে হাসপাতালে দেখতে যান তখন আত্মীয়টি তাঁকে একটি প্যাকেট দেন। বলেন, পাশের বেডে যে লোকটি ছিল সে ছাড়া পেয়ে সকালের দিকে চলে গিয়েছে। যাবার আগে অনুরোধ করেছিল, এই প্যাকেটটা যদি ঠিকানা মতন জায়গায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন তিনি—বড় ভাল হয়।"

ভিক্টর বলল, "মানে, যে পেশেন্ট ছাড়া পেয়ে হাসপাতাল থেকে চলে যাচ্ছে—সেই পেশেন্ট অন্য এক পেশেন্টকে অনুরোধ করেছিল।"

"হ্যাঁ।"

"প্যাকেটের ওপর নাম ঠিকানা ছিল?"

"হ্যাঁ। ভালভাবে প্যাক করা। ওপরে আমার নাম। 'লিটল জু' লেখা। ঠিকানাও ছিল।"

ভিক্টর বলল, "শাসমলসাহেব আমাকে ফোনে বললেন, প্যাকেটের মধ্যে গানাসাহেবের হারানো ডায়েরিটা ছিল?"

"হ্যাঁ, ডায়েরিটা আমার কাছে ফেরত এসেছে।"

ভিক্টর সুনন্দনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সুনন্দন বলল, "যে পাতাগুলো দরকার সেগুলো নেই। ছিঁড়ে বার করে নেওয়া হয়েছে।"

ভিক্টর বলল, "ডায়েরিটা কই?"

"অফিসেই আছে। আপনার জন্যে রেখে দিয়েছি," বলে সুনন্দন টেবিলের ড্রয়ার দেখাল। "দেখবেন?"

ভিক্টর মাথা নাড়ল। দেখবে। বলল, "আগে চলুন, আপনাদের লিটল জু একবার দেখে আসি।"

"চলুন, " সুনন্দন বলল। বলে শাসমলকে ডাকল।

অফিসঘর থেকে অন্তত গজ পঞ্চাশ দূরে লিটল জু। পুরোপুরি গোল না হলেও প্রায় গোলমতন একটা জায়গা জাল দিয়ে ঘেরা। পাশের খানিকটা জায়গা একটানা জালের বেড়া দেওয়া। মাথার ওপরেও জালের চাঁদোয়া। দু-এক জায়গায় হয় টিন, না হয় অ্যাসবেস্‌টাস্‌। ভেতরে দু-একটা ছোট মাপের গাছপালা। অল্প স্বল্প ঝোপঝাপ, মানে ঘাস আর লতাপাতার ঝোপ।

ভিক্টরের মনে হল, সেকেলে বড় বড় জমিদার বাড়ি—যাকে রাজবাড়ি বলা হত, সেইসব বাড়িতে এইরকম শখের চিড়িয়াখানা থাকত। দেখার মতন বিশেষ কিছু নেই। পাখিই এখানে বেশি। একজোড়া ময়ূর রয়েছে। গোটা বারো-চোদ্দো বানর। একটা ভালুক। রাজহাঁস গোটা চার।

ভিক্টর বলল, "আপনাদের ব্যবসা চলে কেমন করে?"

সুনন্দন বলল, "কোথায় আর চলে!...পাখি কিছু বিক্রি হয়। প্রাইভেট অর্ডার থাকে। পাখিওয়ালারাও খদ্দের ঠিক করে আমাদের কাছে এসে নিয়ে যায়। আমরা অবশ্য সার্কাসের অর্ডার পেলে জন্তু জানোয়ার জোগাড়ের ব্যবস্থা করি।"

"কেমন করে?"

"লোক আছে আমাদের।...সাপ দেখবেন?"

"সাপ!"

শাসমল বললেন, "সাপের বিষ নিয়ে যাবার লোক আছে।"

ভিক্টর বলল, "না মশাই, সাপ আমি দেখব না। ওই জিনিসটি আমার একেবারে পছন্দ নয়।"

সুনন্দন বলল, "তা হলে চলুন, অফিসে ফিরি।"

"চলুন।"

অফিসে ফিরে শাসমল গেলেন বাড়ির দিকে, চায়ের কথা বলতে।

ভিক্টর একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে বসল। বলল, "ডায়েরিটা আমি দেখব। তার আগে দুটো কথা জেনে নিই। চুরি যাওয়া ডায়েরি আপনি ফেরত পেয়েছেন। পাননি ডায়েরির মধ্যের কিছু পাতা। আপনি কি এর পরও ব্যাপারটা নিয়ে এগোতে চান?"

সুনন্দন অবাক হয়ে বলল, "এগোব না? বাঃ!...ডায়েরির আসল জিনিসই তো চুরি গিয়েছে।"

ভিক্টর একটু পরে বলল, "যে ব্লু ডোয়ার্ফ বা নীল বামনের কথা ডায়েরিতে ছিল, তাদের সম্পর্কে আপনার আগ্রহ আছে?"

"আগে ছিল না। এখন খুবই আগ্রহ।"

"বাইরের সার্কাসপার্টির জন্যে?"

"খানিকটা তাদের জন্যে ঠিকই। বাকিটা নিজের জন্যে।"

"কেন?"

"ভাল করে ভাবিনি।"

ভিক্টর অন্যমনস্কভাবে কয়েক টান সিগারেট খেল। বলল, "ওই যে ভদ্রলোক। কী নাম...আজ এসেছিলেন..."

"মোহিনীমোহন পাল।"

"ভদ্রলোককে আপনি আগে কখনও দেখেছেন?"

"না," মাথা নাড়ল ভিক্টর।

"মানুষটিকে কেমন মনে হল?"

সুনন্দন কী বলবে বুঝতে পারল না। শেষে বলল, "সাধারণ মানুষ যেমন হয়। খারাপ বলে তো মনে হল না। নয়তো বাড়ি বয়ে কেউ অন্যের দেওয়া জিনিস দিতে আসে!"

"তা ঠিক।...আচ্ছা, আপনারা কি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওঁর আত্মীয়ের পাশের বেডে যে রোগীটি ছিল তার নাম, বয়েস? কেমন দেখতে ছিল? কী অসুখ করেছিল

তার। কতদিন ছিল হাসপাতালে?"

সুনন্দন বলল, "শাসমলদা করেছিলেন।"

"আচ্ছা!"

"পাশের বেডে যে ছিল তার নাম জানা যায়নি। মানে, ভদ্রলোকের আত্মীয় জানেন না। বয়েস বছর চল্লিশের মতন। দিন পাঁচেক হাসপাতালে ছিল। রোগ তেমন কিছু নয়, হাই ফিভার। প্রথমে খারাপ ধরনের ম্যালেরিয়া মনে হয়েছিল। পরে দেখা গেল, ম্যালেরিয়া। তবে খারাপ ধরনের নয়। পেশেন্ট নিজেই রিলিজ চেয়ে নিয়ে চলে গেল।"

"আর কিছু?"

"না। আর কিছু বলতে পারলেন না ভদ্রলোক।"

"মোহিনীমোহন পালকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

"অফিসে। বাড়িতে।"

"তাঁর আত্মীয় কি এখনও হাসপাতালে?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে চলুন। কাল ভদ্রলোকের অফিসে যাওয়া যাক। সেখান থেকে হাসপাতালে।"

"আমি কি যেতে পারব?"

"শাসমল যাবেন।"

"শাসমলদা পারবেন।...আপনাকে ডায়েরিটা দেখাই।"

সুনন্দন ডায়েরি দেখাবার আগেই শাসমল ফিরে এলেন।

হাসপাতালের শরৎবাবু

মোহিনীমোহনের অফিস একেবারেই সাধারণ। ছোট মাপের দুটো ঘর। আসলে একটাই ঘর; পার্টিশান করে দুটো খুপরি করা হয়েছে। একটায় বসেন মোহিনীমোহন আর ক্যাশবাবু। অন্যটায় এক কেরানিবাবু। অফিসের বেয়ারা নিতাইও টুল পেতে বসে থাকে। লোকজন যারা টিকিট কিনতে আসে তারা বসে ফোল্ডিং চেয়ারে।

মোহিনীমোহনের ব্যবসা হল, যাকে বলে—লাক্সারি বাসে করে ঘুরে বেড়ানোর ব্যবস্থা করা। দূর পাল্লায় বাস ছোটে না, কাছাকাছি জায়গায় ঘোরাফেরা করে, দিঘা, বিষ্ণুপুর, জয়রামবাটি—এইরকম আর কী! দিঘার দিকেই তাঁর বাস বেশি চলে।

শাসমলকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্টর এল ধর্মতলা স্ট্রিটে, মোহিনীমোহনের অফিসে। তখন বিকেল ফুরোয়নি।

শাসমলকে চিনতে পারলেন মোহিনীমোহন। "আসুন।"

দুহাত তুলে নমস্কার জানিয়ে শাসমল বললেন, "আপনার কাছেই এলাম। কালই বলেছিলাম, একটু বিরক্ত করতে আসতে পারি।" বলে শাসমল হাসির মুখ করলেন, যেন বিরক্ত করতে এসে লজ্জায় পড়েছেন।

মোহিনীমোহন বললেন, "বসুন।"

শাসমল ভিক্টরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মোহিনীমোহনের। বললেন, "ইনি কয়েকটা কথা জানতে এসেছেন। যদি দয়া করে বলেন, আমাদের বড় উপকার হয়। আমরা একটা গণ্ডগোলের মধ্যে পড়েছি।"

মোহিনীমোহন ভিক্টরের দিকে তাকালেন, "বলুন?"

ভিক্টর গতকালই সব শুনেছিল শাসমলদের কাছে। তবু বলল, "আপনার আত্মীয় বা বন্ধু কোন হাসপাতালে আছেন?"

"আর জি কর হাসপাতালে।"

"কোন ওয়ার্ড, কত নম্বর বেড?"

মোহিনীমোহন ওয়ার্ড বললেন। বেড নম্বরও।

নামটাও জেনে নিল ভিক্টর। বলল, "উনি এখনও আছেন হাসপাতালে?"

"হ্যাঁ। কেন?"

"আপনি কি আজও হাসপাতালে যাবেন?"

"না, আজ যাব না। অন্য কাজ রয়েছে।"

ভিক্টর সামান্য ইতস্তত করে বলল, "আপনার সঙ্গে দু-চারটে কথা ছিল। একটু আড়ালে..." বলে আড়চোখে ক্যাশবাবুর দিকে তাকাল।

মোহিনীমোহন বুঝতে পারলেন। ক্যাশবাবুকে বললেন, "সরকার, তুমি বরং রায়বাবুর কাছ থেকে ঘুরে এসো। বলবে, সাতাশ বারো গাড়িটার কাজ হচ্ছে। দিন চারেক লাগবে। তার আগে বুকিং নিতে পারছি না। যদি দিন পাঁচেক পরে হলে চলে, আমাদের বাস পাওয়া যাবে।"

ক্যাশবাবু কাগজপত্র গুছিয়ে ক্যাশবাক্সে চাবি দিয়ে উঠে পড়ল। যাবার সময় চাবিটা মোহিনীমোহনের সামনে রেখে দিল।

শাসমল বললেন, "পালবাবু, গতকালই আমরা আপনাকে বলেছিলাম, আমাদের একটা সাহায্য করতে হবে...ইনি ঘোষসাহেব, আমাদের কোম্পানির হয়ে একটা কাজ করছেন। আপনি যদি সাহায্য করেন—।"

মোহিনীমোহন মানুষটিকে দেখলে সজ্জন বলেই মনে হয়। খানিকটা বয়েস হয়েছে। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। পান খান। দাঁতে ছোপ ধরে গিয়েছে। চোখ দুটি বড় বড়। ডান গালে মস্ত আঁচিল।

মোহিনীমোহন বললেন, "বলুন কী সাহায্য করতে পারি?"

ভিক্টর বলল, "আপনি কতদিন ধরে হাসপাতালে আসা-যাওয়া করছেন?"

"দিন সাতেক।"

"আপনার আত্মীয় বা বন্ধুর কী অসুখ হয়েছে?"

"ও আলসারের রোগী। মাঝে মাঝেই ভোগে। এবার বাড়াবাড়ি হয়েছিল। এখন অনেকটা ভাল।"

"আপনি কি রোজই হাসপাতালে যান?"

"না। রোজ পারি না।"

"শেষ কবে গিয়েছিলেন?"

"পরশু।"

"পরশুই কি আপনি প্যাকেটটা পান?"

"হ্যাঁ পরশু পাই। কাল আমার নিজের একটা কাজ ছিল ওদিকে। প্যাকেটটা নিয়ে গিয়েছিলাম।"

ভিক্টর সামান্য চুপ করে থাকল। দেখল একবার শাসমলকে। তারপর বলল, "আপনি যে হাসপাতালে যেতেন, আশেপাশের বেডের রোগীদের নিশ্চয়ই দেখেছেন?"

"দেখেছি মানে চোখে পড়ত। ভিজিটিং আওয়ার্সে কত লোক যায়, তার মধ্যে কে রোগী কে ভিজিটার বোঝাও যায় না। সার্জিক্যাল ওয়ার্ড তো নয় মশাই যে, চট করে বোঝা যাবে!"

ভিক্টর বলল, "তার মানে আপনি ঠিক নজর করে দ্যাখেননি। আপনার আত্মীয়ের বেডের পাশে কোনও রোগী ছিল?"

মোহিনীমোহন মাথা নাড়লেন। "না; দেখিনি। ঠাওর করে দেখিনি। তবে এক ছোকরাকে দেখতাম, সে ভিজিটিং আওয়ার্সে বাইরের দু-একজনের সঙ্গে বারান্দার দিকে গিয়ে গল্প করত।"

"কেমন দেখতে?"

"কেমন দেখতে!" মোহিনীমোহন যেন মনে করবার চেষ্টা করলেন ছোকরাকে। তারপর বললেন, "চেহারা খারাপ নয়। ছিপছিপে, গায়ের রং ময়লা, মুখের মধ্যে কেমন অবাঙালি ছাপ আছে।"

"নাম-ধাম?"

"কিছুই বলতে পারব না।"

ভিক্টর শাসমলের দিকে তাকাল। বোঝাতে চাইল, এখানে বসে থেকে আর লাভ হবে না।

"আমরা আজ উঠি," ভিক্টর বলল। "আপনাকে বিরক্ত করে গেলাম।" চেয়ার সরিয়ে উঠে পড়ল সে। হঠাৎ কী মনে হল, বলল, "আপনার তো বাস-সার্ভিস। কত লোকজন বুকিংয়ের জন্যে আসে এখানে। আপনার কী মনে হয়, যে ছোকরার কথা আপনি বলছেন, এ রকম কাউকে এখানে কোনওদিন আসতে দেখেছেন?"

মোহিনীমোহন কয়েক পলক তাকিয়ে মাথা নাড়তে গিয়ে আর মাথা নাড়লেন না। কী যেন ভাবলেন। পরে বললেন, "আমি মনে করতে পারছি না।"

শাসমলও উঠে পড়েছিলেন।

ভিক্টর বলল, "আসি।" বলে নমস্কার জানাল।

বাইরে এসে ভিক্টর বলল, "চলুন শাসমলসাহেব, হাসপাতালে যাওয়া যাক।" হাতের ঘড়িটা দেখল। পৌনে পাঁচ। আর. জি. কর পর্যন্ত যেতে যেতে ছ'টা বেজে যাবে হয়তো। দেখা শোনার পালা শেষ হয়ে যাবে ততক্ষণে। তবু একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

হাসপাতালে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় ছয়। ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে আসছে। লোকজন বেরিয়ে আসতে শুরু করেছিল।

শাসমল বললেন, "চলুন, একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। আমার সঙ্গে দু-একজনের চেনা আছে, যদি দেখতে পাই ঘাড় ধরে বার করে দেবে না।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই মস্ত হলঘর।

ভিক্টর বেড নম্বর মিলিয়ে যাঁর কাছে এসে দাঁড়াল তাঁকে দেখে শাসমল অবাক। চেনা মানুষ মনে হচ্ছে।

শাসমল বললেন, "শরৎবাবু না?"

ভদ্রলোকও শাসমলকে দেখছিলেন। "আপনি?"

"কাণ্ড দেখুন," শাসমল বললেন, "আপনি যে মোহিনীবাবুর আত্মীয় কেমন করে বুঝব?"

শরৎবাবু বললেন, "মোহিনী সম্পর্কে আমার ভাই হয়। কাজিন। বন্ধুও।...কী ব্যাপার বলুন তো? এদিকে হঠাৎ?"

শাসমল বললেন, "মোহিনীবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, সেখান থেকেই আসছি।"

ভিক্টর শরৎবাবুকে দেখছিল। মোহিনীবাবুর সমবয়েসী বলেই মনে হয়। তবে রোগা চেহারা। অসুখ বিসুখের দরুন খানিকটা বুড়োটে দেখায়। সাদামাটা ভদ্রলোক বলেই মনে হয়।

শাসমল ভিক্টরকে বললেন, "শরৎবাবু আমার চেনাজানা। ওঁর গ্যারাজ রয়েছে তেলকলের কাছে। গাড়ি সারাই হয়।"

শরৎবাবু ভিক্টরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মানুষটিকে তিনি চেনেন না। সন্দেহের চোখেই দেখছিলেন ভিক্টরকে।

শাসমল বললেন, "আমরা একটা খোঁজ নিতে এসেছি, শরৎবাবু। আপনার পাশের বেডে এক পেশেন্ট ছিল। চলে যাবার সময় সে একটা প্যাকেট দিয়ে যায় আপনাকে। প্যাকেটটা আপনি মোহিনীবাবুকে দিয়েছিলেন ঠিকানা মতন জায়গায় পৌঁছে দিতে।"

শরৎবাবু বললেন, "হ্যাঁ, কাশীপুরের ঠিকানা। জু..."

"লিটল জু।"

"মনে পড়ছে।"

"আমি ওখানে কাজ করি ।"

শরৎবাবু কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন। পরে অবাক হয়ে বললেন, "তাই নাকি মশাই। আমি জানতাম আপনি গ্রে স্ট্রিটে কোনও একটা রেডিয়োর দোকানে বসেন।"

শাসমল হেসে বললেন, "আমার ছোটভাইয়ের ব্যবসা; 'সুর ও স্বর'। রেডিয়ো-রেকর্ডের দোকান। আমি মাঝে মাঝে সন্ধের দিকে বসি।"

"ও! তাই বলুন!"

ভিক্টর শাসমলকে ইশারা করল। ওয়ার্ডে ঘণ্টি পড়ছে। এবার আর থাকতে দেবে না ভিজিটারদের।

শাসমল বললেন,"যে লোকটি আপনাকে প্যাকেটটা দিয়েছিল তার নাম জানেন?" বলে শরৎবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকল।

শরৎবাবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। ভেবে বললেন, "নাম তো বলতে পারব না। ওকে চৌধুরী বলে ডাকত।"

"কেমন দেখতে?"

শরৎবাবু বর্ণনা দিলেন চেহারার। মোহিনীমোহনের বর্ণনার সঙ্গে মিলে গেল প্রায়। নতুন করে যা জানা গেল, তা হল চৌধুরীর চোখের তারা কটা রঙের। নাক লম্বা, খাড়া নাক যা বোঝায়।

"বাঙালি?"

"স্পষ্ট বাংলা কথা, মশাই। দেখলে অবশ্য কেমন যেন মনে হয়। দেওঘরের লোক বলল।"

"দেওঘর?"

"বলল, কলকাতায় কাজে এসেছিল। ছিল বন্ধুর বাড়ি। হঠাৎ ম্যালেরিয়া ধরে গেল। বেদম জ্বর। বন্ধুর বাড়িতে দেশাশোনার লোক নেই। ডাক্তার বলল, হাসপাতালে ভর্তি হতে। জ্বরটা ম্যালিগনান্ট টাইপের হয়ে উঠেছিল। ও হাসপাতালে চলে এল। অবশ্য দেখা গেল, মামুলি ম্যালেরিয়া।"

ভিক্টর বলল, "আপনার কাছে প্যাকেট দিয়ে গেল কেন?"

শরৎবাবু একটু ভেবে বললেন, "কী জানি! আমি শ্যামবাজার বেলগাছিয়ার দিকে থাকি শুনেই বোধহয়। বলল, ও আজই দেওঘরে ফিরে যাচ্ছে। আমি যদি দয়া করে প্যাকেটটা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করি—বড় ভাল হয়।"

"প্যাকেটে কী আছে সে বলেনি?"

"বলেছিল, একটা বই আছে। জরুরি বই।"

"প্যাকেট আপনি দেখেননি?"

"না," শরৎবাবু মাথা নাড়লেন। "পোস্টঅফিসের রেজিস্ট্রি প্যাকেটের মতন চারদিক মোড়া ছিল, কেমন করে দেখব!"

ভিজিটিং আওয়ার্সের শেষ ঘণ্টি বেজে গেল। আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

ভিক্টর বলল, "ওর কাছে লোকজন আসত শুনলাম?"

"তা আসত।"

"কারা?"

"বন্ধুবান্ধব বোধহয়।"

"তাদের কাউকে আপনি চেনেন না?"

"না।"

"মোহিনীবাবু বলছিলেন, ওরা নাকি বারান্দায় গিয়ে গল্পগুজব করত?"

"হ্যাঁ। লোক এলে ও বাইরে চলে যেত।"

ওয়ার্ডের মধ্যে আর কোনও ভিজিটার নেই। ভিক্টরের মনে হল, এরপর আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। শাসমলকে বলল, "চলুন, আমরা যাই।"

শরৎবাবু বললেন শাসমলকে, "কী ব্যাপার, মশাই? আপনারা হঠাৎ....?"

শাসমল বললেন, "তেমন কিছু নয়। একটু খোঁজখবর করতে এসেছিলাম। পরে আবার দেখা হবে শরৎবাবু! আজ আসি।"

শাসমল আর ভিক্টর দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

হাসপাতালের ফটক পর্যন্ত স্কুটার ঠেলতে ঠেলতেই এল ভিক্টর। তারপর বলল, "নিন, বসুন। আপনাদের দিকেই যাওয়া যাক।"

ভিক্টর স্কুটারে স্টার্ট দিল। শাসমল বসলেন পেছনে।

"আপনি চৌধুরীর নাম ঠিকানা জোগাড় করতে পারবেন শাসমল সাহেব?" ভিক্টর বলল, "আপনার সঙ্গে ডাক্তারদের দু-একজনের চেনা আছে বলছিলেন?"

শাসমল বললেন, "পারব। রোগীর টিকিট কাটা হয়েছিল, খাতা রয়েছে।"

"নাম ঠিকানা জোগাড় করুন। তবে ফলস্ নাম ঠিকানা দিয়ে ভর্তি হলে..."

"দেখি। খোঁজ করি, আগে।"

খালপারের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে ভিক্টর বলল, "আমি একটা জিনিস নজর করেছি। আপনি কি কিছু লক্ষ করেছেন?"

শাসমল বললেন, "না। কী বলুন তো?"

ভিক্টর বলল, "শরৎবাবু কথা বলার সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। মনে হল, উনি ঝট করে কিছু বলছেন না।"

শাসমল বললেন, "আমি বুঝতে পারিনি। অসুস্থ মানুষ!"

"উনি আপনার পরিচিত বললেন। অথচ উনি জানেন না, আপনি লিটল জু-এর লোক। বরং বললেন, আপনার নাকি গ্রে স্ট্রিটে রেডিয়ো-রেকর্ডের দোকান!"

শাসমল বললেন, "আমার ভাইয়ের দোকানে আমাকে উনি দেখেছেন। ভুল বুঝেছেন। কিন্তু আপনি বলার পর আমার এখন খেয়াল হচ্ছে, শরৎবাবুর গ্যারাজে আমি অন্তত বার দুই সুনন্দনের জিপ গাড়ির কাজ করিয়েছি। ছোটখাটো কাজ। শরৎবাবুর তো জানা উচিত ছিল, লিটল জু-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে।"

ভিক্টর কোনও কথা বলল না।

খালপারের রাস্তা দিয়ে সোজা যেতে যেতে ভিক্টর আচমকা ব্রেক করল। রাস্তা ভাল নয়। বিরাট এক গর্ত সামনে। নিজেকে সামলে নিয়ে গর্তের পাশ কাটিয়ে আবার এগিয়ে গেল সে।

শরৎবাবু মানুষটিকে দেখতে যত সাদামাটা, নিরীহ ভদ্রলোক বলে মনে হয়, হয়তো আসলে উনি ততটা নন। কে বলতে পারে, ভদ্রলোক মিথ্যে কথা বলছেন না? হয়তো ওঁর পাশের বিছানায় যে রোগীটি ছিল—তার সঙ্গে ডায়েরির কোনও সম্পর্ক নেই। সবটাই বানানো গল্প।

শরৎবাবুর পাশের বেডে কে ছিল, তার ঠিকানা কী, এটা জেনে নেওয়া খুব মুশকিলের হবে না। যদি দেখা যায়, শরৎবাবুর কথার সঙ্গে তার কোনও মিল নেই তা হলে একটা সূত্র ধরে এগোনো যেতে পারে।

"শাসমলসাহেব?"

"বলুন?"

"শরৎবাবুর সঙ্গে সুনন্দনের আলাপ আছে?"

"না, আমি তো জানি না।"

ভিক্টর আর কথা বলল না। দমকা বাতাস এল। ধুলো উড়ল। খালের গা বরাবর ঝাঁকড়া-মাথা গাছগুলোর মাথার ওপর অন্ধকার নেমেছে। আকাশের চেহারা পালটে আসছিল। মেঘ জমছে।

লিটল জু-এর সামনে এসে স্কুটার থামাতেই ভিক্টরের চোখে পড়ল সুনন্দন বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে।

শাসমল আগেই নেমে পড়লেন। স্কুটার রাখতে রাখতে ভিক্টর ইশারায় সুনন্দনদের দিকে দেখাল। "ভদ্রলোক কে?"

"সুনন্দনের মামাতো ভাই প্রমথ।"

"ও!...কী করেন ভদ্রলোক?"

"আগে করত। এখন তেমন কিছু করে না।"

"কী করতেন আগে?"

"জাহাজের মাল খালাসের সাব কনট্রাক্টরি গোছের কিছু করত। পয়সাকড়ি পকেটে ছিল একসময়, বাপের সম্পত্তি পেয়েছিল। সে সমস্ত কবেই ফুরিয়ে গিয়েছে মামলা-মোকদ্দমায়। নিজেও বেহিসেবি। চালিয়াত গোছের। বদসঙ্গ রয়েছে। ছোকরা ভাল নয়, ঘোষসাহেব।"

ভিক্টর কথা বলতে বলতে সুনন্দনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। সুনন্দনও এগিয়ে এল। সামনাসামনি এসে দাঁড়াল ওরা।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে ভিক্টর বলল, "দু জায়গা ঘুরে এলাম। চলুন, আপনার সঙ্গে বসি।"

ভিক্টর যেন ইচ্ছে করেই প্রমথকে উপেক্ষা করল।

সুনন্দন বলল, "চলুন। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমার মামাতো ভাই প্রমথ।"

ভিক্টর তাকাল। দায়সারাভাবে বলল, "আচ্ছা!"

প্রমথ কোনও কথা বলল না। তার মুখ দেখে মনে হল সে রীতিমতন চটে গিয়েছে।

ভিক্টর গ্রাহ্য করল না।

নীল বামন না ধোঁকাবাজি!

বাইরে বৃষ্টি নেমে গিয়েছিল।

ভিক্টর অনেক আগেই বাড়ি ফিরেছে। বৃষ্টি নামার পর বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে

পুবের দিকের জানলা বন্ধ করে দিল। ছাট আসছে জলের।

বিছানায় ফিরে আসার আগে ভিক্টর অন্যমনস্কভাবে তার ঘরের টেবিলের সামনে সামান্য দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় ফিরে এল আবার।

গানাসাহেবের ডায়েরিটা মোটামুটি দেখার পর তার মনে হয়েছে, সাধাসিধে, সরল এক মানুষের মনের কথা হিসেবেই ডায়েরিটার যা মূল্য। এটাকে সাহিত্য বলা যাবে না, সাহেবের রোজনামচাও বলা যায় না। বড়জোর বলা যেতে পারে 'মনে এল' গোছের রচনা। কিন্তু ডায়েরির জাতবিচার ভিক্টরের কাজ নয়। তার কাজ চোর ধরা।

ভিক্টরের অভ্যেস হল, গোয়েন্দাগিরি করার আগে খানিকটা অঙ্ক কষে নেওয়া। সব গোয়েন্দাই সেটা করে। তবে এক একজন এক একরকম ভাবে অঙ্কটা ছকে নেয়। যার যেমন অভ্যেস।

ভিক্টর মোটামুটিভাবে যে ছক সাজাচ্ছে তাতে সে দেখছে, সুনন্দনের ঘর থেকে ডায়েরি চুরি, সেই ডায়েরি আবার ফেরত পাওয়ার মধ্যে একটা বিচিত্র রহস্য রয়েছে। রহস্যটা হল, ডায়েরির মধ্যে থেকে কিছু পাতা ছিঁড়ে নেওয়া।

প্রশ্ন হল, যে লোকটা ডায়েরি চুরি করেছে সেই কি ডায়েরি ফেরত দিয়েছে? যদি দিয়ে থাকে তা হলে চুরি করতে গেল কেন? ধরে নেওয়া যাক, চোর খুবই সজ্জন, পরের জিনিস না বলে নেয়, আবার ফেরতও দেয়। বেশ, ফেরত দিক। কিন্তু, ফেরত দেবার সময় বিশেষ কিছু পাতা বেমালুম ছিঁড়ে নেবে কেন?

ভিক্টর এই ব্যাপারটা ধরতে পারছে না। ডায়েরি চুরি করেছে যে লোকটি সে তো ইচ্ছে করলেই তার প্রয়োজনীয় পাতাগুলো নকল করে নিতে পারত। ফোটো কপি, জেরক্স—কত কী রয়েছে আজকাল। হুবহু নকল হয়ে যেত। সহজ কাজ সহজভাবে না করে পাতাগুলো ছিঁড়তে গেল কেন ডায়েরি-চোর?

এর একটা সহজ জবাব দেওয়া যেতে পারে। চোর মোটেই চায় না, সুনন্দনের হাতে পাতাগুলো ফেরত দিতে। অর্থাৎ সুনন্দন যেন ওই পাতাগুলো থেকে কোনও ফায়দা না লুঠতে পারে। বা পাতাগুলোয় যা যা আছে সেগুলোর কোনও সাহায্য না নিতে পারে। সোজা কথায় সুনন্দনকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে বাধ্য করা।

ভিক্টর আজ সুনন্দনের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছে, গানাসাহেব নীল বামন সম্পর্কে যা যা লিখেছেন, তার দশ আনাই সুনন্দনের মনে থাকলেও ছ আনা নেই। কিছু কিছু জিনিস ভাল করে খেয়াল করেনি সুনন্দন। তা ছাড়া ওই লেখার মধ্যে গানাসাহেব একটা নকশা করেছিলেন পেনসিলে করে। নকশাটা জরুরি। তার মধ্যে দেখানো আছে ঠিক কোন জায়গায় তিনি নীল বামনদের দেখেছিলেন। সুনন্দন এই নকশা মনে করতে পারছে না।

ব্যাপারটা তা হলে এই দাঁড়াচ্ছে, সুনন্দনরা যাতে নীল বামনদের খোঁজ করতে না পারে তার জন্যে প্রয়োজনীয় পাতাগুলো ছিঁড়ে ওরা রেখে দিয়েছে—চোরের দল—বাকিটা ফেরত দিয়েছে। না দিলেই বা কী ক্ষতি ছিল!

এরপর আসে অন্য কথা। সুনন্দনের লিটল জু দেখে ভিক্টরের মনে হয়নি, ব্যবসাটা অর্থকরী। আগে হয়তো ছিল, কিন্তু এখন নয়। না হবার বড় কারণ, খদ্দের

ছাড়া ব্যবসা হয় না। সুনন্দনের কপালে এখন পশুপাখি কেনার খদ্দের জোটে না। অন্য কারণ, আজকাল জঙ্গলে গিয়ে পশুটশু ধরাও বেআইনি। নিষেধ রয়েছে সরকারের। সুনন্দন অবশ্য এই দুটো কথাই স্বীকার করেছে।

সত্যি কথা বলতে কী, বাবার আমলে যা ছিল তারই অবশিষ্টটুকু নিয়ে সুনন্দনের লিটল জু বেঁচে আছে। কদাচিৎ এক-আধটা নতুন কিছু জুটে গেলে অন্য কথা।

ভিক্টর স্পষ্টই বুঝতে পারছে, সুনন্দনের আর্থিক অবস্থা এখন তেমন ভাল নয়। ভাঙা কাঠামোর ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে। টাকা তারও দরকার।

এমন হতেই পারে, নীল বামন ভাঙিয়ে সুনন্দনও একটা মোটা টাকা রোজগারের স্বপ্ন দেখছিল। অবশ্য তা সম্ভব কি না সেটা অন্য কথা। বনের পশুপাখিকে যদি বা লুকিয়ে চুরিয়ে ধরা যায়—মানুষকে কেমন করে ধরবে সুনন্দনরা!

ভিক্টর রীতিমতো ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছিল।

ডায়েরি চুরি এবং ফেরতের অংশটাকে যদি 'ক' বলে ধরা যায়, তা হলে 'খ' হল মোহিনীমোহন, শরৎবাবু, হাসপাতাল এবং এক—'চৌধুরী'-র অংশটা। দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক আছে, তবে কী ধরনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তা ভিক্টর এখনও ধরতে পারছে না।

হঠাৎ কী মনে করে ভিক্টর নোটনকে ডাকল চেঁচিয়ে।

নোটন এল সামান্য পরে।

"কী করছিলি?"

"দিদির সঙ্গে গল্প করছিলাম।"

"গল্প করছিলি, না, সিনেমার কাগজ দেখছিলি?"

নোটন হাসল। বলল, "বই পড়ছিলাম, 'প্রেতাত্মার কান্না'।"

নোটন গোয়েন্দা-বই আর সিনেমা-কাগজের পোকা।

ভিক্টর বলল, "প্রেতাত্মা সাজতে পারবি?"

নোটন মাথা নাড়ল। বলল, "না। কালো আলখাল্লা পরতে পারব না।"

ভিক্টর হেসে উঠল।

খানিকটা পরে ভিক্টর বলল, "তোকে ক-দিন কলকাতার বাইরে পাঠাতে চাই। যাবি?"

নোটন বলল, "কবে?"

"ধর, পরশু-তরশু।"

মাথা নাড়ল নোটন। বলল, "এই হপ্তায় মোহনবাগানের দুটো খেলা আছে। রেলের সঙ্গে আর এরিয়ান্সের সঙ্গে, রেল ভাল টিম। আমি কেমন করে যাব?"

ভিক্টর বলল, "খেলা পরে। তোর মোহনবাগান রেলের সঙ্গে ড্র করবে। তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস।"

ড্র-এর ব্যাপারটা নোটনের ঠিক পছন্দ নয়। তবে হেরে যাওয়ার চেয়ে ভাল। গতবার রেলের কাছে হেরে গিয়েছিল মোহনবাগান। এবার অন্তত জেতা উচিত।

নোটন বলল, "তুমি যাবে?"

ভিক্টর বলল, "যেতে পারলে ভাল হত। দেখি, পারি কি না! আমি না পারলে তুই

একলাই যাবি।”

“কোথায়?”

“ঢালপাহাড়ি।”

নোটন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। এমন নাম সে জীবনেও শোনেনি। বলল, “জায়গাটা কোথায়?”

ভিক্টর নিজেও জানে না জায়গাটা কোথায়? সুনন্দনের মুখে যেমনটি শুনেছে তাতে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না ঢালপাহাড়ি ঠিক কোথায়। আভাসে যতটা পারল বলল।

নোটন বলল, “যাব।”

ভিক্টর বলল, “ঠিক আছে, এখন তুই প্রেতাত্মা পড়তে যা। আমি ভেবে দেখি।”

নোটন চলে গেল।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। বাদলা ভিজে বাতাস আসছে হুহু করে। ভিক্টর মাথার তলায় হাত রেখে ছাদ-মুখো হয়ে শুয়ে থাকল।

হঠাৎ তার মনে হল, কলকাতায় বসে-বসে চোর ধরার চেষ্টা করার চেয়ে একবার ঢালপাহাড়ি যাওয়া বোধ হয় ভাল। ভাল এই জন্যে যে, গানাসাহেব যা লিখে গিয়েছেন তার কতটা সত্যি আর কতটা তাঁর ভ্রম তা জানা দরকার। যদি ধরেও নেওয়া যায়, নীল বামন বলে কিছু ছিল—তা হলেও দেখতে হবে—এতকাল পরেও তার অস্তিত্ব আছে কি না! না থাকাই স্বাভাবিক। যদি নাই থাকে তবে আচমকা বামন নিয়ে মাথা ঘামানো কেন?

ভিক্টরের কেমন সন্দেহ হতে লাগল, প্যান্থার সার্কাস, সিঙ্গাপুর—এসব বানানো কথা নয় তো!

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ভিক্টর। ঘরের মধ্যে পায়চারি করল বারকয়েক, তারপর সোজা বারান্দায় চলে গেল।

বারান্দার একপাশে ফোন। ভিক্টর ফোন তুলে নিল।

বারকয়েক চেষ্টার পর সুনন্দনকে পাওয়া গেল।

ভিক্টর বলল, “আমি ভাবছি, একবার স্পটে যাব।”

“স্পট?”

“ঢালপাহাড়ি। নিজের চোখে জায়গাটা একবার দেখে আসতে চাই।”

ওপাশে সুনন্দন যেন থমকে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলল, “যেতে পারবেন?”

“না পারার কী রয়েছে! আমি আমার লোক সঙ্গে নিয়ে যাব। আপনি নিশ্চয় যেতে পারবেন না চোখের যা অবস্থা। শাসমলসাহেব আমাদের সঙ্গে যাবেন।”

সুনন্দন রাজি হয়ে গেল, “কবে যাবেন?”

“ভাবছি পরশু।”

ফোনের লাইনে খরখর শব্দ হতে লাগল। সুনন্দনের গলা ভাল করে শোনা যাচ্ছিল না।

ভিক্টর বলল, "আপনি আমাকে একটা ম্যাপ এঁকে দেবেন।....না না, যতটুকু আপনার মনে আছে। তারপর কী করা যায়—আমরা ওখানে গিয়ে ভেবে দেখব।"

সুনন্দন ওপাশ থেকে বলল, "শাসমলদা মানে বলাইদা কাল এখানে এলে আমি কথা বলব। আপনার সঙ্গে দেখা করবেন উনি । কিন্তু মিস্টার ঘোষ জায়গাটা খুঁজে বার করা বোধহয় কঠিন হবে। ম্যাপ থাকলে সুবিধে হত। ডিটেল আমার মনে নেই।"

ভিক্টর বলল, "চেষ্টা করা যাক।"

"করুন।"

"একটা কথা আপনি ভেবে দেখেননি। যারা ডায়েরি চুরি করেছিল তারা হয়তো এরই মধ্যে ঢালপাহাড়ি পৌঁছে গিয়েছে। অবশ্য যদি তারা কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে ডায়েরিটা চুরি করে থাকে। যাই হোক, আমরা যাচ্ছি। আপনি শাসমলকে কাল পাঠিয়ে দেবেন অফিসে।" কথা শেষ করে ভিক্টর ফোন নামিয়ে রাখল।

দিদির ঘরে আলো জ্বলছিল।

দিদি এসময় হয় বইপত্র মুখে করে বসে থাকে, নয়তো নিজের মনে রেডিয়ো শোনে।

ভিক্টর কয়েক পা এগিয়ে দিদির ঘরে গিয়ে ঢুকল।

"কী রে?" দিদি বলল। বলে হাতের বই পাশে রেখে উঠে বসল।

ভিক্টর বলল, "পরশুদিন একবার বাইরে যাব।"

"বাইরে? কোথায়?"

"তেমন দূরে নয়। ওই আসানসোল-আদরার দিকে।"

"কেন?"

"একটা কাজ হাতে নিয়েছি।...নোটনকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তোর খানিকটা অসুবিধে হবে।"

দিদি মাঝে মাঝে ভিক্টরের কাজকর্ম পছন্দ করে না। বলল, "অসুবিধে নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। কচির মা আছে, পাশের বাড়ির কাকাবাবু আছেন। আমি জিজ্ঞেস করছি, তুই যাবি কোথায়? কেন?"

ভিক্টর বিছানায় বসল। খুব সংক্ষেপে নীল বামনের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বলল, "জায়গায় গিয়ে একবার দেখে আসতে চাই।"

দিদি কথার জবাব দিল না কিছুক্ষণ, তারপর ঠাট্টার সুরে বলল, "নীল বামন তোদের জন্যে বসে আছে! অনর্থক যাবি।"

"তাই মনে হয়।"

"গিয়ে দেখবি, কোথাও কিছু নেই। এ কি তোর রূপকথার গপ্প! সাত কলসি মণি-মানিক-মোহর নিয়ে চারটে সাদা বাঁদর চারদিক ঘিরে এক যক্ষের ধন পাহারা দিচ্ছে। বাঁদরগুলো চার প্রহরে চার রকম রং পালটায়।"

ভিক্টর প্রথমে কান করেনি, হেসে উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ যেন তার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। দিদির দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "যক্ষের ধন।"

বলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, "হ্যাঁ, হতে পারে। সাত কলসি না হোক, দু-তিন কলসি মোহরও যদি এখানে লুকোনো থাকে—তার তো লাখ টাকা দাম হবে। দিদি, তুই তো আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলি।"

ভিক্টর লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল। তার মনে হল, যকের ধন থাক আর না থাক—ওই জায়গায় কোনও কিছু থাকা সম্ভব—যার অনেক মূল্য। নীল বামন হয় গল্পকথা, না হয় ধোঁকাবাজি।

ঢালপাহাড়ি

ঢালপাহাড়ি নামের সঙ্গে জায়গাটার কিছু মিল আছে। চারদিকে তাকালে মনে হয়, দূরে পাহাড়ের যে ঢল নেমেছে তারই একেবারে পায়ের তলায় এই জায়গাটা। পাহাড়তলির মতনই। কাছাকাছি কোনও রেল স্টেশন নেই। মাইল তিন দূরে বাস রাস্তা। বাস মোড়ে ছোট বাজার, অল্প লোকবসতি। সেখান থেকে হয় পায়ে হেঁটে ঢালপাহাড়িতে আসতে হয়, না হয় গোরুর গাড়ি। অবশ্য মুদি আর কাঠগোলার মালিক ভানুবাবুর একটা ভাঙা জিপ আছে বাস মোড়ে। ভাড়া চাইলে পাওয়া যায়। তবে জিপের যা চেহারা, দেখলে মনে হয় আধ মাইলটাক যেতে-না-যেতে তার চাকাগুলো খুলে বেরিয়ে যাবে।

ভিক্টররা ঝুঁকি নিয়ে জিপটাই ভাড়া করেছিল। তাদের কপাল ভাল, ঢালপাহাড়িতে পৌঁছেও গেল। কিন্তু জিপ থেকে নামার পর বুঝতে পারল, বড়ই বেজায়গায় এসে পড়েছে। থাকার কোনও জায়গা নেই।

পাহাড়তলির দু-দশঘর গরিব মানুষ থাকে ঢালপাহাড়িতে। জঙ্গলের কাঠকুটো কুড়িয়ে বেড়ায়, শালপাতা কুড়োয়, নিজেদের কুঁড়ের সামনে অল্পস্বল্প সবজি ফলায়, পেটে ভাত জোটে না বছরের মধ্যে ছ'মাস, বনেজঙ্গলে যা জোটে তাই খেয়ে বাকি সময়টা কাটিয়ে দেয়।

শাসমল বললেন, "ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা ডাকবাংলোর কথা ভানুবাবু বললেন যে?"

জিপের ড্রাইভার বলল, "কোঠি।"

"কোথায় কোঠিটা?"

ড্রাইভার আঙুল দিয়ে দূরে কী দেখাল, তারপর বলল, তার জিপ ওখানে যেতে পারবে না। চড়াই পথ, রাস্তাও খারাপ।

ভিক্টর বুঝতে পারল, ড্রাইভারকে আর আটকানো যাবে না। টাকাপয়সা মিটিয়ে দিয়ে বিদায় দিল। যাবার সময় বলে দিল, এদিক দিয়ে যদি যায় আবার যেন খোঁজ করে।

পাহাড়তলির দু-দশজন ভিক্টরদের ঘিরে ধরেছিল। "বাবুরা কোত্থেকে এসেছেন গো?"

শাসমল তাদের সামলালেন।

তারপর ডাকবাংলোর খোঁজে এগিয়ে চলল। তিনজনের হাতে-কাঁধে মালপত্র ঝোলাঝুলি। ভানুবাবু বলেই দিয়েছিলেন, "চাল ডাল আলু চা চিনি কিনে নিয়ে যান মশাই। ওখানে কিছু পাবেন না। ডাকবাংলোয় চাপরাশি আছে, রান্নাটা করে দিতে পারবে, পয়সা দেবেন।"

সিকি মাইলের মতন পথ হাঁটার পর একটা ছোট মতন বাড়ি দেখা গেল। কাঠের বাড়ি, মাথায় টালি। দেখতে মন্দ লাগছিল না।

এদিকেও সবে বর্ষা নেমেছে। আবহাওয়া মেঘলা। মাঝে মাঝে মরা রোদ উঁকি দিচ্ছিল। গাছপালা বনজঙ্গলের জন্যে জায়গাটা ঠাণ্ডা। ছায়া ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে।

বাড়িটার কাছে এসে শাসমল বললেন, "ডাকবাংলো নয় ঘোষসাহেব, বিট্ বাংলো।"

ডাকবাংলো, বিট্‌বাংলো যাই হোক—মাথা গোঁজার জায়গাটাই এখন প্রয়োজন। ভিক্টর মাথা ঘামাল না।

চৌকিদার ছিল। মানুষটার চেহারা দেখলে মনে হয়, এক সময় বোধহয় আসল সেপাই ছিল, এখন বুড়ো হয়ে তালপাতার সেপাই হয়ে গিয়েছে। যেমন লম্বা, তেমনই কুচকুচে কালো। মাথার চুল সাদা। মস্ত গোঁফ। পেকে সাদা। হাতে লোহার বালা। ডান কানে রুপোর আংটা।

চৌকিদার তার নাম বলল, লছুয়া।

বাঙালি নয়, তবু বাংলাতেই কথাবার্তা বলে। মাঝে মাঝে হিন্দি মেশায়। শুনতে মন্দ লাগে না।

লছুয়া ঘর খুলে দিল। ঘর খোলার বকশিস দশ টাকা। দেড়খানা ঘর। একটা ঘর শোবার, অন্যটা খাওয়াদাওয়ার। পেছনে বাথরুম। সামনে বারান্দা। কাঠের জাফরি ঘেরা। লতাপাতা জড়িয়ে জাফরিটা বাহারি দেখায়।

লছুয়া বলল, সে হল বিট্‌বাংলোর চৌকিদার। একজন বিট্‌বাবুও আছে এখানে। কেশববাবু। সকালবেলায় খাকি পোশাক চাপিয়ে সাইকেল নিয়ে জঙ্গলে বিট্ দিতে যায়। দুপুরে ফেরে।

ভিক্টর জল খেতে চাইল।

জল এনে দিল লছুয়া। কুয়ার জল। স্বাদ রয়েছে।

ভিক্টর নোটনকে বলল, "তুই ওকে নিয়ে ম্যানেজ কর। আগে একটু চা খাওয়া দরকার।"

লছুয়া বলল, মোটামুটি বাসনপত্র, চায়ের কেটলি, কাপ, প্লেট সবই এখানে আছে। কখনও কখনও ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সাহেবরা এখানে এসে হাজির হন। তাঁদের জন্যে ব্যবস্থা করা আছে। সরকারি ব্যবস্থা।

নোটন রান্নাবান্নার চাল ডাল আলু চা চিনি বার করে লছুয়াকে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ লছুয়া বলল, "বাদমে বুঝে লেব। চা-পাত্তি থোড়া আছে বাবু। আমি চা লিয়ে আসছি। ওই বাবুরা আধা প্যাকিট চা, এক ডিব্যা শক্যর ফেলে গেছেন।"

ভিক্টর বলল, "কোন বাবু? ফরেস্টবাবু?"

"না। দো বাবু। কলকাত্তা শহরসে এসেছিলেন।"

ভিক্টর কেমন সন্দেহের চোখে লছুয়াকে দেখল; তারপর শাসমলের দিকে তাকাল।

শাসমলও খানিকটা অবাক হয়েছিলেন।

ভিক্টর বলল লছুয়াকে, "বাবুরা বেড়াতে এসেছিলেন?"

মাথা নাড়ল লছুয়া। বলল, "কামে এসেছিলেন। সিনেমাকা বাবু। বললেন, জঙ্গল দেখতে এসেছেন। সিনেমাকা তসবির তুলবেন।"

শাসমল বললেন, "সিনেমার বাবু? কী নাম, জানো?"

লছুয়া বলল, "খাতামে লেখা আছে। সাব, আপলোক ভি নামটা লিখিয়ে দিন। সরকারকা আইন।" বলে লছুয়া গেল খাতা আনতে।

ভিক্টর বুঝতে পারল, সরকারি ব্যাপার। এখানে থাকতে হলে খাতাপত্রে নাম লিখতে হবে।

লছুয়া গিয়েছিল খাতা আনতে। ঘরে ভিক্টররা তিনজন। ভিক্টর বলল, "শাসমলসাহেব, আমরা কি লেট করলাম?"

শাসমল বললেন, "দাঁড়ান। আগে দেখি খাতাটা।"

নোটন বলল, "সিনেমার লোক শুটিংয়ের জায়গা দেখতে এসেছিল? এখানে? এত দূরে?"

খাতা নিয়ে এল লছুয়া।

লম্বা খাতা। দেখলে মনে হয়, বছর কয়েকের পুরনো। লছুয়ার মতনই তার রোগা-পাতলা চেহারা। পাতাগুলো ছিঁড়ে আসছে। নানা ধরনের নাম পাতায়। তবে বেশি নয়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাবুদেরই আসা-যাওয়া বেশি।

শাসমল খাতা নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। ভিক্টর তার পাশে।

"এই যে ঘোষসাহেব!" বলে শাসমল শেষ নামটা দেখালেন, "ডি. মিত্র অ্যান্ড ফ্রেন্ড।"

ভিক্টর নামটা দেখল। নামের পাশে ঠিকানা। কলকাতার পার্শিবাগান। বাড়ির নম্বরও রয়েছে।

ভিক্টর বলল, "আপনি আপনার নাম লিখে দিন, বলাই শাসমল অ্যান্ড পার্টি।"

শাসমল পকেট থেকে ডট পেন বার করে খাতায় নাম লিখতে লাগলেন।

ভিক্টর লছুয়ার দিকে তাকাল। "বাবুরা কতদিন ছিলেন?"

লছুয়া হিসেব করে বলল, "চার দিন।"

"গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন?"

"ভটভটিয়া।"

খাতাটা ফেরত দিতে দিতে শাসমল বললেন, "বাবুরা শুধুই ঘুরলেন ফিরলেন না, ফোটো তুললেন?" বলে শাসমল ফোটো তোলার নকল করে দেখালেন।

লছুয়া যা বলল, তাতে মনে হল, কাঁধে ঝোলানো এক ক্যামেরা ওদের কাছে ছিল।

ভিক্টর বলল, "কবে ফিরে গেলেন বাবুরা?"

"কাল চলে গেলেন।" বলেই কী মনে হল লছুয়ার, বলল, "বাবুরা ফিন আসবেন।"

"আবার আসবেন? কবে?"

"দো-তিন রোজ বাদ।"

ভিক্টর আর কথা বাড়াল না, নোটনকে ইশারায় বোঝাল, লছুয়াকে নিয়ে বাইরে গিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করতে।

লছুয়া চলে যেতেই ভিক্টর বলল, "শাসমলসাহেব, আমরা দেরি করলাম। আরও আগে এখানে আসা উচিত ছিল।"

শাসমল বললেন, "ডি. মিত্র লোকটা যে কে তা আমি জানি না, তবে পার্শিবাগানে মহাদেবের বাড়ি, সুনন্দনের বন্ধু।"

"ঠিকানাটা কি ঠিক?"

"বলতে পারছি না।"

"মহাদেব মোটরবাইক চড়ে?"

"এক্সপার্ট। খুব ভাল চালায়। আজকালকার ছেলেছোকরা মশাই, মোটরবাইক আর জিন্‌স্ হল ওদের প্রাণ।"

ভিক্টর একটু যেন হাসল। সে নিজেও তো আজকালকার ছোকরা।

শাসমল বললেন, "সমগ্র ব্যাপারটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে ঘোষসাহেব।"

ভিক্টর অন্যমনস্কভাবে বলল, "মহাদেবকে আপনি আজকাল সুনন্দনের বাড়িতে দেখতে পান?"

"না। দিনকয়েক দেখিনি।"

"কত দিন?"

মনে মনে হিসেব করে শাসমল বললেন, "সুনন্দনের অ্যাক্সিডেন্টের পরও বার দুই নার্সিং হোমে গিয়েছিল। তারপর থেকে দেখছি না।"

"কী করে মহাদেব?"

"বাপের ফোটোগ্রাফির ব্যবসা ছিল। নাম করা কোম্পানি। বাবা মারা গেছেন। পৈতৃক ব্যবসাকে আরও ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তুলেছে মহাদেব। শুনেছি, সিনেমাওলাদের স্টিল ফোটোগ্রাফি থেকে শুরু করে এখন মুভি ক্যামেরার কাজকর্মও করার চেষ্টা করছে।"

"সুনন্দনের কেমন বন্ধু? ইন্‌টিমেট?"

"প্রাণের বন্ধু।"

"নীল বামনের ব্যাপারটা সে জানে? সুনন্দন যেন বলেছিল আমায়।"

"জানে।"

"প্যান্থার সার্কাসের চিঠিও সে দেখেছে?"

"দেখেছে বলেই জানি।"

ভিক্টর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। বলল, "আমার এখন আফসোস হচ্ছে শাসমলসাহেব। আরও দু-তিন দিন আগে এখানে এলে ভাল হত। ডায়েরি চুরি

হয়েছে কলকাতায়, কিন্তু রহস্যটা বোধহয় এখানেই লুকিয়ে আছে।”

শাসমল বললেন, “কেমন রহস্য?”

ভিক্টর হাসল। কিছু বলল না।

নোটনরা চা আনল।

দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিল ভিক্টররা। রাত্রে ট্রেন জার্নি, সকালের দিকে বাস আর ভানুবাবুর বদখত জিপের ঝাঁকানি, নতুন জায়গার কুয়োর জল, আলু ভাতে ভাত, ডাল, ডিমের কারি—সব মিলিয়ে মিশিয়ে দুপুরে চমৎকার এক ঘুমের অবস্থা তৈরি হয়েছিল। ওরই সঙ্গে সোনায় সোহাগা হয়ে দেখা দিল বৃষ্টি। পাহাড়তলির এই বৃষ্টি যেন আরও অলস ঘুমকাতুরে করে তুলল।

ঘুম ভাঙতে-ভাঙতে বিকেল।

নোটন এসে বলল, “দাদা, বিট্‌বাবু কেশব ফিরে এসেছে।”

ভিক্টর বলল, “চল, দেখা করি। শাসমলসাহেব উঠবেন নাকি?”

শাসমল উঠে পড়েছিলেন। বললেন, “চলুন।”

এই কাঠের কুঠরির বিশ-পঁচিশ গজ দূরে, দুটি ঘর—, অল্প বারান্দা। বিট্‌বাবু কেশব থাকে একটা ঘরে, অন্যটায় চৌকিদার লছুয়া।

কেশবের আজ ফিরতে দেরি হয়েছে। তার সাইকেলের টায়ার পাংচার হয়ে গিয়েছিল। সাইকেল ঠেলে দু-তিন মাইল রাস্তা চক্কর মারা সোজা কথা নয় এখানে। তার ওপর বৃষ্টি।

কেশব সবে স্নান করে উঠেছে। গা মাথা মুছে লুঙ্গি পরে হাজির হল কেশব। স্বাস্থ্য চমৎকার। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। বছর বত্রিশ বয়েস বড় জোর। মুখটি সাধারণ।

ততক্ষণে বারান্দার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে ভিক্টররা। বৃষ্টি নেই। মেঘ ভেসে যাচ্ছে হু হু করে। বাদল হাওয়া। বিট্‌বাংলোর গায়ে একজোড়া ইউক্যালিপটাস। বাতাসে প্রায় নুয়ে পড়ছে। অন্য গাছগুলোর মধ্যে রয়েছে এক কাঁঠালগাছ আর ঘোড়ানিম। বাংলোর বেড়ার গা ধরে কাঁটাগাছ আর করবীঝোপ।

ভিক্টরই আলাপ শুরু করল। বলল, তারা দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে এসেছে এখানে। নিরিবিলিতে তিন-চারটে দিন কাটিয়ে ফিরে যাবে। অন্য একটা উদ্দেশ্যও আছে।

কেশব জানতে চাইল উদ্দেশ্যটা কী?

ভিক্টর আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল। বলল, “আমার একটা ছোটখাটো ব্যবসা আছে। ওষুধের ব্যবসা। হোমিওপ্যাথি। বেলেঘাটায় নিজেদের ওষুধের কারখানা। নিজেদের কারখানায় ওষুধ তৈরি করি।”

শাসমল বোধ হয় বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। ভিক্টরসাহেব পাগলের মতন কী বলছেন। হোমিওপ্যাথি ওষুধের ব্যবসা। শাসমল নিজে হোমিওপ্যাথির নাম শুনলে নাক কোঁচকান।

নোটন মজা পাচ্ছিল। দাদাকে সে বিলক্ষণ চেনে।

ভিক্টর বলল, "আমাদের দেশে কত রকম গাছগাছড়া যে আছে, আর কত রকম তার গুণ। কবিরাজরাও জিনিসটাকে মর্ডান করতে পারল না। হোমিওপ্যাথি পেরেছে। আমাদের ফারমাকোপিয়াতে..." বলে ভিক্টর এমন মুরুব্বির ভঙ্গি করল যে মনে হল, বনের বিট্‌বাবু কেশবকে সে এসব বড় বড় কথা কী-বা বোঝাবে। কেশব যে জীবনেও ফারমাকোপিয়ার নাম শোনেনি তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সামান্য থেমে ভিক্টর বলল, "আমরা শুনেছি, এই জায়গায় মানে এই এলাকার বনজঙ্গলে অটোমোটা রোবাটোস বলে—না না ওটা দেশি নাম নয়, বিদেশি নাম, দেশি নাম—ইয়ে মানে হিরুকণ্টক।"

শাসমল কোনও রকমে হাসি চেপে সামনে থেকে সরে গেলেন।

ভিক্টর বলল, "ওই গাছ একটু খুঁজে দেখব। চোখ আর লিভারের দারুণ ওষুধ। যদি গাছটা পাই..."

কেশব বলল, "এখানে নানারকম গাছপালা আছে। নামও জানি না।"

"খুঁজলেই যে পাব তা নয়—তবু দেখি। শুনেছি যখন।"

কেশব বলল, "দেখুন না।"

ভিক্টর কথা ঘুরিয়ে নিল, "লোকজন আসে এখানে?"

"এমনি লোক ন-ছ'মাসে একজন। আমাদের সাহেবরা আসেন।"

"ক-দিন আগে এক সিনেমা পার্টির কারা যেন এসেছিল? নামকরা লোক?"

কেশব বলল, "দুজন এসেছিল। নাম বলতে পারব না।"

"জায়গাটা ভালই। তা ওরা কেমন দেখল টেখল? মানে পছন্দ হল জায়গাটা?"

কেশব মাথা নেড়ে বলল, "জানি না।"

"লছুয়া বলছিল, আবার আসবে বলে গিয়েছে!"

"আসতে পারেন। মহুয়া জঙ্গলের দিকে একটা টিলা আছে। টিলার তলায় পাহাড়ি নালা। ওপাশে বাবুরা ঘোরাফেরা করেছেন।"

ভিক্টর আর কিছু বলল না। কেশবকে অকারণে সন্দিগ্ধ করা উচিত নয়। সিনেমার বাবুরা সিনেমার লোক—তাদের সম্পর্কে বেশি উৎসাহ দেখালে কেশব অন্য কিছু ভাবতে পারে।

কেশবকে ছেড়ে দিয়ে ভিক্টর ইশারায় শাসমলকে ডাকল।

বিট্‌বাংলোর সামনের দিকে পায়চারি করতে করতে ভিক্টর বলল, "শাসমলসাহেব, আপনি কি ডায়েরির মধ্যে সেই ম্যাপটা দেখেছেন?"

মাথা নাড়লেন শাসমল। বললেন, "আমাকে ডায়েরির কথা জিজ্ঞেস করবেন না। সুনন্দন হঠাৎ দেখলাম ডায়েরিটা নিয়ে মেতে গিয়েছে, আমায় বলল, আমি এক-দুবার দেখেছি। আমার কোনও আগ্রহ হয়নি। কী দেখেছি তাও আমার মনে নেই। জিনিসটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছিল এই পর্যন্ত। ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি।"

"কিন্তু আপনি বলেছেন, এমন ঘটনার কথা আপনি আগে বইয়ে পড়েছেন?"

"পড়েছি। বিদেশের ঘটনা। ঘোষসাহেব, কত আজগুবি ঘটনার কথা আমরা বইয়ে-কাগজপত্রে পড়ি। অবাক হই। তা বলে মাথা ঘামাতে বসি না। বসে লাভ নেই।"

ভিক্টর বলল, "এই ব্যাপারটায় যে মাথা ঘামাতে হচ্ছে।" বলে একটু হাসল। আবার বলল, "আমার সন্দেহ হচ্ছে, মহুয়া জঙ্গলের যে টিলার কথা কেশব বলল, সেই জায়গাটায় সিনেমাওলারা অকারণে ঘোরাফেরা করেনি। যদি ওদের কাছে গানাসাহেবের ডায়েরির ছেঁড়া পাতাগুলো থাকে—তার মধ্যে ম্যাপটাও রয়েছে। ম্যাপ দেখেই ওরা টিলার কাছে ঘুরেছিল। আমরাও ওই দিকটা দেখব। কাল সকালেই বেরোনো যাবে, কী বলেন?"

শাসমল হেসে বললেন, "যেমন হুকুম করবেন। হোমিওপ্যাথি ওষুধের গাছ খুঁজতে যাওয়া তো! কী যেন নাম বলছিলেন?"

নামটা নিজেই ভুলে গিয়েছিল ভিক্টর। মাথা চুলকোতে লাগল। হেসে উঠল।

কাঠের ক্রস

দুটো দিন বৃথাই কাটল।

মহুয়া জঙ্গলের কাছে টিলা আর তার একপাশে এক পাহাড়ি নালার মধ্যে আলাদা করে চোখে পড়ার মতন কিছু নেই। পাহাড়তলির এই জায়গাটার যত্রতত্র টিলা। দূর থেকে সব সময় বোঝা যায় না। কাছে এলে ধরা যায়। সমতলভূমি বলতে এখানে কিছু নেই। আর গাছপালাও নানা ধরনের। বেশিরভাগই শাল মহুয়া আমলকী শিশু। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এক জায়গায় ইউক্যালিপটাস লাগানো হয়েছে। গাছগুলো যেন এখনও বাড় পায়নি।

পাহাড়ি নালা যেমন হয়, বর্ষায় বৃষ্টির জল পেলে ভরে ওঠে, উঁচু থেকে নেমে আসে জলের ধারা, আবার শুকিয়ে যায়—এখানকার অবস্থাও তাই।

কাছাকাছি অনেকগুলো টিলা খুঁটিয়ে দেখে ভিক্টর প্রায় হতাশ হয়ে গেল। কোনও দিক থেকেই ধরা যাচ্ছে না, কোন রহস্য আছে এখানে।

শাসমল বললেন, "কলকাতায় ফিরবেন নাকি?"

কথাটার মধ্যে ঠাট্টা ছিল। ভিক্টর ঠাট্টাটা হজম করে নিয়ে বলল, "দাঁড়ান, অধৈর্য হবেন না। আরও দুটো দিন দেখতে দিন।"

"আপনি ভাবছেন, মোটরবাইকওলারা আবার ফিরে আসবে?"

"ভাবছি না মশাই, চাইছি ওরা আবার একবার আসুক।"

"আসবে?"

"যদি আশা না ছেড়ে দিয়ে থাকে আবার আসবে।...আচ্ছা শাসমলসাহেব, একটা কথা বলুন তো? মোটরবাইকওলারা কি কলকাতা থেকে বাইক নিয়ে এসেছে না, এদিকে কোথাও থেকে জোগাড় করেছে?"

শাসমল বললেন, "কলকাতা থেকে নিয়ে আসা ঝঞ্ঝাটের। এক যদি ট্রাকে চাপিয়ে

কাছাকাছি কোথাও নিয়ে এসে থাকে! না হয় কোনও রকমে এদিকেই কোথাও জুটিয়েছে।"

"ট্রাকে চাপিয়ে আনা যাবে?"

"সহজেই। ট্রাকে টন টন মালপত্র যায়, একটা সামান্য মোটরবাইক আনা যাবে না!"

ভিক্টর মাথা নাড়ল। শাসমল ঠিকই বলেছেন। রোড ট্রান্সপোর্টে বাইক আনা মোটেই কঠিন নয়। কাছাকাছি কোথাও থেকে জোটানো সম্ভব।

জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভিক্টর সিগারেট ধরাল। বলল, "নোটনকে তো লাগিয়ে দিয়েছি। লছুয়া আর কেশবের সঙ্গে নানা গল্প ফেঁদে ভাব জমিয়ে ফেলেছে। আবার মাঝে মাঝে বাইরের দিকেও টহল মেরে আসছে। নীল বামনের কথা লছুয়ারা জানে না, শাসমলসাহেব।"

শাসমল বললেন, "পুরনো ব্যাপার, সার। নীল বামন আর কি থাকবে!"

"ওরকম কিছু নেই তা হলে?"

"না থাকারই কথা।"

"সুনন্দন তা হলে নীল বামন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন?"

শাসমল বললেন, "আমি ঠিক বলতে পারব না। ও যে নিজে নীল বামনের কথা বিশ্বাস করে তাও আমার মনে হয় না। আর যদি বা ধরুন নীল বামন আজও থেকে থাকে—তাদের ধরারও কোনও উপায় নেই। বনজঙ্গলের পশুপাখি এখন আর ধরা যায় না।"

"সুনন্দন প্যান্থার সার্কাসকে চিঠিতে..."

"মামুলি চিঠি দিয়েছিল।"

সামান্য চুপ করে থেকে ভিক্টর বলল, "লছুয়া আর কেশব যা বলছে তাতে তো মশাই সন্দেহ হচ্ছে মহাদেবই এখানে এসেছিল। কী বলেন?"

মোটরবাইক চড়ে যারা এসেছিল তাদের একজনের চেহারার বর্ণনা শুনে শাসমলের ওইরকমই ধারণা। ভিক্টর মহাদেবকে চেনে না। শাসমল চেনেন। তিনিই ভিক্টরকে বলেছেন কথাটা।

"মহাদেব বলেই মনে হয়। দ্বিতীয় লোকটা কে?"

ভিক্টর চুপ করে থাকল।

আরও খানিকটা হেঁটে এসে ভিক্টর বলল, "আশেপাশে ছোট ছোট বসতি আছে। দু'দশ ঘর লোকের বাস। চলুন, এবার ওদিকে একটু খোঁজ খবর করা যাক।...আজ বিকেলে যাবেন?"

শাসমল বললেন, "আমার আপত্তি নেই। চলুন।"

গাছের মাথায় একঝাঁক পাখি ডাকাডাকি করছিল। ছায়ায় ছায়ায় ভিক্টররা ফিরতে লাগল। আকাশ মেঘলা। গাছপালার ছায়া-ছড়ানো পায়ে চলা পথ। জঙ্গলের বাতাস বাদলার গন্ধে ভরা।

হাঁটতে হাঁটতে ভিক্টর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কী যেন দেখছিল।

শাসমলও দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভিক্টরের চোখ যেদিকে সেদিকে তাকালেন। কিছু বুঝতে পারলেন না।

"কী হল ঘোষসাহেব?" শাসমল বললেন।

ভিক্টর কোনও জবাব দিল না কথার। কয়েক পা এগিয়ে গেল। কুমড়োপাতার মতন একরকম পাতায় খানিকটা জায়গা ঝোপ হয়ে রয়েছে। আগাছার ঝোপ। হাত কয়েক দূরে বিরাট তেঁতুলগাছ। পিচফলের মতন কিছু ফল ধরে আছে একটা গাছে। ফলগুলো দেখতে অবশ্য ছোট।

পিঠ নুইয়ে ভিক্টর কী একটা দেখতে দেখতে শাসমলকে ডাকল।

কাছে এলেন শাসমল।

"ওটা চিনতে পারেন?" ভিক্টর আঙুল দিয়ে জিনিসটা দেখাল।

শাসমল দেখলেন। বললেন, "মনে হচ্ছে ক্রস।"

"হ্যাঁ। এখানে ক্রস কেন?"

শাসমল একটু ভেবে বললেন, "আদিবাসীরা থাকত এদিকে। ওদের মধ্যে অনেকে ক্রিশ্চান হয়েছিল। হয়তো এই জায়গায় কাউকে কবর দেওয়া হয়েছে।"

ভিক্টর আরও দু পা এগিয়ে গেল। তার কাঁধের ছোট ঝোলায় সামান্য কয়েকটা দরকারি জিনিস আছে। খুরপি, ছুরি, মাটি-খোঁড়া কাঁটা। এমনকী কয়েক গজ নাইলনের দড়ি। টুকিটাকি আরও কিছু।

কাঁধের ঝোলা নামিয়ে ভিক্টর ছুরিটা বার করে নিল।

শাসমলের কাঁধে জলের ফ্লাস্ক। ফ্লাস্ক নামিয়ে শাসমল বললেন, "করবেন কী?"

ভিক্টর কোনও জবাব দিল না কথার। আগাছাগুলো কাটতে লাগল।

ফ্লাস্কের ঢাকনি খুলে শাসমল খানিকটা জল খেলেন।

ক্রস একপাশে হেলে রয়েছে। কাঠের ক্রস।

ভিক্টর হাঁটু গেড়ে বসে ক্রসটা দেখতে লাগল।

"আপনি দেখুন," ভিক্টর বলল।

শাসমল মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসলেন। দেখলেন ঝুঁকে পড়ে। বললেন, "ছুরি দিয়ে কেটে কেটে কাঠের ওপর নাম খোদাই করে রেখেছে। কী কাঠ মশাই?"

"পড়তে পারেন?"

"পারছি না। ময়লা ধরে গিয়েছে।"

"রোদ বৃষ্টি জল ঝড়, গাছপালা—ময়লা তো ধরবেই। তবু কিছুই পড়তে পারছেন না?"

শাসমল আরও ঝুঁকে পড়লেন। আগাছার পাতা দিয়ে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করলেন লেখাগুলো। বললেন, "ইংরিজি হরফ।"

"রোমান হরফ।"

"তলার একটা লেখা কিছু পড়তে পারছি।"

"প্রথমটা নেই। পচে নষ্ট হয়ে গিয়েছে জায়গাটা।"

"হ্যাঁ। ডবলুর মতন একটা অক্ষর দেখছি।"

"'ও' হরফও রয়েছে মনে হচ্ছে।"

"মানেটা কী? ও ডবলু?"

ভিক্টর যেন তামাশার গলায় বলল, "পি ও ডবলু নয়তো? প্রিজনার অব ওয়ার। মানে যুদ্ধবন্দি।"

"যুদ্ধবন্দি?" শাসমল অবাক।

ভিক্টর বলল, "অন্য মানেও হতে পারে। 'পি' এখনও খুঁজে পাইনি।...আপনি সরুন। ওপরের কাঠটা আমি খুলে নিয়ে যাব।"

শাসমল সরে এলেন।

ভিক্টর বসে পড়ল মাটিতে। ঝোলা থেকে যন্ত্রপাতি বার করল।

কাঠটা প্রায় পচে গিয়েছিল। খোলার আগেই ভেঙে গেল।

ভিক্টর উঠে পড়ল কাঠের টুকরো হাতে। বলল, "চলুন, ফিরে গিয়ে এটা পরিষ্কার করি। দেখা যাক কার নাম লেখা আছে?"

শাসমল বললেন, "চলুন। কিন্তু ভিক্টরসাহেব, এই কাঠের টুকরোর সঙ্গে নীল বামনের সম্পর্ক কী?"

ভিক্টর বলল, "হয়তো কিছুই নয়। তবু একটা কথা আছে জানেন তো? যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো ভাই, পাইলেও পাইতে পারো..." বলে হাসল ভিক্টর, কথাটা শেষ করল না।

শাসমল বললেন, "অমূল্য রতন পাবেন! দেখুন।"

কাঠের সরু ফলকটা নিয়ে ভিক্টর এত রকম গবেষণা শুরু করল যে শাসমল মজা পেয়ে বললেন, "আপনি কি শিলালিপি উদ্ধার করছেন ভিক্টরসাহেব?"

শিলালিপি না হোক ওই ময়লা দাগ ধরা পচে যাওয়া কাঠের ফলক থেকে খোদাই করা নামটা উদ্ধার করতে ভিক্টরের বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত যত দূর বোঝা গেল, নামটা কার্লো পিরো নামের কোনও ভদ্রলোকের হতে পারে। মারা যাবার পর তাঁর কবর হয়েছে ঢালপাহাড়ির কাছে বনে জঙ্গলে।

ভিক্টর একসময় খেলাধুলো নিয়ে মাতামাতি করেছে অনেক। সে ছিল কলেজ টিমের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন। ফুটবলে সুবিধে করতে না পারলেও বাইরের বড় বড় খেলোয়াড়দের নামধাম জানত। কার্লো পিরো নাম থেকে তার মনে হল, ইটালিয়ান নাম। অবশ্য নামটা যদি ঠিক মতন উদ্ধার করা হয়ে থাকে।

কার্লো মানুষটা ইটালির, কিন্তু তার কবর এরকম অদ্ভুত জায়গায় হল কেন?

নোটনের ঘাড়ে ভিক্টর একটা কাজ চাপিয়েছিল। বলেছিল, আমাদের সঙ্গে তুই জঙ্গলে ঘুরবি তো ঘোর। কিন্তু তোর অন্য কাজ হল আশেপাশে ঘুরে বেড়ানো। দেখবি, ছোট ছোট যে বসতি আছে, দু দশটা গেঁয়ো কুঁড়ে, এসব জায়গায় ঘুরে বেড়াবি। গল্পগুজব জমাবি। খবর নেবার চেষ্টা করবি—এই জায়গায় কারা আসে, এখানে আগে কেমন অবস্থা ছিল, কারও নজরে অদ্ভুত কিছু পড়েছে কি না!

নোটন দিন দুই ধরে এই কাজটাই করে বেড়াচ্ছিল সকালের দিকে।

নোটনের কাছ থেকে জানা গেল, মাইলখানেক তফাতে একটা গ্রাম আছে। ছ-সাতটি মাত্র কুঁড়ে ঘর। ওরা বলে 'কুঁড়িয়া'। ক্রাঠুরে গাঁ। ওই গ্রামের এক বুড়োর সঙ্গে নোটন দিব্যি খাতির জমিয়ে নিয়েছে। লোকটা একসময় পল্টনে কাজ করেছে। মিলিটারি মেসে খানসামার কাজ।

ভিক্টর বলল, "আজ বিকেলে যাব বুড়োর কাছে। কী বলুন শাসমলসাহেব?"

শাসমল হেসে বললেন, "আমি আপনার হুকুমে হাজির আছি। যা বলবেন সার! তবে বিকেলে বৃষ্টি আসতে পারে জোরে।"

বৃষ্টি এল না। ধোঁয়াটে হালকা মেঘ ভাসতে ভাসতে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে জমা হতে লাগল যেন। ওপাশটা অনেক কালচে দেখাচ্ছিল।

নোটন মাইলখানেক পথ হাঁটিয়ে যেখানে নিয়ে এল সেটা আদিবাসীদের ছোট গ্রাম বলেই মনে হয়। কয়েক ঘর মাত্র বসতি। মাটির কুঁড়ে। মাথার ওপর খাপরা আর পাতার ছাউনি। কাঠকুটোও চাপানো আছে। গোটাদুয়েক ছাগল আর চার-ছ'টা মুরগি চরছে সামনে। টুকরো টুকরো হাত কয়েকের খেত। কোথাও শাকপাতা, কুমড়ো-লাউ, কোথাও বা কচি ঢেঁড়শ ফলেছে।

বুড়ো বাইরেই ছিল। নোটনকে দেখে এগিয়ে এল।

বয়েস হয়েছে বুড়োর। ষাটের ওপর। মাথায় চুল নেই, প্রায় নেড়ার মতন দেখায়। কপাল গালের চামড়া কুঁচকে রয়েছে। গলায় একটা ক্রস ঝুলছে ওর। ময়লা খাটো ধুতি। ধুতি আর গায়ের গেঞ্জি দুই-ই ছেঁড়া।

বুড়োর নাম মুংরু। নামের আগে পরে একটা লেজুড় জুড়েছে। বলে বার্জ। কেন কে জানে!

ভিক্টররা মুংরুর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলল। সিগারেট দিল।

মুঠো পাকিয়ে সিগারেট ধরে বড় বড় টান মারল মুংরু। তারপর নিজের কাহিনী শুরু করল। কথা বলতে ভালবাসে লোকটা।

মুংরুর কাহিনী থেকে বোঝা গেল, গত যুদ্ধের সময়, মুংরুর বয়েস যখন কুড়িও হয়নি তখন সে মিলিটারি ক্যাম্পে ঝাড়ুদারের কাজ করত। ওই যে পাহাড়ি টিলা ওখানে ক্যাম্প বসেছিল একটা। তারকাঁটায় ঘেরা ছিল অনেকটা জায়গা। পঁচিশ-ত্রিশজন সাহেব থাকত। কারও হাত কাটা, কারও পা কাটা। ডাক্তার ছিল ক্যাম্পে। মিলিটারি ট্রাকে করে খাবারদাবার ওষুধ আসত। ওটা ঠিক হাসপাতাল ছিল না। মিলিটারি হাসপাতাল থেকে আসত সাহেবরা। দু-চার মাস পরে তাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। কোথায় যে মুংরু জানে না। তবে, ওদের খুব তোয়াজে রাখা হত।

একদিন ক্যাম্পে কী যে হল কে জানে, বোমা পড়ার মতন শব্দ হল বিকট। আগুন ধরে গেল। তছনছ হয়ে গেল ক্যাম্প। দু-পাঁচজন বাঁচল, বাকি সব মারা গেল। মিলিটারি অ্যাম্বুলেন্স এসে হটিয়ে নিয়ে গেল সকলকে।

মুংরু চলে গেল অন্য ক্যাম্পে। দূরে। সেখানে তাকে ঝাড়ুদারের কাজও করতে হত, আবার খানসামার কাজও।

যুদ্ধ থেমে যাবার পর মুংরু রেল খালাসির কাজ করেছে। শেষে সে আবার ফিরে এল নিজের জায়গায়। তবে এই জায়গায় নয়, ক্রোশখানেক দূরে। তাদের গাঁ তখন হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। সাদা মাটি খুঁড়ছে বাবুরা। তারা এই জায়গাটায় এসে উঠল।

ভিক্টর মন দিয়ে সব শুনল। শেষে বলল, "এই টিলায় পরে আর কেউ আসত না?"

মুংরু বলল, সে ঠিক জানে না। তবে দু-তিনজন সাহেব এসেছিল এখানে।

"পাদরিসাহেব?"

মুংরু মাথা নাড়ল। না। তবে এক পাদরিসাহেবকে পরে দেখেছে। চেনা-জানা হয়নি।

ভিক্টর বলল, "কত দিন আগে দু-তিনজন সাহেব এসেছিল?"

মুংরুর হিসেবের মাথা নেই। যা বলল—তার থেকে মনে হল, বছর দশ-বারো আগে। তারা তাঁবু গেড়ে থাকত, জিপ গাড়ি ছিল, যন্ত্রপাতি সঙ্গে এনেছিল। এক সাহেব মারা গেল। বাকিরা ফিরে গেল।

এখানে ওই টিলায় কোনও অদ্ভুত কিছু লোকজন দেখা যায় কি না মুংরু বলতে পারল না।

ভিক্টররা আর দেরি করল না। আকাশের চেহারা ঘোর হয়ে আসছিল।

ফেরার পথে শাসমল বললেন, "কী মনে হচ্ছে ভিক্টরসাহেব?"

ভিক্টর বলল, "আমার খটকা লেগেছিল প্রথমে। ভাবছিলাম ওখানে যুদ্ধের সময় কোনও 'প্রিজনার অব ওয়র' ক্যাম্প ছিল কি না! শুনেছি ব্রিটিশরা এদেশে গত যুদ্ধের শেষের দিকে যুদ্ধবন্দিদের ক্যাম্প বসিয়েছিল, কয়েকটা জায়গায়।"

"আপনার কার্লো..."

"ইটালিয়ান। হতে পারে আফ্রিকা যুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা হোমরাচোমরা কয়েকজন ইটালিয়ানকে ধরতে পেরেছিল।"

"জার্মানরা না যুদ্ধ করত আফ্রিকায়? রোমেলের দল?"

"মুসোলিনির সৈন্যসামন্ত বোধ হয় কোথাও কোথাও লেজুড় হয়ে থাকত।" ভিক্টর সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "তা প্রিজনার অর ওয়র নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। ওটা যুদ্ধবন্দি ক্যাম্প ছিল না। ছিল রেস্ট ক্যাম্প। যুদ্ধের সময় যেসব ব্রিটিশ অফিসাররা জোর ঘায়েল হত তাদের কারও কারও আরোগ্য শিবির। মুংরুর কথা থেকে তাই আন্দাজ হয়।"

শাসমল বললেন, "আচ্ছা! কিন্তু ক্যাম্পে ঘটেছিল কী? বোমা পড়ার মতন শব্দ, আগুন, ক্যাম্প ছারখার হয়ে গেল?"

ভিক্টর বলল, "কে জানে! কোনও প্লেন ভেঙে পড়তে পারে। হয়তো বোম্বার।"

"বোমারু উড়োজাহাজ?" শাসমল ঠাট্টার গলায় বললেন। "কাণ্ড দেখুন ভিক্টরসাহেব, নিজেদের বোমায় নিজেরাই ঘায়েল?"

"অ্যাক্সিডেন্ট!"

"অন্য কিছু নয় তো?"

"অন্য কী?"

"মানে বাইরে থেকে কিছু এসে পড়েনি তো?"

"বাইরে থেকে কী এসে পড়তে পারে?" বলেই ভিক্টরের যেন খেয়াল হল, উল্কাটুল্কা ছিটকে এসে পড়েনি তো? খানিকটা যেন চমকে উঠল ভিক্টর। উল্কাপাত হতেই পারে। কেউ বলতে পারে না, কেন কবে কোথায় উল্কা এসে ছিটকে পড়বে পৃথিবীর মাটিতে!

হাঁটতে হাঁটতে দশ-পনেরো গজ এগিয়ে এসে ভিক্টর হঠাৎ বলল, "আপনি অন্ধকারে ঢিলটা ভালই ছুড়েছেন। বস্তুটা উল্কা হতে পারে।"

"উল্কাবৃষ্টি?"

"বৃষ্টি হোক আর না হোক একটা উল্কাপাত হতেই পারে।...আর মনে হচ্ছে, ওই ঘটনার অনেক পরে তিন সাহেব এসেছিল ব্যাপারটা সরজমিনে দেখতে। বোধহয় ওরা ছিল বিজ্ঞানী। তাঁবু গেড়ে বসে পড়েছিল চারপাশ পরীক্ষা করতে। ওদের মধ্যে একজন কার্লো পিরো। কার্লো বেচারি মারা যায়। তারই কবর পড়েছে ওখানে।"

শাসমল বললেন, "এর সঙ্গেই বা নীল বামনের সম্পর্ক কী?"

"কিছু নয়। তবে..."

ভিক্টরের কথা শেষ হল না। নোটন বলল, "দাদা মোটরবাইকের শব্দ।"

বাইক দেখা যাচ্ছিল না। শব্দটা শোনা যাচ্ছিল।

মহাদেব

মোটরবাইকটা কাছাকাছি আসতেই ভিক্টররা পাথরের আড়ালে সরে গিয়েছিল।

পাহাড়ি চড়াই পথ। পায়ে হাঁটার মতন চওড়া। এ পথে জিপ নিয়ে ওঠা যায় না। জিপের একটা রাস্তা অবশ্য আছে কিন্তু ঘুরপথে। সরকারি অফিসাররা বিট্‌বাংলোয় যাবার সময় সেই রাস্তা ধরেই যায়।

ভিক্টররা আড়াল থেকে দেখল, মোটরবাইকের চেহারাটা বেশ জাঁদরেল। হালকা ফিনফিনে যে ধরনের বাইক আজকাল বেরিয়েছে বাজারে, সেরকম নয়। পুরনো ধরনের। রং কালো। যারা বসে আছে তাদের মাথায় হেলমেট। গায়ে 'উইন্ড চিটার'। বাতাস এবং বৃষ্টি দুই-ই আটকানো যায়। পরনে জিন্‌স্‌-এর প্যান্ট। বাইকের এপাশে ওপাশে লটবহর ঝোলানো রয়েছে।

বাইকটা ধীরে ধীরেই এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

গজ-তিরিশ-চল্লিশ এগিয়ে বাঁক নিল বাইকটা। গাছপালার আড়ালে চলে গেল।

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ভিক্টররা।

ভিক্টরকে কিছু বলতে হল না। শাসমল নিজেই অবাক হয়ে বললেন "মহাদেব।"

ভিক্টর বলল, "চিনতে পেরেছেন?"

"হ্যাঁ, মহাদেব। তবে মোটরবাইকটা ওর নয়। ওর নিজের বাইকের রং লাল। পুলিশ সার্জেন্টদের মতন।"

"কাছাকাছি কোথাও থেকে জোগাড় করেছে।"

"হ্যাঁ, তাই দেখছি।"

"পেছনের লোকটাকে চিনতে পারলেন?"

"না।"

নোটন বলল, "ওরা বিট্‌বাড়ির দিকে যাচ্ছে।"

মোটরবাইকটা যে এই সরু পায়ে-চলা পথ ধরে বিট্‌বাংলোর দিকে যাচ্ছে বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

ভিক্টর হালকা গলায় বলল, "যাচ্ছে, আবার ফিরে আসবে।"

"ফিরে আসবে?"

"বিট্‌বাংলোয় গিয়ে যখন দেখবে থাকার জায়গা নেই, ঘর দখল হয়ে গিয়েছে তখন আর কী করবে!" ভিক্টর যেন মজা পাচ্ছিল।

শাসমল বললেন, "করবে আর কী! চাপরাশির কাছ থেকে খাতা চেয়ে নিয়ে দেখবে, কারা ঘর দখল করল। খাতায় নাম দেখবে বলাই শাসমল অ্যান্ড পার্টি। ব্যস, তারপর আর বুঝতে কিছু বাকি থাকবে না!"

ভিক্টর হেসে বলল, "দ্যাটস্ রাইট। শাসমলসাহেব, আপনি লিটল জু ছেড়ে আমার অফিসে এসে বসুন।"

শাসমলও হাসলেন। বললেন, "তাই দেখছি।"

নোটন হঠাৎ বলল, "দাদা, খেলা জমে গেল। এবার সেই নাগাপাহাড়ে রক্তারক্তির মতন ব্যাপার হবে।"

ভিক্টর জোরে হেসে উঠল। এক টাকা দু টাকা সিরিজের গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে পড়ে নোটনের মাথায় সব সময় রক্তারক্তির রোমাঞ্চ।

তবে, কথাটা নেহাত মিথ্যে বলেনি নোটন। মহাদেবরা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে। এসে যদি দেখে বলাই শাসমলও বিনি উদ্দেশ্যে ঢালপাহাড়ি আসেননি তারা তো ছেড়ে দেবে না। খুনোখুনিও হতে পারে।

ভিক্টর বলল, "শাসমলসাহেব, নোটন কী বলছে শুনলেন?"

শাসমল বললেন, "শুনলাম।"

"এবার কী হবে বলতে পারেন?"

"সব পারি না। প্রথমটা পারি। আমরা এখানে এসেছি দেখে মহাদেবরা অবাক হবে। ওরা এখনকার মতন সরে পড়বে। কিন্তু বরাবরের মতন নয়।"

"ঠিক বলেছেন।"

"আরও একটা কথা ভিক্টরসাহেব! আমরা এখন থেকে বিপদের মধ্যে পড়লাম। ওরা নজর রাখবে।"

"আমরাও রাখব।"

"কিন্তু কেন?...আমি এখনও বুঝতে পারছি না—আমরা কেন এখানে এসেছি?

চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে কী ঘটেছিল তা জানতে তো আমরা আসিনি।"

ভিক্টর বলল, "না, সেটা জানতে আসিনি। আমরা উল্কা-বিশারদ নই। প্লেন বা বোম্বার-বিশারদও নয়। তবে, এটা আমার সন্দেহ হচ্ছে, ওই পুরনো ঘটনার সঙ্গে কার্লোসাহেবদের ঢালপাহাড়িতে আসা আর তারপর গানাসাহেবের নীল বামন দেখার একটা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে।"

ভিক্টররা হাঁটতে লাগল। মোটরবাইকের শব্দ এই পাহাড়তলিতে অনেকক্ষণ শোনা গিয়েছিল। ফিকে শব্দ মিলিয়ে এল শেষ পর্যন্ত।

সিগারেট ধরাল ভিক্টর। অন্যমনস্ক। বলল, "আপনারা বলছেন ডায়েরিতে নীল বামনের কথা লেখা ছিল। ডায়েরির ওই পাতাগুলো আমি দেখিনি। সুযোগ হয়নি। কিন্তু আপনাদের কথাবার্তা থেকে আমার মনে হয়েছে, গানাসাহেব ঠিক নীল বামন বলে কিছু লেখেননি। বামনের মতন দেখতে লিখেছেন। মানে, শর্ট হাইট। বেঁটে বেঁটে বামন বলে একটা কথা আমরা বলি। তার মানে বামন নয়, এত বেঁটে যে বামনের মতো দেখায়।"

শাসমল হেসে বললেন, "তালগাছের মতন লম্বা বললে যেমন সত্যি সত্যি মানুষ লম্বায় তালগাছ হয় না।"

"ঠিক বলেছেন।"

"তা বামনই হোক আর বেঁটেই হোক—তার সঙ্গে কীসের সম্পর্ক আগের ঘটনাগুলোর?"

"সেটাই তো রহস্য, মশাই। আমরা এসেছি রহস্য উদ্ধার করতে। দেখি কতটা পারি।"

চড়াই আর চড়াই। মাঝে মাঝে বাঁক। পাথর, ঝোপঝাড়, গাছপালা। আকাশ এবার কালো হয়ে আসছে।

আরও খানিকটা হেঁটে এসে ভিক্টর বলল, "শাসমলসাহেব, আমি যেন কোথায় পড়েছিলাম, আকাশ বা শূন্য থেকে যেসব উল্কাটুল্কা পড়ে তার ওপর গবেষণাও করা হয়। আজকাল গবেষণার যুগ।"

"তা ঠিকই।"

"লেখাপড়া এখন চুলোয় দিয়েছি। তবু আমার মনে হচ্ছে, আমেরিকায় অ্যারিজোনায়—উইন...কী যেন উইন্‌সলো কি নামটা—একটা উল্কা পড়েছিল দশ হাজার বছর আগে। যে জায়গায় পড়েছিল সেখানে নাকি মাটি ফেটে বিরাট এক দিঘির মতন হয়ে গিয়েছে। সাড়ে তিনশো-চারশো হাত গর্ত।"

শাসমল বললেন, "উল্কা তো সোনা নয় ভিক্টরসাহেব, যে, সোনার জন্যে লোকে ছুটবে!"

"এখানেই তো ভুল করলেন। অনেকের কাছে সোনা যত দামি, এক টুকরো উল্কার দাম তার চেয়ে কম নাও হতে পারে।"

"পাগলের কাণ্ড।"

নোটন হঠাৎ বলল, "দাদা, ওই দেখুন..."

ভিক্টররা বিট্‌বাংলোর কাছাকাছি চলে এসেছিল। এখান থেকে বাংলো দেখা যায়। ওরা নীচে, বাংলোটা ওপরে, টিলার মাথায়। নোটনের কথায় ওরা বাংলোর দিকে তাকাল। মহাদেবদের দেখা যাচ্ছে। মোটরবাইক দাঁড় করানো।

শাসমল বললেন, "ওরা এখন কী করবে? ফিরে আসবে। এই রাস্তা দিয়েই। এখানে কোনও পাথর নেই যে আমরা আড়ালে ঘিয়ে লুকোব!"

ভিক্টর বলল "ঝোপ আছে, বালিয়াড়ির মতন এবড়োখেবড়ো জমি আছে। আমরা সেরেফ ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়ব।"

শাসমল চারদিকটা একবার দেখে নিলেন, যেন লুকোবার জায়গা খুঁজলেন।

নোটন বলল, "দাদা, আমরা এগিয়ে যাব? না, এখানেই হল্ট মেরে যাব?"

"আরও একটু এগিয়ে চল। তারপর হল্ট..."

বিট্‌বাংলোর দিকে চোখ রেখে আরও খানিকটা এগিয়ে এসে ভিক্টররা দাঁড়াল।

বাংলোর সামনেটা এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। লছুয়া দাঁড়িয়ে আছে। মহাদেবরা যেন অস্থির। পায়চারি করছে।

শাসমল বললেন, "ওই ছোকরা মহাদেব। খুব হাত পা নাড়ছে। দেখতে পাচ্ছেন? ওই যে, লম্বা মতন।"

ভিক্টর বলল, "অন্য লোকটা কি চৌধুরী?"

"চৌধুরী?"

"হাসপাতালের চৌধুরী!"

"আচ্ছা! কেমন করে বুঝলেন?"

"আন্দাজে বললাম, চৌধুরী নাও হতে পারে।"

ভিক্টররা আর এগিয়ে গেল না। মহাদেবরা যেন হাত পা ছুড়ে চেঁচামেচি করছিল লছুয়ার সঙ্গে। করতে করতে মোটরবাইকের সামনে ফিরে এল।

ভিক্টর বলল, "মিলিটারি কায়দায় ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়ুন। ওরা আসছে।"

মোটরবাইকের শব্দ শোনা গেল। গর্জন করে উঠল যেন যন্ত্রটা। যতটা প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি গর্জন করছিল। মহাদেবদের রাগ-বিরক্তি প্রকাশের জন্যেই বোধহয়।

গাড়ি নেমে আসছে।

ভিক্টররা লুকিয়ে পড়ল।

সামান্য পরেই বাইক সামনে এসে পড়ল। হাত-দশেক তফাত মাত্র। মোটরবাইকটা ঢালু পথ বেয়ে সাবধানে নীচে নেমে গেল।

ওরা আড়ালে যেতেই ভিক্টররা উঠে পড়ল।

জামা প্যান্ট ঝাড়তে ঝাড়তে শাসমল বললেন, "ওরা কী বলছিল শুনতে পেয়েছেন?"

"না।"

"গাড়ির শব্দে আমিও শুনতে পেলাম না। তবে মনে হল, গালমন্দ করছে আমাদের।"

ভিক্টর বলল, "চলুন, লছুয়াদের কাছেই শুনতে পাব।"

বিট্‌বাংলোয় ফিরে লছুয়ার মুখে যে বৃত্তান্ত শুনল ভিক্টররা তাতে বুঝতে পারল, মহাদেবরা যত না খেপেছে তার চেয়েও বেশি ভয় পেয়েছে।

"সাহেবরা এত গোসা করলেন, বাপ রে বাপ।" লছুয়া বলল, "মাগর আমি কী করব! ঘর ফাঁকা আছে, দুসরা লোক এসেছে। আমি সরকারকা নোকর। আমার ডিউটি আমি করেছি। ঘর ফাঁকা রাখব, দুসরা সাহেবরা ফিরে যাবে। তামাশা!"

কেশব বলল, "বাবুরা মাথা গরম করলেন।"

লছুয়া বলল, "ডর ভি লেগে গেল। ভটভটিয়াবাবু দোসরা বাবুকো বললেন, কী বাত বললেন কেশববাবু?"

কেশব বলল, "তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে বললেন।"

শাসমল বললেন, "তুমি তোমার খাতা দেখিয়েছ লছুয়া?"

"জি।...খাতা দেখে চক্কর লেগে গেল।"

"ঠিক আছে। চক্কর লাগুক। তোমরা আইন মতন কাজ করেছ। আমরাও বেআইনি কাজ করিনি। ওরা আবার আসবে বললে?"

কেশব বলল, "কিছু বললেন না।"

"ভেগে গেলেন," লছুয়া বলল।

ভিক্টর বলল, "ঠিক আছে। এখন তুমি আমাদের চা খাওয়াও লছুয়া।"

লছুয়ারা চলে গেল।

বাংলোর বাইরে বিকেল পড়ে ধীরে ধীরে ঘোলাটে ছায়া নেমে যাচ্ছিল। আকাশ ক্রমশই কালো হচ্ছে পাহাড়ের দিকে। এপাশেও মেঘের কালো ছড়িয়ে এল।

ভিক্টর বলল, "শাসমলসাহেব, কাল কি পরশুই আমাদের ফাইনাল অ্যাসাল্ট। হয় জিতলাম, না হয় হারলাম।"

"কালকের পর পরশু কে থাকবে! পেটে গামছা বেঁধে থাকব নাকি? ফুডস্টক কাল শেষ।"

নোট বলল, "আমি চাল-ডাল এনে দেব?"

"কেমন করে?"

"কেশবের সাইকেল নিয়ে বাসমোড় চলে যাব।"

ভিক্টর মোটেই পেটের চিন্তা করছিল না। অন্য কথা ভাবছিল। মহাদেবরা ফিরে যাবার লোক নয়। তারা আবার আসবে। তবে বিট্‌বাংলোয় নয়। ওই মহুয়া জঙ্গলের কাছে বা পাশাপাশি কোথাও। ঘুরে বেড়াবে। কেন বেড়াবে—সেটাও বোঝা যায়। গানাসাহেবের হাতে আঁকা ম্যাপ ওদের কাছে। ম্যাপে দেখানো জায়গাটা ওরা তন্নতন্ন করে খুঁজবে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। উদ্দেশ্যটাও বোঝা যায়। ওরা ঠিক জায়গায় যদি হাতড়াতে পারে—তা হলে নিশ্চয় মহামূল্য কিছু পাবে।

কিন্তু, ভিক্টর বুঝতে পারছিল না, এই মহাদেবরা ক-দিন আগেই এখানে এসেছিল। ম্যাপটাও তাদের সঙ্গে ছিল। তারা ছবি তোলার নাম করে বিশেষ বিশেষ জায়গায়

ঘোরাফেরা খোঁজাখুঁজি করেছে কোনও কিছু প্রাপ্তির আশায়। তখন যদি তারা ব্যর্থ হয়ে থাকে তা হলে কেমন করে ভাবছে এবার সফল হবে?

মহাদেবরা কি তা হলে প্রথম বার বেজায়গায় ঘোরাফেরা করেছিল? বিফল হয়ে ফিরে গিয়ে আবার এসেছে সঠিক জায়গার সন্ধান নিয়ে? তা যদি হয়, তবে বলতে হবে, এমন কেউ আড়ালে আছে যে মহাদেবদের সঠিক জায়গার হদিস দিতে পেরেছে। সে কে? আর কেনই বা গানাসাহেবের ম্যাপ দেখে মহাদেবরা সঠিক জায়গাটা বুঝল না?

পেনসিলে আঁকা খসড়া ম্যাপ দেখে এই বনজঙ্গলে জায়গা খুঁজে বার করা কঠিন। জঙ্গল বড় তাড়াতাড়ি পালটে যায়। গাছপালা বাড়ে, লতাপাতা ছড়ায়, ঝোপঝাড় মাটি পথ ঢেকে দেয়। গানাসাহেবের দেখানো জায়গা এত বছর পরে ঠাওর করা কঠিন, খুবই কঠিন।

ভিক্টরের ধারণা, মহাদেবরা ভুল শুধরে নতুন করে জায়গাটা খুঁজতে এসেছে। এই ভুল শুধরে দেবার মতন কেউ কি রয়েছে আড়ালে?

না হয় মহাদেবরা নির্দিষ্ট জায়গা খুঁজে পেয়েও কোনও কারণে কাজে হাত দিতে পারেনি। এবার এসেছে পুরোপুরি তৈরি হয়ে।

ভিক্টর অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর শাসমলকে বলল, "কাল থেকে আমাদের অষ্টপ্রহর সংকীর্তন। মহাদেবরা যে-কোনওভাবে যে-কোনও পথ দিয়ে জঙ্গলে আসবে। ওরা কোথায় আসছে, কী করছে—নজর রাখতে হবে আমাদের। হয়তো মুখোমুখিও হতে হবে ওদের। আপনি কোনও অস্ত্রটস্ত্র এনেছেন?"

শাসমল মাথা চুলকে বললেন, "ওই ড্যাগার। যা আমি ছুড়তে জানি। কিন্তু প্র্যাকটিস নেই। ভুল জায়গায় গেঁথে যেতে পারে।"

নোটন বলল, "দাদা, আমাদের সব রেডি আছে।" বলে হাসল।

চোরের ওপর বাটপাড়ি

পরের দিন ভিক্টররা নজরদারি করেও মহাদেবদের কোনও হদিস পেল না। জঙ্গলের সর্বত্র সমান হয় না। কোথাও গাছপালা ঘন। এত ঘন যে, দশ হাত দূরেও কী আছে দেখা বা বোঝা যায় না। আবার কোথাও কোথাও গাছের ঘনত্ব নেই। অল্প গাছ, ঝোপঝাড় বেশি, চারপাশে তাকালে অনেক কিছুই নজরে পড়ে। কোথাও বা নিতান্তই কাঁটাগাছ আর নুড়ি পাথর ছাড়া অন্য দৃশ্য চোখেই পড়ে না।

ভিক্টররা তৈরি হয়েই নজরদারিতে বেরিয়েছিল।

শাসমল বললেন, "আর একটা দূরবিন আনতে পারলে ভাল হত। তখন কি ছাই জানতাম এখানে এসে নজরদারি করতে হবে।"

ভিক্টর হেসে বলল, "আপনি কি ভেবেছিলেন জঙ্গলে আমরা হারমোনিয়াম বাজাতে আসছি? ঢাল তলোয়ার ছাড়া যুদ্ধ হয়?"

শাসমল বললেন, "আপনার ঢাল বলতে ওই দূরবিন; আর তলোয়ার বলতে ওই পিকিউলিয়ার ব্যাটন।"

ভিক্টর তামাশা করে বলল, "এই যথেষ্ট। পিস্তল আমি ব্যবহার করি না, যদিও তাতে আমার হাত একেবারে মন্দ নয়।" বলে নোটনকে দেখাল। বলল, "নোটনের কাছে আছে ওর 'চিতি'। দেখতে পাতলা ফিনফিনে ছুরি—কিন্তু চিতিসাপের চেয়ে ভয়ংকর।"

নোটন বলল, "আমার হাতিয়া।" বলে কোমরে গোঁজা হাত-খানেকের গোল লাঠিটা দেখাল। লোহার রিং লাগানো লাঠিটায়। ওটা যেন একটা রুলের মতনই দেখতে।

শাসমল বললেন, "ধরুন ওদের সঙ্গে রিভলভার আছে।"

"থাকতে পারে।"

"তখন?"

"তখনকার কথা তখন। আপনি আমাদের অবজ্ঞা করবেন না শাসমলসাহেব। আমরা রিভলভারে ডরাই না।"

"বেশ করেন। এদিকে তো দুপুর গেল। এরপর?"

"বিকেল পর্যন্ত দেখব। তারপর ফিরে যাব।"

"রাত্তিরে?" শাসমল ঠাট্টা করে বললেন।

"রাত্তিরে আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন। মহাদেবরা অতটা সাহস করবে বলে মনে হয় না।" বলে ভিক্টর একটু চুপ করে থেকে বলল, "অন্ধকারে ছুঁচ খোঁজার চেয়েও ঘুটঘুটে অন্ধকারে জঙ্গলে কিছু খোঁজা বড় কঠিন। মহাদেবরা এখানে বাঘ শিকার করতে আসেনি, এসেছে মহামূল্য কিছু খুঁজতে!"

শাসমল আর কিছু বললেন না।

সারাটা দিন জঙ্গলে ঘুরে ফিরে এল ভিক্টররা বিট্‌বাংলোয়। তখন বিকেল ফুরিয়ে আসছে। তিনজনেই ক্লান্ত, শ্রান্ত।

সন্ধেবেলায় বৃষ্টি নামল।

শহর কলকাতায় বৃষ্টি দেখার আগ্রহ ভিক্টরের বড় একটা হত না। কিন্তু এই পাহাড়তলিতে, নির্জনে, অন্ধকারে বৃষ্টি দেখতে দেখতে ভিক্টর কেমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। হয়তো কিছু ভাবছিল। কখন যে একসময় তার ঘুম এসে গিয়েছে সে জানে না, যখন ঘুম ভাঙল তখন রাত হয়েছে, লছুয়া খাবার দিয়েছে টেবিলে।

খেতে বসে ভিক্টর বলল, "কাল থেকে কি খাওয়া বন্ধ শাসমলসাহেব?"

লছুয়া সামনেই ছিল। বলল, "কাল হো যাবে।"

নোটন বলল, "তো হো যাক। পরশু কুছ ব্যবস্থা হো যাবে।" বলে হেসে উঠল।

পরের দিন সকালে বেরোতে বেরোতে প্রায় ন'টা বাজল।

সারাদিনের মতন তৈরি হয়ে বেরিয়েছে তারা। দুপুরের খাবার বলতে হাত-রুটি আর আলু পিঁয়াজের তরকারি, কুমড়ো ভাজা। বড় বড় দুটো জলের পাত্র কাঁধে

ঝোলানো।

রোদ প্রখর নয়। আকাশ মেঘলা। বাদলার ভাব রয়েছে চারদিকে।

ভিক্টরের কেমন মনে হচ্ছিল, আজ মহাদেবদের দর্শন পাওয়া যাবে। মনে হচ্ছিল, কারণ মহাদেবরা বুঝতে পেরেছে শাসমলরা অযথা এখানে আসেননি। সময় নষ্ট করা মানে শাসমলদের সুযোগ করে দেওয়া। মহাদেবরা নিশ্চয় তা দেবে না।

দুপুর পর্যন্ত কিছুই ঘটল না। একটা টিলার আড়ালে গাছপালার ছায়ায় বসে যখন রুটি আর আলু পিঁয়াজের অদ্ভুত টনিক খেয়ে তিনজনেই জল খাচ্ছে, হঠাৎ শাসমলেরই যেন নজরে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শাসমল দূরবিন তুলে নিতে নিতে বললেন, "ওরা কারা?"

ভিক্টরও নোটনের দিকে জলের পাত্রটা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তাকাল দূরে।

শাসমল বললেন, "ভিক্টরসাহেব, ওরা এসেছে। মহাদেবরা।"

ভিক্টর হাত বাড়াল। "দূরবিনটা দিন।"

শাসমল দূরবিন দিলেন।

ভিক্টর দূরবিন চোখে দিল। এটা সস্তা দূরবিন নয়। মিলিটারি দূরবিন। সাত-আট বছর আগে ভিক্টর কিনেছিল ডিস্‌পোজাল থেকে। সামান্য গোলমাল ছিল। সারিয়ে নিয়েছে।

ভিক্টর অনেকটা সময় নিয়ে দেখল। তারপর বলল, "শাসমলসাহেব, জায়গাটা তো মনে হচ্ছে সেই জায়গা, যেখানে আমরা কবরখানার ক্রস পেয়েছিলাম। মোটামুটি সেই জায়গা।"

শাসমল বললেন, "এখান থেকে কতটা দূর?"

"নাক বরাবর হলে আধ মাইল।"

"ওরা কী করছে দেখতে পাচ্ছেন?"

"গাছের আড়াল পড়ে যাচ্ছে। তবু মনে হচ্ছে ওরা একটা গাঁইতি চালাচ্ছে। পাহাড়ে চড়া গাঁইতির মতন।"

"আপনি দেখতে পাচ্ছেন?"

"মোটামুটি পাচ্ছি।"

"এখন কী করবেন?"

"আমরাও যাব। সাবধানে, আড়ালে আড়ালে।"

"চলুন তা হলে?"

"আগে নোটন যাবে।" বলে দূরবিন নামাল ভিক্টর। বলল, "নোটন যাবে প্রথমে—নাক বরাবর। সিধে। আপনি যাবেন ওইদিক দিয়ে। ডান হাতি হয়ে। আমি যাব বাঁ দিক দিয়ে।" ভিক্টর হাত নেড়ে ইশারায় বুঝিয়ে দিল—কে কোন দিক দিয়ে যাবে।

শাসমল আর নোটন দাঁড়িয়ে পড়েছে ততক্ষণে।

নোটন বলল, "সোজা গেলে দেখতে পাবে যে!" বলে দূরবিনটা একবার চাইল।

দেখল খানিকক্ষণ। বলল, "আমি একটু বাঁ দিক ঘেঁসে যাই। গাছপালা রয়েছে। তা ছাড়া ঝোপঝাড়ও পাব।"

ভিক্টর বলল, "তাই যাস। সাবধানে।" বলে শাসমলকে বোঝাতে লাগল, "তিন দিক দিয়ে ঘিরে ফেলা আর কী! অন্য যে পথটা খোলা রইল, সেটা সোজা। যদি ওরা সেই পথে পালায় আমরা দেখতে পাব।"

শাসমল বললেন, "চলুন তা হলে!"

ভিক্টর বলল, "খুব ব্যস্ত হবেন না। ওরা বিকেল পর্যন্ত থাকবে। তার আগে নড়বে বলে মনে হয় না। আমরা ধীরেসুস্থে সাবধানে যাব।"

হাতের ঘড়িটা দেখল ভিক্টর। তিনটে বাজে। দিনটা মেঘলা বলে চট করে সময় ঠাওর করা যায় না। সাড়ে চার কি পাঁচটা পর্যন্ত আলো যা থাকবে তাতে মহাদেবের নজরে রাখার অসুবিধে হবে না।

ভিক্টররা যেখানে আছে সেখান থেকে মহাদেবের কাছে যেতে বেশি সময় লাগার কথা নয়। কিন্তু পাহাড়ি পথ, চড়াই-উতরাই, কোথাও কোথাও ঘুরপথে যেতে হয়, ফলে সময় খানিকটা বেশি লাগারই কথা।

ভিক্টর বলল, "নিন, ধীরেসুস্থে এগোন। সাবধানে যাবেন। যতটা কাছাকাছি পারেন এগিয়ে যাবেন, গিয়ে আড়াল থেকে ওয়াচ করবেন মহাদেবরা কী করছে। ধরা দেবেন না।"

নোটন বলল, "দাদা, আমি বলছিলাম যে আমরা কাছাকাছি হলে যদি শিস দিয়ে জানান দিই হাজির আছি, তা হলে?"

শাসমল বললেন, "ওরা কালা নাকি? শিস শুনতে পাবে না?"

নোটন বলল, "পাখির ডাকের মতন শিস। জঙ্গলে কত পাখি ডাকছে। কেমন করে বুঝবে?"

শাসমল বললেন, "আমি শিস দিতে জানি না।"

নোটন হেসে ফেলল, "ঠিক আছে। টারজানের ডাক ডাকবেন।"

ভিক্টর বলল, "চলুন। আপনাকে শিস দিতে হবে না।"

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে দাঁড়াল তিনজনে। নোটনই এগিয়ে গেল প্রথমে। শিশুগাছের তলা দিয়ে নুড়িপথে নেমে গেল।

শাসমল পা বাড়ালেন। বললেন, "ভিক্টরসাহেব, মহাদেব খুব রাফ। সামলাতে পারবেন?"

"দেখা যাক।"

শাসমলও নিজের রাস্তা ধরলেন।

ভিক্টর মুহূর্তকয় দাঁড়িয়ে থাকল। দূরবিন চোখে লাগিয়ে আবার কিছুক্ষণ দেখে নিল। মহাদেবদের দেখা যাচ্ছে না। গাছগাছালির আড়ালে চলে গিয়েছে।

সিগারেট ফুরিয়ে যাওয়ায় ভিক্টর নিজেই পাকানো সিগারেট তৈরি করে খাচ্ছিল। বুদ্ধি করে একটা তামাকপাতার প্যাকেট আর কাগজ না আনলে বিপদে পড়তে হত। তামাকপাতা রগড়াতে রগড়াতে একবার আকাশটা দেখল সে। ঘোলাটে মেঘলা।

পুবের দিকে খানিকটা মেঘ কালো হয়ে এসেছে।

সিগারেট পাকিয়ে সেটা ধরিয়ে নিল ভিক্টর। পা বাড়াল।

খানিকটা রাস্তা পার হয়ে এসে ভিক্টর এদিক ওদিক তাকাল। নোটনকে আর দেখা যাচ্ছে না। সে ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে সামনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। শাসমলও অদৃশ্য হয়ে পড়েছেন।

সামনেই সেগুন গাছ। তারপরই বনতুলসীর মতন দেখতে এক ধরনের গাছের ঝোপঝাড়। পাখি উড়ে গেল। হলুদ-লাল বুনো ফুল। তারই সঙ্গে গা মিলিয়ে কলকে ফুলের ঝোপ।

ভিক্টরের মনে হচ্ছিল, আজকের দিনটা বোধহয় বৃথা যাবে না। যাওয়া উচিত নয়। এটা বড় আশ্চর্যের কথা, মহাদেবরা গানাসাহেবের ম্যাপ নিয়ে আজ যেখানে এসে হাজির হয়েছে, মাত্র পরশু ঘটনাচক্রে ভিক্টর ওই একই জায়গা থেকে একটা কাঠের ক্রস কুড়িয়ে পেয়েছে। না, কুড়িয়ে পাওয়া বলা যায় না। বলা উচিত কবরখানার মাটি থেকে ভেঙে তুলে নিয়েছে।

ভিক্টরের খেয়াল হল, ক্রসটা চোখে পড়ার পর তো ওই জায়গার ঝোপ খানিকটা পরিষ্কার করেছিল। ছুরিতে কাটা ডালপালা পাতা এখনও ছড়িয়ে আছে জায়গাটায়। মহাদেবরা ওই জায়গাটায় পা দিলেই বুঝতে পারবে, আগে কেউ এখানে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সন্দেহ হবে। আর সন্দেহটা শাসমল-পার্টির ওপরেই। তারপর...?

তারপর কী হয়েছে বা হতে পারে ভিক্টর জানে না। দেখা যাক কী হয়!

খানিকটা সময় নিয়ে ভিক্টর প্রায় জায়গাটার কাছে পৌঁছে গেল। চোখে দূরবিন লাগাল। দেখতে পেল না কাউকে। কোথায় গেল মহাদেবরা? ওরা কি আরও ভেতরে ঢুকে গিয়েছে!

বাবলাগাছের মতন দেখতে কাঁটার ঝোপের আড়ালে আড়ালে গজ চল্লিশ-পঞ্চাশ এগিয়ে আসার সময় ঘাড় ঘোরাতেই দূরে শাসমলকে দেখতে পেল ভিক্টর। শাসমলও তা হলে পৌঁছে গেলেন!

আরও সামান্য এগিয়ে ভিক্টর গাছের আড়াল পেল। জামগাছ, বট। হামাগুড়ি দিয়ে গাছের কাছে এসে সামনে তাকাল ভিক্টর। তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল।

মহাদেবরা কেউ নেই। তাদের কিছু জিনিস পড়ে আছে। খুচরোখাচরা জিনিস। যেমন, মাথার টুপি, একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, এঁটো পাতা। খাওয়া দাওয়া সেরে ফেলে দিয়েছে পাতাগুলো। রবারের ম্যাটও পড়ে আছে এক টুকরো।

মহাদেবরা যে এখান থেকে চলে যায়নি সেটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ওরা আছে কোথায়?

এমন সময় পাখির শিস শুনতে পেল ভিক্টর। হালকা সরু শিস শুনে সত্যিই পাখির ডাক বলে মনে হয়।

ভিক্টর তাকাল।

ঝোপের পাশে নোটনের মুখ। উবু হয়ে বসে আছে। মাথার ওপর আরও ঘোলাটে হয়ে এল। গাছপালার ছায়ার জন্যে হতে পারে কিংবা মেঘ জমেছে আকাশে।

নোটন ইশারায় ব্যাগটা দেখাল।

মাথা নাড়ল ভিক্টর, দেখেছে।

নোটন ইশারা করে বলল, "টেনে নেব?"

ভিক্টর না বলল প্রথমে, তারপর কী মনে করে ইশারা করেই জানাল—টেনে নিতে।

নোটন গিরগিটির মতন বুকে হেঁটে এপাশ-ওপাশ দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল। গিয়ে ব্যাগটা উঠিয়ে নিল। নিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

ভিক্টর বুঝতে পারছিল না, কী করবে? অপেক্ষা করবে আড়ালে? না, এগিয়ে যাবে?

নোটন ইশারায় জানাল কাছাকাছি কেউ নেই, দেখতে পায়নি সে।

ভিক্টর আড়াল থেকে সাবধানে বেরিয়ে দু-চার পা এগিয়ে গেল।

মহাদেবরা কাছে নেই। তারা বুনো ঝোপঝাড় দিয়ে পায়ে হাঁটার মতন পথ করে সামনে এগিয়ে গিয়েছে। ভাঙা ডালপালা, ছেঁড়া পাতা চোখে পড়ল ভিক্টরের। তবে বেশিদূর এগোয়নি। বড়জোর গজ-ত্রিশ। তারপর?

তারপর কী দেখার জন্যে ভিক্টরের ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল। খুব সাবধানে পা পা করে এগিয়ে এসে ভিক্টর দেখল, ঝোপঝাড়ের মধ্যে দুটো পাথর। পাহাড়ি পাথর। ফিটতিনেক উঁচু। কিন্তু গোল ধরনের। পাথরের মধ্যে খাঁজ যেমন হয়। কিন্তু এই খাঁজের জন্যে পাথরের চেহারাটা একটা আকার পেয়েছে। পাহাড়ি পাথরের যেখানে ছড়াছড়ি সেখানে ঘোড়ার মতন দেখতে, কী হাতির মতন দেখতে, কখনও কখনও রাক্ষসের মতন দেখতে—পাথর দেখতে পাওয়া নতুন কিছু নয়। এরকম হয়। এক একটা আবার প্রায় চলে আসে নিজের থেকেই।

ভিক্টর দেখল, পাথর দুটো এমন করে পড়ে আছে, যেন ও দুটো কোনও কিছু পাহারা দিচ্ছে।

দুই পাথরের মাঝখান দিয়ে গলে যাবার পর যা চোখে পড়ে সেটা যেন কোনও গুহাগর্ত। মুখটা লতায়পাতায় ঝোপেঝাড়ে অদৃশ্য ছিল। মহাদেবরা যতটা দরকার সাফসুফ করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

ভিক্টর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখল। গুহার কাছে গিয়ে কান পাততেও হল না। শব্দ পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে যেন গাঁইতি মারার শব্দ। পাথরে লাগছে, লেগে আওয়াজ উঠছে। গলার স্বরও পাওয়া যাচ্ছিল। মহাদেবরা কথা বলছে। গুহাটা নিশ্চয় বড় নয়, দীর্ঘও নয়, নয়তো এভাবে স্পষ্ট শব্দ পাওয়া যেত না। মহাদেবরা বেশি দূরে যেতে পারেনি।

আর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয় এখানে। মহাদেবরা যে কোনও সময়ে চলে আসতে পারে।

ভিক্টর ফিরে এল।

আগের জায়গায় ফিরে আসতেই শাসমলকে দেখতে পাওয়া গেল। শাসমল একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। গাছটা দেখতে অদ্ভুত। একেবারে সোজা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তার ডালগুলো দু পাশ থেকে জ্যামিতিক নিয়ম ও নকশা মেনে দু দিকে ছড়ানো। বড় বড় গোল পাতা। দেখলে মনে হয়, শতমুখী প্রদীপের নকশা যেন।

ভিক্টর শাসমলের কাছে চলে গেল।

শাসমল মৃদু স্বরে বললেন, "ওদের বাইক নীচে দাঁড় করানো আছে। কোথায় ওরা?"

ভিক্টর ইশারা করে বলল, "গুহায় ঢুকেছে।"

"গুহা?"

"সামনে এগিয়ে গেলে দেখতে পাবেন। তবে এগিয়ে যাবার দরকার নেই। ওরা এসে পড়তে পারে।"

"গুহার মধ্যে কী খুঁজছে?"

ভিক্টর হাসল। "চলুন, আমরা অন্য পাশে গিয়ে দাঁড়াই। ওরা যাই খুঁজুক, এখান থেকে নিয়ে যাবার সময় দেখা যাবে।"

ভিক্টর ইশারায় নোটনকে সরে আসতে বলছিল। তার আগেই নোটন হাত তুলে কী যেন দেখাল। কাগজের মতন।

সরে আসতে বলল ভিক্টর।

তিনজনে শেষ পর্যন্ত তফাতে গিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে মহাদেবদের দেখা যাবে।

নোটন বলল, "দাদা, কাগজ!"

ভিক্টর কাগজগুলো নিল। নিয়েই যেন চমকে গেল। বিশ্বাস করতে পারছিল না।

"শাসমল সাহেব, দেখুন তো! ডায়েরির পাতা কি না?"

শাসমল দেখলেন। তিনিও অবাক। বললেন, "হ্যাঁ, ছেঁড়া পাতাগুলো।"

ভিক্টর যেন ক-পলকে পাঁচ-ছ'টা পাতা উলটে গেল। "এই সেই ম্যাপ।"

শাসমল দেখলেন। মাথা নাড়লেন। "হ্যাঁ, ম্যাপ।"

ভিক্টর বলল, "এবার আমরা ফিরে যেতেও পারি।"

"ফিরে যাব?"

"খানিকক্ষণ দাঁড়াতেও পারেন। মহাদেবদের দেখার জন্যে।"

"মানে?"

"মানে, যদি দেখতে চান মহাদেবরা গুহা থেকে কোনও নীল বামন ধরে আনছে, তা হলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। তবে আমার মনে হয় না, ওরা কোনও বামন ধরে আনতে পারবে?"

"তা হলে?"

"আমার মনে হয়, ওরা নিজেরাই আমাদের কাছে যাবে।"

"আমাদের কাছে?"

ভিক্টর ডায়েরির পাতাগুলো দেখাল। হেসে বলল, "এগুলোর জন্যে। ওরা গুহা-অভিযান করার সময় ব্যাগের মধ্যে কাগজগুলো রেখে গিয়েছিল। স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, চোরের ওপর বাটপাড়ি করার মতন বাটপাড় এখানে আসতে পারে। বেচারিরা বড় ভুল করেছিল। এখন এই কাগজগুলোর জন্যে বিট্‌বাংলোয় না ছুটে উপায় কী!"

শাসমল বললেন, "যদি আসল জিনিস পেয়ে যায়, কাগজগুলোর কী দাম?"

"আসল জিনিসটা কী?"

"জানি না।"

"তা হলে শুনুন। যে জিনিসই ওরা পাক আজ আর নিয়ে যাবার সাহস করবে না। ব্যাগ চুরি থেকেই বুঝতে পারবে ওদের ওপর চোখ রাখার জন্যে শাসমল অ্যান্ড কোম্পানি দাঁড়িয়ে আছে। হয় ওরা আসল জিনিস কোথাও লুকিয়ে রেখে যাবে, না হয় আপাতত অন্য কোনও মতলব ভাববে।"

শাসমল কিছু বললেন না।

ভিক্টর বলল, "আরও একটা কথা আছে শাসমলসাহেব। আমার তো মনে হচ্ছে, আপনারা আগাগোড়া ভুল করেছেন। ডায়েরির মধ্যে কতকগুলো কোড ওয়ার্ড আছে। সাঙ্কেতিক শব্দ। এগুলোর মানে না বুঝে মাথা খারাপ করার কোনও অর্থ নেই। চলুন, মানেটা আগে বোঝবার চেষ্টা করি।"

শাসমল বোকার মতন তাকিয়ে থাকলেন।

সোনার পেটি

সন্ধের মুখে আবার বৃষ্টি নামল। কালও নেমেছিল।

ভিক্টর কোনওরকমে স্নান সেরে ডায়েরির ছেঁড়া পাতাগুলো নিয়ে বসে পড়েছিল। লণ্ঠনের আলোয় আলো কম, কালি বেশি। চোখ টনটন করছিল। ঘণ্টা-দেড়েক কেটে গেল। শাসমল বারান্দায় বসে বসে বৃষ্টি দেখছেন। নোটন গিয়েছে লছুয়ার সঙ্গে তামাশা করতে।

হঠাৎ ভিক্টর চেঁচিয়ে উঠল, "শাসমলসাহেব, শিগগির!"

শাসমল বললেন, "হল কী?"

"আসুন। রহস্য উদ্ধার হয়েছে।"

শাসমল ঘরে এলেন।

ভিক্টর বলল, "কাগজ-কলম নিন। এই যে সামনে পড়ে আছে।"

শাসমল কাগজ-কলম উঠিয়ে নিলেন।

ভিক্টর বলল, "ভাষাটা টেলিগ্রামের মতন। যেটুকু না দিলে নয়। আর শব্দগুলো কোড্ করে বসানো। নিন, আমি বলছি। আচ্ছা তার আগে এই দেখুন এখানে একটা চিহ্ন দেওয়া আছে। বিস্ময় চিহ্ন। মানে কোড্‌টা লম্বালম্বি সাজানো আছে। পাশাপাশি নয়। প্রথম শব্দটা দেখছেন? অ্যাবাভ—ABOVE। অ্যাবাভের A নিন। লিখুন।

তারপর নীচে দেখুন। শব্দটা হল দেম—THEM। দেম থেকে M নিন। লাস্ট ওয়ার্ড। লক্ষ করে দেখুন, কোনও শব্দই চার-পাঁচের বেশি অক্ষর দিয়ে নয়। একমাত্র শেষ শব্দটা ছ' অক্ষরের। যাকগে, আপনি পেলেন A আর M। প্রথম দুটো শব্দের হিসেব হবে ফার্স্ট ওয়ার্ড আর লাস্ট ওয়ার্ড নিয়ে। পরের দুটো শব্দের হিসেব ধরতে হবে দু নম্বর ওয়ার্ড আর পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে। দেখুন এখানে আছে FINE, ফাইন-এর দু নম্বর ওয়ার্ড নিন; আর পরের শব্দের লাস্ট ওয়ার্ড 'L'-এল। শব্দটা ছিল DRILL। তা হলে কোডের হিসেব দাঁড়াচ্ছে, ওয়ান অ্যান্ড ফোর, টু অ্যান্ড ফাইভ। তারপরই সেটা পালটে গিয়ে দাঁড়াবে ফোর ওয়ান, ফোর টু। আবার সেই ওয়ান ফোর, টু ফাইভ।"

শাসমল বললেন, "অঙ্ক জেনে আমার দরকার নেই। মানেটা বলুন?"

ভিক্টর বলল, "মানেটা ধরতে পারবেন। আগে লিখে যান।"

ভিক্টর কোড উদ্ধার করে বলতে লাগল আর শাসমল লিখতে লাগলেন। A MILITARY PLANE...CARRYING TWO...TWO BOXES OF GOLD...

কোড্-এর ধাঁধাটার অর্থ উদ্ধার করে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল তা হল এই: যুদ্ধের সময় একটা মিলিটারি প্লেন দুপেটি সোনা নিয়ে সিঙ্গাপুরের দিকে যাচ্ছিল। যেতে গিয়ে আগুন লেগে এখানে ভেঙে পড়ে। সোনার পেটি আর উদ্ধার করা যায়নি। এখনও এই সোনা কোথাও না কোথাও পড়ে আছে।

শাসমল কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই নোটন ফিরে এল।

শাসমল বললেন, "সোনার পেটি?"

"মিলিটারি পেটি মশাই।"

"প্লেন ভেঙে পড়ে গিয়েই ক্যাম্পে আগুন লেগেছিল তা হলে?"

"তা ছাড়া আর কী!"

"সিঙ্গাপুরে সোনা যাবে কেন?"

"তা বলতে পারব না। তবে সিঙ্গাপুর নিশ্চয় তখন ব্রিটিশদের হাতছাড়া হয়নি। পরে জাপানিরা..."

"গানাসাহেব এসব জানলেন কোথা থেকে?"

"সাহেবই বলতে পারতেন। শুনেছিলেন কোথাও থেকে। কিংবা সাহেব সিক্রেট সার্ভিস করতেন।"

"আর ওই বামন? মানে ডোয়ার্ফ?"

ভিক্টর বলল, " ওটা ডোয়ার্ফ নয়। আপনারা আগাগোড়া ভুল করেছেন। আমার মনে হয়, যে দুটো পাথর বসানো আছে গুহার সামনে সেই দুটোকে উনি বুঝিয়েছেন। ওঁর ধারণা হয়েছিল, কিংবা কিংবদন্তিও হতে পারে, ওই পাথর দুটো যক্ষের ধন পাহারা দেবার মতন করে যেন বসে আছে।"

শাসমল বললেন, "উনি লিখেছিলেন নীল রং। পাথরের রং নীল হয়?"

"না। কালো হয়। কিন্তু ডায়েরিতে তো নীল লেখা নেই। লেখা আছে নীলচে। অনেক সময় বৃষ্টি বাদলার পর, গাছপালার মধ্যে দিয়ে আসা রোদের জন্যে রঙের ভুলচুক হয়। তা ছাড়া গানাসাহেব রংকানা হতে পারেন। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ

নেই।”

“কী নিয়ে তবে মাথা ঘামাব?”

“সোনার পেটি।”

শাসমল বললেন, “মহাদেবরা কি গুহার মধ্যে সেটা পেয়েছে?”

“সম্ভাবনা কম,” বলে ভিক্টর একটা সিগারেট পাকাতে লাগল। সিগারেট পাকানো হয়ে গেলে ধরিয়ে নিল, ধোঁয়া টানল, বলল তারপর, “প্লেন ভেঙে আগুন লেগে তখন যা অবস্থা কেউ আর পেটির দিকে নজর দেয়নি। জানবেই বা কেমন করে পেটিতে কী আছে। ওটা তো কন্‌ফিডেনসিয়াল। সেটা কোথায় কী অবস্থায় ছিটকে পড়েছে কেউ জানে না। মাটি পাথর গাছপালায় ওই দুটো পেটি এখন কোন পাতালে তলিয়ে আছে বলা অসম্ভব। আমার মনে হয়, অনেক বছর পরে কার্লোর যে দলটি এসেছিল—তারা সোনার সন্ধানেই এসেছিল। হয়তো তাদের কাছে ডিটেকটার ধরনের কোনও যন্ত্র ছিল। শুনেছি আজকাল এসব যন্ত্র খুব কাজের। তা কার্লো তো মারাই গেল।”

নোটন বলল, “রাত হচ্ছে, দাদা।”

“হ্যাঁ। কাগজপত্র তুলে ফ্যাল। এই পাতাগুলো আমার আর তেমন দরকার নেই। ওদের আছে—মহাদেবদের। সাবধানে রাখিস।”

নোটন কাগজপত্র পরিষ্কার করতে লাগল।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে শুতে শুতে প্রায় দশটা বাজল। এখন আর বৃষ্টি নেই। হাজার হাজার ঝিঁঝি ডেকে চলেছে।

ভিক্টর ঘুমিয়ে পড়ল।

শাসমল জেগে থাকলেন কিছুক্ষণ।

নোটন বাইরে দরজার কাছে খাটিয়ে পেতে শুয়েছিল। দরজাটা ভেজানো।

কখন যেন আকাশে আচমকা একটু চাঁদও উঠেছিল—সেই চাঁদের আলোয় ছায়ার মতন যে দুটি মূর্তি বিট্‌বাংলোয় এসে দাঁড়াল—তাদের কেউ দেখল না।

নোটন অঘোর ঘুমে।

আচমকা তার দমবন্ধ হয়ে আসায় ঘুম ভেঙে উঠে বসতে যাচ্ছিল। উঠতে পারল না। হাত পা ছুড়ল।

কে যেন তার গলা টিপে ধরে আছে।

চাপা গলায় রুক্ষভাবে কে যেন বলল, “চুপ। কথা বলার চেষ্টা করলে গলার নলি উড়িয়ে দেব।”

নোটন অনুভব করল একটা ধারালো ছোরার আগা তার গলার চামড়া ছুঁয়ে রয়েছে। শব্দ করার সাহস হল না নোটনের।

“দাঁড়াও।” লোকটা উঠে দাঁড়াতে বলল নোটনকে। নোটন উঠে দাঁড়াল।

দুটো লোক। একজনের হাতে ছোরা, অন্যজনের হাতে পিস্তল।

দরজার সামনে থেকে খাটটা সরিয়ে দিয়ে পিস্তলওলা লোকটা দরজা ঠেলল। ভেজানো দরজা খুলে গেল।

ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাইরের পাতলা চাঁদের আলো ঘরের জানলা বরাবরও পৌঁছতে পারেনি।

নোটনের গলায় ছোরা ছোঁয়ানো। নোটনকে নিয়ে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াল একজন। অন্যজন পিস্তল হাতে দু'পা এগিয়ে।

"টর্চটা জ্বালো।"

নোটনের গলার কাছে যে ছোরা ধরে দাঁড়িয়েছিল সে টর্চ জ্বালতে বলল। বাঁ হাতে টর্চ ছিল পিস্তলওলার। টর্চ জ্বালল। জ্বেলে ঘরের মধ্যেটা দেখল। ভিক্টর পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। শাসমল চিত হয়ে শুয়ে। নাক ডাকছেন। বেশি বেশি নাক ডাকছেন যেন।

পিস্তলওলা ঘরের প্রতিটি জিনিসের ওপর আলো ফেলে দেখছিল। হয়তো ব্যাগটা খুঁজছিল।

ভিক্টর পাশ ফিরে শুয়ে। ঘুমের ঘোরে নড়াচড়াও করছে না।

পিস্তলওলা ব্যাগটা দেখতে পেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ যে কী হল—নোটনও বুঝতে পারল না, শুধু একটা শব্দ শুনল, আর দেখল পিস্তলওলার পিস্তল মাটিতে পড়ে গিয়েছে, একটা ছোরা ছিটকে এসে দরজার পাল্লায় লেগে মাটিতে পড়ে গেল।

শাসমল যেন স্প্রিং দেওয়া যন্ত্র। ওই চেহারায় কখন যে ভল্ট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন বোঝাই যায় না। হাতে আরও একটা ছোরা। সার্কাসের ড্যাগার ম্যান।

ভিক্টর উঠে পড়ল। যেন শব্দ শুনেই উঠছে। আসলে তার ঘুম আগেই ভেঙেছিল। সুযোগ খুঁজছিল উঠে পড়ার।

পিস্তলওলার হাতের পিস্তল মাটিতে, টর্চটাও পড়ে গিয়েছে।

ভিক্টর নিজের টর্চ হাতে উঠে পড়ল। "বাতিটা জ্বালতে হয় শাসমলসাহেব!"

"জ্বেলে নিন। আমি টার্গেট করে আছি।" বলে পিস্তলওলাকে দেখাল। একটু নড়লেই শাসমলের ছোরা গিয়ে তার গলায় বা বুকে বিঁধবে।

ভিক্টর লণ্ঠন জ্বালল।

মেটে আলোয় সকলেই সকলকে দেখছিল।

"মহাদেববাবু না?" ভিক্টর বলল, "নোটনের গলার কাছ থেকে ছোরাটা নামিয়ে নিন। না নিলে..." বলে পিস্তলওলাকে দেখাল। অর্থাৎ আপনার বন্ধুটিও রক্ষা পাবে না। এই না চৌধুরী? হাসপাতালের। শরৎবাবুর বর্ণনা যেন মিলে যাচ্ছে।

মহাদেব শাসমলের দিকে তাকাল। সে ভাল করেই জানে সার্কাসের এককালের ড্যাগার থ্রোয়ার ওই লোকটা বিপজ্জনক।

ভিক্টর বলল, "মহাদেববাবু, খুনোখুনি করে লাভ নেই। লড়াইটা আপসে মিলিয়ে ফেলা ভাল।"

মহাদেব একটু ভাবল, তারপর নোটনকে ছেড়ে দিল।

ভিক্টর বলল, "শাসমলসাহেব পিস্তলটা পায়ে করে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিন। ওটা আমরা কেউই ছোঁব না। এখন আমাদের পিস্ কনফারেন্স হবে।"

শাসমল এগিয়ে গিয়ে পায়ে করে পিস্তলটা ঠেলে দিলেন খাটের তলায়।

ভিক্টর বলল, "মহাদেববাবু, আপনারা বসতে পারেন।"

মহাদেব বলল, "ডায়েরির কাগজগুলো আপনারা হাতিয়ে এনেছেন?"

"এনেছি। ব্যাগ সমেত।"

"ওগুলো ফেরত পাব?"

"না।"

"সুনন্দনকে ফেরত দেবেন?"

"হ্যাঁ। আমার সঙ্গে চুক্তি ছিল—ডায়েরিটা খুঁজে দেওয়া। তা ডায়েরিটা আপনারা ফেরত দিয়েছেন। ছেঁড়া পাতাগুলো আমি ফেরত দেব। দিতে পারলে দুটো পয়সা পাব—এই আর কী!"

মহাদেব ভিক্টরকে দেখল। তারপর বলল, "বেশ তাই দেবেন। দিয়ে বলবেন, ধুরন্ধর আর ধূর্ত আমি অনেক দেখেছি, নন্দন—মানে সুনন্দনের মতন আর কাউকে দেখিনি। একদিন ওকে পস্তাতে হবে।"

শাসমল বললেন, "সুনন্দন ধূর্ত! না, তুমি তার বন্ধু হয়ে..."

মহাদেব হাত তুলে বাধা দিল। বলল, "যা জানেন না—তা নিয়ে কথা বলবেন না। নন্দন আপনার মনিব হতে পারে কিন্তু সেরা শয়তান। যাক...ওসব কথা তুলে লাভ নেই। আমরা বোধহয় যেতে পারি?"

ভিক্টর বলল, "আরে, আপনি চটে যাচ্ছেন কেন? কে শয়তান, কে শয়তান নয়, সেকথা যেতে দিন। কী ঘটেছে যদি বলেন ব্যাপারটা বুঝতে পারি। আমি জানি সোনার পেটি আপনারা পাননি।"

"না।"

"কী পেয়েছেন?"

"কিছু হাড়গোড় কঙ্কাল।"

"গুহার মধ্যে?"

"হ্যাঁ।"

"মহাদেববাবু, একটা কথা আমায় বলুন। সোনার কথা আপনি জানলেন কেমন করে?"

মহাদেব বলব কি বলব না করে বলল, "নন্দন একটা ইডিয়েট, বোকা, বুদ্ধু। সে একবর্ণও বোঝেনি সাহেবের ডায়েরির ওই জায়গাটা। আমি দিনের পর দিন মাথা ঘামিয়ে কোড্-এর মানে বার করেছিলাম। কথা ছিল—সোনার পেটি আমরা দু'জনে সমান অংশে ভাগ করে নেব। নন্দন প্রথমে রাজি হয়েছিল, পরে যখন দেখল, ভাগ দেওয়াটা বোকামি হবে তখন সে আমার পেছনে লোক লাগাল। আমাকে হয় খুন করবে না হয় মাস ছয়েকের জন্যে বিছানায় ফেলে রাখবে। এরমধ্যে নিজে কাজ হাসিল করে নেবে।"

"আচ্ছা!...তখন আপনি ডায়েরি চুরি করলেন?"

"করলাম। মুখে সামনাসামনি আমরা বন্ধু হয়ে থাকলাম, ভেতরে ভেতরে যে-যার মতন প্যাঁচ কষতে লাগলাম।"

"চুরি করা ডায়েরি আপনি ফেরত দিতে গেলেন কেন? অবশ্য কাজের

পাতাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে।"

মহাদেব সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "না দিলেও চলত। দিলাম নিজের বাহাদুরি দেখাতে। নন্দনকে বুঝিয়ে দিলাম, ও আমার সঙ্গে টেক্কা মারতে এসে ভুল করেছে। আমি ওরকম পাঁচটা নন্দনকে পকেটে পুরতে পারি।"

শাসমল হঠাৎ বললেন, "হাসপাতালের শরৎবাবু তোমার কেউ হয়?"

"আমার কেউ হয় না। ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমি টাকা ধার করি। লোকটা সুদখোর। মানি লেন্ডার। দোকানের জন্যে অনেক টাকা নিয়েছি।"

ভিক্টর এবার চৌধুরীর দিকে তাকাল। "এটি কে? হাসপাতালের চৌধুরী?"

"হাসপাতালে ও কয়েকদিন ছিল। ও আমার লোক। ওর নাম চৌধুরী নয়, মিশ্র। ও একজন কোড্ এক্সপার্ট।"

"আচ্ছা!...পিস্তল চালাতেও পারে?"

মহাদেব এবার কেমন যেন হাসল। বলল, "পারে। শুটিংয়ে প্রাইজ পেয়েছে। তবে খুনি নয়।" বলে কী মনে করে শাসমলের দিকে তাকাল, "শাসমলদা, খেলাটা ভালই দেখালেন। তা সত্যি বলতে কী পিস্তল চালাবার জন্যে আমরা আসিনি। এসেছিলাম ছেঁড়াপাতাগুলো উদ্ধার করতে। পিস্তলটা আপনারা দেখতে পারেন। ওটা নকল পিস্তল। যাত্রাদলের। ভয় পাওয়ানোর জন্যে সঙ্গে রেখেছিলাম।"

ভিক্টর বলল, "ছেঁড়াপাতাগুলো নিয়ে কী করতেন আপনি?"

"আবার দেখতাম। যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে! শোধরাবার চেষ্টা করতাম। মাটি খুঁড়তে বসতাম আবার।"

মাথা নাড়ল ভিক্টর। বলল, "বৃথা চেষ্টা করতেন। আপনি যে ভুল করেছেন, আমিও সেই একই ভুল করেছি। ভেবেছি ওটা গোল্ড। সোনার পেটি। রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেক ভেবেছি। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার মনে হল, গোল্ড কথাটাও কোড্। ডবল কোড্। ওটাও তো কোড্। গোল্ড মানে এখানে সোনা নয়, গ্রেনেড্। এক ধরনের স্পেশ্যাল গ্রেনেডের তখন কোড নাম ছিল 'গোল্ড'।"

মহাদেব কেমন বোকার মতন তাকিয়ে থাকল।

ভিক্টর বলল, "আচ্ছা মহাদেববাবু, সত্যি করে বলুন, সোনার নেশায় কি সুনন্দনবাবুর অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারে আপনার কোনও...?"

মাথা নাড়ল মহাদেব, "না।"

"আর প্যান্থার সার্কাসের চিঠির ব্যাপারটা?"

"ওরা সার্কাসপার্টি নয়, স্মাগলার পার্টি। ইন্টারন্যাশনাল গোল্ড স্মাগলার।"

"ওরা কেমন করে জানল, সুনন্দনের কাছে সোনার খবর পাওয়া যাবে?"

মহাদেব বলল, "এসব কথা সুনন্দনকে জিজ্ঞেস করবেন। সে আপনার চেয়ে খবর বেশি রাখে।"

"আর নীল বামন?"

"বাদ দিন। ও একরকম সোনার হরিণ।...আপনারা কি আমাদের সকাল পর্যন্ত আটকে রাখবেন?"

"সকাল তো হয়েই এল। খানিকক্ষণ বসে যান।"

ভোর ফুটতেই মহাদেবরা চলে গেল।

শাসমল বললেন, "ওরা তো ফিরে গেল! আমরা?"

"আমরাও ফিরব।...তবে শাসমলসাহেব, আপনাকে একটা পরামর্শ দিই। সুনন্দনকে আপনি এবার ত্যাগ করুন। সুবিধের মানুষ নয় আপনার মনিব। সোনা খোঁজার নেশা ওর যাবে না।"

"আপনি যে বললেন সোনা নেই। গোল্ড মানে এখানে গ্রেনেড্।"

"মিথ্যে কথা বললাম। মহাদেবদের বাঁচালাম অনর্থক কষ্ট থেকে। সোনা হয়তো আছে কোথাও। তা যদি কোনওদিন খুঁজে পাওয়া যায়, সেটা হবে সরকারের সম্পত্তি। আইন সেকথাই বলে।"

নোটন বাইরে চলে গিয়েছিল। বলল, "দাদা, চায়ের ব্যবস্থা দেখি।"

ভিক্টর আর শাসমল বাইরে এল। সবে সকাল হয়ে আসছে। আকাশ এখনও রাঙা ওঠেনি।

গোয়েন্দা-রহস্য কাহিনী

কালবৈশাখীর রাত্রে

কলকাতা শহরে এমন শুকনো গা-জ্বালানো গরম বড় একটা পড়ে না। আজ ক'দিন ধরেই সেই বিশ্রি গরমটা চলেছে। কাগজেপত্রে বলছে, আরও দিন দুই এই দুর্ভোগ আছে।

কাগজে কী বলে আর না বলে। গতকাল তো সকাল থেকেই মনে হচ্ছিল, কলকাতা শহরটাকে একটা বিশাল কড়াইয়ের ওপর বসিয়ে কেউ যেন সেঁকে দিচ্ছে। অসহ্য গরম। রাস্তাঘাট, বাড়ি, ট্রাম-বাস, সব যেন আগুন। তার ওপর, কলকাতায় যা সচরাচর দেখা যায় না, দুপুরের আগে থেকেই লু বইতে শুরু করে দিল। মরে যাবার অবস্থা। অথচ, আজ সকালের কাগজে দেখা গেল, গরম নাকি কাল একটু কম ছিল।

একেবারেই বাজে কথা। নয়তো ছাপার ভুল।

ভিক্টরকে গতকাল একবার ব্যাঙ্কে যেতে হয়েছিল। বেলা বারোটা নাগাদ। অবস্থাটা সে বুঝতে পেরেছিল। আজ আর সে বাইরে যাচ্ছে না। পাগল না কি! দশটা নাগাদ নিজের অফিসে চলে এসেছে, রোদ না পড়া পর্যন্ত আর বেরোবে না।

তার অফিসটা অবশ্য এ-সব দিনের পক্ষে ভাল। ভাল মানে, এমনই ঘর যে, রোদ-বাতাস প্রায় ঢুকতেই পারে না। একটি মাত্র জানলা বাইরের। তাও পশ্চিম দিকে। কাজেই শেষ দুপুর পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। ঘরটা একরকম ঠাণ্ডাই হয়ে থাকে বারো মাস। শীতকালে কনকন করে।

দুপুরের দিকে একটা ছাড়া ছাড়া ঘুম সেরে ভিক্টর তার সর্বকর্মবিশারদ নোটনকে ডাকতে যাচ্ছিল, চা খেতে হবে, এমন সময় তার অফিসঘরের ফোনটা বেজে উঠল। এমনভাবে বাজল যে, মনে হল, ভুল জায়গায় লাইনটা লেগে গিয়েছে।

ভিক্টর হয়তো ফোন তুলত না। কিন্তু বেজে যাচ্ছে দেখে বিরক্ত হয়ে ফোন তুলল।

"হ্যালো?"

ওপাশ থেকে ফোনের নম্বর বলল। মানে জানতে চাইল, ঠিকঠাক নম্বর পেয়েছে কি না।

ভিক্টর বলল, হ্যাঁ, নম্বর ঠিক।

"ভিক্টর ঘোষ আছেন?'

আরে, এ যে ভিক্টরকেই খুঁজছে। ভিক্টর বলল, "কথা বলছি।"

ও পাশ থেকে দু মুহূর্ত কোনও সাড়া নেই। তারপর গলা শোনা গেল। "আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই!"

"আমার সঙ্গে! ...কেন?"

"দেখা হলে বলব। আমার খুব দরকার।"

ভিক্টরের মনে হল, ও-পারে যে কথা বলছে, তার গলায় স্বর মোটা, একটু নাকিস্বর। বয়স্ক বলেই মনে হচ্ছে।

"আপনি কে?"

"দেখা করে বলব। আপনি আমায় চিনবেন না।"

"ও! ...আমার কথা আপনাকে কে বলল? ফোন নম্বর পেলেন কেমন করে?"

"পেয়েছি। জগদীশ আমাকে বলেছে।"

"জগদীশ! ...আচ্ছা! ...কিন্তু সে তো আজ তিন-চার মাস বেপাত্তা। তার কোনও খবরই পাই না।"

"কলকাতায় থাকতে পারছে না। ঘোরাচ্ছে অফিস। এখনও কলকাতায় নেই।"

"ঠিক আছে। আপনি আসুন। কখন আসবেন?"

"সাড়ে চারটে নাগাদ।"

"সাড়ে চার! ...ও কে, আসুন।! আমার অফিস খুঁজে নিতে পারবেন?"

"পারব। রিপন স্ট্রিট।"

"হ্যাঁ। এটা একটা বাজার। অলমোস্ট লাইক এ বাজার। অনেক ঘর, অনেক খোপ। দোতলায় আমার অফিস।"

"আমি খুঁজে নেব।"

ও-পাশের ফোন রাখা হয়ে গেল। ভিক্টর নিজেও ফোন নামিয়ে রাখল।

সামান্যক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ভিক্টর। নোটনকে ডাকল।

"কী রে, চা খাওয়াবি না আজ?"

"বসিয়ে দিয়েছি", নোটন বলল। বলেই একটু মাথা চুলকে নিল। "তোমাকে চা খাইয়েই আমার ছুটি!"

"ছুটি?"

"মাঠে যাব। এরিয়ান্সের সঙ্গে খেলা।" বলে নোটন হাসল।

ভিক্টর বুঝতে পারল। আজ নোটনের টিম মোহনবাগানের সঙ্গে এরিয়ান্সের খেলা। কলকাতার মাঠে লিগ চলছে। মোহনবাগানের খেলা থাকলে নোটনকে রোখা যায় না। হেজিপেজি খেলা হলেও সে যাবে।

ভিক্টর ঠাট্টা করে বলল, "ক'টা লেবু কিনেছিস আজ?"

"দুটো।" হাসল নোটন।

"মাত্র দুটো। ...তা আজ যা গরম, তোর মোহনবাগানের বুড়ো প্লেয়ারগুলো তো মাঠে নেমেই হাই তুলবে, খেলবে কেমন করে?"

নোটন কানে তুলল না কথাটা; বলল, "বুড়োদের ভেলকিতেই এখন পর্যন্ত একটা পয়েন্টও হারাইনি। দ্যাখো না এবার কী হয়।"

আর দাঁড়াল না নোটন, চলে গেল।

এই ঘরটার গায়ে গায়ে একটা করিডর ধরনের লম্বা সরু ঘর আছে। তার পাশেও যে-ঘর, সেটা একসময়ে ভিক্টরদেরই ছিল। এখন সেটা যোগেন হাজরা বলে এক ভদ্রলোককে তারা সাবলেট্ করে দিয়েছে। হাজরামশাই হলেন এক ধরনের ডাক্তার।

জল-চিকিৎসা আর ম্যাগনেট-থেরাপি করেন। পাগলা ধরনের।

করিডর মতন ঘরটা নোটনের। ওখানেই সে বসে, শোয়, গাদা গাদা ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়ে। বাংলা গোয়েন্দা-বইয়ের সে পোকা। ওই ঘরেই স্টোভ, কেটলি, কাপ, চিনি, কফি, চা, এক-আধ প্যাকেট বিস্কিট, সবই রাখা আছে।

নোটনকে দিয়ে ভিক্টরের কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। একেবারে নিজের না হোক, নোটন হল বাড়ির লোক। ভিক্টরদের বাড়িতেই থাকে। জামাইবাবু হঠাৎ মারা যাবার পর দিদি যখন ভিক্টরের কাছে চলে এল, তখন সঙ্গে করে নোটনকে নিয়ে এসেছিল। নোটনের বয়েস তখন বছর আঠারো। আজ পাঁচ-ছ' বছর সে ভিক্টরদের কাছে। বাড়ির লোকই হয়ে গিয়েছে। সত্যি বলতে কী, বাড়িতে নোটনই তাদের ম্যানেজার। দিদি সংসার সামলায়, নোটন করে সাকরেদি। বাড়িতে তারা মাত্র তিন জন, দিদি, ভিক্টর আর নোটন। আর যে আছে, সরমাদি, সে সকালে আসে, সারাদিন থাকে, কাজকর্ম সেরে সন্ধেবেলায় বাড়ি চলে যায়।

দিদিই বলেছিল ভিক্টরকে, 'তুই যখন বেরোস, নোটনকে নিয়ে যাস। তোরও কাজে লাগবে, আর ওর-ও সময় কাটবে। বাড়িতে বসে থাকলে গাধা হয়ে যাবে।' ভিক্টর অরাজি হয়নি। একটা লোক তো থাকা দরকার তার, নয়তো বড় বেমানান হয়।

চা নিয়ে এল নোটন।

ভিক্টর বলল, "তুই তো চললি, এদিকে একজন যে আসবে।"

"কে?"

"নাম বলল না। জগদীশের চেনা।"

"জগদীশদার লোক?"

"তাই মনে হল।"

নোটন একটু চুপ করে থেকে বলল, "দেড়-দু'মাস কোনও লোক আসেনি অফিসে। আসতে দাও।"

কথাটা ঠিক। ভিক্টর আজ মাসখানেকের ওপর কোনও কাজ পায়নি। শেষ কাজ করেছিল বীরবল সাহানি বলে এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের। সাহানিকে কয়েকটা লোক ফোনে শাসাচ্ছিল, চিঠি দিচ্ছিল, ফলো করছিল। ব্যবসা থেকে সাহানিকে হটাবার তাল করেছিল। ভিক্টর ব্যাপারটা হাতে নেয়। মাস-দুইয়ের মধ্যেই সব ঠাণ্ডা।

"তুমি যদি বলো, খেলার মাঠ থেকে আমি সোজা এখানে ফিরে আসব। ক'টার সময় লোক আসবে?"

"সাড়ে চারটে নাগাদ।"

"আমি কি থেকে যাব?"

"না, তুই যা।" বলে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল ভিক্টরের। হেসে বলল, "তুই যদি গোটা-ছয়েক পাতিলেবু কিনতিস নোটন, একটা ভাল ক্লায়েন্ট পেতাম। মাত্র দুটো কিনলি!"

নোটন কিছু বলল না। হাসল।

নোটনের একটা তুক আছে। মোহনবাগানের খেলা থাকলে সে সকালে বাজার থেকে আলাদা করে দু-তিনটে পাতিলেবু কিনে আনবে। এনে ছুঁচ- সুতো দিয়ে লেবু ফুটো করে সেগুলো তার ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে দেবে। লেবু ঝুলোলে নাকি মোহনবাগান হারবে না। অবশ্য তিনটে লেবু বড় একটা ঝোলায় না নোটন, নিতান্ত ইস্টবেঙ্গল আর মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে খেলা পড়লে ভাগ্যটা আরও পোক্ত করে নিতে চায়।

তবে লেবু ঝুলিয়েও নোটন তার মোহনবাগানকে বাঁচাতে পারে না। আগের বছর তার ক্লাব চার-পাঁচটা খেলায় হেরে গেল।

নোটন আর দাঁড়াল না। চলে গেল।

ভিক্টর চা খেতে খেতে একটা সিগারেট ধরাল।

সাড়ে চার নয়, পৌনে পাঁচটা নাগাদ এক ভদ্রলোক এলেন।

ভিক্টর বলল, "আসুন।"

ভদ্রলোককে নজর করে দেখতে দেখতে ভিক্টরের মনে হল, ওঁর বয়েস বছর পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। ভাল চেহারা। শক্তসমর্থ। মাথার চুল অল্পই পেকেছে। চোখ দুটি ঝকঝকে। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি।

ভিক্টর বসতে বলল ভদ্রলোককে।

চেয়ারে বসতে বসতে ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম মাধবচন্দ্র শর্মা। আমরা সেনশর্মা।"

"ও! ...জগদীশ...!"

"জগদীশবাবু আমার চেনা-জানা। আগে উনি আমাদের পাড়ায় থাকতেন। এখন ঢাকুরিয়ায় চলে গেছেন।"

"হ্যাঁ। নতুন বাড়ি করে উঠে গিয়েছে। ওর বাবা খানিকটা জমি কিনে রেখেছিলেন আগেই। বছরখানেক হল বাড়ি শেষ করেছেন।"

সামান্য অপেক্ষা করে মাধবচন্দ্র বললেন, "আমি আপনার কাছে জরুরি একটা কাজে এসেছি। বড় বিপদে পড়ে।"

ভিক্টর কিছু বলল না। বিপদে পড়েই লোকে তাদের মতন মানুষের কাছে আসে। সুখে-শান্তিতে থাকলে কে আর গোয়েন্দা খুঁজে বেড়ায়।

মাধবচন্দ্র যেন কেমন করে কথাটা বলবেন একটু ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, "আপনাকে একটু গুছিয়ে বলি, নয়তো বুঝতে পারবেন না। অবশ্য পরে আপনাকে অনেক কথাই বলতে হবে, যা আপনি জানতে চান।" সামান্য থেমে মাধবচন্দ্র পকেট থেকে একটা কার্ড বার করলেন। ভিক্টরের দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, "আপনি বিশ্বাস অ্যান্ড ব্যানার্জি কনসার্নের নাম শোনেননি। শোনার কথাও নয়। কলকাতা শহরে হাজারে হাজারে ফার্ম আছে; কে কার খোঁজ রাখে।"

ভিক্টর কার্ডটা দেখল। ভাল বুঝতে পারল না।

মাধবচন্দ্র বললেন, "আমরা যে-ধরনের ব্যবসা করি, সে-ধরনের ব্যবসা কম

লোকই করে। আমরা হলাম প্রপারটি ডিলার্স, মানে সম্পত্তি কেনাবেচার ব্যবস্থা করি। বলতে পারেন, আমরা একরকম এজেন্ট। নিজেরাও অনেক সময় সম্পত্তি কিনি, সুবিধে হলে; পরে খদ্দের পেলে বেচে দিই।"

"আপনারা কী ধরনের সম্পত্তি বেচাকেনা করেন?"

"স্থাবর অস্থাবর দুই-ই। তবে স্থাবরই বেশি।"

"বাড়ি, জমিজায়গা..."

"হ্যাঁ। পুরনো বাড়ি, জমি, এসবই বেশি করি। তবে কখনও কখনও আমরা বাড়ির সঙ্গে অন্য জিনিসও কিনি। যেমন ধরুন গাড়ি, পুরনো সেকেলে ফার্নিচার, পাথরের মূর্তি, ঝাড়লণ্ঠন। তবে এগুলো বেশি কিনি না। কেননা আজকাল এসব জিনিসের খদ্দের পাওয়া কঠিন।"

ভিক্টর খানিকটা কৌতূহল বোধ করছিল। সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল মাধবচন্দ্রের দিকে। নোটন থাকলে ভদ্রতা করে চা খাওয়ানো যেত। আপাতত তার উপায় নেই। পাশের অফিসের বেয়ারা নিতাইকে বললে অবশ্য এনে দেবে। আগেও দিয়েছে।

মাধবচন্দ্র সিগারেট নিলেন না। উনি সিগারেট খান না। নস্যি নেন। নস্যির ডিবে বার করলেন।

"আমাদের ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা দু-কথায় বলার নয়।" মাধব বললেন, "পরে আপনি আরও জানতে পারবেন। এখনকার মতন আপনার জেনে রাখা দরকার, আমি আসছি কর্তামায়ের তরফ থেকে।"

"কর্তামা?"

"ব্যানার্জি-বিশ্বাস কোম্পানির নাম থেকেই বুঝছেন, ব্যবসাটা হল পার্টনারশিপের। দু পুরুষের ব্যবসা। হালের কথা ধরলে তিন পুরুষ বলা যায়। আগের পুরুষ কী করেছেন না করেছেন আমি ভাল জানি না। আমি এখানে বছর পঁচিশ রয়েছি। ধরণীবাবুকে আমি দাদা বলতাম। আমরা এক দেশের লোক, একই পাড়ার বাসিন্দে। ধরণীবাবু আমাকে হাতে ধরে ব্যানার্জি-বিশ্বাস কোম্পানিতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি হলেন কোম্পানির পার্টনার। বিশ্বাস। আর ওদিকে ছিলেন যুগলকিশোর ব্যানার্জি। উনি ব্যানার্জির তরফের। যুগলবাবু এখনও আছেন। নেই ধরণীদাদা। উনি বছরপাঁচেক আগে মারা গেছেন। কর্তামা হলেন ধরণীদাদার মা।"

ভিক্টর কেমন গোলমাল করে ফেলছিল। বলল, "দাঁড়ান, ভাল করে ব্যাপারটা বুঝতে দিন। ...ব্যানার্জি অ্যান্ড বিশ্বাস কোম্পানির দুজন অংশীদার। একজন যুগলকিশোর ব্যানার্জি, আর অন্যজন ধরণী বিশ্বাস।"

"ধরণীমোহন বিশ্বাস।"

"ধরণীবাবু বছর পাঁচেক হল মারা গেছেন।"

"হ্যাঁ।"

"তা সমস্যাটা কী?"

মাধবচন্দ্র কথা বলতে বলতে নস্যি নিয়েছেন, নিয়ে নাক পরিষ্কার করেছেন।

বললেন, "সমস্যাটা সামান্য নয়। ধরণীবাবুর ছেলে সুজনকে খুনের আসামি করে ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর চেষ্টা হচ্ছে।"

"খুনের আসামি?" ভিক্টর যেন চমকে উঠল।

"বিশ-বাইশ বছরের একটা ছেলে কেমন করে খুনি হতে পারে আপনি বলুন! গুণ্ডা বদমাশ ডাকাত তো সে নয়।"

"সুজনের বয়েস ঠিক কত?"

মাধব যেন মনে মনে হিসেব করলেন, "ওই একুশ-বাইশ।"

"পড়াশোনা করে?"

"না। গত বছর বি. এস. সি পাশ করেছে। পড়াশোনা আর করেনি। লেখাপড়া ছেড়ে ও একটা ফার্মিং নিয়ে মেতে উঠেছিল।"

"ফার্মিং?" ভিক্টর হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল।

"বড় কিছু নয়, ভিক্টরবাবু! বিঘে আট-দশ জমিতে সবজি, ফল, হাঁস, মুরগি, এসব নিয়ে রয়েছে। একে ঠিক ফার্মিং বলা যায় না। বলতে পারেন, বাগান করেছে। ...ওর ইচ্ছে দু-চার বছরের মধ্যে ওখানে একটা জ্যাম-জেলি-সসের কারখানা করবে!"

"আপনি যে বললেন হাঁস-মুরগিও আছে?"

"হ্যাঁ। তবে সেটা পোলট্রি নয়। বাগানের মধ্যে একটা পুকুর আছে ছোট। হাঁস-মুরগির ঘর করে দিয়েছে। পুকুর ঘেঁষে। হাঁস-মুরগির দল চরে বেড়ায়। ডিম পাড়ে।"

"জায়গাটা কোথায়?"

"খুব একটা দূরে নয়। দমদম এয়ারপোর্টের আগে ডান হাতি। ভি আই পি রোড থেকে দশ কিলোমিটার মতন এগোলে রসুলপুর বলে একটা জায়গা আছে। সেখানেই সুজনের বাগান।"

ভিক্টর সিগারেট ধরাল। "আপনি গিয়েছেন?"

"গিয়েছি। আমায় তো যেতেই হয়।"

"এবার আসল কথাটা বলুন তো? সুজনকে নিয়ে গোলমাল কী হয়েছে?"

মাধব কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, "প্রায় হপ্তা-তিনেক আগে, সুজনের বাগানের বাইরে, শ'খানেক গজের মধ্যে একটা লোক খুন হয়েছে। যে খুন হয়েছে, তাকে আমরা কেউ চিনি না।"

"সুজনও চেনে না?"

"না।"

"তা হলে সুজনের কথা উঠছে কেন?"

"লোকটা যেখানে খুন হয়েছিল, সেখানে একটা ছাতা পাওয়া গিয়েছে, যেটা সুজনের।"

"ছাতা?" ভিক্টর অবাক।

মাধব বললেন, "খুনটা কখন হয়েছিল কে জানে! তবে, সন্ধের পর কোনও সময়ে হবে। কেননা, সন্ধের খানিকটা আগে জোর কালবৈশাখী উঠেছিল। ঝড় থেমে যাবার

পরেও খানিকক্ষণ বৃষ্টি হয়েছে। ঝড়-বৃষ্টির আগে লোকটা খুন হয়নি নিশ্চয়। বৃষ্টি থেমে আসার সময় হতে পারে।"

ভিক্টর অন্যমনস্কভাবে টেবিল থেকে একটা পেনসিল তুলে নিল। মেমো-প্যাডের ওপর দাগ কাটতে কাটতে বলল, "আপনি বলতে চাইছেন, লোকটা বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় হেঁটে যাচ্ছিল, তখন তাকে খুন করা হয়েছে।"

"হ্যাঁ; তাই তো মনে হয়।"

"সুজনের ছাতা লোকটার কাছে গেল কেমন করে?"

"সুজনই দিয়েছিল...!"

"সুজন দিয়েছিল! এই বলছেন, সুজন তাকে চেনে না, আবার বলছেন, সুজন তাকে ছাতা দিয়েছিল!"

মাধব বললেন, "ব্যাপারটা নিশ্চয় অদ্ভুত। কিন্তু পুরো ঘটনাটা এখনও আপনাকে বলা হয়নি। যে-দিনের কথা বলছি সেদিন সন্ধের আগে কালবৈশাখী উঠেছিল। কালবৈশাখী ওঠার আগে একটি লোক এসেছিল সুজনের সঙ্গে দেখা করতে। সুজনের অচেনা। এসেছিল ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তা বলতে। লোকটির বয়েস হয়েছে কিছুটা। সে যখন চলে যাচ্ছে, তখন বৃষ্টি পুরোপুরি থামেনি। সুজনের ছাতাটা সুজন তাকে দিয়ে দেয়। পরের দিন আবার তার আসার কথা। ছাতা ফেরত পাবার অসুবিধে হবে না ভেবেই সুজন তাকে ছাতা দিয়েছিল। সুজনের ছাতা নিয়ে লোকটা বৃষ্টির মধ্যে চলে যায়।" মাধব একটু থামলেন, পরে বললেন, "সুজন যাকে ছাতা দিয়েছিল, আর যে-লোকটি খুন হয়েছে, এরা এক নয়। সুজন বলছে, সে অন্য একজনকে ছাতা দিয়েছিল।"

ভিক্টর বলল, "যে মারা গিয়েছে তাকে দেখেছে সুজন?"

"হ্যাঁ। পরের দিন। যখন ব্যাপারটা অন্যদের নজরে পড়ে, তখন।"

"আশ্চর্য!"

"আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার রয়েছে। ছাতা ছাড়াও একটা টর্চ পাওয়া গিয়েছে। ডেডবডির কাছাকাছি পড়ে ছিল। টর্চটাও সুজনের।"

"সে কী!"

"সুজন বলছে, ছাতা এবং টর্চ সে লোকটিকে দিয়েছিল। ছাতা দিয়েছিল, সামান্য বৃষ্টির মধ্যেই লোকটি চলে যাচ্ছিল বলে। আর টর্চ দিয়েছিল, লোকটির নিজের টর্চ ঠিক মতন জ্বলছিল না বলে। ঝড়-বৃষ্টিতে, অন্ধকারে লোকটি যাবে বলে ওই সাহায্যটুকু সে করেছিল।"

ভিক্টর কাগজের ওপর পেনসিল দিয়ে যেন একটা বাগান আঁকতে লাগল। চুপচাপ। হঠাৎ মুখ তুলল। বলল, "পুলিশ কি সুজনকে ধরেছে?"

"না। ধরেনি, তবে জ্বালাতন করছে। নজরে রেখেছে। যখন-তখন গিয়ে হাজির হচ্ছে বাগানে। জেরা করছে।"

"যে-লোকটি মারা গেছে, মানে যাকে খুন করা হয়েছে, তাকে কে চেনে?"

"আমি বলতে পারব না।"

"শনাক্তকরণ হয়নি?"

"যা শুনেছি, তাকে কেউ আইডেন্টিফাই করতে পারেনি।"

"ও! ...তা হলে তো দেখছি ব্যাপারটা বেশ জটিল।"

মাধব বড় করে নিশ্বাস ফেললেন। "আমাদের মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়। কর্তামা শক্ত মানুষ। কিন্তু তিনিও ভেঙে পড়েছেন। ওই একটি নাতিই তাঁর সম্বল।"

ভিক্টর যেন কিছু ভাবছিল। পরে বলল, "আমায় কী করতে হবে?"

মাধব বললেন, "সুজনকে বাঁচাতে হবে। আমি আপনাকে বলছি, পুলিশ সুজনকেই সন্দেহ করছে। তারা অন্য দু-একটা জোরালো প্রমাণের খোঁজে রয়েছে যাতে সুজনকে খুনি হিসেবে ধরা যায়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সুজন খুবই ভাল ছেলে। তার স্বভাব-চরিত্র নিয়ে কোনও সন্দেহ হতে পারে না। আপনি বরং আমাকে খুনি হিসেবে ভাবতে পারেন, সুজনকে পারবেন না। এত ভাল, ভদ্র, নরম মনের ছেলে।"

ভিক্টর একটু চুপচাপ থাকল। তারপর বলল, "আমার কাজ হবে সুজনকে বাঁচানো, এই তো?"

"হ্যাঁ।"

"কাজটা আমি নিতে পারি। তার আগে সুজনের সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার। কথাবার্তা বলতে হবে।"

"আপনাকে আমি বাগানে নিয়ে যাব। সেখানেই আছে ও। পুলিশ থেকে তাকে নজরে রেখেছে। অনুমতি না নিয়ে তাকে বাগান ছেড়ে আসতে বারণ করেছে এখন।"

"বাগানে আমাকে যেতেই হবে। ওটাই তো আসল ক্রাইম স্পট।" বলে ভিক্টর একটু হাসল।

মাধব বললেন, "আপনি কাজটা নিলেন, এই খবর কি আমি কর্তামা'কে গিয়ে দিতে পারি?"

"পারেন। তবে সুজনের সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত পাকাপাকিভাবে কথা দিতে পারছি না।"

"তবু আমি আপনার কথা নিয়েই যাচ্ছি। ...একটা অন্য কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। আপনার, মানে আপনাকে কী দিতে টিতে হবে?"

ভিক্টর কেন যেন হাসল। বলল, "পরে বলব। কাজটা হাতে নিলে কিছু টাকা অ্যাড্ভান্স করবেন। পরে খরচ-খরচা দেখে বলব, কত টাকা লাগতে পারে। বিল পাবেন। ...এখন আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন। আমি সুজনের বাগান দেখতে চাই, কথা বলতে চাই তার সঙ্গে।"

মাধব বলল, "কালকেই আমি সে ব্যবস্থা করছি।"

॥ দুই ॥

কানে শোনা আর চোখে দেখার মধ্যে অনেক তফাত।

গাড়ি যখন সুজনের বাগানের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল, ভিক্টর রীতিমতো অবাক

হয়ে বলল, "এ তো মশাই এলাহি ব্যাপার।"

মুখে এলাহি বললেও ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, তবে একেবারে ছোট ব্যাপারও নয় বলা যায়। বাগানের সামনের দিকটায় পাঁচিল, মানে কম্পাউন্ড ওয়াল। ফটকও আছে। পাঁচিলের মাথার ওপর কাঁটাতার। ভিক্টরের মনে হল, ফুট-চারেক ইটের গাঁথনি, বাকি ফুট-দুই কাঁটাতারের বেড়া। বড় বড় গাছপালাও দেখা যাচ্ছিল ভেতরে।

মাধব বললেন, "আসুন।"

জায়গাটা চোখে দেখতে ভাল লাগে। কলকাতা শহরের প্রায় গায়ে গায়ে এখনও কত মাঠঘাট, গাছপালা, পাঁকসর্বস্ব পুকুরই না রয়েছে। একেবারে গ্রাম বলতে যা বোঝায়, তা-ই। সারাটা পথে কত যে আকন্দ আর বাঁশঝোপ চোখে পড়ল।

এ-দিকের মাটির গন্ধও আলাদা।

ভিক্টর ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরাল। রোদ নেই বললেই চলে, তবে আলো রয়েছে। গরমের দিন। এই আলো মুছতে মুছতে কমপক্ষে ঘণ্টাখানেক লাগবে। আজকাল সওয়া ছয় সাড়ে ছয়ের আগে তেমন অন্ধকার হয় না।

ভিক্টর বলল, "এত বড় বাগান, সবটাই কি ঘেরা হয়ে গিয়েছে?"

মাধব বললেন, "না। পেছনের দিকটায় কাঁটাতারের বেড়া। এই যে ইটের গাঁথনি দেখছেন, এও বেশিদিনের নয়। সুজন ধীরে ধীরে পাঁচিলটা গেঁথে নিচ্ছে!"

বিকেল ফুরিয়ে আসায় পাখির ঝাঁক মাঝে মাঝেই মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল।

ফটক খোলা। কাছাকাছি একটা লোক কী-যেন করছিল। মাধবদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"ছোটবাবু কোথায়, সদানন্দ?"

সদানন্দ হাত দিয়ে একটা টালির ঘর দেখাল। বলল, "ওই দিকেই ছিলেন।"

মাধব বললেন, "গাড়িতে কিছু জিনিস আছে। কানু একা পারবে না। তুমি যাও।" বলে ভিক্টরকে বললেন, "চলুন, আমরা ঘরে যাই।"

ভিক্টর টালির ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, "সুজন কি ওখানে থাকে?"

"হ্যাঁ। ...ওই যে বাড়িটা দেখছেন, ওটা এখানে আগেই ছিল। মাটির বাড়ি, খোলার চাল। সেসব ভেঙেচুরে সুজন নিজের থাকার মতন করে নিয়েছে।"

"কটেজ?"

"তা বলতে পারেন।"

ভিক্টর চারপাশ দেখতে লাগল। তার মনে হল, গাছপালার যা চেহারা তাতে বোঝা যায় এ-বাগানের অনেকটাই আগে ছিল। আমগাছের তো অভাব দেখা যাচ্ছে না। পেয়ারাগাছও চোখে পড়ে। জাম-জামরুলও হয়তো আছে। এখন, এতটা তফাত থেকে বড় বড় গাছের বাগানের সব গাছ ধরা যাচ্ছে না।

সুজনের 'কটেজ' কিন্তু ফটকের গায়ে গায়ে নয়। হাঁটতে হয় খানিকটা। গজ পঞ্চাশ।

ভিক্টর বলল, "সুজন কি এখানেই বেশির ভাগ সময় থাকে?"

"আগে থাকত না। আজকাল থাকে। আগে ও সকালে আসত, বিকেলে বাড়ি ফিরে যেত। মানে কলকাতায়। তারপর ওর মাথা গোঁজার জায়গা হয়ে যাবার পর, দু-একদিন একটানা এখানেই থেকে যেত। হালে, হপ্তার মধ্যে চার-পাঁচটা দিন এখানেই কাটাত। বাকিটা কলকাতার বাড়িতে। তবে গত দশ-পনেরো দিন একেবারেই কলকাতায় যাচ্ছে না।"

"পুলিশের বারণ বলে?"

"খানিকটা তাই। তবে আমাদের পুরনো উকিল আছে। উকিলবাবু বলছিলেন, আমি পুলিশের নাক ঘষে দেব। আইন আমি ভাল জানি। উনি থানা-পুলিশ করেছেন। বোধ হয় শাসিয়েছেন। তার ফলে, পুলিশ একটু নরম হয়েছে। বলেছে, সুজন যদি কলকাতায় যায়, যেন পুলিশকে জানিয়ে যায়।"

"আপনি কাল বলছিলেন, সুজন এখানে নজরবন্দি হয়ে রয়েছে। কলকাতায় যায় না।"

"ওটা কথার কথা। একদিন কি দুদিন দু-এক ঘণ্টার জন্যে কর্তামায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে।"

"পুলিশকে জানিয়ে?"

"হ্যাঁ।" বলে একটু থেমে মাধব বললেন, "সুজন বড় জেদি, একরোখা, সাফসুফ ছেলে। ওরও কেমন জেদ ধরে গেছে, এই বাগানে বসে থেকে ও দেখে নেবে পুলিশ ওর কী করতে পারে?"

এমন সময় কার গলা পেয়ে ভিক্টর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। মাধবও তাকালেন।

টালির বাড়ির নীচে এক বাতাবি লেবুর গাছ। ডালপালা ছড়িয়ে বেশ বড়ই হয়েছে। গাছের পাশ থেকে এগিয়ে এসেছে একটি ছেলে, পরনে পাজামা, গায়ে ফতুয়া-পাঞ্জাবি।

"সুজন!" মাধব বললেন। বলে ডাকলেন তাকে। "সুজন, আমি এঁকে নিয়ে এসেছি। ভিক্টর ঘোষ। কর্তামা আমায় হুকুম করেছেন।"

সুজন ভিক্টরকে দেখল। পরে বলল, "আসুন।"

চার-পাঁচ ধাপ সিঁড়ি। কাঁচা সিঁড়ি। সিমেন্ট করা হয়নি। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ছোট বারান্দা। বারান্দায় ক্যাম্বিসের চেয়ার, বেতের চেয়ার, মোড়া পড়ে আছে।

"ঠাকুমা কেমন আছে, মাধবকাকা?"

"ওই রকমই।"

"বুড়ি অকারণ ব্যস্ত হয়ে মরছে। কোনও মানে হয় না।...আপনি ঠাকুমাকে বলবেন, পুলিশের সঙ্গে এটা আমার চ্যালেঞ্জ। আমিও দেখে নেব, ওরা কী করতে পারে।"

ভিক্টর নজর করে সুজনকে দেখছিল। খানিকটা ছিপছিপে ধরনের চেহারা, গায়ের রং শ্যামলা, মুখের গড়ন তেকোনা ধরনের, থুতনির দিকটা সরু। নাক চোখ পরিষ্কার। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল। সুজনকে দেখলে ছেলেমানুষই মনে হয়। মানে কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়া ছেলেদের মতন। আইনমাফিক সাবালক, কিন্তু ঠিক

ঠিক সাবালকত্ব বোধ হয় এখনও পায়নি। আবেগপ্রবণ, তেজী এবং রাগী।

মাধব বসতে বললেন ভিক্টরকে। সুজনেরও খেয়াল হল, ভিক্টরকে বসতে বলা হয়নি। তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। বলল, "বসুন।"

ভিক্টর বসতে বসতে বলল, "কটেজটা তো বেশ!"

সুজন বলল, "আমার প্ল্যান। কম খরচে বাড়ি।" বলে একটু যেন হাসল।

"ক'টা ঘর?"

"দুটো। অফিসঘর নিলে আড়াইটে। কিচেন, বাথরুম আলাদা।"

"পুরোটাই টালি?"

"টালির ছাদ। দেয়াল পাকা। নীচের মেঝে..." বলে আঙুল দিয়ে পায়ের দিকটা দেখাল, "সিমেন্ট করে নিয়েছি।"

"বাঃ! অভাব শুধু ইলেকট্রিসিটির?'

"হ্যাঁ, এদিকে ইলেকট্রিসিটি নেই। কলকাতার লোক, আলোর জন্যে বড় খারাপ লাগে। আমরা লণ্ঠন ব্যবহার করি। কখনও মোমবাতি। একটা হ্যাজাক আছে আমার। কমই জ্বালাই। কেরোসিনের বড় অভাব।"

মাধব বললেন, "তোমরা বসে কথা শুরু করো। আমি ওদিকটা একটু দেখি। কর্তামা কী সব পাঠিয়েছেন, রাখার ব্যবস্থা করে...একটু চায়ের কথা বলি।"

মাধব আর দাঁড়ালেন না। সদানন্দ আর কানু ড্রাইভার ধরাধরি করে একটা বস্তা আনছিল। সদানন্দর কাঁধে মস্ত এক ঝোলা।

সুজন বসল।

ভিক্টর কয়েক পলক সামনের দিকে তাকিয়ে যেন ঠিক করে নিল, কী ভাবে কথাটা শুরু করবে। তারপর সুজনের দিকে তাকাল।

"আমার সম্পর্কে মাধববাবু কিছু বলেছেন আপনাকে?" ভিক্টর বলল।

"না। মাধবকাকা আগেই আমাকে বলেছিলেন, ঠাকুমা'র ইচ্ছে, একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগানো।"

"গোয়েন্দা না হলেও আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। আমার নাম ভিক্টর ঘোষ!"

"ভিক্টর নাম কেন?"

ভিক্টর হেসে ফেলল, "ডাকনামটাই আমার আসল নাম হয়ে গেছে। আমার ভাল নাম শুভব্রত। বাবা আমাকে ভিক্টর বলে ডাকতেন। কখনও ডাকতেন 'ভিকু' বলে। ছেলেবেলা থেকে বন্ধুবান্ধব, পাড়ার লোক, সবাই ভিক্টর বলে ডাকতে ডাকতে ভিক্টর হয়ে গেলাম।"

সুজন যেন অন্যমনস্ক হয়ে কিছু ভাবতে লাগল। হঠাৎ বলল, "আচ্ছা, আমাদের কলেজে একজন ভিক্টর ঘোষের নাম শুনতাম। কমনরুমে গ্রুপ ফোটোতেও দেখেছি। আমাদের চেয়ে অনেক সিনিয়র। কলেজের ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন। ইউনিভার্সিটি টিমেরও..."

বাধা দিয়ে ভিক্টর বলল, "তোমার কোন কলেজ ছিল?"

"স্কটিশচার্চ..."

"তবে ভাই আমিই সেই ভিক্টর। হাত মেলাও। তোমাকে তুমি বলে ফেলেছি, ভালই করেছি।" বলে ভিক্টর হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে দিল।

সুজন হাত বাড়াল। বলল, "আপনি আমার সিনিয়ার। আমরা আপনাদের কত গল্প শুনেছি। খেলার গল্প, সোশ্যালের গল্প। একবার আপনারা দারুণভাবে আগুনের হাত থেকে দুটো ছেলেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। ল্যাবরেটরিতে আগুন লেগে গিয়েছিল।"

ভিক্টর হাসতে হাসতে বলল, "করেছি অনেক কিছু। এখন আর সে-বয়েস নেই, ভাই। পেটের ধান্দায় ঘুরি।...যাকগে, সেসব গল্প পরে একসময় করা যাবে। এখন কিছু কাজের কথা হোক।"

ভিক্টর হাত ছেড়ে দিয়েছিল সুজনের। সুজন যেন নিজের কোনও লোক পেয়ে গেছে, খুশি হয়েছে, তাকে সব বোঝাতে পারবে, বলল, "এরা আমায় সাসপেক্ট করছে, ভিক্টরদা! ভাবছে আমি কিলার! অদ্ভুত ব্যাপার!"

"ওরা কী ভাবছে বাদ দাও। পুলিশ অনেক কিছু ভাবে। তোমাকে তো আর অ্যারেস্ট করেনি।"

"আমাকে হিউমিলিয়েট করেছে। কিন্তু আমি কেন লোক খুন করতে যাব?"

"নিশ্চয় যাবে না। কিন্তু কিছু একটা হয়েছে, যার সঙ্গে তুমি জড়িয়ে পড়েছ! আমি শুনতে চাই, ঠিক কী হয়েছে?"

"মাধবকাকা আপনাকে বলেননি?"

"বলেছেন। আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।"

সুজন একটু চুপচাপ থেকে শেষে বলল, "প্রায় হপ্তাতিনেক হল। এমনিতে আমার বার-তারিখ মনে থাকে না। কিন্তু ঘটনাটা ঘটার পর, মনে রাখতেই হচ্ছে। দিনটা ছিল শনিবার, বাইশে এপ্রিল। শনিবার বিকেলে আমি কলকাতার বাড়িতে চলে যাই। আমার একটা মোটরবাইক আছে। সেদিন যাব বলে ঠিকঠাক করেও যাওয়া হল না। মোটর বাইকের চাকা পাংচার। এখানে সারাবারও উপায় নেই। কাজেই যাবার আশা ছেড়ে দিয়ে স্নান করতে গেলাম। যা গরম আর গুমোট চলছে। স্নান করে ফিরে এসে দেখি, একটি লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

"কেমন লোক? বয়েস কত? চেহারা?"

"সাধারণ লোক। ঠিক কলকাতা শহরের মানুষ নয়। এদিককার কোনও গ্রামের মানুষ মনে হল। বয়েস ঠিক বলতে পারব না। ইয়াং নয়। রুক্ষ এলোমেলো চুল। দু-দশটা পাকা চুলও থাকতে পারে। কালচে মুখ। গালে দাগ। বসন্তের দাগ হলেও হতে পারে। চোখে চশমা। চশমাটা প্রায় ঝুলে পড়েছে।"

"ধুতি পরা, না, প্যান্ট পরা?"

"পাজামা পরা। গায়ে কিন্তু শার্ট।"

"কী নাম বলল লোকটা, কোথায় থাকে? কেন এসেছিল?"

"নাম বলেছিল কি না আমার মনে পড়ছে না। হয়তো একবার বলেছিল। হরিপদ তারাপদ কিছু হবে। তবে সে যে মুস্তাফি, এটা বারকয়েক বলেছে।"

"কী দরকারে এসেছিল?"

সুজন বলল, "এসেছিল দালালির কাজ নিয়ে। বলছিল, দেগঙ্গার দিকে একটা বাগান বিক্রি আছে। যার বাগান, তিনি মারা গেছেন। বিধবা স্ত্রী এখন বাগানটা বেচে দিতে চান। দরদস্তুর নিয়ে কথা বলে দেখেছেন, হাজার পঁচিশ-তিরিশ টাকা হলেই জমি-বাগান বেচে দেবেন?"

"লোকটা তা হলে দালাল? তা তোমার কাছে এসেছিল কেন?"

"আমার বাগানের কথা শুনে এসেছে। ...এদিকে কাছাকাছি গ্রামে ওর শালা থাকে। তার কাছেই এসেছিল। সেখানেই থাকবে রাত্তিরটা।"

"শালার কাছে শুনে এসেছে?"

"তেমন কিছু বলল না। যারা জমিটমি ও বাগানের দালালি করে, তারা অনেক খবর রাখে। কানে যায় তাদের। আমার বাগানের কথা শুনেই এসেছে।"

ভিক্টর আবার একটা সিগারেট ধরাল। "তারপর?"

"তারপর আর কী! আমি বললাম, এখন আর বাগান কেনার ক্ষমতা আমার নেই। দেগঙ্গা অনেকটা দূরও। লোকটা নাছোড়বান্দা। বলল, 'সময় নিয়ে ভেবে দেখুন। হাজার কুড়িতেও রাজি করানো যেতে পারে।' কথায় কথায় খেয়াল হয়নি, হঠাৎ দেখি কালবৈশাখী উঠেছে। প্রচণ্ড ঝড়। আকাশ কালো ঘুটঘুটে। ঝড় কমার মুখে বৃষ্টি নেমে গেল। জোর বৃষ্টি। বৃষ্টি কমতে কমতে সন্ধে। মুস্তাফি উঠি উঠি করতে লাগল। নিজেই বলল, 'আমাকে যদি একটা ছাতা দেন, কাল তো আসছি, ফেরত দিয়ে যাব।"

"তুমি ছাতা দিলে?"

"দিলাম। লোকটা আটকে গিয়েছে। সন্ধে পেরিয়ে যাচ্ছে, বৃষ্টি থামছে না। ফেরত তো দিয়েই যাবে। দিলাম।"

"আর টর্চ?"

"বলবেন না। লোকটার নিজের কাছে টর্চ ছিল। যাবার সময় দ্যাখে, টর্চটা একবার জ্বলেই নিভে গেল। ঠুকেঠাকেও জ্বলল না। কাজেই আমার টর্চটা দিলাম।"

"ভাবলে, ছাতা আর টর্চ কালকেই ফেরত পেয়ে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।... আমি একেবারেই খারাপ কিছু ভাবিনি," সুজন বলল। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "একটা লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। লোকটাকে আমার খারাপ মনে হয়নি। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ফিরে যাচ্ছে দেখে, আমার ছাতা আর টর্চ তাকে দিয়েছিলাম। টর্চটা সে চেয়েই নিয়েছিল একরকম।... তা ছাড়া সে বাগানের কথা বলতে আসবেই। ছাড়বে না।"

"কিন্তু তুমি তাকে চেনো না?"

"না, চিনি না। বলল কাছেই থাকবে। সামনের গ্রামে। আমি বিশ্বাস করেছি।"

"এখন তার ফল ভোগ করছ।"

সুজন ক্ষুণ্ণ হল। বলল, "তাই দেখছি। কিন্তু ভিক্টরদা, আপনিই বলুন, মানুষ অচেনা হলে কি তার জন্যে কিছু করতে নেই? কলকাতার রাস্তায় হরদম অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে। রাস্তার লোকই তো তাদের উঠিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়।"

মাধব এলেন। সঙ্গে এক বুড়ো মতন কাজের লোক। চা এনেছে। চায়ের সঙ্গে মিষ্টি। বোধ হয় মাধবই কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছেন।

চা নামিয়ে চলে গেল লোকটি।

মাধব চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। "নিন, একটু চা খান।"

সুজন বলল, "মাধবকাকা, ভিক্টরদাকে আমি নামে চিনতাম। আমাদের আলাপ হয়ে গেছে। আমরা একই কলেজের ছাত্র। উনি অনেক সিনিয়ার।"

মাধব দেখলেন দুজনকে, তারপর হেসে বললেন, "বাঃ! ভালই হল। এটা সুলক্ষণ।"

ভিক্টর চা নিয়েছিল। চুমুক দিল। তারপর সুজনকে বলল, "যে-লোকটা তোমার কাছে এসেছিল, আর যে মারা গিয়েছে, তারা একই লোক নয়?"

"না।"

"যে মারা গিয়েছে, মানে খুন হয়েছে, তাকে তুমি দেখেছ?"

"দেখেছি। পরের দিন। যখন খবর পেলাম যে, একটা লোক খুন হয়ে মাঠের রাস্তায় পড়ে আছে।"

"যে খুন হয়েছে, তাকেও তুমি কোনওদিন দ্যাখোনি?"

"না। আমাদের বাগানে যারা কাজকর্ম করে, কেউ তাকে চেনে না।"

"আর যে-লোকটা তোমার কাছে এসেছিল, বলেছিল, সামনের গ্রামে তার শালার বাড়িতে রাত কাটাবে, পরের দিন তোমার ছাতা, টর্চ ফেরত দিয়ে যাবে, সেই মুস্তাফির কোনও খবর পেলে না?"

সুজন মাথা নাড়ল। বলল, "না। পুলিশও খোঁজ নিয়ে দেখেছে, কাছাকাছি গ্রামে মুস্তাফি বা তার কোনও আত্মীয় নেই। একটা লোকও নাকি বলেনি, মুস্তাফি বলে তাদের কোনও চেনা লোক আছে।"

ভিক্টর একটা মিষ্টি তুলে নিয়ে মুখে দিল। ভাবছিল।

"যে খুন হয়েছে, তাকে কী ভাবে খুন করা হয়েছে?"

"পেছন থেকে মাথায় মারা হয়েছিল। পুলিশ বলছে।"

"ব্যাক অব দি স্কাল।"

"হ্যাঁ।"

"লোকটার পরিচয় জানা যায়নি তা হলে?"

"না।"

"বয়েস কত? চেহারা?"

"তিরিশের ওপর। চেহারা দেখে শহুরে মনে হয় না।"

মাধব বললেন, "দুটো ব্যাপারই অদ্ভুত। যে খুন হল, তার কোনও পরিচয় পাওয়া গেল না। আর যে সুজনের কাছে এসেছিল, তারও কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না। অদ্ভুত নয়?"

ভিক্টর বলল, "খানিকটা বেশি রকম অদ্ভুত।...তবে সুজন, আমি তোমায় একটা কথা বলতে পারি। পুলিশ নিজেও ব্যাপারটা ধরতে পারছে না। তোমাকে তারা

পুরোপুরি সন্দেহও করতে পারছে না। করলে হয়তো অ্যারেস্ট করত। ওরা তোমায় হ্যারাস করছে, তোমার ওপর নজর রাখছে। এটা ওদের পার্ট অব দি জব্। তুমি তোমার মতো থাকো। ঘাবড়ে যেয়ো না।...আমাকে শুধু একটা কথা বলো, তোমার কাছে যে এসেছিল, তাকে কে কে দেখেছে এখানের?"

"সদানন্দ আর পুলিন।"

"সদানন্দকে দেখলাম। পুলিন কে?"

"চা দিয়ে গেল। এখানেই থাকে।"

"পুলিশের কাছে এরা কী বলেছে?"

"যে-লোকটা এসেছিল আর যে খুন হয়েছে, তারা এক লোক নয়।"

মাধব বললেন, "যে খুন হয়েছে আর ওই মুস্তাফি, যে এসেছিল, এরা একই লোক নয় বলা সত্ত্বেও পুলিশ কেন হাঙ্গামা করছে ভিক্টরবাবু?"

ভিক্টর বলল, "পুলিশ ভাবছে, কিংবা ধরুন ভাবতে পারে যে, সুজনকে বাঁচাতে তার নিজের লোক সদানন্দ আর পুলিন মিথ্যে কথা বলছে।"

"মিথ্যে কথা?" সুজন যেন চটে গেল।

ভিক্টর হালকা গলায় বলল, "পুলিশ আগে সন্দেহ করে, পরে সত্য খোঁজে। ও নিয়ে তুমি মাথা খারাপ কোরো না।"

চা শেষ করে ভিক্টর বলল, "আজ তো দেখছি অন্ধকার হয়ে এল। এখন তোমার বাগানে ঘুরে বেড়িয়ে আমি কিছু দেখতে পাব না ভাল করে। তা ছাড়া, লোকটা ঠিক কোন জায়গায় খুন হয়েছিল, আমি দেখতে চাই।"

মাধব বললেন, "আপনি কি দিনে দিনে আসতে চাইছেন?"

"আমি আগামী কালই আসতে চাইছি।"

"আসুন। গাড়ির ব্যবস্থা করব।"

"না," ভিক্টর মাথা নাড়ল। "আমার স্কুটার আছে। রাস্তা আমি মোটামুটি চিনে গেলাম। আমি নিজেই আসব।"

সুজন বলল, "কখন?"

"সকালের দিকে। আমি তোমার এখানেই দুটো খেয়ে নেব। এখন চলো, একবার বাগানটা একটু ঘুরে যাই।" বলতে বলতে ভিক্টর উঠে দাঁড়াল।

৷৷ তিন ৷৷

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধে হল ভিক্টরের।

স্নান সেরে আরাম করে নিজের ঘরে বসেছে, পাখা চলছে ঝড়ের মতন, দিদি ঘরে এল।

"খাবি না কিছু?" দিদি বলল।

"খেয়েছি। এক গ্লাস শরবত খাওয়াও।"

"গিয়েছিলি কোথায়? নোটন বলল, বিকেলেই বেরিয়ে গিয়েছিস অফিস ছেড়ে।"

ভিক্টর হাসল। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, সে নিজে যত না গোয়েন্দা, দিদি তার চেয়েও বড় গোয়েন্দা। নোটনকে দিদি যেন ইনফরমার হিসেবে ভিক্টরের পেছনে লাগিয়ে রেখেছে।

"কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম। একটু নতুন কেস হাতে নিচ্ছি।"

দিদি কয়েক মুহূর্ত ভিক্টরকে দেখল। বলল, 'নিয়েছিস নে, তবে খুনোখুনির মধ্যে জড়াবি না।"

ভিক্টর মাথা নাড়ল। না নেড়ে উপায় নেই।

দিদি চলে গেল শরবত আনতে।

মানুষের জীবন বড় অদ্ভুত। এই দিদি তার জেঠতুতো বোন। জ্যাঠামশাই ছিলেন বিলেত-ফেরত দাঁতের ডাক্তার। ডেন্টাল সার্জন। ডাক্তার হিসেবে পশার করেছিলেন প্রচুর। জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে ছিল না; ভিক্টরকেই ছেলে হিসেবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। ছোট ভাইও ছিল প্রাণ। এমনই কপাল, ভাইয়ের স্ত্রী, মানে ভিক্টরের মা মারা গেলেন আগে, বছর তিন পরে ভাই, মানে ভিক্টরের বাবা। ভাইপোকে একেবারে যেন রত্ন করে ঝুলিয়ে রাখলেন বুকে। জ্যাঠাইমাও সেই রকম, 'ভিকু ভিকু' করে দিন কাটত তাঁর। সেই জ্যাঠাইমাও মারা গেলেন। তার আগেই দিদির বিয়ে হয়েছে।

জ্যাঠাইমা গেলেন, জ্যাঠামশাইও চলে গেলেন। দিদি বিধবা, নিঃসন্তান হয়ে ফিরে এল কলকাতায়। এখন শুধু দিদি আর ভিক্টর। দিদি যে ভিক্টরকে নিয়ে খানিকটা দুশ্চিন্তায় থাকে, ভিক্টর জানে।

মাঝে-মাঝে দিদি রাগ করে বলে ফেলে, "বাবা অত করে চাইল তুই দাঁতের ডাক্তার হ, তুই গেলি অন্য দিকে। তোকে ভূতে ধরেছিল, তা না হলে মানুষ চোর-জোচ্চোর, গুণ্ডা-বদমাশ নিয়ে দিন কাটায়!"

যার যেমন মতি। ভিক্টর ডেন্টাল সার্জন হতে পারত। হয়নি। তার ইচ্ছেই হয়নি। দাঁতের ডাক্তার না হয়ে হল গোয়েন্দা। সোমসাহেবের 'স্টার সিকিউরিটি সার্ভিস'-এ কাজ করল ক' বছর। কিছুদিন থাকল এক কারখানার স্পেশ্যাল অফিসার হয়ে, চোর-জোচ্চোর, হামলাবাজদের চোখে চোখে রাখল, তারপর ছেড়ে ছুড়ে নিজের অফিস খুলল। অবশ্য, অফিস খুলতে ঘর খুঁজতে হল না, জ্যাঠামশাইয়ের চেম্বারটাই হয়ে গেল তার অফিস।

ভিক্টর তার অফিসের নাম দেয়নি। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে, সিকিউরিটি কনসালট্যান্ট। তার হাতে কাজকর্ম বেশি থাকে না। বছরে বড়জোর গোটা-ছয়। এর মধ্যে খুচরো বেশি। দু-একটা বড় যদি বা জুটে যায়।

কোনও দুঃখ নেই ভিক্টরের। নিজেদের বাড়ি। মাথার ওপর দিদি। খাওয়া-পরার অভাব এখনও ঘটেনি। হাতে কিছু কাজকর্ম থাকলেই সে খুশি।

দিদি শরবত নিয়ে এল। "নে।"

শরবতের গ্লাস নিতে নিতে দিদিকে একটু দেখল। ভিক্টরের যদি কোনও দুঃখ থাকে, তবে সে-দুঃখ দিদির জন্যে। ছেলেবেলা থেকেই এই দিদি তার প্রাণ। আর সে

হল দিদির একমাত্র ভরসা।

"আচ্ছা দিদি, জ্যাঠামশাইয়ের কাছে একটা লোক আসত, ঘরবাড়ির দালালি করত। ভদ্রলোকের কী নাম, জানিস তুই?"

দিদি ভাবল। মাথা নাড়ল। পরে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল। বলল, "কার কথা বলছিস? পালবাবু?"

"হ্যাঁ। ভদ্রলোক কোথায় থাকেন জানিস?"

"না। শুনেছি, হ্যারিসন রোডে থাকতেন। কেন?"

"এমনি জিজ্ঞেস করলাম।"

"তুই বুঝি বাড়ি কিনবি?" বলে দিদি হাসল।

ভিক্টরও হেসে ফেলল। বলল, "বলেছিস ভাল!"

দিদি চলে যাচ্ছিল। চলে যেতে গিয়ে বলল, "পালবাবুদের বেনারসি শাড়ির দোকান ছিল ওদিকেই। বোধ হয় ওঁর ভাইয়েরা দেখাশোনা করত।"

ভিক্টর শুনল। "নাম জানিস দোকানের?"

"না।" দিদি চলে গেল।

শরবত খাওয়া শেষ করে ভিক্টর চুপচাপ বসে থাকল। ভাবছিল।

সুজনের ব্যাপারটা খুব সহজ বলে মনে হচ্ছে না। ভিক্টর এখন পর্যন্ত যা জেনেছে তা সামান্য। এই দু-চার আনা জানা দিয়ে কাজ হয় না। এগোনোও যায় না। অনেক কিছু তাকে জানতে হবে। তার জন্যে সময় চাই, ঠিক ঠিক খোঁজখবর পাওয়াও দরকার।

এখন পর্যন্ত ভিক্টর যা বুঝছে কিংবা তার যা মনে হচ্ছে, তাতে সুজনকে সন্দেহ করা যায় না। সুজন কেন একটা লোককে অনর্থক খুন করতে যাবে? তার কী লাভ? উদ্দেশ্যই বা কী? যাকে মোটিভ বলে, তেমন কোনও উদ্দেশ্য সুজনের নেই।

বরং ঘটনা শুনে মনে হচ্ছে, ছক কষে ভেবে চিন্তে সুজনকে এই খুনের মামলায় কেউ জড়াবার চেষ্টা করছে। তাই নয় কী? প্রথমত, ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে সুজনের বাগানের বাইরে, কিন্তু কাছে! সুজনকে যাতে সন্দেহ করা যায়, সেই জন্যে তার ছাতা এবং টর্চ বেশ ভেবেচিন্তে বুদ্ধি করে সুজনের ঘর থেকে তুলে আনা হয়েছে। তা ছাড়া, একটা লোককে যেন তালিম দিয়ে, শিখিয়ে-পড়িয়ে বাগানবেচার দালাল করে সুজনের কাছে পাঠানো হয়েছিল। লোকটা জাল। যদি জাল না হত, তার হদিস পাওয়া যেত। মুস্তাফি বলে কারও হদিস পাওয়া যায়নি। অন্তত সুজন বা পুলিশ, কেউই মুস্তাফির কোনও হদিস পায়নি।

ভিক্টর চোখের পাতা প্রায় বন্ধ করে অনেকক্ষণ বসে থাকল। ভাবল। কিছুই সে অনুমান করতে পারছিল না। গোটা ব্যাপারটাই যেন ধাঁধা।

চেয়ার থেকে উঠে পড়ে ভিক্টর ঘরের মধ্যে বার কয়েক পায়চারি করল। সিগারেট ধরাল একটা। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

আচ্ছা, ব্যাপারটা এইভাবে ভাবা যাক। ভাবা যাক, সুজনের কোনও শত্রু আছে। শত্রু কে, আপাতত জানা নেই। ধরে নেওয়া যাক, রাম বা শ্যাম তার শত্রু।

রাম-শ্যামের উদ্দেশ্য সুজনকে জব্দ করা। এমন একটা অবস্থায় ফেলা, যাতে সুজনের মতন ছেলেমানুষ দিশেহারা হয়ে যায়। এমনিতেই খুনের মামলায় কাউকে জড়াতে পারলে তার তো হয়ে গেল। নাওয়া খাওয়া ঘুম স্বস্তি শান্তি সব গেল। বিশেষ করে সুজনের মতন একটা অল্পবয়েসি ছেলের পক্ষে এই চাপ বা টেনশন সহ্য করা কঠিন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, রাম বা শ্যাম, সুজনের কোনও শত্রু সুজনকে জব্দ করার জন্যে একটা খুনের মামলায় জড়াবার ফন্দি এঁটেছিল। তারা বা সে একটা ছক তৈরি করে। সেই ছক মতন, ধরে নেওয়া যেতে পারে, সুজনের মোটরবাইক বিকল করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, সুজন যাতে শনিবার কলকাতায় না আসতে পারে, তার জন্যে ওর মোটরবাইকের চাকা পাংচার করে রাখা হয়। তারপর পাঠানো হয় একটা জাল লোককে সুজনের কাছে, বাগান বিক্রির মিথ্যে গল্প ফাঁদতে। লোকটাকে হয়তো বলা হয়েছিল, এমন কিছু প্রমাণ হিসেবে সুজনের কাছ থেকে আনতে, যাতে বোঝা যায় সুজনের সঙ্গে এই খুনের একটা যোগাযোগ রয়েছে। মুস্তাফি নামের জাল লোকটা আগেভাগেই ঠিক করে নিয়েছিল, সে সুজনের টর্চটাই আনবে। তার নিজের টর্চ সে খারাপ করে রেখেছিল আগেই, যাতে সুজনের টর্চ হাতাতে পারে। কালবৈশাখী ওঠা এবং বৃষ্টি হওয়া আচমকা ব্যাপার। এতে লোকটার সুবিধেই হয়। একটা ছাতাও সে চেয়ে নেয়। মানে, ছাতা এবং টর্চ, দুইয়ে মিলে প্রমাণ আরও পাকা হল।

তা না হয় হল, কিন্তু সেই মুস্তাফি গেল কোথায়? মুস্তাফির বদলে অন্য লোক খুন হল কেন? এই দ্বিতীয় লোকটাই বা কে?

সুজন পুলিশের ওপর যতই চটে যাক, ভিক্টর বুঝতে পারছে, পুলিশ নিজেও সুজন সম্পর্কে পাকা সন্দেহ কিছু করেনি। করলে অন্য ব্যবস্থা করত। তুচ্ছ দু-একটা প্রমাণ দিয়ে কাউকে খুনের মামলায় আসামি করা যায় না। আইন অত কাঁচাভাবে তৈরি হয়নি।

পুলিশের মনে কী আছে পুলিশই জানে। ভিক্টর বরং একবার চেষ্টা করবে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে। কলকাতার থানার দু-পাঁচজনকে ভিক্টর চেনে। আলাপ আছে। এক-আধজন তার বন্ধুর মতন। কিন্তু ওই রসুলপুরের দিকের কোনটা থানা, কে বা আছে, কার এলাকা, সে জানে না। খোঁজ নিতে হবে।

হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়ায় ভিক্টর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ডাকল নোটনকে।

নোটন এল।

"কাল আমি অফিস যাব না। সকালেই বেরিয়ে যাব বাড়ি থেকে। ফিরতে ফিরতে বিকেল হবে। বাড়িতেই ফিরব।"

"ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে যাবে?" নোটন আজ মাধবকে দেখেছে। দাদা ওই ভদ্রলোকের সঙ্গেই বেরিয়ে গিয়েছিল।

"না। একলা যাব। স্কুটারে।"

"কোথায়?"

"দমদম এয়ারপোর্টের দিকে। শোন, তুই কাল অফিস থেকে আসবার সময় আমার তিন নম্বর ডায়েরিটা নিয়ে আসবি।"

"তিন নম্বর?"

"হ্যাঁ।...চিনিস না?"

"চিনি। কালো রঙের মলাট।"

"আর একটা কাজ করবি।...হ্যারিসন রোড চিনিস তো?"

নোটন হেসে ফেলল। তারা তালতলায় থাকে, হ্যারিসন রোড চিনবে না? "কী করতে হবে বলো?"

"হ্যারিসন রোডে বেনারসি শাড়ির দোকান পাবি দশ-পনেরোটা। কমও পেতে পারিস, বেশিও পেতে পারিস। তোকে একটা খবর আনতে হবে।"

"বলো।"

"পালবাবু বলে এক ভদ্রলোককে আমার দরকার। নাম মনে পড়ছে না। জ্যাঠামশাইয়ের কাছে আসতেন। দু-পাটি দাঁতই বাঁধানো। একটা চোখ বেশ ট্যারা। পালবাবুর ভাইদের বেনারসি শাড়ির দোকান ওদিকে। হ্যারিসন রোডে। ভদ্রলোককে খুঁজে বার করতে হবে। খুব দরকার।"

নোটন এমন একটা ভাব করল যেন, এ আর এমন কী বিরাট কাজ।

"ভদ্রলোকের বয়েস এখন কত, তোকে বলতে পারছি না। ষাটের মতন হবে। পালবাবু জ্যাঠামশাইয়ের পেশেন্ট ছিলেন। এমনিতেও আসা-যাওয়া করতেন।"

নোটন বলল, "তুমি ভেবো না। ভদ্রলোককে ঠিক খুঁজে বার করব।"

"দেখি তোর মুরোদ।"

নোটন একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "আর কিছু করতে হবে?"

মাথা নাড়ল ভিক্টর, "না। এখনকার মতো নয়।"

নোটন চলে যাচ্ছিল, কী মনে করে ভিক্টর বলল, "নোটন, তুই ডিম বেচার ব্যবসা করতে পারবি?"

নোটন কিছু বুঝতে পারল না। অদ্ভুত কথা। দাদা তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে? অবাক হয়ে ভিক্টরকে দেখতে লাগল।

ভিক্টর হেসে ফেলল। জোরে। বলল, "তুই একবার মুড়িঅলা সেজেছিলি মনে আছে? লাহাদের ছেলে চুরির কেসে?"

নোটন বুঝতে পারল। যোগেশ লাহাদের ছেলে চুরির কেসের কথা তার মনে পড়ল সঙ্গে-সঙ্গে। দাদা তাকে মুড়িঅলা সাজিয়ে নজরদারিতে লাগিয়ে দিয়েছিল সাহাবাগানে। তাকে মন্দ মানায়নি। বিহারের ছেলে, কথায় ভাঙা ভাঙা বাংলা বুলি এনেছিল মুড়িঅলা সেজে।

নোটন বলল, "মামলাটা কীসের দাদা?" নোটন যে-কোনও কাজকর্মকেই মামলা বলে।

ভিক্টর হেসে বলল, "পরে শুনবি।...তুই গাধা, ডিমের ব্যবসা করতে পারবি কি না বল?"

মাথা হেলিয়ে নোটন বলল, "ইজিলি।" বলে হেসে ফেলল।

নোটনের মুখে 'ইজিলি' একটা মুদ্রাদোষ। এমন ভাবে বলে, না হেসে পারা যায় না।

ভিক্টর বলল, "ঠিক আছে। এখন যা।"

॥ চার ॥

সুজনের বাগান দেখলে বোঝা যায়, নতুন করে হাত পড়েছে, যদিও আসলে বাগানটা পুরনো। বিরাট বিরাট আমগাছ, কিছু পেয়ারাগাছ, জাম- জামরুলও রয়েছে দু-চারটে; বেল, কাঁঠাল, তাও চোখে পড়ে! এ ছাড়া, খুচরো কতক গাছ।

সুজনের ভাল করে জানা ছিল না, থাকলে সে কেষ্টপুরের ভেতরের দিকেও বাগান পেয়ে যেত। সুজন বলল, "এককালে কলকাতা ছাড়ালেই এমন বাগান আপনি পরপর দেখতে পেতেন। দমদম থেকে বারাসত পর্যন্ত কত বাগান। এখন আর পাবেন না। কলোনি হয়েছে, বাড়ি হয়েছে। বাগান কেটে বসত হয়েছে। জমির অভাব। মানুষ বেড়েছে।"

"তোমার এই বাগানটা কত দিনের?" ভিক্টর বাগানে ঘুরতে ঘুরতে জিজ্ঞেস করল।

"পুরনো। আমি যার কাছ থেকে কিনেছি, তার কাছেই বছর-তিরিশ ছিল।"

"কার কাছ থেকে কিনেছ?"

"সিঁথির এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে। মুসলমান ভদ্রলোক। তিনি তাঁর সব কিছু বেচে মেয়ের কাছে এলাহাবাদে চলে গেলেন। ছেলে নেই, মেয়েই সব। নাতি-নাতনিদের না দেখে থাকতে পারেন না। বরাবরের মতন চলে গেলেন।"

"তোমার খরচখরচা বেশি পড়েছিল?"

"না। আমি কম টাকাতেই পেয়েছি।"

গাছপালা ছাড়িয়ে ভিক্টর পুবের দিকে এগিয়ে গেল। এদিকটায় সবজিবাগান। দেখলেই বোঝা যায় নতুন করে হাত পড়েছে। গরমের দিন, সবজির শোভা নেই, তবু বেগুন, ঝিঙে, লাউ-কুমড়োর মাচা, শশা চোখে পড়ছিল। জনা-দুয়েক লোক বাগানে কাজ করছে।

ভিক্টর ভাল করে নজর করছিল। এই বাগানের পুব দিকটা সবজিখেত। কিছু জমি ফাঁকা পড়ে আছে। তারপর সীমানা। কাঠের খুঁটি আর কাঁটাতার দিয়ে সীমানা ঘেরা রয়েছে। সীমানার ওপারে মাঠ। দু-একটা গাছপালা থাকলেও নেড়া জমি।

সুজনের মনে মনে ইচ্ছে রয়েছে, এই বাগানের একপাশে ফুলবাগান করবে। এখনও পেরে ওঠেনি। অল্প কিছু বসানো আছে।

ভিক্টর ঘুরতে ঘুরতে পুকুরের কাছে এল। একে ঠিক পুকুর বলা যায় না; বড় ডোবা বলাই ভাল। গরমকালে জল শুকিয়ে এসেছে।

সুজন বলল, বাগান নেবার পর সে খানিকটা মাটি কাটিয়েছে পুকুরের, নোংরা

পরিষ্কার করিয়েছে। এই পুকুর আরও বাড়াতে হবে, নয়তো জলের অভাবে গাছপালা শুকিয়ে মরবে। এখনকার মতন সে দুটো টিউবওয়েল বসিয়েছে। একটা তার টালিঘরের দিকে, আর-একটা সবজিবাগানে। পুকুর থেকে জল তুলে বাগানে দেবার জন্যে রয়েছে ছোট পাম্প। ডিজেলে চলে।

পুকুরের কাছাকাছি হাঁস-মুরগির ঘর। ছোট ছোট কতকগুলো চৌকো খাঁচা যেন। হাঁস-মুরগি চরে বেড়াচ্ছিল।

ভিক্টর বলল, "আমার এক শাকরেদকে আমি তোমার বাগানে ঢুকিয়ে দিতে চাই।"

সুজন ঠিক বুঝল না।

ভিক্টর বলল, "তাকে আমি ইনফরমার হিসেবে রাখব।"

"ইনফরমার?"

"তোমার বাগানের চেয়েও আমার কাছে যেটা জরুরি সেটা হল, এই বাগানে যারা কাজ করে, আসা-যাওয়া করে, তাদের দিকে নজর রাখা।"

অবাক হয়ে সুজন বলল, "কেন?"

"এই বাগানে যারা কাজ করে, তারা যে যুধিষ্ঠির, তা তোমাকে কে বলল? এদের মধ্যে বদমাশ কেউ থাকতে পারে। সেদিন তোমার মোটরবাইকের টায়ার পাংচার হয়েছিল, না, করানো হয়েছিল, কে বলবে?"

ভিক্টরের কথার সঙ্গে সঙ্গে সুজন যেন চমকে গেল। কথাটা আগে তার মনে হয়নি। ভাবেনি। বলল, "তাই তো। আগে আমার খেয়াল হয়নি। আপনি ঠিক বলেছেন। আমার মোটরবাইকের চাকা পাংচার হয়নি। হাওয়া বেরিয়ে গিয়েছিল।"

ভিকটর তাকাল। দেখল সুজনকে। সন্দেহের গলায় বলল, "হাওয়া বেরিয়ে গিয়েছিল? চোরা লিক্?"

"না," মাথা নাড়ল ভিক্টর, "আমি ভেবেছিলাম পাংচার। এখানকার যা রাস্তাঘাট। পরে তো দেখলাম পাংচার নয়। চোরা লিক্ও পাওয়া গেল না। ভালভ্ পিনটা বেঁকে গিয়েছিল। হয়তো তাতেই হাওয়া বেরিয়ে গিয়েছে।"

ভিক্টর কিছু বলল না। হাঁটতে লাগল। পুকুর ছাড়িয়ে, হাঁস-মুরগির ঘর পেরিয়ে খানিকটা হেঁটে ছায়ায় এসে দাঁড়াল ভিক্টর। এরই মধ্যে রোদ কেমন চড়ে উঠেছে। আর খানিকটা বেলায় গনগন করবে। তবু এখানে অনেক আরাম। গাছপালা, মাটি, ছায়া, কলকাতার মতন আগুন ঠিকরোয় না রাস্তাঘাট, বাড়ি থেকে।

ছায়ায় দাঁড়িয়ে ভিক্টর আমবাগানের দিকে তাকাল। ওদিকে ছায়া বেশি। একটা কোকিল ডাকছে। কিংবা দুটো। বোঝার উপায় নেই।

সুজন নিজেই বলল, "সত্যি ভিক্টরদা, ব্যাপারটা, মানে পাংচারের ব্যাপারটা আমি এমন করে ভেবে দেখিনি।"

ভিক্টর সিগারেট ধরাল, "ওই লোকটা কে?"

"কোন লোক?"

ইশারায় একটা লোককে দেখাল ভিক্টর। কলাঝোপের দিকে কাজ করছে।

সুজন বলল, "জনার্দন।"

"বাগানে কাজ করে?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার বাগানে ক'জন কাজ করে?"

"জনাপাঁচেক।"

"সদানন্দ আর পুলিনকে ধরে?"

মাথা নাড়ল সুজন। বলল, "পুলিন বাগানের কাজ করে না। ঘরদোরের কাজ করে, ফাই-ফরমাশ খাটে, রান্নাবান্না। সদানন্দ মাজেসাঝে করে। তবে বাগানের কাজ এরা জানে না। জানে ওরা।" বলে সুজন আঙুল দিয়ে জনার্দনকে দেখাল।

"আঃ!" ভিক্টর যেন ধমক দিল, "হাত তুলে আঙুল দিয়ে কাউকে দেখাবে না। দেখালে সে বুঝতে পারবে আমরা তাকে নিয়ে কথা বলছি।...যাকগে, যে পাঁচজন তোমার বাগানে কাজ করে, তারা কি সবাই এখানে থাকে?"

"না," মাথা নাড়ল সুজন, "দু'জন থাকে। ওই যে খোলার চালের ঘর দেখছেন, ওখানে।"

"বাকিরা?"

"কাজ করতে আসে বাইরে থেকে। এদিকেই ওদের বাড়ি। গাঁয়ে।"

"কোন দু'জন থাকে?"

"রাখাল আর জনার্দন।"

"বাইরে থেকে কারা আসে?"

"দশরথ, বনমালী, খগেন।"

"এদের কারও সম্পর্কে তোমার কোনও সন্দেহ হয়? মানে, যারা তোমার এখানে আছে?"

সুজন একটু ভাবল। মাথা নেড়ে বলল, "আমি সেভাবে কিছু ভাবিনি ভিক্টরদা। সন্দেহ করিনি।"

"সন্দেহ করতে পারো?"

"ভেবে দেখতে হবে।"

"বেশ। চলো। আমি ওই জায়গাটা দেখতে চাই, যেখানে খুনখারাপি হয়েছিল।"

"চলুন।"

সুজন ভিক্টরকে নিয়ে এগিয়ে চলল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছে। এখনও গায়ে লাগার মতন গরম হয়নি। কতক কাক-চড়ুই ওড়াউড়ি করছে। আজ যেন গরম কমেছে সামান্য।

"সুজন, তোমায় কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব। খোলাখুলি জবাব দেবে? কিছু লুকোবে না?"

সুজন যেন খানিকটা অবাক হয়েই ভিক্টরকে দেখল। বলল, "আপনার কাছে কথা লুকোব! কেন?"

ভিক্টর একটু হাসল। বলল, "চোরের মন বোঁচকার দিকে। আমাদের সেই অবস্থা।

কাউকে সহজে বিশ্বাস করতে পারি না। যাকগে, বাজে কথা। কাজের কথা বলি। তোমার ওই শর্মা কাকাবাবু লোকটি কেমন?”

সুজন যেন প্রথমে কথাটা ধরতে পারেনি এমন চোখ করে তাকিয়ে থাকল। পরে বলল, “কাকাবাবুর কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?”

“আমার যা জিজ্ঞেস করার জিজ্ঞেস করব। তুমি জবাব দেবে। কেন জানতে চাইছি জিজ্ঞেস করবে না।”

সুজন বুঝতে পারল। মাথা নাড়ল। বলল, “আমার নিজের কাকা থাকলে যত নিজের হতেন, কাকাবাবু তার চেয়েও বেশি নিজের।”

“মানে তুমি ওঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করো।”

“করি।”

“উনি তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারেন না?”

“না।”

হাঁটতে হাঁটতে ফটক পর্যন্ত এসে গেল সুজনরা।

ভিক্টর বলল, “তোমাদের ব্যবসা তো পার্টনারশিপের। বিশ্বাস অ্যান্ড ব্যানার্জি।”

“হ্যাঁ।”

“এই ব্যবসা সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়? কেমন চলছে? হালে কোনও গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েছে কি না, শুনেছ কিছু?”

মাথা নাড়ল সুজন। বলল, “ব্যবসার ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। আমার ভাল লাগে না একেবারে। কাকাবাবু আর ঠাকুমাই যা বোঝেন।”

“তোমাদের যে অন্য পার্টনার, মানে ব্যানার্জিরা...”

বাধা দিয়ে সুজন বলল, “ভিক্টরদা, আমি আপনাকে সত্যি বলছি, আমাদের ব্যবসার আদার মানে অন্য পার্টনার হলেন যুগল-জ্যাঠা। যুগলকিশোর ব্যানার্জি। যুগল জ্যাঠা প্রায় অন্ধ এখন। ছানি অপারেশান করিয়েছিলেন গত বছর। আনসাকসেসফুল। কেন কে জানে! অন্য চোখটাতেও ছানি পড়েছে। ভাল দেখতে পান না। আমাদের ব্যবসার ব্যাপারটা এখন যুগল জ্যাঠার ভাগ্নে দ্যাখে।”

“ভাগ্নে কেন?”

“যুগল জ্যাঠার এক ছেলে ছিল। মারা গিয়েছে। ছেলে মারা যাবার পর জ্যাঠা ভাগ্নেকেই আঁকড়ে ধরেছেন। ভাগ্নেই তাঁর ছেলে বলতে পারেন।”

“নাম কী তার?”

“অর্ধেন্দু। ...আমরা বলি মেজদা।”

“বয়স কত? কেমন লোক?”

“বয়স আমার চেয়ে বেশি। বত্রিশ-তেত্রিশ হবে।...লোক খারাপ নয়। তবে রুক্ষ, গরম মেজাজের। কথাবার্তা কাঠখোট্টা ধরনের। এমনিতে মেজদাকে ভাল লাগে না, তার ব্যবহারের জন্যে। তবে মানুষ খারাপ নয়।”

“তোমার সঙ্গে সদ্ভাব আছে?”

“সদ্ভাব মানে...মানে এমনিতে ঠিকই। তবে আমি ওদিকে বড় একটা মাড়াই না।”

"চতুর লোক?"

"হ্যাঁ। বেশ চতুর।"

"ফন্দিবাজ।"

"ফন্দিবাজ! ...তা কেমন করে বলব?"

"তুমি যে হঠাৎ এইরকম একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে, তা তোমার যুগল জ্যাঠা কিংবা তাঁর ভাগ্নে অর্ধেন্দু, মানে ওই মেজদা, তোমার খবর নিতে এসেছিল?"

সুজন ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, "না। কাকার কাছ থেকে যুগল জ্যাঠা খবর পান। আসতে পারেন না, ওঁর আবার হার্টের অসুখ। মেজদা আসেনি, তবে একটা চিঠি পাঠিয়েছে।"

"আসতে পারেনি কেন?"

"হাত ভেঙেছে। বাঁ হাত। বাড়িতে রয়েছে।"

"হাত ভাঙল কেমন করে?"

"পড়ে গিয়ে।" সুজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত দিয়ে সামান্য দূরে একটা গাছ দেখাল। বলল, "ওই যে গাছটা দেখছেন, ওখানেই খুন হয়েছিল।"

ভিক্টরও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। চারপাশ তাকিয়ে দেখল। সুজনের বাগানের সীমানা থেকে পঞ্চাশ কি পঁচাত্তর গজ হবে। পঁচাত্তরের মতন। একেবারে নেড়া মাঠ নয় এখানটায়। দু-চারটে ঝোপঝাড় রয়েছে। তবে আগাছার জঙ্গলে যে সব ভরে আছে, তা বলা যাবে না।

ভাল করে চারপাশ দেখতে দেখতে ভিক্টর এগিয়ে চলল। মেঠো রাস্তা। পায়ে-চলা পথের দাগ। ঘাস যেন রোদের তেজে পুড়ে গিয়েছে, মাটি রুক্ষ। ধুলো রয়েছে।

গাছের কাছে এসে ভিক্টর বলল, "জামগাছ?"

"হ্যাঁ।"

"বড় গাছ বলতে এখানে আর তো কিছু দেখছি না। একটা বটগাছ, তা ওটা তো তফাতে।"

সুজন মাথা নাড়ল।

জামগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ভিক্টর মন দিয়ে জায়গাটা দেখল। "লোকটা ঠিক কোথায় পড়ে ছিল? মানে তোমরা কোথায় পড়ে থাকতে দেখেছ?"

সুজন ক'পা এগিয়ে জায়গাটা দেখাল।

"কেমনভাবে পড়ে ছিল? মুখ থুবড়ে, না পাশ হয়ে?"

"মুখ থুবড়ে। ঘাড় একটু কাত হয়ে ছিল।"

"রক্তটক্ত দেখেছ?"

"ছিল হয়তো মাথার দিকে। শুকিয়ে গিয়েছিল। আমরা কেউ নাড়াচাড়া করিনি। খুনখারাপির ব্যাপার।"

"পুলিশে খবর দিয়েছিল কে?"

"আমি জানি না। কেউ দিয়েছিল।"

"তোমার লোকরা নয়?"

"আমার লোকরা খবর দিতে গিয়ে শোনে পুলিশ খবর পেয়ে গেছে। তারা আসছে। তা ধরুন, পুলিশের আসতে আসতে খানিকটা বেলাই হল। আটটা নাগাদ এল।"

ভিক্টর খুব নজর করে মৃতদেহ পড়ে থাকার জায়গাটা দেখতে লাগল। জামগাছ থেকে আট-দশ পা দূর।

"তোমার ছাতা আর টর্চ কোথায় পড়ে ছিল?"

"ছাতাটা ছিল ওইখানে", বলে আঙুল দিয়ে জায়গাটা দেখাল, "আর টর্চটা লোকটার পাশে। বুকের কাছে।"

ভিক্টর আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। ভাবুকের মতন থুতনিতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। এ-পাশ ও-পাশ ঘুরল। মাটিতে বসে পড়ল। দেখল। বলল, "সেদিন ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। মাটি নিশ্চয় কাদা কাদা হয়ে গিয়েছিল। পায়ের দাগ পাওয়া উচিত। তা ছাড়া যদি ধস্তাধস্তি হয়ে থাকে, তার দাগও। পুলিশ নিশ্চয় সব দেখেছে?"

সুজন বলল, "পায়ের দাগ দেখে কী বুঝবে? লোকজন ওই রাস্তা ধরেই হাঁটে। দাগ তো থাকবেই।"

"ভিজে মাটি, কাদায় আরও স্পষ্ট করে থাকা দরকার।"

সুজন হঠাৎ বলল, "ভিক্টরদা, আজকাল খালি পায়ে কেউ বড় হাঁটে না। কমপক্ষে হাওয়াই চপ্পল পায়ে থাকে। জুতোর দাগ ছিল।"

ভিক্টর হেসে ফেলল, "ওই একই হল প্রায়। আমি ভাবছিলাম, যদি ধস্তাধস্তির কোনও দাগ পাওয়া যায়।"

"এই ব্যাপারটা আমি ঠিক বলতে পারব না। পুলিশ পারবে।"

ভিক্টর আর কিছু বলল না। আশেপাশে ঘুরতে লাগল। দেখতে লাগল চারপাশ। গাছের গুঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কী যেন ভাবল। মাথা তুলে দেখল গাছটা। ডালপালায় ভর্তি। ঘন পাতা যেন গাছের মাথা অন্ধকার করে রেখেছে।

হঠাৎ কী যেন নজরে পড়ল ভিক্টরের। "ওটা কী?" বলে খানিকটা দূরে এক ইটের স্তূপ দেখাল।

সুজন দেখল। বলল, "ওটা ইটের পাঁজা। পাঁজা মানে, ওখানে কেউ বোধ হয় একটা কিছু করবে ভেবেছিল, শিব বা শেতলার মন্দির। মন্দির আর হয়ে ওঠেনি। ভিত গড়তে গড়তেই বন্ধ হয়ে গেল। ইট পড়ে থাকল পাঁচ-সাতশো। চেহারা দেখে বুঝছেন না? ইটগুলো কালো হয়ে গিয়েছে।"

ধীরে ধীরে রোদ চড়ে ওঠায় গরম লাগছিল। বাতাস আছে। কিন্তু গরম। ঘাম হচ্ছিল।

ভিক্টর বলল, "তুমি যাও। আমি এদিকে একটু ঘুরে দেখি।"

"এই রোদে কত ঘুরবেন?"

"অভ্যেস আছে আমার। তুমি যাও। শোনো, একটা কথা বলি। তোমার বাগানে যারা কাজকর্ম করে, তাদের কাছে কখনও কোনও সন্দেহ প্রকাশ করবে না। যেমন

ছিলে, সেইভাবে থাকবে। আর আমার কথা যদি কেউ জানতে চায়, বলবে...” ভিক্টর একটু ভাবল, বলল, “বলবে, আমি একজন খরিদ্দার। আমি বাগান কেনার কথা ভাবছি। তোমার কাকাবাবু আমায় বাগান দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন। আর তোমাদের ব্যবসাই তো সম্পত্তি বেচাকেনার।”

মাথা হেলিয়ে সুজন বলল, “ওরা বিশ্বাস করবে?”

“না করে না করবে। বাগানের কাছে খুনখারাপি দেখে তুমি বিরক্ত হয়েছ, কিংবা ধরো ভয় পেয়েছ। তোমার ঠাকুমা এ-বাগান রাখতে দেবেন না। বাগান বেচে দেবার কথা ভাবছ তোমরা, এমন তো হতেই পারে।”

সুজন কথা বাড়াল না। বাগানের দিকে পা বাড়াল।

ভিক্টর দাঁড়িয়ে থাকল। আবার একটা সিগারেট ধরাল।

আধাআধি সিগারেটটা খেল। বাকিটা ফেলে দিল। দিয়ে প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল।

তার পকেটে একটা দূরবিন আছে। ম্যাক্স ফ্লাই দূরবিন। দেখতে ছোটখাটো, কিন্তু খুব কাজের। বিদেশি জিনিস। গত যুদ্ধের সময় প্রথমে এই ধরনের দূরবিন চালু হয়। পরে তার কলকব্জাকে আরও জোরদার করা হয়েছে। ব্যবহার করার পক্ষে আরও সুবিধেজনক।

ভিক্টর দূরবিন লাগাল চোখে। দেখতে লাগল। দূরের জিনিস যেন নাকের কাছে চলে এসেছে। সবই স্পষ্ট। ঝোপঝাড়, মাঠ, ইটের পাঁজা, বটগাছ, সবই তার হাতের নাগালের মধ্যে মনে হচ্ছে। দেখতে দেখতে ভিক্টর একটি জায়গায় এসে আর চোখ সরাল না। দেখল, দেখতে লাগল। তারপর দূরবিন নামিয়ে এগিয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

ভিক্টর বাড়ি ফিরেছিল শেষ বিকেলে।

রাস্তায় তার স্কুটারটা গোলমাল না করলে আর খানিকটা আগে ফেরা যেত। কালই মিস্ত্রিকে দিয়ে দেখিয়ে নেবে স্কুটার। তেলের গোলমাল হচ্ছে বোধ হয়। সামান্য ব্যাপার।

বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নিল খানিকক্ষণ। স্নান সারল। সন্ধে হয়ে আসছে প্রায়।

চা-খাবার খেয়ে ভাবছিল ছাদে গিয়ে পায়চারি করবে, এমন সময় নোটন এল।

“তুই এই ফিরলি?”

“হ্যাঁ,” বলে নোটন একটা বাঁধানো খাতা রাখল। বড় ডায়েরি-খাতার মতন দেখতে। বলল, “তোমার তিন নম্বর খাতা।”

“রেখে দে। আর কী খবর বল? হ্যারিসন রোড গিয়েছিলি?”

“তোমার পালবাবুকে ধরেছি।”

“ধরেছিস?”

নোটন এমন একটা ভাব করল যেন, এই সামান্য কাজটা করতে না পারলে তার

গলায় দড়ি দেওয়া উচিত ছিল। মুখের ভাব যেমনই হোক, নোটনকে বিস্তর খাটতে হয়েছে যে, সেটা সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে গেল।

নোটন বলল, "দাদা, বেনারসি শাড়ির দোকান ওদিকে পর পর। কোন দোকানে গিয়ে খোঁজ করব, কোথায় পাব পালবাবুকে, তা তো জানি না। আমি করলাম কী, রাস্তার একটা পাশ থেকে শুরু করলাম। ডান পাশ। শাড়ির দোকান দেখলেই ঢুকে যাই, পালবাবুর খোঁজ করি। ডান পাশে পেলাম না। তখন ধরলাম সিল্ক হাউসের রাস্তা। খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে কালীতলার কাছে দোকান পেলাম।"

"কালীতলা! সে কী রে?"

"তোমাদের কলকাতার লোকরা ওই রকমই। থাকে হেদো থেকে এক মাইল দূরে, জিজ্ঞেস করলে বলবে, হেদোর কাছে থাকি।"

ভিক্টর বলল, "না রে, আমাদেরও ভুল হতে পারে। হ্যারিসন রোড বলে শুনতাম। তবে বোধ হয়..."

"ব্যাপারটা শোনো। পালবাবুদের আদি দোকান হ্যারিসন রোডেই ছিল। পরে শরিকি ঝগড়াঝাঁটিতে দোকান উঠে যায়। এক ভাই কালীতলার কাছে ঘর নিয়ে দোকান করে।"

"তাই বল। পালবাবুকে পেলি?"

"না। তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন। বাড়ি ছেড়ে বড় একটা বেরোন না। শরীরেও জুত নেই। থাকেন মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে। বাড়িতে গেলে দেখা হয়ে যাবে।"

"তুই গিয়েছিলি?"

"না। আমি গিয়ে কী করব! তোমার কী কাজ আমায় বলোনি।"

"ঠিক আছে। তুই এখন যা। পরে কথা বলব।"

নোটন চলে গেল।

ভিক্টর পালবাবুর কথা ভাবল। ভদ্রলোক ভিক্টরকে নিশ্চয় চিনতে পারবেন। একসময় অত আসা-যাওয়া ছিল এ-বাড়িতে।

পালবাবুর কাছে ভিক্টর কালই যাবে। কিন্তু দেখা করলেই যে কাজ হবে এমন নয়। পালবাবু নিজে একসময় বিষয়সম্পত্তি বিক্রিবাটার নানান খোঁজখবর রাখতেন। হয়তো দালালি করতেন। বিশ্বাস অ্যান্ড ব্যানার্জি কোম্পানির কথা তাঁর জানা থাকতে পারে। অন্তত নাম নিশ্চয় শুনেছেন।

ভিক্টর জানে, ব্যবসাপত্র, কোম্পানি, মালিকানা, এ-সব জিনিসের মধ্যে শরিকি ব্যাপার থাকলেই একটা না একটা গণ্ডগোল লেগে যায়। বিশ্বাস-ব্যানার্জির মধ্যে নেই, সে-কথা কে বলবে। বলতে পারেন মাধবচন্দ্র শর্মা। তিনি পুরনো কর্মচারী, বিশ্বস্ত, সুজনদের তরফের লোক; তাঁর জানা সম্ভব। কিন্তু ভদ্রলোক এখনও পর্যন্ত নিজে থেকে কিছু বলেননি। কেন বলেননি? তা হলে কি কোনও গণ্ডগোল নেই? না, ঠিক এখনই উনি নিজেদের কোম্পানির কথা বলতে চান না।

শর্মাবাবুর সঙ্গে কাল ভিক্টরের দেখা হবার কথা।

ভিক্টর এখন আর পালবাবু-শর্মাবাবুর কথা ভাবতে রাজি নয়। বরং সে ভাবছে,

আজ যে দুটি জিনিস সে উদ্ধার করেছে, তার সঙ্গে সুজনের বাগানের কাছে মানুষ খুনের যে ঘটনাটি ঘটেছে, তার সম্পর্ক আছে কি না।

বাঁধানো দাঁতের একটা টুকরো, আর চশমার কাচের টুকরো টাকরা থেকে কিছু কি উদ্ধার করা যাবে?

যে যাই বলুক, ভিক্টরের ম্যাক্সফ্লাই দারুণ জিনিস। এর তুলনা নেই। ফিল্ড বায়নাকুলার নানারকমের হয়, হতে পারে, ভিক্টর জানে না; কিন্তু তার এই দূরবিন, ম্যাক্সফ্লাই, পয়লা নম্বরের জিনিস। না হলে, বাঁধানো দাঁতের একটা টুকরো চোখে পড়ত না। আকন্দগাছের ছোট্ট একটু ঝোপ, তার তলায় ওটা পড়ে ছিল। বাঁধানো দাঁতের বড়সড় পাটি হলে কার না নজরে পড়বে? পুলিশেরও নিশ্চয় পড়ত। এ একেবারে ছোট্ট জিনিস। একটি মাত্র দাঁত, পাটি ছোট, দেড় ইঞ্চি মতন। সামনের দাঁত, নীচের। ধুলোয় মাটিতে নোংরায় পড়ে থাকতে থাকতে একেবারে কালচে চেহারা হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া, ভিক্টরের ধারণা, ওই দাঁতের মালিক নিশ্চয় পান খেত। পান খাওয়া দাঁতের ছোপ রয়েছে ওতে। আসল দাঁতে যত না ছোপ ধরে, নকল দাঁতে তার চেয়েও বেশি ধরে। সাধে কি নকল দাঁতওলারা রোজ ময়লা পরিষ্কারের পাউডার দিয়ে নকল দাঁত পরিষ্কার করে।

এই দাঁতের টুকরো ও-রকম একটা জায়গায় কেমন করে গেল? ওটা কার?

দু' নম্বর হল চশমার কাচের ভাঙা টুকরো। সেটাই বা মরা ঘাসের পাশে পড়ে ছিল কেন? কার চশমা?

ভিক্টর দুটো জিনিসই তুলে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। সুজনকেও কিছু বলেনি। এখন বলার দরকার নেই। চশমার কাচের টুকরোগুলো কাল সে তার বন্ধু অনন্তর কাছে পাঠাবে। কত পাওয়ার জানা দরকার। ভিক্টর নিজে যা অনুমান করছে, মোটামুটি পাওয়ার আছে। দূরের জিনিস দেখার জন্যে। ডিসটান্ট ভিশান গ্লাস বলতে যা বোঝায় আর কী!

এই দুটো জিনিস কবে, কখন, কেমন করে ওই খুনের জায়গার কাছাকাছি গিয়ে পড়ল, তা জানা দরকার। এটা খুবই আশ্চর্যের কথা, খুনের জায়গা থেকে বড় জোর গজ আট-দশ দূরে পড়ে ছিল, চোখের আড়ালে। পুলিশের নজরে আসেনি। তবে, তেমন তেমন পুলিশ হলে নজরে পড়ে যেত। অবশ্য, এমনভাবে ছিল ওগুলো যে, চট করে ঠাওর করাও যায় না।

আরও একটা জিনিস ভিক্টরের নজরে পড়েছে। ওই যে কিছু পুরনো ইট স্তূপ হয়ে পড়ে আছে, সেই ইটের পাঁজার কাছে মাটিটা যেন অন্য রকম। মানে, খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছিল। একেবারে টাটকা খোঁড়াখুঁড়ি হলে ধরা যায় চট করে, কিন্তু পনেরো-বিশ দিন আগে যদি খোঁড়াখুঁড়ি হয়ে থাকে, তা হলে সহজে ধরা মুশকিল।

ভিক্টরের সন্দেহ হওয়ায় সে সুজনকে কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল। সুজন বলল, "যারা সাপ ধরে বেড়ায়, তাদের কাজ। ইটের পাঁজার কাছে সাপুড়ে এসে মাটি খুঁড়েছিল শুনেছি। এখন গরমকাল, মাঠেঘাটে এই সময় সাপ বেরোয়।"

"কবে এসেছিল সাপ ধরতে?"

"তা দিন বারো-চোদ্দো হবে।"

"খুনের ঘটনার পরে?"

"হ্যাঁ। পাঁচ-সাত দিন পরে।"

"সাপ পেয়েছিল?"

"শুনেছি পেয়েছিল।"

"কী সাপ?"

"কেউটে। আমি ঠিক জানি না।"

ভিক্টর আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

মাঠেঘাটে সাপ ধরে বেড়ায় এমন লোক ভিক্টর কখনও দ্যাখেনি। কিন্তু এরা গর্ত খুঁড়ে সাপ ধরার পর যত্ন করে জায়গাটা বুজিয়ে দেয়, এমন নিয়ম আছে নাকি! কে জানে।

ভিক্টর প্রথমে শুনতে পায়নি। পরে শুনল। বারান্দা থেকে দিদি ডাকছে, "তোর ফোন।"

ভিক্টর উঠে পড়ল। তাদের বাড়ির ফোন ঘরের লাগোয়া ঢাকা বারান্দায় থাকে।

উঠে গিয়ে ফোন ধরল ভিক্টর।

"আমি শর্মা কথা বলছি।"

"মাধববাবু? বলুন?"

"আপনি গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। সারাদিন ছিলাম।"

"রাস্তা চিনতে অসুবিধে হয়নি?"

"না। একেবারেই নয়।"

মাধবচন্দ্র শর্মা যেন একটু চুপ করে থেকে পাশের কোনও লোকের সঙ্গে অস্পষ্টভাবে কী বলে নিলেন। তারপর ভিক্টরকে বললেন, "আমি কর্তামায়ের বাড়ি থেকে আপনাকে ফোন করছি। মা পাশেই আছেন। তিনি জানতে চাইছেন, সুজনের দুর্ভাবনা কমেছে কি না।"

ভিক্টর দুমুহূর্ত সময় নিয়ে বলল, "অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। ওঁকে বলে দিন, সুজন ভাল আছে।"

"আপনি ভরসা দিলেই আমরা..."

"শর্মাবাবু?"

"বলুন?"

"আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।"

"আপনি যখন বলবেন, দেখা করব।"

"কাল বিকেলে দেখা করুন।"

"আপনার অফিসে?"

"তা-ই আসুন। পাঁচটা নাগাদ। আমি থাকব।"

"যাব। পাঁচটার মধ্যেই।"

ভিক্টরের হঠাৎ কী খেয়াল হল, বলল, "একটা কথা আমায় বলুন তো, আমি যে সুজনের হয়ে কাজ করছি, মানে আপনাদের হয়ে, এটা কি আপনাদের যুগলবাবু, তাঁর ভাগ্নে অর্ধেন্দু জানেন?"

শর্মা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। তারপর নিচু গলায় বললেন, "ওঁদের কিছু বলা হয়নি। কর্তামা নিষেধ করেছেন।"

"কেন?"

"কেন—সে অনেক কথা ভিক্টরবাবু।"

"কাল আপনি আমাকে ওই কথাগুলোই বলবেন। আমি আপনাদের কোম্পানির ব্যাপারে ভাল করে জানতে চাই।"

শর্মা বললেন, "জানাব, আমি যা জানি।"

ফোন রেখে দিতে গিয়ে ভিক্টরের কী মনে হল, আচমকা বলল, "শর্মাবাবু, আপনাদের অর্ধেন্দুবাবু অফিসে আসেন?"

শর্মা যেন ইতস্তত করলেন, "এখন আসছেন না।"

"হাত ভেঙেছে বলে?"

"আপনি কেমন করে জানলেন?"

"সুজনের কাছে শুনলাম। কত দিন আসছেন না?"

"তা...তা হপ্তা-তিনেক হবে। কেন বলুন তো?

"এমনি," ভিক্টর হালকা করে বলল, "এখন তা হলে ফোন রাখছি।"

ফোন রেখে দিল ভিক্টর।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল সামান্য। তাদের এই বারান্দাটা বেশ। সেকেলে বাড়ির বারান্দা যেমন হয়। বারান্দাটা দক্ষিণমুখো। নীচে লোহার রেলিং। ওপরে কাঠের খড়খড়ি। এই বারান্দায় দিদি কয়েকটা টব রেখেছে পাতাবাহারের। একটুআধটু বাতাসও আসছিল এখন।

অল্প দাঁড়িয়ে থেকে ভিক্টর ঘরে এল। সিগারেট ধরাল একটা। তারপর নোটনের আনা খাতাটা টেনে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

এই খাতাটা আসলে এক ধরনের রেজিস্টার। ভিক্টর নিজেই তৈরি করেছে। এতে প্রয়োজনীয় নানান লোকের নাম ঠিকানা পেশা লেখা আছে। সেইসঙ্গে রয়েছে কিছু বিশেষ তথ্য। যেমন ধরে নেওয়া যাক, ফৌজদারি মামলা করেন, নাম করেছেন, উকিল একটা মামলায় তাক লাগিয়ে দিয়েছেন—এমন একজন জটিল ব্যারিস্টার দরকার। ভিক্টরের এই খাতায় তাঁর খবরাখবর পাওয়া যাবে। হয়তো এমন একজন জহুরি দরকার, যিনি কলকাতা শহরে সেরা দশজন জহুরির একজন। এই খাতায় তেমন জহুরির খবর পাওয়া যাবে।

ভিক্টর খাতার পাতা ওলটাতে লাগল। পালবাবুর কাছে কতটা সাহায্য পাওয়া যাবে ভিক্টর জানে না। হয়তো কিছুই পাওয়া যাবে না। কিন্তু ভিক্টরের এমন একজনকে দরকার, যে বিষয়-সম্পত্তি কেনাবেচার খোঁজখবর রাখে, এবং নিজে বড় ধরনের দালাল। দেখা যাক এমন কাউকে পাওয়া যায় কি না।

॥ ছয় ॥

পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা। ভিক্টর ঘড়ি দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে উঠল। শর্মাবাবুর হল কী?

ছ'টাও বাজতে চলল প্রায়। শর্মাবাবুর দেখা নেই। ভদ্রলোকের আসার কথা পাঁচটা নাগাদ। সেখানে ছ'টা। এত দেরি কেন? রাস্তায় আটকে গেছেন? কলকাতার রাস্তাঘাটের যা হাল, আটকে যাওয়া অসম্ভব নয়। ভিক্টর সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত দেখবে। এর মধ্যে শর্মাবাবু এলেন ভাল, না এলে আর অপেক্ষা করতে পারবে না ভিক্টর। তাকে অন্য কাজে বেরোতে হবে।

নোটন আর এক দফা চা করেছিল। ভিক্টরকে দিল। বলল, "অফিস বন্ধ করব না?"

"আর খানিকটা দেখি।"

"তুমি সোজা বাড়ি যাবে?"

"না। তুই সোজা বাড়ি চলে যাস। দিদিকে বলিস, আমার ফিরতে ফিরতে আট-সাড়ে আট হবে। আমার কাজ আছে। পালবাবুর কাছেও যাব একবার।"

নোটন ঘর ছেড়ে বাইরে গেল। গল্পগুজব করে সময় কাটাবে।

চা শেষ করে ভিক্টর মশলা মুখে দিচ্ছে, নোটন এসে বলল, "দাদা, ভদ্রলোক আসছেন।"

"ঠিক আছে। ওঁকে একটু চা খাওয়াস।"

নোটন চলে যাচ্ছিল, মাধব শর্মা ঘরে এলেন।

ভিক্টর বলল, "এত দেরি?"

নোটন চলে গেল।

শর্মাবাবুকে অস্থির দেখাচ্ছিল। কী যেন হয়েছে!

ভিক্টর শর্মাবাবুর মুখ চোখ দেখে বুঝতে পারছিল, কিছু একটা হয়েছে। জিজ্ঞাসু চোখে সে চেয়ে রইল। কী হয়েছে বুঝতে পারছিল না।

শর্মা বসলেন। তাকালেন। "আমায় একটু জল খাওয়াতে পারেন?"

ভিক্টর নোটনকে ডাকল না। নিজেই উঠল। ঘরে জল আছে। কাচের গ্লাসে জল গড়িয়ে শর্মাকে দিল।

জল খেয়ে শর্মা নিশ্বাস ফেললেন। স্বস্তির।

ভিক্টর বলল, "কী ব্যাপার মাধববাবু?"

মাধবচন্দ্র শর্মা কপালে হাত দিলেন, বললেন, "ওঁরা তো জেনে গেছেন।"

"ওঁরা! কে ওঁরা? কী জেনেছেন?"

শর্মা বললেন, "আপনার কথা। আমরা যে আপনাকে সুজনের বাগানে নিয়ে গিয়েছি, এই কথাটা বড়বাবু...মানে যুগলবাবুরা জেনে গেছেন।"

ভিক্টর বলল, "তাকে ক্ষতি কী হয়েছে?"

শর্মা মাথা নাড়লেন, "কর্তামা কথাটা বড়বাবুদের জানাতে চাননি। তিনি

চেয়েছিলেন যা করার গোপনে করতে।”

“গোপনে সবকিছু করা যায় না মাধববাবু। এটা ওঁরা জানতে পারতেন। হয় আজ না হয় কাল,” বলে ভিক্টর একটু থামল। পরে বলল, “ওঁরা জানায় ক্ষতি কী হয়েছে?”

শর্মা বললেন, “বড়বাবু...যুগলবাবু আজ আমায় বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেখান থেকেই আমি আসছি। বড়বাবু দেখলাম খুবই অসন্তুষ্ট। বললেন, সুজন তো তাঁরই ছেলের মতন। সুজনের সম্পর্কে কথা বলার অধিকার নিশ্চয় তার ঠাকুমার রয়েছে। তা বলে বড়বাবুকে একটিবার না বলে আমরা যে একটা প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগাব সুজনের জন্যে, এটা তিনি পছন্দ করেননি। ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। সুজনের বাগানের কাছে একটা লোক খুন হয়েছে। হতেই পারে। পুলিশ গিয়ে তাকে দুটো কথা জিজ্ঞেস করেছে, এতে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হল। আমার বাড়ির দরজায় যদি কেউ খুন হয়, পুলিশ এসে আমায় পাঁচটা কথা জিজ্ঞেস করতেই পারে। তার মানে এই নয় যে, পুলিশ সুজনকে মার্ডার চার্জে ফেলছে।”

ভিক্টর কথাগুলো শুনতে শুনতে সিগারেট ধরাল। বলল, “তারপর?”

“তারপর আর কী! আমার অবস্থাটা কেমন দাঁড়াল বুঝতেই পারছেন! ওঁদের কাছে আমি হয়ে থাকলাম পরামর্শদাতা। কর্তামাকে পরামর্শ দিয়ে এ-কাজ আমিই করিয়েছি। বড়বাবু তা-ই বললেন।”

“না হয় তাই হলেন। অন্যায় তো কিছু করেননি।”

শর্মা চুপ করে থাকলেন। কী যেন ভাবছিলেন। পরে বললেন, “আপনি ঠিকই বলেছেন, কথাটা বড়বাবুরা আজ না হয় কাল জানতে পারতেন। কর্তামাকে আমি সে-কথা বলেও ছিলাম। উনি জেদ ধরলেন...”

নোটন এক কাপ চা এনে শর্মার সামনে রেখে দিল। দিয়ে চলে গেল।

শর্মা ভিক্টরকে বলল, “আপনি খাবেন না?”

“এইমাত্র খেয়েছি। আপনি খান।” ভিক্টর সামান্য অপেক্ষা করল। তারপর বলল, “শর্মাবাবু, আপনাদের বিশ্বাস-ব্যানার্জি কোম্পানি নিয়ে আমার কিছু জানার ছিল। এখন মনে হচ্ছে, অংশীদারদের মধ্যে সদ্ভাব...”

চায়ে চুমুক দিয়েছিলেন শর্মা। হাত তুলে বাধা দিলেন। বললেন, “সদ্ভাব! ঘরের কথা বাইরে বলতে ইচ্ছে করে না মশাই! যাদের নুন খাই, তাদের নিন্দে করে বেড়ানো উচিত নয়। কিন্তু অসহ্য হলে করতেই হয়। আমি নিজের বড়াই করতে চাই না। তবে কর্তামা না থাকলে আর আমি না থাকলে সুজন আজ পথে বসত। ধরণীদা...সুজনের বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, তখন বড়বাবুকে দেখেছি, আর ধরণীদা মারা যাবার দু-চার বছর পর থেকেই দেখছি বড়বাবুকে। মানুষ কেমনভাবে পালটে যায়। আমি আপনাকে বলছি ভিক্টরবাবু, কর্তামা'র মতন বুদ্ধিমতী, একরোখা মানুষ যদি না থাকতেন, আমরা ভেসে যেতাম। ধরুন, এই যে আমি, আমাকে কি আর বড়বাবুরা রাখতেন। কবেই তাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু কর্তামা'র জন্যে পারেননি। কর্তামা সোজা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের তরফের লোক আমি, আমি ওঁদের হয়ে কাজকর্ম

দেখাশোনা করব।”

“আপনি তা হলে আইন-মাফিক বিশ্বাসদের তরফের লোক?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“ব্যানার্জিরা কী চান? মানে ওঁদের উদ্দেশ্য কী ছিল?”

“ওঁরা চেয়েছিলেন কোম্পানির পুরো মালিকানা।”

“বিশ্বাসদের অংশ কিনে নিতে চেয়েছিলেন?”

“ঠকিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। লাখ দুই টাকা দিয়ে বিশ্বাসদের হটাতে চেয়েছিলেন।”

ভিক্টর টেবিল থেকে পেনসিলটা তুলে মাথা চুলকোতে লাগল। বলল, “আপনাদের কোম্পানির লাভ টাভ, আয় কেমন? মানে বছরে? গড়পড়তা আয়?”

“অ্যাভারেজ!” শর্মা বললেন। চা শেষ হয়েছিল। নস্যির ডিবে বার করলেন। বললেন, “আগে আগে ভালই ছিল। আমরা দেড় থেকে দু’পার্সেন্ট কমিশনে কাজ করতাম। তা ধরুন বছরে, কম করেও পঁচিশ-তিরিশ লাখ টাকার কাজ-কারবার হত। তখন লোকের হাতে পয়সা ছিল। আমাদের কোম্পানির নিট আয় থাকত হাজার পঁচিশ-তিরিশ। এর ওপর ছিল বায়না দিয়ে সম্পত্তি ধরা, তারপর সেটা বিক্রি করা। তাতে ভাল টাকা আসত। মোটামুটি পঞ্চাশ-ষাট হাজার ইনকাম ছিল বছরে।”

“খুব বেশি তো নয়! এখন কত?”

শর্মা যেন একটু হাসলেন। বললেন, “আজ টাকার দাম নেই। খোলামকুচি হয়ে গেছে স্যার। বিশ-বাইশ বছর আগেও পঞ্চাশ-ষাট হাজার কম ছিল না। তা ছাড়া আপনি শুধু কমিশনের আয় দেখছেন। যেটা খাতায়-পত্রে থাকত। এর বাইরেও ব্যবস্থা থাকত। কাঁচা টাকার ব্যবস্থা।”

ভিক্টর বুঝতে পারল না। বলল, “মানে?”

“মানে? মানে, ধরুন একটা সম্পত্তি কেনার জন্যে দুটো পার্টি রয়েছে। রাম আর শ্যাম। কমিশনের বাইরে কোন পার্টি কতটা বার করতে পারে, তাই নিয়ে ডিল হত। সেটা কাঁচা টাকায়। যার সম্পত্তি বেচা হত, তাকেও কিছু ছাড়তে হত। এগুলো সবই খাতাপত্রের হিসেবের বাইরে।”

ভিক্টর বুঝতে পারল।

সামান্য চুপচাপ। তারপর ভিক্টর বলল, “আমি কি তা হলে ধরে নেব, ব্যানার্জিদের তরফ থেকে বিশ্বাসদের হটানোর একটা চেষ্টা অনেকদিন ধরেই ছিল? এখনও আছে?”

“হ্যাঁ।”

“কোম্পানির অবস্থা এখন কেমন?”

“ভাল নয়।”

“আর?”

“দুটো বড় মামলা চলছে। ধরে নিতে পারেন, কোম্পানি জাল-জুয়াচুরি করার মামলায় জড়িয়ে পড়েছে। উকিল-ব্যারিস্টারে টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে হুহু করে। ওদিকে

বড়বাবু আর তাঁর ভাগ্নেতে মিলে কাঁচা টাকা সরিয়েছেন অনেক। আমার আড়ালে এ-সব হয়েছে।”

ভিক্টর যেন একটা রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিল অস্পষ্টভাবে। মালিকানার লড়াই নাকি? সুজনকে...? কিন্তু তা কেমন করে হবে? সুজনকে যদি হটাবার ইচ্ছে থাকত, তাকেই খুন করার চেষ্টা করত। সুজনের বাগানের সামনে অন্য একটা লোককে খুন করা কেন?

ভিক্টর বলল, “সুজনকে আপনাদের বড়বাবু পছন্দ করেন?”

“মোটেই নয়।”

“তাঁর ভাগ্নে অর্ধেন্দু?”

“ওটা তো পয়লা নম্বরের শয়তান। মামার যা-ও বা দু-একটা গুণ আছে, ভাগ্নের স্বভাবে ছিটেফোঁটা সভ্যতা-ভদ্রতা নেই। হাড়বজ্জাত, শয়তান।”

“শর্মাবাবু, আপনি আমায় একটা কথা খোলাখুলি বলুন। সুজনকে কি আপনার বড়বাবুরা...”

ভিক্টরকে কথা শেষ করতে দিলেন না শর্মা। বাধা দিয়ে বললেন, “আমি আপনাকে বলিনি। ভেবেছিলাম আগ বাড়িয়ে বলব না এখন। কিন্তু না বলে পারছি না।” শর্মাবাবু একটু চুপ করে থাকলেন, তারপর সরাসরি তাকালেন ভিক্টরের দিকে। বললেন, “সুজন যখন বাগানটা কেনে, কর্তামা বলেন, টাকাটা কোম্পানি থেকে নিতে। বিশ্বাসদের পাওনা টাকার বেশির ভাগটাই কোম্পানিতে পড়ে ছিল। অল্পস্বল্প দিত। বাকিটা দেব-দিচ্ছি করে আটকে রাখত। আমি সুজনের কথা বড়বাবুকে বলি। উনি ভীষণ রেগে যান। বলেন, টাকা দিতে পারবেন না। অর্ধেন্দু তো আমাকে জুতো মারতে বাকি রেখেছিল। আমি কর্তামা'কে বললাম সব কথা। কর্তামা নাতিকে ডেকে বললেন, “তুই যাবি, গিয়ে টাকা চেয়ে নিবি। যদি না দিতে চায়, বলবি, আমি এখনও মরিনি। যুগলকে আমি রাস্তায় নামিয়ে ছাড়ব।”

“সুজন গিয়েছিল?”

“হ্যাঁ। খানিকটা চটেমটেই গিয়েছিল দেখা করতে।”

“টাকাও পেল? কত টাকা?”

“বাগানটা সুজন কিনেছে হাজার পঁয়ত্রিশ টাকায়। সব টাকাই তো বড়বাবুদের কাছ থেকে নিয়েছে। বাগানের জন্যে বাড়তি খরচ দিচ্ছেন কর্তামা।”

ভিক্টর বলল, “এই টাকা আদায় নিয়ে কোনও গণ্ডগোল করেছিল সুজন?”

শর্মাবাবু যেন বলব কি বলব-না করে শেষে বললেন, “দেখুন, ঠিক কী হয়েছিল, আমি জানি না। আমি ছিলাম না। কিন্তু পরে দেখেছি, বড়বাবু আর অর্ধেন্দু সুজনের ওপর খেপে রয়েছেন।”

ভিক্টর মোটামুটি আভাস পেয়ে গেল ব্যানার্জি-বিশ্বাসদের। আপাতত তার কৌতূহল খানিকটা মিটেছে।

ঘড়িতে পৌনে সাত। ভিক্টর বলল, “আমায় এক জায়গায় যেতে হবে।”

“চলুন। আমিও বাড়ি ফিরব।...কর্তামার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি।”

ভিক্টর উঠে দাঁড়াল।

শর্মাও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

নোটনকে ডাকল ভিক্টর। বলল, "অফিস বন্ধ কর। আমি কাজ সেরে বাড়ি ফিরব. দিদিকে বলিস, রাত হবে।"

বাইরে এসে শর্মা বললেন, "আপনি কোন দিকে যাবেন?"

"মধ্য কলকাতা। ঠনঠনিয়ার কাছে।"

"আমি ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিলাম। গাড়ি থাকলে আপনাকে পৌঁছে দিতাম।"

"না না। আমার কোনও অসুবিধা হবে না। আমিই বরং ট্যাক্সি ধরি। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি।"

শর্মা হঠাৎ বললেন, "সময় মন্দ হলে লোকসানের শেষ থাকে না। সেদিন অদ্ভুতভাবে আগুন লেগে গেল আমাদের গাড়িতে। পুড়ে ছাই হয়ে যেতে বসেছিল।"

ভিক্টর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, "আগুন লেগে গেল মানে?"

"ইলেকট্রিক তারের কী-সব গণ্ডগোল হয়েছিল। স্টার্ট করার সঙ্গে সঙ্গে দপ করে আগুন লেগে গেল। জোর বেঁচে গিয়েছি মশাই।"

"গাড়ি আপনাদের কোম্পানির?"

"না না, সুজনদের। কর্তামা মাঝে-মধ্যে একটু বেরোন। দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়। কখনও কারও সঙ্গে দেখা করতে যান। নয়তো বাড়িতে পড়ে থাকে গাড়িটা।"

রাস্তায় নামতেই একটা ফাঁকা ট্যাক্সি পেয়ে গেল ভিক্টর।

॥ সাত ॥

দিন চার-পাঁচ ভিক্টর আর দেখা করতে পারেনি সুজনের সঙ্গে। দেখা না করুক, সুজনের ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

সেদিন রবিবার। দুপুরটা ঘোলাটে হয়ে ছিল। গুমোট প্রচণ্ড। বিকেলের গোড়ায় ভিক্টর নোটনকে ডাকল। বলল, "চল, একটু বেড়িয়ে আসি।"

"কোথায়?"

"চল না। বাইরের হাওয়া খেয়ে আসবি।"

"চলো।"

"একটু সেজেগুজে যাবি।"

"সেজেগুজে?"

ভিক্টর হাসল। বলল, "বুঝলি না?"

নোটন বুঝতে পারল। হেসে বলল, "পিকনিক?'

"হ্যাঁ। ছোট পিকনিক।"

এটা ওদের মধ্যে সাঁটের কথা। নোটন বুঝল, আজ দু-একটা মালমশলা নিয়ে দাদার সঙ্গে তাকে বেরোতে হবে। নোটন দুটো ব্যাপারে খুব ওস্তাদ। একটার নাম হাতিয়া। এটা এক ধরনের লাঠি-বিদ্যে। হাতখানেক, মানে ফুট-দুয়েক লম্বা একটা

লাঠির টুকরো বা রুল হল হাতিয়ার একমাত্র অস্ত্র। এর দু'পাশ সামান্য গোলমতন। মধ্যিখানে লোহার রিং পরানো। তাক করে ছুড়তে পারলে যে-কোনও মানুষকে জখম করা যায়। নোটন এই বিদ্যেটা রপ্ত করেছিল কম বয়েস থেকেই। তাদের ওখানে এটা ছিল বাহবা পাবার মতন বিদ্যে। নোটন অনেকবার হাতিয়া-র খেলা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে মহাবীর পার্টিকে। অন্য যে-বিদ্যেটা নোটন জানত, তাকে দেহাতিরা বলত, 'চিতি'। এ-জিনিস হল এক জাতের গুপ্তি। বিঘতখানেক লম্বা। পাতলা ফিনফিনে। অথচ ভারী। দু-ধারে ক্ষুরের মতন ধার। চামড়ার খাপে জিনিসটা রাখতে হয়। নোটন এই চাকুবিদ্যে বা গুপ্তিবিদ্যে জানত, তবে হাতিয়া'র মতন অতটা ওস্তাদ হতে পারেনি।

স্কুটার নিয়ে ভিক্টর আর নোটন যখন বেরোল, তখন বিকেল।

নোটন বলল, "আকাশটা দেখেছ। ঝড় হতে পারে।"

ভিক্টর বলল, "কালবৈশাখীর সময়। ঝড়বৃষ্টি হতেই পারে। চল, দেখা যাক, কী হয়।"

সুজনের বাগানে পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল শেষ। আলো মরে গিয়েছে।

এত তাড়াতাড়ি আলো মরার কথা নয় এখন। আজ আকাশ ঘোলাটে, মেঘ মেঘ ভাব, খানিকটা তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে এসেছে।

ভিক্টর ভাবতে পারেনি সুজনের কাছে এক পুলিশ অফিসারকে দেখতে পাবে। দেখে ঠিক অবাক হল না, তবে পছন্দ করল না।

সুজন আলাপ করিয়ে দিল, "মিস্টার সান্যাল।"

পুলিশ অফিসার সান্যালের বয়েস বেশি নয়। ভিক্টরের চেয়ে অবশ্য বড়। বছর চল্লিশ হবে বয়েস। চেহারাটি চমৎকার। কিন্তু চোখ দেখলেই বোঝা যায়, অতি ধূর্ত।

সান্যাল বললেন, "ইনিই তা হলে আপনার ব্যোমকেশ?" বলে মুখ টিপে হাসলেন।

সুজন কোনও কথা বলতে পারল না।

ভিক্টর ঘাবড়াল না। বলল, "আমার নাম ভিক্টর ঘোষ। কিছু মনে করবেন না, আমি লিগ্যাল প্রাইভেট ইনভেসটিগেটার।"

"আপনার সঙ্গী, না চেলা?" বলে নোটনকে দেখালেন সান্যাল।

"সঙ্গী।"

"তা আজ কী মনে করে?"

ভিক্টর স্পষ্টই বুঝতে পারল, এখানে তার আসা-যাওয়ার খবর এঁরা জানেন।

"মক্কেলের সঙ্গে কথা বলতে।"

"তা তো বুঝতেই পারছি। কী কথা? অফকোর্স যদি..."

"কথাটা এখন কেমন করে বলি সান্যালসাহেব?" বলে চোখের ইশারা করল নোটনকে, "তুই একবার পুকুরটা দেখে নে। মাছ ধরতে আসতে পারিস একদিন।" বলে সুজনের দিকে তাকাল, "ওর খুব মাছ ধরার নেশা।"

নোটন চলে যাচ্ছিল, সান্যাল বললেন, "সঙ্গী কি ছিপ ফেলতেও পারে?"

সুজন বলল, "তা পারে।"

নোটন চলে গেল।

সুজন বলল, "বসুন ভিক্টরদা।"

ভিক্টর বসল। সান্যাল যে তাকে লক্ষ করছেন, বুঝতে পারছিল ভিক্টর। ভদ্রলোক তাকে পছন্দ করছেন না। ভিক্টরও সান্যালকে খুশি মনে নিতে পারছে না।

সামনে চায়ের কাপ পড়ে ছিল। একটু আগেই চা খাওয়া হয়েছে। সান্যাল ধীরেসুস্থে সিগারেট ধরালেন।

"ভিক্টরসাহেবের অফিস কোথায়?" সান্যাল কেমন রগুড়ে গলায় বললেন।

ভিক্টর অফিসের ঠিকানা দিল।

"আজকাল কী হয়েছে বলুন তো? দেশটা কি ইংল্যান্ড-আমেরিকা হয়ে উঠল! কলকাতা শহরেই ডজনখানেক এজেন্সি। সবাই গোয়েন্দা হয়ে গেল যে!"

ভিক্টর নিজের সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, "যে রেটে ক্রাইম বাড়ছে, ক্রিমিন্যাল বাড়ছে, একা পুলিশ আর সামাল দিতে পারছে না! কী সান্যালসাহেব, ক'দিন আগে আপনাদের কনফারেন্সে কর্তারা কথাটা বলেছেন না?"

সান্যাল বললেন, "পুলিশ এখন কর্পোরেশনের লরি হয়ে গেছে। যত্ত ঝঞ্ঝাট সব পুলিশের। তা ভিক্টরসাহেব, এ-বিদ্যেয় আপনার হাতেখড়ি কবে?"

"নবিশ," ভিক্টর ঠাট্টা করে বলল।

"ও! ডালিমগাছে ফুল ধরেছে..." বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন। "তা পেলেন কিছু?"

"চেষ্টা করছি।"

"করুন। একটা কথা আপনাকে বলে দিই...।" সান্যাল হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর বললেন, "কীভাবে জখম করা হয়েছিল আপনি জানেন?"

"পেছন দিক থেকে মাথায় মেরে।"

"লোয়ার পার্ট অব দি হেড। ব্যাক সাইড। কিন্তু কী দিয়ে তা জানেন না?"

"কী দিয়ে?"

"লোহার বল।"

"লোহার রড দিয়ে নয়?"

"না।"

"মোজা, মাফলার কিংবা ছোট থলির মধ্যে লোহার বল বা ভারী পাথর পুরে মাথায় মারার কথা আমি পড়েছি। ও দিয়ে মানুষ খুন করা যায়। তবে এই জিনিসটা শুনেছি পুরনো ব্যাপার। ও-দেশে চলত একসময়।"

"এখানেও চলে। রেয়ার।"

'কিন্তু এগুলো একেবারে গ্রাম্য অস্ত্র। তাই না?"

"হ্যাঁ, তা..."

এমন সময় আলো ঝলসে উঠল বাগানের ফটকের দিকে। গাড়ির শব্দ পাওয়া

যাচ্ছিল। একটু পরেই ফটকের কাছে গাড়ি এসে দাঁড়াল।

সান্যাল বললেন, "আমার জিপ এসে গেছে। উঠি।" বলে উঠে পড়লেন। "চলি, সুজনবাবু," বলে দু'পা এগিয়ে ভিক্টরকে ডাকলেন।

ভিক্টর কিছু বুঝতে পারল না, তবু উঠে দাঁড়াল।

দু-তিন ধাপ সিঁড়ি নেমে রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে সান্যাল বললেন, "এই ছোকরার ব্যাপারে আপনি খোঁজখবর করেছেন?"

ভিক্টরের মনে হল, সান্যালের গলার স্বর খানিকটা অন্যরকম। তিনি আগের মতন ঠাট্টা করছেন না। ভিক্টর বলল, "ক্লায়েন্ট সম্পর্কে খোঁজখবর করতেই হয় খানিকটা। করেছি। তা ছাড়া সুজন আমার জুনিয়ার। একই কলেজের ছাত্র।"

"ও! আপনি কলেজি দাদা। তা ভিক্টরসাহেব, একটা কথা আপনাকে বলি। ছোকরাকে নজরে রাখবেন। সাবধানে থাকতে বলবেন। কলকাতায় ছোটাছুটি করতে বারণ করবেন। বিপদ ঘটতে পারে।"

ভিক্টর অবাক হয়ে বলল, "কেন?"

"কেন? আপনি নিজেই বুঝে নিন, কেন!...চলি।...ও, একটা কথা, এই পুলিশ স্টেশন আমার নয়। এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের এলাকা। আমি স্পেশ্যালি ডেপুটেড। থানায় একটু কথা বলে রাখবেন।" বলেই সান্যাল কী মনে করে মাথা নাড়লেন, "না, এখন থাক।"

সান্যাল এগিয়ে গেলেন পুলিশ-জিপের দিকে।

জিপ চলে যাবার পর ভিক্টর একটু দাঁড়িয়ে থাকল। সান্যাল মানুষটি ঠিক যে কেমন, সে বুঝতে পারল না।

ফিরে এসে ভিক্টর সুজনকে বলল, "সান্যাল কি তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসেন?"

"না। এই নিয়ে বার-তিনেক।"

"কেন এসেছিলেন?"

"কিছু বললেন না। বললেন, "থানার গাড়ি টহল মারতে যাচ্ছিল গ্রামের দিকে। উনি এসে পড়েছিলেন সে-সময়। বললেন, এখানে নামিয়ে দিয়ে যেতে।"

"তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করেননি?"

"এমনি কিছু নয়। তবে সেই মুস্তাফির কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন। দু-তিনটে ফোটো দেখালেন। বললেন, মুস্তাফির সঙ্গে মিল আছে কি না মুখের। আমি কোনও মিল পেলাম না।"

ভিক্টর বলল, "মুস্তাফির ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত। লোকটা জাল। কিন্তু কে? কেন এসেছিল? শুধু শুধু ছাতা আর টর্চ নিতে আসেনি!"

"কী জানি।"

"এই ধরনের কোনও লোককে তুমি আগে কখনও দেখেছিলে?"

"না।"

ভিক্টর খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকল। পরে বলল, "তোমায় কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস

করি। তার আগে তোমার জেনে রাখা দরকার, তোমার যুগল জ্যাঠা আর মেজদা অর্ধেন্দু শর্মাবাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তোমার হয়ে যে একজন প্রাইভেট ইনভেসটিগেটার লাগানো হয়েছে, এ-কথা ওঁরা জেনেছেন। জেনে খুবই অসন্তুষ্ট। আমি ভাবছি, জানলেন কেমন করে? তোমার কাছে ও-তরফের কেউ এসেছিল?"

"না," মাথা নাড়ল সুজন।

"তোমার এখানে এমন কেউ আছে, যে ওদের লোক?"

"না।"

"যোগাযোগ আছে, এমন লোক?"

"কেমন করে বলব!"

"তুমি এই বাগান কেনার পর যুগলবাবুরা কেউ দেখতে আসেননি?"

"মেজদা এসেছিল। বাগান কেনার পর ঠাকুমা একটু পুজো মতন করেছিল, তখন মেজদা এসেছিল।"

"ছিল? না, এসেই চলে গেল?"

"না, ঘণ্টা-দুই ছিল। ঘুরে ঘুরে বাগান দেখল।"

আকাশে আরও মেঘ ঘনিয়েছে। অন্ধকার হয়ে এল বাগান। দূরে মেঘ ডাকার শব্দ শোনা গেল। বাতি এনে রাখল পুলিন। চা এনেছে।

ভিক্টর বলল, "আমি শুনলাম, এই বাগান কেনার টাকা তুমি যুগলবাবুর কাছ থেকে আদায় করেছ। যদিও টাকাটা তোমাদের প্রাপ্য।"

"হ্যাঁ। আমরা কোম্পানির কাছে অনেক টাকা পাই। পাওনা টাকা থেকে ওটা চেয়ে নিয়েছিলাম।"

"যুগলবাবু প্রথমে দিতে চাননি!" ভিক্টর বলল চায়ে চুমুক দিয়ে।

"না, চাননি। কোম্পানির অবস্থা ভাল না। টাকার টানাটানি। হিসেবপত্র দেখতে হবে, এইসব বায়না ধরেছিলেন। ঠাকুমা আমায় বলল, তুই গিয়ে টাকা আদায় করে নিয়ে আয়। আমি গেলাম।"

"তোমার ঠাকুমা আর কী বলেছিলেন?"

"বলেছিল, টাকা না দিলে ওদের আমি রাস্তায় দাঁড় করাব। ঠাকুমা রগচটা। বুড়ি ওই রকমই। পরোয়া করে না। আপনি জানেন না, আমার ঠাকুমা একসময় স্বদেশি করত।"

ভিক্টর অবাক হল। বলল, "তাই নাকি! বাঃ! আচ্ছা সুজন, তুমি কি বলতে পারো, তোমার ঠাকুমা ওদের ওপর চটা কেন?"

সুজন সঙ্গে সঙ্গে কথার জবাব দিল না। পরে বলল, "ভিক্টরদা, ওরা আমাদের বরাবর ঠকাবার চেষ্টা করেছে বলে শুনি। বাবা মারা যাওয়ার পর আমাদের অসহায় দেখে নিজেরাই কর্তৃত্ব করেছে। আমাদের পাওনা টাকাপয়সা নিয়েও বিস্তর ভোগাত। ঠাকুমা প্রথম দিকে কিছু বলত না। পরে ভীষণ চটে গিয়েছিল। আপনাকে আমি খোলাখুলি বলছি, টাকাপয়সা সম্পত্তি ব্যবসা, ওদের সঙ্গে আমি থাকব না বলেই আলাদাভাবে এই বাগান কিনেছি। ঠাকুমা চেয়েছিল, আমি পৈতৃক ব্যবসায় গিয়ে বসি,

নিজেদের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিই। আমার ভাল লাগেনি।"

চা খেতে খেতে ভিক্টর সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল। ঝড় উঠতে পারে। বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেছে। গুমোট বাড়ছে।

ভিক্টর বলল "যুগলবাবুর কাছে টাকা চাইতে গিয়ে কী হল?"

সুজন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। ভাবছিল কিছু। পরে বলল, "আমি একদিন যুগল জ্যাঠার বাড়িতে গেলাম। আমার ভাল লাগত না যেতে, তবু বছরে দু-তিনবার যেতে হত। বিজয়ার পর, নতুন বছরে, এইরকম আর কী। আমি সন্ধের দিকে ও-বাড়িতে গেলাম। যুগল জ্যাঠা তখন নিজের শোবার ঘরের লাগোয়া বসার জায়গায় বসে ছিলেন। আমাকে দেখে 'আয় আয়' করলেন। দু-পাঁচটা কথার পর আমি টাকার কথা বললাম। উনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন।"

"তখন অন্য কেউ ছিল কাছাকাছি?"

"না। টাকার কথায় উনি বারবার বলতে লাগলেন, টাকা নেই, কোথায় পাবেন টাকা! আমিও নাছোড়বান্দা। যুগল জ্যাঠা বিরক্ত হয়ে উঠে নিজের শোবার ঘরে চলে যাচ্ছিলেন। আমিও ওঁর পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকলাম। ঘরে বাতি জ্বলছিল। উনি আমাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য মেজদাকে ডাকতে লাগলেন। আমাকে, আমার বাবাকে যা-তা বলছিলেন। কোম্পানির জন্যে নাকি এক কুটোও আমরা কিছু করলাম না, শুধু টাকা নিয়ে গেলাম। বলতে বলতে জ্যাঠা ঘরের একপাশে রাখা ছোট দেরাজের ড্রয়ার টেনে কিছু বার করতে যাচ্ছিলেন; হ্যাঁচকা টানে ড্রয়ারটা পুরো বেরিয়ে এসে মাটিতে পড়ে গেল। জিনিসপত্র ছিটকে পড়ল মেঝেতে। চুরুটের ফাঁকা বাক্স থেকে কী যেন পড়ল, গোল গোল, টফির মতন দেখতে, গোটা চারেক মোটা মোটা কলম, ঘড়ি, আরও কত কী ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল।"

"ড্রয়ার খোলা ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর?"

"মেজদা ঠিক তখনই ঘরে এল। যুগল জ্যাঠা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে। একবার মেঝের ওপর পড়া জিনিসগুলো দেখছেন, একবার আমাকে দেখছেন। কী করবেন বুঝতে পারছেন না। কোনও রকমে সামলে মেজদাকে বললেন, আমি টাকা চাইতে গিয়েছি। আমি বুঝতে পারলাম, হয় মেজদা আগেই কথাটা শুনেছে, না হয় আড়াল থেকে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। আগেও শুনতে পারে। মাধবকাকা তো আগেই যুগল জ্যাঠাকে বলেছিল।"

ঝড় এসে গেল। ধুলো আর শুকনো পাতা উড়ে আসছে বাগান থেকে। ঘূর্ণিঝড় বোধ হয়।

বারান্দায় বসে থাকা মুশকিল। ভিক্টর রুমাল বার করে নাক চোখ আড়াল করল।

সুজন বলল, "ঘরে চলুন।"

ঘরে এসে চোখ মুখ মুছতে মুছতে ভিক্টর বলল, "তারপর?"

"তারপর সহজেই কাজটা হয়ে গেল। মেজদা আমাকে বলল, দিন দুই পরে গিয়ে

টাকাটা নিয়ে আসতে। অফিসে যেতে বলল।”

“তুমি টাকা পেয়ে গেলে?”

“হ্যাঁ। অবশ্য আমাকে একটা এগ্রিমেন্ট লিখতে হল। আমাদের পাওনা টাকা আমরা পুরোপুরি পেয়েছি, এইরকম আর কী!”

“তুমি লিখে দিলে?”

“ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে কী লাভ! গোলমাল আমি চাই না। আর ওই ব্যবসাতেও আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। আমার এই বাগানকে আমি কী করে তুলব দেখবেন! ফ্রুট প্রোডাক্টস, ডেয়ারি, আমি সব করব।”

ভিক্টর হাসল, “ভেরি গুড। তোমার সাকসেস দেখলে খুশি হব। কিন্তু তুমি যে পাওনা-শোধের চুক্তি সই করে এলে, তোমার ঠাকুমাকে বলেছ?”

“না। ঠাকুমা শুনলে রেগে আগুন হয়ে যাবে। হার্ট পেশেন্ট। বার দুই ধাক্কা সামলেছে। বুঝলেন তো! এই যে এখন যা যাচ্ছে, আপনি ভাবুন, বুড়ি কত টেনশানে রয়েছে।”

ভিক্টর একটা সিগারেট ধরাল। সুজন দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। নয়তো ঘর এতক্ষণে ধুলোয় ভরে যেত।

ভিক্টর বলল, “কাজটা হয়তো ভালই করেছ। কিন্তু...”

সুজন বলল, “কিন্তু কিছু নেই, ভিক্টরদা। আপনি যদি ঠিক ঠিক দ্যাখেন, যুগল জ্যাঠা অন্যায় কিছু বলেননি। আমরা কোম্পানির অংশীদার। ঠিক আছে, কিন্তু বাবা মারা যাবার পর থেকে আমরা কিছু করিনি।”

“কেন, তোমার মাধবকাকা?”

ইতস্তত করে সুজন বলল, “হাজার হোক, মাধবকাকা কর্মচারী। কোম্পানির ভালমন্দে তাঁর কোনও হাত নেই।”

ঝড় একই রকম। বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে না। হয়তো ঝড় উঠেই দুর্যোগ কেটে যাবে।

ভিক্টর অন্যমনস্কভাবে বলল, “তুমি কি বলতে পারো, যুগলবাবুর চুরুটের বাক্স থেকে যে জিনিসগুলো পড়ে গিয়েছিল, সেগুলো কী?”

মাথা নাড়ল সুজন। না, সে পারে না।

“কথাটা তুমি অন্য কাউকে বলেছ?”

“না।”

“কেন?”

সুজন এলোমেলো ভাবে বলল, “বলিনি, কারণ জিনিসগুলো কী আমি জানি না। তা ছাড়া যুগল জ্যাঠা অনেকদিন ধরেই আফিম টাফিম খান, ওইরকম কিছু হবে হয়তো।”

“আফিম। অত বড় বড় আফিমের ডেলা”, ভিক্টর হেসে উঠল, “তোমার যুগল জ্যাঠা সারাজীবন ধরে অত আফিম খেতে পারবেন না।”

“কী জানি। আমি জানি না।”

“তুমি কি কখনও শুনেছ, যুগলবাবুরা স্মাগলিংয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন?”

"না", মাথা নাড়ল সুজন, "মাধবকাকা অবশ্য সন্দেহ করেন, মেজদার কিছু বদ কাজকর্ম আছে।"

"ওঃ! তা তোমার মাধবকাকার অবস্থা ভাল নয়। শুনেছ?"

"হ্যাঁ। কাকা গত পরশু এসেছিলেন। বললেন সব। ওরা বোধ হয় মাধবকাকাকে আর রাখবে না। ভিক্টরদা, আমি শুধু ঠাকুমা'র কথা ভাবছি। বুড়ি যে কী করবে! এই ধাক্কা সামলাবে কেমন করে?"

ভিক্টর একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমি তোমার ঠাকুমা'র কাছে যাব শিগগির। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার।"

সুজন যেন খুশিই হল। বলল, "খুব ভাল হয়।"

দুজনেই চুপ করে গেল। বাইরে ঝড় বাড়ছে। মেঘও ডাকল। ভিক্টর লণ্ঠনের আলোর দিকে তাকিয়ে। কী যে ভাবছিল কে জানে।

সুজন নিজেই বলল, "সেদিন আরও জোরে ঝড় উঠেছিল।"

ভিক্টর আলোর দিকেই তাকিয়ে থাকল। বলল, "মুস্তাফি যেদিন এসেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"কতক্ষণ ঝড় ছিল বলতে পারো?"

"ঠিক করে বলতে পারব না। আধ ঘণ্টা তো হবেই। তারপর বৃষ্টি।"

"আচ্ছা সুজন, মুস্তাফির কোনও মুদ্রাদোষ লক্ষ করেছিলে?"

সুজন ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলল, "একটা দোষ আমার চোখে পড়েছে। কথা বলতে বলতে প্রায়ই দেখছিলাম, জিভ দিয়ে সামনের দাঁত তুলে আবার বসিয়ে নিচ্ছিল।"

ভিক্টর উত্তেজিত হয়ে পড়ল, "বাঁধানো দাঁত।"

"হ্যাঁ। তা না হলে জিভ দিয়ে ঠেলে দাঁত তোলা যায় নাকি?"

"আমি জানি। ডেন্টিস্টের ঘরের ছেলে আমি", ভিক্টর বলল, হাসল, "এক-একটা দাঁত যাদের বাঁধানো থাকে, তাদের একটা বদ অভ্যেস হয়ে দাঁড়ায়, জিভ দিয়ে পাটিটা খুলে আবার বসিয়ে নেওয়া। এই করতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্টও হয়েছে। আসলে কী জানো, একটা আর্টিফিসিয়াল জিনিস মুখে থাকলে জিভ যেন মাঝে মাঝেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলে।"

"গোটা পাটি হলে হয় না?"

"সাধারণত না। যাকগে, মুস্তাফির একটা দাঁত বাঁধানো ছিল। নীচের পাটির?"

"হ্যাঁ।"

"লোকটা পান খেত?"

সুজন অবাক হয়ে বলল, "আপনি কেমন করে জানলেন?"

ভিক্টর মুচকি হাসল, "জানতে পেরেছি।"

ভিক্টরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুজন বলল, "মুস্তাফি পান-জরদা দুইই খেত। ওর পকেটে প্লাস্টিকের ঠোঙায় মোড়া পান ছিল। জরদা ছিল একটা ছোট্ট কৌটোয়। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ও পান-জরদা খেয়েছে।"

ভিক্টর খুশির গলায় বলল, "সেই দাঁত আমি পেয়েছি।"

সুজন বুঝতে পারল না, "মানে?"

"মুস্তাফির বাঁধানো দাঁত আমি পেয়েছি। আকন্দগাছের ঝোপের আড়ালে পড়ে ছিল।"

সুজন যেন কথা বলতে পারছিল না।

ভিক্টর বলল, "মুস্তাফি চশমা পরত?"

"চশমা? পরত। চশমা দেখেছি।"

"তুমি ঠিক বলছ?"

মাথা হেলাল সুজন। ঠিকই বলছে।

"তা হলে মুস্তাফির চশমার কাচের টুকরোও পেয়েছি।"

"আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী বলছেন?"

ভিক্টর বলল, "আমি দুটো জিনিস উদ্ধার করেছি। পুলিশের কেন নজরে পড়েনি জানি না। বাঁধানো একটা দাঁত, আর চশমার কাচের ভাঙা টুকরো। একই জায়গা থেকে। বাঁধানো দাঁত মুস্তাফির। চশমার টুকরোটাও তার। চশমার কাচ আমি পরীক্ষা করিয়েছি। মাইনাস পাওয়ার। মাইনাস ফোর। মানে, চোখ মোটামুটি ভালই খারাপ। দূরের জিনিস দেখতে পায় না লোকটা। মুস্তাফিকে কেউ কি অ্যাটাক করেছিল? যে খুন হয়েছে, সে কে? সেই কি মুস্তাফিকে অ্যাটাক করেছিল? কিন্তু তা কেমন করে হবে? পেছন থেকে চড়াও হলে মুস্তাফিরই জখম হবার কথা।

সুজন বোবার মতন বসে থাকল। একেবারে বোবা।

ভিক্টর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে। ঘাড় মাথা চুলকোতে লাগল। খানিক পায়চারি করল ঘরের মধ্যে। তারপর বলল, "মুস্তাফি মারা যায়নি, এটা ঠিক। কিন্তু তার ওপর চড়াও হয়েছিল কে? কেন? হাতাহাতি হয়েছিল দু'জনে? যে মারা গেছে, তার সঙ্গে না অন্য কেউ এসেছিল তার সঙ্গে? অন্য কেউ যদি এসে থাকে, সে কে? কেন এসেছিল?"

ভিক্টর অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

॥ আট ॥

ঝড় থামল। বৃষ্টি হল না। কয়েক ফোঁটা জল পড়ল। যেন বৃষ্টি আসি আসি করে পালিয়ে গেল। কিংবা দূরে কোথাও বৃষ্টি নেমেছিল, এ-পর্যন্ত আর পৌঁছতে পারল না।

ভিক্টর আর নোটন যখন বাগানের বাইরে এসে দাঁড়াল, আকাশের মেঘ পাতলা হয়ে গিয়েছে। ছেঁড়া মেঘের পাশে পাশে তারা চোখে পড়ছিল। অন্ধকার। সোঁদা গন্ধ উঠছে। মাটি ভেজেনি। তবু শুকনো ধুলোভরা মাঠেঘাটে কয়েক ফোঁটা জল পড়ায় গন্ধটা ছড়িয়ে গিয়েছে। বাতাস ঠাণ্ডা। বোঝাই যায়, তফাতে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে।

স্কুটারে স্টার্ট দিল ভিক্টর। নোটন পেছনের সিটে বসল।

ভিক্টর বলল, "বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে ন'টা-দশটা বেজে যাবে।"

নোটন বলল, "ভি আই পি ধরতে পারলে হুহু করে বেরিয়ে যাব।"

ভিক্টর এগিয়ে গেল। আলোর জোর সামান্য কম। রাস্তা দেখতে অবশ্য অসুবিধে হচ্ছিল না।

মাঠঘাট, এবড়োখেবড়ো রাস্তায় রাত্রের দিকে গাড়ি চালাতে খানিকটা অসুবিধে হওয়া স্বাভাবিক। ধীরেই গাড়ি চালাচ্ছিল ভিক্টর।

খানিকটা এগিয়ে এসে ভিক্টর বলল, "কিছু বুঝলি?"

নোটন কথাটা শুনতে পায়নি ভাল করে। গাড়ির শব্দ, তায় জোর বাতাস। ভিক্টর সামনের রাস্তা দেখছে, ঘাড় ফেরায়নি।

নোটন বলল, "কিছু বললে?"

"বললাম, কেমন দেখলি?"

"বুঝতে পারলাম না। আমি জনার্দন আর রাখালের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তারপর ঝড় উঠে গেল। ওদের ঘরেই ছিলাম।"

"আমি আগে ভেবেছিলাম, তোকে এখানে ভিড়িয়ে দেব। ডিম কিনতে আসছিস, এইভাবে আসবি। দেখলাম, সেটা কাজের হবে না। জানাজানি হয়ে গেছে। তুই যে ডিম সাপ্লায়ার নোস, এরা তা ধরে ফেলবে," বলে ভিক্টর যেন হাসল।

কথাবার্তা ভাল শোনা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না। নোটন চুপ করে থাকল।

আরও খানিকটা জায়গা এগিয়ে এসে একটা বাঁক। রাস্তার একটা পাশে ডোবা। ডান দিকের জমি যেন ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ঝোপঝাড়।

"লোক দুটো কেমন দেখলি?" ভিক্টর বলল।

"জনার্দনকে চালাক লাগল। রাখাল মামুলি।"

"চালাক কেন?"

"বোলচাল দিচ্ছিল। বলছিল, বারাসত-বসিরহাট থেকে হাওড়া-লিলুয়া বিশ-পঁচিশটা বাগানে সে কাজ করেছে।"

"কী বাগান?"

"ফলের বাগান। হাতের গুণ আছে। গাছ নষ্ট হয় না।"

"আর?"

"ওর বাড়ি পুরুলিয়ার দিকে। এদিকে এসে কাজকর্ম করছে আজ পনেরো-বিশ বছর।"

"বয়েস কত লোকটার?"

"বছর পঁয়ত্রিশ।"

"আমি লোকটাকে দেখেছি। তাগড়া।"

"ওর ঘরে টাঙ্গি দেখলাম।"

"টাঙ্গি?"

"খাটিয়ার তলায় রাখা ছিল। কাঠের বাক্সর আড়ালে।"

ভিক্টর সামনের দিকে গর্ত মতন দেখল। গর্ত আর কয়েকটা ডালপালা।

ডালপালায় রাস্তা আটকে ফেলেছে প্রায়। ঝড়ে এমন হয়নি। হওয়া সম্ভব নয়। রাস্তায় গায়ে কোনও গাছ নেই। ভিক্টর সাবধান হয়ে গেল। আচমকা একটা শব্দ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভিয়ে দিল ভিক্টর। স্টার্ট বন্ধ করে দিল গাড়ির।

নোটনও লাফিয়ে নেমে পড়েছিল।

গাড়িটা সামান্য সরিয়ে ভিক্টর এ-পাশ ও-পাশ তাকাল। শব্দটা বন্দুকের? না পাইপগানের?

রাস্তার ডান দিকে ঝোপঝাড়। কিন্তু খানিকটা তফাতে বাঁ দিকে ঘন ছায়ার মতন পড়ে আছে এঁদো ডোবা। কোনদিক দিয়ে শব্দটা এল, বোঝা গেল না। ঝোপের দিক থেকেই আসতে পারে। যদিও ঢালু মাঠের ওপর ঝোপটা গজ-তিরিশ দূরে রয়েছে।

ভিক্টর খুব নিচু ফিসফিসে গলায় বলল, "নোটন?"

নোটন তার আগেই জামার তলা থেকে হাতিয়া বার করে নিয়েছে। চাপা গলায় বলল, "টর্চ তোমার কাছে।"

"একটু দাঁড়া।" ভিক্টর কান পেতে থাকল। কোথাও কোনও শব্দ হচ্ছে কি না শোনার চেষ্টা করছিল। বাতাসের শব্দ ছাড়া কোনও শব্দ কানে আসছে না। আকাশে এখনও ছেঁড়াফাটা মেঘ, মাঝে মাঝে তারা। ওই তারার আলোয় অন্ধকার ফিকে হবার উপায় নেই।

হঠাৎ নোটন বলল, "ঝোপের দিকে।" বলে পা বাড়াতে যাচ্ছিল।

ভিক্টর বলল, "ছটফট করিস না, দাঁড়া। এবার আমি একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি। খসখস করছে।"

নোটন বলল, "আমি ঝোপটার দিকে এগোচ্ছি। আমায় দেখতে পাবে না। আমি যখন বলব, তুমি টর্চটা জ্বেলে দেবে।"

নোটন সাবধানে ধীরে ধীরে রাস্তা ছেড়ে ঢালু মাঠে নামতে লাগল। ভিক্টর তার টর্চ বার করে নিয়েছে। স্কুটারটাকে রাখতে পারলে সুবিধে হত। ঠিক মতন জায়গা পাচ্ছে না।

অন্ধকারে কয়েক পা পিছিয়ে এসে সমতল জায়গা পেল ভিক্টর। স্কুটার দাঁড় করিয়ে রাখল। রেখে নিজেও মাঠের দিকে নামতে লাগল।

কে গুলি চালাল? কেন? ভিক্টর প্রায় হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে এগিয়ে চলল। মাথার হেলমেটটা বাঁ হাতে, ডান হাতে চার ব্যাটারির টর্চ। রিফ্লেক্টার লাগানো। জোর আলো হয়।

নোটন চেঁচিয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে টর্চ জ্বালল ভিক্টর।

ব্যাপারটা যে কী হল বোঝা গেল না। ভৌতিক দৃশ্য যেন। ঝোপের আড়াল থেকে একটা বিচিত্র লোক বেরিয়ে এসে পালাতে লাগল। একেবারে কালো পোশাক। আলখাল্লার মতন জামা।

নোটন তার হাতিয়া ছুড়ল। লোকটা দাঁড়াল এক মুহূর্ত। একটা হাত তুলল একবার। বোধ হয় কাঁধের কাছে লেগেছিল। দাঁড়াল না। ছুটতে লাগল। লম্বা লম্বা

পা। দেখতে দেখতে দূরে চলে গেল। তারপর কোথায় মিশে গেল কে জানে!

ভিক্টর টর্চের আলো ফেলেও আর লোকটাকে খুঁজে পেল না।

"নোটন?"

"পালিয়ে গেল।" নোটনের গলায় আফসোস। একে টর্চের আলো, তায় লোকটা দৌড়চ্ছে। কী করা যাবে।

"তুই ঠিক আছিস?"

"বিলকুল ঠিক। আর-একটু হলে ধরতে পারতাম।"

"লোকটা দৈত্য নাকি রে?"

"তাই দেখলাম। কী লম্বা! মাথার পেছন দিকে ঝাঁকড়া চুল।"

ভিক্টর আর নোটন ঝোপের এ-পাশ ও-পাশ দেখল। বিড়ির টুকরো, দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

নোটন তার হাতিয়া কুড়িয়ে আনল।

ভিক্টর বলল, "আমাদের জন্যেই লোকটা বসে ছিল।"

"গুলি চালিয়ে ঘায়েল করতে চেয়েছিল, দাদা?"

"চেয়েছিল। কিন্তু ও গুলি চালাতে জানে না। অন্ধকারে অত দূর থেকে গুলি চালিয়ে কাউকে ঘায়েল করা সহজ নয়। ও ভেবেছিল, আমরা যখন বাধ্য হয়ে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ব, স্কুটারের হেডলাইট জ্বলবে, তখন আলো দেখে আমাদের তাক করে ও গুলি চালাবে। একেবারেই গাধা। টেলিস্কোপিক রাইফেল হলে পারত।"

ভিক্টর আর নোটন ফিরে আসার সময় শুনল, দূরে কোথাও বিশ্রি ভাবে একটা কুকুর ডাকছে। কুকুরের ডাকটা ভয়ংকর। মাঠেঘাটে যেন ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে শুতে শুতে এগারোটা বেজে গেল।

আজ কলকাতার দিকেও ঝড় হয়েছে। একটু বৃষ্টিও হয়েছে। গুমোট ভাবটা কমে গিয়েছিল।

বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল না ভিক্টর। বরং সে যেন একে একে আজকের ঘটনাগুলো সাজিয়ে নিচ্ছিল। প্রথমত, সুজনের টাকা আদায়ের বৃত্তান্ত শুনলে বোঝা যায়, তার যুগল জ্যাঠা বাধ্য হয়েই টাকাটা দিয়েছেন। বাধ্য হবার কারণ অর্ধেন্দু, আর ফাঁকা চুরুটের বাক্সে রাখা কতকগুলো জিনিস। গোল গোল ছোট্ট বলের মতন জিনিসগুলো কী? কেনই বা সেগুলো দেখলে মনে হবে আফিমের ডেলা। ওপরে একটা কিছু মাখানো ছিল নিশ্চয়। খয়েরি রঙের। মোটা মোটা কলমই বা থাকবে কেন চুরুটের বাক্সে?

জিনিসগুলো কী, তা আন্দাজ করা মুশকিল। তবে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যুগলবাবু আর অর্ধেন্দুর কাছে হাজার পঁয়ত্রিশ টাকার চেয়েও ওগুলো মূল্যবান। সুজন যেন কোনও রকম সন্দেহ না করে, কিংবা ওগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে না পারে, শুধু সেই জন্যেই তাড়াতাড়ি অর্ধেন্দুর কথা মতন টাকা দিতে রাজি হয়ে গেলেন যুগলবাবু।

টাকা দিয়ে একটা চুক্তি (পাওনা টাকা শোধ হবার রসিদ) লিখিয়ে নেবার সঙ্গে মূল ব্যাপারের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই বোধ হয়। ধড়িবাজ ব্যবসায়ী লোক মাত্রই যেমন হতে পারে, সেই রকমই লোক ওরা, যুগলবাবুরা। সুযোগ যেটুকু পেয়েছে কাজে লাগিয়ে নিয়েছে।

ভিক্টরকে জানতে হবে যুগলবাবু আর তাঁর ভাগ্নে মিলে সত্যি কোনও স্মাগলিংয়ের কারবার করেন কি না। করলে তাঁরা কী ধরনের চোরাই কারবারের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন।

কিন্তু ভিক্টরের পক্ষে এর হদিস করা কঠিন। দেখা যাক, মাধব শর্মা কিছু বলতে পারেন কি না!

যুগলবাবুদের ঘটনাটা সরিয়ে রাখলে অন্য ঘটনা যা পরিষ্কারভাবে ভিক্টর বুঝতে চেষ্টা করছে, তা হল মুস্তাফির অন্তর্ধান-রহস্য। এই রহস্যের মধ্যে জটিলতা অনেক। তবু একটা কথা এখন ধরা যাচ্ছে, মুস্তাফিকে সেদিন বাগানের বাইরে কেউ আক্রমণ করেছিল। আচমকা। আড়াল থেকে। ধস্তাধস্তিও হয়েছিল, নয়তো বাঁধানো দাঁতের টুকরো আর চশমার ভাঙা কাচ পাওয়া যেত না।

ধস্তাধস্তির পর মুস্তাফির কী হল? সে কি পালাল? না তাকে গুম করা হয়েছে।

ভিক্টর যেন নিজেই কেমন চমকে উঠল! গুম করার কথাটা তো তার একবারও মনে হয়নি আগে! এমন তো হতে পারে, মুস্তাফিকে গুম করা হয়েছে। আর সেই জন্যেই লোকটার কোনও পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও লোকটা জাল।

ব্যাপারটা যদি এইভাবে সাজানো যায়, একটা লোক, তার আসল নাম যা-ই হোক, মুস্তাফি নাম নিয়ে সুজনের কাছে এসেছিল। নিশ্চয় কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। বাগানের দালালি সে করে না। তার অন্য কোনও মতলব ছিল। কী মতলব কেউ জানে না। কিন্তু যাবার সময় সে সুজনের ছাতা আর টর্চ চেয়ে নিয়ে যায়। কেন?

এই মুস্তাফি যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন তার ওপর আচমকা কেউ চড়াও হয়। ধস্তাধস্তি হয়েছিল মুস্তাফির সঙ্গে। মুস্তাফির চশমার কাচ ভেঙে যায়, একটা বাঁধানো দাঁত খুলে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। সেই মুস্তাফির আর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। সে কোথায় গেল? মুস্তাফি কোন তরফের লোক? কে তাকে পাঠিয়েছিল? যুগলবাবুরা? কেন?

ভিক্টর এই রহস্যের কোনও উত্তর পাচ্ছিল না।

সে এটাও বুঝতে পারছিল না, ভিক্টরদের ওপর আজ হামলা করার চেষ্টা করা হয়েছিল কেন? সুজনের হয়ে ভিক্টর কাজ করছে বলে? অন্য কোনও কারণ থাকতে পারে না। তার মানে, ভিক্টরকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাকে ঘায়েল করারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু বোকার মতন!

ওই লোকটাই বা কে? দৈত্যের মতন দেখতে? অন্তত অন্ধকারে ফাঁকা মাঠে টর্চের আলোয় লোকটাকে সেই রকম দেখাচ্ছিল। যদিও তার মুখ ভিক্টররা দেখতে পায়নি। যদি বা দেখা যেত, দূর থেকে কি কিছু বোঝা যেত!

ভিক্টরের কানে গেল, বারান্দায় রাখা দেয়াল-ঘড়িতে দুটো বাজল।

॥ নয় ॥

নামের সঙ্গে মানুষটিকে মেলানো যায় না। নাম শিবসাধন ঘটক। পরিচিত মহলে তাঁকে বলা হয়, শিব ঘটক। কেউ কেউ আবার বলে শিবু টক। এই 'টক'-এর দুটো মানে হতে পারে। একটা মানে স্বাদে অম্ল, অর্থাৎ টক; অন্য মানে হল, শিবুবাবু বড় কথা বলেন, বক্কেশ্বর।

শিবসাধনকে দেখতে মোটেই যাত্রাদলের শিবের মতন নয়। রংটি কালো। ছিপছিপে চেহারা, নাক মুখ কাটাকাটা, চোখ দুটি যেমন উজ্জ্বল, তেমনই ছোট। ধূর্তামিতে পাকা। ভদ্রলোক সাজেপোশাকে ফিটফাট। পাইপ খান।

শিবসাধন এমন একটা কাজ করতেন যা চমকপ্রদ। তাঁর ঘনিষ্ঠরা ছাড়া অন্যরা সে-কাজের খোঁজখবর রাখে না। লোকে জানে, তিনি ভারত সরকারের মাঝারি কর্মচারী; তাঁর কাজ সীমানা জরিপ। আসলে ওটা হল লোকের কাছে একটা মিথ্যে পরিচয়। শিবসাধনের কাজ হল, চোরাই সোনাদানা, হিরে-মুক্তো, মাদকদ্রব্য কোথা দিয়ে কেমন করে আসে-যায়, কোন কোন ঘুঘুরা তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তার খোঁজখবর রাখা।

এই শিবসাধনের সঙ্গে ভিক্টরের খানিকটা খাতির আছে। শিবসাধনের বয়েস প্রায় পঞ্চাশ। থাকেন ঢাকুরিয়ার দিকে।

ভিক্টর ফোনে কথাবার্তা বলে রেখেছিল। কলকাতাতেই এখন আছেন শিবসাধন। দেখা করতে সময় দিয়েছিলেন সন্ধের দিকে।

ভিক্টর সন্ধের গোড়ায় শিবসাধনের বাড়িতে এসে হাজির।

শিবসাধন নিজেই অভ্যর্থনা করলেন, "এসো হে ভিক্টরচন্দর। আছ কেমন? বাড়ির খবর কী? দিদি কেমন আছেন তোমার?"

বাড়ির খবরাখবর দিল ভিক্টর। শিবসাধন নীচের ঘরে বসলেন না; সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা দোতলার পেছনের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বসালেন ভিক্টরকে। বললেন, "নীচের ঘরে বসলেই দাশগুপ্তরা এসে হাজির হয়। তারপর তাস। দোতলাই ভাল। কেউ ডিস্টার্ব করবে না।"

শৌখিন মানুষ শিবসাধন। সাজিয়ে গুছিয়ে পরিচ্ছন্নভাবে থাকতে ভালবাসেন। বাহুল্য থাকে না, রুচি থাকে।

দোতলায় বসে খানিকক্ষণ সাধারণ কথা হল। ভিক্টরকে বেশি কথা বলতে হল না, শিবসাধনই বকে গেলেন।

প্রায় মিনিট কুড়ি-পঁচিশ একতরফা কথা বলার পর শিবসাধনের খেয়াল হল, ভিক্টর এসেছে দরকারি কথা বলতে। বললেন, "ওহে, আমি রাজধানী এক্সপ্রেসের মতন চলছি। হ্যাবিট আর যাবে কোথায়? নাও, তোমার কথা বলো?"

ভিক্টর বলল, "আমি একটা ইনফরমেশানের জন্যে এসেছি।"

"সে তো বুঝতেই পারছি। কী ইনফরমেশান?"

"যুগলকিশোর বলে কারও নাম শুনেছেন?"

"কে যুগলকিশোর?"

ভিক্টর যুগলকিশোরের পরিচয় দিল। তাদের ব্যবসাপত্রের কথা বলল। কোথায় বাড়ি তাও বলল। শেষে বলল, "যুগলবাবুর এক ভাগ্নে আছে। নাম অর্ধেন্দু। তাকে আমি দেখিনি। শুনেছি লোক সুবিধের নয়।"

পাইপে তামাক ভরতে ভরতে শিবসাধন যেন যুগলকিশোরের কথা ভাবছিলেন। বললেন, "এরকম কাউকে আমি চিনি না। পাকা স্মাগলারদের খবর রাখি হে। তুমি যা বলছ, তাতে মনে হচ্ছে ওরা চুনোপুঁটি। আমি নাম দিয়েছি 'ডায়েল'। টেলিফোনের ডায়েল আর কী! ওরা কালেক্ট করার কাজ করে। ওদের কথা বলতে পারব না।"

ভিক্টর বলল, "আপনি খোঁজ করে আমায় বলবেন।"

"চেষ্টা করতে পারি। তা তোমার প্রবলেমটা কী?"

ভিক্টর আগাগোড়া ঘটনা বলল না। অনেক বলতে হবে। ছোট করে বলল যা বলার। শেষে বলল, "আমি বুঝতে পারছি না, এমন কী জিনিস ওই খয়েরি রঙের বা ধরুন চকোলেট রঙের গোল গোল গুলি সাইজের..."

ভিক্টরকে কথা শেষ করতে দিলেন না শিবসাধন। বললেন, "তুমি নিজে তো চোখে দ্যাখোনি?"

"না। কেমন করে দেখব।"

"তুমি যে জিনিসের কথা বলছ, সেটা চোখে দেখলে বোঝা যেত। তবে আমি তোমায় বলছি, যে কোনও দামি পাথর লুকিয়ে রাখার জন্যে তুমি পেস্ট ধরনের জিনিস সহজেই ব্যবহার করতে পারো। সেটা যদি চকোলেট পেস্ট হয়, তাতেও কোনও ক্ষতি নেই। স্মাগলাররা চোরাই মাল নানাভাবে পাচার করে। টুপি, জুতো, বেল্ট ছড়ি, সিগারেট কেস, লাইটার, এমনকী আরও অদ্ভুতভাবে। আমি একবার একটা লোককে ধরেছিলাম, খোঁড়া সেজে আসছে, এক পায়ের গোড়ালিতে প্লাস্টার, পায়ের পাতার তলায় খড়মের মতন কাঠ, হাতে অ্যালুমিনিয়ামের ছোট ক্রাচ। আমাদের ইনফরমেশান ছিল। কিন্তু কোন লোক তা জানা ছিল না। লোকটাকে আমার সন্দেহ হল। চিনেম্যানের মতো দেখতে। এয়ারপোর্টে তাকে ধরলাম। তার পায়ের প্লাস্টারের মধ্যে পলিথিনের পাতলা শিট। ব্যাটা সেই পলিথিনের পাতলা শিটের মধ্যে করে ড্রাগ পাচার করছে। ভাবতে পারো।"

ভিক্টর হঠাৎ যেন কেমন চমকে উঠল। প্লাস্টার। অর্ধেন্দুর না হাত ভেঙেছে? হাতে প্লাস্টার ছিল। কিন্তু সুজনের সঙ্গে মামা-ভাগ্নের ফয়সালা হয়েছে অনেক আগে। অর্ধেন্দুর হাত ভাঙার ঘটনা হালের। তা হলে?

শিবসাধনের স্ত্রী নিজের হাতে চা-খাবার নিয়ে এসেছিলেন। চেনেন ভিক্টরকে। চা ঢেলে দিয়ে বসলেন। কথা বললেন খানিকক্ষণ। তারপর উঠে গেলেন।

চা খেতে খেতে ভিক্টর বলল, "আপনি কি বলতে পারেন, হালে, মানে মাসখানেকের মধ্যে, কোনও বড় ঘটনা ঘটেছে স্মাগলিংয়ের?"

শিবসাধন বললেন, "একেবারে হালে নয়, তবে মাস দুই আগে মিস্টিরিয়াসলি কিছু বার্মিজ চুনি এসে পড়ে। একজন নটোরিয়াস স্মাগলার কেমন করে সেগুলো বার

করে নিয়ে যায় এয়ারপোর্ট থেকে, জানা যায়নি। কিন্তু আজব ব্যাপার, কলকাতায় আসার পথে সেগুলো চুরি যায়।"

"কেমন করে?"

"আমি শুনেছি, লোকটা এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি করে ফিরছিল। বোধ হয় গোটা ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক করে দেখানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রাস্তার মধ্যে ভি. আই পি রোডে তার ট্যাক্সি খারাপ হয়ে যায়। ট্যাক্সিটা সত্যিই খারাপ হয়নি। প্ল্যান করে খারাপ করা হয়েছিল। অন্তত তা-ই মনে হয়। কেননা, স্মাগলারের বয়ে আনা বার্মিজ চুনি আর পাওয়া যায়নি। লোকটাকে মেরে রাস্তার পাশে ফেলে ট্যাক্সিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাপারটাকে এমনভাবে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, যেন আগুন ধরে যাওয়াটা অ্যাকসিডেন্ট। আর লোকটা গাড়ি থেকে নেমে পালাতে গিয়ে জখম হয়ে মারা গিয়েছে। এই খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল। পড়োনি?"

"মনে পড়ছে না।"

"অ্যাকসিডেন্ট রিপোর্ট হিসেবে খবরটা বেরিয়েছিল। ছোট করে।"

"আপনারা কেমন করে জানলেন?"

শিবসাধন হাসলেন। বললেন, "আমাদের জানতে হয়। এ-নিয়ে এখনও ইনভেসটিগেশান হচ্ছে।"

"বার্মিজ চুনি নিয়ে লোকটা আসছিল, এর প্রমাণ কী?"

"ইনফরমেশান ছিল। কিন্তু কোন লোক আনছে, তা বলা ছিল না। শুধু বলা ছিল, 'রোজ', মানে গোলাপফুল। গোলাপফুলের মতন দেখতে একটি মহিলাকে ধরাও হয়েছিল এয়ারপোর্টে। কিছু পাওয়া যায়নি। পরে শুনেছি, কথাটা 'রোজ' নয় 'নোজ'। মানে, খাড়া নাকওয়ালা লোকদের ওপর নজর রাখবে। ভুল হয়ে গিয়েছিল, 'রোজ' আর 'নোজ'-এ।"

ভিক্টর যেন একমনে কিছু ভাবছিল। অন্যমনস্কভাবে বলল, "ঘটনাটা ঘটেছিল কোথায়?"

"ভি আই পি রোড। ভেরি নিয়ার টু এয়ারপোর্ট। একটা কালভার্টের কাছে।"

"লোকটাকে কি গুলি করে খুন করা হয়? না স্ট্যাব্‌ড?"

"হেড্‌ ইনজিউরি!"

"মাথায় লেগেছিল?"

"মাথার পেছন দিকে। হাতে-পায়েও সামান্য চোট ছিল। কিন্তু সিরিয়াস নেচারের নয়।"

ভিক্টর হঠাৎ বলল, "শিবদা, আমি বোধ হয় এবার একটু ধরতে পারছি।"

"কী পারছ?"

"যে জায়গাটার কথা আপনি বলছেন, ট্যাক্সি পোড়ানো হয়েছিল, সেই জায়গাটার চল্লিশ-পঞ্চাশ গজের মধ্যেই সুজনের বাগানে যাবার রাস্তা শুরু হয়েছে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। আমি ক'দিন ওদিকে আসা-যাওয়া করছি। কালভার্ট আমি দেখেছি। পাশেই

বিরাট নিমগাছ।"

"রিয়েলি?"

"তা ছাড়া, যেভাবে স্মাগলারটাকে খুন করা হয়েছিল আপনি বলছেন, হেড্ ইনজিউরি, মাথার পেছন দিকে, ঠিক সেইভাবে সুজনের বাগানের বাইরেও একটা লোককে খুন করা হয়েছে। মনে হচ্ছে, দি সেম কিলার। লোকটা মাথার পেছন দিকে মেরে মানুষ মারায় হাত পাকিয়েছে। প্রফেশনাল কিলার। আপনি জানেন, যারা খুন করে, তাদের প্রত্যেকের এক একটা ব্যাপারে হাতযশ থাকে।"

শিবসাধন মাথা হেলালেন। বললেন, "রাইট। এক একটা গ্রুপের এক এক রকম ওয়ে অব কিলিং।"

ভিক্টর বলল, "দুটো জিনিস মিলে যাচ্ছে। জায়গা আর খুন করার পদ্ধতি। একটা জিনিস শুধু মিলছে না।"

"কী?"

"চোরাই বার্মিজ চুনি এতদিনে কলকাতার মক্কেলদের হাতে থাকার কথা। তা যদি থাকে, তা হলে সুজনের বাগানের কাছে খুনখারাপি হবে কেন?"

শিবসাধনের পাইপ নিভে গিয়েছিল। আগুন দিয়ে নিলেন। বললেন, "এমন তো হতে পারে, কলকাতার বাজারে, মানে মক্কেলদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। কিংবা কিছু এসেছে, কিছু থেকে গেছে ওদিকে।"

ভিক্টর মাথা নেড়ে বলল, "হতে পারে।"

॥ দশ ॥

পরের দিন সকাল থেকে ভিক্টর তোড়জোড় শুরু করল।

নোটনকে পাঠাল মাধবচন্দ্র শর্মার কাছে চিঠি দিয়ে। বেশি কিছু লিখল না। শুধু লিখল, 'আজ বিকেলে আপনি একবার অবশ্যই আমার বাড়িতে আসবেন। জরুরি দরকার।'

নোটন চলে যাবার পর ভিক্টর তার চেনা মোটর-গ্যারাজে ফোন করল। গাঙ্গুলি ছিল। পেয়ে গেল ভিক্টর।

"গাঙ্গুলি?"

"বলুন দাদা?"

"একটা জিপ দরকার। বিকেল তিনটের মধ্যে।"

"জিপ?"

"ভাল রানিং কন্ডিশান হওয়া দরকার। চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে। ভাড়া যা-ই হোক।"

"ডিজেল জিপ একটা আছে? চলবে?"

"চলবে।...ড্রাইভার লাগবে না। শুধু আমার বাড়িতে এনে গাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাবে।"

"ঠিক আছে। ব্যবস্থা করছি।"

ভিক্টর পিস্তল চালাতে জানে। কিন্তু ব্যবহার করে না। তার বদলে যা ব্যবহার করে, তাকে বলা হয় 'ব্যাটন'। ইস্পাতের গোল নল। নলের মধ্যে একটা চাবুকের মতন জিনিস থাকে, ইস্পাতের; দুদিকে করাতের দাঁতের মতন ধার। ব্যাটনের হাতলে বোতাম আছে। টেপা মাত্র ইস্পাতের ধারালো দাঁত যেন ছিটকে বেরিয়ে আসে। এই বস্তুটি বাজারের স্টিল হুইপ বা লোহার চাবুকের মতন নয়। এ অন্য রকম। যদিও দেখতে মোটামুটি একই ধরনের। বিদেশ থেকে বস্তুটি যিনি আনিয়েছিলেন, সেই কাওলাসাহেব ছিলেন ভিক্টরের গুরু। তিনি দিল্লিতে চলে যাবার সময় ভিক্টরকে দিয়ে গেছেন। লোহার এই 'ব্যাটন' একটা চামড়ার খাপের মধ্যে ভরা থাকে।

ভিক্টর ব্যাটনটাকে দেখেশুনে নিল। খুঁজে বার করল হান্টিং টর্চ।

নোটন ফিরল খানিকটা বেলায়। বলল, "শর্মাবাবু দুপুরেই এসে পড়বেন।"

ভিক্টর বলল, "নোটন, কিছু জুট জোগাড় করে নে। হাত-মোছা জুট। টেনিস বলের মতন করে গোল করে নিবি। আর যাবার সময় মনে করে এক-দু' লিটার পেট্রল নিবি। ভুলিস না।"

নোটন আন্দাজ করে বলল, "দাদা, আজ কি বড় পিকনিক হবে?" বলে হাসল।

যে-কোনও রোমাঞ্চকর ব্যাপারকে নোটন বলে পিকনিক। কোনওটা ছোট, কোনওটা বড়।

ভিক্টর মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। তুই তৈরি হয়ে নিবি। শোন, দিদিকে কিছু বলবি না। বললে চেঁচাবে।"

নোটন মাথা নাড়ল, বলবে না।

জিপ এল। রামেশ্বর ড্রাইভার জিপ পৌঁছে দিয়ে চলে গেল তিনটের আগেই।

শর্মা এলেন চারটে নাগাদ।

ভিক্টর হেসে বলল, "আজ সন্ধেবেলায় পিকনিক করতে যাব।"

"পিকনিক?"

"ওই আর কী! দেখুন না কী হয়!"

"কোথায় যাবেন?"

"প্রথমে সুজনের বাগানে। সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে আবার ফিরব। তবে কলকাতায় নয়। ওই দিকেই।"

"কী ব্যাপার মশাই?"

"চলুন না, দেখবেন।"

"নতুন কিছু হয়েছে?"

"আগে থেকে শুনলে বুঝবেন না। সঙ্গে চলুন, দেখতে পাবেন। যদি কপাল ভাল হয়, ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে।" বলে একটু থেমে ভিক্টর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা শর্মাবাবু, আপনাদের অর্ধেন্দুবাবুর হাতের প্লাস্টার কাটা হয়েছে?"

আচমকা প্রশ্নে শর্মা একটু হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, "হ্যাঁ। কেন?"

"এমনি জিজ্ঞেস করছি। কবে কাটা হয়েছে? অবস্থা কী?"

"ভালই। হপ্তা তিনেক ছিল প্লাস্টার।"

"ভাঙা জোড়া লাগল?"

"বুঝলাম না।"

"দুর্ভোগ আর কী!"

শর্মা কিছু বললেন না।

জিনিসপত্র গুছিয়ে বেরোতে বেরোতে বিকেল গড়াল। হাতঘড়িতে সওয়া চার।

জিপের সামনের সিটে ভিক্টর আর নোটন। পেছনে বসেছেন শর্মা। শর্মা বার কয়েকই কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, জানতে চেয়েছেন, ব্যাপারটা কী হতে যাচ্ছে? ভিক্টর শুধু মুচকি হেসেছে। বলেছে, চলুন না, দেখবেন।

আজকের দিনটা ভাল। আকাশ পরিষ্কার। আলোও যথেষ্ট। গরম রয়েছে। তবে মাঝখানে যেমন আগুন ঝরছিল আকাশ থেকে, তেতেপুড়ে যাচ্ছিল মানুষ, গাছপালা, সেই গরম কেটে গিয়েছে। বার ছয়েক কালবৈশাখী উঠে গেছে এর মধ্যেই। আর পাঁচ-সাত বার। তারপর বর্ষা আসার পালা।

ভিক্টর পাকা ড্রাইভার। অকারণ জোরে যায় না, আবার ধীরেও নয়। ভি আই পি রোড ধরতে তার আধঘণ্টা মতন সময় গেল।

ভি. আই. পি. রোডে পড়ে ভিক্টর বলল, "শর্মাবাবু, আমরা প্রথমে সুজনের কাছে যাব।"

জায়গাটা খেয়াল ছিল ভিক্টরের। নিমগাছের সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করাল সে। কালভার্ট চোখে পড়ছে। জিপ থেকে নামতে নামতে শর্মাকে বলল, "একটু বসুন, আসছি।"

গাড়িটা আসার সময় বাঁ রাস্তা ধরে এসেছিল। অনেকটা এগিয়ে ডাইনের মোড় পেয়ে ঘুরে ডান রাস্তা ধরে আবার ফিরল। দাঁড়াল কালভার্টের কাছেই।

ভিক্টর জায়গাটা ভাল করে দেখে নিল। এই জায়গায় ট্যাক্সি পোড়ানো হয়েছিল। খুন হয়েছিল একটা লোক। লুঠ হয়েছিল দামি পাথর, সে বার্মিজ চুনিই হোক বা বহুমূল্য হিরেই হোক, বা হোক না কেন অন্য পাথর।

ট্যাক্সিটা যে পুড়েছিল সেটা বোঝা যায়, এখনও রাস্তার পাশে ঘাসের চেহারা লালচে মতন, কালচে হয়ে আছে খানিকটা জায়গা।

ভিক্টর ফিরে এল গাড়িতে। স্টার্ট দিল। বলল, "এবার সুজনের কাছে।"

গাড়ি এবার আধ-পাকা, একরকম কাঁচা রাস্তাই বলা যায়, পথ ধরে এগোতে লাগল।

যেতে যেতে ভিক্টর নোটনকে বলল, "নোটন, সেই জায়গাটার কথা খেয়াল রাখিস। একবার সার্ভে করে নেব। গাড়ি দাঁড় করাতে চাই না এখন।"

নোটন বলল, "স্লো করে দিয়ো।"

"চল দেখি।"

আধ-মাইলটাক পথ এগিয়ে এসে ভিক্টর জিপের স্পিড কমিয়ে দিল। সেই জায়গাটা সামনে এসে পড়েছে।

নোটন ভাল করে নজর করছিল। ভিক্টরও দেখছিল। রোদ এখনও পুরোপুরি পালায়নি। আলোর সঙ্গে হালকাভাবে মেশানো। চারদিক ভালই দেখা যায়।

আগে ভিক্টর লক্ষ করেনি। একটা পাশ একেবারেই নেড়া মতন। শুধু মাঠ, এবড়োখেবড়ো। অন্য পাশটায় গাছপালা ঝোপঝাড় রয়েছে। দু ফার্লং কি তার একটু বেশি হবে, দূরে জঙ্গল মতন। মানে, গাছগাছালির ঘন আড়াল।

ভিক্টর বলল, "নোটন, দূরে দেখছিস?"

মাথা নাড়ল নোটন। বলল, "সেদিন লোকটা বোধ হয় ওদিকেই পালিয়েছিল।"

"দূরবিনটা পকেটে আছে। নিয়ে দেখবি।"

ভিক্টর গাড়ি থামাতে চাইছিল না। নোটন দূরবিনটা বার করে নিল ভিক্টরের পকেট থেকে। দেখল মন দিয়ে। বলল, "দাদা, মনে হচ্ছে আমবাগান। বাঁশঝোপও আছে।"

"দেখি।" ভিক্টর ডান হাতে স্টিয়ারিং ধরে বাঁ হাতে দূরবিন নিয়ে চোখের সামনে ধরল। দেখল। বলল, "একটা ঘর টর আছে মনে হচ্ছে? দ্যাখ।"

নোটন দূরবিন ফের নিল। দেখল। বলল, "মালী-ঘর।"

"ঠিক আছে। রেখে দে।"

শর্মাবাবু বললেন, "কী দেখছেন আপনারা?"

ভিক্টর বলল, "সিনারি।" বলে হেসে উঠল।

শর্মাবাবু হাসির অর্থ বুঝলেন না।

ভিক্টর চট করে গাড়ি জোর করল না, যেমন ধীরে ধীরে আসছিল, সেই ভাবেই অনেকটা পথ এগিয়ে স্পিড্ বাড়াল। সে বোকা নয়। এখানে যদি এমন কেউ থাকে, যে নজরদারি করছে গাড়ি টাড়ি, সে যেন বুঝতে না পারে যে, একটা জিপ এই জায়গায় এসে থেমেছিল, চারপাশ দেখেশুনে চলে গেছে। তাতে সন্দেহ হবে। সতর্ক হয়ে যাবে ওরা।

সুজনের বাগানে আসতে আসতে রোদ চলে গেল। আলো থাকল। গোধূলির আলো।

সুজন অবাক হয়ে বলল, "ভিক্টরদা?"

ভিক্টর বলল, "তোমায় নিতে এসেছি। চলো, এক জায়গায় যাব। কাছাকাছি।"

"কোথায়?"

"দেখতেই পাবে। শোনো, আমাদের বেরোতে একটু দেরি হবে। অন্ধকার না হলে বেরোব না। সন্ধে করে যাব। ততক্ষণ একটু চা-টা খাওয়া যাক।...ভাল কথা, আমরা বেরোবার আগে তুমি একবার তোমার বাগানের লোকজনদের দেখে নেবে। তারা আছে, না কেউ বেরিয়েছে!"

"দশরথরা চলে গেছে একটু আগে।"

"তা যাক। যারা এখানে থাকে, তাদের দেখে নেবে। কিছু বলবে না।"

শর্মাবাবু বললেন, "আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, মশাই।"

"পারবেন", ভিক্টর হেসে বলল, "দেখুন না কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।"

॥ এগারো ॥

গাড়ির আলো নিভিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে ভিক্টর সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকল। সন্ধে হয়ে গিয়েছে। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। আকাশভরা তারা। মাঠঘাটের গন্ধ উঠছিল।

ভিক্টর শেষে বলল, "সুজন, সেদিন তোমার বাগান থেকে ফেরার পথে এই জায়গায় কেউ আমাদের ওপর গুলি চালিয়েছিল। লোকটাকে আমরা ধরতে পারিনি। কিন্তু তার চেহারার একটা আদল দেখেছি। আজ তার সঙ্গে, কিংবা তাদের দলের লোকের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করার ইচ্ছে।"

সুজন বলল, "গুলি? আপনাদের ওপর?"

"লোকটা আমাদের উপকারই করেছে। নাও, নেমে পড়ো। শর্মামশাই, নিন, নেমে পড়ুন। আপনি আবার ধুতি পরে ঘোরাফেরা করেন। মাঠের মধ্যে ছোটাছুটি করতে হলে তো মুখ থুবড়ে পড়বেন?"

নোটন নেমে পড়েছিল আগেই। ভিক্টর নামতে নামতে বলল, "জিনিসগুলো গুছিয়ে নে।"

ভিক্টর পুরোপুরি তৈরি। নোটনও।

সুজন নামল। শর্মাবাবুও নেমে পড়লেন।

ভিক্টর বলল, "সুজন, তুমি ওই কাঁধ-ব্যাগটা ঝুলিয়ে নাও, ওর মধ্যে জুটের গোলা মানে বল আছে। নোটন পেট্রলের ক্যানটা আপাতত নিয়ে নিক। পরে তোমায় নিতে হতে পারে।...শোনো, আমরা এখন আলো জ্বালব না। যখন দরকার হবে জ্বালব। অন্ধকারে যতটা পারি এগিয়ে যাব।"

"কোথায়?" সুজন বলল।

"এখানে একটা আমবাগান আছে। সেখানে যাব।"

"চলুন।"

ভিক্টর আর নোটন সামনে। পেছনে সুজন আর শর্মাবাবু।

সাবধানে মাঠে নেমে গেল ভিক্টররা। বলল, "কথাবার্তা না বলাই ভাল। বললেও নিচু গলায়।"

অন্ধকারেই মাথা নাড়ল সুজন।

অন্ধকারে মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে প্রথম প্রথম অসুবিধে হচ্ছিল। চোখ সইয়ে নেবার জন্য ধীরে ধীরেই হাঁটছিল চারজনে। খানিকটা পথ হেঁটে আসার পর মোটামুটি চোখ সয়ে গেল।

ভিক্টর একটু দাঁড়াল। নোটনকে বলল, "ওই দিকটায় না?"

"হ্যাঁ।"

ভিক্টর এবার বাঁদিক ধরে এগোতে লাগল।

বিশ-পঁচিশ পা এগোল কি এগোল না, আচমকা কুকুরের ডাক শোনা গেল। ডাকটা শুনতে ভাল নয়। অ্যালসেশিয়ান না বুনো কুকুর? বিকট শব্দ করে ডাকছিল। এই ডাক না সেদিনও শুনেছে ভিক্টররা?

ভিক্টর বলল, "সুজন, তুমি কুকুর পুষেছ?"

"না।"

"ডাকটা কেমন?"

"ভয় করে।"

ভিক্টর আর কিছু বলল না সুজনকে। নোটনকে বলল, "নোটন, সেদিনও ডাক শুনেছিলাম।"

মাঠের ওপর দিয়ে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার যেন ধীরে ধীরে জমে যাচ্ছে মাঠের ওপর।

কুকুরের ডাক কিন্তু থেমে গেল।

শর্মাবাবু হোঁচট খেলেন। কিন্তু সামলে নিলেন।

নোটন কয়েক পা এগিয়ে গেল। ভিক্টর সামান্য পিছনে। নোটনের কতক ইন্দ্রিয় খুব তীক্ষ্ণ, সে যেন কোনও বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল। নিচু গলায় ভিক্টরকে বলল, "দাদা, পেট্রলের ক্যানটা ধরতে হবে।"

ভিক্টর এগিয়ে ক্যান নিল, নিয়ে সুজনকে দিল।

নোটন তার 'হাতিয়া' বার করে নিল।

ভিক্টর বাঁ হাতে টর্চ নিল। ডান হাতে আপাতত কিছু নিল না। কিন্তু ব্যাটন নেবার জন্যে তৈরি থাকল।

সাবধানে এগোতে লাগল নোটন, পিছনে ভিক্টর। কুকুরের ডাক থেমে যাবার পর অদ্ভুত চুপচাপ লাগছিল। যেন এই জায়গাটা একেবারে জনমানবশূন্য।

আরও একটু এগোবার পর অন্ধকারে থমথমে ছায়ার মতন দাঁড়িয়ে থাকা আমবাগান আর বাঁশঝোপ চোখে পড়ছিল। জায়গাটাকে ভুতুড়ে দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন কোনও ভাঙাচোরা পুরনো বাড়ি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

সুজন কাঁটাঝোপে পা আটকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। শর্মাবাবু তার পেছনে। সে বলতে যাচ্ছিল, 'কাকাবাবু, সামলে,' এমন সময় আবার সেই কুকুরের ডাক। এবার কাছে। অন্ধকার থেকে ছুটে আসছে।

নোটন কিছু বলার আগেই ভিক্টর তার টর্চ জ্বালল। হান্টিং টর্চ। আলোয় ঝলসে উঠল সামনেটা।

এমন একটা কুকুর এখানে দেখার কথা নয়। কী জাতের কুকুর কে জানে! যেমন বিশাল দেখতে, তেমনই তার ডাক। বীভৎস।

নোটনের হাতে সময় নেই। কুকুরটা যে হিংস্র, মারাত্মক, বুঝতে তার বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি। হাতিয়া তার হাতেই আছে। কিন্তু হাতিয়ায় কি ওই বীভৎস জন্তুটাকে ঘায়েল করা যাবে। নোটন ঠিক করে নিল, প্রথমে হাতিয়া ছুড়বে। তারপর 'চিতি'। চিতি

কোনও রকমে যদি একবার জন্তুটার চোখ কিংবা গলার কাছে গেঁথে যায়, তবে ওর সাধ্য নেই দাঁত বসাবার।

ভিক্টরও পলকের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল। ব্যাটন বার করে স্প্রিংয়ের বোতামে হাত দিতেই যেন সাপের ছোবলের মতন বেরিয়ে এল ভেতরের অস্ত্রটা।

কুকুরটা কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল কি না কে জানে!

নোটন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার হাতিয়া ছুড়ল। নিশানা ভুল হল না। হতে পারত। সোজা গিয়ে মুখে লাগল অস্ত্রটা। নেহাতই কপাল। গায়ে লাগতে পারত। সোজা গিয়ে গায়ে লাগলে ওর বোধ হয় বিশেষ কিছু হত না।

মুখে লাগার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা যে কী বীভৎস ভাবে চেঁচিয়ে উঠল, কানে না শুনলে বোঝা যাবে না।

ভিক্টর নোটনকে সরিয়ে দিয়ে তার ব্যাটন নিয়ে দাঁড়াল। এই করাতের মতন দাঁততোলা ইস্পাতের চাবুক দু-ঘা কুকুরটার মুখে গলায় গায়ে পড়লে লেজ গুটিয়ে পালাবে।

"তুই আগুন জ্বাল!" ভিক্টর বলল, "শিগগির!"

নোটন তাড়াতাড়ি সুজনের কাছ থেকে কাঁধ-ঝোলাটা নিয়ে জুটের বল বের করে ফেলল। "পেট্রল ঢালুন। তাড়াতাড়ি।"

কুকুরটা আচমকা মার খেয়ে বিশ্রিভাবে কেঁদে উঠেছিল, তারপর লাফিয়ে এগিয়ে এল। আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু মুখে হাতিয়ার চোট লাগার দরুন তার নিশানা ভুল হল। ভিক্টর তার ব্যাটন চালাল। ইস্পাতের ধারালো চাবুক দু-ঘা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা এমন ভাবে চেঁচাতে লাগল যেন মরে যাচ্ছে। বার দুই লুটোপুটি খেল। বিকট করে চেঁচাল।

আশ্চর্য ব্যাপার, আর এগোল না কুকুরটা। পালাতে লাগল।

ততক্ষণে নোটন জুটের গোলা পেট্রলে ভিজিয়ে ফেলে দিয়েছে মাটিতে, দিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দিয়েছে। দপ করে আগুন জ্বলে উঠল।

ভিক্টর বলল, "আরও জ্বাল। এগিয়ে গিয়ে।"

নোটন আর সুজন এগিয়ে গিয়ে আরও গোটা তিনেক জুটের গোলায় আগুন জ্বালাল।

এবার যেন আলো হয়ে গেল আমবাগানের সামনেটা।

শর্মাবাবু হতভম্ব। তিনি কিছু বলছেন না। বলতে পারছেন না।

ভিক্টররা এগিয়ে গেল।

আমবাগানের কাছে আসতেই চোখে পড়ল, বাগানের মধ্যে একটা খাপরা-ছাওয়া বাড়ি। বাগান যেন বাড়িটাকে চারদিক থেকে আড়াল করে রেখেছে। ভিক্টর আগেই এটা ঝাপসা ভাবে দেখেছিল তার দূরবিনে।

"চল, দেখি। এসো সুজন। সাবধানে।"

বাগানের গাছপালার তলা দিয়ে এগিয়ে যেতেই টর্চের আলোয় বাড়িটা পুরোপুরি

দেখা গেল। একেবারে ফেলনা বাড়ি নয়। ইট আর খাপরা দিয়ে গড়া। ছোট হলেও একেবারে এক-কামরার কুঁড়ে নয়। সামনে একটা কুয়ো।

আমবাগানের মালীর বাড়ি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এমন করে ঘরদোর জানলা বানিয়ে কি মালী থাকে?

এখানে যে লোক থাকে, বোঝাই যাচ্ছিল। বাড়িটার সামনে মাঠে বাঁশের খুঁটিতে তার বাঁধা। একটা গামছা ঝুলছে তারে। কুয়োর কাছে দড়ি বালতি। ভিক্টর বলল, "নোটন, আরও দুটো গোলা জ্বালিয়ে দে। আলো বেশি হলেই ভাল।"

নোটনের যেন মজাই লাগছিল। এর আগে যে জুটের বলগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে, তার আগুন ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে। গরমের দিন। শুকনো পাতা, শুকনো ঘাস, দু-একটা ছোটখাটো ডালপালা আগুন পেয়ে দিব্যি জ্বলতে শুরু করেছে। পেছন দিকটা আগুনের আলোয় এখন বেশ স্পষ্ট।

সুজনও কেমন করে বুঝতে পেরেছিল, এই জায়গাটা ভাল নয়, এখানে কিছু আছে, কিছু ঘটেছে। সে তাড়াতাড়ি কাঁধ-ঝোলা থেকে জুটের গোলা এগিয়ে দিল।

নোটন পাঁচ-দশ পা এগিয়ে পেট্রলে ভিজিয়ে নিল গোলাগুলো। আরও খানিকটা এগিয়ে এমন করে গোটা তিনেক গোলা জ্বালিয়ে দিল, যেন দেওয়ালিতে তুবড়ি জ্বালাচ্ছে।

শর্মাবাবু ঘামছিলেন। তাঁর বুক কাঁপছিল। কী করছে এরা?

দেখতে দেখতে সামনের দিকটা আগুনের আলোয় লাল মতন হয়ে উঠল।

কুকুরটা ডেকে উঠল আবার। এই ডাক কান্নার মতন। জন্তুটা যে কোথায় লুকিয়ে আছে বোঝা যাচ্ছে না। বোধ হয় বাড়ির পেছন দিকে পালিয়ে গিয়েছে।

ভিক্টর এগিয়ে গেল।

"দাদা, ওই যে...!" নোটন হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "সেই লোকটা!"

কুয়োতলার সামনে কুলঝোপ। তার আড়াল থেকে দৈত্যের মতন লোকটা বেরিয়ে এসেছে। বিশাল চেহারা, ঝাঁকড়া চুল, পরনে কালো পাজামা, গায়ে আলখাল্লার মতন কালো জামা। হাতে টাঙ্গি। আগুনের আলোয় টাঙ্গির ফলা ভয়ংকর দেখাচ্ছিল।

ভিক্টর বুঝতে পারল, এই লোকটার হাত থেকে বাঁচতে হলে আর দেরি করা চলবে না। "নোটন!"

প্রায় চোখের পলকে ভিক্টর হাতের টর্চ সুজনের হাতে গুঁজে দিল। তারপর তার ব্যাটন নিয়ে এগিয়ে গেল। নোটনও তৈরি। তার একহাতে হাতিয়া, অন্য হাতে চিতি।

টাঙ্গি তুলে দৈত্যটা এগিয়ে আসছিল। আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সে কেমন অবাক হয়ে ভিক্টরের হাতের অস্ত্রটা দেখছিল। এমন অদ্ভুত অস্ত্র সে দ্যাখেনি যেন জীবনে। হাত-আড়াই লম্বা একটা ইস্পাতের ধারালো দাঁতকাটা ফলা যেন লক লক করছে।

ভিক্টরও লোকটাকে দেখছিল। কে প্রথম আক্রমণ করবে, কে নিজেকে বাঁচিয়ে পালটা আক্রমণ করবে, বোঝা যাচ্ছিল না।

প্রায় যেন লাফিয়ে পড়ার মতন লোকটা টাঙ্গি তুলে লাফিয়ে পড়ল ভিক্টরের সামনে।

ভিক্টর নজর রেখেছিল। সামান্য সরে গিয়ে তার ব্যাটন চালাল। লোকটার হাতে লাগতে লাগতে একটুর জন্যে লাগল না, না লেগে তার টাঙ্গির তলায় গিয়ে লাগল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লোকটা টাঙ্গি বাঁচিয়ে আবার হাত তুলল। ততক্ষণে নোটনের হাতিয়া গিয়ে তার কাঁধে লেগেছে, ভিক্টরও আবার ব্যাটন চালাল।

কী যে হল, বোঝার আগেই দেখা গেল লোকটা পালাচ্ছে। টাঙ্গি মাটিতে পড়ে।

নোটন তাকে তাড়া করল।

ভিক্টর কুয়োতলার কাছে এগিয়ে গেল।

কুয়োতলার হাত-বিশেকের মধ্যে বাড়িটা। গোটা দুই ঘর। একটা ঘরের দরজায় তালা। জানলা বন্ধ। অন্য ঘরটা হাট করে খোলা।

সুজন আর শর্মাবাবুও এগিয়ে এলেন।

ভিক্টর এগিয়ে গিয়ে খোলা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। সুজন আলো ফেলল টর্চের। ঘর ফাঁকা। কেউ নেই। তবে ঘরের মধ্যে খাট-বিছানা থেকে পোশাকআশাক, মা কালীর ছবি, সবই রয়েছে।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে গোঙানির মতন শব্দ শোনা গেল।

ভিক্টর শব্দটা শুনল কান দিয়ে। "সুজন, এই ঘরে কেউ আছে।"

"তালা বন্ধ।"

"তুমি টাঙ্গিটা তুলে আনো।"

ভিক্টররা বাইরে এল, বারান্দায়।

সুজন টাঙ্গি তুলে আনল।

"দরজার মধ্যে... না তুমি আমায় দাও।"

সুজন বুঝতে পেরেছিল দরজার তালা ভাঙতে হবে। বলল, "আপনি দাঁড়ান। আমি তালা ভাঙছি।"

সামান্য সময় লাগল সুজনের। তালা ভেঙে গেল।

দরজা খুলে আলো ফেলল সুজন।

হাত-পা-মুখ-বাঁধা একটা লোক কোনও রকমে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেঁড়া জামা। পরনে ময়লা লুঙ্গি। লোকটাকে ভূতের মতন দেখাচ্ছিল।

সুজন যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। চেঁচিয়ে উঠল, "মুস্তাফিবাবু!"

ভিক্টরও চমকে গেল। এইভাবে এখানে মুস্তাফিকে দেখা যাবে, সেও কল্পনা করতে পারেনি।

মুস্তাফি মাথা নেড়ে ইশারা করছিল, তার মুখের কাপড় খুলে দিতে।

ভিক্টর সুজনের দিকে তাকাল, "খুলে দাও।"

সুজন এগিয়ে মুখের কাপড় খুলল মুস্তাফির। লোকটা মুখ হাঁ করে শ্বাস টানতে লাগল। গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না। কাশল।

মুস্তাফির হাতের বাঁধন, পায়ের বাঁধনও খুলে দিল সুজন।

প্রায় টলতে টলতে মুস্তাফি ঘরের মধ্যে রাখা দড়ির খাটিয়ায় গিয়ে বসে পড়ল। "একটু জল," বলে ঘরের কোণে রাখা কলসি দেখাল।

শর্মাবাবু এগিয়ে গিয়ে জল এনে দিলেন, অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে করে। গ্লাস ছিল কলসির পাশে।

জল খেয়ে দম নিয়ে মুস্তাফি বলল, "আমি ভাবতে পারিনি উদ্ধার পাব। সেই শয়তান কালাকুর্তা কোথায়?"

"পালিয়েছে।"

"শয়তানটাকে ছেড়ে দিলেন? লোকটা মার্ডারার, জল্লাদ।"

"আপনি?" ভিক্টর তীক্ষ্ণভাবে মুস্তাফিকে নজর করতে করতে বলল।

মুস্তাফি বলল, "আমি অ্যান্টি স্মাগলিং স্কোয়াডের ইনটেলিজেন্সের লোক।"

ভিক্টরের গলা দিয়ে শব্দ বার হল না।

"আমাকে একটু বাইরে নিয়ে চলুন। ...আজ মাসখানেক ধরে আমি এই ঘরে। শুধু স্নান-বাথরুমের সময় বাইরে বার করে। করে কুকুর পাহারা বসিয়ে দেয়। আমাকে ওরা..."

সুজন মুস্তাফির হাত ধরল।

উঠে দাঁড়াল মুস্তাফি। পায়ে যেন জোর নেই। টলতে টলতে বাইরে এল। বাইরে তখনও আগুন জ্বলছে।

ভিক্টর বলল, "আপনাকে কি ধরে এনে গুম করে রেখেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"কারা?"

"কালাকুর্তার মালিকরা।"

"তারা কারা?"

"স্মাগলারদের একটা গ্যাঙ। ভাড়াটে গুণ্ডা।"

"কবে ধরে এনেছিল?"

"আমি যেদিন সুজনবাবুর বাগান থেকে ফিরছিলাম।"

"আপনি সুজনের বাগানে কেন গিয়েছিলেন?"

"সে অনেক কথা। ...এখন বলতে পারব না। ...আমাকে আপনারা যদি একবার লোকাল পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে দেন।"

হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা গেল। কাছাকাছি নয়। খানিকটা তফাতে।

সুজনরা চমকে গিয়েছিল। ভিক্টর সাবধান হয়ে গেল। বলল, "তাড়াতাড়ি ঘরে যাও, সুজন। নোটন মাঠে। আমি দেখছি।"

সুজন, মুস্তাফি আর শর্মাবাবু ঘরে ফিরে এল। দরজা বন্ধ করল না।

ভিক্টর ছুটতে ছুটতে পঁচিশ-তিরিশ গজ যেতেই দেখতে পেল, নোটন। সান্যালসাহেবও আসছেন। সান্যালসাহেবের হাতে পিস্তল।

আরও একটু নজর করে বুঝতে পারল, রাস্তায় তার জিপগাড়ির পাশে একটা

মোটরবাইক।

মোটরবাইকটা যে সান্যালসাহেবের, বুঝতে কষ্ট হল না ভিক্টরের।

॥ বারো ॥

অর্ধেন্দু ঘরে এল।

যুগলকিশোর সোফায় বসে আছেন একপাশে। অন্য সোফাসেটিতে সান্যালসাহেব আর ভিক্টর। আর-একদিকে মুস্তাফি, সুজন আর শর্মাবাবু।

সাতসকালে বাড়িতে পুলিশের লোক এসেছে শুনে অর্ধেন্দুর মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে সুজনদের দিকে তাকাল।

ভিক্টর অর্ধেন্দুকে দেখছিল। রূঢ় রুক্ষ চেহারা। রাগী চোখ। পরনে পাজামা আর হাতকাটা পাঞ্জাবি। এক হাতে ক্রেপ ব্যান্ডেজ জড়ানো, প্রায় কনুই পর্যন্ত।

যুগলকিশোর কোনও রকমে বললেন, "ওঁরা পুলিশের লোক। তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন।" ওঁকে বড় রুগ্ন, দুর্বল মনে হচ্ছিল। ভয়ে কাঠ।

অর্ধেন্দু বলল, "পুলিশের লোক এ-বাড়িতে কেন?"

সান্যাল মুচকি হাসলেন। বললেন, "আপনার ভাগের—মানে শেয়ারের বার্মিজ চুনিগুলো কোথায়?"

অর্ধেন্দু যেন কিছুই বুঝতে পারেনি। বলল, "বার্মিজ চুনি। কী বলছেন! চুনি আমি কী করব! আপনারা..."

অর্ধেন্দুকে থামিয়ে দিয়ে সান্যাল বললেন, "আপনারা যান ডালে-ডালে আমরা ঘুরি পাতায়-পাতায়। আপনি ভাল করেই জানেন, দমদম এয়ারপোর্ট থেকে আপনাদের এক এজেন্ট বার্মিজ চুনি নিয়ে আসছিল। আপনারা সন্দেহ করেছিলেন, সেই এজেন্ট চুনিগুলো জুয়েলার বারজাতিয়াকে বিক্রি করে দেবে। লোকটাকে আপনারা খুন করেন। তার ট্যাক্সি পুড়িয়ে দেন।"

"কী যা-তা বলছেন! আমি এসব জানি না।"

"জানেন।" সান্যাল হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর চেহারা যেন মুহূর্তে অন্যরকম হয়ে গেল, "মিথ্যে চালাকি করার চেষ্টা করবেন না। আপনি, শশীকান্ত বলে এক জুয়েলার, আর রামমনোহর সিং, তিনজনে ছক কষে চুনি লুঠ করেছেন। ভাড়াটে লোক দিয়ে খুন করিয়েছেন লোকটাকে।"

অর্ধেন্দু বলল, "আপনি কি আমাকে ধমকাতে এসেছেন?"

"আপনাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছি।"

"অ্যারেস্ট! পুলিশ হয়েছেন বলে মাথা কিনেছেন!" অর্ধেন্দু যেন খেপে গেল।

সান্যাল বললেন, "না, মাথা কিনিনি। আপনারাও আমাদের কেনেননি। এই বাড়ি সার্চ হবে। আপনারা অনেক দিন ধরে স্মাগলিংয়ের দলে আছেন। আমরা লোক এনেছি। তল্লাশি করব।"

"সার্চ! হোক...! দেখুন কী পান!" অর্ধেন্দু ব্যঙ্গ করে বলল।

ভিক্টর শর্মাবাবুর দিকে তাকাল একবার। তারপর চোখের ইশারা করল। শর্মাবাবু মাথা নাড়লেন।

ভিক্টর সান্যালকে বললেন, "সান্যালসাহেব, সার্চ তো হবেই, তার আগে আপনি কি ভদ্রলোককে হাতের ক্রেপ-ব্যান্ডেজটা খুলতে বলবেন?"

সান্যাল সাহেব কথাটার অর্থ বুঝলেন না। অবাক হয়ে তাকালেন। বললেন, "ব্যান্ডেজ?"

ভিক্টর বলল, "উনি হাত ভেঙেছেন বলে প্লাস্টার বেঁধে একবার বোধ হয় চোখে ধুলো দিয়েছেন। সেটা মাসখানেক আগের ঘটনা। সুজনের বাগানের বাইরে খুন হবার পর। বোধ হয় তখন কোনও ভয় বা সন্দেহ হয়েছিল। আর আজ বেঁধেছেন ক্রেপ-ব্যান্ডেজ। বোধ হয় আমাদের চোখে ধুলো দিতে। ব্যান্ডেজ উনি বাঁধেন না। আজই বেঁধেছেন, আমরা এসেছি দেখে।... তা ছাড়া যে-হাতটা ভেঙেছিল বলেছিলেন, এটা সে-হাত নয়। তাড়াতাড়িতে ভুল করে ফেলেছেন।"

সান্যাল বললেন, "আচ্ছা! বুঝেছি।" নিজেই এগিয়ে গেলেন সান্যাল। অর্ধেন্দুর হাত ধরে ফেলে ঠাট্টার গলায় বললেন, "আপনার ব্যান্ডেজ বাঁধা ঠিক হয়নি। দিন, আমি বেঁধে দিচ্ছি। অবশ্য না খুললে তো বাঁধতে পারব না।"

যুগলকিশোর যেন পাথর। চোখমুখ কালো হয়ে গেছে।

সান্যাল বুঝতে পারলেন, অর্ধেন্দুর হাত কাঁপছে। মুখে ঘাম জমতে শুরু করেছে।

ক্রেপ-ব্যান্ডেজ খুলতে খুলতে সান্যাল বললেন, "আপনার বিরুদ্ধে আমাদের অন্য অভিযোগও আছে। আপনি আপনার এক পার্টনার শশীকান্তকে বলেছিলেন, আপনার চুনিগুলো আপনি সুজনের বাগানে তার ঘরে লুকিয়ে রেখেছেন। শশিকান্ত আমাদের কাছে সেই কথাই বলেছে। সে আপনার চেয়েও বড় ধরনের ক্রিমিন্যাল। তার হাতে গুণ্ডা, জল্লাদ, সবই আছে। আর আছে লুকোনো বাগান-ডেরা। তার লোভ হয়েছিল, সুজনের ঘর থেকে চুনিগুলো বার করে নেবে। কিন্তু একটা মস্ত ভুল করেছিল। এই যে মুস্তাফি, এ আমাদের লোক। মুস্তাফির আসল নাম প্রতাপ মজুমদার। এত শক্ত করে কেউ ব্যান্ডেজ বাঁধে! ব্লাড সার্কুলেশন হবে না, মশাই! কী বলছিলাম যেন, মুস্তাফির কথা। হ্যাঁ, মুস্তাফি একদিন সুজনের বাগানে ব্যাপারটার খোঁজখবর করতে যায়। আমরা নানা ধরনের ইনফরমেশান পাচ্ছিলাম। শশিকান্ত তখনও ধরা পড়েনি। আমাদের ইনফরমার টুকরোটাকরা খবর দিচ্ছিল। সুজনবাবুকে বাজিয়ে দেখতে গিয়েছিল মুস্তাফি। তার মনে হয়, ব্যাপারটা মিথ্যে। সান্যাল মুস্তাফির দিকে তাকালেন। বললেন, "তুমি বাকিটা বলো মুস্তাফি... আই মিন, মজুমদার।"

মুস্তাফি ওরফে মজুমদারকে এখন অন্য রকম দেখাচ্ছিল। পরনে শার্ট-প্যান্ট। মজুমদারের খোয়া যাওয়া বাঁধানো দাঁতটা নেই। চোখে অবশ্য চশমা রয়েছে। এটা তার ডুপ্লিকেট চশমা। বেশি চোখ খারাপ বলে এক সেট বাড়িতে রেখে দেয় সব সময়।

মজুমদার বলল, "আমি সুজনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বুঝতে পেরেছিলাম, ভদ্রলোক ইনোসেন্ট। আমি এটাও বুঝেছিলাম, যদি কেউ ওঁর ঘরে বা বাগানের

কোথাও চুনি লুকিয়ে রেখেও থাকে, উনি কিছু জানেন না। একবারও আমি চুনি-পান্নার কথা তুলিনি, শুধু মানুষটাকে বুঝে নিচ্ছিলাম।... তা হঠাৎ কালবৈশাখী উঠল। তারপর বৃষ্টি।"

"তুমি সুজনবাবুর ছাতা আর টর্চটা ধার করে ফিরছিলে?"

"হ্যাঁ, সার। ...হঠাৎ বাগানের বাইরে খানিকটা চলে আসার পর রাস্তায় আমার ওপর কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

"তার আগে যে তোমার গার্ড যোগিয়াকে খুন করেছে, তুমি দেখতে পেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, সার! যোগিয়া মাটিতে পড়ে ছিল। কিন্তু সে যে খুন হয়েছে, তা বুঝতে পারিনি। আমি যখন তাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে তাকে দেখবার জন্য টর্চ জ্বেলে উবু হয়ে বসেছি, ঠিক তখন আমার ওপর কে ঝাঁপিয়ে পড়ল! আমি তার জোরের সঙ্গে পারলাম না।"

"লোকটা তোমাকে গলার টুঁটি চেপে ধরে নিয়ে চলে গেল। গুম করল?"

"হ্যাঁ, সার! আমায় মেরে ফেলতে পারত। কেন মারেনি জানি না।"

"বোধ হয় একই জায়গায় দু-দুটো খুন করতে ভয় পেয়েছিল। কিংবা ভেবেছিল, তুমি... আরে, এ কী! অর্ধেন্দুবাবু, এগুলো কী?"

অর্ধেন্দুর হাতের ক্রেপ-ব্যান্ডেজ পুরোপুরি খোলা হয়ে যেতেই দেখা গেল, তার হাতের মুঠোয় আট-দশটা পাথর। শুধু চুনি নয়, হিরেও আছে বোধ হয়।

অর্ধেন্দু কোনও কথা বলল না। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন বুঝতে পেরেছে, ধাপ্পা মারার, পালাবার বা কোনও ছুতোয় নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা নিরর্থক। চুপ করে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে।

সান্যাল পাথরগুলো নিয়ে ভিক্টরকে বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ ভিক্টরসাহেব।"

যুগলকিশোর মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে বসে। যেন কাঁদছেন। শুধু বললেন, "খুনটুন আমরা করিনি। করাইনি। বিশ্বাস করুন।"

অর্ধেন্দু হঠাৎ বলল, "শশিকান্তকে আমি দেখে নেব।"

"পরে। পরে দেখবেন।... এখন তাকে আমরা দেখছি।"

সুজন, শর্মাবাবু আর ভিক্টর ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরছিল। সুজনরা যাবে তাদের কলকাতার বাড়িতে। ঠাকুমা'র কাছে।

যেতে যেতে সুজন বলল, "ভিক্টরদা, আপনি আমাকে বাঁচালেন। আমার ঠাকুমা যে কী স্বস্তি পাবে আজকে..."

ভিক্টর বলল, "আমি তোমাকে যতটা বাঁচিয়েছি, ততটাই বাঁচিয়েছেন সান্যালসাহেব। ভদ্রলোক যে তোমার চারদিকে কত রকম ভাবে নজর রেখেছিলেন, আজ আমি বুঝতে পারছি।"

শর্মাবাবু বললেন, "ভদ্রলোক আমাদের পিছু নিয়ে নিয়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। নয়তো ওই দৈত্যটা ঘায়েল হত না।"

ভিক্টর বলল, "সান্যালসাহেবের পিস্তলের গুলি খেয়েও লোকটা মরেনি। কড়া জান। ...হাসপাতালে পড়ে আছে। ভালই হয়েছে। একটা মারাত্মক খুনে ধরা পড়েছে। এই মামলায় ও একটা বড় উইটনেস।"

সুজন বলল, "ভিক্টরদা, নোটনবাবুকেও আমাদের বাড়িতে আনতে হবে একদিন। নোটনবাবু দারুণ সাহসী।"

ভিক্টর হেসে বলল, "নোটন আমার ডান হাত। ওর অনেক গুণ। পরে বলব।"

খানিকটা এগিয়ে এসে শর্মাবাবু বললেন, "কর্তামায়ের কাছে আজ আমি নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়াতে পারব।" বলে বড় করে নিশ্বাস ফেললেন, যেন স্বস্তির হাঁফ ছাড়লেন। তারপর একটু অন্যমনস্ক থেকে বললেন, "আর-একটা কথা বলি। যাদের অন্ন খেয়েছি এতকাল, তারা যে খুনখারাপির মধ্যে ছিল না, এটা ভেবে খানিকটা ভাল লাগছে।"

ভিক্টর বলল, "না, যুগলবাবু আর অর্ধেন্দু খুনখারাপির মধ্যে ছিল না। ছিল শশিকান্ত। শশিকান্ত চেয়েছিল অর্ধেন্দুর ওপর বাটপাড়ি করতে। ভুল করে ফেলেছিল। ওর ভাড়াটে জল্লাদটা ভেবেছিল মুস্তাফি আর তার গার্ড নিশ্চয় অর্ধেন্দুর পাঠানো লোক। তা সুজনের বাগানের বাইরে খুনের ঘটনা ঘটে যাবার পর অর্ধেন্দু বুঝতে পেরেছিল, কাজটা কার। সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বার্মিজ চুনিগুলো সবসময় নিজের কাছে রাখত, হাতে প্লাস্টার বেঁধে। কোথাও বেরোত না। পরে যখন মনে হল, অবস্থাটা থিতিয়ে আসছে, তখন অফিসে বার হল। কিন্তু..."

সুজন বলল, "এই জন্যেই কি ওরা চাইছিল না যে, আপনি আমার হয়ে খুনের ব্যাপারটার তদন্ত করুন?"

"হ্যাঁ। ওরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কোন সাপ বেরিয়ে পড়ে কে জানে!"

ভিক্টর আরাম করে এবার একটা সিগারেট ধরাল। বলল, "সবই হল, শুধু ওই লোহার বল, যেটা দিয়ে মাথায় মেরে মানুষ মারত জল্লাদটা, সেটা খুঁজে পাওয়া গেল না। যাবে নিশ্চয়। জল্লাদটার একটু হুঁশ আসুক। নিজেই বলবে। আমি মানুষ মারার অনেক অস্ত্র দেখেছি। বলটা একবার দেখার ইচ্ছে।"

ডা কা ত - কা হি নী

রাবণের মুখোশ

রাজা রামজয় রায়। রামজয় রাজা ছিলেন না ; রাজা উপাধিও পাননি। তিনি ছিলেন জমিদার। প্রজারাই খাতির করে সাবেকি রীতিতে তাঁকে রাজা বলত।

রামজয়ের আসল জমিদারি ছিল মনসাচরে। মনসাচর জায়গাটা খুব বড় নয়, আবার ছোটও নয় তেমন। মোটামুটি আয়তন। তবে জায়গাটা সুন্দর। দ্বারভূমের শেষ, সাঁওতাল পরগনার শুরুতেই মনসাচর। পশ্চিমে একফালি নদী, উত্তরে পাহাড়ি জমি। নদীতে আট-দশ মাস জলই থাকে না, বর্ষায় জল আসে, শীতে ফুরিয়ে যায়। বাকি সময়টা শুকনো, শুধু বালি আর বালি, বড়জোর মাঝনদীতে গোড়ালি-ভেজা একটু জলের ধারা।

মনসাচর ছাড়াও আশেপাশে অল্পস্বল্প জমিজায়গা আছে রামজয়ের। জমিদারি দেখাশোনায় এই মানুষটির নজর নেই এমন বলা যাবে না ; আবার সেকালের পাকা জমিদারদের মতন তিনি না কঠোর না দুর্জন। প্রজারা রামজয়কে পছন্দই করত।

এই গল্পের শুরু এক শীতের সকালে। তবে তখনও তেমনভাবে শীত আসেনি। মাসটা অগ্রহায়ণের একেবারে শেষ।

সময়ের কথাটাও একটু বলে রাখতে হয়। তখন ইংরেজদের আমল। প্রায় সোয়াশ' বছর আগের কথা। সাহেবরা এ-দেশে জাঁকিয়ে বসেছে ঠিকই, তবে রাজকর্মে অনেক গাফিলতি ছিল। বিশেষ করে শাসনের ব্যাপারটা ছিল আলগা, দুষ্টজনের অত্যাচার দমন করার মতন ব্যবস্থা ও ক্ষমতা কোনওটাই তেমন ছিল না সরকারের!

গল্পটা এবার শুরু করা যেতে পারে।

সেদিন সকালে রামজয়ের মন ভাল ছিল না। তাঁর একটা শখের আরবি ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটার যে বয়েস হয়েছিল তাও নয়, তবু বেচারির কী যে অসুখ করল, তাকে সারানো গেল না। ঘোড়াটা মরেনি এখনও, তবে মরতে চলেছে।

বিশাল জমিদারবাড়ির একপাশে আস্তাবল। ভেতর মহলের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।

আস্তাবল থেকে ঘোড়াটাকে দেখে রামজয় ফিরছিলেন। বিষণ্ণ মুখ। এই তো সেদিনও সকালে ঘোড়াটাকে নিয়ে তিনি নদীর পাশ দিয়ে কতটাই না ছুটে বেড়িয়েছেন। আর আজ বেচারি মরতে চলেছে! কী যে হল ঘোড়াটার, কে জানে!

"রাজাবাবু ?"

রামজয় মুখ তুললেন। দু'হাত জোড় করে পাঞ্জালি দাঁড়িয়ে। ঘাড় পিঠ নুইয়ে নমস্কার করল বিনীতভাবে। তার পায়ের কাছে মাটিতে এক পুঁটলি আর শতরঞ্জি মোড়া ছোট বিছানা।

"পাঞ্জালি ? কী খবর ?"

"খবর ভাল নয়। বলতে সাহস পাচ্ছি না, রাজাবাবু !"

"কেন ?"

"আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, মনে অশান্তি রয়েছে। আপনি বড় কাতর— !"

পাঞ্জালির কয়েকটা মুদ্রাদোষ আছে, তার মধ্যে 'কাতর' শব্দটাকেও ধরা যায়।

অন্যদিন হলে রামজয় হয়তো হেসে বলতেন, 'তোমায় অনেক দিন না দেখলেই কাতর হই হে ! বলো, কী খবর !....' আজ আর হাসলেন না, সামান্য মাথা নাড়লেন। বললেন, "ঘোড়াটাকে আর বাঁচাতে পারলাম না হে ! ও চলে যাবে। কী করব ? চেষ্টা তো করলাম অনেক।"

কথা বলতে-বলতে রামজয় ছোট কাছারি বাড়ির দিকে এগিয়ে চললেন। সকালে তিনি ছোট কাছারিতে বসেন। বড় কাছারিতে নায়েব, গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারীরা বসে। বড় কাছারি এখন প্রায় ফাঁকা।

পাঞ্জালি রামজয়ের পেছন-পেছন হাত কয়েক তফাত রেখে হাঁটছিল। তার জিনিসগুলো সে তুলে নিয়েছে মাটি থেকে। লোকটার বয়েস বছর পঁয়তাল্লিশ। চোখে দেখে বয়েস বোঝা যায় না ওর। রোগা গড়ন, মাথায় লম্বা, চৌকো ধরনের মুখ, সামান্য গোঁফ-দাড়ি, মাথার চুল বাবরি ছাঁদের, গায়ের রং মিশমিশে কালো। পরনে মোটা ধুতি, গায়ে কোর্তা, মোটা একটা চাদর। পায়ে মোষের চামড়ার নাগরা, ধুলোয় ভরা।

পাঞ্জালি নাকি একসময়ে বুনো হাতি ধরার দলের সঙ্গে ছিল। পরে গণ্ডগোল হওয়ায় দল ছেড়ে দিয়েছিল। পরে আখের খেতে কাজ করেছে, আখের পর কুঠিবাড়িতে। সেটাও ছেড়ে দেয়। তারপর এটা-সেটা। কোথাও মন বসাতে পারেনি। এখন ঘোরাঘুরিই যেন তার পেশা। বাউণ্ডুলে স্বভাবের লোক।

রামজয় এই বাউণ্ডুলে লোকটিকে নিজের কাছে রাখতেই চেয়েছিলেন। পারেননি। তবে সে মাঝেমধ্যেই রামজয়ের কাছে আসে। দশ-পনেরো দিন থাকে, আবার উধাও হয়ে যায়। নিজেই আবার এসে হাজির হয় হঠাৎ। রামজয় স্নেহই করেন পাঞ্জালিকে।

ছোট কাছারির দরজা খোলা। রাজাবাবুর বসার জায়গার ঝাড়ামোছা শেষ। জানলাও খোলা রয়েছে। রোদ আসতে শুরু করেছে জানলা দিয়ে।

রামজয় বললেন, "খারাপ খবরের কথা কী বলছিলে ?"

খানিকটা ইতস্তত করে পাঞ্জালি বলল, "রাজাবাবু, কিছু শোনেননি ?"

তাকালেন রামজয়, মাথা নাড়লেন। "না। কী শুনব ?"

"রাবণের মুখোশ।"

রামজয় যেন চমকে উঠলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন পাঞ্জালির

দিকে। বিশ্বাস হচ্ছিল না। বললেন, "আবার রাবণের মুখোশ ? কোথায় ?"

"আজ্ঞা, মনসাচরেই।"

"এখানে ? কই ? কে বলল তোমায় ? আমি তো শুনিনি !"

পাঞ্জালি বিনীতভাবেই বলল, "নদীর পশ্চিমে, ঝুঁটি জঙ্গলের কাছে একটা আমগাছে রাবণের মুখোশ ঝুলছে।"

রামজয় যেন মনে-মনে ভাবলেন, খোঁজার চেষ্টা করলেন কিছু। বেশ কয়েকটা দিন সকালে তিনি আর বেরোতে পারছেন না। ঘোড়া থাকলে সূর্য ওঠার মুখে-মুখে নদীর পাড়-বরাবর দেড়-দু' মাইল ছুটে আসা তাঁর অভ্যাস। ঝিন্টীগাছের ঝোপ তিনি আন্দাজ করতে পারেন। ঝুঁটি জঙ্গল বেশি দূর নয়। মাইলটাক পথ। সকালে বেরোতে পারলে ব্যাপারটা নিশ্চয় তাঁর নজরে পড়ত।

"তুমি নিজের চোখে দেখেছ ?" রামজয় বললেন।

"আজ্ঞা।"

"কখন দেখেছ ?"

"কাল সাঁঝবেলায়।" বলে একটু থেমে আবার বলল, "কাল আমি বেলেগাঁ থেকে মনসাচরে এলাম বাবু। আসার সময় নজরে গেল। রাতটা শশীর কাছে কাটিয়ে সক্কালেই আপনার কাছে আসছি খবর দিতে।"

রামজয় কিছু বললেন না। ভাবছিলেন। রাবণের মুখোশ হেলাফেলা করার ব্যাপার নয়। বরং খুবই ভয়ের কথা। বিপদেরও। এই তল্লাটের, শুধু এই তল্লাট কেন, তিরিশ-চল্লিশ মাইল এলাকার মধ্যে রাবণের মুখোশের নাম শোনেনি, এমন কেউ নেই। রাবণের মুখোশ মানে ডাকাত দশাননের দল। এই দলটা সবদিক থেকেই ভয়ঙ্কর। এরা যেমন চতুর, তেমনই নৃশংস। সাহসেরও অভাব নেই। দশানন যে কোথায় থাকে কেউ জানে না ; কেউ বলে সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ে-জঙ্গলে, কেউ বলে গোপালহাটিতে, বীরভূমেই। দশাননকে কেউ চোখে দেখেছে কি না সন্দেহ। সে নাকি মুখোশে মুখ ঢেকে, না হয় কাপড়ে মাথা-মুখ ঢেকে ডাকাতি করতে বেরোয়। কাজেই তার চেহারার বর্ণনা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না। নানাজনের নানা বর্ণনা ; তার সঙ্গে সকলেই নিজের মতন করে কিছু কল্পনা মিশিয়ে দশাননকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। তবে হ্যাঁ, দশানন তার দলবল নিয়ে যখন যে-গ্রামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে — সেই গ্রাম প্রায় ছারখার হয়ে যায়। সোনাদানা, টাকাপয়সা, বাসনপত্র যাদের আছে তারা তো দশাননের হাত থেকে বাঁচেই না, সাধারণ মানুষের ধান-চাল থেকে ঘটিবাটি পর্যন্ত লুঠ হয়ে যায়। মায়াদয়া তার নেই, নয়তো কি গরিব মানুষের কুঁড়েতেও সে আগুন লাগাতে পারে। তাও তো সে লাগায় খেয়ালখুশি মতন। ডাকাত দশানন সত্যিই আতঙ্ক।

রামজয় বললেন, "পাঞ্জালি, তুমি যখন বলছ, আমি অবিশ্বাস করছি না। তবু একবার খবর নিতে লোক পাঠাচ্ছি।"

ঘরের বাইরে নস্কর হাজির ছিল। রামজয় গজেন নস্করকে ডেকে হুকুম করলেন ঝুঁটি জঙ্গলের কাছে কাউকে পাঠিয়ে খবর আনতে— সে দেখে আসবে আমগাছের

ডালে রাবণের মুখোশ ঝুলছে কি না!

পাঞ্জালি বলল, "বাবু, আমি জানি কার্তিক, অঘ্রান এই দু'মাসে দশানন দু'জায়গায় ডাকাতি করেছে।"

"কোথায়-কোথায় ?"

"লাতুর আর পঁইচিতে।"

"লাতুরে হাজরা বাড়ি— !"

"বাদ যায়নি।"

রামজয় ভাবলেন কিছুক্ষণ। লাতুরের বড় জমিদার হাজরারা। তাদের ধনবল, লোকবল কিছু কম নেই। ও-বাড়িতে লাঠিয়াল পাইক-বরকন্দাজ ছাড়াও বন্দুক আছে। তবু তারা দশাননকে আটকাতে পারল না। আশ্চর্য!

কী মনে করে রামজয় বললেন, "এই সময়টাই দশাননের ডাকাতি করে বেড়াবার সময় ?"

"আজ্ঞা হাঁ। পুজো কাটল, জলস্থল শুকোল কি দশাননের দল বেরিয়ে পড়ল। গরম পর্যন্ত চলবে। তারপর কোথায় লুকাবে কে জানে!"

কথাটা মোটামুটি ঠিক। ডাকাত দশাননের উৎপাত, অত্যাচার, লুঠপাট শুরু হয় পুজোর পর, কালীপুজো থেকে ; চৈত্র-বৈশাখ পর্যন্ত তার ডাকাতির মরসুম চলে, বর্ষার সময় থেকে আর তার কথা শোনা যায় না।

রামজয় হঠাৎ একটু হাসলেন। বললেন, "তুমি বলছ, এবার তবে আমাদের পালা ?"

পাঞ্জালি মুখে কিছু বলল না। মাথা নাড়ল।

"গত বছরও দশানন হাটতলায় রাবণের মুখোশ ঝুলিয়েছিল জানো তো ?"

পাঞ্জালি মাথা নাড়ল। জানে বই কী!

রামজয় ঠাট্টার গলায় যেন বললেন, "কী হল ?" বলে বিশাল জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। ছোট কাছারির লাগোয়া মাঠ, মস্ত এক তেঁতুল গাছ, ডাইনে বড় কাছারি। কাছারির সিঁড়ির তলায় পাথরের চাঙড়। লম্বাটে সিঁড়ি। একপাশে বেলগাছ। দু-চারটে ফুলঝোপ এখানে-ওখানে। ঠাকুরদালানটাও সামান্য চোখে পড়ে এখান থেকে। বড় কাছারি ছাড়িয়ে বাঁ দিকে। তারপর জমিদারবাড়ির উঁচু পাঁচিল।

বাইরের দিকে তাকিয়েই রামজয় বললেন আবার, "একবার মুখোশ টাঙিয়েই তার কী হল হে! আর তো মুরোদ হল না!"

ঘাড় হেলিয়ে কথাটা মেনে নিল পাঞ্জালি। দশাননের ডাকাতির একটা নীতি আছে। মানে, কেতা। সে যেখানে ডাকাতি করে, সেখানে তিনবার রাবণের মুখোশ টাঙায়। প্রথমটার মানে হল, এবার বাপু তোমাদের পালা। দ্বিতীয়টা হল, সাবধান করা। আর তৃতীয়টার মানে, আমরা হাজির!

দশাননের মনে কী আছে কেউ জানে না, তবে তার তিনবার মুখোশ টাঙাবার অভ্যাস দেখে লোকে এইরকমই মানে করে নিয়েছে।

পাঞ্জালি গলা নামিয়েই বলল, "একটা কথা তো আপনি মানবেন, হুজুর।"

"কী ?"

"গতবার নদীর ওপারে সাহেবরা এল জরিপের কাজে। তাঁবু ফেলল। তারা চলে গেল, লোক থাকল তাদের। ঘোড়া-দারোগা আসতে লাগল মাঝে-মাঝে। সেপাই ছিল পাঁচ-সাতজন। দশানন হয়তো আর সাহস করে এগোয়নি।"

রামজয় জানেন সব। যুক্তিটাও মানেন। সাহেবরা কীসের জরিপের কাজে এসেছিল তিনি অবশ্য জানেন না। শুনেছেন, নকশার কাজ করতে এসেছিল জরিপের দফতর থেকে। তা সে যাই হোক, দশানন বোধ হয় সাহেবসুবো, দারোগা, সেপাই— এসব দেখে পিছিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওপাশের তাঁবু তো বেশিদিন থাকেনি। বড়জোর মাসখানেক কি দেড়েক। তারপরও সময় ছিল দশাননের মনসাচরে হানা দেওয়ার। দেয়নি। খুব-সম্ভব সে তার দলবল নিয়ে এ-তল্লাটে আর অকারণে সময় নষ্ট না করে অন্যদিকে চলে গিয়েছিল।

রামজয়ও যে ভয়ে গুটিয়ে গিয়েছিলেন দশাননের, তা নয়। খানিকটা দম্ভভরেই তিনি লোক দিয়ে মুখোশটা নামিয়ে দেন হাটতলাতেই। তারপর পায়ে করে সেটা সরিয়ে দেন নোংরার মধ্যে।

দশানন কি গতবারের সেই অপমানের শোধ নিতে ফিরে আসছে এবার ?

রামজয় এখন পর্যন্ত দশাননের মুখোমুখি হননি। কিন্তু তিনি জানেন, গত পাঁচ-ছ' বছর দশানন আর তার দলবল এই তল্লাটে ভীষণ এক আতঙ্ক ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তার ধারণা, সে না জানি কত বড় এক দুঃসাহসী, বুদ্ধিমান, ভয়ঙ্কর পুরুষ ! নিজেকে সে সত্যিই কি রাবণ ভাবে নাকি ! যদি তাই ভেবে থাকে, তবে তার জানা উচিত রামজয়ও কম নন, রাবণের নিধন রামের হাতেই হয়েছিল।

"পাঞ্জালি ?"

"বাবু ?"

"তোমার কী মনে হয় ?"

"আজ্ঞা, দশাননের কথা বলছেন ! মুখোশের কথা শুনলে আমি বড় কাতর হই বাবু ! কতজনের সব্বনাশ করে ওরা। ... তা ই'বার আবার মুখোশ টাঙাল। ও কি শুধু আমাদের ডরাতে চায় বলছেন ?"

"না, তা বলছি না। গতবারের শোধ নিতে আসছে ?"

"আজ্ঞা, তাই মনে হয়।"

রামজয় সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "তা আসুক।"

পাঞ্জালি বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। এই জমিদারবাড়িতে তার আসা-যাওয়া অনেক কালের। বছরদশেক তো হবেই। রামজয়ের যখন বয়েস চল্লিশের নীচে, তখন থেকে বাবুকে দেখছে। সে সময় ওঁর কী চেহারা ছিল। আহা ! গড়ন নিখুঁত। মাথায় লম্বা, টকটক করছে গায়ের রং, স্বাস্থ্য মজবুত, হাত, পা, ছাতি যেন মাপে-মাপে গড়েছেন ভগবান। কোনও কিছু তোয়াক্কা করেন না। মস্তবড় লাঠিয়ালকে কাবু করতে পারেন উনি, সড়কি চালাতে জানেন, তরোয়াল

খেলাও শেখা আছে, আর বন্দুক তো জানেনই।

পাঞ্জালি জানে, রাজাবাবুর সে বয়েস নেই। এখন তিনি পঞ্চাশের কাছাকাছি। স্বাস্থ্য খানিকটা ভাঙবেই এই বয়েসে। হাত-পায়ের সেই জোর বা চমকই বা কোথায় পাবেন! লাঠির ঘা মাথায় পড়ার আগে চোখের পলকে তিনি সরে যেতে পারতেন, ভেলকি দেখাতেন সড়কি চালাতে তখন। এখন, এই বয়েসে সেসব আর ফিরে আসবে না।

রামজয় বললেন, "ভয় করলে ভয়, না করলে নয়। পীত্বা কর্দমপানীয়ং ভেকো মকমকায়তে...। নর্দমার জল খেয়ে ব্যাঙরাই মকমক করে পাঞ্জালি। ও হল নর্দমার ব্যাঙ। আমি দশাননকে ভয় করি না। আমার মনসাচরে তাকে আমি শিক্ষা দেব। সে নিজেকে কী ভেবেছে হে! একটা ডাকাত, তার এত স্পর্ধা হয় আমার জমিদারিতে মুখোশ টাঙিয়ে আমায় ভয় দেখাবে! সে-মানুষ আমি নই। আসুক দশানন, আমি তৈরি থাকব।"

রামজয় সামান্য উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন।

পাঞ্জালি বলল, "বাবু, একটা কথা বলি, অপরাধ নেবেন না।"

"বলো!"

"ঘোড়া-দারোগাকে একটা খবর দিলে হয় না আগেভাগে?"

রামজয় যেন অবাক হলেন; তারপর হেসে ফেললেন। বললেন, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে—।"

"আজ্ঞা?"

"ঘোড়া-দারোগা কি এখানে থাকে হে! সে থাকে সদরে। এখান থেকে সাত-আট ক্রোশ দূর। তার চেহারাখানা ঢাকের মতন। আর ব্যাটার ঘোড়াটা গাধা-জাতের; ওকে আর ঘোড়া বোলো না। ...আরে, ওর দ্বারা যদি কিছু হত, তবে দশানন এ-তল্লাটে দাপিয়ে বেড়াতে পারত না। শোনো পাঞ্জালি, একটা কথা বলি। সাহেবদের রাজত্বে আমরা থাকি বটে, কিন্তু তাদের ভরসায় থাকি না। ওরা আমাদের বাঁচাবে কেমন করে? বিশ মাইলে চালাবাড়ির একটা থানা আর ক'টা সেপাই রাখলে কি তামাম এলাকা দেখা যায়, না, বাঁচানো যায়!"

পাঞ্জালি অস্বীকার করতে পারল না কথাটা। সত্যিই তো, রাস্তা নেই, ঘাট নেই, আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা নেই, পায়ে হেঁটে চলো, নয়তো গোরুর গাড়িতে, ধনীমানী হলে পালকিতে। আর এখানে যা নদীর অবস্থা এখন, নৌকোও সর্বত্র চালানো যায় না। তবু বড় নদীতে নৌকো করে মানুষের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আসা-যাওয়া সুবিধের।

পাঞ্জালি বলল, "আপনি হুকুম করলে আমি—"

পাঞ্জালিকে কথা শেষ করতে দিলেন না রামজয়, বললেন, "না, তোমায় ওই ঢাকের বাদ্যি বাজাতে যেতে হবে না। আমাদের ক্ষমতায় যা হয় করব। আমি রামজয় রায়। নরনাথ রায়ের ছেলে। দশাননকে আমি দেখে নেব, দেখব সে কতবড় ডাকাত।"

পাঞ্জালি আর কিছু বলল না।

রামজয় সামান্য অন্যমনস্ক। ভাবছিলেন। হঠাৎ ঠাট্টার গলায় বললেন, "তোমার কী মনে হয়? দশানন কবে মনসাচরে পায়ের ধুলো দিতে আসতে পারে?"

পাঞ্জালি বলল, "আজ্ঞা, আমার অনুমান, মেলার সময়।"

"পৌষ মাসে?"

"সংক্রান্তির আগে মনসাচরে ভারী মেলা বসে, বাবু। আপনি জানেন। কত ব্যাপারি আসে, বেচাকেনা হয়, লোকে লোকারণ্য। তখনই তো ডাকাত পড়ার সময়। লুঠতরাজ করলে লাভ বেশি।"

রামজয় মাথা নাড়লেন। পাঞ্জালির অনুমানই হয়তো ঠিক। বললেন, "পৌষ তো পড়ল!"

"পরশুবার পড়বে!"

"তা হলে হিসেবমতন মাসখানেক সময়।"

"আজ্ঞা।"

"তুমি এখন আর কোথাও যেতে পারবে না। এখানেই থাকবে।

"থাকব হুজুর। আপনাদের বিপদ, আমি থাকব না!"

"তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে আমিও তৈরি হব।...শোনো, আজই ও-বেলায় মধুকে খবর দিয়ে আসতে বলবে আমার কাছে। আর কাল থেকে তোমার প্রথম কাজ হবে মনসাচরের সব জায়গায় লুকিয়ে খোঁজ খবর করা। তুমি জানবে, সর্বত্রই ঘরের শত্রু বিভীষণ থাকে। এখানেও আছে।"

পাঞ্জালিকে আর কিছু বলার দরকার হল না। সে সরাসরি রামজয়ের গুপ্তচর না হলেও পাঁচ জায়গায় পাঁচ কথা, যার অনেকটাই গোপন, রাজাবাবুর কানে পৌঁছে দেয়।

এমন সময় নস্কর এসে খবর দিল, সে লোক পাঠিয়ে জেনেছে, ঝুঁটি জঙ্গলের কাছে আমগাছের ডালে সত্যিই রাবণের মুখোশ ঝুলছে।

রামজয় শুনলেন। তারপরই হুকুম করলেন, মুখোশটা নামিয়ে নদীর পাড়ে আবর্জনায় ফেলে দিতে।

দুই

সন্ধেবেলায় রামজয় নিজের ঘরে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। তামাকের গন্ধটি মিঠে, ঘরের বাতাসে গন্ধ ছড়িয়ে গিয়েছে। গড়গড়ায় শব্দ উঠছিল না, নলের মুখটি মাঝে-মাঝে নিজের মুখের কাছ থেকে সরিয়ে কোলের ওপর রেখে দিচ্ছিলেন রামজয়। কয়েকটা কাগজপত্র, দলিল-কাগজের মতন দেখতে, তুলে নিয়ে দেখছিলেন, ভাবছিলেন, আবার রেখে দিচ্ছিলেন পাশে। সামান্য তফাতে রেড়ি-তেলের সেজবাতি জ্বলছিল।

বিরজাসুন্দরী ঘরে এলেন। রামজয়ের স্ত্রী। দেখতে বড় সুন্দর। যেমন মুখের আদল, তেমনই গড়ন। গায়ের রং ফরসা। তবে স্বামীর তুলনায় হয়তো একটু কম। বিরজার স্বভাবটিও নরম, জমিদারবাড়ির অন্দরমহলের মাথা হয়েও তিনি গলা তুলে কথা বলেন না, হাসিখুশি মুখেই ফাইফরমাশ করেন, দাসদাসীদের ধমক দেওয়ার অভ্যেসটাই নেই।

মাথার কাপড় আরও একটু তুলে দিয়ে বিরজা স্বামীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকলেন কয়েক দণ্ড। তারপর বললেন, "কীসব শুনছি!"

রামজয় মুখ তুলে স্ত্রীকে দেখলেন। "কী শুনছ?"

"মনসাচরে রাবণের মুখোশ পড়েছে।"

"পড়েছে না, ঝুলিয়েছে। ডাকাত পড়ার আগেই তুমি ওই দশাননকে পড়িয়ে দিচ্ছ!" ঠাট্টার গলাতেই বললেন রামজয়।

"ওই একই হল! আজ পড়েনি কাল পড়বে।"

"তাই নাকি? তা খবরটা পেলে কোথায়?"

"ভেতরে ওরা বলছে। ...তুমি নাকি হুকুম করে মুখোশটা গাছ থেকে নামিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছ?"

রামজয় অবাক হলেন না। সকালে যে-ঘটনাটি ঘটেছে সেটি সামান্য ব্যাপার নয়। মুখোশ অতি সামান্য ব্যাপার, তুচ্ছ ব্যাপার; কিন্তু রাবণের মুখোশ নয়। একটা বাঘ যদি আচমকা কোনও গতিকে মনসাচরে এসে পড়ত, বা কোথাও আগুন লেগে দশ-বিশটা চালা পুড়ে যেত—তবু বোধ হয় এত তাড়াতাড়ি ভয়ের খবরটা ছড়িয়ে পড়ত না সর্বত্র। তা ছাড়া পাঞ্জালি একাই যে মুখোশটা দেখেছে ঝুঁটিজঙ্গলের কাছে তাও তো নয়, অন্য কারও-কারও চোখে পড়তেই পারে। আগুনের ফুলকি থেকে আগুন ছড়ায় যেমন—গুজব আর আতঙ্কের খবরও সেইভাবে ছড়িয়ে পড়ে। জমিদারবাড়িতে তো আরও আগে ছড়ানো উচিত ছিল। নস্কর আর নস্করের লোকই ছড়িয়ে দিয়েছে। পাঞ্জালি বরং এসব ব্যাপারে একটু সাবধান হতে পারে।

রামজয় গড়গড়ার নল মুখে দিলেন। তামাকে আগুন নিভে গিয়েছে। নল সরিয়ে রেখে রামজয় তামাশার গলায় স্ত্রীকে বললেন, "দশানন খবর পেয়েছে তোমার মহলে দু-চার ঘড়া মোহর আছে লুকনো, আর সোনার গয়নাগাটিও কম নেই। ভাবছে, একবার চোখে দেখে যাবে।"

বিরজা বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?"

রামজয় হেসে ফেললেন। বললেন, "কেন? মোহরের ঘড়া তোমার কাছে নেই?"

"আমার আবার মোহর কোথায়? শ্বশুরবংশের পুরনো মোহর কিছু আছে। ঘড়া ভর্তি নয়, ঘটি ভর্তি। গয়নাগাটি তো থাকবেই, কোন জমিদারবাড়িতে না থাকে!"

"তবে সেগুলোই দশাননকে দিয়ে দিও।"

বিরজা যেন এবার একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। স্বামী তাঁর কথা কানেই তুলছেন না, রঙ্গ করছেন। "তুমি বললে তাই দেব।"

রামজয় এবার জোরেই হেসে ফেললেন। পরে বললেন, "তোমায় কিছুই দিতে হবে না। আমি বেঁচে থাকতে দশাননের সাধ্য হবে না—এই বাড়ির একটা ঘটিবাটিও লুঠ করে নিয়ে যায়। শুধু জমিদারবাড়ি কেন, মনসাচরের প্রজাদের বাড়ি লুঠ করতে এলেও সে মরবে।"

"তুমি তার সঙ্গে লড়বে! সে একটা ভয়ঙ্কর ডাকাত। লোকে বলে রাক্ষস।"

"আসল রাক্ষস নয়। নকল। নামটাই তার দশানন। বেটার না আছে দশটা মাথা, না দশটা মুখ। যাক গে, এ-নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। ভাববার জন্যে আমি আছি।"

"বাঃ, আমার ভাবনা হবে না?"

"ভাবনা করে লাভ নেই। দশাননের ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার মানুষ আমি নই। ...তুমি তোমার মতন থাকো। ভাল কথা, ছেলেমেয়ে কোথায়?"

"রাজু পড়ছে, লক্ষ্মী ছোটপিসিমার কাছে বসে গল্প শুনছিল।"

রামজয়দের দুটি ছেলেমেয়ে। রাজু আর লক্ষ্মী। রাজুর ভাল নাম রাজেন্দ্র। লক্ষ্মীর তো অজস্র নাম, লক্ষ্মীমণি, পূর্ণিমা, মণি, রানি—আরও কত। আদরের নাম—যার যেমন খুশি নাম ধরে ডাকে।

রাজুর বয়েস বছর আঠারো। সে স্বভাবে নিরীহ, স্বাস্থ্যে মাঝারি, বাবার মতন মজবুত শরীর তার নয়; পড়াশোনায় ঝোঁক আছে। সদর শহরে পড়তে গিয়েছিল, গোমেজসাহেবের স্কুলে। সাহেব পঁচিশ-ত্রিশজন ছাত্র নিয়ে একটা স্কুল বসিয়েছিলেন কাঁচা দালানবাড়িতে। মেসোমশাইয়ের বাড়িতে থেকে রাজু পড়াশোনা করছিল। কিন্তু জ্বরজ্বালার দরুন বেশিদিন থাকতে পারেনি শহরে। বাড়িতেই ফিরে এসেছে। এখানে এক পণ্ডিত আর আদালতের কাজ-জানা এক ভদ্রলোক, ইংরেজিও জানেন কিছুটা—এঁরাই রাজুকে পড়িয়ে যান বাড়ি এসে। রাজুর অন্য গুণ বলতে সে পটছবি আঁকতে পারে, গড়তে পারে মাটির মূর্তি, আর কাগজ কেটে-কেটে হরেকরকম ফুল, পাখি, এটা-সেটা করতে পারে।

রামজয় চান না, ছেলে এখন থেকে জমিদারি দেখাশোনার কাজে লেগে যায়। বয়েস কম। কাজ শেখার বয়েস তো পড়েই থাকল।

বিরজা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, রামজয় হঠাৎ বললেন, "তোমাকে একটা কথা বলি। এখন থেকে সাবধানে থাকবে। নতুন কেউ যদি অন্দরমহলে কাজকর্ম খুঁজতে আসে, খুঁজতে এসে কান্নাকাটি করে, হাতে-পায়ে ধরে—তবু নতুন লোক বাড়ির মধ্যে ঢোকাবে না। হালফিল যদি কাউকে ঢুকিয়ে থাকো, তার ওপর লক্ষ রাখবে। আর ছেলেমেয়েকে চোখে-চোখে রেখো।"

বিরজা কিছু বললেন না। চলে গেলেন ঘর ছেড়ে।

রামজয় সামান্য বসে থাকলেন।

কাল কি পরশুর মধ্যে দশাননের রাবণের মুখোশের খবরটা মনসাচরের

ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে যাবে এ-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। প্রজারা শুধু যে ভয় পাবে তাও নয়, কেউ-কেউ কাছারিবাড়িতে ছুটে আসবে, কেউবা হয়তো অন্যত্র পালিয়ে যাওয়ার ফন্দি আঁটবে কিছুদিনের জন্য। তারা চাইবে, দশানন তার দলবল নিয়ে মনসাচরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লুঠপাট শেষ করে ফিরে যাক আগে—তারপর আবার তারা নিজেদের ঘরবাড়িতে ফিরে আসবে। এরা বেশি সাবধানী, ভিতু, চালাক।

রামজয় এদের জোর করে আটকে রাখতে পারেন না। আবার তাঁর মোটেই ইচ্ছে নয়, ভয় পেয়ে মনসাচরের কিছু লোকজন অন্যত্র পালিয়ে যায়। যে যত ভয় পায়, ভয় ততই তার কাছে লাফ মেরে-মেরে এগিয়ে আসে। তা ছাড়া রামজয় মনে করেন, তিনি মনসাচরের জমিদার শুধু নন, প্রজাদের রক্ষাকর্তা, অভিভাবক। তিনি যদি এদের বিপদের সময় বাঁচাতে না পারেন, কে পারবে! ওরা কার ভরসায় থাকবে!

কিন্তু এটাও ঠিক, দশানন সাধারণ ডাকাত নয়। সে অতি ধূর্ত, দুঃসাহসী, নৃশংস। তার দলবলও কেউ কারও থেকে কম অত্যাচারী নয়। কাজেই রামজয়কে এমনভাবে তৈরি হতে হবে যেন ধূর্ততায় দশানন তাঁকে টেক্কা দিতে না পারে। বুদ্ধি, সাহস আর চালাকি ছাড়া দশাননকে তিনি হারাতে পারবেন না।

মনে-মনে এ-সবেরই একটা ছক কষছিলেন রামজয় সেই ওবেলা থেকেই। ওপরে চুপচাপ থাকলেও ভেতরে তিনি চঞ্চল ছিলেন।

আপাতত তিনি দেখছেন, তাঁর প্রধান দুই ভরসা বলতে পাঞ্চালি আর মধু। পাঞ্জালি শুধু বুদ্ধিমান নয়, তার মাথাতে ফন্দিফিকির ভালই খেলে। অতি বিশ্বস্ত। খবরাখবর এনে দিতেও সে যথেষ্ট পটু। তাকে ওপর-ওপর দেখলে যতটা বাউণ্ডুলে, খেপাটে মনে হয়—ততটা খেপাটে সে নয়, বাউণ্ডুলে ঠিকই।

আর মধু হল ডাকসাইটে লেঠেল সর্দার মাধব। এই তল্লাটে মাধবকে চেনে না এমন কেউ নেই। তার নামের আগে সর্দার না বললে মাধবের যেন মান থাকে না। অবশ্য বড়রা তাকে অনেকেই মধু লেঠেল বলে ডাকে। রামজয় বরাবর মধু বলেই ডেকে এসেছেন।

জমিদারবাড়িতেই একসময় মাধবের আসা-যাওয়া ছিল প্রায়ই। কাজেকর্মে তার ডাক পড়ত, তার চেয়ে বিশ্বস্ত পাহারাদার আর নেই বলে রামজয় যে-কোনও পাহারাদারির কাজে তাকে ডেকে পাঠাতেন। এখনও পাঠান। তবে মাধবের বয়েস হয়ে গিয়েছে। চল্লিশ ছাড়িয়ে গিয়েছে সে, আগের সেই শক্তি না থাকতে পারে, কিন্তু যা আছে, তাই-বা কম কী! তা ছাড়া মাধবের একটা দল আছে, লাঠিয়ালের দল। তারা সর্দারের নামে প্রাণ দিতে পারে। রামজয়ের দরকার মাধবকে।

নিজের ঘর থেকে উঠে রামজয় বাইরে এলেন। ঢাকা বারান্দায়। বারান্দাটা বেশ চওড়া। ঘুলঘুলি করা ইটের রেলিং বারান্দার কিনারা ঘেঁষে। বড়-বড় থাম।

মাথায় খিলান।

এখানে দাঁড়িয়ে জমিদারবাড়ির সামনের সবটা আর দু'পাশের খানিকটা দেখা যায়। পিছন দেখা যায় না। অগ্রহায়ণের একেবারে শেষ এখন। বাইরে শীত এসেছে ; কুয়াশাও জমছে সন্ধে থেকে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে রামজয়ের মনে হল, দশাননের নজর একেবারে ছোট নয়, বরং তার আসল দৃষ্টি থাকে বড়দের ওপর, তারপর মাঝারিদের ওপর। শেষে ছোটদের দিকে চোখ ফেরায়। লোকে বলে, গরিব গৃহস্থের বাড়ির ব্যাপারে তার নিজের উৎসাহ বিশেষ নেই। তবে তার দলবলের আছে। দলবলের বাছবিচার কম। বড় কাজ সারা হয়ে গেলে নিতান্তই যেন উৎসাহের রেশ হিসেবে ওরা ছোট কাজগুলোও সেরে যায়।

ধরেই নেওয়া যায়, দশাননের প্রথম লক্ষ্য হবে জমিদারবাড়ি। রামজয় তাতে সন্দেহ করেন না। রায়বাড়ির ধনসম্পত্তি লুঠ করা ছাড়াও দশাননের একটা আক্রোশ জমিদার এবং জমিদারবাড়ির ওপর থাকতে পারে। গত বছর সে পা বাড়িয়েও রায়বাড়িতে আসতে পারেনি। সাহেবদের জরিপ-তাঁবু পড়ার জন্যই হোক বা যে-কোনও কারণেই হোক। কিন্তু হাটতলায় টাঙানো তার প্রথম দফার মুখোশ যে রামজয়ের হুকুমে নামিয়ে নোংরায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল—এ-কথা নিশ্চয় তার কানে গিয়েছিল। জমিদার রামজয়ের এই স্পর্ধা ও অবজ্ঞা সে ভুলবে কেমন করে ! দশাননকে এইভাবে অপমান করার সাহস যে দেখাল—তাকে কি সে ছেড়ে দেবে ? সে-পাত্র দশানন নয়। এবার সে গত বছরের সেই অপমানের শোধ নিতে আসছে। খবরও দিয়েছে আগাম।

রামজয় মনে করেন, দশানন একেবারে সাধারণ ডাকাতও নয়। তার বড়সড় দল আছে, অস্ত্রশস্ত্র আছে—এটাও যেমন ঠিক কথা, সেই রকমও যথেষ্ট বুদ্ধিমান। তারও খোঁজখবর করার লোক আছে। দশানন ভাল করেই জানে, জমিদার রামজয় পুঁটিমাছের প্রাণ নিয়ে জন্মাননি। দু'-পাঁচটা ভেতো ডাকাত যে এখনও রামজয়ের সামনে পড়লে লাঠি সড়কির ঘায়ে কিংবা তরোয়ালের কোপে ঘায়েল হবে—এই খবরটাও তার জানা আছে। কাজেই সে নিশ্চয় তৈরি হয়েই আসবে।

বারান্দা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে অনেকটা চলে গিয়েছিলেন রামজয়। এবার দাঁড়ালেন। সামনের দিকেই তাকিয়ে থাকলেন।

রায়দের জমিদারবাড়ির এলাকা কম নয়। মূল বাড়ি আর কাছারি মিলিয়েই বিঘে দেড়েক জমির ওপর বাড়ি। দোতলা বাড়ি। একপাশে তেতলাও আছে খানিকটা অংশ। ঘর কুঠরি অসংখ্য। অন্দরমহলের কত ঘর তো খালিই পড়ে থাকে, অতিথি জ্ঞাতি-কুটুম্ব এলে থাকে কিছুদিন, আবার চলে যায় ; দাসদাসীদের থাকার ব্যবস্থাও বাড়ির পিছন দিকে। দু'-একজন কর্মচারীও থাকে সেরেস্তায়।

দশানন কি জানে না, রায়বাড়ির ভেতরে চোরা কুঠরি চোরা সিঁড়ি আছে ? জানে না নাকি, এ-বাড়ির মধ্যে কয়েদ-কুঠরিও আছে, যেখানে দশাননকে জীবনভর আটকে রাখা যায় ?

হয়তো জানে। কাঁচা কাজ করার লোক দশানন নয় বলেই মনে হয়।

রামজয়ের চোখে পড়ল, নীচে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে।

বারান্দার কিনারায় এসে রামজয় হাঁকলেন, "কে ?"

"আমি রাজাবাবু, সামন্ত।"

"ও, সামন্ত ? বদ্যিনাথ ! ...ওপরে এসো।"

সামান্য পরেই বদ্যিনাথ এল। প্রায় মাটি ছুঁয়ে বাবুকে প্রণাম করল।

"কেমন আছ হে বদ্যিনাথ ?"

"আজ্ঞা, ভাল আছি।"

"কাজকর্ম কেমন চলছে ?"

"মন্দ নয়। ছোট কামারশালা, চারটি প্রাণী, চলে যায় বাবু।"

"আমার কয়েকটা কাজ আছে।" রামজয় বললেন।

"খবর পেয়েই এলাম। সেরেস্তার গড়াইবাবু গিয়ে বললেন। আমার আসতে দেরি হয়ে গেল।"

"কালকে এলেও চলত।"

"ভাবলাম জরুরি কাজ।"

"কাজটা জরুরি, তবে হাতে সময় আছে। ....শোনো বদ্যিনাথ, এই বাড়ির কয়েকটা ঘরে লোহার কাজ আছে কিছু।"

বদ্যিনাথ কিছু বলল না, তাকিয়ে থাকল। তার চেহারা বেঁটেখাটো, রং কালো, লোহা-পেটানো শরীর। বেশবাস সাধারণ, ধুতি জামা গায়ে একটা মোটা চাদর।

"তুমি সেই কলটার কাজ জানো ? না, ভুলে গেছ ?"

"কোন কল ?"

"বেজি কল। লোহার পাত দিয়ে তৈরি... ।"

বদ্যিনাথ একটু চুপ করে থেকে বলল, "ভুলিনি বাবু। তবে আজকাল তো বেজি কল কেউ লাগায় না দরজায়। আপনি হুকুম করলে হয়ে যাবে।"

"চার-পাঁচটা ঘরের ভেতর থেকে ওই কল লাগাতে হবে। বাইরে থেকে দরজা ভেঙে কেউ যেন ঘরে ঢুকতে না পারে।"

বদ্যিনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ইতস্ততভাবে বলল, "শুনলাম, দশানন রাবণের মুখোশ টাঙিয়েছে... ! তাই কি... !"

"হ্যাঁ। ঠিকই শুনেছ।"

"আপনি কয়েকটা ঘরে আলাদা করে ওই কল লাগাতে চাইছেন ?"

"তাই চাইছি।"

"লাগিয়ে দেব।"

"কাউকে কিছু বলবে না। তোমার কাজ আমি নিজে দেখব।"

"আজ্ঞা !"

বদ্যিনাথ মাথা সামান্য হেঁট করেই জবাব দিচ্ছিল। রামজয়কে সে শুধু মান্য করে না, ভয়ও পায়। বছর পাঁচেক আগে একবার বদ্যিনাথকে পুলিশ ধরেছিল।

খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল সে। রামজয়ই তাকে বাঁচিয়েছিলেন। অবশ্য বদ্যিনাথ সত্যি-সত্যি খুন-খারাপির মধ্যে ছিল না। তবু তার হাতে হাতকড়া পড়েছিল তখন।

রামজয় হঠাৎ বললেন, "বদ্যিনাথ, আমার জন্যে আরও একটা জিনিস বানিয়ে দিতে হবে। পারবে?"

"কী জিনিস?"

রামজয় একটু যেন হাসলেন, বললেন, "সে জিনিস আগে তুমি তৈরি করোনি, দেখাওনি।"

তাকিয়ে থাকল বদ্যিনাথ।

"একটা দু-ফালি ছোট ছোরা, মুখের দিকে দুটো সরু ফলা থাকবে। খুব সরু, এক-দেড় আঙুল লম্বা, তবে যেমন ধারালো তেমনই শক্ত। জামার তলায় কোমরের কাছে যাতে লুকিয়ে রাখতে সুবিধে হয়—এইভাবে তৈরি করতে হবে। আমি তোমায় ছবি এঁকে দেখিয়ে দেব।"

বদ্যিনাথ অবাক হয়ে শুনল, কিছু বলল না। সে বঁটি কাঠারি কুড়ুলের ফলা তৈরি করতে জানে, ছোরাছুরি সে করেনি কখনও তার কামারশালায়।

রামজয় আর দাঁড় করিয়ে রাখলেন না বদ্যিনাথকে। বললেন, "তুমি তা হলে এসো, রাত হয়ে যাচ্ছে।"

বদ্যিনাথ হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

রামজয়ও নিজের বসার ঘরের দিকে ফিরতে লাগলেন। ফিরতে-ফিরতে ভাবলেন, কাল সকালে একবার জমিদারবাড়ির সীমানাটা ভাল করে দেখে নিতে হবে। ভাঙাচোরা পাঁচিল, ফাঁকফোকর মেরামত করানো দরকার, পাঁচিলের গা-লাগানো বড়-বড় ঝাঁকড়া-মাথা গাছ যা আছে তার ডালপালাও কাটিয়ে ফেলা দরকার। দশাননের দলের লোকজনরা যাতে সহজে জমিদারবাড়ির এলাকার মধ্যে ঢুকতে না পারে।

অবশ্য নিজের বাড়ি বাঁচালেই তো চলবে না রামজয়ের, তাঁর প্রজাদেরও ঘরবাড়ি বাঁচাবার জন্য তিনি কী-কী করতে পারেন—তাও ভেবে দেখতে হবে।

এই সময় দূর থেকে আচমকা শেয়ালের ডাক শোনা গেল।

রামজয় দাঁড়ালেন। ঘুরেই দাঁড়ালেন। সামনে তাকালেন, কিছু দেখতে পেলেন না। ডাকটা শেয়ালের মতনই। তবে শেয়াল কিনা বোঝা মুশকিল। আর ডাকল যখন, একটা শেয়ালই ডাকল কেন? আরও দু'-চারটের ডাকা উচিত ছিল। কই, ডাকল না তো?

তিন

পরের দিন বিকেলে কয়েকজন মাতব্বর এল রামজয়ের সঙ্গে দেখা করতে। এরা সকলেই মনসাচরের লোক, রামজয়ের প্রজা। রাজাবাবুই এদের আসতে বলেছিলেন।

কাছারিবাড়িতে বসে কথাবার্তা হচ্ছিল।

মাতব্বরদের মধ্যে সরসীনাথ ভট্টাচার্য হলেন প্রবীণ মানুষ। ষাটের ওপর বয়েস। স্বাস্থ্য আজকাল ভাল যায় না, তবু একেবারে ভেঙেও পড়েননি। পারিবারিক কয়েকটি শোক-আঘাত পেয়েছেন পর-পর, মন ভেঙেছে, শরীরও ভেঙেছে।

রামজয় সরসীনাথকে খাতির করেই কথাবার্তা বলছিলেন। তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে ডাকাত দশাননকে নিয়ে অকারণ বেশি দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই। সে আগে একবার মুখোশ টাঙিয়ে মনসাচরের মানুষকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছে ; হয়তো কয়েকদিনের মধ্যে আবার একবার টাঙাবে। তারপর শেষবারের মতন রাবণের মুখোশ টাঙিয়ে মনসাচরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে দলবল নিয়ে। তাই তো ?

সরসীনাথ বললেন, "ওটাই ওর রেওয়াজ শুনেছি।"

"ওর রেওয়াজটার কথাই শুনেছেন ভটচায্যিমশাই ; কিন্তু রায়বংশেরও একটা রেওয়াজ আছে," রামজয় বললেন শান্তভাবে। "আপনি আমার পিতৃদেবকে দেখেছেন। তিনি একটা কথা বলতেন। বলতেন, বড় গাছ নিজের মাথার ওপর সূর্যের প্রখর তাপ সহ্য করেও গাছের তলায় আশ্রিত পথিককে ছায়া দান করে—শময়তি পরিতাপং ; ছায়য়া...। আমরা বড় গাছ নই ভটচায্যিমশাই। তবু বলি আমাদের বংশ আশ্রিতকে রক্ষা করাকে ধর্ম মনে করে। আপনারা আমার আশ্রিত। আমি আপনাদের বিপদের দিনে সবার আগে আছি। দশানন আমাকে না মেরে আপনাদের ক্ষতি করতে পারবে না।"

সরসীনাথ কিছু বলার আগেই অন্য মাতব্বররা একসঙ্গে কিছু বলার চেষ্টা করল। বোঝা গেল না কে কী বলতে চায়।

রামজয় একজনের দিকে আঙুল দেখালেন। "বিশ্বনাথ, তুমি কিছু বলবে ?"

বিশ্বনাথ জমিদারবাবুর চেয়ে বয়েসে কিছু ছোট। সে কারবারি লোক। লোকে বলে মহাজন। বিশ্বনাথ বলল, "আপনি অভয় দিচ্ছেন, আমরা সাহস পাচ্ছি। কিন্তু বাবু, দশানন সাদামাটা চোর-ডাকাত নয়। তার দলে পঁচিশ-তিরিশজন ভয়ঙ্কর লোক আছে বলে শুনেছি। তারা খুনে। জল্লাদ। কিছুই গ্রাহ্য করে না। ওরা মানুষ নয়, জন্তু। আপনি একা কেমন করে এই জন্তুদের সঙ্গে লড়বেন ?"

"আমি একা কেন ? তোমরা আছ।"

"আমরা ?"

"কেন, তোমরা নেই ? তোমরা এখানে থাকো না ? এই মাটি, গ্রাম, ভিটে,

ছেলে-মেয়ে-বউ, ভাই-বোন, প্রতিবেশী তোমাদের নয় ? তোমরা তবে কে ?"

বিশ্বনাথ থতমত খেয়ে গেল। এত কিছু ভেবে সে বলেনি কথাটা। সামান্য চুপ করে থেকে গলা নামিয়ে বলল, "বাবু, আমি তা বলিনি। সাত পুরুষের ভিটে এখানে, কোন মুখে অমন কথা বলব ! আমি বলছিলাম, আমরা ছাপোষা মানুষজন, আমাদের কতটুকু ক্ষমতা—দশাননের দলের সঙ্গে লড়াই করব ?"

রামজয় বললেন, "হাতের লড়াইটা আমরাই করব, তোমরা মনের লড়াইটা সামলাও। মনের হার বড় হার বিশ্বনাথ।"

বিশ্বনাথ চুপ করে গেল।

সরসীনাথ বললেন, "আমি অন্য কথা ভাবছি, রামজয়। রাবণের মুখোশের কথা আজ দু'-তিনদিনেই সারা মনসাচরে ছড়িয়ে গিয়েছে। সবাই যে ভয় পাবে—এটা তুমিও জানো, আমরাও জানি। এই পৌষ মাসের শেষে এখানে মেলার নামে দশ-বিশ গাঁ থেকে লোকজন আসে। ব্যাপারি আসে। বেচাকেনা হয়। দু' পয়সা রোজগার করে মানুষে। দশাননের নামে এবার তো কেউ আসবে না। কেন আসবে ? তাদেরও ভয় আছে প্রাণে। কী হবে মেলার ? সম্বৎসর যারা তাকিয়ে থাকে মেলায় দু' পয়সা রোজগার করবে বলে তাদেরই বা কী হবে ?"

রামজয় নিজেও কথাটা ভেবেছেন। বললেন, "আপনি ঠিক বলেছেন। আমিও ভেবেছি মেলার কথা।"

"কী ভেবেছ ?"

"মেলার এখন মাসখানেক সময় আছে।"

"মাসখানেক নয়," সরসীনাথ মাথা নাড়লেন। "সংক্রান্তির দিন স্নান-পুজোআর্চা, কিন্তু মেলা শুরু হয় তার আগেই। সাত-আটদিন আগে থেকেই ব্যবসায়ীরা আসতে শুরু করে, সংক্রান্তির পরও তারা থাকে দিনকয়েক। হিসেব ধরলে আর কুড়ি-বাইশ দিন।"

অন্যরাও মাথা নাড়ল। ভটচায্যিমশাই যথার্থ কথাই বলেছেন।

রামজয় বললেন, "আমি মানলাম। ধরে নিন, দশানন ওই সময় মনসাচরে হাজির হবে ঠিক করেছে। আমিও যে ঠিক করেছি, দশাননের ভয়ে যারা এ-বছর মেলায় আসতে চাইবে না, তারা এর পর আর কোনওদিন এখানে মেলায় এসে দোকানপত্র সাজিয়ে বসতে পারবে না। আমার হুকুম থাকবে, তাদের বসতে না-দেওয়া। তা-ছাড়া মেলায় যারা বেচাকেনা করতে আসে তারা জমিদারকে দু'-চার টাকা করে প্রণামী দেয়। এই টাকা তাদের আর দিতে হবে না কোনওদিন, অন্তত আমি যতদিন বেঁচে আছি, রায়বংশের জমিদারি যতদিন আছে—।"

মাতব্বররা চুপ করে থাকল। বুঝতে পারল, জমিদারবাবু আগেভাগেই সব স্থির করে রেখেছেন, অনর্থক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

শেষে পঞ্চানন সাঁই বলল, "আজ্ঞে, এর পরও যদি মেলা না বসে ?"

"না বসলে না বসুক। ভয় নিয়ে যারা ঘরে বসে থাকতে চায়, বসে থাকুক, আমার তাতে কিছুই আসে যায় না, সাঁই। আমি শুধু তোমাদের এই কথাটা বলতে

ডেকে পাঠিয়েছি যে, দশাননকে আমি মনসাচরের মানুষের ধন-মান লুঠ করে নিয়ে যেতে দেব না। তোমরা আমার সহায় থেকো।"

কথাবার্তার এখানেই শেষ। মাতব্বররা উঠে পড়ল।

কাছারির বাইরে এসে সরসীনাথ পাশের সঙ্গীকে বললেন, "রামজয় জেদ ধরেছে। আমরা আর কী বলব বলো ? তবে কী জানো, এ তো মিটমাটের লড়াই নয় যে, দশাননকে কিছু প্রণামী দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে ! মুখোমুখি হতেই হবে রামজয়কে। জানি না, আমাদের কপালে কী আছে।"

সঙ্গী বলল, "কপালে দুর্ভোগই আছে খুড়োমশাই, আপনি দেখে নেবেন।"

বিকেল ফুরিয়ে এসেছিল।

রামজয় পায়চারি করতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গে পাঞ্জালি।

জমিদারবাড়ি ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে এসে রামজয় অন্যমনস্কভাবেই বললেন, "পাঞ্জালি, মনসাচরে আসার কোন কোন পথ আছে ?"

পাঞ্জালি যেন অবাক হল, বলল, "আজ্ঞা, পথ তো চতুদ্দিকেই।"

"চতুর্দিকেই পথ তা আমি জানি। আসল পথ কোন কোনটা ?" রামজয় যে না জানেন পথগুলো তা নয়—তবু বললেন।

সামান্য ভেবে পাঞ্জালি বলল, "পশ্চিমে নদী, নদী পেরিয়ে পুরনো বিশালিতলা আর জোড়া বটগাছের পাশ দিয়ে আসা যায়। দক্ষিণে হাটুরিময়না, সে তো আজ্ঞা মনসাচরের পাশের গাঁ, সেখান দিয়েও আসা যায়, তবে গোরাথানের পথ দিয়ে লোকজনের যাতায়াত।"

রামজয় নিজেই বললেন, "উত্তরে জঙ্গল। আর পুবে মরা ঝিল।"

"হ্যাঁ, বাবু।"

সরাসরি আসা-যাওয়ার পথ বলতে চার কি ছয়। ঝিল দিয়ে মনসাচরে ঢোকা মুশকিল। ঝোপঝাড়, পাঁক, কাদা নোংরা—একবার ঝিলে নামলে গলা পর্যন্ত ডুবে যাবে। দশানন ওই পথ দিয়ে আসবে না।"

পাঞ্জালি বলল, "নদীর পথটাই..."

"না, সে-পথও ধরবে না। কেন ধরবে না জানো ?"

"আজ্ঞা, না।"

"নদীর দিকে গা আড়ালের মতন জায়গা তেমন নেই। ফাঁকা। আসতে গেলে নজরে পড়বে। দলবল নিয়ে ওভাবে দশানন আসবে বলে আমার মনে হয় না।"

"তা বটে," পাঞ্জালি বলল, "তবে রাজাবাবু, বিশালিতলা আর জোড়া বটতলা দিয়ে রাতে যদি আসে... !"

রামজয় মাথা নাড়লেন। বিশালিতলার ভাঙা মন্দিরটার কথা তিনি ভেবেছেন। এই মন্দির যে কবেকার কেউ জানে না। পাথরের মন্দির। একসময় হয়তো মন্দিরের চেহারা গোটাই ছিল। এখন ভাঙা। অর্ধেক পাথর আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছে, মাথা নেই মন্দিরের, নিতান্ত একটা স্তূপ হয়ে পড়ে আছে

কতকাল। সেখানে কোনও দেবদেবীর মূর্তিও নেই। ছড়ানো পাথর আর ঝোপঝাড় ছাড়া চোখেও পড়ে না কিছু। পাশেই জোড়া বটগাছ। এই দুটো বটগাছ আর ভাঙা মন্দির যেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মনসাচরের এক প্রান্তে।

রামজয় বললেন, "আমার মনে হয়, দশানন নদীর ধার দিয়ে আসবে না, ঝিল দিয়েও নয়। ও আসবে হয় জঙ্গলের দিক থেকে, না হয় পাশের গ্রামের পথ দিয়ে। তা যেদিক দিয়েই আসুক, আমি চারদিকেই লোক রাখব। তারা নজর রাখবে।"

পাঞ্জালি বলল, "সেটা ভাল কথা বাবু।"

হাঁটতে-হাঁটতে রামজয় পাঞ্জালিকে বোঝাতে লাগলেন, তিনি কীভাবে নজর রাখার ব্যবস্থা করেছেন চারদিকে। উঁচু মাচান বা যে-কোনও উঁচু জায়গায় বসে মাধবের লোক নজর রাখবে পথের দিকে। দশাননদের দলের লোক যেখান দিয়েই ঢুকুক, সঙ্গে-সঙ্গে তারা জানিয়ে দেবে খবরটা।

"শাঁখ বাজিয়ে ?" পাঞ্জালি বলল।

"না। তারা শাঁখ বাজাবে না। আগেভাগে শাঁখ বাজালে দশাননের দল সাবধান হয়ে যাবে। শাঁখ বাজবে পরে, গাঁয়ের ঘরে-ঘরে। ডাকাতরা গাঁয়ে ঢুকে পড়ার পর।"

"জানানটা তবে দেবে কেমন করে ?"

"আলো দেখিয়ে।"

পাঞ্জালির যেন ধাঁধা লেগে গেল। রাতের অন্ধকারে আলো দেখিয়ে জানান দেওয়াই সুবিধের ঠিকই, কিন্তু সে-আলো তো দশাননদের চোখে পড়ে যাবে। দশ হাত তফাতে একটা জোনাকি উড়লে অন্ধকারে তা চোখে পড়ে আর মশালের আলো চোখে পড়বে না ? তাও আবার একটা কেউ মশাল জ্বালাল, জ্বালিয়ে জানান দিল দ্বিতীয়জনকে, দ্বিতীয়জন আবার মশাল জ্বালিয়ে তৃতীয়জনকে জানিয়ে দিল ডাকাতের দল আসছে। এইভাবে যদি পরপর মশাল জ্বলে তবে আর দশাননদের কাছে গোপন কী রইল ?

পাঞ্জালির মুখ দেখে রামজয় বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকছে না।

রামজয় এবার যেন মজা করে হেসে বললেন, "তুমি যা ভাবছ তা নয়। এ হল গাছ-আলেয়া।"

"গাছ আলেয়া ? সে আবার কী ? আলেয়া তো মাঠেবাটে নজরে আসে, গাছ-আলেয়া কে কবে দেখেছে, রাজাবাবু ?"

রামজয় হালকাভাবেই পাঞ্জালিকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। "গাছ-আলেয়া কিছু নয় হে, ধোঁকা। আসলে কী জানো পাঞ্জালি, তুমি যদি মালসার চাপা আগুনে এক মুঠো নুন আর ফিটকিরির গুঁড়ো ছুড়ে দাও—মালসার আগুন দপ করে জ্বলে উঠবে। আবার নিভেও যাবে একটু পরে। দূর থেকে দেখলে তুমি কিছুই বুঝবে না, মনে হবে আলেয়ার মতন হবে কিছু একটা।"

পাঞ্জালি বুঝতে পারল, বাবু মাথা খাটিয়ে এই মতলবটা বার করেছেন। তা না হয় করেছেন, কিন্তু পৌষ মাস তো পড়ে গেল, শীত এসেছে, দেখতে দেখতে উত্তরে হাওয়ার ঝাপটা আসবে জঙ্গল থেকে, কনকনানি বাড়বে, ঘন হবে কুয়াশা আর হিম পড়বে খোলা আকাশ থেকে। এই শীতের মধ্যে মাধব সর্দারের কটা লোক রাত জেগে মাচায় বসে পাহারা দিতে পারবে দিনের পর দিন! তারা তো মারা পড়ে যাবে।

কথাটা না তুলে পারল না পাঞ্জালি।

রামজয় বললেন, "সে ব্যবস্থা করব। তবে এখন থেকে পাহারায় বসাচ্ছি না কাউকে। দশানন যদি তার নিয়ম মেনে চলে তবে দ্বিতীয়বারের মুখোশটা আগে টাঙাক, তারপর পাহারা বসাব।"

"তিনবারের জন্যে সবুর করবেন না?"

"না। শেষবারের জন্যে অপেক্ষা করতে হলে ঠকতে হবে। কে বলতে পারে পাঞ্জালি, শেষবারের পর আর সময় পাব না, দশাননও বোকা নয়।" বলে একটু থেমে রামজয় দাঁড়িয়ে পড়লেন হঠাৎ। দূরে তাকালেন। অন্ধকার হয়ে আসছে। সন্ধ্যাতারা ফুটে উঠেছে। হাওয়া এল শীতের। অল্পক্ষণ চুপচাপ থাকার পর এবার তিনি বললেন, "কামারপাড়া থেকে কাল বদ্যিনাথকে ডাকিয়ে এনেছিলাম। ক'টা কাজের কথা ছিল। প্রাণের ভয় আমি করি না পাঞ্জালি। কিন্তু বাড়িতে আমাদের পাঁচ পুরুষের নারায়ণ বিগ্রহ আছেন। তাঁর নিত্য পুজো হয়। বিগ্রহের অলঙ্কারও কম নেই। ওই ঘরটি আমায় দশাননের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। তা-ছাড়া, তেমন কিছু হলে রায়বংশের গচ্ছিত কিছু সোনাদানাও তো সরিয়ে রাখতে হবে। আমার ছেলেমেয়েও আছে। এ-সবই সাবধানে রাখতে চাই।... তা ও-কথা থাক এখন। একটা ব্যাপার আমার মাথায় আসছে না হে!"

"কী বাবু?"

"বদ্যিনাথ চলে যাবার পর পরই বাড়ির গায়ে শেয়ালের ডাক শুনলাম। একটাই শেয়াল বলে মনে হল।"

"শেয়ালের ডাক!"

"না, না, ওতে অবাক হবার কিছু নেই। শেয়াল কুকুর ডাকতেই পারে। তবে রায়বাড়ির আশেপাশে শেয়ালের ডাক বড় একটা শুনি না। তা-ছাড়া ওই ডাকটা কানে লাগল। বুঝতে পারলাম না, সত্যিই শেয়ালের, না মানুষের গলায় শেয়ালের ডাক?"

পাঞ্জালি অবাক হয়ে বলল, "মানুষের গলায় শেয়ালের ডাক?"

"বদ্যিনাথকে কি কেউ নজর করছিল?"

"কেন?"

"এই বাড়ির ওপর নজর রাখার জন্যে। দশানন শুনেছি আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ে না, সবরকম খবরাখবর রাখে। চোর-ডাকাতেরও চর থাকে পাঞ্জালি।"

পাঞ্জালি বলল, "জানি রাজাবাবু।... তা হলে কি এই বাড়িতেও দশাননের

লোক ঢুকেছে ?”

রামজয় তাকালেন। দেখছিলেন পাঞ্জালিকে। বললেন, “আমার এখানে সবাই পুরনো কর্মচারী। নতুন কাউকে দেখছি না। ভেতর মহলে মেয়েরা থাকে, তাদের খবর আমি জানি না। তবু সাবধান হতে বলেছি তোমাদের মাকে।”

পাঞ্জালি চুপ করে থাকল সামান্য সময়। রামজয় আবার হাঁটতে শুরু করেছেন। হাততিনেক পিছনে পাঞ্জালি। বিশ-ত্রিশ পা এগিয়ে এসে সে বলল, “বলতে ভয় হয়, বাবু। আপনার কাছারি-সেরেস্তার কর্মচারীরা পুরনো। তাদের আপনি অন্নদাতা। ওরা আপনার নুন খায়। তবু একটা কথা মনে করলে আমি বড় কাতর হই।”

“কী কথা ?”

“আপনি কাল বিভীষণের কথা বলছিলেন। সে তো রাবণের সহোদর ছিল। তাই বলে কি ওর শত্তুর হতে আটকে ছিল ? বলুন আপনি ?”

রামজয় সহজভাবেই বললেন, “না, আটকায়নি। আমার নুন খেয়ে আমারই নেমকহারামি করতে পারে এমন কে আছে আমি জানি না। তবে এখন থেকে নজর রাখছি।... নাও, চলো ফেরা যাক।... তুমি কিছু দেখলে শুনলে, খোঁজ পেলে ?”

পাঞ্জালি বলল, “চেষ্টায় আছি রাজাবাবু। একজনের খবর পেলাম। মাসখানেক হল মনসাচরে এক সাধুরাবা এসেছেন। শ্মশানের দিকে কালীমন্দিরের কাছেই চালা বানিয়েছেন। সেখানেই থাকেন। সাধুবাবা নাকি মৌনী ! কথাবার্তা কারুর সঙ্গে বড় বলেন না। তবে যা জানাবার ইশারায় জানিয়ে দেন।”

রামজয় বললেন, “সাধুবাবার কথা আমার কানে গিয়েছে। তাকে দেখিনি। শুনেছি, বাবা পাকুড়ের দিক থেকে এসেছে। তুমি তাকে দেখেছ ?”

“আজ্ঞা, না।”

“যাও, দেখে এসো। তবে সাবধানে দর্শন করবে বাবাকে, যেন কিছু বুঝতে না পারে।”

পাঞ্জালি মাথা নাড়ল। সে সাবধান হয়েই সাধুবাবাকে দর্শন করতে যাবে।

জমিদারবাড়ির কাছাকাছি এসে রামজয় হঠাৎ বললেন, “পাঞ্জালি ?”

“বাবু ?”

“তোমার কি মনে হয়, এবার মনসাচরে পৌষ সংক্রান্তির মেলা বসবে না ? দশাননের ভয়ে আসবে না লোকজন ?”

পাঞ্জালি মাথা নাড়ল। বলল, “না, আমার তেমন মনে হয় না। মেলা অবশ্যই বসবে, তবে জমজমাট কম হতে পারে।”

রামজয় আর কিছু বললেন না।

চার

পুরো দশটা দিনও কাটল না, আবার রাবণের মুখোশ ঝুলতে লাগল গাছের ডালে। এবারে আর আমগাছের ডালে নয়, ঝুঁটি জঙ্গলের কাছেও নয়, একেবারে হাটতলার মুখে অশ্বত্থ গাছটার নিচু দিকের ডালে। কে টাঙাল কে জানে, তবে এমন দিনে টাঙিয়েছে আর এমনভাবে ঝুলিয়ে দিয়েছে মুখোশ যে কারও নজরে না পড়ে উপায় নেই।

মনসাচরে হাট বসে রবিবার। বড়সড় হাটই বলা চলে। শাক-সবজি আনাজপাতিই শুধু নয়, চালডাল, তেল, মশলাপাতিরও দু-একটা দোকান বসে যায় গাছগাছালির ছায়ার তলায়। আরও টুকটাক চোখে পড়ে হাটে ; কবিরাজী শেকড়বাকড় খুঁজলেও পাওয়া যায়।

হাট বসতে বসতে বেলা হয়, দুপুরে জমজমাট ; সন্ধের আগে আগে ফাঁকা। মনসাচর তো ছোটখাটো গ্রাম নয়, গঞ্জের মতন বড়ও নয়, তবু বড় বইকী। নয়-নয় করেও বড়-ছোট পাঁচ-পাঁচটা পাড়া, মানুষজন কম হবে কেন ! হাটের দরকার তো সকলেরই ; তার ওপর আশপাশের গ্রাম থেকে কেউ-কেউ এসে পড়ে।

নিয়মমতন হাট বসল ঠিকই, কিন্তু বেচাকেনা যতটা না জমল তার চেয়ে বেশি আলোচনা চলল মুখোশ নিয়ে। দশাননের মুখোশ টাঙাবার প্রথম ঘটনাটার কথা এতদিনে সকলেই জেনেছে, শুনেছে, তবে আজ নিজেদেরই চোখে দেখল, অশ্বত্থগাছের ডালে সেই ভয়ঙ্কর মুখোশটা ঝুলছে।

রামজয়ের কাছে খবর গেল দুপুরের আগেই।

কাছারিতে বসেই খবরটা শুনলেন রামজয় ; তারপর বললেন, "বিকেল গড়াবার আগেই ওটা নামিয়ে হাটতলাতেই পুড়িয়ে দেবে। আর যেখানে মুখোশটা ঝুলছিল সেখানে ভুষোপড়া মাটির হাঁড়ি আর খড় দিয়ে একটা কাকতাড়ুয়া করে ঝুলিয়ে দাও।"

খবরটা জানাতে এসেছিল নস্কর। সে তো নিজে হাটে যায়নি। লোকে এসে খবর দিয়ে গিয়েছে। কর্তাবাবুর হুকুম শুনে নস্কর খানিকটা অবাক হল। রাবণের মুখোশ নামিয়ে কাকতাড়ুয়া টাঙাতে হবে ! মানে, দশানন তবে রাবণ নয়, নিতান্তই এক খড়ের কাকতাড়ুয়া। নস্কর যেন মনে-মনে ভাবছিল, দশাননকে এতবড় অপমান করাটা কি ঠিক হবে !

"কী হল ? দাঁড়িয়ে রইলে ?"

"না আজ্ঞে, যাই— ।"

"শোনো, মধুকে একটা খবর পাঠাও, আজ বিকেল-নাগাদ যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।"

"খবর পাঠাচ্ছি— !"

"পাঞ্জালি কোথায় ?"

"দেখিনি হুজুর, খোঁজ করছি।'

নস্কর চলে গেল।

রামজয় বসে থাকলেন। ভাবছিলেন। দশানন তবে সত্যি সত্যিই তার তরফের দ্বিতীয় দফার হুমকি দিয়ে গেল! তা দিক! তবে এত তাড়াতাড়ি আবার তার মুখোশ ঝুলবে রামজয় ভাবেননি। মেলার এখনও দেরি আছে। না, দেরিই বা কোথায়; সংক্রান্তির দেরি থাকলেও মেলা বসার দেরি নেই।

দশাননের হিসেবটা কেমন রামজয় জানেন না। সে মেলার গোড়ায় আসবে না, মাঝে; নাকি শেষের দিকে কে জানে! তবে এত তাড়াতাড়ি আর-একবার মুখোশ ঝোলানোর অর্থ, দশানন দেরি করতে চায় না। হয়তো সে জানতে পেরেছে, রামজয়ও ভেতরে ভেতরে তৈরি হচ্ছেন—, যত সময় পাবেন—ততই তাঁর সুবিধে হবে। দশানন সে-সুযোগ দিতে চায় না রামজয়কে।

রামজয় আর বসে থাকলেন না, উঠে পড়লেন।

কাছারিবাড়ির বাইরে এসে পায়চারি করতে করতে চারপাশ তাকালেন। জমিদার বাড়ির চৌহদ্দির উঁচু পাঁচিলের ভাঙাচোরা অংশগুলো প্রায় মেরামত হয়ে গিয়েছে। সামান্য যা বাকি—দু-একদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। পাঁচিলের গা-লাগানো বড়-বড় গাছ যা আছে—তার ছড়ানো ডালপালা নজর করে রামজয় যেগুলো কেটেছেঁটে দিতে বলেছিলেন, সেগুলো ছাঁটা হয়ে গিয়েছে। এই ধরনের ডালপালা রাখলে বিপদ হতে পারে। সাধারণত, চোর-ডাকাতের দল পাঁচিল বেয়ে ওপরে উঠে, গাছপালা পাতার আড়ালে লুকোতে চায়। সে-সুযোগ তাদের না দেওয়াই ভাল।

রামজয় মোটেই চান না, দশাননের দলবলের লোক সহজে জমিদারবাড়ির এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

খানিকটা সময় পায়চারি করে রামজয় একবার তাঁর ঘোড়ার আস্তাবলের দিকে তাকালেন।

গত পরশুই সেটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ঘোড়াটা আর নেই। বড় কষ্ট পেয়েছেন রামজয়। হোক না পশু, তবু রামজয়ের সঙ্গে এই আরবি ঘোড়াটার আশ্চর্য এক সম্পর্ক ছিল, মনে হত, ঘোড়াটা যেন তাঁর বাধ্য ও অনুগতই শুধু নয়, তাঁর সঙ্গীর মতন। সে আর নেই!

রামজয়ের হঠাৎ কেমন খটকা লাগল। লোকে বলে, বড় কোনও বিপদ আসার আগে দুর্ভাগ্য নাকি জানান দেয়। মানুষের বড় কাছের কেউ বিদায় নেয়, মূল্যবান কোনও জিনিস খোওয়া যায়! ঘোড়াটা যে চলে গেল, সেটা কি তবে অশুভ ইঙ্গিত!

রামজয় মাথা নাড়লেন। না, না, তা কেন হবে! আর অশুভ যদি এসেই থাকে—তাকে এড়িয়ে গিয়েই বা কী লাভ!

সন্ধের আগেই মাধব সর্দার হাজির। পাঞ্জালিও কাছেই ছিল।

হাটতলার কথা নিয়ে আলোচনা হল কিছুক্ষণ। শেষে রামজয় বললেন, "মধু, তুমি কতটা তৈরি হয়েছ ?"

মাধব মুখ তুলে বলল, "আমার লাঠিয়ালরা ঠিক আছে, হুজুর। ষোলো লাঠি, চার সড়কি। একজোড়া ভাল তিরন্দাজও পেয়েছি। যমজ ভাই, কানু আর ধনু। বয়েসে ছোকরা।"

"সব তোমার হাতেই আছে ?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"কুড়ি-বাইশজনের দল তোমার ! ভাল কথা। এর মধ্যে চার ছ' জনকে তুমি কাল থেকেই হাটতলার আশপাশে নজর রাখতে বলো। আমার মনে হয়, দশানন এবার আর চুপ করে বসে থাকবে না।"

মাধব সর্দার মাথা নাড়ল। তারও সেই রকম ধারণা। মাধবকে দেখলে বোঝা যায় না, সে এই তল্লাটের মস্ত বড় লাঠিয়াল। সামান্য বয়েস হয়ে গেলেও মাধবের পেটানো, ছিপছিপে শরীরে কেমন এক নরম ভাব আছে। চোখ-মুখ রুক্ষ নয়। মাথার চুল অবশ্য বেশ বড়, কাঁধ পর্যন্ত, মানতকরা চুল, গোঁফ আছে, দাড়ি নেই। গলায় কণ্ঠি।

রামজয় বললেন, "আমি তোমায় যেমনটি বলেছিলাম সেইভাবে রাতপাহারা দেবার দরকার হবে ; তবে আরও দু-চারটে দিন যাক, দেখি দশাননের তিন নম্বর মুখোশ কবে কোথায় ঝোলানো হয়।"

মাধব বলল, "হুজুর, আমরা পাহারায় বসার জায়গা বেছে রেখেছি। যেদিন হুকুম করবেন বসতে পারব।"

"ঠিক আছে, তুমি আজ এসো। কাল খবর দেবে।"

মাধব চলে গেল।

রামজয় সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "পাঞ্জালি, হাটতলায় অশথগাছে মুখোশ টাঙাল কে ? দশাননের লোক এসে রাতারাতি কাজটা সেরে গেছে বলে আমার মনে হয় না।"

পাঞ্জালি বলল, "আমারও ধোঁকা লাগছে, বাবু ! এ বাইরের লোকের কাজ নয়। কাল বিকালেও কোনও মুখোশ ছিল না। হাটতলার পাশ দিয়ে গাঁয়ের লোকজন আসা-যাওয়া করেছে, কারও নজরে পড়েনি। সাঁঝে বা রাতে মুখোশটা টাঙানো হয়েছে।"

"টাঙাল কে ? যে টাঙিয়েছে সে এই গাঁয়ের লোক, দশাননের চর।" রামজয় বললেন।

"আজ্ঞা, তা তো বটেই। তবে সেই লোকটা কে ?"

"তুমি আন্দাজ করো।"

পাঞ্জালি আজ ক'দিন—তার এখানে আসার পর থেকে মনসাচরের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে সে নতুন মানুষ নয়, অনেকেই তার চেনা,

কেউ-কেউ ইয়ার-দোস্ত গোছের। গাঁয়ের মজলিসে, আড্ডায়, তাস-পাশার আসরে তার আসা-যাওয়া আছে। গল্পগুজব করে, তামাক খায়, হাসি-মশকরা করে। কিন্তু তার চোখ-কান খোলা থাকে ; সজাগ সতর্ক। আভাসে ইঙ্গিতে সন্দেহ করার মতন কিছু শুনলেই সে কান খাড়া করে সেটা শুনে নেয়। আবার এখান-ওখান ঘুরে দেখে নেয় নতুন কোনও লোকজন এসে আড্ডা গেড়েছে কি না গাঁয়ে। রাজাবাবুকে রোজই খবরাখবর দেয় পাঞ্জালি গ্রামের, লোকের মতিগতির কথা জানায়। সত্যি বলতে কী, আজ ক'দিনের মধ্যে পাঞ্জালি এমন কারও খোঁজ পায়নি যাকে দশাননের চর বলে মনে করা যেতে পারে। এক সেই মৌনী সাধুবাবা ছাড়া এখানে নতুন কাউকে দেখতেও তো পাচ্ছে না পাঞ্জালি। কিন্তু তারও বিশ্বাস এ-গ্রামে দশাননের চর ঘাপটি মেরে বসে আছে। কে সে ?

পাঞ্জালি হঠাৎ বলল, "বাবু, লোকের বাড়িতে ভাই ভাইপো, ভাগ্নে, কুটুমজন, এ-ও আসে। আজ আসে, দু'দিন পরে চলে যায়। তেমন লোকজন তো নজরে পড়ে না। তবে, নতুন বলতে হালে একজোড়া সাপুড়ে এসে জুটেছে এখানে !"

"সাপুড়ে ? এই শীতকালে ?"

"হ্যাঁ, আজ্ঞা।"

"কোথায় আছে তারা ?"

"চাষি পাড়ার পশ্চিমে। নদীর দিকে।"

"খোঁজ নিয়েছ ?"

"নিলাম। এক সাপুড়ে আর তার ভাইপো। সাপুড়েটার জড়িবুটি জানা আছে। তার ভাইপোটা জোয়ান। ষোলো-সতেরো হবে বয়েস।"

"আর সাপুড়ে ?"

"চল্লিশের গায়ে।"

"এখানে কেন এসেছে ? থাকে কোথায় ?"

পাঞ্জালি বলল, "একটা চালা বানিয়ে নিয়েছে তারা কোনওরকমে খড়পাতা দিয়ে, ভাঙা কাঠকুটো জোগাড় করে। সাপুড়েটা সাপের ঝাঁপি নিয়ে ঘোরাফেরা করে না বেশি। জড়িবুটিই বেচে বেড়ায় দোরে-দোরে। তার জড়িবুটিতে নাকি অজীর্ণ সারে, জ্বরজ্বালা আরাম দেয়, বাতের ব্যথা মরে মালিশ তেলে।"

"ও ! তা আজ হাটতলাতেও কি বসেছিল সাপুড়েটা ?" রামজয় জানতে চাইলেন।

"বসতে পারে। আমি আজ দুপুরে হাটে যাইনি, বাবু। বিকেলে গিয়েছি। তখন মুখোশ পোড়ানো হচ্ছিল।"

রামজয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। মনসাচরে মা মনসার খাতির যত্ন খানিকটা থাকবেই। নামই যখন মনসাচর। অবশ্য কেন যে এই নাম হয়েছিল এখানকার কেউ জানে না। হতে পারে অনেক আগে, কোনও সময়ে নদীর জল এসে ঢুকে পড়েছিল ঝিলের দিকে। পরে ঝিল সরল, বাঁশঝোপ আর বাবলা গাছের গায়ে-গায়ে লতাপাতা আগাছার জঙ্গল হল। পাঁকে কাদায় শ্যাওলায় থিকথিক

করতে লাগল ঝিল। তখন হয়তো সাপের উপদ্রব হয়েছিল খুব। নামটা ওরই জন্যে হতে পারে, নাও পারে। তবে মনসাচরে এক মনসামন্দির আছে। আষাঢ়ের শেষ বা শ্রাবণের শুরুতে সেখানে অষ্টনাগের পুজো বসে। গ্রামের পুজো, খানিকটা মাতামাতি তো থাকবেই। তবে সে তো কবেই ফুরিয়ে গিয়েছে, এখন বর্ষা নয়, শরৎ হেমন্ত শেষ করে শীত পড়তে চলল, এখন এখানে আচমকা একজোড়া সাপুড়েই বা কেন আসবে!

রামজয়ের সন্দেহ হচ্ছিল। বললেন, "লোকটাকে তুমি দেখেছ?"

"দেখেছি। ঢ্যাঙা চেহারা, কুচকুচে কালো রং গায়ের, রুক্ষু। মাথার চুল বড়-বড়, মাথার ওপর ঝুঁটি করে বেঁধে রাখে। গলায় মালা আর কবচ বাঁধা। হাতে লোহার বালা।" বলেই কী যেন মনে পড়ে গেল পাঞ্জালির, আবার বলল, "ওর একটা চোখে মা-শেতলার দয়া হয়েছিল। চোখটায় দেখতে পায় কি না অল্পস্বল্প জানি না।"

"এখানে কেন এসেছে?"

পাঞ্জালি ঘাড় চুলকে বলল, "ভেতরের কথা জানি না। তবে বেদে-বাওড়াদের স্বভাবই ওই, এক জায়গায় থিতু হয় না। গরিব মানুষ। পেটের দায়ে এখান-ওখান ঘুরে বেড়ায়।"

"পেটের দায়ে ঠিক এই সময়েই এখানে এল। ঠিক আছে, ভাল করে খোঁজ নাও।" বলে রামজয় একটু ভাবলেন, বললেন আবার, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না পাঞ্জালি, ওইদিকে তোমার মৌনী সাধুবাবা আর এদিকে দুই সাপুড়ে—এরা সবাই একে-একে এই সময়টায় এসে জুটল কেন?

পাঞ্জালি বলল, "সাধুবাবা এসেছেন মাসখানেক হল, আর ওই সাপুড়েরা খুড়ো-ভাইপোরা এল পরে।"

"তাই দেখছি। খোঁজ করলে তুমি হয়তো আরও দু-একজন নতুন কাউকে দেখতে পাবে।"

পাঞ্জালি কিছু বলল না। খোঁজ সে যথাসাধ্য করবে।

রামজয় কথা পালটালেন। বললেন, "মেলার কথা শুনলে কিছু?"

"শুনলাম আজ্ঞা। মেলা বসবে। আপনি ভরসা দিয়েছেন—মেলা বসবে বইকী! তবে কতটা জমবে আগে থেকে বলা যাচ্ছে না। মেলার ক'দিন গাঁয়ের লোক সজাগ থাকবে, তারা নিজেরাও পাহারা দেবে শুনলাম।"

রামজয় খুশি হলেন। দশাননের ভয়ে যদি এত কালের পুরনো মেলা বন্ধ থাকে তবে মনসাচরের মানুষের পক্ষে সেটা গৌরবের ব্যাপার হবে না। মেলা বসুক—দশানন দেখুক তার ভয়ে নদীর চরে মেলার জায়গা ফাঁকা পড়ে থাকে না।

পাঞ্জালি হঠাৎ বলল, "একটা কথা বলি, রাজাবাবু?"

"বলো।"

"বদ্যিনাথের কাজ কি শেষ হয়েছে?"

"বদ্যিনাথ। বেজিকলের কথা বলছ ? না, এখনও শেষ হয়নি। দুটো ঘরের কাজ শেষ হয়েছে। একটা বাকি। কাজ পরশুর মধ্যে হয়ে যাবে হয়তো। কেন ?"

"না। আপনি বলেছিলেন বাবু, তাই জানতে চাইলাম। একটা কথা শুনলাম।"

"কী ?"

"বদ্যিনাথের বড় ছেলেটা গাঁ-ছাড়া হয়েছে গতকাল।"

রামজয় অবাক হলেন। বদ্যিনাথ আজ আসেনি। তিনি কিছু জানেন না। বদ্যিনাথের বড় ছেলে তার বাপের সঙ্গে কামারশালায় কাজ করে। জমিদার বাড়িতে কাজ করতে আসার সময় অবশ্য বদ্যিনাথ একা আসে। রামজয়ের চোখের সামনে তার কাজ সারে। তার ছেলেকে নিয়ে কথা ওঠার কারণ নেই। তবু, এটা তো ঠিকই, বাপের কাজকর্মের কথা সাবালক ছেলে জানবে না, এমন তো হতে পারে না ! তা ছাড়া বেজিকলের ঢালাই-পেটাই যা হবার কামারশালাতেই হয়, সামন্ত সেগুলো বয়ে আনে জমিদার বাড়িতে, এনে তার কাজ করে।

রামজয় কেমন ধোঁকা খেয়ে গেলেন। বললেন, "সামন্ত ? ছেলে গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে তোমায় কে বলল ?"

"শুনলাম। বদ্যিনাথ বেটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"কী হয়েছিল ? বাপ-বেটায় ঝগড়া ?"

"জানি না। আপনি বদ্যিনাথকে জিজ্ঞেস করবেন ?"

"করব। কাল-পরশু তার আসার কথা।... তবে কি পাঞ্জালি, ছেলের দোষ বাপের ঘাড়ে চাপানো যায় না। তা ছাড়া বদ্যিনাথ আমার ঘরের কথা বাইরে বলে বেড়াবে না। সে সাহস তার হবে না, হে।... তবে হ্যাঁ, বেটা তার জানতে পারে। কাজ করে বাপের সঙ্গে কামারশালায়।"

পাঞ্জালি বলল, "ছেলেটা ভাল নয়। আপনি বদ্যিনাথের সঙ্গে কথা বলবেন, রাজাবাবু। বললেই বুঝতে পারবেন সব।"

রামজয় মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ, কথা তিনি বলবেন বইকী বদ্যিনাথের সঙ্গে। কালই বলবেন। তেমন বুঝলে, ব্যবস্থাও করবেন বদ্যিনাথের।

পাঁচ

সংক্রান্তির মেলা শেষপর্যন্ত কতটা বসবে বোঝা যাচ্ছিল না। ঠিক তখনই দেখা গেল, নদীর তীর ঘেঁষে একদল লোক এসে বসে পড়েছে। মেলার একটা জায়গা মোটামুটি ঠিক করা আছে। নদীর কাছেই। মেলা যদি বড় হয়, জমে যায়— তবে সেটা ছড়িয়েও যায় আশপাশে। ব্যাপারি, দোকানি ছাড়াও মেলায় আসে নাগরদোলা, ঘোড়াদোলার লোক ; আসে পাখিওলা, সাপুড়ে, এমনকী বাঁদর-নাচিয়ে দু-একজন। মিষ্টিমাষ্টার দোকানও বসে, গুড়, বাতাসা, কদমা, বেসমের লাড়ু

পাওয়া যায় মিষ্টির দোকানে।

একদল লোক এসে বসে পড়তেই মনসাচরের মানুষের নজর পড়ল মেলার জায়গার দিকে। লোকগুলো মোটামুটি ঠিক জায়গাতেই এসে বসেছে। তবে তারা ঠিক ব্যাপারি নয়। দু-তিনজন ব্যাপারি, বাকিরা বাউল বোষ্টম।

বাঁশের খুঁটি পুঁতে, পাতার ছাউনি, ছেঁড়াফাটা তেরপল মাথার ওপর টাঙিয়ে যারা বসে পড়ল— তাদের প্রথমে দেখল শিবপদ। অবশ্য সে না দেখলেও ব্যাপারটা অন্যের নজরেও পড়ে যেত। শিবপদ ছেলেমানুষ, গোরু, ছাগল চরিয়ে বেড়ায়। গোরু চরাতে গিয়েছিল ওদিকে। চোখে পড়ল লোকগুলোকে। কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখেছেও ওদের, তারপর ফিরে এসে খবর দিয়েছে অন্যদের।

শিবপদ খবর দেওয়ার পরপর আরও কয়েকজন খবর আনল, মেলায় লোক আসতে শুরু করেছে বাইরে থেকে।

তা হলে মেলা বসছে ?

মেলা বসবে না ভেবে যারা মরমে মরে ছিল তারা নেচে উঠল মেলা বসার খবর পেয়ে। সত্যি তো, কতকালের মেলা এটা, কতরকম গল্প আছে মেলা নিয়ে। শোনা যায় পরম বৈষ্ণব শুভ দাস এই মেলায় এসে স্নান করতেন প্রতি বছর। আজও শুভদাসের নামে একটি স্তূপ আছে ইটের।

মনসাচরের ঘরে-ঘরে একটা সাড়া পড়ে গেল, মেলা বসছে।

কিন্তু কী হল দশাননের ? দু'-দু'বার মুখোশ টাঙাবার পর সে কি পিছিয়ে গেল ? তার কাছে তবে বুঝি খবর পৌঁছে গিয়েছে, মনসাচরের রাজাবাবু তাঁর লোকজন আর প্রজাদের নিয়ে দশাননকে রুখতে তৈরি হয়ে আছেন। কথায় বলে, যারে ডরাই তার কাছে ঘেঁষি না।

দশানন কি ভয় পেয়ে গেল ? অবাক কাণ্ড ! ভয় পাওয়ার মানুষ তো দশানন নয়। তবে ? সে কি তবে অন্য কোনও সুযোগের অপেক্ষা করছে ?

রামজয় খবরটা শুনেছিলেন। পাঞ্জালি এসে জানিয়ে গিয়েছিল।

পরের দিন রামজয় পাঞ্জালিকে সঙ্গে নিয়ে শেষ বিকেলে নদীর দিকটা নিজের চোখে দেখতে বেরোলেন।

শীতের বেলা, রোদ মরে আলো নিভতে-নিভতে কতক্ষণই বা লাগে ! আলো মরে এসেছিল। অন্ধকার হয়ে আসছে।

রামজয়ের মাথায় পাগড়ি, গায়ে গরম চাপকান। পাঞ্জালির গায়ে মোটা চাদর, গরমই, তবে যেমন করকরে তেমনই তার অদ্ভুত রং।

যেতে-যেতে রামজয় বললেন "পাঞ্জালি, বাউল, বোষ্টম ক'জন এসেছে দেখেছ ?"

"গুনতি তো করিনি, রাজাবাবু। জনাছয় হবে।"

"আর দোকানি ?"

"তিনজনকে দেখলাম।"

"ওদের ব্যবসা কীসের ?"

"তা তো জানি না। সবে এসে বসেছে। পোঁটলাপুঁটলি, গাঁটগাঁটরি খোলেনি। দোকান সাজালে বুঝতে পারব।"

"মুড়ি-মুড়কির দোকান নয় তো ?" রামজয় ঠাট্টা করেই বললেন।

পাঞ্জালি জবাব দিল না।

চুপচাপ আরও খানিকটা হেঁটে এসে রামজয় বললেন, "চোখে ধুলো দেওয়ার মতলব করেনি তো দশানন ? নিজের দলের ক'জনকে বোষ্টম সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে ?"

"আজ্ঞা ?"

"কাজটা খুব সোজা, পাঞ্জালি ! গেরুয়া পরে ক'টা লোক যদি এসে বসে থাকে— তুমি কি তাদের চট করে সন্দেহ করতে যাবে ! কেউ যায় না। ভাবে, আহা খঞ্জনি বাজিয়ে সাদাসিধে ক'টা বোষ্টম হরেকৃষ্ণ গেয়ে বেড়াচ্ছে, এরা আবার ডাকাত হবে কেন ?"

পাঞ্জালি মাথা হেলিয়ে বলল, "তা বটে আজ্ঞা।"

"আমি নিজের চোখে ওদের একবার দেখব।"

"কিন্তু রাজাবাবু, আঁধার হয়ে গেল, দেখবেন কেমন করে ?"

"আড়াল থেকেই দেখব। তা ছাড়া ওরা তো তোমার আঁধারে বসে থাকবে না। দু-একটা কুপি জ্বলবে নিশ্চয়।"

নদীর কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন রামজয়রা। আজ কোন তিথি কে জানে ! এখন বেশ অন্ধকার। আকাশে অজস্র তারা ফুটে উঠেছে। কুয়াশা জমতে শুরু করেছে নদীর দিকে। গাছপালা কালো হয়ে এল।

রামজয় বললেন, "ওরা কারা আমি জানি না, পাঞ্জালি। তবে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, নদীর মুখে গড়িখালের কাছে একটা নৌকো ভিড়ে আছে। মাঝারি নৌকো, ছই দেওয়া। এই নৌকো করেই হয়তো এরা এসেছে। কিংবা এরা হাঁটাপথেই এসেছে, নৌকোটা এদের পরে এসেছে।

পাঞ্জালি বলল, "নৌকোর কথা কে বলল হুজুর ?"

"মধু।"

"মাধব সর্দার ?"

"হ্যাঁ। তার লোক চারদিকে নজর রাখছে। আমি মধুকে বলেছি, ওই যারা এসেছে তাদের ওপর সবসময় নজর রাখতে। কোনওরকম সন্দেহ হলেই সোজা ধরে কাছারিবাড়িতে নিয়ে আসবে।"

পাঞ্জালি বলল, "নৌকোর কথা আমিও শুনেছি, বাবু, নিজের চোখে দেখিনি। একটা কথা কী জানেন, মেলায় যত ব্যাপারি আসে, সবাই তো পাশের গাঁ দিয়ে গোরুর গাড়িতে মালপত্তর বয়ে আনে না, নৌকো করেও দূর থেকে আসে। এখন মাঝনদীতেও জল নেই। কাজেই যতটুকু নৌকো বওয়া যায় নৌকো করে এসে একটা জায়গায় নৌকো বেঁধে দেয়। এটাও হয়তো তাই।"

"দেখা যাক।"

যেতে-যেতে হঠাৎ পাঞ্জালি বলল, "দাঁড়ান রাজাবাবু।"

রামজয় দাঁড়িয়ে পড়লেন।

"ওই দেখুন।"

"কী!"

"ওই যে আঁধার দিয়ে একটা লোক যাচ্ছেন—।"

চোখে পড়ল রামজয়ের। বললেন, "কে?"

"চোখে ভুল করছি না বাবু! উনি সেই সাধুবাবা।"

রামজয় নজর করে দেখলেন। বড়ই অস্পষ্ট। তবু অনুমানে মনে হল, দীর্ঘ চেহারার একটি মানুষ, মাথায় জটা থাকতেও পারে, অন্ধকারে বোঝা যায় না, লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলে যাচ্ছে।

রামজয় বললেন, "সাধুবাবা না শ্মশানের দিকে থাকে! এদিকে কেন?"

"জানি না।"

"ডাকো ওকে।"

"ডাকব?"

"হ্যাঁ। ডাকো। দেখব ওকে।"

পাঞ্জালি হাঁক পাড়ল। সাধুবাবা দাঁড়াল না। একবার, দু'বার, তিনবার হাঁক শোনার পর দাঁড়াল সাধুবাবা।

রামজয়রা এগিয়ে গেলেন।

জায়গাটা বালিয়াড়ির মতন। সাধুবাবা বালিয়াড়ির ওপরে, নীচে রামজয়রা। বালিমাটিতে পা সামান্য বসে যায়।

রামজয় ওপরে উঠে সাধুবাবার মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

চোখে পড়ার মতনই চেহারা। মাথায় অস্বাভাবিক লম্বা। লম্বা-লম্বা হাত পা, মাথায় জটা নেই। তবে চুলগুলো প্রায় জটার মতন হয়ে এসেছে। মুখে দাড়ি-গোঁফ। পরনে ধুতি। এই শীতেও গায়ে জামা নেই, গামছা জড়ানোর মতন করে একটা ছোট চাদর জড়ানো। ডান হাতে মোটা লাঠি।

সাধুবাবাকে দেখলে ভয়ভক্তি হোক না হোক, অবাক হতেই হয়।

রামজয় সাধুবাবাকে দেখছিলেন।

পাঞ্জালি হাতজোড় করে নমস্কার জানাল সাধুবাবাকে। বলল, "বাবা, প্রণাম।" বলে রামজয়কে দেখাল। "ইনি আমাদের রাজাবাবু। এখানকার মালিক।"

সাধুবাবা আগেই দেখেছে রামজয়কে। সামান্য মাথা নাড়ল। যেন বোঝাতে চাইল, পরিচয়টা জানা আছে।

রামজয় দেখলেন, সাধুবাবা কোনওরকম খাতির দেখাবার চেষ্টা করল না। আবার অবজ্ঞাও করল না। লোকটা নাকি মৌনী! পুরোপুরি মৌনী না হলেও কথাবার্তা কদাচিৎ বলে।

রামজয় বললেন, "তুমি না শ্মশানের কাছে কালীমন্দিরের কাছে থাকো।

এদিকে কোথায় গিয়েছিলে ?”

সাধুবাবা মুখে কোনও জবাব দিল না। হাত তুলে পশ্চিম দিকটা দেখাল।

“ওদিকে কী ?”

সরাসরি কোনও জবাব নয়, ইঙ্গিতে সাধুবাবা জানাল, এমনি গিয়েছিল। রামজয় পশ্চিমের দিকটা দেখলেন। এখন আর কিছু ঠাওর করা যায় না। অন্ধকার আর কুয়াশা জমে গিয়েছে ওদিকে। ঝাপসাভাবে একটা মাথাউঁচু গাছই নজরে আসে।

পাঞ্জালি বলল, “আপনি এখন ফিরছেন ?”

মাথা নাড়ল সাধুবাবা।

রামজয় বললেন, “আমার কানে গেছে তুমি পাকুড়ের দিক থেকে এসেছ ! এত জায়গা থাকতে এখানে এলে কেন ? তুমি কীসের পুজোআর্চা করো ? তান্ত্রিক ? কালীসাধনা করো নাকি ?”

সাধুবাবা শুনল কথাগুলো। তারপর আকাশের দিকে লাঠি তুলে কী যেন বোঝাতে চাইল।

রামজয় কিছুই বুঝলেন না। আকাশ দেখানোর কী অর্থ ? ঈশ্বরের সাধনা নাকি ! লোকটা কি সত্যিই সাধক, না, ভেকধারী !

পাঞ্জালি বলল, “বাবু, চলুন আমরা এগোই। বড় অন্ধকার হয়ে আসছে।”

রামজয় পাঞ্জালিকে বললেন সাধুবাবাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে, “সাধুজিকে একদিন আমার কাছারিবাড়িতে নিয়ে যাবে। তখন কথা হবে। .... চলো।”

এগোতেই যাচ্ছিলেন রামজয়, হঠাৎ লাঠিসমেত হাত তুলে পথ আটকাল সাধুবাবা। বারণ করল এগিয়ে যেতে।

রামজয় অবাক ! পাঞ্জালিও।

পথ আটকানোর মতন হাত তোলা ছিল সাধুবাবার। সামান্য পরে হাত নামিয়ে লাঠি দিয়ে বালিতে একটা চিহ্ন আঁকল।

অন্ধকারে চিহ্নটা বোঝা যায় না। পাঞ্জালি ঝুঁকে পড়ল। দেখল। তারপর মাথা তুলে রামজয়কে বলল, “কাটা চিহ্ন, রাজাবাবু। এগোতে নিষেধ করছেন।”

রামজয় কৌতূহল বোধ করলেও অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, “রাখো ওর নিষেধ। চলো।”

এগিয়ে গেলেন রামজয়, সঙ্গে পাঞ্জালি।

সাধুবাবা দাঁড়িয়ে থাকল। দেখল দু'জনকে, এগিয়ে যাচ্ছে। নিজেও পা বাড়াল।

এদিকে নদীর চর হলেও বালি শক্ত। মাটির মতন আঁট হয়ে গিয়েছে। মাঝে-মাঝেই ছোট-ছোট ঝোপ। ভাঙাচোরা কাঠকুটো, ইট পাথর— মাটির ভাঙা হাঁড়ি সরাই পড়ে আছে। এদিকেই মেলা বসে। মেলার শেষপ্রান্ত এতটাই ছড়িয়ে আসে।

হাঁটতে-হাঁটতে রামজয় বললেন, “তোমার এই সাধুবাবাটিকে আমার বিশ্বাস

হচ্ছে না, পাঞ্জালি । এক মাসের ওপর হল সে এখানে এসে বসে আছে। শ্মশানকালীর মন্দিরের কাছে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকলেই সে সাধু হয় না। চেহারাটাও যা দেখলাম, মনে হল গায়ে ক্ষমতা ধরে।

পাঞ্জালি বলল, "এই কি দশানন ?"

"দশানন !"

"দশাননকে কেউ চোখে দেখেনি রাজাবাবু। এক-এক জন এক-এক রকম বলে। শুনেছি, দশানন নিজের মুখ দেখতে দেয় না, মুখোশ পরে থাকে।"

রামজয়ও শুনেছেন সেইরকম। তবু তাঁর বিশ্বাস করতে বাধছিল। দশানন আজ একমাসের ওপর তাঁর এলাকায় এসে সাধু সেজে বসে থাকার ঝুঁকি নেবে ! এত সাহস ও স্পর্ধা তার হবে না।

পাঞ্জালি কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল। এতটা তার মনে হয়নি। সাধু সেজে চোরছ্যাঁচড় আসতে পারে, তা বলে দশাননের মতন ডাকাত ! যার ভয়ে সবাই তটস্থ হয়ে মরে, সে এত খোলাখুলি পাঁচজনের চোখের সামনে এসে বসে থাকবে !

ঘাবড়ে গিয়ে পাঞ্জালি বলল, "আপনি কি মনে করেন দশানন সাধুবাবা সেজে আগে থেকে এসে এখানে লুকিয়ে বসে আছে ! ওই কি মুখোশগুলো টাঙাচ্ছে লুকিয়ে ?"

"বলতে পারছি না। দেখতে হবে। মধুকে বলব, ওর আস্তানায় গিয়ে দেখে আসবে, কী আছে সেখানে।"

অনেকটাই চলে এসেছিলেন রামজয়রা। আর খানিকটা দূরে আলো চোখে পড়ল।

পাঞ্জালি বলল, "বাবু, ওই যে দেখুন, আলো !"

চোখে পড়েছিল রামজয়ের।

আলো দেখতে-দেখতে রামজয়ের মনে হল, ওগুলো কুপির আলো। এক-একটা জায়গা থেকে আগুনের ফুলকিও দেখা যাচ্ছে। হতে পারে, মাথা গোঁজার ছাউনির সামনে রাত্রের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করছে ওরা। ফাঁকা জায়গায় কাঠকুটো জ্বালিয়ে রান্নাবান্না হচ্ছে।

কে বলতে পারে নৌকো-করে-আসা ওই দলটা দশাননের অনুচর নয় ! দশানন নিজে সাধু সেজে এসে শ্মশানের কাছে বসে আছে আগে থেকে, তারপর সময় বুঝে তার অনুচরদের আসতে হুকুম করেছে !

আচমকা রামজয়ের মনে হল, সাধুবাবা যে তাদের এদিকে আসতে নিষেধ করছিল তা কি এইজন্য ? এখানে এলে ধরা পড়ে যাবে ওই লোকগুলোর আসল পরিচয় !

রামজয় সামান্য ইতস্তত করলেন। তিনি লোকজন লেঠেল কিছুই নিয়ে আসেননি সঙ্গে করে। ভরসা বলতে পাঞ্জালি। সে আবার নিরীহ গোছের, বিপদে পড়লে নিজেকে বাঁচাতে জানে না। রামজয়ের কাছেও কিছু নেই। তিনি শুধু হাতে এসেছেন। থাকার মধ্যে আছে বদ্যিনাথের হাতে তৈরি দু'ফলা ছোরাটা।

কোমরে গোঁজা আছে তাঁর।

কী করবেন ভাবছেন রামজয়, এমন সময় অদ্ভুত এক চিৎকার। না, ভয় পেয়ে কেউ চিৎকার করছে না, কে যেন মুখের সামনে হাত রেখে অদ্ভুতভাবে ডাকছে, "আয়, আয়, আয় রে।"

সেই ডাক চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছিল, হারিয়ে যাচ্ছিল শীতের বাতাসে। তবু ডাক থামছে না।

তারপর শোনা গেল একটা বুনো কুকুরের ডাক। ডাকটা কুকুরের হলেও শেয়ালের মতন লাগছিল।

রামজয় আর এগোলেন না। পাঞ্জালির হাত টেনে নিয়ে সামনের ঝোপের আড়ালে বসে পড়লেন। চাপা গলায় বললেন, "পাঞ্জালি— এই গলা কার? তোমার সাধুবাবার?"

ছয়

মাধব সর্দার হুকুম মেনে কাজ করে।

রাজাবাবুর হুকুম-মতন সে পাঁচ বাউল বোষ্টম আর দুই ব্যাপারিকে কাছারিবাড়িতে এনে হাজির করল।

ততক্ষণে খানিকটা বেলা গড়িয়েছে। বড় কাছারিতে কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছিল। নায়েব, গোমস্তা, কর্মচারীরা যে যার মতন কাজ করছে। তাদের নজরে পড়ল, মাধব সর্দার আর তার এক শাগরেদ কতকগুলো লোককে নিয়ে এসে ছোট কাছারিতে জমিদারবাবুর কাছে পৌঁছে দিল।

ব্যাপারটা তারা ঠিক বুঝল না। তবে লোকগুলোকে দেখে মনে হল, এরা নতুন। মনসাচরের বাসিন্দে নয়। এরা কোথা থেকে এল, কেনই বা এল, মাধবই বা কেন এদের নিয়ে এসেছে, কিছুই বুঝতে না পেরে যে যার মতন অনুমান করে গালগল্প করতে লাগল।

রামজয় নিজের জায়গাটিতে বসে ছিলেন। হাত কয়েক তফাতে পাঞ্জালি। একপাশে একটা ফরাসও পাতা আছে। বয়স্ক লোকজন এলে রামজয় ওই ফরাসে তাঁদের বসতে বলেন। জমিদার হলেও রামজয়ের সৌজন্যবোধের অভাব নেই।

লোকগুলোকে রাজাবাবুর কাছে পৌঁছে দিয়ে মাধব বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রামজয় তাকালেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা বাউল বোষ্টমদের দিকেই তাঁর নজর গেল প্রথমে। পরে অন্য দু'জনকে দেখলেন। ভেতরে ভেতরে তিনি কী ভাবছেন, এদের সন্দেহ বা অবিশ্বাস করছেন কি না, তাঁর চোখমুখ দেখে তা ধরা যাচ্ছিল না।

"তোমরা কোত্থেকে আসছ?" রামজয় সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করলেন প্রথম লোকটিকেই।

জমিদারবাবুকে আগেই তারা খাতির জানিয়ে নমস্কার সেরে নিয়েছিল, কিন্তু কোনও কথা বলেনি।

প্রথম লোকটিই এদের দলে বয়েসে বড়। দেখতেও মোটামুটি ভাল। একটু গোলগাল নধর ধরনের চেহারা হলেও শক্তসমর্থ। সে বলল, "আমরা আমডোল থেকে আসছি।" বিনীতভাবেই বলল।

"তোমার নাম ?"

কৃষ্ণ দাস।"

"কী করো সেখানে ? আখড়া আছে ?"

"আমাদের পুরনো মঠ আছে আমডোলে। রাধামাধবের সেবা হয়। আঠারো-বিশজন বৈষ্ণব থাকি।"

"এখানে আগে এসেছ ?"

"একবার এসেছি। তিন বছর আগে। এবারে এসেছি মকরে স্নান করতে, শুদ্ধি হতে।"

"শুদ্ধি হতে ? মানে ?"

"আজ্ঞে, এবারের সংক্রান্তিতে তিনটি শুভ যোগ হয়েছে। আমরা শ্রীশ্রী মোহান্ত অধীরানন্দ জিউর ভক্তশিষ্য। এখানে মোহান্ত জিউর প্রধান শিষ্য শুভদাসজির অন্তিম হয়েছিল। তাঁর সমাধি আছে। সেখানে ক'দিন ভজন-পূজন করে ফিরে যাব।"

রামজয় রীতিমতন অবাক হলেন। তিনি ভাবতেই পারেননি, এমনভাবে গুছিয়ে কৃষ্ণদাস কথা বলতে পারে। শুভদাসের কথা রামজয় ছেলেবেলা থেকেই শুনেছেন। বড় সাধক। পরম বৈষ্ণব। তিনি একবার নাকি এখানে পৌষ সংক্রান্তিতে স্নান করতে এসেছিলেন। সে অনেক পুরনো কথা। কিন্তু শুভদাস তো এখানে দেহরক্ষা করেননি। অন্তত রামজয় তেমন কথা শোনেননি। অবশ্য শুভদাসের নামে নদীর কাছে একটা ভাঙা স্তূপ পড়ে আছে যে তা ঠিকই।

"তোমরা শুভদাসের শিষ্য ?"

"না বাবু," রামদাস মাথা নাড়ল। বলল, "শ্রীশ্রী মোহান্তর শিষ্য ছিলেন প্রভু শুভদাস। আমরা তাঁর শিষ্যের শিষ্য।"

রামজয় অন্যজনের দিকে তাকালেন। "তোমার নাম ?"

"প্রহ্লাদ।"

"তুমি এই দলে আছ ? কত বয়েস তোমার ?"

"বাইশ-চব্বিশ হবে। সঠিক জানি না, মহাশয় !"

মহাশয় ! রামজয় যেন একটু হাসলেন। এই বয়েসেই গেরুয়া ধরেছে প্রহ্লাদ। মাথার চুল ছোট-ছোট। গাল তোবড়ানো। বাঁ গালে কাটা দাগ। শরীরের তুলনায় হাত দুটো ছোট।

একে-একে সকলের পরিচয় নিলেন রামজয়। তারপর কৃষ্ণদাসকে জিজ্ঞেস করলেন। "তোমরা এখানে মকর স্নান সারতে এসেছ ! ভাল কথা। কিন্তু আসার

আগে কিছু শোনোনি ?"

কৃষ্ণদাস বলল, "না বাবু, আগে শুনিনি ; এখানে এসে শুনলাম।"

"দশাননের কথা শুনলে ! তোমাদের ভয় করছে না ?"

কৃষ্ণদাস সরল মুখ করে হাসল। বলল, "আমাদের কীসের ভয় বলুন ! আমরা গরিব ভিখিরি বাউল বোষ্টম, আমাদের আর কী আছে বলুন ! একটা পুঁটলি আর একতারা, ক'টা খঞ্জনি। ডাকাত আমাদের কী নেবে ?" বলে একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "শুনেছি, দশানন গরিব মানুষের ক্ষতি করে না।"

রামজয় শুনলেন। একবার তাকালেন পাঞ্জালির দিকে। মুখ ফিরিয়ে নিলেন আবার। হঠাৎ তাঁর কী খেয়াল হল, বললেন, "কৃষ্ণদাস, ভুল শুনেছ ! দশানন নিজে কী করে জানি না, তবে তার চেলারা গরিবদের মায়াদয়া করে বলে শুনিনি। ...যাকগে, তুমি একটা পদ গান করো তো শুনি।"

রাজাবাবুর কথা শুনে পাঞ্জালি অবাক ! কৃষ্ণদাসকে গান গাইতে বলছেন ! কেন ? হঠাৎ তাঁর গান শোনার শখ হল কেন ?

কৃষ্ণদাসও প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল। সামলে নিল নিজেকে। তারপর বলল, "আজ্ঞে, তবে একটা বাউল গাই।" বলে সুর করে গাইল, "খ্যাপা ঘুমিয়ে রইলি ঘন্টা হল টিকিট কই নিলি। যখন পড়বে পাকা হবি ভ্যাকা ওরে বোকা তাই বলি....।"

রামজয় হাত তুলে থামতে বললেন।

কৃষ্ণদাস চুপ করে গেল।

রামজয় বললেন, "ঠিক আছে, তোমরা যাও !....ভাল কথা, কাল সন্ধেবেলায় তোমাদের ওখানে কেউ হাঁক পেড়ে 'আয়- আয়- আয় রে' বলে ডাকছিল শুনেছ ? কানে গিয়েছে ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"কে ডাকছিল ?"

"জানি না। একটা ডাক শুনেছি।"

"আচ্ছা যাও ! এবার ডাক শুনলে খেয়াল করবে— কে ডাকছে !" বলে রামজয় পাঞ্জালিকে বললেন, "বাইরে গিয়ে কাউকে বলো, ভেতরে গিয়ে খবর দিক, এদের সিধে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। আর অন্য দু' জনকে ডেকে দাও।"

কৃষ্ণদাসরা বিনীতভাবে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। পাঞ্জালিও বাইরে গেল।

এবার ঘরে এল দুই ব্যাপারি।

রামজয় দু' জনকেই খুঁটিয়ে দেখছিলেন। ব্যাপারিরা জমিদারবাবুকে প্রণাম জানাল ঘাড়-পিঠ নুইয়ে।

"তোমরা কোত্থেকে আসছ ?"

"মেহেরগঞ্জ থেকে হুজুর।"

"কী নাম তোমাদের ?"

"আজ্ঞে, আমার নাম নীলমণি রাইত, আর ওর নাম দক্ষিণা। আমরা সম্পর্কে

কুটুম। ও আমার ছোট বোনাই।”

নীলমণির বয়েস চল্লিশের নীচে। পাকাপোক্ত শরীর। গায়ের রং শ্যামলা। মাথায় টেরিকাটা চুল। দাড়ি নেই, গোঁফ আছে। দক্ষিণার বয়েস বছর ত্রিশ-বত্রিশ। বেঁটেখাটো চেহারা। চোখ দুটো বড়-বড়, খানিকটা লালচে।

রামজয় নীলমণিকেই বললেন, “তোমরা শুনলাম ব্যাপারি। কীসের ব্যবসা তোমাদের ?”

নীলমণি বলল, তার হল— তামাক, গুড়, ডাল আর মশলাপাতির ব্যবসা। সে সাধারণ ব্যাপারি, মহাজন নয়। আর দক্ষিণার ব্যবসা বলতে বাসনপত্রের। কলাই-করা থালা, বাটি, ঘটি, পেতলের পিলসুজ, প্রদীপ, সেও এমন বড় কিছু নয়। তবে জিনিসগুলো ভাল।

রামজয় বললেন, “মেলা বসতে-বসতে এখনও হপ্তাটাক বাকি। এত আগে-আগে এসে পড়লে ?”

নীলমণি বলল, “আমরা আগে এদিকে আর আসিনি বাবু ! মনসাচরের মেলার কথাই শুনেছি। বড় মেলা, জমকালো মেলা বসে জেনে এবার এলাম। ক’দিন আগে এলাম, ভালমতন জায়গা খুঁজে বসব বলে। দোকান পাতলে দু’ পয়সা বিক্রিও হতে পারে মেলার আগে। আমরা সবেই এসেছি। মোটঘাট খুলিনি এখনও।”

রামজয় নীলমণিকে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। লোকটা সত্যি কথা বলছে না চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা করছে ? এক বস্তা ডাল আর এক ধামা মশলাপাতি সাজিয়ে আনলেই কি ব্যাপারি হওয়া যায় !

দক্ষিণার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে গিয়ে রামজয় দেখলেন, লোকটা তোতলা। বেশ ভালমতনই তোতলা।

রামজয় নীলমণিকেই বললেন, “তোমরা এখানে আসার আগে রাবণের মুখোশ টাঙাবার কথা শোনোনি ?”

“না। এখানে এসে জানলাম।”

“তা এখন কী করবে ঠিক করেছ ?”

নীলমণি সামান্য চুপ করে থেকে বলল, “ভেবে পাচ্ছি না। চিন্তা হচ্ছে, বাবু। আবার ভাবছি, এসেছি যখন, তখন মেলা বসা পর্যন্ত দেখে যাই। লোকজন কেমন হয়, না দেখে ফিরে যেতেও মন উঠছে না। এখানে থাকলে আমাদের আলাদা আর কী হবে বলুন ! সকলের যা হবে আমাদের কপালেও তাই হবে।”

রামজয়ের ভালই লাগল কথাটা শুনতে। “তোমরা কি নৌকোয় এসেছ ?”

“আজ্ঞে।”

“আর ওই বোষ্টমের দল ?”

“ওরাও আমাদের নৌকোয় এসেছে।”

“একই জায়গা থেকে ?”

“না, আজ্ঞে। ওরাই আগে চেপেছিল, আমরা পরে।”

"নৌকোয় আর ক'জন আছে ?"

"দাঁড়ি মাঝি ছিল। নৌকো ফিরে যাওয়ার কথা।"

রামজয় বললেন, "গিয়েছে নাকি ? কাল পর্যন্ত তো ছিল।"

"জানি না আজ্ঞে।"

"ঠিক আছে। তোমরা যাও।....একটা কথা হে নীলমণি, যদি তোমরা মেলা পর্যন্ত না থাকো, ফিরে যাও, তবে কাছারিবাড়িতে এসে জানিয়ে যাবে।"

নীলমণিরা চলে গেল। পাঞ্জালি আগেই ফিরে এসেছিল। কথাবার্তা শুনছিল রাজাবাবুদের।

ঘর ফাঁকা হলে পাঞ্জালি রামজয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল। বলল, "বোষ্টমদের কি খারাপ মনে হল, রাজাবাবু ?"

রামজয় অন্যমনস্ক ছিলেন। পরে খেয়াল হল। কেমন এক হাসি খেলে গেল চোখে। বললেন, "ভালমন্দ বুঝিনি এখনও। ওদের আমি আন্দাজ করতে দিতে চাই না, আমরা কৃষ্ণদাসদের সন্দেহ করছি।"

"সিধে দিতে বললেন যে—" পাঞ্জালি অবাক হয়ে বলল।

"হ্যাঁ, বললাম। ওরা যেন ধরে নেয় আমরা ওদের সন্দেহ করছি না।"

"ওই কেষ্টদাস বোষ্টমবাবাজির কথা শুনে....। আপনি আবার গান গাইতে বললেন।"

"বাজিয়ে দেখছিলাম হে ! যে বোষ্টম নয়, বাউল নয়, তাকে চট করে একটা গান গাইতে বললে ঘাবড়ে যাবে। গান মনে আসবে না।"

পাঞ্জালি মেনে নিল কথাটা। সে নিজেই তো কত গানের দু চার লাইন করে জানে, তা বলে কেউ যদি হুট করে গাইতে বলে তাকে, সে কি পারবে গাইতে ? বলল, "কেষ্টদাস কিন্তু গাইতে পারল বাবু !"

রামজয় স্বীকার করে নিলেন, কৃষ্ণদাস সত্যিই পেরেছে। তবে সচরাচর এমন গান মাঠঘাটের বাউলরা গায় না। ক্ষ্যাপা ঘন্টা হল ঘুমিয়ে থাকলি— টিকিট নিলি না— এমন একটা তত্ত্বের গান তারা ঝট করে গাইবে না। এদিকে রেলও নেই যে, গাড়ি দেখবে ঘন্টি শুনবে ! তত্ত্বের গান না গেয়ে বরং রাধাকৃষ্ণর গান বা হরি ভজনার গান গাইতে পারত !

"নীলমণিকে কেমন মনে হল, পাঞ্জালি ?" রামজয় বললেন।

"সাদামাটা। ওর কথায় লুকোচুরি আছে বলে মনে হয় না।"

রামজয় কোনও জবাব দিলেন না।

মাধব সর্দার এতক্ষণ বাইরে ছিল, দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল।

"মধু ?"

মাধব ঘরে এল।

রামজয় বললেন, "কাছারি বাড়িতে যারা এসেছিল তাদের ওপর তুমি আগের মতনই নজর রাখার ব্যবস্থা করবে। তবে তোমার লোকজনকে বলবে সরাসরি যেন কিছু না বলে ওদের, না ঘাঁটায়। লুকিয়ে নজর রাখতে বলবে। পারলে

ভাবসাব পাতাবে, কিন্তু কিছু বলবে না।... ভাল কথা, বদ্যিনাথের বেটার খবর পাওয়া গেছে ?"

"না, হুজুর।"

"সে কি গাঁ-ছাড়া হয়ে গেল ?"

"এ-গাঁয়ে নেই।"

"ঠিক আছে, তুমি যাও।... আজ সন্ধেবেলায় ওই মৌনীবাবার চালার কাছাকাছি হাজির থাকবে। আমরা যাব। তুমি এখন যাও।"

মাধব সর্দার চলে গেল।

রামজয় উঠে পড়লেন। ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন বারকয়েক। খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। বেলার রোদ এখন গাঢ়, রোদের রং দেখে মনে হচ্ছে, তাত জমেছে। কয়েকটা প্রজাপতি উড়ছিল। এক ঝাঁক চড়ুই। ঘাসের গায়ে-গায়ে গজিয়ে ওঠা বুনো ঝোপে ছোট-ছোট ফুল, বেগুনি রঙের।

রামজয় হঠাৎ বললেন, "পাঞ্জালি, তোমার সাধুবাবাকে না আসতে বলা হয়েছিল আজ ?"

"আজ্ঞা, হাঁ।"

"সে এখনও এল না।"

"সময় আছে, বাবু।... হয়তো ঠিক খেয়াল করেনি কথাটা।"

"কাল যার গলা শুনেছিলে সে কিন্তু সাধুবাবা।"

"আমারও তেমন লাগে রাজাবাবু। আশেপাশে আর তো কারও থাকার কথা নয়। চোখেও পড়েনি।"

"কাকে ডাকছিল লোকটা ?"

পাঞ্জালি জানে না। সে নিজেই অনেক ভেবেছে, বুঝতে পারেনি। বলল, "ওঁরা শ্মশান জাগেন, তন্তর মন্তর করেন, ভূত-পেতেয় কাকে ডাকেন কে জানে ! পাগলামি হতে পারে, বাবু !"

রামজয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বাইরে গোলমাল শুনে থেমে গেলেন। বড় কাছারি থেকে দিবাকর প্রায় ছুটতে-ছুটতে এসে বলল, "সেই খ্যাপাটে সাধুবাবা, শ্মশানের কাছে যে থাকে, বিরাট এক বুনো কুকুর নিয়ে জমিদার বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। কুকরটা নেকড়ে বাঘের মতন দেখতে। কাছারির লোক ভয় পেয়ে গিয়েছে, হুজুর।"

পাঞ্জালির দিকে তাকালেন রামজয়। তারপর ইশারায় ডাকলেন তাকে। "চলো, দেখি।"

সাত

ছোট কাছারির বাইরে লম্বা বারান্দা। ঢাকা বাবান্দা। সামনে মাঠ। ডান দিকে বড় কাছারি। বড় কাছারির কর্মচারীরা সবাই বাইরে বেরিয়ে এসেছে গোলমাল শুনে। বারান্দা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে যাওয়ার সাহস নেই। কালো কুকুরটা দেখতেই বিশাল নয়, তার মুখচোখ দেখলে মনে হয়, স্বভাবে সে হিংস্র। এ কুকুর শুধু বুনো নয়, জাতই বুঝি আলাদা।

রামজয় পাঞ্জালিকে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন কুকুরটাকে। বিরক্ত হলেন। এভাবে একটা ভয়ঙ্কর বুনো কুকুর নিয়ে কাছারিবাড়িতে আসা সাধুবাবার উচিত হয়নি। গ্রামের মধ্যে দিয়েই আসতে হয়েছে সাধুবাবাকে ; যে-কোনও সময়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

রামজয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই তিনি দেখলেন, সাধুবাবা তার হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে একটা দাগ টানল। দাগ টানার পর লাঠিটা ফেলে দিল মাটিতে, দিয়ে হাত তুলে ইশারায় কুকুরটাকে বসতে বলল। আর কী আশ্চর্য, কুকুরটা সঙ্গে-সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ল, একেবারে লাঠির সামনে। যেন লাঠিটা পাহারা দেওয়াই তার কাজ। এরকম বাধ্য অনুগত যে ওই ভয়ঙ্কর কুকুরটা হতে পারে, ভাবাই যায় না!

সাধুবাবা কয়েক পা এগিয়ে রামজয়ের কাছে এল। ইশারায় জানাল, কুকুর নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, ও কিছুই করবে না। এখন জমিদারবাবু ইচ্ছে করলে ভেতরে যেতে পারেন।

রামজয় মাথা নেড়ে সাধুবাবাকে ডাকলেন। ডেকে পাঞ্জালিকে নিয়ে তাঁর ছোট কাছারিবাড়িতে ফিরে এলেন আবার।

বসবার দরকার ছিল না। বসলেন না রামজয়। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সাধুবাবাকে দেখতে লাগলেন। কালকের মতনই পোশাক, পরনে ধুতি, গায়ে চাদর। স্নানও সারা হয়েছে বাবার। কপালে লাল ফোঁটা। কী বলবেন বুঝতে না পেরে সামান্য সময় চুপ করে থাকলেন রামজয়। পরে বললেন, "কাল তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমরা খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর একটা ডাক শুনি। তোমার গলা বলে মনে হল। তুমি কাকে ডাকছিলে ? ওই কুকুরটাকে ?"

মাথা নেড়ে সাধুবাবা জানাল, হ্যাঁ, সে কুকুরটাকেই ডাকছিল।

"ওইরকম এক কুকুর নিয়ে তুমি ঘুরে বেড়াও ? তোমার ভয় না থাকতে পারে, অন্যদের ভয় হয়। বিপদও হতে পারে।"

সাধুবাবা ইশারায় বোঝাতে চাইল, কুকুরটা তার সঙ্গেই থাকে। নজরে রাখলে ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

রামজয় বললেন, "আমি শুনেছি, তুমি মাসখানেক হতে চলল এখানে এসেছ। কেন এসেছ ? তোমার পরিচয় কী ?"

সাধুবাবা মুখে কিছু বলল না। ইশারায় জানাল, তাকে খানিকটা কাগজ আর

কালি-কলমের ব্যবস্থা করে দিতে।

রামজয় খানিকটা অবাক হলেন। তারপর পাঞ্জালির দিকে তাকালেন।

ছোট কাছারিতেও রামজয় নিজের কাজকর্ম করেন। চিঠিপত্র লেখেন। হিসেব দেখেন। কাগজ কালি কলম এখানেও আছে। পাঞ্জালি জানে।

পাঞ্জালি ঘরের একপাশ থেকে কাগজ কালি পালকের কলম এনে দিল।

সাধুবাবা মাটিতে বসল। কাগজ কালি কলম রাখল ফরাসের ওপর। তারপর কীসব লিখে কাগজটা পাঞ্জালির দিকে এগিয়ে দিল।

পাঞ্জালি কাগজ নিয়ে রাজাবাবুকে দিল।

রামজয় এবার আরও অবাক হয়ে গেলেন। আরে, এ যে লেখাপড়া-জানা লোক। সাধুবাবার হাতের লেখা স্পষ্ট, গোটা গোটা ; পড়তে কোনও অসুবিধে হয় না। রামজয় কাগজের লেখাগুলো পড়লেন।

সাধুবাবা লিখেছে। "আমার নাম অতুলানন্দ। আদি নিবাস বিল্বগ্রাম। জেলা বাঁকুড়া। পাকুড় আমার কর্মস্থান ছিল। দুই বৎসর পূর্বে পাকুড় ত্যাগ করিয়াছি। আমার কোনও সংসার নাই। আমি সূর্যসাধক। একটি সঙ্কল্প করিয়াছি। তাহাই উদ্‌যাপন করিতেছি। সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মৌন থাকি। একান্ত প্রয়োজন না হইলে রবিবার বাদে দিবা ভাগে কথা বলি না। আমার দ্বারা আপনার কোনও প্রকার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। বিপদে সাহায্য পাইবেন, এইমাত্র বলিতে পারি।"

রামজয় বার দুই-তিন লেখাটি পড়লেন। দেখলেন আবার অতুলানন্দকে। কৌতূহল বাড়ছিল। সূর্যসাধক যে কাদের বলে তিনি জানেন না। এই লোকটার সংসার নেই বলছে। কেন নেই ? কেনই বা সে সূর্যসাধক হয়েছে ? আর সঙ্কল্প উদ্‌যাপনই বা কেন করছে ? কীসের সঙ্কল্প ?

রামজয়ের কী খেয়াল হল, বললেন, "কাল তোমার সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে। অন্ধকার। তবু তুমি আমাদের কথার জবাব দাওনি মুখে। ইশারায় উত্তর দিয়েছ। অথচ তার খানিকটা পরে তুমি দশ দিক কাঁপিয়ে আয়-আয় করে তোমার কুকুরকে ডাকছিলে ! কেন তুমি মুখে জবাব দাওনি ?"

অতুলানন্দ কাগজটা ফেরত চাইল। তারপর লিখল, "অপরাধ মার্জনা করিবেন। মনে-মনে সন্ধ্যামন্ত্র পাঠ করিতেছিলাম, পাঠ শেষ হয় নাই। অল্প পরে আমার মন্ত্রপাঠ শেষ হইল। দেখিলাম আপনারা আমার নিষেধ না মানিয়া আগাইয়া যাইতেছেন। আশঙ্কা হইল, অন্ধকারে আমার পোষ্যটি না আপনাদের আক্রমণ করে। তাহাকে ডাকিতে লাগিলাম। সে আশেপাশে কোথাও ছিল।"

পাঞ্জালিকে কাগজটা দিল অতুলানন্দ।

রামজয় কাগজ নিলেন। পড়লেন। ফেরত দিলেন পাঞ্জালিকে। অতুলানন্দকে বললেন, "তুমি এখানে আছ। রাবণের মুখোশের কথা জানো না ? শোনোনি ? তুমি যে দশাননের অনুচর নও তার প্রমাণ কী ?"

অতুলানন্দ মাথা নাড়ল। না, সে দশাননের অনুচর নয়। তারপর নিজেই

আবার হাত বাড়িয়ে কাগজটা চাইল পাঞ্জালির কাছে।

কাগজটা দিল পাঞ্জালি।

অতুলানন্দ লিখল, "আপনাদের অসুবিধা না থাকিলে আজ সন্ধ্যায় নদীপারে সাক্ষাৎ করিতে পারেন। যাহা জানিতে চান, বলিতে পারি। আপনার অনুমতি পাইলে আমি এখন যাই।"

রামজয় কাগজটা নিয়ে দেখলেন। অতুলানন্দকে আর আটকে রাখার দরকার আছে বলে তাঁর মনে হল না। ঠিক আছে, সন্ধের পরই তিনি দেখা করবেন অতুলানন্দের সঙ্গে। কিন্তু কোথায়? নদীপারে কোন জায়গায়? কয়েক মুহূর্ত ভেবে রামজয় বললেন, "তুমি আসতে পারো। আমরা আজ সন্ধেবেলায় হাটতলায় থাকব। তোমার অপেক্ষা করব।" বলে পাঞ্জালির দিকে তাকালেন। "পাঞ্জালি, হাটতলায় একটা খড়ের চালা আছে, না?"

"আছে আজ্ঞা। আমতলার কাছেই।"

রামজয় অতুলানন্দের দিকে তাকালেন। "আমরা চালার কাছে থাকব। তুমি ওখানে আসবে। কথা হবে। এখন যেতে পারো।"

অতুলানন্দ উঠে পড়ল।

রামজয় জানলা দিয়েই বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, অতুলানন্দ কাছারির সামনে গিয়ে তার লাঠি কুড়িয়ে নিল মাটি থেকে— তারপর কুকুরটাকে নিয়ে চলে গেল।

পাঞ্জালি বলল, "রাজাবাবু, আমি কিছু বুঝলাম না। সাধুবাবা অত কী লিখলেন! আপনার কেমন মনে হল লোকটিকে!"

পাঞ্জালি একটু-আধটু লেখাপড়া জানে। অতুলানন্দের লেখা সে পড়েনি; পড়লে হয়তো খানিকটা বুঝতে পারত।

রামজয় বললেন, "তোমার সাধুবাবাকে হেলাফেলা করার মানুষ বলে মনে হচ্ছে না, পাঞ্জালি। লোকটার কী উদ্দেশ্য, কোন সঙ্কল্প নিয়ে সে সন্ন্যাসী হয়েছে, কেনই-বা মৌনী হয়ে থাকে কে জানে! তবে ওর যে খানিকটা ক্ষমতা আছে, তা তো দেখতেই পেলে।" বলে উনি অতুলানন্দের লেখাগুলোর কথা বললেন।

পাঞ্জালি মন দিয়ে শুনল কথাগুলো। শেষে বলল, "আপনি তবে আজ যাবেন সন্ধ্যায়।"

"হ্যাঁ, কেন?"

"না আজ্ঞা, যাওয়া ভাল। তবে ওই কুকুরটাকেই ভয়।"

রামজয় হাসলেন, "যার কুকুর সে দেখবে। কিন্তু পাঞ্জালি, আমি ভাবছি, সাধুবাবার কথা আমি মাসখানেক ধরে শুনেছি। কানে আসছে। তুমিও বলেছ সেদিন। কুকুরটার কথা তো শুনিনি।"

পাঞ্জালি বলল, "থাকত হয়তো আশেপাশে, নজরে আসত না। সাধুবাবা গণ্ডি কেটে রেখে দিত মনে হয়।" বলে হাসল।

"বিকেলে তৈরি থেকো হে, যেতে হবে।"

মাথা নুইয়ে পাঞ্জালি জানাল, সে তৈরি থাকবে।

সন্ধের মুখে-মুখে হাটতলায় এসে রামজয়রা দেখলেন অতুলানন্দ আগেই এসে দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরটা নেই।

"কী হল, তোমার সেই সঙ্গীটি কই ?" রামজয় বললেন। কৌতূহল হচ্ছিল তাঁর।

অতুলানন্দ বলল, "তাকে রেখে এসেছি আমার চালাঘরে।"

"সে কী ! ঘর থেকে যদি বাইরে বেরিয়ে যায় !"

"যাবে না ! সে পাহারায় আছে।" বলে একটু চুপ করে থেকে অতুলানন্দ বলল, "আপনার কাছে আমি কোনও নালিশ জানাচ্ছি না। আমি সাধুসন্ন্যাসী লোক। আমার ওই মাথা গোঁজার ছোট্ট চালার তলায় ধনদৌলত কিছুই নেই। তবু আজ দেখলাম, কারা যেন আমার কুঁড়েতে ঢুকে পোঁটলাপুঁটলি হাতড়েছে।"

রামজয় অবাক হলেন, "সে কী !" বলে পাঞ্জালির দিকে তাকালেন।

পাঞ্জালি কিছু বলল না। তার সন্দেহ হল, এ-কাজ মাধব সর্দারের কোনও চেলার হতে পারে। রাজাবাবু সরাসরি হুকুম না দিলেও নজর রাখতে বলেছিলেন সাধুবাবার আস্তানার ওপর। হয়তো একটু বেশি নজরদারি করে ফেলেছে মাধবের চেলা।

"তোমার কিছু খোওয়া গিয়েছে ?" রামজয় জিজ্ঞেস করলেন।

অতুলানন্দ এমনভাবে মাথা নাড়ল যে, বোঝা গেল না সে কী বোঝাতে চাইল। খোওয়া যাওয়ার কথাটা যেন এড়িয়ে গিয়েই অতুলানন্দ বলল, "আপনি আমায় দশাননের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন কাছারিবাড়িতে !"

"হ্যাঁ। তুমি..."

"আমি তার অনুচর নই। তবে তাকে জানি।"

"জানো ?" রামজয় কৌতূহল বোধ করলেন। "জানো মানে ? তার কথা শুনেছ !"

"আমি তাকে দেখেছি।"

রামজয় রীতিমতন অবাক ! বিশ্বাস হচ্ছিল না। দশাননকে নাকি কেউ সামনাসামনি দেখেনি। ডাকাতটা নিজের মুখ কাউকে দেখায় না। তার মাথা মুখ ঘাড় গলা দেখার উপায় নেই, ঢাকা থাকে কাপড়ের পট্টিতে। মুখে থাকে মুখোশ। ও নিজের মুখ লুকিয়ে রাখে বলেই নানান গুজব রটে, যার যা মন চায় বলে, অদ্ভুত-অদ্ভুত বর্ণনা দেয় দশাননের।

রামজয় বললেন, "তুমি নিজের চোখে তাকে দেখেছ ?"

"দেখেছি। দেখতে সে ভয়ঙ্কর নয়। আর পাঁচজনের মতন। তবে শরীরে শক্তি ধরে। আর সুপুরুষও বলতে পারেন। আপনিও তাকে দেখবেন।"

"দেখব ? কবে ?"

"ঊনত্রিশে পৌষ সংক্রান্তি। বাইশে পৌষ পূর্ণিমা তিথি। দশানন চব্বিশ অথবা পঁচিশে পৌষ মনসাচরে আসবে। আপনি হয়তো মনে করছেন, সে পূর্ণিমার পর-পরই আসবে কেন ? দশাননের কাছে কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ নেই। সে শুধু

একটি দিন ঠিক করে পুজোআর্চা সেরে নিয়ে ডাকাতি করতে বেরিয়ে পড়ে। একবার তার দল নিয়ে বেরিয়ে পড়লে একটা মাত্র জায়গায় ডাকাতি করে ফেরে না, দু-চার জায়গায় কাজ সেরে নিজেদের জায়গায় ফিরে যায়। এটাই তার অভ্যাস।"

কথাগুলো পুরোপুরি বিশ্বাস হল না রামজয়ের, আবার অবিশ্বাস করতেও পারছিলেন না। পাঞ্জালির দিকে তাকালেন। সেও অবাক হয়ে সাধুবাবার কথা শুনছিল।

"তুমি কেমন করে জানলে দশানন কবে মনসাচরে আসবে ?" রামজয় বললেন, "তুমি কি দশাননের হয়ে পাঁজিপুঁথি দেখে দাও ? গণনা করো ? গণৎকার ?" কথার শেষে সামান্য বিদ্রূপ ছিল।

অতুলানন্দ বলল, "গণনা নেই এমন কথা বলি না। অনুমানও গণনা। আপনি আমার কথা মানতে না চান— না-ই মানলেন। তবে আমি যা জানি, খোঁজ রাখি— আপনাকে বললাম। আপনি যথেষ্ট সাবধান হয়েছেন। কিন্তু এভাবেও আপনি দশাননকে আটকাতে পারবেন না। সে আসবে। আপনার সামনে যে বিপদ..."

কথার মধ্যে অতুলানন্দকে থামিয়ে দিলেন রামজয় ; মৃদু হেসে বললেন, "আমার বিপদ আমি বুঝি, অতুলানন্দ। নিজের বিপদ নিয়ে আমি ভেবে মরছি না। এই বিপদ আমার প্রজাদের, মনসাচরের মানুষের। বিপদ বলে আমি পালাব নাকি ?"

"না। আপনি পালাবার মানুষ নন। ... আমি আপনাকে পালাতেও বলছি না। আরও সাবধান হতে বলছি। আমার দ্বারা আপনার কোনও অনিষ্ট হবে না।"

"তুমি দশাননকে কোথায় দেখেছ ?" রামজয় হঠাৎ বললেন।

অতুলানন্দ বলল, "এর উত্তর এখন পাবেন না। যদি দশানন ধরা পড়ে— আপনাকে আমি সবই বলব।"

রামজয় সন্দিগ্ধ হলেন। "দশানন তোমার শত্রু ?"

অতুলানন্দ কোনও জবাব দিল না।

অপেক্ষা করে রামজয় বললেন, "অতুলানন্দ, তুমি আশ্চর্য মানুষ। আমি বুঝতে পারছি না, সত্যিই তুমি সাধুসন্ন্যাসী, না এটা তোমার ভেক। ... তা সে যাই হোক, আমি তোমায় বিশ্বাস করছি। যদি অবিশ্বাসের কাজ করো, পরিণাম ভাল হবে না। আমি কত নির্দয় হতে পারি তুমি জানো না। এখন বলো, দশানন কি সত্যিই ওই সময়ে— তুমি যা বলছ— তখন মনসাচরে আসবে ?"

"আমার অনুমান।"

"মেলার মধ্যেই ?"

"হ্যাঁ। ... আপনি যেমন ওর মুখোমুখি হয়ে দেখতে চান দশানন কত শক্তি ধরে, ও নিজেও আপনার সামনাসামনি আসতে চায়। মেলার মধ্যেই সে

আসবে।"

"কেন ?"

"আপনার ক্ষমতা পরখ করতে। মেলার ভিড়ে এসে পড়ার সুযোগও বেশি।"

রামজয় যেন ভাবলেন কিছু। বললেন, "মেলা তা হলে ভালই বসবে বলো ! ... তা অতুলানন্দ, তুমি এত কথা জানলে কেমন করে ? নিজেই বলছ তার অনুচর নয়, অথচ দশাননের হাঁড়ির খবর তোমায় কে জোগায় ?"

অতুলানন্দ বলল, "সময় এলে আপনি সব জানতে পারবেন।"

"ও ! ... তবে সেই সময় আসুক। আচ্ছা, অতুলানন্দ, একটা কথা বলো তো ! আমার এখানে দশাননের রাবণের মুখোশ কে টাঙায় ? কার এত বড় সাহস হয় ? জানো তুমি ?"

অতুলানন্দ বলল, "সব মানুষ সমান হয় না। আপনি যত ভাল জমিদারই হোন না কেন, মনসাচরে আপনার শত্রুও আছে। তাদের কেউ। দশানন তাকে বশ করেছে।"

"কে সে ?"

"আপনি ব্যস্ত হবেন না। অধৈর্য হবেন না। তাকে তার মতন থাকতে দিন এখন। মেলা শুরু হোক, তারপর... ! আর মাত্র সাতটা দিনও নয়— আপনি অপেক্ষা করুন।"

আট

মেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

গোড়ার দিকে দোকানপসার সাজিয়ে বসার জন্যে দোকানিরা বিশেষ আসছিল না। হয়তো ভয়ে। কাছাকাছি গঞ্জ থেকে যারা গোরুর গাড়িতে বস্তা, বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে হাজির হয় আগেভাগে, তারাও এবার প্রথমদিকে আসতে সাহস পায়নি। তফাত থেকে খোঁজখবর করছিল, আসবে কি আসবে না—করে দু-চারদিন কাটিয়ে দিল। তারপর দেখল, মেলা ধীরে-ধীরে জমে উঠছে। মনসাচরের জমিদার রামজয় রায় নিজে তাঁর লাঠিয়ালদের নিয়ে মেলার তদারকি করছেন। সাধারণ প্রজারাও তাদের জমিদারের পেছনে দাঁড়িয়েছে দলবেঁধে। ডাকাত দশাননের হুমকির কাছে এরা কেউ যেন মাথা নোয়াতে চায় না। মনসাচরের ইজ্জত বড়, না, দশাননের হুমকি বড় !

দিন কয়েকের মধ্যেই মেলায় লোকজন আসা বেড়ে গেল। দুটো-চারটে করে আসতে লাগল গোরুর গাড়ি ব্যাপারিদের নিয়ে। ওদিকে নৌকোও দেখা যেতে লাগল নদীর মুখে।

দেখতে-দেখতে মেলার জায়গাটা মোটামুটি ভরে আসছিল। শীতের দিন—, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বেশ, রোদে-রোদে নদীর চর তপ্ত হয়ে যাবে, বিকেলের পর থেকেই উত্তরের হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অন্ধকার হয়ে আসে চোখের

পলকে, তারপর কুয়াশা আর কনকনে শীত জমতে থাকে। খড়ের চালা মাথায় ছোট-ছোট দোকান, কুপি বাতি, মায় লণ্ঠন ঝোলে দোকানে, আগুনের ব্যবস্থাও থাকে কোথাও-কোথাও, বেচাকেনার সঙ্গে দু' মুঠো পেটে দেওয়ার ব্যবস্থাও তো করতে হয়। ওদিকে একদল যাত্রী এসেও জুটে গিয়েছে মকর স্নানের জন্যে।

কোথায় দশানন ?

দশানন কি তবে আসবে না ? ভয় পেয়ে গেল ? না কি, সুযোগের অপেক্ষায় আছে ?

সাহস করে মুখ বাড়িয়ে কী হচ্ছে দেখার মতনই হল ব্যাপারটা। আরও দু'-পাঁচটা দোকান এল। মনসাচরের লোকজন এসে মেলায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাউল বোষ্টমদের জমায়েত বেড়ে গেল ক'দিনের মধ্যেই।

এমন সময় আবার দশাননের মুখোশ ; কে যে এখন এসে টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বোঝা গেল না ! অন্য দু'বার—আর যাই হোক ফাঁকায় ফাঁকায় নজর এড়িয়ে মুখোশ টাঙাবার সুযোগ ছিল। এবার তো তা নয়, মেলার লোকজনের আসা-যাওয়া, দোকানপসার, এখানে-ওখানে ছড়ানো স্নান-যাত্রীদের ছাউনি, এত ভিড়ের মধ্যে কেমন করে টাঙাল মুখোশটা ! আবার সেই মেলার জায়গাতেই, ছোট একটা গাছের ডালে ! আশ্চর্য !

মেলায় যারা এসেছিল তারা যত না অবাক হল—তার চেয়েও বেশি ভয় পেয়ে গেল ! এবার তবে কী হবে ?

কিছু হবে না। জমিদার রামজয়ের লাঠিয়ালরা তো বটেই—মনসাচরের আরও কিছু জোয়ান মদ্দরা বলে বেড়াতে লাগল, "মেলায় যারা এসেছে— তারা কেউ উঠবে না। পালিয়ে যাবে না ভয়ে, আমরা মেলার চারপাশে ঘিরে রেখেছি—আসুক দশানন তার দলবল নিয়ে, রক্তারক্তি হয় যদি হবে— তবু মনসাচরের মেলা ভেঙে যাবে না। মকর-স্নান যেমনটি হয়েছে বরাবরের মতন তেমনটিই হবে।"

সেদিন সন্ধের মুখে রামজয় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার মুখে বিরজাসুন্দরী ব্যস্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। স্বামী তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

"তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ ?" বিরজা বললেন।

"হ্যাঁ। তুমি এসে ভালই হল ! আমিই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমি এখন যাচ্ছি।"

স্বামীর সাজগোজ দেখেই বিরজা বুঝতে পেরেছিলেন, উনি এখন কোথায় যাচ্ছেন ! মাথায় মস্ত পাগড়ি, কপাল প্রায় ঢাকা। পাগড়ির একটি প্রান্ত ঘাড়-গলা ঢেকে রেখেছে। গায়ে আলখাল্লার মতন জামা। তার ওপর চাপানো রয়েছে কম্বল। হঠাৎ নজরে পড়লে রামজয়কে চিনে ফেলা মুশকিল !

বিরজা ভয়ে-ভয়ে বললেন, "কোথায় যাচ্ছ ?"

"দশাননের খোঁজে।"

বিরজা চমকে উঠলেন। "আমি শুনলাম তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ বলে ডেকে পাঠিয়েছ, তাই এলাম। দশাননের খোঁজে যাচ্ছ !"

"হ্যাঁ। শুনলাম সে এসেছে। আমার কাছে বিকেলেই খবর এসেছে। যাই একবার দেখে আসি।"

রামজয় যতই না হালকা করে বলার চেষ্টা করুন কথাগুলো, বিরজা বুঝতে পারলেন স্বামীর মন মোটেই হালকা নেই। মুখ গম্ভীর। ভয় পেয়ে বিরজা বললেন, "তুমি এখন বাড়ি ছেড়ে যাবে সেই ডাকাতটার খোঁজ করতে !"

"হ্যাঁ।" বলে আবার একটু হাসলেন। "আমাদের অতিথি তো, কুটুমও বলতে পারো। নিজে এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে ডেকে আনাই সামাজিকতা !"

বিরজার ভাল লাগছিল না। "সত্যিই দশানন এসেছে !"

"শুনেছি।"

"কে বলল ?"

"আমার চর আছে।"

"ওই পাঞ্জালি ?"

"না, অন্য চর লাগিয়ে রেখেছি।...যাক গে, তোমায় ক'টা কথা বলে যাই। বেজি-কল লাগানো ঘর তিনটের কথা তুমি জানো। যে-ঘরে আমাদের গৃহদেবতা নারায়ণের অলঙ্কারপত্র আছে—সেই ঘর বন্ধ। ওই ঘর কেউ খুলতে পারবে না। দশটা দশাননও নয়। অন্য দুটি ঘরের মধ্যে উত্তরের ঘরে রায়বংশের গচ্ছিত কিছু সোনাদানা সিন্দুকে রাখা আছে। সেই ঘরেও ঢোকা যাবে না। বাকি ঘরটা তুমি জানো। বিপদে পড়লে ছেলেমেয়ে নিয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়ো। তবে তেমন বিপদ হবে না।"

"তুমি নিজে যাচ্ছ বিপদের মুখে, আর আমি পড়ে থাকব—সোনাদানা আগলাবার জন্যে !"

"বিরজা, বিপদ আমার একার নয়, আমার পরিবারেরও শুধু নয়— এ-বিপদ মনসাচরের, আমার প্রজাদের। আমাকে তো যেতেই হবে।"

বিরজা আর কথা বললেন না। একই কথা কতবার যে তিনি স্বামীর মুখে শুনছেন।

"ছেলেমেয়েদের সাবধানে রেখো। আর, এমন যদি হয় আমি আজ বা কাল-পরশু ফিরলাম না বাড়িতে—, ভয় পাবে না। তুমি জানবে, আমার মাথা কাটার ক্ষমতা দশাননের হবে না। সে এতকাল যাদের সঙ্গে লড়েছে তারা রামজয় রায় নয়।...আমি চলি। ভয়ের কোনও কারণ নেই তোমার। মধুর ছ'জন লোক এই বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। দু'জন থাকবে আমার সঙ্গে। পাঞ্জালিও আছে।...আমি চললাম।"

বিরজা দেখলেন স্বামী আর দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন।

রামজয় মেলার কাছাকাছি এসে একবার দেখলেন চারপাশ। তাঁর একেবারে

কাছাকাছি না হলেও হাত কয়েক তফাতে দু'পাশে দুই লেঠেল। দু'জনেই মাধব সর্দারের চেলা। বিশ্বস্ত। দুটোই একেবারে যেন ছায়ার মতন রামজয়ের পাশে-পাশে চলেছে।

পাঞ্জালি বরাবরের মতন রামজয়ের পেছনে-পেছনে।

রামজয় শেষমেশ দাঁড়িয়ে পড়লেন। "পাঞ্জালি ?"

"বাবু !"

"ওই দু'জনকে এবার সরে যেতে বলো। ওরা খানিকটা আড়ালে থাকুক। একসঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই এখন।"

পাঞ্জালি দু'পা এগিয়ে হুকুম জানিয়ে এল লেঠেলদের।

"তুমিও এর পর আমার কাছাকাছি থাকবে না।" রামজয় বললেন।

পাঞ্জালি অবাক হয়ে বলল, "আমিও থাকব না ?"

"না। গায়ের পাশে থাকবে না। মেলার কাছে গিয়েই তুমি তফাতে চলে যাবে। তবে নজর করবে আমাকে।"

"আপনি—"

"আমি ঘুরতে-ঘুরতে ঠিক জায়গায় হাজির হব।"

"চিনতে পারবেন ?"

"পারব। দোলনা টাঙানো হচ্ছে যেখানে সেই জায়গাটা তো ! জনাছয়েক লোক জুটেছে।

"আজ্ঞা। তাই শুনেছি। সঙ্গে বোঁচকা-বুঁচকি আছে। মকর-স্নান করতে আসার ভেক ধরেছে যে ! একটার মাথা নেড়া।"

"চিনে নেব। অসুবিধে হবে না।"

হাঁটতে-হাঁটতে মেলার সামনে এসে পাঞ্জালি অন্যদিকে সরে গেল।

রামজয় একা।

মেলার ভিড় এখন নেই। দুপুর, বিকেল যত লোক হয় তার তুলনায় এই সন্ধের সময় লোকজন প্রায় নেই। থাকার মধ্যে শুধু ব্যাপারিরা আর দলবেঁধে যারা স্নান করতে এসে কোনওরকমে একটা চট বা খড়ের ছাউনি টাঙিয়ে বসে আছে, তাদেরই চোখে পড়ে। মিটমিটে আলো জ্বলছে এপাশে-ওপাশে, খাওয়াদাওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে কেউ-কেউ। ছইঅলা গোরুর গাড়ির মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে দু'-পাঁচজন। গোরুর গাড়িও কম আসেনি ! ওরই মধ্যে খোল-করতাল বাজিয়ে গান হচ্ছে কোথাও, কোথাও-বা তাস খেলাও চলছে। খানিক হইহল্লা। আগুন পোয়ানোর ব্যবস্থাও করেছে কেউ-কেউ।

হিমে ঠাণ্ডায় মেলা দেখার উৎসাহ ক'জনেরই-বা থাকে ! যারা এতক্ষণ ছিল—এবার তারা ফিরে যাচ্ছে।

রামজয় যতটা সম্ভব আড়ালে-আড়ালে খানিকটা ঘুরে শেষপর্যন্ত অন্যদিকে পা বাড়ালেন।

বেশি হাঁটতে হল না। আগুনটা চোখে পড়ল।

যেমনটি তিনি শুনেছেন ঠিক তাই। একটা দোলনা টাঙানো হয়েছে। তফাতে বুঝি বয়ড়া গাছ। খড়ের আগুন জ্বালিয়ে কয়েকটা লোক বসে আছে।

রামজয় ভয় পেলেন না। ভেতরে সামান্য চঞ্চল হলেও ধীরে-ধীরে আগুনের কাছে এগিয়ে গেলেন।

বালিতে পায়ের শব্দ ওঠার কথাও নয়, তবু লোকগুলো মুখ তুলে তাকাল।

রামজয় একেবারে তাদের সামনে।

খড়ের আগুনের আলোতে লোকগুলো রামজয়কে দেখল। দেখেও উঠে দাঁড়াল না। আগুনের তাপ নিচ্ছিল হাতে-পায়ে, শুধু মুখ তুলে তাকিয়ে থাকল।

রামজয় বললেন, "তোমরা কে ? কোথা থেকে আসছ ?"

জবাব দেওয়ায় যেন গা নেই, প্রথমে জবাব দিল না কেউ। শেষে একজন বলল, "আমরা চানে এসেছি। পরশু মকর।"

কোথা থেকে এসেছ ?"

"এলাম... ! কেন মশাই ! চানে আসতে পারি না ?"

রামজয় বুঝতে পারলেন, লোকগুলো তাঁকে চেনে না। হয় চেনে না, না-হয় চিনতে চায় না। না চেনাই স্বাভাবিক।

রামজয় নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে কী মনে করে থেমে গেলেন। লক্ষ করলেন লোকগুলোকে। নেড়া মাথা লোকটাও আছে। মাথায় গামছা বেঁধে বসে আছে।

"তোমরা স্নানে এসেছ ?"

"হ্যাঁ। বললাম তো চানে এসেছি।"

"তোমরা এ-ক'জন, না আরও সঙ্গী আছে ?" রামজয় যেন চাপা ঠাট্টা করে বললেন।

লোকটা চটে গেল। বলল, "কেন মশাই, অত খবরে আপনার দরকার কীসের ? আপনি কে ?"

রামজয় আগেভাগে সবই ঠিক করে রেখেছিলেন। হেসে বললেন, "আমি নসিববাবু। মোহর ফেলে পাশা খেলি। তোমরা কেউ পাশা খেলতে জানো ?"

"মোহর !"

"বিশ্বাস হচ্ছে না ! দেখবে— ?" রামজয় তাঁর জোব্বার ভেতর থেকে একটা মোহর বের করে দেখালেন।

খড়ের আগুনে মোহর চকচক করে উঠল। দেখল লোকগুলো।

রামজয় হাত গুটিয়ে নিলেন। "তোমরা তবে পাশা খেলতে জানো না। যাই, দেখি আর কে জানে !"

আগুনের কাছে না দাঁড়িয়ে সরে গেলেন রামজয়। অন্যদিকে পা বাড়ালেন।

দশ-পনেরো পা এগিয়ে আসার পর বুঝতে পারলেন পেছনে কেউ আসছে। আসুক। তিনি তো তাই চান। মোহর কি মিছিমিছি দেখিয়েছেন ! এবার একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলেন রামজয়। আলোর সামনে থেকে অন্ধকারে সরে যেতে

চান ! তবে আজ এখন আর তেমন অন্ধকার কোথায় ! জ্যোৎস্না রয়েছে, যদিও কুয়াশায় মোড়া ।

পেছনের লোকটা প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়তেই রামজয় পাশে সরে গেলেন । গিয়েই তার হাত চেপে ধরলেন ।

লোকটা গায়ে শক্তি ধরে । হাত প্রায় ছাড়িয়ে নিচ্ছিল । কিন্তু তার আগেই রামজয় কোমর থেকে ছোরা বার করলেন । লোকটা কিছু বোঝার আগেই দেখল, তার গলার কাছে ছোরা ।

ভয় পেয়ে গিয়েছিল লোকটা ।

রামজয় দেখলেন লোকটাকে । বললেন, "তুমি দশাননের লোক ?"

মাথা নাড়ল লোকটা । "না, না ।"

"মিথ্যে কথা বলবে না । আমি রামজয় রায় । তোমার মতন লোকের গলার নালি কাটতে আমার আটকাবে না । দশানন কোথায় ?"

"আমি জানি না হুজুর, আমায় ছেড়ে দিন ।"

"ছেড়ে দেব ! তার আগে তোমায় কী করা হবে জানো ?...ওই যে দেখছ নদী, ওখানে আমার লোক গর্ত খুঁড়ে রেখেছে । তোমাকে সেই গর্তে ডুবিয়ে বালি চাপা দেওয়া হবে । শুধু মুখ-মাথা বার হয়ে থাকবে । কাল সকাল থেকে মেলার লোক এসে দেখবে তোমায়, মনসাচরের লোকজন ছুটে আসবে দশাননের চেলাকে দেখতে । তোমার ওপর তারা যেসব অত্যাচার করবে..."

"আমায় ছেড়ে দিন হুজুর । আপনার পায়ে ধরছি ।"

"দশানন কোথায় ?"

লোকটার গলা আটকে যাচ্ছিল । "এখানে নেই ।"

"কোথায় ?"

"নৌকোয় । বড় নৌকোয় ।"

"নদীতে নৌকো ভিড়িয়ে বসে আছে— ।" বলতে-বলতে রামজয় হাঁক পাড়লেন ।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে মাধব সর্দারের দুই লেঠেল—যারা তফাতে ছিল, নজর রাখছিল রাজাবাবুর ওপর, কোথা থেকে এসে হাজির !

রামজয় লোকটাকে লেঠেলদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "একে কোথাও নিয়ে গিয়ে আটক কবে রাখো । ছাড়বে না । মধু কোথায় ?"

ততক্ষণে পাঞ্জালিও এসে গিয়েছে ।

"পাঞ্জালি, সর্দার কোথায় ?"

"খুঁজে আনছি ।"

"চলো, আমি দেখছি ।" বলে লেঠেলদের বললেন, "এর সঙ্গীরা ওদিকে বসে-বসে আগুন পোয়াচ্ছে । ওদেরও আটক করে রাখবে ।"

পাঞ্জালিকে সঙ্গে নিয়ে রামজয় এগিয়ে গেলেন ।

"পাঞ্জালি ?"

"বাবু !"

"দশাননকে পেয়েছি হে ! তিনি নদীতে নৌকোয় বসে তামাক খাচ্ছেন। চলো দেখা করে আসি ! মধুকে খুঁজে নাও।"

নয়

ভুল রামজয় করেননি। আবার সময় মতন সাবধানও হতে পারেননি। তাঁর মাথাতেও আসেনি হয়তো, সব সময় সব কথা কি মাথায় আসে ! ভুল হয়ে গেল সেখানেই। মাধব সর্দারের লেঠেলের দল জ্বলন্ত মশাল হাতে নদীর দিকে ছুটে গেল। গলায় রে-রে রব। ফলে নৌকোর কাছে গিয়ে দেখা গেল, দশাননের তরফ থেকে একটি লোকও বেরিয়ে এল না। মনে হল না, নৌকোয় লোক আছে !

রামজয় যখন জলের কাছে, লেঠেলরা তার আগেই নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকোয় উঠে পড়েছে। ছোটাছুটি করছে না, তবু তারা নৌকোর চারপাশে যেভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল তাতে নৌকো দুলছিল। ওদের হাতের মশালের আলোয় অনেকটা জায়গা আলো হয়ে উঠেছে, নদীর জলে মশালের আলো কাঁপছিল।

রামজয় বুঝতে পারলেন, লেঠেলদের মশালের আলো আর বিকট চিৎকার শুনে দশাননের লোকজন গা-ঢাকা দিয়েছে। তারা তো বোকা নয়। কিন্তু কোথায় গা-ঢাকা দেবে ? নদীতে নেমে পড়ে সাঁতরে সরে গিয়েছে তফাতে ? তা ছাড়া আর কী হতে পারে !

রামজয় বিরক্ত হলেন। লেঠেলদের মাথা বরাবরই মোটা। ওরা অত বুদ্ধির ধার ধারে না, অন্যের মাথা ফাটাতে, হাত-পা ভাঙতেই যা শিখেছে ! উজবুক। মাধব নিজে থাকলে কথা ছিল। কিন্তু সর্দার নিজে নেই। তার দায়িত্ব মেলা সামলানো। মেলা থেকে তাকে সঙ্গে করে আনেননি রামজয়। ওর সঙ্গে দুটো চেলা আছে অবশ্য।

"পাঞ্জালি, এখানে লেঠেলদের কে আছে ?"

কাছাকাছি ছিল একজন। সে জলে নামেনি।

পাঞ্জালি ডাকল লেঠেলকে।

রামজয় বললেন, "যাও, ওদের হইহল্লা করতে বারণ করো। বলো, নৌকো ছেড়ে নীচে নেমে আসতে। মশাল তো জ্বালিয়েই ফেলেছে। নীচে এসে দেখুক, জলে যদি কাউকে সাঁতরে পালাতে দেখতে পায় !"

লেঠেল এগিয়ে গেল।

রামজয় সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মশালের আলোয় অনেকটাই দেখা যায়। তিন-চারটে সাধারণ নৌকো একপাশে, বেশ খানিকটা তফাতে বাঁধা। চরে

ভিড়ে আছে। দু-চার পা বড়জোর জল ঠেলতে হয় নৌকোতে উঠতে গেলে। বোঝাই যায় এগুলোতে সাধারণ যাত্রী আর ব্যাপারিরা এসেছে। তারা কেউ নৌকোয় নেই বলেই মনে হচ্ছে, মেলায় গিয়ে বসেছে। মাঝিরা দু-একজন নৌকো সামলাচ্ছে— এখন এই নৌকোই তাদের ঘরসংসার। এই মাঝিরাও মশালের আলো ও হল্লায় ভয় পেয়ে কোথায় লুকিয়ে পড়েছে কে জানে!

দশাননদের নৌকো অন্য পাশে। একটা বড়, দুটো ছোট নৌকো। বড় নৌকোটা যে কখন, এই গোলমালের মধ্যে, সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে, রামজয় খেয়াল করেননি। হয়তো মশাল হাতে লোকজন ছুটে আসছে দেখেই নৌকাটাকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল।

সন্দেহ হল রামজয়ের।

"পাঞ্জালি?"

"বাবু!"

"ওই নৌকোতেই দশানন আছে।"

পাঞ্জালি দেখল। নৌকোটা চর থেকে অনেকটাই সরে গিয়েছে। তার মাথায় কিছুই আসছিল না।

রামজয় হঠাৎ বললেন, "আমি তো ছাড়ব না। দশানন পালাতে চাইলেও আমি তাকে পালাতে দেব না। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে লেঠেলদের সামলাও। তারা যেন এখানেই থাকে। আমি ওই নৌকোর কাছে যাব।"

পাঞ্জালি অবাক হয়ে বলল, "কেমন করে রাজাবাবু? সামনে জল!"

"জলের মধ্যে দিয়েই যাব। কোমরজলের সামান্য বেশি হতে পারে।"

"আরও বেশি—"

"আমি ভালই সাঁতার জানি। তুমি ভেবো না। এদের সামলাও। আমি যাচ্ছি ..." বলতে-বলতে রামজয় গায়ের কম্বলটা পাঞ্জালির দিকে ছুড়ে দিয়ে এগিয়ে গেলেন।

নিজেকে লুকোবার উপায় ছিল না। মশালগুলো দাউ-দাউ করে জ্বলছে। আলোয় আলো হয়ে আছে জায়গাটা। তবু রামজয় এগিয়ে গেলেন। তাঁর ভরসা, লেঠেলরা। এরা যতক্ষণ এখানে আছে, ততক্ষণ দশাননের লোকরা আগ বাড়িয়ে লড়তে আসবে না। তেমন মতলব থাকলে, আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ত। লুকিয়ে পড়ত না। দশাননও জানে, রামজয়ের কোনও ক্ষতি এখন যদি হয়ে যায় তবে তার পক্ষে মাথা বাঁচিয়ে পালানো মুশকিল। আর সে কোথায় পালাবে? তার কয়েকটা চেলা যে মেলায় আটক পড়ে আছে!

কোমরজলের কাছাকাছি এসে রামজয় ভাল করে একবার বড় নৌকোর দিকে তাকালেন। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবে নৌকো দুলছে, ভাসছে। সরেও যাচ্ছে নাকি আরও?

সামান্য এগোতেই একটা গলা শুনতে পেলেন রামজয়। সামান্য পরেই কে যেন মোটা দড়ির মতন কিছু ছুড়ে দিল নৌকো থেকে। মাথা বাঁচিয়ে সরে গেলেন

রামজয়। ধরে ফেললেন দড়িটা।

দড়িতে টান পড়ল। নৌকো থেকে কেউ টান দিচ্ছে দড়িতে। রামজয়কে টেনে নিতে চাইছে নাকি!

রামজয় দড়ি ধরে এগিয়ে গেলেন।

নৌকোয় উঠতেই কে যেন বলল, রামজয়কে, "আসুন হুজুর।"

তাকালেন রামজয়। একটা মামুলি লোক। তবে চেহারা দেখলে বোঝা যায় গায়ে শক্তি আছে। ডাকাতদলেরই কেউ। হয়তো দশাননের খাস লোক।

লোকটাকে কয়েক পলক দেখে নিয়ে নৌকোটা লক্ষ করলেন তিনি। বজরা নয়, তবে ছই-দেওয়া নৌকোটা খানিকটা অন্যরকম। সাধারণভাবে নৌকোর ছই এত লম্বা হয় না। এটা লম্বাই। পাটাতনের কাঠও মজবুত।

রামজয়ের কোমর পর্যন্ত ভিজে। জল পড়ছিল পায়ের নীচে। শীতের রাত, নদীর জল, ভিজে পোশাক—শরীরের তলার দিকটা কনকন করছিল।

"আসুন হুজুর।" লোকটা আবার বলল। খাতির করে বলল, না ব্যঙ্গ করে!

"তুমি কে?"

"মাঝি।"

"মাঝি! এই নৌকো তোমার?"

লোকটা সে-কথার কোনও জবাব না দিয়ে আবার বলল, "আসুন হুজুর। ভেতরে আসুন।"

ছইয়ের ভেতরে যেতে ডাকছে লোকটা। রামজয় ভাবলেন কয়েক মুহূর্ত। যাবেন, না, যাবেন না?

"তুমি দশাননের লোক?"

"হুজুর যা ভাবেন।"

"দশানন কোথায়?"

"ভেতরে।"

"ছইয়ের ভেতর বসে আছে?"

"আজ্ঞে।"

রামজয় উত্তেজনা বোধ করলেন। "চলো।"

ছইয়ের ভেতরে এসে রামজয় অবাক! ভেতরের জায়গাটা শুধু লম্বা নয়, মোটামুটি গোছানো। ছোটখাটো একটা ঘর যেন। লণ্ঠন ঝুলছে ভেতরে, খড়পাতা বিছানা, একপাশে থালা, বাটি, জলের কলসি, অন্য পাশে একটা কাঠের উঁচু বাক্স।

রামজয় বলতে যাচ্ছিলেন, দশানন কোথায়, তার আগেই নজরে পড়ল বাক্সর দিকে চটের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে এল। তার মুখ দেখার উপায় নেই। মুখোশ-পরা মুখ। পরনে ধুতি, গায়ে ফতুয়া। ফতুয়ার ওপর কালো চাদর জড়ানো। মুখোশটা নজর করলেন রামজয়। দশানন কী ধরনের মুখোশ ঝোলায়

গাছের ডালে স্বচক্ষে তা দেখেননি তিনি। তবে অনুমান করলেন। এরকম মুখোশ নিশ্চয় নয়। এ-মুখোশ মুখে পরার। গাঁয়ে-গ্রামে যারা বহুরূপীর খেলা দেখিয়ে বেড়ায়—মুখোশ আঁটে মুখে—এই মুখোশ অনেকটা সেই জাতের। তবে কোনও কাজকর্ম নেই। একেবারে কালো। চোখের কাছে আর মুখের কাছে ফাঁক আছে, যাতে চোখে দেখা যায়, কথা বলা সহজ হয়।

এই তবে দশানন ?

রামজয় কিছু বলার আগেই মুখোশআঁটা লোকটি পিঠ নুইয়ে হাত তুলে নমস্কার জানাল তাঁকে। বলল, "আপনি কষ্ট করে এতদূর এলেন, আপনাকে কোথায় বসতে বলি জমিদারবাবু ! এখানে আপনার বসার মতন— !"

"তুমি দশানন ?"

"লোকে তাই জানে।"

"লোকে তোমায় ডাকাত বলে জানে।"

"ভুল জানে না।"

রামজয়ের মনে হল, লোকটা তো কথা বলতে শিখেছে ভাল। একটা ডাকাত এইভাবে কথা বলতে শিখল কেমন করে ! তা ছাড়া দশাননের কথায় একটা বিদ্রূপের ভাবও আছে। ভেতরে-ভেতরে রাগ হচ্ছিল রামজয়ের।

"তোমার সঙ্গে আমি গপ্প করতে আসিনি।" রামজয় বললেন, "কেন এসেছি তুমি জানো !"

"জানি। আপনি আমায় ধরতে এসেছেন।"

"হ্যাঁ।"

"পারবেন ধরতে ?"

"পারব না বলে মনে হচ্ছে তোমার ? আমার বিশ-পঁচিশ জন লেঠেল নদীর চরে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার ক'জন দলের লোক মেলায় আমার লোকজনের হাতে আটক আছে। এর পরও কি তোমার মনে হয়, আমরা তোমায় ধরতে পারব না ?"

দশানন প্রথমে কোনও কথা বলল না। তারপর যেন হাসল। বিকট শব্দ করে নয়। সাধারণভাবে। বলল, "আপনি এখানকার রাজাবাবু। এই এলাকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। খবরাখবর আমিও রাখি রাজামশাই। কিন্তু আপনি আমায় ধরতে পারবেন না।"

"কেমন করে বুঝলে ?"

"আপনার লেঠেলরা এত ক্ষমতা ধরে নাকি ? দশাননকে ধরবে ?"

"আমার লেঠেলরা ক্ষমতা ধরে কি ধরে না—সেটা অন্য কথা। মনসাচরে শুধু ক'জন লেঠেল নেই, মানুষও আছে। তারা তোমাদের রুখতে পারে।"

"পারলে ভাল। আপনারা জিতবেন।"

রামজয় অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। বললেন, "তুমি কী চাও ? যদি দলবল নিয়ে ফিরে যেতে চাও—এখনও যেতে পারো। মনসাচরে এখন পর্যন্ত তোমরা লুঠপাট

করতে পারোনি। মানুষ মরেনি, জখম হয়নি। ঘরেদোরে আগুন জ্বলেনি। এখনও সময় আছে ফিরে যাওয়ার।"

দশানন এবার ব্যঙ্গ করে বলল, "আপনি আমাদের মাফ করতে চান ?"

"যতক্ষণ আমাদের কোনও ক্ষতি হচ্ছে না—ততক্ষণ অশান্তি চাই না। যদি ক্ষতি হয় তোমরা কেউ ... !"

রামজয়ের কথা শেষ হল না, আচমকা দশানন কাকে যেন ডাকল, জোরেই।

ডাকের সঙ্গে-সঙ্গে একটা লোক এসে হাজির। ভয় পাওয়ার মতনই চেহারা। যেমন কালো তেমনই বিশাল দেখতে।

দশানন বলল, "জমিদারবাড়িতে কতজন লোক গেছে আমাদের ?"

"বারোজন।"

"মেলায় কতজন আছে ?"

"দশ।"

"এখানে ?"

"আমরা ক'জন আছি।"

"আর কোনও খবর আছে ?"

"না।"

"তুমি যাও।"

লোকটা চলে গেল।

দশানন এবার স্পষ্ট গলায় বলল, "শুনুন রাজামশাই। আপনার বাড়িতে আমার লোকরা আজ ডাকাতি করবে। হয়তো এতক্ষণে তারা ঢুকে পড়েছে বাড়িতে। আমরা জানি আপনি বাড়ি আগলাবার জন্যে লোক রেখেছেন। তাতে আমাদের আটকাবে না। আমাদের বাকি লোকরা মেলায় ...। তারাও আর বসে থাকবে না।"

রামজয় চমকে উঠলেন। তিনি যেন ভাবতেই পারেননি, এইভাবে আজই ডাকাত পড়বে তাঁর বাড়িতে, মেলায়, মনসাচরে।

কিছু বুঝি বলতে যাচ্ছিলেন রামজয়, তার আগেই দশানন বলল, "এই নৌকো কিন্তু আরও অনেকটা সরে এসেছে, রাজামশাই। আপনার লেঠেলরা কি তা ধরতে পেরেছে ?" বলে জোরে হেসে উঠল দশানন। "আপনি বাইরে গিয়ে দেখতে পারেন, ওরা কোথায় আর আমরা কোথায় !"

দশ

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও পাঞ্জালি দেখল, রাজাবাবু ফিরছেন না। না-ফেরার কী কারণ হতে পারে, সে বুঝতে পারছিল না। দশানন কি ওই নৌকোয় নেই ? বিপদ বুঝতে পেরে তার চেলাদের মতন গা ঢাকা দিয়েছে ? না কি রাজাবাবু নৌকোয় ওঠার পর কোনও বিপদে পড়েছেন ?

মশালের আলোয় যতটা দেখা যায় তত দূর তাকিয়ে থেকে-থেকে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। এতগুলো লেঠেলের হাতেই মশালের আলো তো অনেকটাই ছড়িয়ে পড়েছে। কই, কোথায় রাজাবাবু ?

পাঞ্জালির হঠাৎ সন্দেহ হল, নৌকোটা আগে যেখানে ছিল সেখানে নেই। আরও পিছিয়ে গিয়েছে।

লেঠেলদের মধ্যে এখন যে বড়— এই ছোট দলটার মাথা— তার নাম কংস। মাধব সর্দারের বহুকালের চেলা। কংস, সত্যিই যেন কংস, যেমন চেহারা তেমনই জ্বলজ্বলে চোখ। বিরাট গোঁফ, গালপাট্টা। একমাথা চুল।

পাঞ্জালি বলল, "কংস, একটু নজর করে দ্যাখো তো, আমার মনে হচ্ছে, নৌকোটা আরও পিছিয়ে গিয়েছে।"

কংস দেখল। বলল, তারও তাই মনে হচ্ছে।

পাঞ্জালি কিছু বলার আগে অন্য লেঠেলরা একই সঙ্গে বলতে লাগল, নৌকোটা সরে যাচ্ছে। তাদের হাবভাব দেখে মনে হয়, পারলে যেন তারা এই মুহূর্তে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পাঞ্জালি বিপদে পড়ে গেল। তার মাথায় এল না, কী করা উচিত ! লেঠেলদের এগোতে বলবে, না, দাঁড় করিয়ে রাখবে নদীর পাড়ে !

শেষপর্যন্ত পাঞ্জালির মনে হল, ডাকাতদের ফেলে যাওয়া ছোট দুটো নৌকোর একটাকে নিয়ে কংসরা দু-তিনজন এগিয়ে গিয়ে দেখে আসতে পারে বড় নৌকোয় কী ঘটল ? কী হল রাজাবাবুর ?

কংসকে কথাটা বলল পাঞ্জালি।

এ আর এমন কী বড় কাজ ! কংস জনাদুই লেঠেলকে ডেকে নিয়ে চলে গেল নৌকোর কাছে।

নদীর চর ঘেঁষে দশাননের লোকদের যে-দুটো ডিঙি ধরনের নৌকো বাঁধা ছিল তার ত্রিসীমানায় কেউ ছিল না। মাঝিও নেই নৌকোতে। খানিকটা ডান দিকে, বালির আর মাটির ঢিবিমতন জায়গাটার পাশে অন্য যে দু-তিনটে নৌকো বাঁধা— সেগুলোতে ব্যাপারিরা কেউ-কেউ এসেছে মেলায়, দু-দশজন স্নানযাত্রীও। সেই নৌকোগুলোতে মাঝি ছিল এক-আধজন। কিন্তু লেঠেলদের দাপাদাপিতে ভয় পেয়ে যে যার নৌকোয় বসে আছে। তারা হয়তো জানে না, বুঝতেও পারেনি যে, গায়ের পাশে দশাননের দলবল এসে ঘাপটি মেরে বসে ছিল। কেমন করে বুঝবে ? ডাকাত সেজে তো তারা আসেনি, এসেছে আর পাঁচজন যাত্রী হিসেবে।

কংসরা জনাতিনেক ডাকাতের একটা নৌকো নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। কংস নিজেই নৌকো বাইতে জানে। অবশ্য এসব নৌকো বাওয়া সহজ।

পাঞ্জালি চিৎকার করে বলল, "সাবধানে যাবে বটে, কংস ! দরকার বুঝলে আলো দেবে।" আলো দেবে মানে মশাল নেড়ে জানান দেওয়া।

কংস একটা হাঁক দিল। শীতের বাতাসে নদীর ফাঁকায় সেই হাঁক ছড়িয়ে গেল— কথা শোনা গেল না, শুধু একটা হা-হা ধ্বনি।

নৌকোটা এগিয়ে যাচ্ছিল কংসদের। মশালের আলোও একসময় খানিকটা তফাতে চলে গেল।

পাঞ্জালি বড় বিপদে পড়ে গিয়েছে। রাজাবাবুর সঙ্গ ছাড়া তার উচিত হয়নি। উনি যদি একবার বলতেন, পাঞ্জালি সঙ্গে যেত। তবে সে অত পাকাপোক্ত নয়, শীতের রাতে নদীর জল ঠেলে সে কতদূর এগোতে পারত কে জানে ! এখন আর তার কিছুই করার নেই। শুধুই অপেক্ষা করা।

কংসদের নৌকো আরও এগিয়ে গেল। মশালের আলো দেখে তাই মনে হচ্ছিল।

"নজর করে বলো তো হে, আর কতটা তফাতে আছে কংসরা ?" পাঞ্জালি বলল তার পাশে দাঁড়ানো লেঠেলকে।

লোকটা বলল, "বেশি নাই।"

"দশাননের নৌকোটা হটছে, না থিতু আছে ?"

"বুঝা যায় না। হটে নাই।"

এমন সময় আচমকা একটা কোলাহল ভেসে এল। প্রথমে বোঝা যায়নি ভাল করে, তারপর কোলাহলের ধরনটা ভয়, আতঙ্কের মতন মনে হল। বহু গলা, অনেকের চিৎকার, দেখতে-দেখতে আগুনটাও চোখে পড়ল।

পাঞ্জালিরা তাকাল। তাদের পেছনে, অনেকটা দূরে মেলার দিক থেকেই কোলাহল ভেসে আসছে। সেইসঙ্গে দপদপে আলো। আগুন লেগে গিয়েছে যেন। কোথায় লেগেছে, ঠিক কোন দিকে, বোঝা যায় না, তবে মেলা-থানেই যে আগুন লেগেছে বুঝতে অসুবিধে হয় না। আগুনের শিখাও মাঝে-মাঝে বাতাসে লকলক করে নেচে উঠছিল। কোলাহল বাড়ছে। মনে হল, অনেকে মিলে যেন ছোটাছুটি করছে, চিৎকার করছে। ভয়ের গলার সঙ্গে অন্যরকম চিৎকারও কানে এসে লাগছিল পাঞ্জালির।

পাঞ্জালি মেলা-থানের দিকে তাকিয়ে দেখছিল, আগুন জ্বলছে, হইচই, চেঁচামেচি, বুঝতে পারছিল না, কী ঘটেছে ওখানে ? আগুন লেগে গিয়েছে !

পাঞ্জালির পাশে যে লেঠেলরা ছিল তারাও থতমত খেয়ে অনেক দূরের আগুনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ঘটনাটা এমনই আচমকা নজরে পড়ে গিয়েছিল, কানে এসেছিল চেঁচামেচি যে, কেউই কিছু ধরতে না পেরে বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকল। আগুনের লালে আকাশও লালচে দেখাচ্ছিল ওদিককার। ধোঁয়ার গন্ধ।

পাঞ্জালি বলল, "কী হল হে ! আগুন লাগল ?"

"মেলা-থানেই লাগল !"

"ইস ! কোন দিকে গো ?"

"বুঝা যায় না। পশ্চিমেই যেন !"

"হাঁকাহাঁকি শুনছ ?"

না-শোনার কথা নয়। এমন নির্জনে, এই রাত্রে— সামান্য শব্দও যখন অনেক

দূর পর্যন্ত ভেসে যায়, তখন অত লোকের হাঁকডাক, চিৎকার এদের কানে না পড়ার কারণ নেই।

লেঠেলদের মধ্যে একজন অনেক বিচক্ষণ। সে কান পেতে চিৎকার হইহল্লা শুনছিল। সে হঠাৎ বলল, "কর্তা, ডাকাত পড়েছে।"

ডাকাত! দশাননের দল কি মেলায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে? পাঞ্জালি বোবা হয়ে গেল! ডাকাত পড়বে কেমন করে? মেলায় যে-ক'টা লোককে দশাননের দলের বলে মনে হয়েছে— তারা তো সবাই এখন মাধব সর্দারের হেফাজতে। তা ছাড়া, মাধব নিজে তার দলবল নিয়ে মেলা পাহারা দিচ্ছে। মনসাচরের লোকজনও পনেরো বিশ জন লাঠি-বল্লম নিয়ে মেলা আগলাচ্ছে।

হতভম্ব হয়ে পাঞ্জালিরা যখন তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে, তখনই শাঁখ বেজে উঠল। প্রথমে এক বা দুটো, তারপর চার পাশ থেকে। মনসাচরের বাড়ি-বাড়ি থেকেও শাঁখ বেজে উঠতেই বোঝা গেল, সত্যিই ডাকাত পড়েছে, আচমকা আগুন লেগে যায়নি। শাঁখ বাজিয়ে গ্রামের লোক সবাইকে ডাকাত পড়ার বিপদ জানিয়ে দিচ্ছিল।

পাঞ্জালি ভয় পেয়ে গেল। মেলায় ডাকাত পড়েছে, গাঁয়ের বাড়ি-বাড়িতেও হয়তো, কে জানে জমিদারবাড়িতেও ডাকাত পড়ল কিনা! দশানন তবে তার কথার নড়চড় করল না!

লেঠেলরা ছটফট করছিল। তারা এভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। মেলার দিকে ছুটে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে যাচ্ছিল। তাদের সর্দার রয়েছে মেলায়, রয়েছে সঙ্গীরা, তারা সবাই লড়ছে ডাকাতদের সঙ্গে, আর ওরা ক'জন এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে!

ওদিকে আর-এক কাণ্ড শুরু হয়ে গেল।

কংসদের নৌকো দশাননের বড় নৌকোর কাছাকাছি যাওয়ামাত্র যেন বড় নৌকো থেকে আগুন ফেলতে লাগল ছুড়ে ছুড়ে। পাঞ্জালি আগে এমন দৃশ্য দেখেনি। বুঝতেও পারছিল না। আগুনের কী ওগুলো? গোলা? না জ্বলন্ত মশাল?

একজন লেঠেল বলল, খড়ের আঁটি জ্বালিয়ে কংসদের নৌকোয় ফেলে দিচ্ছে দশাননরা। নৌকোর পাটাতনে এভাবে জ্বলন্ত খড় ফেললে কংসরা আর এগোতে পারবে না, আগুন ধরে যাবে পাটাতনে, নিজেরাও হাত-পা বাঁচাতে পারবে না! পুড়ে মরবে।

পাঞ্জালি অসহায় হয়ে একবার মেলার আগুনের দিকে, আর-একবার কংসদের নৌকোর দিকে তাকাচ্ছিল।

তারপর বালির ওপর বসে পড়ল।

"কর্তা, আমরা দাঁড়িয়ে থাকব?"

পাঞ্জালি কিছুই বলতে পারল না।

হঠাৎ এক লেঠেল 'জয় মা, জয় মা' বলে ডাক দিয়ে মেলার দিকে ছুটতে লাগল। মশাল হাতে তার দৌড় দেখে অন্যরাও তার পিছু-পিছু দৌড় দিল।

পাঞ্জালি শুধু দেখল, ওরা ছুটে চলে যাচ্ছে।

নদীর দিকে তাকাল। কংসরা আর এগোতে পারেনি। তাদের নৌকোতে আগুন দেখা যাচ্ছিল। খড় জ্বলছে, না নৌকোয় আগুন ধরে গেল, কে জানে!

অদ্ভুত এক ভয় আর হতাশায় পাঞ্জালি যখন অসহায়ের মতন কপাল চাপড়াচ্ছে, তখন যেন কার গলা পেল।

তাকাল পাঞ্জালি।

তাকিয়ে অবাক! এ কী দেখছে সে?

সাধুবাবা তার সামনে দাঁড়িয়ে। ফকিরদের মতন এক আলখাল্লা পরনে, গায়ে কম্বল, মাথায় একটুকরো কাপড় বাঁধা। এমন বেশে সাধুবাবাকে আগে কোনওদিন দেখেনি পাঞ্জালি। চিনতে ক' মুহূর্ত সময় লাগল।

পাঞ্জালি অবাক! "সাধুবাবা আপনি?"

অতুলানন্দ বলল, "আমি এখানেই ছিলাম।"

"আপনাকে দেখিনি। কোথায় ছিলেন?"

অতুলানন্দ সে-কথার কোনও জবাব দিল না।

"সাধুবাবা, ওদিকে দেখছেন? আগুন জ্বলছে। মেলায় ডাকাত পড়েছে। দশাননের দল সব পুড়িয়ে ছাই করে দিল।"

অতুলানন্দ বলল, "সবই দেখছি।"

"ওদিকেও দেখুন! নদীর দিকে। দশাননের নৌকো থেকে..."

পাঞ্জালিকে কথা শেষ করতে দিল না অতুলানন্দ। বলল, "দেখেছি। শোনো, রায়মশাইকে নিয়ে তুমি ভেবো না। ওঁর দায়িত্ব আমার। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কিছু করতে পারবে না। এখান থেকে আমি বুঝতে পারছি না, জমিদারবাড়িতেও হয়তো ডাকাত পড়েছে। তুমি ওদিকে চলে যাও। দশানন জমিদারবাবুর ছেলেকে চুরি করে নিয়ে আসার মতলব করেছে। যেমন করে পারো, আটকাও ওদের।"

পাঞ্জালি চমকে উঠল। রাজাবাবুর ছেলে রাজুদাদাকে দশানন চুরি করে আনতে পারে, এমন কথা তার মাথায় আসেনি কখনও। জমিদারবাড়ির ছেলে চুরি করে এনে কী হবে দশাননের?

"সাধুবাবা, এ আপনি কী বলছেন?"

"যা জানি, তাই বলছি।"

"ছেলে চুরি করে ওর লাভ?"

"ছেলে চুরি করে আনতে পারলে তাকে নিজেদের কাছে আটকে রাখবে। জমিদারবাবুর কাছে সোনাদানা, টাকা দাবি করার এটা সহজ পথ। রায়বাড়ির ধনরত্ন ডাকাতি করে হাতানো মুশকিল— সে জানে। দশানন সব খবর রাখে। সে জানে জমিদারবাবুর ছেলে একটিও এখনও সাবালক হয়নি। রায়মশাইয়ের

বংশধরকে আটকাতে পারলে জমিদারবাড়ির ধনদৌলতে ভাগ বসাতে পারবে দশানন। ...তুমি যাও, মেলায় যা হচ্ছে হোক, তুমি লেঠেলদের নিয়ে জমিদারবাড়ি আগলাতে যাও।"

"আর রাজাবাবু ?"

"আমি আছি। ...দশানন ওঁর কোনও ক্ষতি করতে চাইবে না এখন। আমি জানি। তুমি যাও।"

"আপনি ?"

"আমি একটা নৌকো রেখেছি। ওই পাশে। ওখানেই ছিলাম। মাঝি সেজে ছিলাম। পোশাক বদলেছি এবার। আমার নৌকো নিয়ে আমি দশাননের কাছে যাব।"

"আপনি একলা ?"

"আমার সঙ্গীটি আছে। আর আছে বন্দুক।"

"বন্দুক ! আপনার ?"

"আছে। কেউ জানে না। ওটা আমি সাবধানে রাখি। পাছে কারও নজরে পড়ে, বালিমাটি খুঁড়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম। রায়মশাইয়ের লেঠেলরা সেদিন আমার মাথা গোঁজার চালার ভেতর ঢুকে যা পেয়েছে হাতড়ে ছিল। তুমি তো আগেই শুনেছ সে-কথা। বন্দুকটা অন্য জায়গায় রাখা ছিল, ওরা আর কেমন করে জানবে ! ...তুমি এখন যাও। জমিদারবাড়িতে কী ঘটছে কী জানি ! আমি রায়মশাইকে নজরে রাখব। তাঁর কোনও ক্ষতি হবে না। তুমি যাও।"

পাঞ্জালি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না।

অতুলানন্দ বলল, "একটা কথা মনে রাখবে। উতলা হবে না। রানিমাকে বারণ করবে উতলা হতে। গায়ের ক্ষমতা দিয়ে দশাননকে জব্দ করা মুশকিল। সে চতুর, নৃশংস, তার সঙ্গে বুদ্ধি আর শয়তানি করে লড়তে হবে।"

পাঞ্জালি ততক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে।

এগারো

দশানন মানুষটা পশুরও অধম। রামজয়কে অনেকক্ষণ একই ভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে শেষে বলল, "চলুন রায়মশাই, একবার বাইরেটা দেখে আসবেন।"

রামজয় ভেতরে-ভেতরে চঞ্চল হলেও বাইরে স্থির ছিলেন। তিনি জানতেন, ধৈর্য হারালে চলবে না। আতঙ্ক, উদ্বেগ প্রকাশ করলে দশানন আরও পেয়ে বসবে। তিনি শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। একবার, মাত্র একটিবার যদি সুযোগ পান, দশাননকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন যে, তার দুঃসাহস আর অহঙ্কারের কী পরিণতি হতে পারে ! তেমন সুযোগ অবশ্য রামজয় পাচ্ছিলেন না। পায়ের দিকটাও ক্রমশ অসাড় হয়ে আসছিল। শত হলেও এই বয়সে শীত আর ভিজে-ঠাণ্ডা কতক্ষণ সহ্য করা যায় ! জল অবশ্য আর পড়ছে না গড়িয়ে।

দশানন আবার ডাকল।

রামজয় বাইরে এলেন। বাইরে এসে চমকে গেলেন।

দশানন বলল, "ওই দেখুন, আপনাকে যারা বাঁচাতে আসছিল—তারা এখন পালাচ্ছে। আমার একটা নৌকো নষ্ট হল রায়মশাই।"

রামজয় দেখলেন। কারা তাঁকে বাঁচাতে আসছিল তিনি জানেন না। পাঞ্জালি আর লেঠেলরা ? সেই নৌকোটার পাটাতনে কি আগুন লেগে গিয়েছে। যারা আসছিল তারা জলে ঝাঁপ দিয়ে ফিরে যাচ্ছে নদীর পাড়ের দিকে। ওদিকে আর একটাও মশাল জ্বলছে না। কোথায় গেল লেঠেলগুলো !

"আপনাদের মেলা ?" দশানন ব্যঙ্গ করে বলল।

বলার দরকার ছিল না। রামজয় আগুন দেখতে পাচ্ছিলেন। মেলা জ্বলছে। দূর থেকে ভেসে আসছে চিৎকার আর শাঁখের আওয়াজ। ডাকাত তা হলে পড়ে গিয়েছে মেলায়।

দশানন বলল, "আমি আপনাকে মিথ্যে বলিনি জমিদারবাবু। দশানন মিথ্যে বড়াই করে না।"

রামজয় ভাবছিলেন জবাব দেবেন না কথার ; কিন্তু শেষপর্যন্ত বললেন, "তুমি মূর্খ।"

"তা বলতে পারেন। ডাকাত আবার কবে আপনার মতন জ্ঞানী হয় !"

"ওই আগুন থেকে বেঁচে তোমার নিজের লোক ফিরতে পারবে ?"

"দু-একজন পারবে না, বাকিরা পারবে। ডাকাতের জাত আমরা, শরীরটাও ডাকাতের, রায়মশাই। জমিদারি রক্ত তো আমাদের গায়ে নেই। আমরা আগুন থেকেও বাঁচতে পারি।"

"তোমার দুটো লোকও ফিরতে পারে কি না দ্যাখো।"

দশানন হাসল।

রামজয় চাইছিলেন দশানন একবার খানিকটা অন্যমনস্ক হোক। অন্যমনস্ক হয়ে তাঁর কাছাকাছি চলে আসুক। তারপর তিনি দেখবেন...।

"যদি অপরাধ না নেন—একটা কথা বলব জমিদারবাবু ?" দশানন বলল। বলতে-বলতে দু' পা এগিয়ে হাত বাড়িয়ে কী দেখাল যেন তার শাগরেদকে। বোধ হয় আগুন-লাগা নৌকোটা। তারপর মুখ ফিরিয়ে রামজয়কে দেখল। "গণ্ডগোলটা আপনিই বাধালেন।"

রামজয় কোনও জবাব দিলেন না।

দশানন বলল, "আপনি আমাকে হেজিপেজি ভাবলেন। ভাবলেন আমি নিমেডাকাতের মতন লুঠপাট করে পেট ভরাই। ওখানেই আপনার মস্ত ভুল হল। আমি ডাকাত ঠিকই, তবে আমার নজর ছোট নয়।"

"নিজের গুণ গাইছ ! আমরা কি জানি না তোমার নজর বড়, না, ছোট !"

"যা জানেন তার অনেকটাই ভুল জানেন। লোকে কী বলে তা কানে তুললে তো রায়মশাই আপনাদেরও সুনাম থাকে না।"

রামজয় আর অবাক হচ্ছিলেন না দশাননের কথা বলার ধরনে। লোকটাকে তিনি মূর্খ বলে গালমন্দ করলেও বুঝতে পারছিলেন—দশানন মোটেই নির্বোধ নয়, সে কথাবার্তা ভালই বলতে পারে। তবে দশানন যখন বলল, 'আপনাদেরও সুনাম থাকে না—' তখন তিনি তার স্পর্ধা দেখে বিরক্ত হলেন। রূঢ় গলায় বললেন, "কী বলতে চাও তুমি ?"

"আমি ডাকাত, তা অস্বীকার করি না। কিন্তু আপনাদের বংশও সাধু নয়।"

রামজয় হতবাক ! তিনি ভাবতেও পারেননি—একজন ডাকাতের মুখে এত বড় অপমানের কথা তাঁকে শুনতে হবে। প্রথমটায় বিমূঢ় হলেও পরে তিনি ধৈর্য হারিয়ে যেন দশাননের দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন, অনেক কষ্টে সংযত করলেন নিজেকে। বললেন, "তুমি ইতর। তোমার স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হচ্ছি। তুমি ভাবছ, আমায় এই নৌকোর মধ্যে একা পেয়ে যা মুখে আসে বলতে পারো ! আমাদের বংশ, পিতৃপুরুষের কথা কী জানো তুমি ? কতটুকু জানো ?"

দশানন শান্তভাবে বলল, "আপনি যা জানেন আমি তার কম জানি না। আপনার পিতা নরনাথ রায় যে জমিদারি পেয়েছিলেন তার আট আনাই আপনার ঠাকুরদার জোর-জবরদস্তি, ছল-চাতুরির জোরেই। আর ডাকাতির কথা যদি তোলেন রায়মশাই, কর্তা-ঠাকুরদা কম যেতেন না। তিনি অনেক ধনরত্ন লুঠ করেছেন। এক সময়ে তাঁর ভয়ে বড় নদীতে ভাড়া নৌকো, বজরা কোনওটাই ভাসাতে সাহস পেত না লোকে।"

রামজয় স্তম্ভিত। দশানন এসব কথা কার মুখে শুনল ! তিনি নিজেই ভাল করে জানেন না তাঁর ঠাকুরদা বিশ্বনাথ রায় কী ধরনের মানুষ ছিলেন। বাবাকে তিনি ভাল করেই জানেন। যেমন কঠিন তেমনই কর্তব্যপরায়ণ। শক্তের কাছে শক্ত, নরমের কাছে নরম। বাবা ছিলেন ধর্মভীরু। তবে, ঠাকুরদার কথা অল্পস্বল্প যা শুনেছেন রামজয় তাতে মনে হয়, বিশ্বনাথ রায় অন্য জাতের মানুষ ছিলেন। ধনসম্পত্তি তিনি যা অর্জন করেছিলেন তার অনেকটাই হাঙ্গামা আর কৌশল করে। শোনা যায়, কোম্পানির আমলে বিশ্বনাথ ইংরেজদের কুঠি লুঠ করতেও পিছপা হননি। তবে তিনি সাহেবদের সঙ্গে ছোটখাটো চোরা লড়াইয়ে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে লড়াই করতেন। না, তাঁকে কেউ সেভাবে ডাকাত বলত না।

রামজয় রাগে, অপমানে কাঁপছিলেন না, বরং ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছিলেন। উত্তেজনার বশে ভুল করার চেয়ে স্থির থাকা ভাল।

দশানন বলল, "নিজের বংশমর্যাদা নিয়ে আপনি অহঙ্কার করতে পারেন, রায়মশাই ; কিন্তু আমি জানি ..."

রামজয় বাধা দিলেন কথায়, বললেন, "দশানন, আমি তোমার মতন নই। ইন্দ্রোহপি লঘুতাং... শ্লোকটা জানো ? কোথা থেকেই বা জানবে ! বিদ্যে নিয়ে তোমার চলে না, চলে ডাকাতি করে। তবু শ্লোকের মানেটা জেনে রাখো। ইন্দ্রও যদি নিজের গুণ নিজে ব্যাখ্যান করেন তবে তাঁর গুণ হালকা হয়ে যায়, লোকে তাঁকে ঘৃণা করে। আমার ঠাকুরদার গুণ তুমি কোথা থেকে জানবে ! আমি যদি

জানাতে চাই—তবে তাঁর গুণের হানি ঘটবে। তুমি নিজেকে তাঁর সঙ্গে তুলনা করতে চাও ! তোমার কী স্পর্ধা !"

দশানন প্রথমে কিছু বলল না, তারপর চিৎকার করে বলল, "স্পর্ধার আপনি কতটুকু দেখেছেন রায়মশাই ! এবার দেখবেন। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আপনার মেলা আমি জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছি। এই কাজটা আমি করতাম না। আপনি করালেন। আমি শুধু আপনার জমিদারবাড়িতেই নজর রেখেছিলাম। ... যান, আপনি ভেতরে যান।"

রামজয়কে ছইয়ের ভেতরে চলে যেতে বলল দশানন।

যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না রামজয়ের। একবার ভাবলেন, দশাননের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরে ভাবলেন, যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে নদীতেও ঝাঁপ দেওয়া যায়।

"আপনি যান !"

রামজয় নৌকোর ছইয়ের মধ্যেই চলে গেলেন আবার।

ভেতরে লণ্ঠন জ্বলছে। শিসপড়া লণ্ঠন। অন্ধকার দেখাচ্ছিল। রামজয় অন্যমনস্ক ও চঞ্চল ছিলেন বলে বুঝতে পারেননি, তিনি বাইরে যাওয়ার সময়ও ভেতরে এত অন্ধকার ছিল না।

হঠাৎ কার ছোঁয়া পেলেন। "কে ?"

"চুপ। আমি অতুলানন্দ !"

রামজয় যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। চটের পাশে একটা ছায়া। গলার স্বর এত চাপা যে, শোনাই যায় না।

"অতুলানন্দ !"

"আপনাকে দুটো কথা বলতে এসেছি। জমিদারবাড়িতে ডাকাত পড়েছে। পড়ার কথা। ওরা কতদূর কী করতে পারবে জানি না। আপনি ভয় পাবেন না, অস্থির হবেন না। দশানন আপনাকে যদি কোথাও আটকে রাখতে চায় আপনি ঘাবড়াবেন না। আমি আছি। আমি থাকতে আপনার প্রাণের ক্ষতি হবে না। ... এখন আপনি যেভাবে আছেন সেইভাবেই থাকুন।" বলতে না বলতে অতুলানন্দ যেন ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

রামজয় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

বারো

জমিদারবাড়ির কাছারি পর্যন্তও এগোতে পারল না দশাননের দল। তারা ভাবতেও পারেনি, ডাকাতের লাঠিও ভাঙে, হাত থেকে ছিটকে যায়, বর্শা বল্লম ছোড়ার আগেই নিজেদেরই ঘায়েল হতে হয়।

না পালিয়ে আর উপায় ছিল না তাদের। কারও হাত ভেঙেছে, কারও মাথা ফেটেছে, দুটো ছেলেমানুষ তিরন্দাজের তির এসে বিঁধেছে হাতে-পায়ে। বাহাদুর

বটে দুই ভাই কানু ধনু।

ওরা পালাল। পালাতে পারল না শুধু একজন, তার অবস্থা খুবই খারাপ, হাঁটু ভেঙেছে, বাঁ হাত নাড়াতে পারছে না, কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে, চোখ নাক ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

ডাকাতরা জানে, জখম-হওয়া সঙ্গীকে ফেলে পালানোয় ভীষণ বিপদ। একজন ধরা পড়া মানে পুরো দলই ধরা পড়ে যেতে পারে। সঙ্গীকে তারা তুলে নিয়ে যায়। পরে হয় সে বাঁচে, না হয় মরে।

এখানে কিছু করার ছিল না। হাঁটু ভাঙা সঙ্গীকে ফেলেই অন্যদের পালাতে হল।

ডাকাতরা জমিদারবাড়িতে ঢুকতে পারেনি ঠিকই, তবে কাছারির মাঠে, আস্তাবলের কাছে, দেউড়িতে, এ-পাশে সে-পাশে যেভাবে দু'পক্ষে লড়াই হয়ে গিয়েছিল তার কিছু চিহ্ন তো থাকবেই। কোথাও আগুন জ্বলছে, কোথাও জ্বলন্ত মশাল নিভে আসার অবস্থা ; মাধব সর্দারের সাত আটজন লেঠেলদের জটলা আর হর্ষধ্বনি, দশাননের দলকে তারা তাড়াতে পেরেছে। তবে তারা একটা দিক বাঁচালেও সব বাঁচাতে পারল না। মেলায় যে আগুন লেগেছে, লুঠপাট হচ্ছে—এ-খবর তাদের কানে এসে গিয়েছে ততক্ষণে। তা ছাড়া গ্রামের ঘরে-ঘরে যে শাঁখ বাজছিল তাও যে থামেনি।

জমিদারবাড়ির গেরস্থালি সরকার ঠাকুরদালানের দিকে থাকে। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। নাম জনার্দন। কানে একটু কম শোনে।

জনার্দন মোটেই সাহসী নয়। ডাকাতদের সঙ্গে মাধব সর্দারের লেঠেলদের লড়াইয়ের সময় সে আড়ালেই ছিল। অবশ্য তার আগেই জানত, রানিমা ছেলেমেয়ে আর খাস দাসী বিন্দুকে নিয়ে চোরা কুঠরিতে লুকিয়ে পড়েছে।

ডাকাতের দল পালিয়ে যাওয়ার পর, মাধবের লোকরা যখন হল্লা করছে, আনন্দে জনার্দন এগিয়ে এসে দাঁড়াল। দেখল, জখমি ডাকাতটাকে। মশালের আলোয় তখনও আশপাশ দেখা যায়। মাধবের দল লোকটাকে ঘিরে রয়েছে।

জনার্দন দেখল, মাটিতে পড়ে রয়েছে ডাকাতটা। মুখ আকাশের দিকে, একপাশে কাত করা। রক্ত পড়ছে তখনও। চোখ বোজা। মনে হয় লোকটার আর হুঁশ নেই।

জনার্দনের একটু ভয় হল, মরে যাবে নাকি লোকটা ? বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ডাকাতটা মারা গেলে ফ্যাসাদ হবে।

জনার্দন বলল, "কী রে, তোরা ওকে মেরেই ফেললি নাকি ?"

একজন বলল, "আজ্ঞা না, মরে নাই।"

"কী করে বুঝলি ? একটু জল দে বেটাকে।"

একজন গেল জল আনতে।

জনার্দন লোকটাকে দেখতে-দেখতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হল। মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। একদিকের গাল নাক রক্তে ভেসে গিয়েছে, জমে যাচ্ছে কালো

হয়ে। চোখের পাতা ফোলা। মুখ বোজা।

দেখতে-দেখতে জনার্দনের মনে হল, এই মুখ যেন সে কোথাও দেখেছে আগে। লোকটার বয়েস বেশি নয়, পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে হয়তো, জোয়ান ছেলে। তবে গায়ে-গতরে তেমন শক্ত নয়। ডাকাতের চেহারা বলে মনে হয় না।

জল এল।

"ডাক তো ওকে। জল দে ..."

ডাকাডাকির পর চোখ খুলল লোকটা।

"ওঠো হে, জল খাও।"

উঠতে কি পারে সহজে, তবু কোনওরকমে উঠে বসল লোকটা। আঁজলা করে জল খাওয়ার উপায় নেই। একটা হাত তুলতে পারছে না। অন্য হাতে ঘটি নিয়ে জল খেল।

"রক্তটা মুছে নাও।"

ফেট্টির কাপড়ে, ফতুয়ার হাতায় রক্ত মুছল খানিকটা।

হঠাৎ জনার্দন বুঝি চিনতে পেরে গেল লোকটাকে। "তোমার নাম কী ? কোথাকার লোক ? ফুলজোড়ের লোক নাকি !"

সামান্য মাথা নোয়াল লোকটা। যন্ত্রণায় তার মুখচোখ কুঁচকে রয়েছে। কাতরাচ্ছে।

"তুমি গত বছর এখানে আস্তাবলের কাজ করতে এসেছিলে না ?" জনার্দন বলল।

আবার মাথা নোয়াল লোকটা। স্বীকার করল।

জনার্দন অবাক ! গত বছরই রাজাবাবুর আস্তাবলের ফকির গিয়েছিল দেশে, বদলি হিসেবে যে-লোক কাজ করতে এসে মাসখানেক ছিল, এ সেই লোক। ঘোড়াকে দানা খাইয়েছে, গা পরিষ্কার করে দিয়েছে, তারপর হুট করে চলে গেল। সেই লোকটাই এসেছে এ-বাড়িতে ডাকাতি করতে ! নেমকহারাম।

জনার্দন স্বভাবে রাগী নয়, হিংস্রও নয় ; বরং দয়ামায়া আছে তার, নরম স্বভাবের মানুষ। সেই জনার্দনও হঠাৎ খেপে গেল। নিজেই তাকে মারতে যাচ্ছিল, সামলে নিল। বলল, "তুমি এত বড় নেমকহারাম। রাজবাড়ির অন্ন খেয়ে গিয়ে এখানেই ডাকাতি করতে এসেছ ?"

লোকটা কী বলতে গেল, গিয়ে কেঁদে ফেলল হাউমাউ করে।

এমন সময় পাঞ্জালি এসে হাজির। সে আর শ্বাস নিতে পারছে না, হাঁফাচ্ছে। নদী থেকে জমিদারবাড়ি কম পথ নয় !

জমিদারবাড়ির ফটকের কাছে আসবার আগেই সে শুনেছে, দশাননের দল মার খেয়ে পালিয়ে গিয়েছে। শুনে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে।

কাছে দাঁড়িয়ে পাঞ্জালি বলল, "সরকারবাবু, রানিমা-রাজুদাদা ওঁরা ..."

"ওনারা ঠিক আছেন। ডাকাতরা কাছারিবাড়ির ওপাশেই যেতে পারেনি। পালিয়ে গিয়েছে।"

"তবু অন্দরমহলে একবার খবর নিন।"

"খবর নিতে লোক গেছে," বলে জনার্দন জখমি-লোকটাকে দেখাল। বলল, "এই লোকটা গত বছর এখানে কাজের খোঁজে এসেছিল। মাসখানেক কাজও করেছে আস্তাবলের। তারপর পালিয়ে গিয়েছিল। বেটাকে আমি চিনতে পেরেছি। ... অ্যাই, তোর নাম কী রে ? ডমরু না ?"

লোকটার নাম ডমরু। ডমরু বলেই ডাকা হত ওকে।

জনার্দন কপাল চাপড়ে বলল, "আর কত দেখব হে পাঞ্জালি, এই বেটা যখন এ-বাড়িতে কাজ খুঁজতে আসে তখন আমায় বলল, তার দেশগাঁ ফুলডোর। আমারও ভিটে সেখানে। দেশগাঁয়ের লোক ভেবে রাজাবাবুর কাছে হাজির করলাম ওটাকে। কাজও হল। থাকত এখানেই। তারপর পালিয়ে গেল। কে জানত ওর মতলব ভাল ছিল না। নেমকহারাম।"

পাঞ্জালি বলল, "আগে আপনি অন্দরমহলের খবরটা নিন। এর ব্যবস্থা পরে হবে।"

জনার্দন হুকুম করল ডমরুকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখার।

"চলো।" জনার্দন পাঞ্জালিকে ডাকল।

জমিদারবাড়ির অবস্থাটা তখনও থমথমে। কেমন থতমত খেয়ে আছে যেন সকলে। ডাকাতের দল পালিয়ে গিয়েছে জানা সত্ত্বেও সরাসরি কেউ বাইরে আসছিল না। বুনো মোষ বা খ্যাপা হাতি এসে সব যেন লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গিয়েছে। বিশৃঙ্খল অবস্থা।

শেষপর্যন্ত জনার্দন অন্তঃপুরের বার-দরজায় এসে দাঁড়াল। সঙ্গে পাঞ্জালি।

বিন্দুদাসী এসে জানিয়ে গেল। রানিমার ছেলেমেয়েরা ভাল আছে। এখন তারা রানিমায়ের ঘরে।

পাঞ্জালি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এল।

"সরকারবাবু, একটা খারাপ খবর আছে," পাঞ্জালি বলল।

"মেলার খবর ?"

"মেলার খবর নয়। সে তো ছাই হয়ে গেল এতক্ষণে।"

"তবে ?"

পাঞ্জালি বলল, "খবরটা আপনি এখনই অন্দরমহলে পৌঁছে দেবেন না। রানিমার কানে যেন না যায় !"

সন্দেহ এবং ভয় হল জনার্দনের। "কী খবর ?"

"দশানন রাজাবাবুকে আটক করেছে।"

জনার্দনের বিশ্বাস হল না। "কী বলছ হে তুমি পাঞ্জালি ?"

পাঞ্জালি পুরো ঘটনাই বলল জনার্দনকে।

জনার্দন খানিকটা বুঝল, খানিকটা বুঝল না। তবে আসল কথাটা বুঝতে পারল। রাজাবাবু এখন দশাননের হাতে আটক পড়েছেন। নিজের নৌকোয় জমিদারবাবুকে আটকে রেখেছে দশানন।

"এখন কী হবে হে ! নৌকো থেকে কে ছাড়িয়ে আনবে রাজাবাবুকে ?"

"জানি না। তবে সাধুবাবা আছেন—"

"সাধুবাবা ! সেই সাধু ! দুর ... !"

"উনি বলেছেন।"

"উনি কে ? রাখো হে ! ওঁর কী ক্ষমতা ! তুমি মাধব সর্দারকে খবর দাও।"

"আমি দেখছি। আপনি এখন এ-কথা কাউকে বলবেন না।"

জনার্দন মাথা নাড়ল।

পাঞ্জালি আবার ছুটল মেলার দিকে।

কখন যে মাঝরাত এসে পেরিয়ে গিয়েছে কে জানে ! শেষ পৌষের ঠাণ্ডা আর হিম-কুয়াশায় ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ানো যায় না। মেলার আগুন নিভে এসেছে। পোড়া গন্ধ, ছাই। ডাকাতের দল লুঠপাট শেষ করে পালিয়ে গিয়েছে কখন। ওরই মধ্যে একটা ডাকাত বুঝি আগুনে ঝলসে নদীর বালিতে মরে পড়ে আছে।

মাধব সর্দারের দলবল একপাশে জটলা করছিল।

আজ রাত্রে বোঝা যাবে না মেলার ক্ষয়ক্ষতি কতটা হল ! কাল সকালে আলো ফুটলে বোঝা যাবে ক'টা দোকান পুড়ল, ক'জন ব্যাপারি সর্বস্বান্ত হল ! তা ছাড়া ডাকাতের দলটার সঙ্গে লড়তে গিয়ে জখমও হয়েছে অনেকে। স্নানযাত্রীরা নিরীহ মানুষ, তারা যে যার দলের মধ্যে বসে জটলা করছিল, কাঁদছিল। কালকের রাত পোহালেই স্নান।

পাঞ্জালি আর মাধব একপাশে এসে কথা বলছিল। মাধবের তখনও আফসোস যাচ্ছে না। এত করেও সে মেলাটাকে ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচাতে পারল না। পারল না এইজন্যে নয় যে, সামনাসামনি লড়াইয়ে তার দল হেরে গিয়েছিল ! না, তা নয়। দশাননের লোকগুলো আগুন লাগিয়ে দেবে যত্রতত্র, সে ভাবতে পারেনি। সর্বনাশ যা করার আগুনেই বেশি করেছে। আগুনের সঙ্গে কে লড়তে পারে !

পাঞ্জালি বলল, "সর্দার, যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে। কাল বোঝা যাবে হাল কী হল ! সব যায়নি, মেলার ওপাশটায় আগুন লাগানো যায়নি। তুমি একটু সামলাও নিজেকে।"

মাধব সামলে নিল যতটা পারে।

"রাজাবাবুর কী হবে ?" পাঞ্জালি বলল।

মাধব আগেই শুনেছে, পাঞ্জালির মুখেই, রাজাবাবু ডাকাত দশাননের হাতে ধরা পড়েছেন। তাঁকে আটকে রেখেছে দশানন।

মাধব বলল, "ওর দলটা তো পালাই গেল কর্তা।"

দশাননের দল যে লুঠপাট শেষ করে নদীর দিকে পালিয়ে গিয়েছে, নৌকো করে হটে গিয়েছে মাঝ নদী পর্যন্ত—তা জানে পাঞ্জালি। চোখে দেখেনি। তবে অনুমান করা যায়।

"এখন কী হবে ?"

"বিহান হতে দিন বটে, রাতে আর কিছু করার নাই।"

"সকাল হওয়ার আগে যদি দশানন বাজাবাবুকে নিয়ে আরও দূরে কোথাও চলে যায় ?"

মাধব মাথা নাড়ল। যাবে না। আর যদি যায়—এখন আর করার কী আছে! মাধব তার ভাঙা দল নিয়ে এই রাত্রে নদীর দিকে ছুটে গিয়ে রাজারাবুকে কি বাঁচাতে পারবে ? পারবে না।

"খানিক পরেই ভোর হবে কর্তা!"

"আমরা তবে ..."

"এই নদীর হাড়হদ্দ আমি চিনি," মাধব বলল, "নৌকো নিয়ে কত তফাতে পালাবে দশানন! খুঁজে পাব তাকে। কাল না পাই, পরশু পাব। পরশু না পাই তরশু। আপনি ঘাবড়াবেন না।"

পাঞ্জালিও বুঝতে পেরেছিল, এই শেষ রাতে তাদের পক্ষে অকারণ দৌড়ঝাঁপ করার মানে হয় না। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই তাদের।

সকালের আশায় আকাশের দিকে তাকাল পাঞ্জালি। এখন আকাশও যেন অঘোর ঘুমে। হিম-কুয়াশার আড়ালে তারাগুলোও আর চোখে পড়ে না।

তেরো

সকালে দেখা গেল, মেলার অর্ধেকটা তো বটেই, তার চেয়েও কিছুটা বেশি নষ্ট হয়েছে দশাননের দলের হাতে। আগুনই ক্ষতি করেছে বেশি। লুঠপাট বাদ যায়নি—তবে যতটা ভাবা গিয়েছিল ততটা নয়। জমিদারবাড়িতে পা রেখেও শেষপর্যন্ত পালিয়ে আসতে হয়েছে ডাকাতদের। মনসাচরের মানুষ আরও অবাক হচ্ছিল, গ্রামের কোনও বাড়িতেই ডাকাতরা আর হামলা করেনি। কেন করেনি ? পারেনি, না কি, মেলা আর জমিদারবাড়িতে বাধা পেয়ে তারা আর গ্রামের বাড়ি-বাড়ি লুঠপাট চালাবার সাহস বা সময় কোনওটাই পায়নি—কে জানে!

সকালের আলোয় মেলার ছাই-ওড়া পোড়া চেহারা দেখলে বুক হায় হায় করে উঠবে এ তো স্বাভাবিক। তবে অত দুঃখের মধ্যেও বড় সান্ত্বনা এই যে, দশানন যা করতে চেয়েছিল তার বারোআনাই পারেনি। পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। মনসাচরের মানুষের কাছে এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। নিজেদের গ্রামের জন্য, প্রতিবেশীর জন্য কতকালের মেলার জন্য একাট্টা হয়ে এই যে এত লোক দশাননের মতন দুর্ধর্ষ ডাকাতদের দলের সঙ্গে সমানে লড়ে গেল এটা কি কম গৌরবের! তাদের জমিদারবাড়িও তো বেঁচে গিয়েছে! তবে!

আজ আর সারাদিন অত ভাবনার সময় নেই। কাল সংক্রান্তির স্নান। সূর্যোদয়ের পর-পরই।

যেটুকু আছে তাই নিয়েই আজকের দিনটি কাটিয়ে দিতে চায় সকলে।

পাঞ্জালি আর মাধব সকাল থেকে নদীর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করল। ব্যাপারিদের দুটিমাত্র ভাড়া নৌকো ছিল—তাও ডাকাতের দলবল কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। নদীর চর শূন্য। দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

পাঞ্জালি বলল, "সর্দার, এখন কী হবে?"

মাধবের সঙ্গে তার চেলাদের জনা দুয়েক ছিল। তারা নদীর পাড় ধরে ডাইনে-বাঁয়ে অনেক খুঁজেছে, কোথাও কিছু খুঁজে পায়নি, দেখতেও পায়নি।

মাধব মানুষটা সহজে ভেঙে পড়ে না। নদীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আগে থেকে মাথা কুটবেন না, পাঞ্জাবাবু! সময় দিন। খোঁজখবর করি।"

"তুমি রানিমায়ের কথা বুঝছ না!"

"বুঝেছি।"

"রাজাবাবু কাল থেকে বাড়ি ফেরেননি। রাত গেল, ভোর হল—বেলাও হয়ে গেল সর্দার, রানিমাকে আমরা কী বলব!"

মাধব সর্দার বোঝে সবই। রাজাবাবু বাড়িতে ফেরেননি, ডাকাত পড়ার আগে তিনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর সন্ধে কাটল, রাত কাটল, সকাল হল—কোথায় তিনি! রানিমায়ের দুর্ভাবনা কি আর না বোঝে সর্দার? কিন্তু সে কী করবে?

"মাকে এখন কিছু জানাবেন না।" মাধব বলল।

"কতক্ষণ না জানিয়ে থাকা যাবে সর্দার!"

"যতক্ষণ পারেন।"

"আমি জানাই না-জানাই, রানিমা আজ ঠিকই জানতে পারবেন।"

মাধব কী ভেবে বলল, "আজ আমায় খোঁজ নিতে দিন। এই নদীর আঁক-বাঁক, আড়-খাড় আমার জানা আছে। আমার লোকজন নিয়ে আমি আগে খোঁজ করি বাবু। দশানন যাবে কুথায়!"

পাঞ্জালি কিছুই বলল না।

এই জায়গার সঙ্গে সর্দারের পরিচয় যত, পাঞ্জালির পরিচয় তার চেয়ে কম নয়। এই নদী কোথায় বেঁকেছে, কোথায় বড় হয়েছে, কোথায় তার আশেপাশে জঙ্গল আর বালিয়াড়ি, কোথায় বা নদীর গা থেকে খালের মুখ বেরিয়েছে তাও জানে পাঞ্জালি মোটামুটি। মাধব যদি তার লোকজন নিয়ে দশাননের নৌকোর খোঁজ করতে শুরু করে, সহজে খোঁজ পাবে বলে মনে হয় না। আজ তো নয়ই। দু-একদিনে সেটা সম্ভব বলেও মনে হয় না। আর এই সময়টায় রানিমাকে কে আগলে রাখবে? কাছারির লোকের সে ক্ষমতা নেই। দেওয়ান-গোমস্তারও নয়। তবে একজন পারেন খানিকটা। তিনি জমিদারবাড়ির পুরোহিত। প্রমথনাথ ভট্ট। সকলে তাঁকে ভট্টমশাই বলে। জমিদারবাড়ির অন্দরমহলে তাঁর আসা-যাওয়া আছে। নিত্যপুজোর সময় তিনি অবশ্য জমিদারবাড়ি যান না, তবে বড় পুজোআচ্চার অনুষ্ঠানে তাঁকেই যেতে হয়। রানিমা ভট্টমশাইকে মান্য করেন।

পাঞ্জালির সঙ্গে ভট্টমশাইয়ের মুখচেনা পরিচয়। তিনি চেনেন পাঞ্জালিকে।

তবে তার কথা ভট্টমশাই বিশ্বাস করবেন কি করবেন না—কে জানে !

আজ মকরস্নান। মানে আজকের রাত শেষ হলেই স্নানের লগ্ন শুরু। ভট্টমশাইকে তাঁর বাড়িতে পাওয়া যাবে এখন। পাঞ্জালি কি তাঁর কাছে যাবে ? না আগে কথা বলবে দেওয়ানজির সঙ্গে! দেওয়ানজিকে তেমন পছন্দ করে না পাঞ্জালি। নামেই দেওয়ান। রাজাবাবুই নিজেই মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলেন, "বুঝলে পাঞ্জালি, আমার এই জমিদারি কি আর রাজরাজড়ার রাজত্ব, নেহাতই জমিদারি, কিন্তু আমার যোগেশচন্দ্রকে দেওয়ান না বললে তার মুখ ভারী হয়। ও ভাবে দেওয়ান নামের মর্যাদা আছে। বাস্তববুদ্ধি থাকলে কী হবে, লোকটা মুখ্যু।

পাঞ্জালির মনে হল, দেওয়ান নয়, যদি কিছু বলতে হয় ভট্টমশাইকে বলাই ভাল।

বেলা হয়ে যাচ্ছিল।

পাঞ্জালি বলল, "সর্দার, এখন চলো—ফেরা যাক। বেলা হয়ে যাচ্ছে। আমি একটু ভাবি। তুমিও ভাবো। দ্যাখো, কী করা যায় !"

মাধবেরও মনে হল, নদীর এই ফাঁকায় এখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।

দু'জনে ফিরতে লাগল। পেছনে মাধবের দুই চেলা।

ফেরার পথে মাধব বলল, "নদী বরাবর পুবে পুরনো এক গড় ছিল না পাঞ্জাবাবু ?"

"গড় !" পাঞ্জালি মনে করার চেষ্টা করল। ভাবল। বলল, "তুমি রতিবাটির জঙ্গলের কথা বলছ ?"

"আজ্ঞে।"

"হ্যাঁ। ওই জঙ্গলে একটা গড় ছিল। কোন আমলের, কে জানে ! ভাঙা, মাটিতে সেঁদিয়ে গেছে। ঘোর জঙ্গল বটে সেখানে !"

"আপনি কি গেছেন ?"

"না। শুনেছি।"

"এখান থেকে ক' ক্রোশ হবে ?"

"বলতে পারব না। আন্দাজ দু'ক্রোশ।"

"এই বেলায় আর কিছু করা যাবে না, বাবু। ও-বেলায় দেখি কী করতে পারি।" বলতে-বলতে মাধব সর্দার হাতের ইশারায় তার দুই সঙ্গীকে ডাকল, তারপর অন্য পথ ধরে এগিয়ে গেল।

পাঞ্জালি একাই ফিরতে লাগল। যাবে সে জমিদারবাড়িতে ; তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সেখানেই। ছোট কাছারির একপাশে তার থাকা।

যেতে-যেতে পাঞ্জালি নিজের মনেই মাথা নাড়ছিল। হয়তো ভাবছিল, সে কি একবার পুরোহিত ভট্টমশাইয়ের কাছে যাবে ? এত বেলায় তাঁর বাড়ি যাওয়া উচিত হবে না। বরং দুপুরের পর যাওয়াই ভাল।

হঠাৎ সাধুবাবা অতুলানন্দর কথা মনে এল। সাধুবাবা তাকে কথা দিয়েছেন,

তিনি বেঁচে থাকতে রাজাবাবুর প্রাণের ভয় নেই। কিন্তু সাধুবাবাই বা কোথায় উধাও হলেন ! কাল রাতের পর আর তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। তাঁর সেই ডিঙি নৌকোও নদীর কোথাও দেখা গেল না।

পাঞ্জালি বুঝতে পারল না, সাধুবাবার কথায় কতটা আস্থা রাখা যায় ! তিনি কি রাজাবাবুকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন ? কে জানে !

বিকেলের আগে-আগে পাঞ্জালি ভট্টমশাইয়ের বাড়িতে হাজির।

বাড়িতেই ছিলেন তিনি। দাওয়ার গায়ে তাঁর বসার ঘর। ঘর মামুলি। তক্তপোশ, চৌপায়া, মোড়া, আসন, হুঁকো আর একরাশ জীর্ণ পুঁথিপত্র ছাড়া ঘরে আর কিছু চোখে পড়ে না। ভট্টমশাই বরাবরই জ্যোতিষচর্চা করেন। তিনি মন দিয়ে একটা জন্মকুণ্ডলী দেখছিলেন। পাঞ্জালি এসে প্রণাম করল।

ভট্টমশাই চেনেন পাঞ্জালিকে। দেখলেন। বললেন, "ও তুমি ! বোসো।"

পাঞ্জালি তফাতে সরে গিয়ে বসল। বলল, "বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি পণ্ডিতমশাই। আপনি বলুন, কী করব ?"

"বিপদ কী, তা তো শুনিনি বাপু !"

"দশাননের কথা—"

"জানি। কে না জানে ! মেলা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে..."

"জমিদারবাড়িতে ডাকাত পড়েছিল—"

"তাও জানি। সেখানে সুবিধে করতে পারেনি শুনেছি।"

"আপনি বোধ হয় সব জানেন না। শোনেননি। আমি সেই কথাই বলতে এসেছি।"

"ও ! তা বেশ তো, বলো, শুনি।"

পাঞ্জালি ঘটনাগুলো বলল পর পর।

ভট্টমশাই মন দিয়ে শুনলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ভট্টমশাই বললেন, "আমায় কী করতে হবে, বলো। আমি বুড়োমানুষ, সাধ্য বলো, ক্ষমতা বলো—আমার কিছু নেই। তবু বিপদ যখন, তখন যতটা পারি করতেই হবে।"

পাঞ্জালি বলল, "আপনি নিজে গিয়ে রানিমাকে সামাল দিন, পণ্ডিতমশাই। কাল থেকে রাজাবাবু ফেরেননি, রানিমা..."

"বউমা-রানি তো চিন্তায় থাকবেনই। আমি গিয়ে তাঁকে কী বলব ?"

"বলবেন, উনি যেন চিন্তা না করেন। রাজাবাবু ফিরে আসবেন।"

"কথাটা তুমি ছেলেমানুষের মতন বলছ ! ফিরে আসবেন বলে কাকে ভোলানো যায় ! বাচ্চাকাচ্চারা যাতে ভোলে, বউমা-রানিকে কি তাতে ভোলানো যাবে ! উনি তো সবই জানতে চাইবেন। আমি তখন কী বলব ? বলব, দশানন তাঁর স্বামীকে ধরে নিয়ে গিয়েছে !"

"না, না, তা বলবেন না।"

"তবে ?"

"বলবেন," পাঞ্জালি ইতস্তত করে বলল, "রাজাবাবু নিজেই দশাননের আস্তানা খুঁজতে গিয়েছেন।" বলেই তার মনে হল, কথাটা বোকার মতন বলা হয়ে গেল। এত কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর এমন কথা শুনলে রানিমা কী মনে করবেন ?

ভট্টমশাই বললেন, "না, তোমার কথার কোনও মানে হয় না। বিশ্বাসও করবেন না বউমা-রানি। ... তুমি, তোমরা কি সত্যিই জানো, কিংবা আন্দাজ করতে পারো, জমিদারবাবুকে দশাননরা কোথায় নিয়ে গিয়েছে ?"

"আজ্ঞে না। তবে আমাদের মনে হয়, বেশি দূরে যায়নি।"

"কেন ?"

"দশানন রাজাবাবুকে আটকে রেখে লেনদেন করতে চায়।"

"কীসের লেনদেন ?"

"সোনাদানা, অর্থ..."

"আটকে রাখার মতন জায়গা এদিকে আছে ?"

"কেমন করে বলব, পণ্ডিতমশাই! তবে ডাকাতদের লুকনো ঘাঁটি থাকে, কোথাও লুকিয়ে আছে। রতিবাটির গড় জঙ্গল..."

ভট্টমশাই মাথা নাড়লেন। বললেন, "তোমরা অত দূরে যাচ্ছ কেন, কাছাকাছি লুকোবার জায়গাও যে আছে !"

"কোথায় ?"

"শিবসাধনের সাতঘরি।"

পাঞ্জালি এমন জায়গার নাম শোনেনি। বলল, "কোথায় সেটা ?"

"মনসাচরের দক্ষিণে। নদীর গা-ধরে ক্রোশখানেকও যেতে হয় না। ঘোড়ানিম আর বাবলার জঙ্গল, খাল, তারই মাঝখানে সাতঘরের এক মন্দির। এককালে ওখানে শিবমন্দির ছিল, সাত-সাতটা মন্দির। শিবভক্তরা থাকত। সাধনপূজন করত। একবার মড়ক লেগে সবক'টা মারা গেল। তারপর থেকে পড়ে আছে। ...ওখানে কেউ পা দেয় না। দশানন যদি লুকোতে চায়, সাতঘরি ভাল জায়গা।"

পাঞ্জালি বলল, "পণ্ডিতমশাই, তবে মাধব সর্দারকে বলি সাতঘরিতে খোঁজ করতে। আপনি রানিমাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে যেমন করে হোক দুটো-তিনটে দিন সামলে দিন। রাজাবাবুকে আমরা খুঁজে আনব, যেমন করেই হোক।"

ভট্টমশাই বললেন, "দেখি, কতটা পারি !"

চোদ্দো

রামজয় কয়েক মুহূর্ত যেন কিছুই খেয়াল করতে পারলেন না। প্রথমে মনে হয়েছিল নিজের ঘরে, নিজেরই বিছানায় শুয়ে আছেন। তখনও ঘুমের আচ্ছন্নতা কাটেনি। পরের মুহূর্তে এই ঘোর কেটে গেল। চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলেন

যেন। স্বাভাবিকভাবে চারপাশে তাকাতেই রামজয় বুঝতে পারলেন, তিনি নিজের বাড়িতে, ঘরে, নিজের বিছানায় শুয়ে নেই। একেবারে অপরিচিত এক জায়গায় শুয়ে আছেন, একটা তক্তার ওপর। একপাশে ভাঙা জানলা, সামনে সরু মতন এক দরজাও দেখা যাচ্ছে ঠিকই, তবু এই জায়গাটাকে ঘর বলা যায় না। পাথর, ইট, কাঠকুটো দিয়ে তৈরি এমন ঘর দেখলে ভেঙে পড়া, ধসে পড়া কোনও মন্দির বা তার লাগোয়া একটা খুপরি বলে মনে হয়।

বাইরে রোদ, পাখি ডাকছে। শীতের বাতাসও বইছিল বোঝা যায়। গাছপালায় শব্দ হচ্ছে।

রামজয় বুঝতে পারলেন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এখন সকাল, খানিকটা বেলাও হয়ে গিয়েছে।

ঘুমের আর দোষ কোথায়! তবে একে ঠিক ঘুমও বলা যাবে না। দুশ্চিন্তা, ক্লান্তি, উদ্বেগ, নিজের অক্ষমতা—সব মিলেমিশে তাঁকে যেন এত বেশি হতাশ ও ক্লান্ত করে তুলেছিল যে, নিজের থেকেই কখন তাঁর চোখ বুজে এসেছিল। নিজেও তিনি জানেন না কখন। নৌকো থেকে রামজয়কে নামাবার আগে তাঁর চোখে পট্টি বেঁধে দিয়েছিল দশাননের লোক। তারপর তাঁকে নামিয়ে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে খানিকটা পথ নিয়ে এল। শেষে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে পট্টি খুলে দিল চোখের। রাত তখন শেষ হয়ে আসছে। একটা কম্বল আর একঘটি জল দিয়ে চলে গেল একজন। রামজয়ের তৃষ্ণা পেয়েছিল। জল খেলেন। বসে থাকলেন। কোথায় যে বসে আছেন তাও অনুমান করার উপায় ছিল না। শেষে তাঁর ঘুম এসে গিয়েছিল।

গায়ের কম্বলটা পাশে সরিয়ে রেখে রামজয় এবার উঠে দাঁড়ালেন। গায়ের কাপড় রাত্রেই শুকিয়ে গিয়েছিল। নদীর জলে ভেজা জামাকাপড় গায়ে শুকিয়েছে সারারাত। ফলে এখন মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল। হয়তো জ্বরও এসেছে সামান্য। নিজের বয়েসটাকে তিনি আর কেমন করে অবহেলা করবেন, শরীর এখন কি আর অত ধকল সইতে পারে!

ভাঙা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই গাঢ়-হয়ে-আসা শীতের রোদ, গাছপালা চোখে পড়ল। গাছগুলো বড়-বড়, ঘন। কিছু ঝোপঝাড়ও রয়েছে। নানান পাখির ডাক। বোঝাই যায়, এটা জঙ্গল। আশপাশে বনবাদাড়ই রয়েছে।

রামজয় সামান্য সময় জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর কী মনে করে সরুমতন একপাশে হেলে পড়া দরজাটা খুলে বাইরে এলেন। না, দরজা কেউ বন্ধ করে দেয়নি বাইরে থেকে।

ফাঁকায় এসে রামজয় রীতিমতন অবাক। ঘন জঙ্গল না হলেও এই জায়গাটা আধা-জঙ্গল। গাছপালার আশপাশে বড়-বড় পাথর, ইটের স্তূপ, গুহার মতন গোটা দুয়েক ঘর, এক দিকে এক ধসে পড়া মন্দির। বিরাট এক বটগাছ, নীচে ভাঙাচোরা বেদীর সামান্য অংশ।

এই জায়গাটা কোথায়? কোথায় হতে পারে?

রামজয় মনসাচরের জমিদার হলেও তাঁর নানা জায়গায় আসা-যাওয়া ছিল। সদর থেকে সেই বেলেপাহাড় পর্যন্ত। জেলাটা তিনি জানেন। চোখেও দেখা আছে। কিন্তু এই জায়গাটা কোথায় হতে পারে!

মনে-মনে হিসেব করলে মনে হয়, মনসাচর থেকে দু' ক্রোশের বেশি হবে না। হয়তো ক্রোশখানেক। ফেরার পথে কতটা সময় নিয়েছে দশানন? তার নৌকো মাঝরাতের খানিকটা পরেই এদিকে কোথায় এসে ভিড়ে গিয়েছিল। ওর দলবলও এসেছে ওর সঙ্গে, তাদের নৌকোও কাছাকাছি বাঁধা রয়েছে। নৌকো থেকে পায়ে-হাঁটা পথ ধরে আসতে খুব একটা সময়-লাগেনি। যদিও রামজয়ের চোখে পট্টি বাঁধা ছিল। অন্যের হাত ধরে আসতে হয়েছে তাঁকে। চোখ বাঁধা থাকলেও বোঝা যাচ্ছিল, ডাকাতরা মশাল জ্বেলে পথ হাঁটছে।

রামজয় অনুমান করলেন, এটা সাতঘরির জঙ্গল হতে পারে। নিজে তিনি এদিকে আসেননি কখনও, তবে শৈবসাধকদের গল্প শুনেছেন। এককালে নাকি এখানে শৈবসাধকদের বিরাট আখড়া ছিল। মন্দির, ঘর, পাতাল-সুড়ঙ্গ—কত কী ছিল। সেসব কবেই ভেঙেচুরে গিয়েছে, ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে আছে জায়গাটা। চারপাশে জঙ্গল ছাড়া কিছু নেই আর সাতঘরির শিব মন্দিরের।

আরও কয়েক পা এগিয়ে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সামনে তাকালেন রামজয়। ঝোপঝাড়, ফাঁকা জমি, কয়েকটা ঘর পর পর। এককালে হয়তো আখড়ার ঘর কিংবা ধর্মশালার মতন ছিল ঘরগুলো। এখন ভাঙাচোরা, তার মাথার ওপর খড়ের আঁটি কোথাও, কোথাও বা পাতার ছাউনি। ওই ঘরগুলোর সামনে ফাঁকা জমিতে দশাননের দলবলের কাউকে কাউকে দেখা গেল। শীতের রোদ পোয়াচ্ছে। কেউ গল্পগুজবে মত্ত। ঘরের কাছে মাটির বড়-বড় জালা। কাঠ চেরার শব্দ হচ্ছিল কোথাও, ধোঁয়াও চোখে পড়ল। ডাকাতদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে নিশ্চয়।

চারপাশের চেহারা দেখে রামজয়ের মনে হল, দশাননরা এখানে নতুন নয়। হঠাৎ এসে পড়েনি। এটা ওদের একটা ঘাঁটি। খুব সম্ভব, জায়গাটা বেছে নিয়ে দশানন তার দলবল নিয়ে কিছুদিন ধরে আছে এখানে। থাকার মতন ব্যবস্থাও করে নিয়েছে নিজেরা। অবশ্য, এই জায়গাটা তারা শুধুই মনসাচরে ডাকাতি করার মতলব নিয়ে ঘাঁটি করেছে, নাকি এখান থেকে আশপাশে আরও লুঠপাট চালাবে বলা যায় না। হয়তো, পুরো অঞ্চলের জন্যে এই ঘাঁটি।

একজন কে আসছিল এদিকে।

রামজয় সরে এলেন। তারপর তাড়াতাড়ি সেই জায়গাটায় যেখানে তাঁকে রাখা হয়েছিল। অবশ্য আর ঘরে ঢুকলেন না।

লোকটা এল। হাতে কচুপাতা। কচুপাতার ওপর মোটা-মোটা রুটি দুটো, একপাশে খানিকটা ঘ্যাঁট। অন্য হাতে একঘটি জল।

লোকটা রামজয়কে বাইরে দেখে অবাক হল না।

খাবারটা দিতে গেল হাত বাড়িয়ে।

রামজয় নিলেন না। মাথা নাড়লেন।

লোকটা বোধহয় একটু অবাক হল। অথচ কিছু বলল না। ঘরে ঢুকে আবার বেরিয়ে এল। খাবার সে ভেতরে রেখে এসেছে, জলও। গতকালের জলের ঘটিটা ফেরত নিয়ে আসতেও ভোলেনি।

রামজয় হঠাৎ ডাকলেন,"শোনো।"

লোকটা দাঁড়াল।

রামজয় বললেন, "খাবার তুমি রেখে এলে কেন ? ফেরত নিয়ে যাও।"

লোকটা মাথা নাড়ল।

"আমি ওই খাবার খাব না।"

"আমরা ডাকাত বলে ?"

"হ্যাঁ। ডাকাতের হাতের নুন আমি খাই না।"

"আমি হুকুম মেনেছি, হুজুর। আপনি না খেলে খাবেন না। ফেরত নিয়ে যেতে পারব না।"

"দশাননের হুকুম ?"

লোকটা জবাব দিল না।

"তোমার নাম কী ?"

"আমাদের নামধাম বলতে নেই।"

"ও !... তোমাদের সর্দারকে বলবে, যারা আমার প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেছে, ঘরদোর পুড়িয়েছে, মেলায় আগুন দিয়েছে— তাদের দেওয়া অন্ন আমি খাই না।"

লোকটা মাথা হেলাল, বলবে কথাটা সর্দারকে। চলে যেতে-যেতে বলল, "আপনি স্নানের সময় ডাকবেন আমাদের। কাছেই পুকুর। তেল কাপড় পাবেন হুজুর। আপনি আমাদের অতিথি।"

লোকটা চলে গেল।

রামজয় অবাক হলেন। একটা ডাকাতের মুখে এমন সাফ-সুফ কথা তিনি আশা করেননি।

রোদে সামান্য দাঁড়িয়ে তিনি অন্যমনস্কভাবে একপাশে সরে গেলেন। মাথার যন্ত্রণা বাড়ছিল। জ্বর বাড়ছে নাকি ?

আচমকা এক মিহি শব্দ। শিসের মতন। রামজয় তাকালেন। কাউকে দেখতে পেলেন না।

আবার শব্দ। তারপর ঝোপের আড়াল থেকে কার মুখ দেখা গেল।

রামজয় দু'পা এগিয়ে গেলেন।

অতুলানন্দ।

অতুলানন্দকে এখানে দেখবেন রামজয় কল্পনাও করেননি।

অতুলানন্দ বললেন, "আমি আছি। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না।"

"তুমি এখানে কেমন করে এলে ?"

"ওদের পিছু ধরে।"

"জায়গাটা কোথায় ?"

"সাতঘরির জঙ্গল।"

"এখান থেকে আগে আমি পালাতে চাই। তারপর দশাননকে..."

"এভাবে আপনি পালাতে পারবেন না। চারদিকে ওদের নজর আছে।"

"কীভাবে পারব।"

"পরে আমি জানাব।... আপনাকে দুটো কথা বলি। আপনি জেদ ধরে কিছু করবেন না। এখানে আপনার কোনও বল নেই। বুদ্ধি আর ছল করে আপনাকে জিততে হবে। দশানন আপনার সঙ্গে নিজে কথা বলতে আসবে। আসতেই হবে। তবে আলোয় সে আসবে না। ও-বেলায় আসবে হয়তো।"

"তুমি মনসাচরের খবর জানো ?"

"না। আমি তো কাল থেকে পিছু ধরে আছি দশাননের। আপনাকে নিরাপদ রাখা আমার কাজ।"

রামজয় বিরক্ত হলেন। "আমার বিপদ বড় ? না, আমার প্রজাদের বিপদ, স্ত্রী-ছেলেদের বিপদ বড় ?"

অতুলানন্দ বলল, "কাল ওরা যখন ফিরে এল, দশাননের দলবল, তখনই তো আপনি দেখেছেন ওরা তাড়া-খাওয়া কুকুর-শেয়ালের মতন পালিয়ে আসছে। প্রাণের ভয়ে যারা পালিয়ে আসে তারা কত ক্ষতি করবে রায়মশাই। যা করেছে আমিও দূর থেকে দেখেছি। আপনি ভাববেন না, পাঞ্জালি জমিদারবাড়ি দেখছিল। আমি খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাব।"

"কখন ?"

"আজ রাতে।"

"দশানন কেন আমার কাছে আসবে ?"

"ওর মতলব ছিল, জমিদার বাড়িতে ডাকাতি করার সময় রাজুবাবুকে ধরে আনবে।"

রামজয় চমকে উঠলেন।

অতুলানন্দ বলল, "রাজুবাবুকে ধরে এনে আপনার সঙ্গে লেনদেন করবে। টাকা, মোহর, সোনাদানা—যা পারে আপনার কাছে আদায় করে ছেলেকে ছেড়ে দেবে। আপনি নিজে এসে ওদের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। এখন তো আপনাকে আটকে রেখেই ওরা লেনদেন করতে চাইবে রায়মশাই।"

রামজয় রাগে যেন জ্বলে উঠলেন। দশানন তাঁর ছেলেকে চুরি করে ধরে আনার মতলব করেছিল ! এত দুঃসাহস তার !

রাগের মাথায় কোমরে হাত দিলেন রামজয়। তাঁর সেই দু'ফলা ছোরাটা নেই। কোথায় গেল ছোরা। ওরা খুলে নিয়েছে ! কখন ? তিনি তো সবসময় সতর্ক ছিলেন ! ওঁর গায়েও কেউ হাত দেয়নি ! তবে ?

তা হলে কি কাল এখানে আসার পর ওরা যে-জল দিয়েছিল খেতে তাতে

মেশানো ছিল কিছু ? খেয়ে উনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। নয়তো এমন অসাড়ে ঘুম হয় কেমন করে ?

তাঁর কাছে, যখন মেলায় যান, ট্যাঁক-থলিতে তিনটে মোহর ছিল। এই মোহর দেখিয়েই মেলায় তিনি দশাননের এক চেলাকে ধরেছিলেন।

রামজয় ট্যাঁক-থলি পেলেন না। দশাননের লোক ছোরা, ট্যাঁক-থলি, দুইই নিয়ে নিয়েছে।

হতাশ হয়ে রামজয় বললেন, "অতুলানন্দ, ওরা আমার..."

অতুলানন্দ চোখের পলকে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হল। রামজয় ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, খানিকটা দূরে দশাননের কোনও চেলা দাঁড়িয়ে। তাঁকে দেখছে।

রামজয়ের কী খেয়াল হল, হাত নেড়ে তাকে ডাকলেন।

পনেরো

ঘরে একটা কুপি জ্বলছিল। আলো যতই ম্লান হোক, এই গুহার মতন এক ঘরে, অন্ধকারে সেই আলোই যেন অনেক। শীতও প্রবল হয়ে আসছে। একে পৌষের শেষ দিন, তায় এই জঙ্গলের মতন জায়গা ; হিমে কুয়াশায় বাতাসে যেন কনকন করছিল চারপাশ।

রামজয় চুপ করে বসে ছিলেন। পরনে ধুতি, গায়ে চাদর। দুই-ই দশাননদের দেওয়া। বস্ত্র না নিয়ে উপায় ছিল না তাঁর। অন্ন তিনি নেননি, সামান্য ফল আর জল খেয়েছেন। ফলও নিতে ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিয়েছিলেন। গায়ে এখন তাপও অনুভব করছেন। হয়তো জ্বর বাড়ছে।

এখানে সন্ধে না রাত স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। কেমন করেই বা যাবে! অন্ধকার আর গাছপালার মিশকালো ছায়া ভিন্ন অন্য কিছু নজরেই আসে না।

রামজয় বাড়ির কথা ভাবছিলেন।

অন্যমনস্ক অবস্থাতেও তিনি পায়ের শব্দ পেলেন। তাকালেন।

তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। দশাননই। তবে এখন তার মুখে মুখোশ নেই। কালচে চাদরের পাগড়িতে মাথা ঢাকা, মুখও আড়াল করে রয়েছে। শুধু নাক আর চোখ দেখা যায়।

দশানন হাত কয়েক তফাতে দাঁড়িয়ে রামজয়কে দেখছিল। একেবারে চুপচাপ।

রামজয় দেখছিলেন, কুপির আলো এড়িয়ে অন্ধকারেই যেন দাঁড়িয়ে আছে দশানন।

শেষে দশাননই কথা বলল, "জমিদার আপনি, আমরা ডাকাত। আপনি অতিথি সেবায় যত যত্ন নেন, আমরা পারি না, বাবুমশাই। তবু আমরা আপনাকে অভুক্ত রাখতে চাইনি। আপনি নিজেই..."

"ডাকাতের হাতের অন্ন আমি খাই না।"

"আপনার যেমন ইচ্ছে। ফলটুকু খেয়েছেন..."

"তোমার যা বলার বলো, অন্য কথায় কাজ নেই।"

দশানন হয়তো হাসল। বোঝা গেল না। কালো কাপড়ের আড়াল! চোখ, নাক দেখা যায়, আর ঠোঁট। থুতনিও দেখা যাচ্ছে না। বলল, "আমার কাজের কথা অল্প।"

"বলো, শুনি।"

"দুশো মোহর, তিরিশ ভরি সোনা, একটি হিরে আর মাত্তর পঁচিশ হাজার টাকা আমার চাই।"

দশাননের স্পর্ধায় অবাক হয়ে গেলেন রামজয়। অতুলানন্দ যা বলেছে তা ঠিকই। লেনদেন করতে চায় ডাকাত সর্দার। কিন্তু দশাননের স্পর্ধায় অবাক হলেও তার কথায় যে নতুন করে অবাক হওয়ার কারণ নেই, আগেই তিনি জেনে ফেলেছেন, এখন তা বুঝতে দেওয়া যাবে না। অতুলানন্দ বলেছে, বল নয়, ছল আর কৌশল ভিন্ন উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব!

রামজয় অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, "দুশো মোহর, সোনা, টাকা—তুমি কী বলছ! মাথা ঠিক আছে তোমার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি সামান্যই চাইছি। কেন জানেন?"

"না। কেন?"

"আমার ক'জন লোক আপনাদের লেঠেলদের হাতে ধরা পড়েছে। বেশি না চেয়ে যা চাইছি তার সঙ্গে ওদেরও ছেড়ে দিতে হবে।"

ভেতরে-ভেতরে খুশি হলেন রামজয়। লেনদেনটা যে একতরফা হওয়ার উপায় নেই—এতেই তিনি খুশি।

"তোমার দলের ক'জন ধরা পড়েছে?"

"চারজন মেলায়, একজন জমিদারবাড়িতে।"

"এই পাঁচজনকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়াও অত মোহর, সোনা, টাকা!"

"বেশি চাইনি, জমিদারবাবু।"

"দুশো মোহরের দাম কত জানো?"

"সে আপনি জানবেন।"

"আমার বাড়িতে অত মোহর নেই।"

দশানন হাসল। হাসির গলায় বলল, "মনসাচরের জমিদারবাড়িতে দুশো মোহর, দু-তিনশো ভরি সোনা, হিরে-মুক্তো, টাকা নেই—এ-কথা আপনি আমায় বিশ্বাস করতে বলেন!"

রামজয় যেন কিছু ভাবলেন। বললেন, "তুমি কোন শর্তে এসব চাইছ?"

"আপনাকে আমরা মনসাচরে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

"ও! তোমাদের শর্ত তবে এই। আমাকে মুক্তি দিতে পারো মোহর সোনাদানার বদলে!"

"কথা আমার পরিষ্কার জমিদারবাবু !"

রামজয় সাবধান হওয়ার চেষ্টা করলেন। অতুলানন্দের মুখ ভাসছিল চোখের তলায়। চাতুরি ছাড়া পথ নেই।

"দশানন ডাকাত সর্দারের খুব নাম শুনেছি," রামজয় গলার স্বর হালকা করার চেষ্টা করলেন। বললেন, "তোমার বুদ্ধির আমি প্রশংসা করছি না।"

দশানন মাথা হেলিয়ে কথাটা স্বীকার করে নিল যেন, বলল, "আমি ডাকাত, পণ্ডিত নই। বিদ্যেবুদ্ধি কেমন করে হবে !"

"দশানন, একটা কথা জানো ! শ্লোকে বলে, খোঁড়া, অন্ধ আর বুড়ো—এই তিনকে নিয়ে তীর্থেও যেতে নেই। মানে কী জানো ! মানে সংসারেই বলো আর ধর্মেকর্মে বলো, এরা অচল। আমার মতন বুড়োকে তোমাদের কাছে আটকে রেখে লাভ হবে না। তুমি যা চাইছ তা পাবে না বলেই মনে হয়।"

"কেন ?"

"তোমার পণমুক্তির বহর দেখে ! দুশো মোহর, সোনাদানা, হিরে, টাকা—এ কি গাছ থেকে পড়বে !"

দশানন বলল, "বেশ, তবে আপনি যেমন আছেন থাকুন !"

"তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ !"

"না। জমিদারমশাইদের কে কবে ভয় দেখায় ! তাঁরাই অন্যকে ভয় দেখান।"

"আমি তেমন জমিদার নই।"

"আপনি হয়তো দয়ার অবতার। ও-কথা থাক ! আমার শর্ত মানলে আপনি মুক্তি পাবেন। না মানলে..."

"আমায় মারবে !"

দশানন ব্যঙ্গ করে বলল, "আমরা নরবলি দিই না।" বলে চলে যাচ্ছিল সে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। "মনসাচরে যা ক্ষতি হয়েছে সে শুধু আপনার জেদের জন্যে। আমরা সংক্রান্তির মেলা নষ্ট করতাম না, একটি মানুষের গায়েও হাত দিতাম না, শুধু জমিদারবাড়িতে ডাকাতি হত। আপনি..."

রামজয় বললেন, "কী করতে সেটা বড় কথা নয়, কী করেছ ভেবে দ্যাখো।...আচ্ছা, ধরো, আমি যদি তোমার শর্ত মেনেই নিই— তবু তুমি কেমন করে মোহর আর টাকার থলি পাবে ?"

দশানন বলল, "আমার লোক আছে ; আপনার চিঠি নিয়ে জমিদারবাড়ি যাবে।"

"তোমার লোক ! তারপর সে যদি ধরা পড়ে !"

"সে-ভাবনা আমার। আপনি ভেবে দেখুন কী করবেন !" দশানন আর দাঁড়াল না, চলে গেল।

রামজয় আবার একা।

কুপির আলো একই ভাবে জ্বলছে বলে মনে হল না। আলো সামান্য কমে এসেছে। তেল ফুরিয়ে গেলে অন্ধকারও হয়ে যেতে পারে। তার অবশ্য দেরি

আছে। শীতটাও বাড়ছিল। কম্বলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলেন রামজয়। তিনি অনেক ভেবেছেন, কিন্তু বুঝতে পারছেন না, কীভাবে দশাননের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াইয়ে এঁটে উঠবেন! তবে তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা, দশাননও খানিকটা বিপদে পড়েছে। বিপদে পড়েছে তার ধরা-পড়া সঙ্গীসাথীদের জন্য। মনসাচরের লোক তো তাদের ছেড়ে দেবে না। কেউ যদি সদরে গিয়ে ঘোড়া-দারোগাকে খবর দিয়ে আসে, তবে তো ওগুলোর কোমরে দড়ি পড়বে। টানতে-টানতে নিয়ে যাবে ফাঁড়িতে। তারপর মারের চোটে কত খবর বেরিয়ে আসবে দশাননের দলের। দশাননকে পালাতে হবে। এখানে আর থাকতে পারবে না।

বাড়ির কথাই আবার মনে পড়ল। বিরজা অন্নজল ত্যাগ করেছেন। ছেলেমেয়ে বাবার প্রত্যাশায় বসে আছে, কান্নাকাটি করছে। জমিদারবাড়িতে সবাই উদ্বেগ নিয়ে সময় কাটাচ্ছে। কেউ জানে না, কী করতে হবে!

আর পাঞ্জালি? সে-ই বা কী করছে? তার বুদ্ধির ওপর ভরসা রাখেন রামজয়, কিন্তু এমন অবস্থায় পাঞ্জালিই বা কী করবে! তবু সে ভরসা। আর অতুলানন্দ।

অনেকটা সময় কাটল। হাঁটুতে মুখ গুঁজে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বসে ছিলেন রামজয়। পায়ের শব্দে মুখ তুললেন।

কালো চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে অতুলানন্দ সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

"অতুলানন্দ!"

"জোরে কথা বলবেন না।"

"কাছাকাছি কেউ আছে?"

"না। ওরা পুজোয় ব্যস্ত।"

"পুজো!"

"ডাকাত-কালী!"

"সে আবার কী?"

"ওরা করে। পাঁজিপুঁথি দিনক্ষণের দরকার করে না। খুশিমতন করতে পারে। এ তো ওদের ঘরের পুজো।"

"কী খবর! পেয়েছ কিছু?"

অতুলানন্দ যতটা পেরেছে খবর জোগাড় করে এসেছে। পাঞ্জালির সঙ্গেও দেখা হয়েছে তার। জমিদারবাড়ির অন্দরমহলে ঢুকতেই পারেনি দশাননের দল। কাছারিবাড়ির কাছ থেকেই পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। অন্দরমহলের সবাই নিরাপদে আছে।

"মেলা?"

"মেলায় ক্ষতি হয়েছে। তবু আজ সকালে মকর স্নান সেরেছে সকলে।"

"আর?"

"পাঞ্জালিরাও অনুমান করেছে আপনাকে দশাননরা সাতঘরির জঙ্গলে এনে আটকে রেখেছে।"

"কে বলল ওকে?"

"ভট্টমশাই আন্দাজ করে বলেছেন। উনি রানিমায়ের কাছেও যাবেন।"

রামজয় অনেকটা স্বস্তি বোধ করলেন।

"রায়মশাই, দশানন এসেছিল ?" অতুলানন্দ জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ।"

"কী বলল ?"

"তুমি ঠিক কথাই বলেছিলে অতুলানন্দ। ও লেনদেন করতে চায়।" বলে রামজয় শর্তের কথা বললেন।

"আপনি কী বলেছেন ?"

"বলিনি কিছু। ও আমাকে সময় দিয়ে গিয়েছে ভাববার।"

"ভাবলেন ?"

"না, ভাবছি। দশাননের শর্ত মানার চেয়ে আমার মরে যাওয়া ভাল। একটা ডাকাত আমাকে চোখ রাঙাচ্ছে, ঠাট্টা করে কথা বলছে আমার সঙ্গে ! কতদূর স্পর্ধা তার। কিন্তু কী করব ! আমার কাছে যে কিছুই নেই অতুলানন্দ। আমার কাছে যে অস্ত্র ছিল তাও ওরা..."

"অস্ত্র আমি এনেছি।"

"তুমি !" রামজয় অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন অতুলানন্দের দিকে।

"অস্ত্র আপনাকে আমি দেব। তবে রায়মশাই এক অস্ত্রে একটা দলকে তো আপনি শায়েস্তা করতে পারবেন না। অস্ত্রটা আপনি রেখে দেবেন, প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হতে পারে। আমি বলছি, দশাননকে আপনি বলুন, তার শর্তে আপনি রাজি। তবে দরাদরি করুন। আমাদের একটা দিন সময় দরকার।"

"একটা দিন—কেন ?"

"আমরা অনেকটা তৈরি। কাল সন্ধে পর্যন্ত আটকে রাখুন দশাননকে। তারপর তার মুখোমুখি হওয়া যাবে। দিনের বেলায় সেটা সম্ভব নয়। ওদের লোক নজর রেখে বসে আছে। আমরা ধরা পড়ে যাব। ধরা পড়ে গেলে আপনার বিপদ বাড়বে বই কমবে না। আমরা কাল আসছি।"

"তোমরা মানে ?"

"আপনার লেঠেলরা। মাধব সর্দার আর তার দল। পাঞ্জালি।"

"তোমরা এই জঙ্গলের আড্ডা ঘিরে ফেলবে ?"

"আজ্ঞে। ...আমি যাই।"

অতুলানন্দ যাওয়ার আগে চাদরের ভেতর থেকে গাদা-পিস্তল বার করে রামজয়কে দিল।

"জানেন তো ?"

"বন্দুক জানি।"

"এ বন্দুক নয়। দুটি মাত্তর টোটা আছে। আপনি টোটা দুটো কোথাও লুকিয়ে রাখুন।"

রামজয় পিস্তল আর টোটা নিলেন।

ষোলো

আগের দিন রামজয় যতটা হতাশ ও বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন পরে আর তেমন মনমরা হয়ে থাকলেন না। বরং তাঁর মনে হল, অতুলানন্দ যা বলেছে—তা যদি ঠিক-ঠিক করে উঠতে পারে ওরা—অতুলানন্দ, মাধব সর্দারের দলবল, পাঞ্জালি—তবে দশানন এবার একটা লড়াই দেখতে পাবে। সে এতকাল একতরফা অন্যের ওপর হামলা চালিয়েছে আচমকা, লুঠপাট করেছে—এবার উলটো ব্যাপার। ডাকাতের দলের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়বে সাধারণ মানুষ।

সকালেই একবার দশাননকে ডেকে পাঠাবার কথা ভেবেছিলেন রামজয়। তাঁর ডাক পেলে দশানন ভাববে, জমিদার রামজয় তবে ভয় পেয়ে গিয়েছেন, নিজের মুক্তির জন্য তিনি দশাননের শর্তগুলো মেনে নিতে রাজি হয়েছেন।

রামজয় অবশ্য দশাননকে ডেকে পাঠালেন না। কারণ, দিনের বেলায় সে আসবে না, মুখ দেখাবে না তার। তা ছাড়া, রাতারাতি মত পালটে তাকে ডেকে পাঠালে সেও সন্দেহ করতে পারে। বুদ্ধিতে সে কম যায় না। আর এটাই বা কেমন কথা—রামজয়ের মতন এক জমিদার, যার এত নাম যশ, সাহসী মানুষ হিসেবে খ্যাতি—তিনি এত সহজে নুয়ে পড়লেন ডাকাতের ধমকানির কাছে। না, না, সেটা অসম্ভব। যাক না একটা বেলা কেটে, দুপুর বিকেল গড়িয়ে যাক, সন্ধে হোক—দশানন নিজেই আসবে তাঁর কাছে। সময় তো রামজয়েরও দরকার। অতুলানন্দ বারবার বলে গিয়েছে, একটা দিন অন্তত আপনি আমাদের সময় দিন।

শীতের সকাল দেখতে-দেখতে কেটে গেল। নিজের গণ্ডির বাইরে পা বাড়ালেন না রামজয়। স্নানও করলেন না, গায়ে তাপ রয়েছে। জল আর ফল ছাড়া কিছু খেলেন না। দুপুর গড়াল। বিকেল। তারপর ঝপ করে সন্ধে। বাইরে অন্ধকার।

একজন এসে কুপি জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিল। রামজয় গায়ে কম্বল জড়িয়ে বসে ছিলেন। গাদা পিস্তল আর দিশি টোটা দুটো তিনি লুকিয়েই রেখেছেন। কারও নজরে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

একসময় দশানন এল। আগের দিনের মতনই মাথার পাগড়ির বাড়তি কাপড়ে মুখ আড়াল করা।

দশানন ভদ্রতায় কম যায় না। জোড় হাতে নমস্কার জানাল রামজয়কে। হাসল। রামজয়ের মনে হল, ভদ্রতা নয় উপহাস করল বুঝি দশানন।

"আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে, জমিদারবাবু," দশানন বলল, "এভাবে কি আপনি থাকতে পারেন! আমাদের অন্ন খাবেন না, আপনাকে ভাল করে শুতে দেব—সে-ব্যবস্থাও নেই। গায়ে আপনার ওই একটিই জামা। এত কষ্ট সহ্য করে লাভ কীসের! ভাবলেন কিছু?"

রামজয় সারাদিনই ভেবেছেন। ফন্দিও এঁটেছেন। দশাননকে কি সেই ফাঁদে

ফেলতে পারবেন ?

রামজয় যেন অনেকটা নরম হয়েছেন, নিমরাজি—এমন গলায় বললেন, "ভেবেছি।"

"কী ভাবলেন ?"

"তুমি যা চাইছ অত দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।"

দশানন হেসে উঠল।

"হাসছ কেন ?"

"আপনি দরদাম করতে চাইছেন, জমিদারবাবু !"

"না। ... তুমি একটা কথা জানো না।"

"কী ?"

"দুশো মোহর, কিছু সোনাদানা হয়তো আমার বাড়িতে আছে। কিন্তু আর যা—তার খবর আমি ছাড়া অন্য কেউ রাখে না।"

"গুপ্তধন !"

"তা বলতে পারো। তুমি কোথায় কী খবর পেয়েছ আমি জানি না। তবে আমি তোমায় বলছি, আমাদের গচ্ছিত অর্থ, অলঙ্কার, দামি পাথরটাথর এমন ঘরে রাখা আছে—যার হদিস কেউ জানে না, আমি ছাড়া। সেই ঘরের দরজা এমন করে বন্ধ করার ব্যবস্থা আছে যে না-জানলে খোলা যায় না। ঘরের চাবিও আমি সরিয়ে রাখি। কাজেই তুমি যা চাইছ—তার সব তোমায় দেওয়া মুশকিল। কে দেবে ?"

"রানিমা দেবেন।"

"উনি গুপ্তধনের কথা শুনেছেন, তার বেশি কিছু জানেন না। ওই ঘর উনি খুলতে পারবেন না, চাবির হদিসও জানেন না।"

দশানন কী ভাবল। বলল, "উনি কী পারবেন ?"

"কেমন করে বলব ! বাক্সে সিন্দুকে যা পাবেন—দিতে পারবেন। তুমি যা চাইছ অত হবে বলে মনে হয় না। রাতারাতি বিশ পঁচিশ হাজার নগদ টাকাই বা কেমন করে জোগাড় হবে ! ... তা তুমি এসব পাবে কেমন করে ?"

"আপনি চিঠি লিখে দেবেন। রানিমাকে। কালই আমি বলেছি ..."

"তুমি নিজে সেই চিঠি নিয়ে যাবে না নিশ্চয়।"

"আমার লোক আছে।"

"বাইরের লোক অন্দরমহলে ঢুকতে পায় না, তুমি জানো না ?"

"সে চিন্তা আমার।"

রামজয় সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "বেশ। আমি না হয় চিঠি লিখে দিলাম। কিন্তু তুমি আমায় ছেড়ে দেবে কখন ?"

"আমার পাওনাগণ্ডা পাওয়ার পর, আর আমার লোকদের ফেরত পেলে ..."

"না।"

"না !"

"শোনো দশানন, আমি একবার নিজের বোকামির জন্যে তোমার হাতে ধরা পড়েছি। আর বোকামি করব না। আমার শর্ত হল, চিঠি তুমি পাবে, কিন্তু চিঠি নিয়ে তুমি যাকেই পাঠাও তার সঙ্গে আমায় মনসাচরের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আমি তোমায় বিশ্বাস করি না।"

দশানন চুপ। মনে হল তার সম্ভ্রমে লেগেছে। অপমান বোধ করেছে ভীষণ। বলল, "দশানন তার কথার দাম রাখে। আপনি আমায় চেনেন না বোধ হয়। আমি ইচ্ছে করলে আপনাকে সারাজীবনের মতন আটকে রাখতে পারি বললে বাড়াবাড়ি শোনাবে, জমিদারমশাই। তবে মাস কয়েক আটকে রাখতে পারতাম। সে-ক্ষমতা আমার আছে।"

রামজয় সতর্ক হয়ে গেলেন। হঠাৎ তাঁর কী মনে হল, বললেন, "একটা কথা বলো আমায় ! বলবে ?"

"বলুন।"

"এই মোহর, সোনাদানা, টাকা নিয়ে তুমি কী করবে ?"

"কী করব ! ... শুনে আপনার লাভ !"

"তবু শুনি।"

"আমারও প্রজা আছে।"

রামজয় অবাক ! বলে কী দশানন ! ডাকাতের প্রজা ! "তুমি কী বলছ ? তোমার প্রজা ! ডাকাতের আবার প্রজা !"

দশানন ব্যঙ্গ করেই যেন বলল, "আপনি জমিদার, রাজা মানুষ; আপনার প্রজা থাকতে পারে। আমার পারে না ?"

রামজয় কেমন হতভম্ব।

দশানন বলল, "আপনার প্রজাদের খাজনা দিতে হয় হুজুর, আপনাকে —জমিদারমশাইকে। আমার বেলায় উলটো। আমাকেই খাজনা দিতে হয় প্রজাদের। তারা আমায় কিছু দেয় না। আমাকেই দিতে হয়।"

অবিশ্বাসের ঝোঁকে মাথা নাড়লেন রামজয়। "তুমি কী বলছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি ডাকাত, তোমার দল আছে, তারা দুর্ধর্ষ ; তোমরা লুঠপাট ডাকাতি করো, মানুষ মারো, গরিব মানুষের ভিটেমাটি ঘরদোর পোড়াও, তোমাদের আবার প্রজা থাকে কেমন করে ?"

দশানন হাসল। বলল, "যা রটে তাই কি সত্যি হয়, জমিদারবাবু ! লুঠ আমরা করি, দুর্নাম আমাদের আছে, আমরা পাপীতাপী—তবে সজ্ঞানে মানুষ খুন হয়নি আমাদের হাতে। মাথা ফেটেছে, হাত-পা ভেঙেছে—ঠিকই, তবে সে তো সামনাসামনি লড়াইয়ের সময়। আপনি বললেন, আমরা গরিব মানুষের ঘরদোর পোড়াই। এটা ঠিক কথা নয়। ইচ্ছে করে আমরা এমন কাজ করিনি। ভুলের বশে অন্যায় হয়েছে। ... আপনাকে আমি আগেই বলেছি, মনসাচরে যা ঘটেছে তার জন্যে দায়ী আপনি। জমিদারবাড়ি লুঠ করা ছাড়া আমাদের অন্য উদ্দেশ্য ছিল না। তালেগোলে অনেক ক্ষতি হল।"

রামজয় চুপ। ভাবছিলেন। দশানন কি তাঁর সঙ্গে চালাকির খেলা খেলছে! লোকটা কথা বলতে জানে। কিন্তু ওকে বিশ্বাস করার কারণ নেই। তবু কোথায় যেন একটা খোঁচা লাগল রামজয়ের।

"দশানন ?"

"বলুন।"

"তুমি যদি এতই ভাল হও—তবে তোমার নামে এমন দুর্নাম রটল কেন ?"

"ভাল বলবেন না। আমরা মন্দ। কপালে কেউ রাজা হয়, জমিদার হয়—আবার ভিখিরিও হয়। আমার কপালে ছিল ডাকাত হব। হয়েছি। ডাকাতি আমার পেশা। তবে বাবুমশাই, এক ফোঁটা দুর্নামকে বিশ ফোঁটা করতে মানুষের অভাব হয়। ওসব কথা বাদ দিন। কাজের কথা বলুন। চিঠি আপনি লিখে দেবেন ?"

"দেব। তবে আমার শর্ত মেনে।"

"তাই হবে।" দশানন চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। "কাল সকালে আপনি কাগজ কালি কলম পাবেন।"

"শোনো।"

"আজ্ঞে বলুন।"

"তুমি যদি আমায় বিশ্বাস করো তবে আমি বলব, তুমি আমার সঙ্গে চলো। তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। আমি তোমায় দুশো মোহর, তিরিশ ভরি সোনা, পঁচিশ হাজার টাকা নগদ আর একটা হিরে দেব। তোমার লোকরাও ছাড়া পাবে।"

দশানন বলল, "আপনি আমায় নিয়ে যাবেন কেন ?"

"যেতে ভরসা পাচ্ছ না ?"

"প্রয়োজন দেখছি না।"

"তুমি আমার সঙ্গে গেলে হয়তো আরও বেশি পেতে।"

"না।" দশানন আর দাঁড়াল না। চলে গেল।

রামজয় বসে থাকলেন। তাঁর অবাক লাগছিল। দশানন সম্পর্কে যত কথা শুনেছেন সব কি ভুল! শুধু রটনা! না, লোকটা তাঁকে কথার জালে জড়িয়ে ধন্ধে ফেলে গেল!

বসে থাকতে পারলেন না রামজয়। গুহার মতন সেই ঘরে খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন। আবার বসে পড়লেন।

রাত বাড়তে লাগল।

ঠিক খেয়াল হয়নি রামজয়ের, ভাঙা দরজা নিঃশব্দে ফাঁক করে কে যেন এল।

চমকে উঠলেন রামজয়।

"আমি!"

"অতুলানন্দ!"

"আমরা কাল এসে পড়ব। আজ অসুবিধে হল।"

"কাল কখন ?"

"সন্ধের ঘোরেই।"

"তোমরা কত জন ?"

"পঁচিশ।"

"এরা কত জন আছে ?"

"সঠিক জানি না। বিশ-পঁচিশ জন তো বটেই।"

"দশানন কাল সকালে চিঠি লিখিয়ে নেবে, রানির নামে। তার লোক যাবে জমিদারবাড়িতে। আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবে—মনসাচরে। নদী পর্যন্ত। ওর পাওনাগণ্ডা বুঝে পাওয়ার পর—ওর দলের যে পাঁচজন ধরা পড়েছে—তাদের নিয়ে লোকটা ফিরে এলে আমাকে ওরা ছেড়ে দেবে।"

"আপনি ওর শর্তে রাজি হয়েছেন ?"

"হয়েছি।"

"আপনাকে ছেড়ে দিলেও কাল দশানন বাঁচবে না।"

"কেন ?"

"কাল এই সাতঘরির জঙ্গলে দশাননের চিতা জ্বালাব।"

"কেন ? সে তো আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে।"

"আগে দিক। দিলেও ওর আর বাঁচবার পথ নেই। কাল দশাননকে আমি ছাড়ব না, রায়মশাই। প্রতিজ্ঞা আমি রাখব।"

রামজয় হঠাৎ বললেন, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। দশানন আমায় অবাক করল। তুমিও করছ ? তুমি কে অতুলানন্দ ? কে তুমি ?"

অতুলানন্দ কোনও জবাব দিল না। দরজার ফাঁক দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সতেরো

দশানন নিজে আসেনি, লোক দিয়ে কাগজ, কালি, কলম পাঠিয়ে দিয়েছিল। ভুসো কালি, পালকের কলম, বালি কাগজ। রামজয় চিঠি লেখার আগে ভাবলেন কিছুক্ষণ। বিরজা পড়তে পারে, রামজয়ই তাকে শিখিয়েছিলেন। সাদাসিধে লেখা পড়ে তার মানে বোঝা বিরজার পক্ষে কঠিন নয়। জটিল হলে ছেলেকে দিয়ে পড়িয়ে বুঝে নিতে হবে।

দু' ভাবেই চিঠি লেখা যায় : সোজাসুজি সিধে কথায়, আবার ঘুরিয়েও লেখা যায়। সোজাসুজি লিখলে দশাননের লোক, ডাকাত সর্দারের দাবি মতন মোহর, টাকা, সোনাদানা পাবে। কিছু কম হতে পারে হয়তো, অন্তত নগদ টাকা। তাতে অবশ্য গোলমাল হবে না, কেননা রামজয় আগেই দশাননকে সে-কথা বলে রেখেছেন।

কিন্তু রামজয় যদি ঘুরিয়ে লেখেন, দশাননকে হতাশ হতে হবে। কিছুই সে

পাবে না, উলটে তার লোক ধরা পড়বে, তারপর জমিদারবাড়ি থেকে যে যেখানে আছে তাদের রাজাবাবুকে উদ্ধারের জন্য ছুটে আসবে নদীর দিকে।

না, রামজয় তেমন কাজ করবেন না। তিনি যখন শেষপর্যন্ত দশাননের দাবি আর শর্ত মেনে নিয়েছেন, তখন বিরজাকে সরাসরিই চিঠি লিখবেন, শঠতা করবেন না।

রামজয় চিঠিটা লিখে ফেললেন একসময়ে।

চিঠি লেখার পর তাঁর হঠাৎ মনে হল, এই ডাকাতের দলে লেখাপড়া জানা লোক আছে নাকি ? তা যদি না থাকে, তবে রামজয় কী লিখলেন বুঝবে কেমন করে ? ধোঁকার চিঠিও তো হতে পারে !

একটা ব্যাপারে রামজয় নিজেই বেশ ধোঁকা খেয়েছেন। এখনও তাঁর স্পষ্ট কোনও ধারণাই হচ্ছে না। দশানন সম্পর্কে যা শুনেছিলেন তিনি, তা মিলছে না অনেক জায়গায়। লোকটা অহঙ্কারী, চতুর হতে পারে, তবে রামজয়ের সঙ্গে ব্যবহারে সে ইতর, অশালীন হয়নি। তাকে রুক্ষ, নিষ্ঠুর হতেও দেখেননি রামজয়। এমনকী কথাবার্তাতেও দশাননকে নিরেট, মূর্খ, নির্বোধ মনে হয়নি। সে কথা বলতে পারে, দাম্ভিক অবশ্যই, তবে অভব্য নয়।

রামজয়ের মনে হল, তিনি ভুল ভাবছেন। চিঠি যে লিখিয়ে নেয় সে নিজে না হোক তার দলে চিঠি পড়ার লোক আছে। চিঠি না পড়ে, কী লেখা আছে না জেনে ওই চিঠি নিয়ে কেউ জমিদারবাড়িতে যাবে না।

দুপুর হয়ে এল। আজও রামজয় অন্নগ্রহণ করলেন না ডাকাতদের। ফল, জল খেলেন।

আজ বড় শীত। মাঘের শুরু বলে নয়, এমনিতেই সকাল থেকে উত্তরের বাতাস দিচ্ছে দমকা মেরে। রোদ যতই কেননা উজ্জ্বল দেখাক তার তাপ যেন ফুটে উঠতে পারছে না। এত গাছপালা অনবরত হাওয়ার দাপটে কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। কত না পাখি এখানে, চাই কি শীতের দুপুরে প্রজাপতিও নেচে যাচ্ছে ঝোপেঝাড়ে।

দুপুর কেটে গেল হুস করে। বিকেল এল আর গেল, যেন চোখের পাতা খুলল, আবার বুজে গেল।

বিকেল ফুরোবার সঙ্গে-সঙ্গে দশাননের লোক এসে হাজির। এবার যেতে হবে।

সেই বড় ছই দেওয়া নৌকো বজরার মতন। দশাননের নৌকো। তার পাশে-পাশে এক ছিপ নৌকো।

নৌকো ভাসল নদীতে। বিকেল তখন মরে গিয়েছে। ঝাপসা হয়ে আসছে চারপাশ।

নৌকোর বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন রামজয়। পরনে সেই পুরনো পোশাক। রামজয় তাঁর পোশাক বদলাবার সময় অতুলানন্দের দেওয়া গাদা পিস্তল লুকিয়ে

কোমরে গুঁজে নিয়েছেন। একটা গুলিও ভরা আছে। অন্যটা পকেটে।

বাড়ির পথেই চলেছেন রামজয়।

যেতে-যেতে তাঁর মনে হল, অতুলানন্দের কথা যদি ঠিক হয়— তবে তাদেরও এতক্ষণে সাতঘরির জঙ্গলের আশেপাশে পৌঁছে যাওয়ার কথা। দলটার কোনও অস্তিত্ব অবশ্য নজরে আসছিল না। ওরা কীভাবে এখানে আসছে কে জানে! নৌকায় এলে কি চোখে পড়ত না! তবে এখানে জঙ্গল এমন ঘন, নদীর আঁকবাঁক, ভাঙাচোরা পাড় এত ভেতরে-বাইরে যে, সমস্ত কিছু চোখেই পড়ে না। লুকিয়ে থাকা আশ্চর্যের নয়।

দশানন ছইয়ের মধ্যে ছিল, বেরিয়ে এল। মুখে মুখোশ।

রামজয় দেখলেন। কী মনে হল, হাসলেন। বললেন, "আবার মুখোশ কেন হে! তোমারই তো জয় হল।"

দশানন বলল, "আপনি যা মনে করেন।"

"চিঠি পড়েছ ?"

"দেখেছি।"

"ঠিক আছে ? না, ভুল আছে কোথাও ?"

"না, মোহর কম হল পঞ্চাশ, নগদ সম্বন্ধে..."

"নগদ তো রানির হাতবাক্সে বেশি থাকে না দশানন! আমার ঘরের দেয়াল-সিন্দুকেও নয়। নগদ কত আছে জানতে হলে কাছারি বাড়িতে গিয়ে নায়েব গোমস্তা ডাকতে হত। সেটা এক্ষেত্রে ভাল হত না।"

"তা বলতে পারেন।"

সামান্য চুপচাপ।

রামজয় হঠাৎ বললেন, "দশানন, আমায় একটা কথা বলবে ?"

"বলুন।"

"তুমি কাল বলছিলে—তোমারও প্রজা আছে। তারা খাজনা দেয় না, উলটে তোমাকেই খাজনা দিতে হয় তাদের। বলছিলে না!"

"হ্যাঁ।"

"এরা কেমন প্রজা ?"

দশানন চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। শেষে বলল, "জেনে কী করবেন!"

"শুনি ?"

দশানন বলল, "এরা বনের মানুষ। এদের কোঠাবাড়ি নেই। খড়ের চালাও নয়। পাতার ছাউনি, কাঠকুটোর খোঁটা এদের আশ্রয়। এদের চাষের জমি নেই, যে জমি আছে হুজুরমশাই, তাতে কাঁকর আর নুড়ি। যব, গম ফলানো যায় না। দুটো পেঁপে, দুটো মকাই হয়তো। ন্যাংটানোংটা মানুষ এরা, বছরে আট মাস শুঁড়ি গাছের বীজ খেয়ে কাটায়। ওদের ঘরে বাতি জ্বলে না। বড়জোর এক-আধ দিন রেড়ির কুপি।"

রামজয় অবাক হয়ে বললেন, "এরা কারা ?"

"লোকে বলে কোল, ভিল, আরও কত কী ! আমি বলি জঙ্গলের মানুষ। তা বলে জন্তু-জানোয়ার নয়, মানুষ।"

"তুমি কি বাড়িয়ে বলছ না, দশানন ? সাঁওতাল তো আমিও দেখেছি। আমাদের মনসাচরেই আছে।"

"বাড়িয়ে বলছি না জমিদারবাবু ! কথার টানে দুটো মাত্রা বেশি হচ্ছে হয়তো। আমি ঠিকই বলছি।"

"তুমি এদের অন্ন জোগাও ?"

"অন্ন জোগাবার মালিক বিধাতা। আমি কে ? আমি শুধু এদের ক'টা দিন বাঁচার মতন ব্যবস্থা করার চেষ্টা করি। আপনি ভাবছেন— এরা কত জন যে, আমায় বারবার ডাকাতি করতে বেরোতে হয় ! না মশাই, বারবার বেরোই না। একবার বেরোই বছরে। গরমে, বর্ষায় দলে লোক জোটাতে পারি না। যাদের জোটাই তাদেরও বখরা দিতে হয়। টাকা, পয়সা, ধান, চাল সবই !"

"ও !" রামজয় যেন কী ভাবছিলেন। অন্ধকারও হয়ে এল। আর খানিকটা পরে কুয়াশা নামবে। বললেন, "দশানন, তোমার জমিদারির এলাকা কতটা ?"

"কম নয়। মানভূম, ধলভূম থেকে এদিককার পালামোর জঙ্গল..."

"বিস্তর এলাকা বটে !" রামজয় হাসলেন।

তারপর চুপচাপ। দু'জনেই। নৌকো চলেছে। সাতঘরির জঙ্গল পেছনে পড়ে গিয়েছে, ছায়ার মতন দেখাচ্ছে এখন। নৌকো যেভাবে চলছে তাতে মনসাচরে পৌঁছতে আর বড়জোর ঘণ্টাখানেক। শনশনে হাওয়ায় সন্ধের মুখে শীত ধরে যাচ্ছিল রামজয়ের। শরীরটাও যে ভাল নেই। গায়ে জ্বর ছিল কাল, আজ তাপ নেই, অবসাদ রয়েছে।

"তোমার দেশবাড়ি কোথায় দশানন ?" রামজয় বললেন।

"দেশবাড়ি ! দেশবাড়ি সর্বত্র।"

"তা হয় না। কোথাও-না-কোথাও তুমি জন্মেছ, বড় হয়েছ, ভিটেমাটি ছিল তোমাদের। সেখানেই তোমার দেশবাড়ি।"

দশানন জবাব দিল না প্রথমে। পরে বলল, "আমি অত জানি না। যার ঘরে মানুষ হয়েছি সে তাঁত বুনত। গামছা, লুগা বুনে হাটে বিক্রি করত। আমার বাপ বলে তাকেই জানি। জঙ্গলের ধার ঘেঁষে মানুষ। শুকনো মহুয়া পাতার আগুন জ্বেলে শীত কাটাতাম। বর্ষায় আমাদের কুঁড়ের মাথা ভিজে চুপসে থাকত। মাছ ধরতাম নদীতে, পাখপাখালি ধরতাম। বাপ গেল, মাইয়া গেল। আমি রাজা।"

"রাজা !" রামজয় হাসলেন। তাঁর ভাল লাগছিল দশাননের কথা শুনতে।

"সিংহাসনে বসে যে রাজা হয় সে পাঁচ বাঁধনে বাঁধা থাকে মশাই। সে দাস। তার দোষ দশ, গুণ একটি-দুটি। আমার মতন যে রাজা হয়—তার সিংহাসন থাকে না, সে মাটির ঢিবিতে বসে হাঁক মারে, তার চেলাচামুণ্ডা ছুটে আসে রে-রে করে..." দশানন হাসতে লাগল।

রামজয়ও হাসলেন। অবাক হচ্ছিলেন আরও। এমন করে যে কথা বলে সে

কিছুতেই মূর্খ, নির্বোধ নয়। বললেন, "দশানন, তুমি এত কথা শিখলে কেমন করে ! এখানে পাঠশালায় পড়েছ, না কেউ তোমায় শিখিয়েছে ?

দশানন বলল, "আমার গুরু আমার বাপ, সে তাঁত বুনত। পরে এক সন্ন্যাসী ঠাকুর আমায় কানে-কানে মন্ত্র দিতেন। তিনি বলতেন, 'তোরা বনের শুকনো পাতা, কাঠকুটো কুড়িয়ে বেঁচে থাকবি নাকি ! যা বেটা, রুখে দাঁড়া।' আমরা তাঁকে সামনে রেখে রুখে দাঁড়ালাম। সেপাইদের সঙ্গে গণ্ডগোল লেগে গেল পাকুড়ের কাছে। উনি মারা গেলেন। আমি দলের রাজা হয়ে বসে আছি।"

দশানন এমন করে বলল, যেন তামাশা করছে নিজের সঙ্গে। হাসতে লাগল।

রামজয় আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর চারপাশে। সবই স্তব্ধ। শুধু জলের শব্দ।

নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হল রামজয়ের। তিনি জানেন, আজ এতক্ষণে অতুলানন্দ আর মাধব সর্দাররা দশাননের সাতঘরির আস্তানা ঘিরে ফেলেছে। দশানন জানে না। সে পরম নিশ্চিন্তে রামজয়ের সঙ্গে গল্প করতে-করতে চলেছে নৌকোয়। মনসাচরের জমিদারকে সে পৌঁছে দিতেই যাচ্ছে নিজের জমিদারিতে। তবে কয়েকটা শর্তে। শর্ত—মানে সে শুধু অর্থ চায়— সোনায়, নগদে, অলঙ্কারে। দশাননের দাবি মেটাতে রামজয়ও আর অরাজি নন। তবে কেন অতুলানন্দরা সাতঘরির জঙ্গল ঘেরাও করবে ! রামজয় কাল কথাটা বলার চেষ্টাও করেছেন অতুলানন্দকে।

"দশানন ?"

"আপনি ভেতরে গিয়ে বসুন। ঠাণ্ডা বাড়ছে।"

"তোমায় একটা কথা বলব ?"

"বলুন !"

"তোমাদের ডেরা কি নিরাপদ ?"

দশানন হাসল। "আমরা চোখ খোলা রেখে কাজ করি।"

ইঙ্গিতটা বুঝলেন রামজয়। বললেন, "লড়াইয়ে হার-জিত আছে। তুমি বরাবর জিতবে তা তো হয় না ! স্বয়ং দশানন রাবণেরও শেষে হার হয়েছিল।"

"সে অন্যায় করেছিল। একটা নয়, অনেক। আমি মশাই অন্যায় করিনি। ডাকাতি আমার পেশা। আমি জমিদারবাড়ি লুঠ করতে চেয়েছিলাম। অন্য কোনও ক্ষতি নয়। যা হয়েছে, তার..."

দশাননের কথা শেষ হওয়ার আগেই রামজয় বললেন, "শোনো, যা হয়েছে তার কথা আমি ভুলে যাচ্ছি। তুমিও ভুলে যাও। তুমি আমার সঙ্গে আমার জমিদারবাড়িতে চলো। যা চেয়েছ তার দু'গুণ বেশি দেব আমি তোমায়। আমি কথা দিচ্ছি। তোমার গায়ে কেউ আঁচড় কাটবে না। আমি তোমার সঙ্গে থাকব।"

দশানন বলল, "আমি নিজে কোথাও ভিক্ষে চাইতে যাই না, লুঠ করতেও নয়।" তার গলার স্বর কঠিন।

রামজয় সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "তুমি আমায় বিশ্বাস করলে না ?" বলতে-বলতে তিনি ছইয়ের ভেতরে চলে গেলেন।

আঠারো

রাত বাড়ছিল। নদীর চরে দুটি মাত্র নৌকো। একটি দশাননের। অন্যটি তার দুই চেলার। দশাননের নৌকো বড়, চর থেকে সামান্য দূরে সরে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যটা ছিপ নৌকো। চর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

রামজয় ছইয়ের মধ্যে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর উদ্বেগ বাড়ছিল। দশানন যাকে পাঠিয়েছে জমিদারবাড়িতে তাকে তিনি দেখেছেন কয়েক পলক। তাঁকে দেখানো হয়েছে, দশাননই দেখিয়েছে। লোকটাকে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে, ও ডাকাতদলের লোক। বোষ্টম বৈরাগীর বেশ তার। মাথায় পাগড়ি। গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা। চিঠি নিয়ে সেই লোকটা গিয়েছে জমিদারবাড়ি। তার পিছু পিছু একজনকে দেওয়া হয়েছে সঙ্গী হিসেবে। তবে সে জমিদারবাড়ি ঢুকবে না, তার কাজ আপদ-বিপদ বুঝলে লোকটাকে বাঁচাবে কিংবা তাকে নিয়ে পালিয়ে আসবে।

রাত যত বাড়ছিল রামজয়ের ততই উৎকণ্ঠা হচ্ছিল। জমিদারবাড়িতে কি লোকটাকে আটকানো হল ? বিরজার কাছে যেতে দেওয়া হয়নি ? তাকে কি ধরে ফেলেছে দেউড়িতে দরোয়ানরা ! নাকি, রানি রামজয়ের চিঠি পেয়েও লোকটাকে বিশ্বাস করেনি !

দশানন বড় জট পাকিয়ে ফেলল। তার বোঝা উচিত ছিল পৌষসংক্রান্তির স্নান শেষ হলেও মেলা আজই উঠে যায়নি। যারা এসেছে, ডাকাতের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে, তারা মেলা থেকে দোকানপত্র উঠিয়ে ফিরে যেতে-যেতে আরও অন্তত দু-তিনটে দিন নেবে। এরা আছে মেলাতেই। আর এদের জিম্মায় হোক বা জমিদারবাড়ির কোনও ঘরে হোক— ধরা-পড়া দশাননের দলের চারজন সঙ্গীও আছে। আছে একটা জখমি লোক। কোনওভাবে যদি খবর যায়— দশাননের লোক এসেছে জমিদারবাড়িতে, তবে তো হয়ে গেল ! লোকটা আর বেঁচে ফিরে আসবে না। তার ওপর মনসাচরের জোয়ান মদ্দ আর মেলার লোকরা না লাঠি-বল্লম নিয়ে হইহই করে ছুটে আসে নদীর চরে দশাননকে ঘিরে ফেলতে !

রামজয় আর ছইয়ের মধ্যে অপেক্ষা করতে পারলেন না। বাইরে এসে দশাননকে খুঁজলেন।

দশানন সাড়া দিল।

রামজয় বললেন, "এত দেরি হচ্ছে কেন ?"

দশানন বলল, "আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন !"

"হ্যাঁ। আমার জন্যে নয়, তোমার লোকের জন্যে।"

"আরও খানিকক্ষণ দেখুন।"

"তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারলে না। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি জমিদারবাড়িতে গেলে তুমি তোমার পাওনা সবই পেতে, আরও বেশি পেতে। তোমার শর্ত মেনে সঙ্গীদেরও আমি ছেড়ে দিতাম। আমি থাকলে তোমার বা তোমাদের কোনও ক্ষতি হত না ! কী করব, আমায় তুমি বিশ্বাস করলে না।"

দশানন হাসল। "উতলা হবেন না। সাপে কামড়ালে তারাই আগে মরে যারা উতলা হয়। আমরা সহজে উতলা হই না।"

"ভাল কথা। দ্যাখো.... !"

"আপনি ভেতরে গিয়ে বসুন। হিম লাগাবেন না।"

"আমার ভাল লাগছে না।"

আরও খানিকটা সময় গেল। রাত বাড়ল।

হঠাৎ দশানন বলল, "চলুন আপনাকে ডাঙায় নিয়ে যাই।" বলেই সে ছিপনৌকোর লোকটাকে ডাকল।

নিজের নৌকো থেকে ছিপ নৌকোয় এসে দাঁড়াল দশানন। সঙ্গে রামজয়। তারপর একেবারে চরে, বালিতে এসে নামল।

"ওই দেখুন—" দশানন বলল।

রামজয় তাকিয়ে থাকলেন। অনেক দূরে যাদের দেখা গেল— তারা কারা বুঝতে পারলেন না তিনি।

"ওরা কারা ?"

"আমার লোকজন।"

"তুমি এত দূর থেকে বুঝতে পারছ ! আলো নেই, মশাল নেই..."

"আমাদের ডাকাতের চোখ। ঘোর অন্ধকারেও চোখ জ্বলে।"

রামজয় তখনও নিশ্চিত হতে পারছিলেন না।

বালির ওপর দাঁড়িয়ে হিম-কুয়াশায় ভরা নদী আকাশ তারা দেখতে দেখতে শব্দ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন রামজয়।

শব্দটা কানে গিয়েছিল দশাননের। কী মনে করে হেসে বলল, "আপনার আফসোস হচ্ছে ?"

"হ্যাঁ।"

"মোহর, সোনা, টাকা...."

"না," মাথা নাড়লেন রামজয়। "ওর জন্যে নয়। আমাদের কিছু গুপ্তধন আছে, তোমায় বলেছি। তার কাছে ওই মোহর সোনা...."

"জানি জমিদারবাবু ! আপনাদের জমিদারবাড়িতে পুরনো গুপ্তধন আছে জানি। শুনেছি। আরও শুনেছি, গুপ্তধনের যেমন পুরনো ঘর রয়েছে সেই রকম তার পাশেই এমন ঘর আছে যেখানে আলো-বাতাস ঢোকে না। সেই কুঠরিতে কাউকে ঢুকিয়ে দিলে এ-জীবনে আর তার বাইরের আলো-হাওয়া দেখার উপায় থাকে না। ঠিক কি না, বলুন !"

"হ্যাঁ। যা শুনেছ তা অনেকটাই ঠিক।"

"আপনার কি তবে সেইজন্যে আফসোস হচ্ছে! আমায় সেই কুঠরিতে আটকাতে পারলেন না!"

"তুমি আমার সঙ্গে তামাশা করছ," রামজয় বললেন। "না, তা নয়। তোমায় আটকাতে পারতাম না।"

"কেন?"

"তুমি কী তা আমি জানি না। শুনেছি অনেক, বিশ্বাসও করতাম। আমার কিছু ক্ষতিও করল তোমার দলবল। তবু, আজ আমি জানি, তুমি অন্য জাতের ডাকাত। ...আমার আফসোস, এত কাছে-কাছে থেকেও তোমার মুখ আমি দেখতে পেলাম না।"

দশানন নীরব।

রামজয় হঠাৎ বললেন, "আমি তোমার কাছে হেরে গিয়েছি দশানন।"

"কেন?"

"বলতে পারব না। আমার বড় অহঙ্কার ছিল আমি সাহসী, সৎ, আমি অত্যাচারী নই, নিষ্ঠুর নই....। দেখলাম, তুমি বোধ হয়— আমার চেয়েও সাহসী, সৎ....।"

"জমিদারবাবু!"

"বলো।"

"আমার মুখ দেখলে আপনি তো কিছু বুঝতে পারবেন না। তবু, আপনার কথায়...." বলতে-বলতে দশানন মুখের আড়াল সরিয়ে ফেলল।

রামজয় তাকালেন। তাঁর সর্বাঙ্গ যেন চমকে উঠল। এমন মুখ দশাননের। সুশ্রী, সহজ, পরিচ্ছন্ন। শুধু একটি চোখ বোজা। অন্ধ নাকি! অতুলানন্দ বলেছিল, দশানন সুদর্শন। বাস্তবিকই তাই। কিন্তু তার একটি চোখের এই অবস্থা কেন!

"দেখলেন?"

"দেখলাম। ....তোমার একটা চোখ—"

"অন্ধ।"

"কেমন করে?"

"যৌবনকালে ভালুকের নখের আঁচড় খেয়েছিলাম। চোখটা নষ্ট হয়ে গেল। জন্তুর সঙ্গে লড়াই। একটা অঙ্গ তো যাবেই।" কথাটা দুর্বোধ লাগল।

দূরের লোকগুলো আরও কাছে এসে পড়েছে। রামজয় যেন বুঝতে পারছেন, ওরা দশাননেরই লোক। একটা কী যেন পিঠে চাপিয়ে নিয়ে আসছে। সেই জখমি লোকটাকে নাকি!

দশানন বলল, "এবার আপনি যেতে পারেন।"

রামজয় পা বাড়ালেন না।

হঠাৎ সেই ডাক। দূর থেকে ডাক ভেসে আসছে : আয়-আয়-আয় রে! নদীর চর যেন সেই ডাকে ছমছম করে উঠল। অতুলানন্দ তার বুনো কুকুরটাকে

ডাকছে। অতুলানন্দর গলা।

রামজয় বললেন, "অতুলানন্দ।"

দশানন বলল, "জানি।"

"তুমি চেনো নাকি ওকে ?"

"চিনি।"

"ও কে ?"

"ওই লোকটাই ক' বছর আগে এই দলের সঙ্গে লড়তে গিয়েছিল। ওর ভেক অনেক রকম। আপনি ধরতে পারবেন না। সন্ন্যাসীর বেশ ধরে আমাদের কাছে আসত-যেত। আমি ওকে বিশ্বাস করতাম। পরে দেখি লোকটা আমাদের পুরো দলকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ইংরেজ সেপাই দারোগার সঙ্গে ষড় করেছিল। সেবার সময় মতন জানতে পেরে আমরা পালিয়ে যাই। ওকে শেষ করে যেতে পারিনি। ওই অতুলানন্দ তখন থেকে আমাদের ধরার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে পেছনে-পেছনে। ....ও ইংরেজদের নুন খাওয়া লোক। হাওলদার থেকে দারোগা। বিশ্বাসঘাতক।"

রামজয় হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর কোমরে এখনও গাদা পিস্তলটা গোঁজা রয়েছে, অতুলানন্দ তাঁকে দিয়েছিল।

"তুমি আমাকে অবাক করছ দশানন ! অতুলানন্দ...."

"আমি সব জানি জমিদারবাবু ! ও এখানে মনসাচরে এসে বসে ছিল আমাদের ধরিয়ে দেবে বলে।"

"তা আমি জানি না। তবে ও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল এ ক'দিন। কিন্তু আজ তো ওদের সাতঘরির জঙ্গল ঘেরাও করার কথা।"

"পারেনি। চেষ্টা করেছিল। পালিয়ে এসেছে।"

লোকগুলো একেবারে কাছে এসে পড়ল। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল ওদের। আটক লোকগুলো ছাড়া পেয়েছে, ছাড়া পেয়েছে জখমি লোকটাও।

সাতঘরির জঙ্গল ঘেরাও হয়নি শুনে রামজয় স্বস্তি পেলেন। তিনি বারণ করেছিলেন অতুলানন্দকে। তিনি যখন মুক্তি পাচ্ছেন, শর্তও মেনে নিয়েছেন দশাননের— তখন লুকিয়ে ডাকাতদলকে ঘেরাও করা অন্যায় হবে। অতুলানন্দ সে-কথা শুনতে চায়নি। তবে সে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। ভাল হয়েছে।

লোকগুলো একেবারে কাছে এসে গিয়েছিল।

দশানন বলল, "আপনি এবার যেতে পারেন।"

রামজয় কী মনে করে বললেন, "তোমার প্রাপ্য পেয়েছ কি না দেখে নেবে না ?"

দশানন হাসল। "দরকার নেই। আপনি আসুন !"

রামজয় মাথা নাড়লেন। "তবু একবার দেখে নাও। রানির তো মাথার ঠিক নেই, বিপদে মানুষের ভুল হয়। তোমার যা প্রাপ্য যদি তা ঠিকমতন না দিয়ে থাকেন !"

দশানন বলল, “যা দিয়েছেন তাতেই আমরা খুশি।”

“তবে আসি।”

“আসুন।”

দশাননের লোকরা একেবারে সামনে। রামজয় দেখলেন। ওরা কোনও কথা বলল না। যে-লোকটা জখম হয়ে জমিদারবাড়িতে পড়ে ছিল তাকে পিঠে করে বয়ে এনেছে এরা। হয়তো পালা করে।

পা বাড়াবার আগে রামজয় হঠাৎ বললেন, “দশানন, তোমায় একটা জিনিস দিয়ে যাই—” বলে জোব্বা উঠিয়ে কোমর থেকে গাদা পিস্তলটা বার করে এগিয়ে দিলেন দশাননকে। “এটা আমায় অতুলানন্দ দিয়েছিল। আমার আর কাজে লাগবে না।”

দশানন হাত বাড়িয়ে দিল না। বলল, “আমার লোকরা আপনার জামার তলায় লুকিয়ে রাখা ছোরাটা নিয়ে নিয়েছে বাবুমশাই। আর মোহর-রাখা থলিটা। ছোরাটা আপনাকে ফেরত দেয়নি। ওটা থাক। মনসাচরের জমিদারমশাইয়ের স্মৃতিচিহ্ন...” হেসে উঠল দশানন। “মোহরের থলিতে দুটো মাত্র মোহর ছিল। জামার ভেতরের জেবে পাবেন। পিস্তল আপনি নিয়ে যান। কাজে লাগবে। পথটুকু সাবধানে যাবেন।”

রামজয় চলে আসছিলেন একা। অন্যমনস্ক, অভিভূত। কোনও হুঁশই ছিল না। দশাননের কথা ভারছিলেন। বড় আশ্চর্য মানুষ দশানন। এমন মানুষ জীবনে রামজয় দেখেননি, আর হয়তো দেখবেন না।

গলা শুনে মুখ তুললেন রামজয়। অন্ধকারে কুয়াশায় খেয়াল করতে পারেননি প্রথমে। পরে দেখলেন, পাঞ্জালি।

ছুটতে-ছুটতে এসেছে পাঞ্জালি। খবর পেয়েছে, রাজাবাবু ফিরে আসছেন।

“পাঞ্জালি ?”

“রাজাবাবু ! আপনি আসছেন শুনে...।”

“তোমরাও আসছ !”

“ওরা পেছনে আছে।”

“তোমরা না সাতঘরির জঙ্গল দখল করতে যাচ্ছিলে আজ— !”

“চেষ্টা করেও পারিনি।”

“ভাল হয়েছে। চলো। ....ওরা সব ভাল আছে ?”

“আজ্ঞে। তবে রানিমা ভাবনাচিন্তায়—।”

“ তা তো হবেই।” রামজয় চুপ করে গেলেন।

একেবারে নিঃশব্দে আরও খানিকটা হেঁটে আসার পর রামজয় বললেন, পাঞ্জালি, মেলার খানিকটা ক্ষতি হলেও আর কোনও ক্ষতি হয়নি তো ?”

“আজ্ঞে না।”

“আমার, তোমার— আমাদের সকলেরই একটা ভুল হয়েছিল। সেই ভুল না

করলে এই ক্ষতিও হয়তো হত না। যা যেত, সবই জমিদারবাড়ির। কিছু লুঠপাঠ হত। হলে হত। তবু এই আগুনের ধোঁয়া উঠত না, শিখা উঠত না, ছাই উড়ত না বাতাসে। আমরা দশাননকে চিনতে পারিনি, জানতেও পারিনি। শুধু তার গল্প শুনেছি। অত্যাচারের গল্প। নানা লোকে সেসব গল্প তৈরি করেছে। দশানন যদি অত্যাচারী হয় তবে আমি কী ?"

পাঞ্জালি কিছুই বুঝতে পারছিল না। চুপ।

জমিদারবাড়ি থেকে বুঝি কিছু লোকজন ছুটে আসছিল। তাদের রাজাবাবুকে দেখতে। তারা এখনও খানিকটা তফাতে।

হঠাৎ কে যেন বালিয়াড়ির আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল। হাতে গাদা বন্দুক। ছায়ার মতন দেখাচ্ছে তাকে।

রামজয় অনুমান করতে পেরে গিয়েছিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন।

তারপর হাতের গাদা পিস্তল তুলে ধরলেন ছায়ার দিকে।

শব্দ হল।

রামজয় বললেন, "অতুলানন্দ।"

পাঞ্জালি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

গ্রন্থপরিচিতি

ওয়ান্ডারমামা। চতুর্থ মুদ্রণ অগস্ট ১৯৮৩।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৯৮ + ৮। মূল্য ১০.০০।
উৎসর্গ : ছোটনকে—বাবা
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অহিভূষণ মালিক।
প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৭৪।

গজপতি ভেজিটেব্‌ল শু কোম্পানি। প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৩।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৯৬। মূল্য ১৬.০০।
উৎসর্গ : ঘচাং-কে দাদু।
প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী।

অলৌকিক। তৃতীয় মুদ্রণ মে ১৯৮৫।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১০১ + ৪। মূল্য ১০.০০।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।
প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১।

সিসের আংটি। প্রথম পুনশ্চ প্রকাশ বইমেলা ১৯৯৪।
পুনশ্চ। পৃ. ১৯৪। মূল্য ৩৫.০০।
উৎসর্গ : বুলবুলিকে—দাদুমণি।
প্রচ্ছদ : অনুপ রায়।
প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮৬। যোগমায়া প্রকাশনী।

রাজবাড়ির ছোরা ও হারানো জীপের রহস্য। প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৭৯।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৯২। মূল্য ১০.০০।
উৎসর্গ : পুচুন-কে বাবা।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : পূর্ণেন্দু পত্রী।

কিশোর ফিরে এসেছিল। প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ১৯৮৩।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৮৮। মূল্য ১০.০০।

উৎসর্গ : অপর্ণাকে—মামা।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুনীল শীল।

মন্দারগড়ের রহস্যময় জ্যোৎস্না। প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৯৫।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১৬৭। মূল্য ৪০.০০।
উৎসর্গ : বাবুই-কে।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুব্রত চৌধুরী।

হারানো ডায়েরির খোঁজে। প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৯।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৯৩। মূল্য ১২.০০।
উৎসর্গ : চৈতালিকে—জেঠু।
প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী।

কালবৈশাখীর রাত্রে। প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৮।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৯৬। মূল্য ১২.০০।
উৎসর্গ : বাবুইকে—দাদুমণি।
প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী।

রাবণের মুখোশ। প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ১৬৭। মূল্য ৫০.০০।
উৎসর্গ:অনমিত্র-কে মামাদাদু।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুব্রত চৌধুরী।